সাহিত্য সংকলন

সাহিত্য সংকলন

সম্পাদক

ভবানী মুখোপাধ্যায়

এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সনস্ প্রাইভেট লিঃ

১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

সূচীপত্র

প্র ব ন্ধ

শেক্‌সপীয়র তর্পণ

ক বি তা

ছোট গল্প

বড় গল্প

চিত্র

প্রচ্ছদ শিল্পী

শ্রীঅন্নদা মুন্সী ও শ্রীবিশ্ব গঙ্গোপাধ্যায়

নিত্য ব্যবহারে
নিম
টুথ পেষ্ট
ছেলেবেলা থেকে এই টুথ পেষ্ট ব্যবহার করলে দাঁত শক্ত ও মাঢ়ী সুদৃঢ় হয়।
একটি
ক্যালকেমিকো
অবদান

মনোজ বসুর

১ম পর্ব—৭·৫০ ॥ ২য় পর্ব—৮·০০

(তৃতীয় মুদ্রণ)

যুগান্তর পত্রিকার বিশেষ প্রবন্ধে (৪-১২-৬১) **নন্দগোপাল সেনগুপ্ত** কয়েকখানা বিশিষ্ট বই নিয়ে আলোচনা করেছেন, নিশিকুটুম্ব সম্পর্কে বলেছেন : বইটি দৃশ্যত চোর ও চুরির কাহিনী, কিন্তু আসলে মানুষ ও মানব-সংসারেরই নিখুঁত আলেখ্য তুলে ধরা হয়েছে এতে। মানুষ স্বভাবতই সৎ না অসৎ অন্যায় ও অপরাধ-প্রবৃত্তি সমাজব্যবস্থার প্রতিক্রিয়া রূপে জন্মায় না তার প্রবণতা সহজাত, সেই মৌলিক প্রশ্ন ভাবায় বইটি।

কিন্তু সে হল উপন্যাসের কঙ্কাল। আসলে বইটিতে আমরা দেখি বিচিত্র মানুষের মিছিল। খানিকটা গ্রাম ও খানিকটা সহরে ছড়ানো এর দীর্ঘকাহিনীতে কত বিচিত্র হাসি-কান্নার উপকাহিনী, কত রকমারি ভাব-অনুভাবের ঘাত-প্রতিঘাত। এমন শতমুখে প্রসারিত কাহিনীর জাল গুটিয়ে তাকে সমাহিত একটি করুণ-মধুর উপসংহারে নিয়ে আসায় ফুটেছে লেখকের আশ্চর্য কৃতিত্ব। মানবতার যে গভীর আবেদন আশ্রয় করে বইটি শেষ হয়েছে, তা-ই এই মহৎ উপন্যাসকে দিয়েছে সার্থক দর্শনের পদবী। লেখকের অধ্যয়নও প্রচুর।

গ্রন্থ প্রকাশ

৫।১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা—৯ ॥ ৩৪-১২৬৬

॥ উল্লেখযোগ্য বই ॥

প্রখ্যাত সংবাদিক নিমাই ভট্টাচার্যের এক অবিস্মরণীয় সাহিত্যকর্ম

রাজধানীর নেপথ্যে

চার টাকা

সংবাদপত্রের শিরোনামার আড়ালে লোকলোচনের অন্তরালে ভারতরাষ্ট্র এর রাজধানীর নয়াদিল্লীর বহমান জীবনের চমকপ্রদ কৌতুহলোদ্দীপক নেপথ্য কাহিনী।

ভবানী মুখোপাধ্যায়ের

জর্জ বার্নাড শ

২য় মুঃ

তিনটি খণ্ড একত্রে ॥ ১০·০০ ॥

'বার্নাড শ বর্তমান শতাব্দীর বহু বিতর্কিত বহু সমালোচিত ও বহু আদৃত গ্রন্থকার। তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির প্রতি এবং তাঁর জীবনকাহিনীর প্রতি পাঠক-পাঠিকাদের আগ্রহ এখনও প্রশ্নাতীত। বাংলা ভাষার শ'র পূর্ণাঙ্গ জীবনী রচনা করে সে কারণেই শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায় শ'রসিক বাঙালীদের ধন্যবাদভাজন হয়েছেন। শ'র সাহিত্যকীর্তির মতোই তাঁর জীবন কৌতূহলোদ্দীপক। এই গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণেই প্রমাণ যে ইংরেজী যাদের মাতৃভাষা নয় এমন একটি জাতির কাছেও বার্নাড শ'র জীবনকথা, তাঁর সাহিত্যসৃষ্টি কতো সাগ্রহ অনুকরণের বিষয়।'—**যুগান্তর** (১লা আষাঢ়, '৭০)

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা : বারো

ওঁ

বৈতানিক

স্ব গ ত

'বৈতানিক' প্রথম প্রকাশের পর দু'টি বৎসর অতিক্রান্ত। এই কালের মধ্যে 'বৈতানিক' স্বকীয় স্বাতন্ত্র্য অক্ষুন্ন রাখার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করেছে। বৈতানিকে'র পূর্বপ্রকাশিত খণ্ডগুলি বিচারশীল পাঠকের অকুন্ঠিত প্রশংসায় ধন্য হয়েছে।

আমরা প্রাচীনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং তরুণ প্রতিভার অনুরাগী। প্রবীন ও নবীনের সমাবেশেই সার্থক সাহিত্য-পত্রের সাফল্য সম্ভব এই আমাদের বিশ্বাস। রাজনৈতিক বা দলীয় প্রভাব মুক্ত শিল্প সঙ্গত সাহিত্য প্রচার আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। দেশ-বিদেশের সাহিত্যিক ও সাহিত্য কর্মের সঙ্গে আমাদের পাঠকদের ঘনিষ্ঠ সংযোগ সাধন আমাদের অন্যতম লক্ষ্য। আমাদের সীমিত-শক্তিতে যথাসম্ভব আন্তরিকতার সঙ্গে আমরা বঙ্গ-ভারতীয় সেবায় আত্মনিবেদন করেছি। পাঠকগণের চিত্তলোক নবীনতার অমৃতরসে উদ্ভাসিত করার মহৎ দায়িত্ব পালনে আমরা সচেষ্ট। নববর্ষের সূচনায় আমরা আমাদের সকল শুভানুধ্যায়ীর অকুণ্ঠ-সহযোগিতা ও সহায়তা প্রার্থনা করি।

*

২৫শে বৈশাখ আমাদের জাতীয় জীবনের এক পুণ্যতিথি। রবীন্দ্রনাথ আমাদের জীবনে যে ভাবে আবির্ভূত হয়ে আমাদের আনন্দ বেদনায় অংশগ্রহণ

করেছেন তার অপর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। বিশ্বজগতের অগনিত মানব সমাজ এবং বিশ্বমানবের আশা, আনন্দ, দ্বন্দ্ব, হতাশা, বেদনা, বঞ্চনা, সংকট, সংঘর্ষ প্রভৃতির সঙ্গে কবি একাত্ম হয়েছিলেন। এই নিবিড়তর সংযোগ ও গভীরতম উপলব্ধি রবীন্দ্রনাথকে শুধু মহাকবি নয়, শান্তি ও মৈত্রীর অগ্রদূতের মহিমায় মহীয়ান করেছে। তিনি বলেছেন: মানুষের মধ্যে যাঁরা মহত্তম, তাঁরা বাস করেন অনাগতকালে, তাঁরা প্রস্তুত করেন ভাবীযুগের আশ্রয়।" রবীন্দ্রনাথ সেই মহত্তম মানুষ, ১৩৭১-এর ২৫শে বৈশাখ আর একবার তাই তাঁকে আমরা শ্রদ্ধায় স্মরণ করি। এই উপলক্ষ্যে কবির 'জন্মদিনে' নামক গ্রন্থের দশম সংখ্যক কবিতাটির অংশ বিশেষ উধৃত করছি:

"কিন্তু যাদের নেই কোনো সংবাদ
কণ্ঠে যাদের নাইক সিংহনাদ,
সেই যে লক্ষ কোটি মানুষ কেউ কালো কেউ ধলো,
তাদের বাণী কে শুনেছে বলো?"

উপরি উধৃত কবিতাটির উপলক্ষ্য ছিল স্পেনীয় গৃহযুদ্ধ, নিদারুণ ভাতৃহত্যায় শতজীবনের হানি কবিচিত্তকে আকুল করে তুলেছিল। রোগজীর্ণ দেহ, কিন্তু কবির সেই জীর্ণ গলায় মানব সমাজের বেদনার যে বাণী সেদিন ধ্বনিত হয়েছিল আজ ১৩৭১ সালেও সেই বাণী মহাসত্যের মহিমায় মহিমামণ্ডিত।

কালজয়ী কবি তাই আমাদের চিরস্মরণীয়।

* * *

সাম্প্রতিক কালে এই উপ-মহাদেশের কোনো কোনো অঞ্চলে যে নিদারুণ হানাহানি হয়ে গেছে ইদানীং কালের ইতিহাসে তার তুলনা নেই। প্রতিদিন অসংখ্য ছিন্নমূল নর-নারী সীমান্ত পার হয়ে প্রাণভয়ে চলে আসছেন, তাঁদের মর্যাদাহীন মনুষ্যত্ব যে ভাবে অপমানিত ও উৎপীড়িত হয়েছে তা অতীব দুঃখকর।

পূর্ব ও পশ্চিম জার্মাণীর কাঁটাতারের বেড়া অনেকের চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছে জানি, অনেক উদার চরিত্র ব্যক্তি সেই অবস্থার বেদনাদায়ক চিত্র এঁকেছেন এবং আজো আন্দোলন করছেন, কিন্তু পূর্ব-বাংলা ও পশ্চিম-বাংলার বাংলা ভাষাভাষী নরনারীদের সম্পর্কে সেই জাতীয় কোনো জনমত গড়ে ওঠেনি। পশ্চিম বাংলার পশ্চিমত্ব যদি লোপ পেয়ে শুধু বাংলা হয় তাহলে যে ভীষণ অবস্থা হবে সে নিয়ে অবশ্য দিনের পর দিন সংবাদপত্রে সুদীর্ঘ

ভাবাবেগপূর্ণ চিঠিপত্র দেখা গেছে, কিন্তু উভয় বঙ্গের সাংস্কৃতিক সংযোগ বৃদ্ধির জন্য কোনো চেষ্টা হয় নি। সাংস্কৃতিক যোগসূত্রে দুটি বিচ্ছিন্ন অংশের মানসিকতার পরিবর্তন সম্ভব, এই বিশ্বাস আমাদের আছে।

সাম্প্রতিক দাঙ্গাহাঙ্গামায় উভয়বঙ্গের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন অনেক ব্যক্তির মধ্যে মহাপ্রাণতার পরিচয় পাওয়া গেছে, যদিও সংখ্যায় তা সামান্য তথাপি গুরুত্বে তার মূল্য অনেক বেশী। পুর্বপাকিস্থানের বাংলা দৈনিক পত্র 'পুর্বদেশে' প্রকাশিত "সাধু মাষ্টারের চিঠি" নামক নিবন্ধটির প্রতি সদবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। কিছু সংখ্যক মানুষের মনে যখন শুভবুদ্ধি জাগ্রত হয়েছে তখন যে সাংস্কৃতিক সুত্র সেই মানুষগুলিকে একসূত্রে বেঁধে রেখেছে সেই দেশের জনগণ, বর্তমান যুগেও, কেন বর্বর যুগের পশুর মত হানাহানি করবে তা বোঝা কঠিন। অশিক্ষা, সংস্কার, অন্ধ বিদ্বেষ আজ মানুষকে পশুরও নীচের স্তরে নিয়ে গিয়েছে। উভয় বঙ্গের সাহিত্যিক ও সাংবাদিকরা এই সর্বগ্রাসী বহ্নি নির্বাপণে যথেষ্ট সচেষ্ট সে পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। বিভ্রান্ত উক্তি, অতিরিক্ত অহিংস মনোবৃত্তির সঙ্গে অতি-উগ্র মানুষের অভাব কোনো দেশেই নেই। জ্বালা বৃদ্ধি না করে নিবৃত্তি করাব চেষ্টাই জ্ঞানীর কর্তব্য। সাংস্কৃতিক ভূমিতে আজ উভয় বঙ্গের সর্বত্র সেই শ্রেণীর দুঃসাহসী মানুষের কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে, এ অতি শুভলক্ষণ এবং অসীম কল্যাণের সম্ভাবনায় পুর্ণ।

* * * *

সুদীর্ঘ চার শতাব্দীকাল শেকস্‌পীয়রের কথা উল্লেখ করতে সর্বশ্রেষ্ঠ বিশেষণ ব্যবহৃত হয়েছে। সামুয়েল জনসন বলেছেন—"And panting time toiled after him in vain."—শতেক যুগের কবিদল তাঁকে বন্দনা জানিয়েছেন, তাঁর জয়গাথা গান করেছেন। নানারঙের জীবন ও মানুষ তিনি এঁকেছেন। সামুয়েল জনসন বলেছেন "many coloured life he drew" তার মধ্যে আছে বৈচিত্র্য বৈভব, বৈশিষ্ট্য এবং বিস্ময়। জীবনশিল্পী শেসস্‌পীয়রকে বাংলাদেশ আজ থেকে দুশো বছর আগে আবিষ্কার করেছে, বাঙালীর জীবনে তাই শেকস্‌পীয়র ঘরের মানুষ। ম্যাসিডোনিয়ার আলেকজাণ্ডার বিশ্ব বিজয় শেষে কেঁদেছিলেন, আর কোনো অঞ্চল বাকী নেই যা জয় করা যায়, এই ছিল তাঁর আক্ষেপ। কল্পলোকের সম্রাট শেকস্‌পীয়র মানব সমাজের যে ছবি এঁকেছেন তা বিশ্বভুবনের ছবি। এই মহাকবির চতুঃশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আমাদের গভীর শ্রদ্ধা জানাই।

আমার জীর্ণ পাতা যাবার বেলায় বারে বারে
ডাক দিয়ে যায় নতুন পাতার দ্বারে দ্বারে॥
তাইত আমার এই জীবনের বনচ্ছায়ে
ফাগুন আসে ফিরে ফিরে দখিন বায়ে,
নতুন সুরে গান উড়ে যায় আকাশপারে,
নতুন রঙে ফুল ফুটে তাই ভারে ভারে॥

ওগো আমার নিত্যনূতন, দাঁড়াও হেসে,
চলব তোমার নিমন্ত্রণে নবীন বেশে।
দিনের শেষে নিবিল যখন পথের আলো,
সাগরতীরে যাত্রা আমার যেই ফুরালো,
তোমার বাঁশি বাজে সাঁঝের অন্ধকারে,
শূন্যে আমার উঠল তারা সারে সারে॥

২৪ বৈশাখ
১৩২৬

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যাবার সময় হোলো বিহঙ্গের। এখনি কুলায়
রিক্ত হবে। স্তব্ধগীতি ভ্রষ্টনীড় পড়িবে ধূলায়
অরণ্যের আন্দোলনে। শুষ্কপত্র জীর্ণ পুষ্প সাথে
পথচিহ্নহীন শূন্যে উড়ে যাব রজনী প্রভাতে
অস্তসিন্ধু পরপারে। কতকাল এই বসুন্ধরা
আতিথ্য দিয়েছে, কভু আম্রমুকুলের গন্ধে ভরা
পেয়েছি আহ্বানবাণী ফাল্গুনের দাক্ষিণ্যে মধুর,
অশোকের মঞ্জরী সে ইঙ্গিতে চেয়েছে মোর সুর
দিয়েছি তা প্রীতিরসে ভরি; কখনো বা ঝঞ্ঝাঘাতে
বৈশাখের, কণ্ঠ মোর রুধিয়াছে উত্তপ্ত ধূলাতে,
পক্ষ মোর করেছে অক্ষম; সব নিয়ে ধন্য আমি
প্রাণের সম্মানে। এ পারের ক্লান্ত যাত্রা গেলে থামি
ক্ষণতরে পশ্চাতে ফিরিয়া মোর নম্র নমস্কারে
বন্দনা করিয়া যাব এ জন্মের অধিদেবতারে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শান্তিনিকেতন
১৪ বৈশাখ
১৩৪১

শেকস্‌পীয়র পঁয়ত্রিশখানি নাটকের রচনা করিয়া বিশ্ববিখ্যাত ও চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রণীত নাটক সমূহে কবিত্ব-শক্তির ও রচনাকৌশলের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতিরিক্ত তিনি চারিখানি খণ্ডকাব্যের ও কতকগুলি ক্ষুদ্র কাব্যের রচনা করিয়াছেন। অনেকে বলেন, তিনি যে কেবল ইংলণ্ডের অদ্বিতীয় কবি ছিলেন এরূপ নহে, এ পর্যন্ত ভূমণ্ডলে যত কবি প্রাদুর্ভাব হইয়াছেন, কেহই তাঁহার সমকক্ষ নহেন।

—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

শেক্সপীয়র তর্পণ

ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

শেক্‌সপিয়র

শেক্সপিয়রের আবির্ভাবের চতুঃশতবার্ষিকী উৎসবে তাঁহার দেশকালের বন্ধনমুক্ত, নিখিলমানব সমাজ প্রসারিত এক নূতন পরিচয় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে।

আজ তিনি শুধু ইংলণ্ডের ও ষোড়শ শতাব্দীর লোক নহেন, আজ তিনি বিশ্বজনের মর্মের আত্মীয়রূপে প্রকাশিত। সাহিত্যিক শিল্পকলা যেখানে জীবনপ্রজ্ঞার দিব্য জ্যোতির্ময়তায় আপনাকে হারাইয়া ফেলে, সৌন্দর্যবোধ ও মনুষ্যচরিত্রাভিজ্ঞতা যেখানে মহা রহস্য-পারাবারের তটসীমায় স্তব্ধ হইয়া দাঁড়ায়, শেক্সপীয়র সেই সীমা অসীমের সঙ্গমস্থলে মানবজিজ্ঞাসার পরিপূর্ণ প্রতীকের মহিমায় চিরবিরাজিত।

ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের একটি পংক্তি পাঠ করিয়া কোলরিজ মন্তব্য করিয়াছিলেন যে উহা যদি আরব মরুভূমিতে ধূলাবালির সহিত মিশিয়া বায়ুতরঙ্গে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিত, তাহা হইলেও তিনি উহাকে ওয়ার্ডসওয়ার্থের রচনা বলিয়া সনাক্ত করিতে পারিতেন ও উল্লাসভরে কবির নাম লইয়া চীৎকার করিয়া উঠিতেন। সকলের কোলরিজের মত অন্তর্দৃষ্টি থাকা সম্ভব নয়, তাথাপি কবির

রচনা আভ্যন্তরীণ লক্ষণ সাহায্যে চেনা যায় এই সত্যই ইহার মধ্যে পরিস্ফুট। নাট্যরচনা নৈর্ব্যক্তিক হইলেও লেখকের মানস রুচি ও প্রবণতা উহার মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে প্রতিফলিত না হইলেও লেখকের জীবনদর্শনের প্রভাব ও পাত্র-পাত্রীদের মধ্যে সহানুভূতির তারতম্য সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে ধরা পড়ে। শেক্সপিয়রের সমকালীন অন্যান্য নাট্যকারেরা তাঁহাদের নাটকের মধ্যে তাঁহাদের ব্যক্তিসত্তার কম-বেশী সুস্পষ্ট ছাপ রাখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এই আত্মপরিচয় বিলুপ্তিতে শেক্সপিয়র সম্পূর্ণ একক ও ধরাছোঁয়ার অতীত।

তিনি মানুষ কেমন ছিলেন, জীবনবৃত্তি সম্বন্ধে তাঁহার কিরূপ ধারণা ছিল সে সম্বন্ধে তাঁহার নাটক হইতে কোনও নির্দেশ পাওয়া যায় না। তিনি জীবনের বিভিন্ন স্তর হইতে বিচিত্র মেজাজের এত বিপুল সংখ্যক চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন যে তাঁহাদের কাহারও সহিত তাঁহার একাত্মতা প্রতিপন্ন করা অসম্ভব। নাট্যসৃষ্টি মায়ামুকুরে যে অসংখ্য ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাদের মধ্যে কাহারও সহিত নাট্যকারের বাস্তব সাদৃশ্য আবিষ্কার ত দূরের কথা, অনুমানই করা যায় না। সৃষ্টিবৈচিত্র্যের মধ্যে আপনাকে নিশ্চিহ্ন করিয়া মিশাইয়া দেওয়ার অদ্ভুত শক্তিতে শেক্সপিয়র কিছুটা ঐশী রহস্যের অধিকারী। অথচ তিনি অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগে জন্মিয়াছেন, তাঁহার জীবনের বাস্তব পরিবেশ মোটামুটি আমাদের পরিচিত, তাঁহার জন্মস্থানে ও কর্মস্থল এলিজাবেথীয় রঙ্গালয়ে তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন কিছু কিছু ছড়ান আছে, তাহার সহযোগীদের শ্রদ্ধা ও ঈর্ষা উভয়ই তাঁহার মুখের উপর ক্ষণিক আলোকপাত করিয়াছে। কিন্তু আত্মা যেমন দেহাভ্যন্তরে থাকিয়াও দেহবোধের অতীত, তেমনি শেক্সপিয়র এক বিশেষ স্থান ও কাল পরিবেশ বিধৃত হইয়াও স্রষ্টা হিসাবে এক অভাবনীয়, কল্পলোকের অধিবাসী। মানুষ শেক্সপিয়রের তথ্যগত প্রমাণ অবলম্বনে আমরা শিল্পী শেক্সপিয়রের সুদূর, নিঃসঙ্গ, রহস্যাবগুণ্ঠিত আত্মার ছদ্মবেশ উন্মোচন করিতে অক্ষম।

বিশ্বস্রষ্টার ন্যায় তাঁহারও প্রস্‌পারোর প্রশান্ত প্রজ্ঞা, এরিয়েলের চপল মাধুর্য ও ক্যালিবানের স্থূল পাশবিকতার প্রতি উদার সমদর্শিতা।

শেক্সপিয়রের আর একটি অনন্যবৈশিষ্ট্য তাঁহাকে অন্য সব শিল্পনির্মাতা হইতে স্বতন্ত্র মহিমায় অধিষ্ঠিত করিয়াছে। প্রায় সমস্ত শ্রেষ্ঠ লেখকেই জীবনকে একটি নির্দিষ্ট দৃষ্টিকোণ, বস্তুবাদ, আদর্শবাদ বা বিশ্ববিধানের এক বিশেষ অনুরঞ্জনের মাধ্যমে দেখিতে অভ্যস্ত। তাঁহাদের লেখায় জীবনের যে রূপটি ফুটিয়া উঠে তাহা উহার কোন একটি উদ্বর্তিত, পরিশোধিত সংস্করণ।

এমন কি যাঁহারা অবিমিশ্র বস্তুবাদী, যাঁহারা কোনরূপ আদর্শানুরঞ্জন ব্যতীত জীবনের বিশুদ্ধ বস্তুসঞ্চয়গঠিত সাধারণ ভাববৃত্তিমূলক ছবি আঁকিতে অভ্যস্ত, তাঁহারাও নিজ নিজ গ্রহণ-বর্জননীতির দ্বারা জীবনদর্শনের প্রত্যক্ষ না হউক, পরোক্ষ পরিচয় দেন। এমনকি টলস্টয়, গ্যেটে প্রভৃতি যে শ্রেণীর লেখক জীবনের বিস্তীর্ণতম পটভূমিকা জীবনচিত্রাঙ্কনের জন্য নির্বাচন করেন, তাঁহারাও তাঁহাদের আপাত-অপক্ষপাত মনোভাবের মধ্যেও একটি দৃঢ়, হয়ত অস্বীকৃত শিল্প অভিপ্রায় পোষণ করেন। ঘটনা-নির্বাচনে উহার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে ও উহার পরিণতিসংঘটনে যে সত্যানুসন্ধিৎসা প্রকাশ পায় তাহার মধ্যে একটি পূর্বপরিকল্পিত ছন্দানুবর্তনের অলক্ষিত প্রভাব ক্রিয়াশীল। সকলেই যেন জীবনকে রাসায়নিক পরীক্ষাগারে গলাইয়া উহাকে পরিস্রুতরূপে গ্রহণের পক্ষপাতী। দর্শন ও বিজ্ঞানের ঔপপত্তির প্রত্যয় কিছুটা তাঁহাদের জীবন-রূপায়ণকে নিয়মিত করে।

প্রায় সকলেই জীবনরসপ্রবাহে পূর্বধারণার পাত্রটি ডুবাইয়া সেই পাত্র হইতে রস চুমুকে চুমুকে পান করেন। তাঁহাদের সৃষ্টি আলোচনায় জীবন রসের যতটা মূল্য, উহাতে নিমজ্জিত, প্রত্যয়-পাত্রটিরও প্রায় ততখানিক মূল্য।

শেক্সপিয়র এ বিষয়ে একটি অনন্য ব্যতিক্রম। প্রত্যক্ষ ও অব্যবহিত জীবনরস আস্বাদনে লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে তাঁহার সমতুল্য কেহ নাই। তিনি কোন পূর্বপোষিত মতবাদের ভেলা বা সুনির্দিষ্ট দার্শনিক মনন ও জীবননীতির নৌকার সাহায্যে এই তরঙ্গ ক্ষুব্ধ জীবনমহাসমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে চাহেন নাই। তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রাবলীর মুখে যে গভীর প্রজ্ঞাময় জীবনদর্শন অভিব্যক্ত হইয়াছে তাহা নাটকীয় বিশেষ, পরিস্থিতি ও তাহাদের বিশেষ অভিজ্ঞতার যুগ্ম প্রভাবে উদ্ভূত, অন্তরমন্থনসঞ্জাত সারনির্যাস। ম্যাকবেথ, হ্যামলেট বা রাজা লিয়রের যে গভীর জীবনসমীক্ষার বাণী ধ্বনিত হইয়াছে তাহা তাঁহাদের মর্মদীর্ণকারী অনুভূতির আগ্নেয় ভাবোদ্গীরণ, তাহা কোন সুলভ সার্বভৌম জ্ঞান সঞ্চয় হইতে আহরণ মাত্র নয়। ইঁহাদের মধ্যে একের বাণী অপরের মুখে মানাইবে না।

ম্যাকবেথের জীবনের প্রতি নিঃশেষ ঔদাসীন্য ও অনাস্থা, হ্যামলেটের সঙ্কটে স্থিরসিদ্ধান্ত গ্রহণের অক্ষমতাপ্রসূত কূট দর্শনচিন্তাজাল, লিয়রের পারিবারিক স্নেহবন্ধনের উন্মূলনজাত সৃষ্টিবিধানের সামগ্রিক অস্বীকৃতি—এ সবই কোন সাধারণ সত্য নয়, প্রত্যেকেরই ব্যক্তিগত অসহ্য মর্মবেদনার বৃন্তে বিকশিত রক্তপুষ্প। বাজপাখী যেমন শিকারের উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে,

শেক্সপিয়রও তেমনি উর্ধ্বগগন হইতে জীবনের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া উহার অন্ত্র হইতে সত্য অভিজ্ঞতা নিষ্কাষন করিয়াছেন। দস্যু যেমন পথিকের উপর আপতিত হইয়া উহার ধনরত্ন আত্মসাৎ করে, শেক্সপিয়রও তেমনি দুর্দম শক্তিতে জীবনের টুঁটি চাপিয়া ধরিয়া উহার গোপন ভাণ্ডারের রহস্য আদায় করিয়াছেন। শেক্সপিয়রের মত জীবনের সঙ্গে এমন নগদ কারবারী সাহিত্যিক সমাজে আর দ্বিতীয় মিলিবে না। যে অর্থে আলেকজাণ্ডার দিগ্বিজয়ী সম্রাট, সেই অর্থে শেক্সপিয়র জীবন-বিজয়ী স্রষ্টা।

শেক্সপিয়রের আরও কতকগুলি আসাধারণ বৈশিষ্ট্য তাঁহার মৌলিক প্রতিভার পরিচয়বাহী। তিনি যে অবস্থায় যে ধরণের চরিত্র আঁকিয়াছেন তাহাদের বাচনভঙ্গী ও বাণীর মধ্য দিয়া এক স্বচ্ছন্দ জীবনলীলা পরিস্ফুট। জীবনবেগ যেখানে নিজ স্বতঃস্ফূর্ত প্রাচুর্যে তরঙ্গিত হইয়া উঠিতেছে সেই ছন্দপ্রবাহটিই শেক্সপিয়রের লেখনীতে আশ্চর্যভাবে ধরা পড়িয়াছে। নানাবিধ চরিত্র—প্রকৃত ও অপ্রাকৃত, সহজ ও জটিল, স্বাভাবিক ও উৎকেন্দ্রিক, জীবন-রসিক ও জীবনবিমুখ, চটুল যৌবন, অস্ফুটবাক্ শৈশব, প্রজ্ঞাগম্ভীর প্রৌঢ়ত্ব—সবই তাঁহার তুলির স্বল্পতম টানে প্রচুরতম জীবন-বৈভবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রণয়ের বৈদ্যুতী শক্তি, প্রেমের উত্তেজনায় জীবন-উপাদানের নব নব রূপের বিন্যাস, এক মস্ত আবেশঘূর্ণনে উহার গঙ্গা-তরঙ্গিত চাঞ্চল্যের অপ্রত্যাশিত বুদ্বুদ উৎক্ষেপ তাঁহার প্রেমিক-প্রেমিকার আচরণে ও সংলাপে বিস্ময়কররূপে প্রকটিত।

শেক্সপিয়রের যুগে প্রেম বিষয়ে একটি কৃত্রিম, কল্পনা-বিড়ম্বিত পাণ্ডিত্য-প্রকাশে ভারাক্রান্ত বর্ণনা ও সংলাপের রীতি Eupheus Arcadia প্রভৃতি গদ্য আখ্যান-গ্রন্থে প্রচলিত ছিল। শেক্সপিয়র সেই কৃত্রিম আদর্শ গ্রহণ করিয়াও উহার মধ্যে অদ্ভুতভাবে প্রাণস্পন্দন ও গতিবেগ সঞ্চারিত করিয়া আশ্চর্য কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। তিনি তাঁহার প্রতিভাস্পর্শে ছন্দ পাণ্ডিত্যের কেতাবী ভাষাকে প্রাণলীলার ভাষায় পরিণত করিয়াছেন। তাঁহার প্রেমসংলাপে আবেগবিহ্বলতা অপেক্ষা মননদীপ্তি ও ক্ষিপ্র জীবনগতিই বেশী মাত্রায় প্রকাশিত। তিনি প্রেমকে wit-এর সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া উহার প্রাণোচ্ছলতা ও বেগবান জীবনসমীক্ষাই বিশেষভাবে প্রকটিত করিয়াছেন। তিনি আলঙ্কারিক শ্রেণীবিন্যাস অনুযায়ী বিভিন্ন রসের স্বতন্ত্র স্ফূরণ অপেক্ষা জীবনের প্রত্যক্ষ প্রেরণাজাত মিশ্র রসেরই উদ্বোধন করিয়াছেন। তাঁহার করুণ রস কাঁদিয়া ভাষায় না; বীররস উচ্চকণ্ঠে আন্দোলন করে না। জীবনের

মিশ্র উপলক্ষ্যের মধ্য হইতে এক একটি সল্পপরিসর উক্তি আমাদের চক্ষুকে অশ্রু-আপ্লুত ও বীরত্ব-বিস্ফারিত করে।

শেক্সপিয়রের জন্মকাল হইতে চারিশত বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে। এই সুদীর্ঘ শতাব্দী চতুষ্টয়ের মধ্যে আমাদের জীবন ও জীবন সম্বন্ধীয় জ্ঞান নানাভাবে সমৃদ্ধ হইয়াছে তাহা নিশ্চিত। কিন্তু আসল প্রশ্ন হইল এই দীর্ঘকালে আমরা কি শেক্সপিয়রের অভিমুখে বিশেষ অগ্রসর হইয়াছি, না, উহার বিপরীত পথেই চলিয়াছি? দুঃখের সহিত বলিতে হয় যে, এই অন্তবর্তীকালে আমাদের জীবন ও জীবনকে দেখিবার ভঙ্গী শেক্সপিয়রবিমুখতার দিকেই প্রবলভাবে ঝুঁকিয়াছে। আমরা আমাদের অভ্যস্ত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও সমালোচনা-পদ্ধতির সাহায্যেই তাঁহার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করিতেছি। আমাদের জীবন এখন বহু জটিল মতবাদের জালে জড়িত, নানা দুশ্ছেদ্য সমস্যাজর্জর। রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী'র রাজার ন্যায় আমরা জীবনকে প্রত্যক্ষভাবে নয়, লৌহজালের অন্তরাল হইতেই দেখি। জীবনের সহিত আমাদের অব্যবহিত সংযোগ আজ বিচ্ছিন্নপ্রায়। আজ কাব্য নাটকে অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি ও বৈজ্ঞানিক ফলশ্রুতির অন্তর্ভূক্তি-প্রয়াসেরই একাধিপত্য। প্রায় সব, সাহিত্যিকই এক একটা থিওরি বা উদ্দেশ্যের ঠুলি চোখে পরিয়াই জীবন-দৃশ্যের অনুধাবন করিতেছেন। কি লেখক কি পাঠক সকলের জীবনই যান্ত্রিকতা-কবলিত। শেক্সপিয়র যে মুক্ত, প্রসন্ন, অন্তর্ভেদী জীবনকে দেখিতেন তাহা যেন আধুনিক যুগের নেত্র হইতে সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হইয়াছে। ডাক্তার যেমন যন্ত্রসাহায্যে রোগীর দেহ পরীক্ষা করে, সাহিত্যও তেমনি ব্যাধি-বীজাণুবহুল জীবনকে পরীক্ষা করিতেছে। সাহিত্যে সুস্থ দৃষ্টি, সহজ প্রসন্নতা, জীবনের বিস্ময়-মহিমার স্বতঃস্ফূর্ত, অনায়াস উপলব্ধি ও দিব্য প্রতিভার রঞ্জন-রশ্মিতে উহার রহস্য-গভীরতায় চকিত অনুপ্রবেশ—এইগুলিই শেক্সপিয়রের কবিসত্তার শাশ্বত গুণ। এগুলি যদি জীবনে ফিরিয়া না আসে, তবে শেক্সপিয়র-পূজা নিছক অতীতচারণায় পর্যবসিত হইবে। 'উর্বশী'র মহাকবির বাক্যের প্রতিধ্বনি করিয়া আমাদের বলিতে হইবে 'অস্ত গেছে, অস্ত গেছে সে গৌরবশশী।'

প্রেমেন্দ্র মিত্র * একটি ভাস্বর মানুষ

সূর্য খুঁজি কোথায় ?
শুধু আকাশ নয়,
নয় মৃত্তিকার হরিৎ উল্লাসে,
পৃথ্বী পঞ্জরের পুঞ্জিত তাপ-শিলাতেও নয়।
খুঁজি এই মানুষের মধ্যে
গহন পরম অনাদি সূর্য।

ইতিহাসে পট কতবার রক্তাক্ত হতে দেখলাম,
দেখলাম উৎক্ষিপ্ত আলোড়িত মানব-প্রবাহের মত্ততা।
সে সবও বুঝি ক্ষণিকের সূর্য-কলঙ্কের রিষ্টি।
তবু তারই মধ্যে
অবিরাম সময়ের ধারায় ছড়িয়ে যাওয়া
আগামী প্রভূতির পলি।

সমস্ত ভাবীকাল যাতে রঞ্জিত
সেই সূর্য মাঝে মাঝে চমকায়
শুধু মানুষেরই মধ্যে।

সৃষ্টিমুল বিধাতার ত্রিকালের পালার খসড়া-ই
কি আধেক উদ্ঘাটিত,
বারেক অনাবৃত, জীবনের পরম রহস্য-মুকুর,
শীতার্ত একটি দ্বীপে
একটি ভাস্বর মানুষ
জীবনকে মঞ্চে তুলে দেখেছিল বলে ?

"No Time Thou shall not boast that I do change—

আমার বিপত্তি দেখে হে কাল করো না গর্ব অত,
তোমার যে পিরামিড অসীম শক্তির সংগঠন,
সে কিছু নূতন নয়, নয়ক তা অদ্ভুত অন্তত,
সকলি তা পুরানোর অভিনব রূপে উজ্জীবন।
আমাদের আয়ু অল্প, তাই বৃথা জয়ধ্বনি করি
তাদের উদ্দেশে যারা তোমার আঘাতে জীর্ণ হয়,
আমাদের ইচ্ছা দিয়ে নবজন্মে নব রূপে গড়ি
অথচ ভাবি না তারা কোনটাই স্বয়ম্ভূব নয়।
তোমার হিসাব খাতা আর তুমি দুইই উপেক্ষার,
অদ্য বা অতীত নিয়ে মনে নেই অহেতু বিস্ময়,
তোমার যা কীর্তিচিহ্ন, যত কিছু ঐশ্বর্য সম্ভার,
দুর্বার গতিতে তারা সবই ওঠে, সবই পায় লয়!
তাই এ শপথ করি, চিরন্তন এ আমার বাণী,
তোমার করাল কাস্তে, তবু আমি মৃত্যুঞ্জয় জানি।

CXXIII

"How oft, when thou, my music, music play'st

মাঝে মাঝে যখনি সে পরিপূর্ণ রাগিণী বাজাও,
ভাগ্যবন্ত কাষ্ঠখণ্ডে সুরের মূর্ছনা রূপ পায়
তোমার অঙ্গুলীস্পর্শে, তারে তারে যখনি নাচাও,
বিভ্রান্ত শ্রবণ দুটি সেই সুরে সম্বিত হারায়।
আমার কি ঈর্ষ্যা হয় ঐ ক্ষীণ তন্ত্রীগুলো দেখে,
মনে হয় ঐ ভাবে চুমো দিই দুটি শুভ্র হাতের গভীরে ?
আর এ দরিদ্র ঠোঁট সৌভাগ্যের পাকা ফল চেখে,
লজ্জায় দাঁড়িয়ে যাব দুঃসাহসী দারুযন্ত্র ঘিরে !
হায় তা হত গো যদি, তাহলে কপাল যেত ফিরে,
আমার সর্বাঙ্গ হত নৃত্যময় তারের মতন…
যার পরে লঘু পায়ে তোমার আঙুল চলে ধীরে,
জীবন্ত ঠোঁটের চেয়ে মৃত কাঠে জাগায়ে স্পন্দন !
ঐ যে বীণার তার, ওরা সুখী ঐটুকু পেয়ে,
ওদের আঙুলই দাও, আমি বাঁচি ঠোঁটে চুমো খেয়ে।

CXXVIII

"In faith, I do not love thee with mine eyes

সত্য জেনো, চক্ষু দিয়ে আমি ভালোবাসি না তোমাকে;
কেননা তোমার মধ্যে দেখে তারা সহস্রেক ত্রুটি ;
কিন্তু এ হৃদয়, সে-যে ভালোবাসে চক্ষু ছাড়ে যাকে,
মাতে তারি অনুধ্যানে যাকে দৃষ্টি দেখায় ভ্রুকুটি।
এ নয় যে, শ্রুতি মোর তব কণ্ঠস্বরে আনন্দিত,
এ নয়, মধুর ইচ্ছা শরীরী স্পর্শের সাড়া খোঁজে ;
কিম্বা স্বাদ, গন্ধ, এরা মনে মনে নয় আমন্ত্রিত
একাকী তোমার সঙ্গে ইন্দ্রিয়জ বাসনার ভোজে
কিন্তু পঞ্চবৃত্তি কিম্বা পঞ্চেন্দ্রিয় হার মেনে যায়
দ্বিধাহীন ছাড়ে সে-যে মানুষের সর্ব গরিমায়,
গরবী তোমার ভৃত্য—সাহচর্যে খোঁজে সে প্রসাদ।
তবু মোর দুর্দশাতে লাভ শুধু এ-টুকুই ঘটে—
সে শুধু দুঃখই দেয় যে-ঠেলেছে পাপের সঙ্কটে॥

CXLI

"Like as the waves make—"

সমুদ্রের তীর জুড়ে উপল বিস্তার,
সেদিকে তরঙ্গরাশি বেগে ধাবমান ;
আমাদেরও মুহূর্তেরা সমাপ্তি রেখার
বক্ষোদেশে নিঃশেষিত, অনন্ত প্রয়াণ !
এগিয়ে চলাই লক্ষ্য তাই প্রাণপণ
অগ্রগামী সকলের পশ্চাদ্ধাবন।
আলোয় যাহার জন্ম তুচ্ছ বাধাভয়,
সগৌরব সংগ্রামেই পূর্ণতায় লীন ;
যৌবনে বিজয়-টীকা কালের প্রশ্রয়,
সুন্দরীর ভ্রূযুগল তুলনাবিহীন !
প্রকৃতির মহাসত্য দুর্লভ সন্ধান ,
নির্মম কাস্তের মতো কালের সংহার;
তাও ব্যর্থ; কালজয়ী কবিতা আমার,
আশাদীপ্ত সেই সৃষ্টি তোমারই যে গান।

LX

"As a decrepit father takes delight—"

যৌবনের চর্চা করে সক্রিয় সন্তান
যেমন তা দেখে সুখ অশক্ত পিতার
ভাগ্য বিড়ম্বিত আমি সান্ত্বনার দান
তেমনি তোমাতে খুঁজি সত্য ও সুসার।
যা-কিছু সে হোক জেনো সৌন্দর্য সম্পদ
ধীশক্তি বা জন্ম কিংবা কিছু ততোধিক
তোমার দেহে ও মনে শোভে কোকনদ,
আমি তার সব রসে প্রেম ও প্রেমিক।
তখন তো খঞ্জ নই ঘৃণিত গরীব
তাও নই, যখন ছায়াতে সমারোহ
তোমার প্রাচুর্যে স্নান করে ধন্য জীব
আংশিক গৌরবে বাঁচে জীবন সুসহ।
শ্রেয় যা তা সব নিয়ে তুমি মহীয়ান
এ ইচ্ছায় দশগুণ সুখী মনপ্রাণ।

XXXVII

"How careful was I—"

কত যত্নবান হয়ে যাত্রার সময়
প্রতি ক্ষুদ্র বস্তুটিকে যত্নে তুলে রাখি,
মিথ্যা ব্যবহারে যদি ঘটে অপচয়
শুধবো আমিই সব গুণাগার, ফাঁকি।
কিন্তু রত্ন ধূলামুঠি তুমি ভাব জানি,
সকল সান্ত্বনা আজ শোকের কারণ,
প্রিয় তুমি আদরের শ্রেষ্ঠ ধনখানি
হীন তস্করের হাতে করি সমর্পণ।
তোমাকে রাখি নি আমি সিন্দুকেতে ভরে,
নেই তুমি তবু আছ করি অনুভব,
আমার নরম বুক ঘিরে রাখে ধরে
খুসি হলে চলে যাও খুসিতে উদ্ভব।
সেখান থেকেও তুমি চুরি-যাবে ভয়
এমন ধনের ক্ষেত্রে সত্য চোর হয়!

XLVIII

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত * কিং লিয়রকে মনে রেখে

হায় হায় শব্দ বাজে হাহা ধ্বনি আজও হাওয়ায়,
সমস্ত শতাব্দী ছাখো আলোড়িত মেঘবৃষ্টি ঝড়ে ;
বিদীর্ণ হৃদয়ে রেখে অকৃতজ্ঞ পুত্তলীর দায়
এখনো আর্তির ঢেউ ধরা দেয় বহু কণ্ঠস্বরে ।
কৃতঘ্নতা, হে রাজন ! নিয়তি কি দুষ্ট বিধিলিপি,
নিজের রক্তের সৃষ্টি নিজেকেই হানে যদি ছুরি,
কে হবে তোমার মতো নীলকণ্ঠ বিষণ্ণ প্রলাপী,
স্নেহের সন্তান যদি হানে সেই নির্দয় চাতুরী ?

পক্ষান্তরে কর্ডেলিয়া, জীবনের বিচ্ছিন্ন কুসুম,
পিতার স্নেহের রত্ন, করুণার ক্লান্ত কাঙালিনী ;
ভ্রান্তি আর শোচনায় ঝরে যায়, মৃত্যু তার ঘুম,
অকৃতজ্ঞ ছায়াদের আকাশে বাতাসে কানাকানি ।

ঝড়বৃষ্টি ঝঞ্ঝাপাত অকৃতজ্ঞ নিসর্গ ত নয়,
স্বার্থের ছোবল যার একমাত্র তার কাছে ভয় ॥

জয়দেব চট্টোপাধ্যায়

স্বৈরিণী-আত্মা

আমি একটি মেয়েকে নিয়ে পালিয়েছিলাম। তারপর যা যা করব বলে ভেবেছিলাম তা করতে পারছি কই। পারছি না ত। তাকে আমি বিয়ে করেছি। বিয়ে নয় ওরা-ই একটা অভিনয় বটে। তারপর লুকিয়ে শহর থেকে দূরে বস্তীতে বাসা বেঁধেছি। আরও গ্রন্থীতে বেঁধেছি তাকে। সে আমার সন্তান বহন করছে। তারপর যা করব ঠিক করেছি—হ্যাঁ তা আমি করবই করব। হোকনা অন্যায়। মানবতা বিরোধী। মানবতা—ফুঃ। ওই কথাটার কোন অর্থ নেই। আর করব নাই বা কেন? এটাতো প্রতিশোধ। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেয না? নিশ্চয়ই নেব।

আমার বাবা মার বেলায় ব্যাপারটা কি হয়েছিল? আমার বাবাকে নিয়ে মা যখন পালিয়েছিল। তাই কখন হয় না কি? কেউ নিশ্চয় প্রশ্ন তুলতে পারে। পারে একশোবার পারে। প্রত্যেক যুক্তিবাদী-ই বলবে এটা সত্য নয়। ভুলকথা। একটা ছেলে পালায়। সঙ্গে নিয়ে যায় একটা মেয়ে। মেয়েটা কখন কি ছেলেটাকে নিয়ে পালাতে পারে। ছেলেটা কি নেহাৎ-ই নাবালক? কিন্তু ব্যাপারটা উল্টো-ই হয়েছিল। অন্ততঃ আমি তাই মনে করি।

আমার বাবা কাজ করত একটা কাটা কাপড়ের দোকানে। ক্যাশবুকে টাকার হিসাব রাখত। চিনির বলদ হয়ে শুধু পরের টাকার চাপেই শরীরটা নুয়ে গিয়েছিল অল্প বয়সে। আমার মা ঐ দোকানেই কাজ করত। দোকানে দুটো বিভাগ ছিল। একটা ছেলেদের পোষাকের আর একটা মেয়েদের পোষাকের। মেয়েদের দিকের কাউণ্টারে দাঁড়িয়ে এগিয়ে দিত সাড়ী, ব্লাউজ, আর ছোট মেয়েদের ফ্রক। ভাব হয়েছিল একটু একটু করে। যা হয়ে থাকে যৌবনে, চোখে যখন সোণালী পর্দা দেওয়া থাকে। যখন মেয়েদের দেখা মাত্র-ই সুন্দরী বলে মনে হয়। আমার বাবার তখন সেই বয়স। মাকে খুব ভাল লেগেছিল বাবার। ভাল লেগেছিল চটুল হাসি আর মাপা কটাক্ষটুকু। মাকে আমি জীবিত দেখিনি। ছবি ও দেখিনি কোনদিন যতদিন বাবা বেঁচে ছিলেন। শুনেছি মা আমার মরে গিয়েছে আমার জ্ঞানোদয়ের আগে। আর আমার দুর্ভাগ্য তাঁর কোন ছবি রেখে যান নি তাঁকে আমার চেনার জন্য। আমি দুঃখ পেয়েছি মার জন্য। মাঝে মাঝে মাকে মনে করবার চেষ্টা করেছি। আর কারুর মার সঙ্গে অনেকটা মিল করে আমার মা'র একটা প্রতিমূর্তি গড়বার চেষ্টা করেছি। মাকে দেখতে চেয়েছি, দেখতে পাইনি বলে দুঃখ পেয়েছি। অথচ বাবা মারা যেতে জেনেছি কথাটা আগাগোড়া মিথ্যে। বাবা মারা যেতে বাবার সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির মালিক হয়েছিলাম আমি। তখনই বাবার ঘরের একটা স্যুটকেশ ঘাঁটতে ঘাঁটতে প্রথমে বুঝেছিলাম বাবা মিথ্যাবাদী। বাবা আমাকে এতদিন ধরে ধাপ্পা দিয়ে ঠকিয়েছেন। আমার বিশ্বাস আর মতকে ভ্রান্ত করে দিয়েছেন। আমি একটা মস্ত ভুলকে মেনে নিয়েছি, বিশ্বাস করেছি। ছি ! ছি !

ঐ স্যুটকেশের মধ্যে আমি পেয়েছিলাম একটা ফটো। বাবা বসে আছেন বর সেজে। বয়স অনেক অল্প। আর তাঁর পাশে কনে সেজে বসে আছে একটি মেয়ে। বুঝলাম ঐ আমার মা। বিশ্বাস আরও ধ্রুব হ'ল যখন দেখলাম আর পেছনে বাবার নিজের হাতে লেখা I and Jamuna 1935। মা'র ছবি ছিল তাহ'লে। আমায় কিন্তু চেনবার সুযোগ দেয়া হয়নি। আমি ঠকেছি। বাবা ঠকিয়েছেন। আর পেলাম বাবার হাতের লেখা অনেক চিঠি আর ডায়েরী। তখন-ই আমার বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছলাম যে আমার মা পালিয়েছিল বাবাকে সঙ্গে ক'রে।

সেগুলো পড়তে পড়তে চাপ চাপ অন্ধকারে নিজেকে ফেলেছিলাম হারিয়ে। চারিদিকের অজস্র ছায়ামূর্তি আমায় আঙুল দেখিয়ে বলেছিল—তুমি পাপের

প্রতিভূ, তুমি গরলের বিন্দু। তোমার মুখ থেকে তোমার মূর্তি থেকে অজস্র মালিন্যের গন্ধ বেরুচ্ছে। হয় ধুয়ে ফেল নির্মল হও। নয়ত ডুবে যাও, তলিয়ে যাও গরল সাগরের অতলে। ভালর মুখোস পরে পাপ বহন কোরো না। অন্যায়, অন্যায়, ভীষণ অন্যায়।

সমস্ত গল্পটা আমার চোখের সামনে এল। একটা জালের আড়ালে নিজেকে অস্পষ্ট রেখে আমি দেখতে লাগলাম। সেই অল্প বয়সে কাপড়ের দোকানের ক্যাশবাবুর কাছ থেকে পালাল। যা করে থাকে সকলে সমাজের সম্মতি না পেলে। যেমন পালিয়েছিলাম আমি ঐ মেয়েটিকে নিয়ে। ক্যাশবাবুর বাড়ীর লোকেরা সংস্রব রাখেনি তার সঙ্গে। মেয়ের বাপের বাড়ীরাও মেয়েটাকে স্বৈরিণী আখ্যা দিয়ে দূরে চলে গিয়েছিল। কিন্তু তারা দূরে যায়নি। যখন রেজেষ্ট্রী ম্যারেজ হ'ল তখন মেয়ের বাবা বেঁচে ছিলেন না—ছিলেন তার মা। মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করাটা তাঁর নেহাৎই পাকা শীকারীর মত কাজ হয়েছিল। এ যেন সুতো ছেড়ে দিয়ে মাছটাকে টোপ গেলানোর প্রলোভন দেখানো। অথচ ক্যাশবাবুর বাড়ীর লোকেরা সত্যিই সরে গিয়েছিল অনেক দূরে। কিছুদিন পরে হঠাৎ সেই কাউণ্টারের মেয়েটি দেখল তার মা খুব ভাল লোক। অন্ততঃ ক্যাশবাবুর বাড়ীর লোকেদের মত নেহাৎ সমাজের ভয়ে একটা সত্যকে গ্রহণ করবার সৎসাহসটাকে হারায়নি। সেই কথা কটাকে যথেষ্ট যুক্তি সঙ্গত করে ভাবল ক্যাশবাবু ভদ্রলোক। তাই শ্বাশুড়ী ঠাকরুণ আর দুই শ্যালিকাকে নিজের কাঁধে নিল। সেই দুই শ্যালিকার বিয়ের ঠিক হ'ল। শ্বাশুড়ী ঠাকরুণ চিন্তায় পড়লেন। টাকা চাই যে অনেক টাকা। টাকা যোগাড় করল ক্যাশবাবু। যে পরের টাকার হিসাব এতদিন রাখত, তাই এবার নিজে নিয়ে এল। বলে নয়, না'বলে। নিঃশব্দে বিয়েটা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তার পরেই এসেছিল যা অনিবার্য্য। সেই ক্যাশবাবু হারিয়ে ছিল চাকরী। সেই কাউণ্টারের মেয়েটা তারপর কিছুদিন খাইয়েছিল সেই ক্যাশবাবুকে। এর মধ্যেই কোন এক ফাঁকে জন্মেছিলাম আমি। কখনও হয়ত সেই কাউণ্টারের মেয়েটাকে মা বলে ডেকেছি। ছিঃ, ছিঃ, তাকে কেন যে আমি ও পবিত্র সম্বোধনটা করেছিলাম, নিজে জানি না। অজ্ঞানে ঐ সম্বোধনটা করেছিলাম তা না হ'লে ওটা পাপ-ই হ'ত। ঐ দোকানে তখন এক নতুন ক্যাশবাবু এসেছিল। সুন্দর, সুপুরুষ। কাউণ্টারের মেয়েটি আবার তাকেও ভালবেসেছিল। প্রথমে নিঃশব্দে। তারপর সোচ্চারে। আমার বাবাকে চোর আখ্যা দিয়েছিল সেই মেয়েটি। তার মা-ও সায়

দিয়েছিলেন কথায়। এরপর মেয়েটি একদিন চলে গিয়েছিল পুরোনো ক্যাশবাবুকে ছেড়ে নতুন ক্যাশবাবুর সঙ্গে।

এরপর জানা গিয়েছিল শুধু—এই লোকটা নয় আরও অনেক লোককে ভালবেসেছিল সেই কাউণ্টারের মেয়েটা। স্বৈরিণী আখ্যা তাকে নতুন করে দিতে হয়নি।

ক্যাশবাবু তারপর আবার চাকরি যোগাড় করেছে। তার সন্তানকে বাঁচিয়েছে আর ঐ দুবছরে প্রেমের নাটককে মনে রাখতে সযত্নে রক্ষা করেছে কিছু চিঠি আর একটা ফটো। ও থেকে সে আনন্দের রস পেত না বিষাদের রস পেত তা জানা যায়নি। হয়ত কিছুই পেত না। হয়ত শুধু ইতিহাস রক্ষা করার আনন্দেই ঐটুকু তুলে রেখেছিল সযত্নে।

আমি কিন্তু আমার চারদিকে একটা বিষাদ দেখতে পেলাম এরপর। নিজের মুখে, গায়ের চামড়ায়, মাংসে অনুভব করলাম একটা ভীষণ মালিন্য, একটা অশ্লীল অনুভূতি। একটা স্বৈরিণী জন্ম দিয়েছিল আমায়। ঐ মেয়েটাই পালিয়েছিল আমার বাবাকে নিয়ে। বাবা কখনই পালায়নি মেয়েটাকে সঙ্গে করে। মেয়েটা প্রলোভিত করেছে বাবাকে। তাকে নিয়ে পালিয়েছে। এর জন্যে বাবাকে নিজের পরিবারের আর সব মানুষের কাছে হেয় হ'তে হয়েছে। হারিয়েছে, সব কিছু হারিয়েছে বাবা। আমি-ও সেই বাবার ছেলে বলে হারিয়েছি অনেক।

অথচ সেই মেয়েটা হারায়নি কিছুই। নিজের সুখ বজায় রেখেছে ঠিক-ই। প্রেমের মূল্য দেয় নি। তবে, স্বৈরিণী ছাড়া কি হ'তে পারে? আমার মস্তিষ্কের স্নায়ুতে বিষাক্ত মাকড়সা বিচরণ করতে থাকে। এক বিষাক্ত অনুভূতি নিয়ে, নিজেকে ছোট করে কতদিন জীবনধারণ করা যায়?

সেই মেয়েটারই শরীরের রসে একটু একটু করে বড় হয়েছি আমি। আমার শরীরের প্রথম কোষগুলো ঐখানেই গঠন করেছি হয়ত। ওঃ! কি গরল, কি গ্লানি বহন করছি আমি।

প্রথমে ভাবতাম আত্মহত্যা করব। জীবন দিয়ে মুছে দেব জীবনের গ্লানিমা। কিন্তু না, তা করতে পারলাম না। কারণ দেখলাম সে অত্যন্ত কঠিন কাজ। তাছাড়া একটা লজ্জা মুছতে কাপুরুষ হ'ব কেন? নিজে পালিয়ে বাঁচব কেন?

আর ঠিক তখনই আমার মনে এই এল প্রতিশোধ নেবার কথাটা। প্রতিশোধ নিতে হ'বে। চরম প্রতিশোধ। সেই মেয়েটা যে আমার

শরীরের কোষে ঘৃণ্য বীজ সংক্রমণ করে গেছে তার ওপর প্রতিশোধ। তাকে প্রথম কিছুদিন খুঁজেছি। তাকে খুঁজে পেলে হয়ত হত্যা করতাম। কিন্তু তাকে পাইনি। তখন ঠিক করলাম প্রতিশোধ নিতে হবে স্বৈরিণী আত্মার ওপর। যে আত্মা বাস করছে অনেক মেয়ের সুন্দর অবয়বের মধ্যে। তার ওপরেই আমার প্রতিশোধ তুলব। তার ওপর যে কি করে কি উপায়ে প্রতিশোধ তুলব সেটাও ভাবতে আমার অনেকদিন সময় লেগেছিল। তারপর যা ঠিক করেছিলাম তা উপযুক্ত বলেই মনে হয়েছিল আমার। যে লজ্জাস্কর অনুভূতি আমার শরীরের কোষে কোষে বাসা বেঁধে আছে, যা ক্ষণে ক্ষণে আমার পাকস্থলী ঘুলিয়ে দেয়—সেই অনুভূতির-ই সংক্রমণ করব আমি। সংক্রামণ করব সেই সুন্দরীর অবয়বে আর তার থেকে যা সংক্রামিত হ'বে ঐ স্বৈরিণী-আত্মায়। সেখানে আত্মাটাকে খোঁচা দেবে, আর তেমন প্রচণ্ড শক্তিতে পারলে তাকে হত্যা করবে।

সেই কথা ভেবে আমি ভালবাসার জন্য খুঁজতে লাগলাম সেই অবয়ব। খুঁজতে লাগলাম সেই সব সুন্দরী মেয়েদের যারা দেহের বাঁকে যৌবন তুলে ধরে আলেয়ার মত প্রলোভন দেখায়। আমি জানি ওরা ভালবাসে নিজেদের। নিজেদের ভালবাসে ওরা প্রেমিকের থেকে বেশী। ওরা মনে করে ওদের দেহের দুয়ারে দাঁড়িয়ে সকলেই ভিক্ষাবৃত্তি করছে। পুরুষদের ওরা ধন্য করে একমুঠো ভিক্ষে দেয়। আমি জানি ঐ অবয়বের মধ্যে থাকে স্বৈরিণী-আত্মা। সেই আত্মাই আমার লক্ষ্য।

চাঁপা বলে মেয়েটাকে হঠাৎ-ই দেখলাম। ডালহৌসী পাড়ায় অফিসে অফিসে ধুপ বিক্রী করত। রঙীন তাঁতের সাড়ীর সঙ্গে রঙ মিলিয়ে পরত জামা। পায়ে স্যাণ্ডেল। কাঁধে ঝোলান ব্যাগে রকমারি ধূপের প্যাকেট। সাড়ী, জামা কাপড় সব কিছুর দোকানে বসে চিঠি নকল করতাম। ও এসে আমার সামনে দাঁড়িয়েছিল সেদিন।—"ধূপ নেবেন, ভাল গন্ধ, চন্দন, অগুরু—?" প্রচণ্ড বিরক্তি নিয়ে ওর দিকে তাকিয়েছিলাম। তারপর ওর শরীরের দিকে তাকিয়ে যেন বুঝেছিলাম ওর শরীরের মধ্যেই সেই স্বৈরিণী-আত্মা আছে।

সেদিন কি আমি ভুল বুঝেছিলাম? না তা আমি বুঝিনি। আমি মেয়েদের দিকে তাকালেই বুঝতে পারি তার ভিতরের আত্মার প্রকৃতি। আর ভুল বুঝব-ই বা কেন। এদিক থেকে আমার মা আমার একটা উপকার করে গেছেন। দুর্গন্ধ চেনবার শক্তি দিয়ে গেছেন আমায়। তাই আমি ভুল বুঝিনি। ভুল বুঝিনি বলেই প্রতি পদক্ষেপে যেমন মাটি পাব

ভেবেছিলাম তেমনই পাচ্ছি। বোঝার ভুল আমার হয়নি বলেই বোধ হয়। তবে কেন শেষ মুহূর্তে এমন সব প্রশ্ন জাগছে। যা করব বলে ঠিক করেছি তা আমি করব-ই। প্রতিশোধ নিয়ে পাপের শোধন।

চাঁপা মেয়েটার মূলধন ছিল দেহভরা যৌবনের বাঁক। বিক্রী হ'ত নিশ্চয়-ই অনেক। মেয়েটার সঙ্গে কথা বলেছি তারপর। প্রতি মাসেই ধূপ কিনেছি নিয়ম করে। ধূপ নেবার আছিলায় হাতে হাতে ঠেকিয়েছি। হাতের তালুর ওপর একটা একটা করে পয়সা গুণে দিয়েছি বার বার ছুঁয়ে ছুঁয়ে। এইসব পরীক্ষা করে একেবারে নিশ্চিত হয়েছি যে মেয়েটা স্বৈরিণী আত্মা বহন করে। বুঝেছি ঠিক ভালবাসার অভিনয় করেছি ওর সঙ্গে বহুদিন ধরে। ওর বাড়ীর খবর নিয়েছি। ওর বাড়ী গিয়েছি। পথে মিশেছি। আর স্থির নিশ্চয় হয়েছি ঐ সেই মেয়ে। ওকেই আমি খুঁজছিলাম।

তারপর ওকে নিয়ে পালিয়েছি একদিন। আমার এ বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না যে আমি পালিয়েছি চাঁপাকে নিয়ে। চাঁপা আমায় নিয়ে পালায়নি। কালীঘাটের চাতালে বিয়ের অভিনয় করেছি। সহরের দূরে নিভৃত বস্তীতে বাসা বেঁধেছি। এরপর আরও কিছু ভালবাসার অভিনয় করার পর ওকে বেঁধেছি গ্রন্থীতে। এই উপযুক্ত মুহূর্তে আমি পরিকল্পনা করেছিলাম ওকে ছেড়ে পালাব। সকলের চোখের সামনে ও নীচু হ'বে; লজ্জা পাবে। ওর দেহে যে লজ্জার বীজ আছে তা লজ্জা দেবে ওর আত্মাকে। আঘাত করবে, শক্তি থাকলে হত্যা করবে। কিন্তু কোথায় যেন থমকে যাচ্ছি। কোথায় যেন মনে হচ্ছে অন্যায় আমি করছি। মানবতার কথা আমি ভাবি না। ও কথাটা যে ভুয়ো তা নতুন করে বলতে হ'বে না। আমার মতে মানবতা একটা মুখোস, তাছাড়া আর কি?

তবে কি করা যায়? যে লজ্জার বীজ রাখলাম ওর কাছে সে যদি আবার প্রতিশোধ নেয় মানব আত্মার ওপর। প্রতিশোধ নিতে নিতেই মানুষের পরে মানুষ বেড়ে উঠবে। এরত শেষ হবে না তবে? চক্রবৃদ্ধিহারে বাড়বে।

আর এক চিন্তার স্রোত মাথায় এসেছে ওকে দিয়ে আত্মহত্যা করাব। ওকে ঘৃণা দেব। ওকে হেয় করব, ছোট করব, তখন এ পাপ শোধনের দায়িত্ব ও ওর নিজের হাতেই নেবে। হয়ত গলায় দড়ি দেবে নয়ত বিষ খাবে। মৃত্যুর দ্বারে ওকে ঠেলে দেব।

চাঁপাকে তাই আমি বদনাম দিয়েছি। অনেক দিন ওকে মেরেছি, যন্ত্রণা দিয়েছি। আর ওর চরিত্রে রাশি রাশি কলঙ্ক সংগ্রহ করে এনে ঢেলে দিয়েছি। কিন্তু চাঁপা আমাকে এত ভালবাসে কেন?

আজকাল আমার একটা চিন্তা মনে কেমন দানা বাঁধছে যে মৃত্যুতে চাঁপা হয়ত মহান হ'বে। তাহলে আমার এই প্রতিশোধ নেয়া ত হবে না।

আজকাল যখন আমি চাঁপাকে পীড়ন করি। ওর যন্ত্রণা কাতর চোখ দুটোর দিকে তাকাই, তখন মনে হয় কে যেন আমাকে শাসন করে। সোণা রঙের ছোট্ট একটা জীব যেন ভীষণ আক্রোশে চিৎকার করে উদ্যত মুষ্টি আমার দিকে ছুঁড়ে দেয়। আমার ভয় করে।

আচ্ছা ও ত দোষ করেনি। ওকে তবে কেন আমি আমার জিঘাংসার ছোবলে টানব। কেন ওর প্রাণ নেব? সেই নূতন প্রাণের ক্রোধ, সেকি ঈশ্বরের আসনে পৌছবে না। হয়ত পৌছাবে। ছোট্ট প্রাণের শক্তি অনেক। অনু থেকে অণুতে শক্তি প্রবলতর হব। ওকে হত্যা ত করা চলে না? একি আমার ভয়? না, না, ভয় আমি করি কাকে। তবে স্নেহ, ভালবাসা? না তাও নয়। ভালবাসা আমি দিই নে কাউকে, কাউকে দেব-ও না। তবে এ কি? আমি কিছু ভুল বুঝছি না ত?

হঠাৎ চিন্তায় ক্লান্ত আমার মস্তিষ্কের স্নায়ুগুলো কেমন স্বপ্নালু হয়ে যায়। আমি দেখি আমার সেই ছবিতে দেখা মা দাঁড়িয়ে আছে। তার শরীরটা একটু একটু করে দ্রবীভূত হয়ে তরল হয়ে যাচ্ছে। একটা পাত্রে করে সেই তরল নারীমূর্তি আমার ঘৃণার আগুনে কে যেন আহুতি দিল। সেই অপরিশোধিত তরল মূর্তি আগুনে শুদ্ধ হয়ে ফোঁটা ফোঁটা করে এসে পড়ছে চাঁপার অবয়বের মধ্যে। ও যে পরিশুদ্ধ কারণবারী। ও থেকে মাতাল হয় না ত। ও কি জীবনের মদ? ও না পেলে শক্তি কমে যাবে? জীবনধারণের কাল কমে যাবে? তবে? দেখছি আমার সব পরিকল্পনাই ব্যর্থ হয়ে গেল।

এখন আমি কি করব তাই ভাবছি।

অজিতকুমার মুখোপাধ্যায় * ঘুম ভেঙে

মাঝ রাতে ভেঙে গেল ঘুম ; জানলার ধারে
অনন্ত জ্যোৎস্না খেলা করে।
টগর মল্লিকা যুঁই রজনীগন্ধার ডালে ডালে,
ঘুম ভাঙানোর গান কে আজ বাজালে।
ফুলদের কাছাকাছি জ্যোৎস্নার সরলতা ছুঁয়ে সর্বদেহে—শুয়ে থাকি ;
তবু অন্ধকারে প্রাণকেন্দ্রে ; উৎসারিত অন্ধস্রোত চেতনার কিনারে কিনারে
মাথা খোঁড়ে, স্নায়ু ছেঁড়ে, শোনিত বুদবুদ কাটে, শিরা কাটে, প্রলয় ঘূর্ণনে
পাড় ভাঙে, বালি ধ্বসে—সাদা ও কালোর দ্বন্দ্বে, ঢেউয়ে আলোড়নে
উচ্চারিত নাম, স্মৃতির গণ্ডুষ পানে পিপাসা মেটে না জ্বালা বাড়ে।
সে জ্বালা না মিটতে আসে সহসা সকলে ; রৌদ্রকরোজ্জ্বল
ধোঁয়া ধূলো আছে বটে, ধূসর প্রচ্ছদ তাও চিনি ;
মাঝরাতে ঘুমভাঙার বঞ্চনা সে কখনও করেনি।
দেখায় না সে আর এক জগৎ ; পালানোর পথ নেই জেনে
যে জ্বালা অন্তরে আছে তাকে বুঝি ভালবাসি—আত্মীয়ের মত নিই মেনে।

শান্তনু দাস * নির্বোধের যুক্তি

তিন নির্বোধ যুক্তি করে আকাশের নীচে
সূর্যটা ইদানীং আলো দিচ্ছে অত্যন্ত কম
তাছাড়া আকাশটাও দূরে নয়, খুব বেশী দূরে,
দূরের আকাশটাকে ইচ্ছে করলে ধরা যেতে পারে।

সুতরাং আকাশটাকে ধরবার আগে
মুখটা ভিজিয়ে আসি আর একটু হুইস্কির জলে
পাঞ্চ করে সোডার বোতল
তারপর সময়ে আঁকসি দিয়ে সূর্যটা নামিয়ে
চকচকে করে দেবো বিলিতি পালিসে !

ইদানীং সূর্যটা আলো দিচ্ছে অত্যন্ত কম
রান্নাঘরে কালি পড়া বালবের মত।

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য

ভেরিয়র এলউইন

ডক্টর ভেরিয়র এলউইনের মৃত্যুতে ভারতের আদিবাসী সমাজ তাহার একজন প্রকৃত বন্ধুকে হারাইল। যাঁহারা তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন, তাঁহারা প্রত্যেকেই জানেন যে অতিরিক্ত পরিশ্রম তাঁহার মৃত্যুর কারণ। আমার প্রায় চারি বৎসরকাল তাঁহার গবেষণা সহযোগী থাকিবার সুযোগ হইয়াছিল, এই সময়ের মধ্যে তাঁহাকে দেখিয়াছি, তাঁহার শহরের বাড়ীতে, আপিশে কিংবা আদিবাসীর গ্রামে সর্বত্রই তিনি দৈনিক প্রায় আঠার ঘণ্টা কাল গবেষণা কার্যের জন্য পরিশ্রম করিতেন, দৈনন্দিন জীবনে তাঁহার অন্য কোন ধ্যান কিংবা কর্ম ছিল না। এলউইনের পিতাও একজন অক্সফোর্ডের 'ডক্টর অব ডিভিনিটি' (Doctor of Divinity) ছিলেন এবং তিনিও এলউইনের মতই স্বদেশ হইতে বহুদূরবর্তী পশ্চিম আফ্রিকায় যখন সিয়েরা লিওনের (Sierra Leone) লর্ড বিশপরূপে কাজ করিতেছিলেন, তখন আফ্রিকার দুরন্ত হলুদ জ্বরে (yellow fever) আক্রান্ত হইয়া মাত্র ৩৮ বৎসর বয়সে প্রাণত্যাগ করেন। ভেরিয়র এলউইনও ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় নাগরিকের অধিকার লাভ করিয়া স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের সমস্ত

সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং ভারতীয় অধিবাসীর সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। এই কার্যে তাঁহাকে ভারতের সর্বাপেক্ষা ম্যালেরিয়া রোগাক্রান্ত অঞ্চলেই জীবনের অধিককাল ব্যয় করিতে হইয়াছিল, মধ্যে মধ্যে তিনি ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িতেন, ইহার বিষ কোনদিনই তাহার দেহ হইতে সম্পূর্ণ দূর হইয়া যায় নাই, ৬০ বৎসর অতিক্রম করিবার পর তাহার পরিশ্রম আর সহ্য হইল না, তিনি রোগগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন এবং মাত্র ৬২ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিলেন।

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের দারুণ শীতের মধ্যে আমি তাঁহার সঙ্গীরূপে উড়িষ্যার কোরাপুট জিলার গুনুপুর তালুকের পাহাড়ের উপর এক শবর জাতির গ্রামে গিয়া বাস করিতেছিলাম। আদিবাসীদের যে খড়ের গাদা ছিল, তাহার নিম্নাংশ অনেকখানি ফাঁক ছিল, তাহাই গাছের পাতা দিয়া ঘিরিয়া লইয়া আমাদের বাস করিবার ব্যবস্থা হইল। এলউইন যখন আদিবাসীর গ্রামে যাইতেন কখনও তাঁবু কিংবা সভ্য জাতির কোন তৈজস সঙ্গে লইতে না, কেবল মাত্র ক্যাম্প খাট, কিংবা ক্যাম্প চেয়ার দুই একটি সঙ্গে থাকিত। ভিজা মাটির উপর পুরু করিয়া খড় বিছাইয়া চারিদিকে পাতায় ঘিরিয়া খড়ের গাছের নীচে দিনের পর দিন ক্যাম্প খাট পাতিয়া আমরা সেখানে বাস করিতেছিলাম। কয়েকদিন যাবৎ বৃষ্টি হইতেছিল, মাটি স্যাঁৎস্যাঁতে, খড় ভিজিয়া উঠিবার উপক্রম হইল, অবশেষে দেখিতে দেখিতে খড় ভিজিয়া গেল, সারা রাত্রে ঘুমের মধ্যে পাতার বেড়ার ফাঁক দিয়া জলের ঝাপটা আসিয়া আমাদিগকে ঘুমের মধ্যে ভিজাইয়া দিতে লাগিল। এলউইনকে বলিলাম, এইখানে আর থাকা যায় না, বরং চল কোনো ঘরে গিয়া উঠি। এলউইন রাজি হইলেন না, বলিলেন, এঁরা গরীব আদিবাসী, এঁদের ঘরে গিয়া যদি আমরা উঠি, তাহা হইলে ইহারা কোথায় যাইবে? দেখিতেছ না, একটি ঘরে ছেলেপিলে লইয়া সকলে থাকে, একটি ব্যতীত আর একটি যে ঘর কাহারও কাহারও আছে তাহাতেও গরু কিংবা ছাগল থাকে। সুতরাং পৌষ মাসের শীতে গভীর রাত্রে জলের ঝাপটায় ভিজিতে হইল। অল্পদিনের মধ্যেই দেখা গেল, উপরের গাদা করা সমস্ত খড় ভিজিয়া গিয়া তাহার ভিতর দিয়া ফোঁটা ফোঁটা জল চোয়াইয়া পড়িতেছে। লেপের নীচ হইতে মুখ বাহির করিলেই মুখে নাকে ফোঁটা ফোঁটা বরফের মত ঠাণ্ডা জলের ফোঁটা পড়িতে থাকে। এলউইনের মত রসিক লোক আমি কমই দেখিয়াছি। সেই অবস্থাতেও তিনি রসিকতা করিয়া আমাকে বিষয়ের গুরুত্ব সম্পর্কে যথার্থ অবহিত হইতে দিলেন না। কিন্তু অবশেষে লেপও ভিজিয়া

উঠিল। এলউইনের দুইটি মোটা কম্বল ছিল, একটি সম্পূর্ণ ভিজিয়া গেল, আর একটিও ভিজিতে লাগিল এবং ইহার অনিবার্য পরিণতি রূপে তিনি যে ম্যালেরিয়া জ্বরে মধ্যে মধ্যে ভুগিতেন, সেই জ্বরে আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু নিজের অসুখের জন্য তিনি ভাবিলেন না, বলিলেন, এই রকম আমার প্রায়ই হয়, কয়েকদিনের মধ্যেই সারিয়া যাইবে। কিন্তু তোমার কোনদিন ম্যালেরিয়া জ্বর হয় নাই, আমার আশঙ্কা হইতেছে এইবার তোমারও জ্বর হইতে পারে; সুতরাং তুমি আর এখানে থাকিও না তুমি আজই বেনারস রওনা হইয়া যাও। আমি এখানেই থাকিব। একটি রুগ্ন ব্যক্তিকে বন্ধু-বান্ধবহীন আদিবাসীর এক সুদূর গ্রামে নিঃসঙ্গ ফেলিয়া রাখিয়া নিতান্ত স্বার্থপরের মত আমি নিজের নিরাপত্তার জন্য ফিরিয়া যাইব, ইহা ভাবিতে আমার ভাল লাগিল না। আমি বলিলাম, তুমি সুস্থ না হইলে আমি যাইতে পারি না। কিন্তু তিনি শুনিলেন না, তিনি রুগ্নদেহ লইয়া এক আদিবাসী গৃহস্থের বারান্দায় গিয়া উঠিলেন, সেখানে কিছু খড় বিছাইয়া মাটিতেই তাহার বিছানা করিয়া দেওয়া হইল। শরীরের উত্তাপ প্রায় একশত চারি ডিগ্রি। টিপ টিপ বৃষ্টির তখনও বিরাম নাই, মাঠে জল, পথে কাদা, আকাশে রোদ নাই কি রকম একটা গুমোট ভাব। সেখান হইতে চলিয়া আসিতে পারিলে আমি বাঁচিতাম, কিন্তু একটি রুগ্ন ব্যক্তিকে এই ভাবে ফেলিয়া রাখিয়া আসিতে মন সরিতেছিল না। কিন্তু এলউইন আমাকে সেখানে আর থাকিতে দিলেন না। একজন পিওন তাঁহার নিকট রাখিয়া একজন পিওন সঙ্গে লইয়া আমি গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া আসিলাম। সেইগ্রামে প্রায় একমাস কাল তিনি ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য উপসর্গে ভুগিয়াছিলেন, কিন্তু এই দিকে তাহার বিন্দুমাত্রও ভ্রূক্ষেপ ছিল না।

এই পরিশ্রমের অভ্যাস তাঁহার জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ছিল। মধ্যে মধ্যে যখন রোগগ্রস্ত হইয়া পড়িতেন তখনও তাঁহার বই পড়ার বিরাম ছিল না। একবার যখন কাশীতে বরুণানদীর তীরে কেশবাশ্রম নামে আমরা এক বাড়ীতেই ছিলাম, তখন একদিন তিনি ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইয়া অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন। আমাকে ডাকিয়া কাছে বসাইয়া আমার হাতে একটি বই তুলিয়া দিয়া বলিতেন, তুমি পড়, আমি শুনিয়া যাই, ইহাতে তোমারও কাজ হইবে। আমি তাঁহার রোগশয্যায় বসিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা পড়িয়া গিয়াছি। তিনি অবসন্ন দেহে শুনিয়া গিয়াছেন, মধ্যে মধ্যে কোন বিষয় আমাকে বুঝাইয়াও দিয়াছেন।

কিছুদিন পূর্বে আমি যখন লেনিনগ্রাডে Ethnographic and Anthropological Museum-টি দেখিতে যাই, তখন সেখানকার গবেষণা-বিভাগের একজন কর্মীর হাতে এলউইনের কিছুকাল পূর্বে প্রকাশিত নেফা সম্পর্কিত একখানি বই তাঁহাকে গভীর মনোযোগের সঙ্গে পড়িতে দেখিলাম। বইখানি দেখিবামাত্র আমার এলউইনের কথা মনে পড়িল। তাঁহাকে বলিলাম, ভেরিয়ার এলউইনের যে সম্প্রতি মৃত্যু হইয়াছে সে সংবাদ কি তোমরা জান? ভদ্রলোক চমকাইয়া উঠিলেন, আর একজন মহিলা ছুটিয়া আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কি বলিতেছ?

আমি বলিলাম, মাত্র কিছুদিন পূর্বে ভেরিয়ার এলউইন আকস্মিক ভাবে পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহাদের দেশে এখনও এই সংবাদ পৌঁছায় নাই, তাহারা বিস্ময় ও দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, চারিদিকে যে যেখানে ছিলেন তাহাদের সকলের মধ্যেই সংবাদটি রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। সকলেই আসিয়া আমাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া এলউইন সম্পর্কে নানা প্রশ্ন করিতে লাগিলেন? মৃত্যুকালে তাহার বয়স কত হইয়াছিল যখন বলিলাম, ৬২ বৎসর মাত্র, তখন একজন মহিলা এই কথাই বলিলেন, খুব অল্প বয়সেই তাঁহার মৃত্যু হইল, কিন্তু অতিরিক্ত পরিশ্রমেই তিনি মৃত্যুকে ডাকিয়া আনিয়াছেন। বুঝিতে পারিলাম, এলউইনের জীবন সম্পর্কিত সমস্ত সংবাদ তাঁহারা রাখেন। Museum-এর অধ্যক্ষ বলিলেন, এই বৎসর আমাদের ২৫০ বৎসর পুর্তি উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে, পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল হইতে ভূতত্ত্ববিদ্‌দিগকে এই উৎসবে যোগদান করিবার জন্য নিমন্ত্রণ পাঠান হইয়াছে, মাত্র ৪।৫ দিন পুর্বে ডঃ এলউইনের চিঠিও পাঠান হইয়াছে, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় সেই চিঠি আর তাঁহার হাতে পৌছিবে না।

আমি জানিতাম কোন রাজনৈতিক চিন্তা এলউইনের মনে স্থান না পাইলেও তিনি কম্যুনিজমের সমর্থক ছিলেন না, ইহার তিনি নিন্দাই করিতেন, কিন্তু এই কম্যুনিষ্ট দেশেও তাহার সমাদর দেখিয়া আমি বিস্মিত হইলাম। এলউইন যদি আজ বাঁচিয়া থাকিতেন, তবে ইহা শুনিয়া কি মনে করিতেন জানি না।

ভারতবর্ষের সঙ্গে এলউইন পরিবারের নানাদিক দিয়া সম্পর্ক ছিল; সেই জন্যই হোক, কিংবা অন্য কি কারণে জানিনা, ভারতের প্রতি, মহাত্মা গান্ধীর আদর্শের প্রতি, এলউইনের সুগভীর শ্রদ্ধা ছিল। তাঁহার পিতা পশ্চিম আফ্রিকায় আদিবাসীদের মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করিতে গিয়া মৃত্যুবরণ

করিয়াছিলেন, তিনিও সেই ব্রত লইয়াই ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, কিন্তু আদিবাসীর মধ্যে ধর্মপ্রচার করিতে পারিলেন না, তাহাদের জীবনের কথা দরদী মন লইয়াই জগতের কাছে প্রচার করিলেন।

এলউইনের জননী মিনি অরম্স্‌বি হলম্যান (Minnie Ormsby Holman) ভারতে জন্মগ্রহণ করেন, মুরী তাঁহার জন্মস্থান। এলউইনের মাতামহ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারী ছিলেন। এলউইনের মাতুল Sir H. C. Holman ভারতীয় সামরিক বিভাগে উচ্চ কর্মচারী ছিলেন। তিনি একজন ভাষাতত্ত্ববিদ্‌ও ছিলেন। এলউইনের দুইজন পিতৃব্য ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের সদস্য ছিলেন, ইহাদের মধ্যে D. H. Elwin মাদ্রাজ ও R. B. Elwin পাঞ্জাব প্রদেশে কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। মহাত্মা গান্ধী যখন অক্সফোর্ড গিয়াছিলেন তখন এলউইনের জননী Mrs M. O. Elwin তাহাকে স্বগৃহে আনিয়া আপ্যায়িত করিয়াছিলেন, মহাদেব দেশাইকে তিনি গভীর স্নেহ করিতেন এবং উভয়ের মধ্যে দীর্ঘকাল পত্রালাপ ছিল। অকস্‌ফোর্ডে এলউইনের গৃহ ভারতীয় ছাত্রদিগের নিকট অত্যন্ত পরিচিত আদর আপ্যায়নের স্থান ছিল। এইভাবে ভারতবর্ষের সঙ্গে নানাভাবে যুক্ত থাকিবার ফলে ভেরিয়র এলউইনও এ দেশকেই তাঁহার জীবনের কর্মক্ষেত্র রূপে নির্বাচিত করিয়া লইয়াছিলেন।

টি. এস. এলিয়ট

কবিতা

অনেকের ধারণা আধুনিক কবিতা দুর্বোধ্য। কবিতা যে দুর্বোধ্য হয় তার অনেক কারণ বর্তমান। অনেক সময় নিছক ব্যক্তিগত প্রয়োজনেই কবিকে তাঁর মানসিকতার প্রকাশের প্রয়োজনে এমন এক ভঙ্গিমার মাধ্যম গ্রহণ করতে হয় যাকে দুর্বোধ্য বলা যায়। এই অবস্থা নিঃসন্দেহে দুঃখকর, তবে আমাদের ত' আনন্দিত হওয়াই উচিত যে কবি একটা দুর্বোধ্য আঙ্গিক আশ্রয় করে তাঁর মনোভংগী প্রকাশে সমর্থ হয়েছেন। কবিতার মধ্যে যদি কিছু নতুন ভাব বা ভঙ্গী থাকে, অনেকের কাছে তা জটিল বলে মনে হয়। ওয়ার্ডসার্থ, শেলী, কীটস, টেনিসন ও ব্রাউনিং প্রভৃতিকে সমালোচকের বিদ্রূপবাণ সইতে হয়েছে, অবশ্য ব্রাউনিংকেই নিয়ে অভিযোগ উঠেছিল যে তাঁর কবিতা বেশ জটিল। সমালোচকরা এঁদের পূর্বগামীদের কবিতাও যে সব বুঝেছেন তা নয়, তবে সে ক্ষেত্রে তাঁদের কবিতাকে জটিলতার দায়ে অভিযুক্ত না করে বলা হয়েছে অসার্থক ও নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। কবিতাকে জটিল মনে হওয়ার আর একটা কারণ আছে, সেটা হল আগে থেকেই একটা কিছু ধারণা করে নেওয়া। সম্পূর্ণ বিরূপ ধারণা মনে নিয়ে কবিতা পড়া, অর্থাৎ এই কবিতা দুর্বোধ্য হতে বাধ্য। পাঠক যদি এই রকম একটা ধারণা মনে নেয় তাহলে তাঁর মন যে সর্বদাই ভয়ে ভয়ে থাকবে একথা বলা বাহুল্য। এই অবস্থা কাব্য রসাস্বাদনের পক্ষে উপযোগী নয়। কাব্যের রস গ্রহণ করার জন্য যে শান্ত সমাহিত মনোভংগীর

প্রয়োজন তা অন্তর্হিত, তিনি তখন অতিশয় সতর্ক হয়ে আছেন পাছে না ঠকতে হয়, তাঁর রসগ্রহণের অনুকূল অনুভূতি তখন বিক্ষিপ্ত, আর তিনি যা হয় কিছু একটার সন্ধানে উৎসুক। সেই দ্রব্যটি যে কি তা কিন্তু তাঁর জানা নেই। নয়ত তিনি শক্ত হয়ে বসে আছেন, আমাকে ঠকানো অত সহজ নয়। অনেক সময় পাদপীঠে দাঁড়িয়ে অনেক ব্যক্তি হঠাৎ ঘাবড়ে যান। পাঠকদের সংশয়টাও যেন একটা আজানা ফাঁদে পড়ার আতংক। লোকে কি ভাববে, কি মনে করবে, এই ভয়! তবে আর এক শ্রেণীর পাঠকও আছেন। তাঁরা এই ব্যাপারে বেশ সইয়ে নিয়েছেন।

তাঁদের অন্তরে একটা অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছে। কবিতার বোধগম্যতা নিয়ে বেশী চিন্তা করার দলে তাঁরা ন'ন। সুরুতেই এ নিয়ে মাতামাতি করতে তাঁরা চান না। আমি জানি, যে সব কবিতার আমি বর্তমানে বিশেষ অনুরক্ত, প্রথম দিকে তার মধ্যে কিছু কবিতার মানে খুঁজে পাইনি, এমন কি কিছু কবিতার মানে আজো বুঝেছি কিনা ঠিক বলতে পারি না। এই সব কবিতার কিছু কিছু আবার স্বয়ং শেকস্‌পীয়রেরই লেখা। আরও একটা কারণ আছে যে জন্য কবিতাকে জটিল বলে মনে হয়, পাঠক যে অর্থ কাব্যের মধ্যে পেতে চান, কবি অনেকটা স্বেচ্ছায় সেই অর্থ এড়িয়ে গেছেন। তখন সংশয়াচ্ছন্ন পাঠক কবিতার মধ্যে এমন বস্তুর সন্ধান করেন যা সেই কবিতায় অনুপস্থিত। এমন অর্থ খোঁজেন যা সেখানে নেই, কবির উদ্দেশ্যই ছিল সেই অর্থ টুকু সেখানে উহ্য রাথা।

কবিতার মানে বল্‌তে যা বোঝায়, সাধারণতঃ তার কাজ বোধহয়—(বোধ হয় বলার হেতু এই যে, কয়েকটি বিশেষ শ্রেণীর কবিতার কথাই বলছি, সব রকমের কবিতার কথা নয়) এই জাতীয় পাঠকের একটা পুরাতন পরিতৃপ্তি ঘটায় যে কবিতা, যে কবিতা তাঁর মনের ওপর আপনার ঘুম-পাড়ানি প্রভাব বিস্তার করে আপনার উদ্দেশ্য সাধন করে। দোরগোড়ায় সজাগ কুকুরকে তার কর্তব্য ভোলানোর উদ্দেশ্যে তস্কর তার একটা মাংস-খণ্ড দিয়ে মুখবন্ধ করে দেয়, তারপর তার উদ্দেশ্য সফল করে, এই ব্যাপারটিও সেই জাতীয়। এ অতি স্বাভাবিক অবস্থা এ বিষয়ে আমার কোনো আপত্তি করার নেই। তবে সকল কবির চিত্ত কিন্তু এই ধরণের ছকবাঁধা পথে যেতে নারাজ, তাঁদের কারো কারো ধারণা যে পাঠকদের মধ্যে কেউ কেউ হয়ত তাঁর অনুরূপ মানসিকতার অধিকারী, তাই কবিতার মধ্যে একটা সহজ গ্রাহ্য যেন তেন প্রকারের অর্থ তাঁরা ভরে দিতে চান না। তাঁরা জানেন, এর

কোনো প্রয়োজন নাই। শুধু তাই নয়, এ বিশ্বাসও তাঁদের মনে থাকে যে অর্থকে দূরে সরিয়ে রেখেও কবিতাকে আরও গভীরতর করা সম্ভব। এই অবস্থাকে অবশ্য আদর্শ স্থানীয় বলা চলে না। শুধু বলা প্রয়োজন যে, আমরা যেমনটি পারব, যা সম্ভব মনে করব, ঠিক সেই ভাবেই লিখব। পাঠক যদি তাই কবিতার মর্মগ্রহণ করতে পারেন উত্তম। আর যদি তাদের ভালো না লাগে তাহলে আমরা নিরুপায়। বিশেষ কোনও সামাজিক পরিবেশে হয়ত আরো একটু সরলভাবে কবিতা লেখাই শ্রেয়, কিন্তু বিশেষ বিশেষ অবস্থায় সুসংবদ্ধ এবং সংহত কবিতা লেখারও প্রয়োজন বর্তমান। উনবিংশ শতাব্দীতে যে সব কবি কবিতার জন্য খ্যাতি অর্জন করেছেন, তাঁদের অনেকের ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে যে আয়তনের জন্য তাঁদের কবিতায় কাব্যরসের ত্রুটি ঘটেছে, উপমেয়কে আপন করে উপমানের বিধান করা হয়েছে। আমার মনে হয় এই ধারণা আমার নিজস্ব নয়, আরো অনেকেরই হয়ত এই ধারণা। নিছক কাব্য পাঠের প্রয়োজনে এবং আনন্দে কে আর ইদানীং ওয়াডসার্থ, শেলী, কীটস্, ব্রাউনিং, সুইনবার্ণ বা সমকালীন ফরাসী কবিদের সমগ্র কাব্যগ্রন্থ পাঠ করেন। 'দীর্ঘ কবিতা' রচনার কাল অতিক্রান্ত সেকথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়, আমি একথাই বলতে চাই যে আয়তন অনুসারে আমাদের পূর্বপুরুষরা কবিতার মধ্যে যে পরিমান রস আশা করতেন আমাদের আকাঙ্খা তার চেয়ে অনেকটা অতিরিক্ত। শুধু যে তাই তা নয়, আমরা একথা ভাবি যে প্রবন্ধের মধ্যে যে কথা কবিতা করে বলা যায় সেকথা বলার জন্য আবার কবিতা রচনার প্রয়োজন কি। প্রবন্ধ দিয়ে যদি কাজ মেটে তবে প্রবন্ধই লিখব, কবিতার চেয়ে গদ্যের মাধ্যমেই অর্থপুর্ণ ভাবপ্রকাশে সুবিধা বেশী, গদ্যের মাধ্যমেই মনোভঙ্গী অনেক সহজে প্রকাশ সম্ভব। আদর্শের স্বপক্ষে অনেকে প্রচার করেন, কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রে আদর্শের অপব্যাখ্যা যেমন হয় তেমনটি আর দেখিনা। আদর্শ নিয়ে যারা বেশী বেশী কথা বলেন তাঁরাই বেশী রকম আদর্শচ্যুত হয়ে পড়েন। কবির বোঝা উচিত যে স্বধর্মে নিধন বরং শ্রেয়। আদর্শের মধ্যেই আছে স্বীকৃতি, নিজের দায়িত্ব বুঝে চলা উচিত। অপরের ভার কাঁধে না নেওয়াই মঙ্গল। তথাপি একথা সত্য যে গদ্যের কাছে যেমন কবিতার, তেমনই কবিতার কাছে গদ্যের পারস্পরিক শিক্ষাগ্রহণের অনেক কিছু আছে। একটি ভাষা যেমন অপর ভাষাকে সমৃদ্ধ করতে পারে, তেমনই পদ্যের সঙ্গে যদি গদ্যের লেনদেন ঘটে তাহলেই সাহিত্যে অধিকতর শক্তি সঞ্চারিত হবে, প্রাণরসে সাহিত্য সঞ্জীবিত হয়ে উঠ্‌বে।

টি. এস. এলিয়ট * জীবন ও মৃত্যু

শেষ প্রহরের আকস্মিক আলোড়ন
জাগায় প্রচণ্ড বায়ু-তরঙ্গ
জীবন ও মৃত্যুর ফাঁকে
আছে আরো কয়েকটি মুহূর্ত
শূন্যে প্রলম্বিত।
এখানে মৃত্যুর পুরী
এর মাঝে আছে নাকি
উদ্দাম বিরোধভীত
প্রেতায়িত প্রতিধ্বনি।

হয়ত বা স্বপ্ন শুধু
কিংবা কোনও ধ্বনি।
সিক্তমুখ আঁখির প্লাবনে
বিস্তীর্ণ বিস্তার যেন
অতল জলের।

অন্ধকার তটিনীর তীরে
কম্পমান শিবিরবহ্নি জ্বলে লেলিহান,
তার সাথে কাঁপে যেন বর্শার ফলক।

ওদিকে আরেক নদী বয়
মরণের সে নদীর পারে
উদ্যত করেছে বর্শা
অশ্বপৃষ্ঠে—তাতার সৈনিক॥

অনুবাদ—ভবানী মুখোপাধ্যায়

বিনয় সেনগুপ্ত

কাব্য-সমালোচনা প্রসঙ্গেঃ এলিয়ট

কবিতা সমালোচনা সাহিত্যের জগতে চিরদিন উল্লেখযোগ্য স্থান জুড়ে আছে। অনেক কবি কাব্য সমালোচনা করেছেন, কবিতা রচনা করেন নি এমন অনেক রসজ্ঞ পাঠকও সমালোচনা করেছেন। আধুনিক কালের শ্রেষ্ঠ ইংরেজ কবি এলিয়ট কবিতার সংজ্ঞা এবং কাব্য সমালোচনার একটা নির্দিষ্ট মান নির্ণয়ের চেষ্টা করছেন বহুদিন থেকে—এখনও তাঁর অন্বেষণ শেষ হয় নি।

কবিতার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে এলিয়ট বলেন যে কবিতার কোন নির্ভুল নির্দিষ্ট সংজ্ঞা প্রায় অসম্ভব, তাঁর মতে কাব্য হোল উন্নত ধরণের আনন্দ সম্ভোগ —Poetry is a superior amusement.

অবশ্য উন্নত ধরণের মানুষের জন্যই কবিতা, এমন ভাবলে ভুল হবে। amusing বলতে সাধারণ ভাবে যা বোঝা যায়, তাকে কাব্যাস্বাদন বললে ঠিক হবে না, আবার অন্য কোন সংজ্ঞা দিতে গেলে আরো বেশী ভুল হবার আশংকা থাকবে, সুতরাং সাধারণ বোধগম্য সংজ্ঞা হিসাবে কাব্য উচ্চস্তরের আনন্দ বলাই যুক্তিসঙ্গত। এলিয়ট্ ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কাব্য সংজ্ঞা অসম্পূর্ণ মনে করেন। "emotion recollected in tranquillity" আবেগের শান্ত সমাহিত রোমন্থন বিশেষ কোন কবির (হয়ত ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের) কাব্যরচনার পদ্ধতি হতে পারে, একে সাধারণ সংজ্ঞা বলা যেতে পারে না। আর্নল্ড কাব্যকে

বলেছেন জীবনের সমালোচনা। কিন্তু কাব্য সৃষ্টিতে বা আস্বাদনে নিত্য নূতন বিস্ময় কবি ও পাঠককে অভিভূত করে, জীবন সমালোচনার দৃষ্টিভঙ্গিতে কাব্যরচনা বা আস্বাদনে এ বিস্ময়বোধ নষ্ট হয়ে যায়।

এলিয়ট কাব্যের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন আপাত দৃষ্টিতে তা সহজ মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তা গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। ভারতীয় রসতত্ত্বে কাব্যকে অনির্বচনীয় এবং কবিকে অপূর্ব বস্তু নির্মাণক্ষম প্রজ্ঞার অধিকারী বলা হয়েছে। ইংরেজী amusing শব্দ অনির্বচনীয়তার অর্থ প্রকাশ করে না। কিন্তু এলিয়ট এ শব্দটি আভিধানিক অর্থে ব্যবহার করেন নি। অনির্দিষ্ট ভাবব্যঞ্জক ভাবেই ব্যবহার করেছেন। উন্নত ধরণের আনন্দ প্রায় অনির্বচনীয়তারই কাছাকাছি। কবিতাকে মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়া, সামাজিক প্রতিক্রিয়া দ্বারা ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। এলিয়ট বলেছেন—"Poetry is something over and above, and something quite different from, a collection of Psychological data about the minds of the poets, or about the history of an epoch ; for we could not take it even as that unless we had already assigned to it a value merely as poetry."

কবির অভিজ্ঞতার একটি স্বতন্ত্র মূল্য নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু এ অভিজ্ঞতা বর্তমান এবং বিগত যুগের প্রভাব অস্বীকার করে না। এলিয়ট মনে করেন, কবিকে ইতিহাসের ধারা, ও সাহিত্যিক ঐতিহ্য সম্বন্ধে সচেতন হতে চেষ্টা করতে হয়। বিগত যুগের কাব্যরূপ ও বর্তমানের কাব্যধারা সমস্তই কবিকে অনুভব করতে হয়। কাব্যবোধের এ ঐতিহ্য উত্তরাধিকার সূত্রে আসে না একে অর্জন করতে হয়। কাব্যবোধের মধ্যে একটা ইতিহাসের অনুভব থাকে, অতীতকে একই সঙ্গে বিগত এবং বর্তমান ভাবে অনুভব করতে হয়। যে কবি অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা অতীত ও বর্তমানকে একই সঙ্গে অনুভব করেন, তিনি সীমাবদ্ধ-কাল এবং অনন্ত কালের পার্থক্য এবং ঐক্য একই সঙ্গে জানেন। তাঁকেই বলতে হবে ঐতিহ্যবোধের অধিকারী কবি। কোন কবি বা শিল্পী তাঁর স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে যথার্থ তাৎপর্য লাভ করতে পারেন না। অতীত যুগের কবি বা শিল্পীর সঙ্গে তুলনা করেই তাঁর বৈশিষ্ট্য বিচার করা যেতে পারে। কবি কি তা হলে ইতিহাসের পণ্ডিত হবেন? কেবল ইতিহাস নয়, অতীতের সমস্ত জ্ঞান বিজ্ঞান সম্বন্ধে ধারণা থকেলেই ইতিহাসের বোধ সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু কবি বা স্রষ্টার পক্ষে পাণ্ডিত্য সর্বদা কল্যাণ করে না। কাব্যিক

সংবেদনশীলতা পাণ্ডিত্যের চাপে সীমীত হয়ে যায়। এলিয়ট মনে করেন—অতীতের হৃদয়স্পন্দন জানবার জন্য কবিকে ঐতিহাসিক বা দার্শনিক হবার দরকার নেই। সেক্‌স্‌পীয়র প্লুটার্কের অনুবাদ থেকেই ইতিহাসের যে বিবরণ তাঁর নাটকে দিয়েছেন, বৃটিশ মিউজিয়মে সুদীর্ঘ দিন ইতিহাস পড়েও অনেকেই তা পারেন নি। আসল কথা কবির একটা অতীত সচেতনতা থাকা দরকার, তাকেই পূর্ণ করে নেওয়া কবির উদ্দেশ্য হবে। কবি সকল যুগের আত্মাকে চেনেন, তাই তাঁকে নৈর্ব্যক্তিক হতে হবে। সর্বদা নিজেকে আড়াল করাই কবির কাব্যজীবনের সাধনা। ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দিতে পারাই শিল্পীর তপস্যা। এলিয়ট এ প্রসঙ্গটি আর বিস্তৃত করেন নি। ব্যক্তিত্ব বিসর্জন বলতে তিনি নিশ্চয়ই কবির প্রকাশ ভঙ্গিমার স্বাতন্ত্র্য অস্বীকার করেন নি। সেক্‌স্‌পীয়র সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, যে সেক্‌স্‌পীয়র প্রকৃতির মত, বিশাল, তাই তাঁকে ব্যাখ্যা করতে হয়। সেক্‌স্‌পীয়র প্রকৃতির মত নৈর্ব্যক্তিকও। তিনি মানুষের হাসিকান্না, কখনও সমুদ্রের গর্জনের মত, আবার কখন সমুদ্রের অতল জলের স্তব্ধ গভীরতার মত, কখনও বা বসন্তের অকারণ উচ্ছ্বাসের মত, প্রকাশ করেছেন। কোথাও তাঁর ব্যক্তিগত অনুভবকে স্পষ্ট বোঝা যায় না। রবীন্দ্রনাথও সাহিত্যতত্ত্ব আলোচনায় শিল্পীর নৈর্ব্যক্তিকতার উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। কবি যখন অনুভব করেন তখন তাঁর অনুভূতি তীব্র এবং আত্মগত সন্দেহ নেই, কিন্তু প্রকাশ করবার সময় তা বিশ্বগত হয়ে ওঠে, কারণ কবি একই সঙ্গে আত্মগত এবং বিশ্বগত, ব্যক্তিক এবং নৈর্ব্যক্তিক ভাবে অনুভব করতে পারেন। শিল্পীর সার্থকতা ব্যক্তিগত বিহ্বলতা, আত্মকেন্দ্রিকতা ত্যাগ করে সর্বজনীন হওয়া। এলিয়ট বলেন—"The progress of an artist is a continual self sacrifice, a continual extinction of personality."

কবি যখন অনুভব করেন, আর কবি যখন সৃষ্টি করেন তখন একই কবির ব্যক্তিত্বে সূক্ষ্ম পার্থক্য সৃষ্টি হয়। অনুভবের মধ্যে ব্যক্তিসত্তা জাগ্রত থাকতে পারে, কিন্তু প্রকাশ করার সময় কবি বিশ্বমানবের মুখপাত্র। কবির মন একটা ধারক যন্ত্রের মতন, অজস্র অনুভব, সহস্র কল্পনা কবি মনে ধারণ করে রাখেন—কিন্তু প্রকাশের সময় এসব অনুভূতি ও কল্পনা নূতন ভাবে প্রকাশিত হয়। বৈশিষ্ট্যে ও কৃতিত্বে বিভিন্ন উপাদান মিলিয়ে নেবার উপরই নির্ভর করে। একই আবেগ বিভিন্ন কবি বিভিন্ন ভাবে প্রকাশ করেন, কারণ তাঁরা বিভিন্ন ভাবে উপাদান ঐক্য তৈরী করেন। এলিয়ট বিশেষ জোর দিয়ে বোঝাতে

চান যে আবেগ প্রকাশের বৈশিষ্ট কবির ব্যক্তিত্বের জন্য নয়, উপাদান মিশ্রণের বিভিন্নতায় জন্য। কবিরা হলেন মাধ্যম, মানুষের আবেগের প্রকাশের মাধ্যম, মাধ্যম হিসাবেই কবির মূল্য এবং তাৎপর্য; ব্যক্তিত্বের প্রশ্নটি আবান্তর।

সাধারণ অনুভূতি বা আবেগ নিয়েও কাব্য রচনা সম্ভব, নূতন আবেগ সৃষ্টি করা কবির কাজ নয়। কাব্যসৃষ্টিতে অনেকখানি পরিকল্পনা এবং সচেতনতা থাকে, আকস্মিক রহস্যজনকভাবে কাব্য সৃষ্টি হয় এমন মনে করার কোনো কারণ নেই। আবেগের তীব্রতা কাব্যের লক্ষ্য নয়, বক্তিত্ব এবং আবেগ থেকে পালিয়ে গিয়েই কাব্য রচনা সম্ভব।

কাব্য সমালোচনা প্রসঙ্গে এলিয়ট সমালোচনার বিভিন্ন ধারা আলোচনা করেছেন—কাব্য আস্বাদনকে গভীর করাই সমালোচনার কাজ, কিন্তু সমালোচককে সর্বদাই নিজের অনুভূতি দূরে রেখে নিরপেক্ষভাবে বিষয়ের সৌন্দর্য আবিষ্কার করতে হবে। মন নিরপেক্ষ, বস্তুনির্ভর সমালোচনার সুত্রপাত বোধ হয় এরিস্টটলই শুরু করেন। এরিস্টটল দুর্লভ প্রজ্ঞার অধিকারী ছিলেন। তিনি যে বিষয় সম্বন্ধেই আলোচনা করেছেন, সর্বত্রই সেই বিষয়কে পরিষ্কার করে তুলে ধরেছেন, নিজের ধারণা যোগ করেন নি। কাব্য-স্রষ্টাকে যেমন অনাসক্ত হতে হয়, কাব্য সমালোচককেও তেমনি অনাসক্ত হতে হবে।

কাব্য সামালোচনার একটা প্রধান ভঙ্গি হোল সমালোচনার মাধ্যমে কাব্যকে নূতন করে সৃষ্টি করা। এতে সৌন্দর্য থাকে, আনন্দ থাকে, বিস্ময়কর কাব্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু এতে সমালোচক কবির প্রতি শ্রদ্ধা বা ভালবাসা প্রকাশ করেও কাব্যের প্রতি অবিচার করেন। একে Aesthetic বা Impressionistic সমালোচনা বলা যেতে পারে। কোলরিজের সেক্‌সপীয়র সম্বন্ধে আলোচনা, কিংবা রবীন্দ্রনাথের প্রাচীন সাহিত্য আলোচনা এ ধরণের। এরকম সমালোচনায় যে কবির কাব্য সম্বন্ধে কোন আলোচনাও হয় না এমন নয়, বরং কোলরিজই সেক্‌সপীয়রের মহত্ব সম্বন্ধে সকলকে প্রথম সচেতন করে দিয়েছিলেন, বোঝাতে চেয়েছিলেন যে সেক্‌স্‌পীয়র কেবল শ্রেষ্ঠনাট্যকার নয়, তিনি একজন মহাকবিও।

এলিয়ট মনে করেন এ ধরণের সমালোচনায় বিষয়নিষ্ঠা থাকে না, সমালোচকের ধারণা ও সৃষ্টিই প্রধান হয়ে প্রকাশিত হয়। "we can please ourselves with our own impressions of the characters and their emotions: and we do not find the impressions of

another person however sensitive, very significant" অর্থাৎ এরকম সমালোচনায় সমালোচক নিজের আবেগ এবং ধারণাকেই প্রকাশ করেন, কিন্তু কবিতা বা নাটকের ভিতরকার অনেক সূক্ষ্ম সংবেদন, অনেক গভীর তাৎপর্য হয়ত বাদ পড়ে যায়।

সমালোচনার নির্দিষ্ট মান স্থির করতে গেলে, কি ধরণের অনুভূতি এবং কি ধরণের চিন্তা সমালোচনার পক্ষে গ্রহণযোগ্য তা স্থির করা দরকার। অনেক সময় অনির্দিষ্ট এবং বিমূর্তভাবে কাব্য আলোচনা (বা কাব্য সংজ্ঞা) করা হয়। এসব বিমূর্তবাদী সমালোচনায় (Abstract criticism) বিষয়-বস্তু কখনই পরিষ্কার হয় না। কবিতা হোল বৌদ্ধিক কর্মের উচ্চস্তরের সুগঠিত রূপ—"Poetry is the most highly organized form of intellectual activity" কবিতার এরকম সংজ্ঞা বিমূর্তবাদী সমালোচনার উদাহরণ। কারণ 'বুদ্ধি', 'কর্ম', ও 'সুগঠিত' হওয়া ইত্যাদি যোগ করলে কবিতার কোন ধারণা করা সম্ভব নয়। কবি-কর্ম অন্যান্য কর্ম থেকে একেবারেই স্বতন্ত্র। শব্দকে সর্বদা নির্দিষ্ট অর্থের প্রতীক ধরে একটি কল্পিত আবেগের জগৎ ধারণা করে কবিতাকে তার অন্তর্ভুক্ত করে ব্যাখ্যা করার ফলেই অমূর্ত সমালোচনার সূত্রপাত হয়েছে। কিন্তু অনেক শব্দই চিরদিন নির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হয় না। আর অর্থ ছাড়াও শব্দগুলি সদাপরিবর্তিত আবেগ প্রকাশ করার ব্যাপারেও কখনও স্থির এবং অপরিবর্তনীয় থাকে না। এজন্যই কাব্যানুভূতির বিশিষ্টতা এবং কাব্যে চিন্তনক্রিয়ার বৈশিষ্ট সম্বন্ধে সচেতন হওয়া দরকার। চিন্তার পরিবর্তে আবেগ ব্যবহার করলে বিষয়গৌরব বিকৃত হয়ে যায়।

এক ধরণের সমালোচক আছেন তাঁরা কাব্যের বহিরঙ্গ বিচার করতে ভালবাসেন। শব্দ, অর্থ, ছন্দ, অলংকার, বানান ইত্যাদির শুদ্ধ প্রয়োগ বিচার করাই তাঁদের কাজ। এলিয়ট এঁদের নাম দিয়েছেন টেক্‌নিক্যাল সমালোচক। সমালোচনার দিক থেকে এ ধরণের আলোচনা সংকীর্ণ, এতে রসবোধের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না।

এলিয়ট মনে করেন বস্তুনিষ্ঠ সমালোচনাই আলোচনার আদর্শ। পাঠকের সামনে তুলে ধরতে হবে, লেখক কি বলতে চান। কবিতা বা রচনার সূক্ষ্ম সৌন্দর্য ভাবনা ও বৈশিষ্ট্য সমালোচক প্রকাশ করবেন কিন্তু নিজের কোন ধারণা যোগ করবেন না। ভাল মন্দের বিচার পাঠক করুন, সমালোচক কেবল বিষয়টি প্রকাশ করবেন। কোন গভীর অন্ধকার অরণ্যে পথিককে কেবল আলো

জেলে দেওয়া, পথ সে নিজেই খুঁজেই নেবে। নিজের ধারণা যোগ না করলেই যে সমালোচকের অধিকার সংকীর্ণ হয় তা নয়। যে কোন বড় সৃষ্টিকে এক দিনেই বোঝা যায় না। নিজস্ব ধারণা যোগ না করেও নিত্য নূতন ভাবে আবিষ্কৃত হয়। অনেক সময় পুরাতন ধারণা নূতন ধারণা দিয়ে শুদ্ধ করে নিতে হয়। কিন্তু ধারণার উৎস কবির কাব্য বা অন্য কোন সৃষ্টি। শেক্‌স্‌পীয়র বা রবীন্দ্রনাথের কাব্য বিচার বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন হতে পারে, কিন্তু সঠিক সমালোচনা কাব্য নাটকের নূতন কোন গুণ আবিষ্কারের দ্বারাই বিচিত্র হবে, সমালোচকের অনুভব বৈচিত্র্য দ্বারা নয়।

কাব্য আস্বাদনের তাৎপর্য হোল অনাসক্ত নৈর্বক্তিক মনের গভীর ধ্যানমগ্ন আনন্দসম্ভোগ। এজন্য এলিয়ট মনে করেন কবিও সমালোচক একই হোলে সমালোচনা বিশুদ্ধ হতে পারে। কবি জীবনানন্দ দাসও কবিতার কথা গ্রন্থে বলেছেন যে স্রষ্টা ও সমালোচক (বিশেষ ভাবে কাব্যে) এক হলেই ভাল, কারণ কবিতার রহস্য কবির বেশি পরিচিত। যদিও তিনি উল্লেখ করেছেন যে তাঁরই লেখা কোন সমালোচনা কোন অ-কবির সমালোচনার সঙ্গে মিলিয়ে তিনি বিশেষ পার্থক্য লক্ষ্য করেন নি। তবুও কবি ও সমালোচক এক হওয়াই ভাল। কারণ তিনি বলেন যাদের মন কবিতা-সৃষ্টির জন্যে তৈরি নয় কাব্য আলোচনায় তারা পরিচ্ছন্নতা, পাণ্ডিত্য, গভীর অন্তঃপ্রবেশ দেখাতে পারলেও কবিতা সম্বন্ধে তাঁদের বোধ চরম গভীরতা লাভ করতে গিয়ে প্রায়ই ব্যর্থ হয়, বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে এই আশংকা করি।

এলিয়ট আধুনিক কালের একজন শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীল লেখক এবং কবি। কবিতার বিষয় তাঁর বক্তব্য নিশ্চয়ই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কবি হওয়া যে অত্যন্ত কঠিন, অনলস তপস্যা দ্বারাই যে সার্থক কাব্য রচনা হয় আধুনিক কালে এলিয়ট তার নিদর্শন। তাঁর বক্তব্য সবটুকু গ্রহণযোগ্য কিনা বিতর্কের বিষয়, সমালোচক কতখানি নিরপেক্ষ এবং কবি কতখানি ব্যক্তিসত্তা বর্জিত হতে পারেন এ নিয়ে নানা বাদপ্রতিবাদের অবকাশ আছে। কিন্তু কাব্য সৃষ্টির গভীর রহস্য এবং কবিকে আচ্ছন্ন না করে সমালোচনা সম্বন্ধে তিনি যে সব আলোচনা করেছেন—সমালোচনা সাহিত্যে তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আমি এলিয়টের বক্তব্য প্রকাশের চেষ্টাই করেছি। প্রবন্ধান্তরে তাঁর কবিতার সঙ্গে তাঁর সমালোচনার সম্পর্ক এবং সমালোচনার সূত্র হিসাবে তাঁর বক্তব্যের মূল্য নির্ধারণের ইচ্ছা রইল।

ডঃ সুধীর করণ

ধনলক্ষ্মী

আকাশে বোধ হয় অষ্টমীর চাঁদ। চাঁদের চারদিকে পাতলা-পাতলা মেঘ ছড়ানো। গাঁয়ের প্রান্তদেশে একখানি অকেজো মাঠে বুড়ো শিমুলের নীচে মাথা খোলা একটা জরাজীর্ণ তাঁবু। ঠিক তাঁবু ও নয়, ময়লা, ছেঁড়া, মোষে-ধরা মার্কিন থানের একটা ঘেরা মাত্র। ঘেরার দু'দিকে দুটো পথ, কানাৎ দিয়ে আড়াল-করা। পেছনের কানাৎ তুলে একটা সত্যিকারের তাঁবুতে পৌছানো যায়। ওটার শরীরও ভালো নয়, বাউলের আলখাল্লার মত চেহারা, অসংখ্য তালিতে কিম্ভূত। চেহারাটা একেবারেই অভিজাত নয়। মাঝে মাঝে ঝড়-ঝাপটায় ওটাকে মুখ গুঁজড়ে পড়ে থাকতেও দেখা যায়। তখন দেখলে মনে হয়—একটা কুৎসিত বুড়ো, হাঁপানী রোগে ভুগছে। যখন কোনরূপে খাড়া থাকে তখন ওর ভেতর আধ ডজন ছেলেমেয়ে সহ প্রৌঢ় বিশ্বনাথম্ ওর স্ত্রী সার্কাস কুইন, একটা কুকুর, একটা মেনী বাঁদর, আর একটা টিয়াপাখি সন্ধ্যে থেকে—বেশ একটু রাত পর্যন্ত কিলবিল করতে থাকে।

সেই বুড়ো শিমুল গাছের তলায় জষ্টিমাসের এক সন্ধ্যায় মেঘলা বাতাস শিরশির্ করছিল। আর, সেই অষ্টমীর চাঁদ, একটা মোটা লম্বা হাতের মত

তাঁদের পেছনে জাপানী ছবির মত নিস্পন্দ ছিল। ঐ দৃশ্যটা দেখতে দেখ্‌তে সার্কাস কুইন ওর ব্যায়ামপুষ্ট কাঠ-কাঠ যৌবনের ওপর খেলা দেখানোর রূপ-সজ্জায় ব্যস্ত ছিল।

পৃথিবীর মাটিতে পেট ভরাবার জন্য মানুষকে বুদ্ধির কসরৎ আর দেহের কসরৎ দেখাতেই হয়। কিন্তু ভাগ্যের উপর আনাস্থা প্রকাশ না ক'রেও বিশ্বনাথম্‌ এবং তার স্ত্রী এক এক সময় বুঝতে পারে যে সার্কাসের খেলা সবসময় জমে না। এমন-কি সার্কাস কুইনের বয়স যদিও চল্লিশের কাছাকাছি হেঁটে এসেছে তবুও মুখে পাউডারের প্রলেপ দিয়ে বুকের ওপর ছুঁচোলো কাঁচুলি এঁটে, পেট খোলা রেখে, জাঙিয়া পরিয়ে হয়তো যৌবনবতী ক'রে তোলা যায়, কিন্তু তা-সত্ত্বেও গেঁয়ো লোকগুলো সার্কাসের তাঁবুতে তেমনভাবে আর ভিড় জমায় না। ঐ সজ্জায় সজ্জিত হয়ে সার্কাস কুইন যখন একধরণের পদক্ষেপ আর অঙ্গভঙ্গি দেখিয়ে নাচ দেখিয়ে যায়, তখন অন্য একটা তাঁবুতে সেই মেনীবাঁদরটা দুটো হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে ঝিমুতে থাকে। একশো-কি দেড়শো দর্শকের চটাপট হাততালির শব্দ শুনলে ওটা চম্‌কে ওঠে শুধু।

সামনে লাল সালুর ওপর মোটা মোটা ইংরাজী হরফে লেখা,—দি গ্রেট কেরালা সার্কাস।

বিশ্বনাথম্‌ এখন শুধু খেলা দেখে, এখন আর খেলা দেখায় না। খেলা শেখায়। ওঁর নাম—রিং মাষ্টার। ওদের দুটো ছেলে, যাদের বয়স পনেরো এবং আট, ডিগবাজী খায়, রিং-এ ওঠে, রিং মাষ্টারের কাঁধে চড়ে কসরৎ দেখায় আর বাকী সময়টা জোকার সেজে লোক হাসায়। জোকার হওয়ার বয়স হয়নি বলেই হোক্‌ অথবা বাপের সঙ্গে ইয়ার্কী তেমন জমাতে পারে না বলেই, হোক্‌—ঐ দুটো রোগাটে জোকারকে মাঝে মাঝে দম দেওয়া পুতুলের মত মনে হয়।

বড় ছেলেটার বয়স যত বাড়ছে, প্রাকৃতিক নিয়মে ওর অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞানের পরিসরও বাড়ছে। ছোট-টা এমনিতেই একটু বেশী রোগা, তার ওপর ডিগবাজী খেতে খেতে ওর মেজাজ বোধ হয় ঠিক থাকে না। তাই মুখে হাসি ফোটায় বেশ কষ্ট করে। বড়-টা মাঝে মাঝে ওর পিঠ চাপড়ে, কাতুকুতু দিয়ে সজাগ রাখে।

আসল খেলা স্নুরু হওয়ার আগে ওরা দুটি ভাই-তে এসে লোক হাসানোর জন্য কতরকমের ভংগি যে দেখায়! সঙ্গে সঙ্গে আস্তে আস্তে গ্রাম্য ঢোল এলোমেলোভাবে ব্যাঙের অনুকরণ করতে চেষ্টা করে।

ঠিক এই সময় বিশ্বনাথম্‌ সেই ঘেরার মধ্যে ঢুকে পড়ে, একটা ঘন্টি নাড়তে

নাড়তে বলে—আব্ খেল্ সুরু হো গিয়া। দেখিয়ে অব্ কওন্ আতা হ্যায়—। দেখিয়ে কেরলা সুঁদরীকো—দেখিয়ে সার্কাস ক্যুইনকো—আভি আতা হ্যায়, তুরন্ত্ আতা হ্যায়—। বলেই আবার ঘন্টি বাজায়। জোকার দুটো একপাশে সরে গিয়ে দাঁড়ায়। সেই গ্রাম্য ঢোল বাজতে থাকে, আবহ-সুরের সৃষ্টি করতে থাকে—এবং এক সময় সার্কাস ক্যুইন, যুবতী সেজে প্রায়-নগ্ন বেশে নিরাসক্তভাবে মুখে হাসি ফুটিয়ে সার্কাস-দেখানোর খোলা জায়গাতে এসে, চারদিকের দর্শকদের অভিবাদন জানায়, সামনের দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে, হাত দুটো লম্বা করে দর্শকরা চোখ টান টান করে দেখে। কুইনের সর্বাঙ্গে ওদের চোখ ঠিক্‌রে ঠিক্‌রে পড়ে। ও পাশে, মেয়েরা পরস্পরের গা টিপে, কেউ কেউ বা শ্বশুর-ভাসুর আছে বলে একহাত ঘোমটা টেনে মুখ টিপে টিপে হাসতে থাকে।

বড় ছেলেটা একবার মাত্র মায়ের দিকে তাকায়। কিছুতেই মা-কে সে সার্কাস-ক্যুইন বলে ভাবতে পারে না। তাই কুইনের নাচ আরম্ভ হলে, সে পেট্রোম্যাক্‌স্‌টাতে পাম্প ক'রে, না হয় তাঁবুর বাইরে চলে যায়। ছোটটা দর্শক হয়ে ফ্যা ফ্যা করে হাসে না হয় ঠিক সেই মেনী বাঁদরটার মত মুখ গুঁজে বসে থাকে। সার্কাস ক্যুইন একেবারে মাপা একটি হাসিতে মুখটাকে যথাসম্ভব উজ্জ্বল করে কি একটা নাচ দেখায়। তারপর নাচ শেষ ক'রে পেছনের তাঁবুতে চলে গিয়ে সজ্জা পরিবর্তন করেই বাচ্চা মেয়েটার মুখে মাই গুঁজে দেয়।

আঃ! কেরালার নারিকেল কুঞ্জের মাঝখানে একখানি গ্রামে সে এখন ফিরে যেতে পেরেছে। সে এখন ধনলক্ষ্মী। আঠারো বছর আগে বিশ্বনাথের বধূ হ'য়ে একদিন গ্রামের একটি কুটির আলো করতে এসেছিল। সেই গ্রামেরই একটি কুটিরে বসে মা ধনলক্ষ্মী—তাঁর বাচ্চা মেয়েকে সোহাগ মাখাচ্ছে এখন। ছ'ছটা ছেলেমেয়ের দিকে একবার নিভৃতে ওর মন বাতাসের মত ছুঁয়ে গেল।

অনেকদিন আগে, বিশ্বনাথম্ তখন অন্য এক সার্কাস কোম্পানীতে খেলা দেখাতো। সেরা খেলোয়াড় হিসেবে ওর খ্যাতিও ছিল। মাঝে মাঝে ছুটি নিয়ে গ্রামে ফিরে আসতো, ধনলক্ষ্মীর কাছে। কেরালার সেই অখ্যাত গ্রামের নিভৃত নিকুঞ্জের একটি কুটিরে, অন্ধকারের মধ্যে মাখামাখি হয়ে দু'জনে শুয়ে থাকতো। বিশ্বনাথম্ গল্প বলতো—বিরাট তাঁবু—ইলেকট্রিক লাইটে জমজমাট—স্কাইলাইট ব্যাণ্ড—হাতী ঘোড়া বাঘ সিংহ উট আর তরুণ-তরুণী-সহ সংখ্যাহীন খেলোয়াড়।

ধনলক্ষ্মীর উৎসাহ বেড়ে যেতো। শুনতে শুনতে ধনলক্ষ্মী বলতো: আমি পারবো। বিশ্বনাথম্ আহ্লাদে আটখানা সার্কাস কোম্পানী থেকে একটা ছোট্ট তাঁবু পাবে, ওরা। একেবারে নিজস্ব সংসার গড়ে উঠবে ওর মধ্যে। আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে সে দিন ধরে বিশ্বানাথম্ ধনলক্ষ্মীকে আদর করেছিল।

সেদিন আত্মীয়-স্বজনরা নিষেধ-ই করেছিল ধনলক্ষ্মীকে।

তারপর দেখতে দেখতে কত বছর পার হয়ে গেছে। ঐ সার্কাস কোম্পানীতে ধনলক্ষ্মী-ও নানা ধরণের খেলা শিখেছিল। প্রায় বছর দশেক ধ'রে সার্কাসের দলে থেকে সে শক্ত শক্ত খেলা আয়ত্ত করেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে মা হতেও আপত্তি করেনি। কিন্তু সব সময়ই তাঁর মনে হয়েছে সে—মা। মা ছাড়া আর কিছু নয়। সার্কাস হচ্ছে ওঁর জীবিকার উপায়।

তারপর বিশ্বনাথম্ সার্কাসের দল ছেড়ে, ধনলক্ষ্মীকে সার্কাসক্যুইন সাজিয়ে নিজে একটি দল করেছে। নির্ভেজাল পরিবারিক সংঘ। সার্কাসক্যুইন ক্রমাগত সার্কাস দেখিয়ে ছেলেপিলেদের পেটের ভাত যোগাড় করেছে আর নিরন্ত্র সংগ দিয়ে চলেছে স্বামী বিশ্বনাথম্কে, মাঝে মাঝে আদর ক'রে যাঁকে সে রিং মাষ্টার বলে ডাকে।

ঐ বুড়ো শিমুলের তলায় একটা জায়গা জুটে গেল বাঙলাদেশের-ই এক গ্রামে। গ্রামের ছেলে-ছোক্রার দল উদ্যোগী হয়ে বিশ্বনাথমের সার্কাসপার্টির টিকেট বিক্রেতা, গেটকিপার এবং ভলান্টিয়ারের কাজে ব্রতী হলো।

গোড়ার দিন দুয়েক তেমন দর্শকের আমদানী হলো না। তারপর আস্তে আস্তে দর্শকের সংখ্যা বাড়তে লাগলো। তিরিশ থেকে চল্লিশ টাকা পর্যন্ত ও'র উপার্জন। শেষের দিকে আবার দর্শক কমতে লাগলো। দিন সাতেক ধ'রে খেলা চলবে বলে মনে হলো। একই খেলা বার বার দেখতে আসবে কে? বিশ্বনাথম্ জানে, এমনি করেই তা'র খেলা চলে। এ গ্রাম থেকে ও গ্রামে। এম্নি ক'রে সে কেরালা পর্যন্ত পৌছে যাবে একদিন।

যেদিন শেষ খেলা, সেদিন সকালে বিশ্বনাথম্ উঠ্লো একটু দেরী ক'রে। মুখ শুক্নো, চেহারায় রাত্রি জাগরণের চিহ্ন। সার্কাস কুইন তখনো শুয়ে। বাচ্চারা কেউ ওঠে নি। এমনিতেই সকলের শুতে একটু রাত হয়। ভোরে ওঠার অভ্যেস কারুরই নেই। উঠেই বিশ্বনাথম্ জানতে চাইলো ডাক্তার কোথায় থাকে।

—সে এখানে কোথা। হেই পাঁচপোতায়, এখান থিকে পাকা পাঁচ মাইল।

বিশ্বনাথম্ পাঁচপোতার পথ ধরে হন হন ক'রে হাঁটতে লাগলো।

—কি হলো হে, রিং মাষ্টারের ?

—কি আর হবে, বোধ হয় ও'র কুইন আবার বিয়োবে। সার্কাসের দল বাড়াতে হবে তো ?

—শ্‌লা—আজকের খেল্‌টা মার্ডার হবে নাকি ?

—কা'র অসুখ বিসুখ হে।

নানারূপ জল্পনাকল্পনা সুরু হলো। হাসি-ঠাট্টার পালা শেষ ক'রে ওরাই আবার কে কোনদিকে ছড়িয়ে পড়লো।

বিশ্বনাথন্ যখন ডাক্তার নিয়ে ফিরলো, তখন প্রায় দুপুর। ডাক্তারকে বেশী টাকা দিয়ে সেই রোদের মধ্যেও টেনে এনেছে।

জানা গেল, ওদের পাঁচ-মাসের মেয়েটার অসুখ চলছে ক'দিন ধরে। রাতে একটু বাড়াবাড়ি রকমের অবস্থা গেছে।

রুগী দেখে ডাক্তার যখন বেরিয়ে এলো, বিশ্বনাথম্ হাত জোড় ক'রে কাঁদো-কাঁদো হ'য়ে বললো: ডাকতার বাবু,—বহুৎ প্রার্থনা-সে ইএ লড়কী মিলা হায়—

ডাক্তার বললে: ঘাবড়ে যাচ্ছো কেন ? বিশেষ কিছু নাই হুয়া হায়। সামান্ত সর্দি বৈঠ গিয়া মাত্র। দাবাই দে দিয়া। আচ্ছা হো যায়েগা।

গাঁয়ের লোকে বললো: আজকে না হয় খেলা নাই দেখালে, রিং মাষ্টার ! মেয়েটার অসুখ যখন—।

বিশ্বনাথম্ বললো, খেল বন্ধ্ নহী হোগা বাবু লোগ। এড্‌ভান্স্ টিকিট ভি বিক্রি হুয়া। শেষ দিনমে পাবলিক কা সাথ এ্যায়সা চিটিংবাজী নহী করেগা হাম। ভগ্‌বান চাহে তো সব ঠিক হো যায়েগা—। এই মেয়েটি যে ওদের কত আদরের সে কথাও জানিয়ে দিল বিশ্বনাথম্। ওদের প্রথম সন্তান হয়েছিল একটি মেয়ে। পাঁচ বছর বয়সে সে মারা যায়। বেঁচে থাকলে সে-ই হতো সার্কাস কুইন। তারপর শুধু ছেলে হয়েছে। ভগবানের কাছে ওদের প্রার্থনার শেষ ছিল না, একটি মেয়ের জন্য। খেলা বন্ধ হলো না।

প্রথমেই সেই হাড়গিলে মেনী বাঁদরটা একটা ছাগলটানা গাড়ীতে চড়ে আবির্ভূত হলো। একহাতে ছাগলের মুখে বাঁধা লাগাম আর এক হাতে চাবুক। দর্শকরা হাততালি দিয়ে বাঁদরকে অভিনন্দন জানালো।

পেছনের তাঁবুতে সেই পাঁচমাসের মেয়েটা গোঙাচ্ছিল বোধ হয়।

তারপর সেই দুটো জোকার ডিগবাজী খেতে খেতে ঢুকলো। কিছুক্ষণ প'রে

ছোট-টা উবুড় হয়ে পড়ে গেল বেশ ভংগী করে। লোকে হেসে কুটিকুটি। বড় ছেলেটা নিজের মাথার পাতলা ফেল্‌ট্ হ্যাট্‌টা খুলে ও'র পেছন দিকে হাওয়া দিতে লাগলো।—লোকে হেসে আর বাঁচে না। এর পর রিং মাষ্টারের সঙ্গে জোকার দুটো বেশ কিছুক্ষণ অভব্য ইয়ার্কী দিয়ে দর্শকদের পেটের ভেতর থেকে হাসি টানতে লাগলো।

বিশ্বনাথম্ এবং ও'র ছেলে দুটো একটা যন্ত্রের মতই ওদের 'ডিউটি' করতে লাগলো যেন। বিশ্বনাথম্-ও জানে, ছেলেদের সঙ্গে ও' রকম রসিকতা চলে না। ছেলেরা কিছু না বুঝেই দম-দেওয়া পুতুলের মত কথা বলে।

—এ্যায় বুড্‌ঢা তুমহারা সাদী নহী হুয়া ?

—হুয়া হায়। তেরা মা কা সাথ। বিশ্বনাথম্ একেবারে যন্ত্র।

তবু ঐ কথাতেই দর্শকদের হাসি তাঁবু ছিঁড়তে থাকে।

ছেলেটা এবার বাঙ্‌লাতে বলবার চেষ্টা করে: তবে তো আমি তুমার বাপ আছি। হামি তোমার ওলড্ ড্যাডি!

বড়টা বলে: না-না, আমি বাপ—ফাদার—পিতাজী।

রিং মাষ্টার: নেহী নেহী আমি আছি।

এর পর কে কার পিতা, সেই বিতর্কের একটানা ছ্যাবলামিতে ওরা মজা ছড়াতে থাকে। আর—ও'রা পরস্পরের গালে অদ্ভুত কায়দায় চটাপট্ চড় পিটতে থাক। আসর সরগরম হয়ে গেল।

এম্‌নি করে এটা ওটা করে বেশ কিছুক্ষণ সময় কাটালো ওরা। তারপর লোকে যখন উস্‌খুশ করতে আরম্ভ করলো, তখন রিং মাষ্টার যথারীতি হাঁকলো: অব দেখিয়ে কোওন্ আতা হ্যায়। সার্কাস কুইনের নাচ সুরু হলো। মুখে ঠিক মাপজোকের সেই হাসি।

মা যখন নাচতে আসে, অন্য ছেলেরা তখন বাচ্চা মেয়েটার কাছে বসে, পাহারা দেয়, কাঁদলে—ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা করে। কেন-না, সার্কাস-ক্ষেত্রে রিং মাষ্টারেরর উপস্থিতি সব সময়েই অনিবার্য।

নাচ দেখানো শেষ ক'রে, তাঁবুর মধ্যে ঢুকে তাড়াতাড়ি কাঁচুলীটা খুলে বাচ্চা মেয়েটার মুখে মাই গুঁজে দেয় ধনলক্ষ্মী। মেয়েটার মুখের ভেতরটা আগুনের মত গরম।

ধনলক্ষ্মীর বুকের ভেতরটা ঢিপ ঢিপ করতে লাগলো। ও'র চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগলো।

এরই মধ্যে কখন এসে ও'র কাছে দাঁড়িয়েছে বিশ্বনাথম্। কাঁদবার ইচ্ছে

হ'লেও বিশ্বনাথমের কান্না তেমন মানানসই হবে না বলেই ও চুপ ক'রে দাঁড়ালো—।

ধনলক্ষ্মী জানে, বিশ্বনাথম্ ওকে গভীর ভালবাসা দিয়ে দীর্ঘ দিন ভরে রেখেছে। আজকে—শেষরক্ষা না করলে ও'র রিং মাষ্টারের মান থাকবে না। বুকের মধ্যে একটা অপ্রকাশ্য ব্যথা মোচড় দিতে লাগলো। একমুহূর্তের জন্য মেয়েটাকে বুকের ওপর থেকে নামাতে সে চায় না।

ওদিকে আকাশের সেই ফ্যাকাশে চাঁদের ওপর মেঘের আবরণ ঘন হচ্ছিল ক্রমশঃ। একটা প্যাঁচা ডাকলো শিমুল গাছের আগডালে। রাত বাড়ছিল বোধ হয়। ঠাণ্ডা হাওয়া একটু জোরে বইতে আরম্ভ করলো। বৃষ্টি নামতে পারে।

ধনলক্ষ্মীর বুক পুড়ে যাচ্ছিল আগুনে। ও'র পাঁজরার ভেতর দিয়ে একটা শিরশিরে সর্পিল উষ্ণতা ছোবল দিতে দিতে এগুচ্ছিল। সার্কাস কুইন মরে যাচ্ছে, না-কি ধনলক্ষ্মী মরছে!

একমুহূর্তের মধ্যে ও'র সমস্ত জীবন ছবি হয়ে ফুটতে লাগলো। আর কেরালার নারকেলবন স্নিগ্ধ হাওয়ায় বার বার মাথা নাড়তে লাগলো ওর আশে পাশে। সেই নিরালা পাতায় ঘেরা কুটির মনে পড়ে।

বিশ্বনাথম্ নির্বাক। সার্কাসকুইন চোখের জল মুছতে মুছতে বললো: আমি তৈরী হচ্ছি। তুমি যাও—

সার্কাস কুইনের মুখের ওপর ঘন পাউডারের ছোপ। তার ওপর দিয়ে ঘাম গড়িয়ে আঁচড় কেটেছে যেন। এবারে একটা লাল রঙের কাঁচুলী আর সবুজ রঙের পুরো জাঙিয়া। হাতে ছাতা।

কুইন আসতেই হাততালির ঝড় উঠলো! ঢুলিটা ঢোল বাজাচ্ছে আস্তে আস্তে। কুইন এবারে দড়ির ওপর ছাতা ধ'রে হেঁটে হেঁটে এপার-ওপার করছে। দড়ির ওপর কত রকমের কসরৎ-ই সে দেখালো। তারপর হাঁটতে হাঁটতেই জাঙিয়ার দড়িটা একহাত দিয়ে ঢিলে করে নিচের দিকে টানতে লাগলো।

দর্শকরা একেবারে নিস্তব্ধ। একসময় পুরো জাঙিয়াটা খুলে ফেলে ছুঁড়ে দিলো সে দর্শকদের দিকে। মাঝপথে ওটাকে লুফে নিল রিঙ্ মাষ্টার।

ওর মুখের দিকে আর তাকানো যাচ্ছে না। কুৎসিত মনে হচ্ছে। ঘামে ও'র পাউডার ধুয়ে যাচ্ছে। ধুয়ে ধুয়ে কিন্তু পুরো মুখটাকে ধনলক্ষ্মীর মুখ করে দিতে পারে নি। তাই আরো বীভৎস মনে হচ্ছে।

দর্শকদের হতাশ ক'রে দিল সার্কাসকুইন। সবুজ জাঙিয়ার নীচে আর একটা খাটো জাঙিয়া—। বাচ্চা মেয়েটা ককিয়ে উঠলো পেছনের তাঁবুতে। কেউ শুনতে পায়নি। সার্কাসকুইন-ও শুনতে পায়নি। ওর মুখের পাউডার যত মুছে যাচ্ছে, তত যেন ধনলক্ষ্মী বাচ্চা মেয়েটায় কান্না শুনতে পাচ্ছে।

একসময় টাল সামলাতে না পেরে সার্কাসকুইন দড়ি থেকে ছিট্‌কে পড়তে যাচ্ছিল। রিং-মষ্টার ও'কে ধরে ফেললো। তারপর প্রায় পাঁজাকোলা ক'রেই তাঁবুর মধ্যে নিয়ে গেল।

একটা বড় আয়না ঝুলছিল তাঁবুতে।

ঐ আয়নাতে ধনলক্ষ্মী তার মুখ দেখলো। এমন কুৎসিত মুখ সে নিজে কোনদিন দেখেনি। ও'র ঠোঁটের রঙ্ রক্তের মত গড়িয়ে পড়েছে। গালের ওপর ঘামের নাল। ঐ মুখের মধ্যে কোথাও সে ধনলক্ষ্মীকে খুঁজে পেলো না। শুধু বুকের ভেতর ঠিক ধনলক্ষ্মীর মত চেহারা কোন এক সুদূর গ্রামের একটা মেয়ে গুম্‌রে গুম্‌রে কাঁদতে লাগলো।

হঠাৎ কি রকম হয়ে গেল সে। আয়নাটাকে টান মেরে মাটিতে আছড়ে ফেলে হাঁপাতে লাগলো। আয়নাটা খান খান হয়ে ছড়িয়ে পড়লো। বাচ্চা ছেলেগুলো কেঁদে উঠলো। বিশ্বনাথমের চোখ দুটো বড় বড় হয়ে গেল। এমন অশান্ত চেহারার ধনলক্ষ্মীর সঙ্গে তা'র কোনদিনই পরিচয় হয় নি। সে ভয় পেয়ে গেল।

ডাকলো: কুইন্! সার্কাস কুইন!

না—। ধনলক্ষ্মী চেঁচিয়ে উঠলো। না—না—

কিছুই বুঝতে পারলো না বিশ্বনাথম্।

ডাক্‌লো: লছ্‌মী, ধন-লছ্‌মী—

একমুহূর্তে ফনা গুটিয়ে নিল ধনলক্ষ্মী। লজ্জা এসে হঠাৎ ও'র দেহকে আঁকড়ে ধরলো। ধীরে ধীরে বললো: একটু বাইরে যাও।

বিশ্বনাথম্ ছেলেগুলোকে নিয়ে তাঁবুর বাইরে এলো।

কিছুক্ষণ পরে ফিরে গিয়ে দেখে, শাড়ী পরে, মাথায় টিপ পরে, মুখ মুছে জননী ধনলক্ষ্মী তা'র বাচ্চা মেয়েটাকে সযত্নে মাই খাওয়াচ্ছে।

সঞ্জয় ভট্টাচার্য * চৈত্রের কবিতা

তীরের মতো আকাশে এক পাখীর ঝাঁক।
তোমার কথা এখন থাক্—
যদিও আজ চৈত্রমাস।

তোমার চোখ পাখীর বাসা, পাখীর নাচ,
সত্যি সব, উপমা নয়, ল্যাকার, কাচ
সব-কিছুই তোমার চোখে দেখতে পাই,
পাইনে শুধু আমার কোনো সর্বনাশ!

তীর বেঁধাবে? আকাশ হয়ে গেছে মনের সকল ঠাঁই।
দাগ থাকে না যাক্ না উড়ে পাখীর ঝাঁক॥

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় * সামনে পাহাড়

সামনে ঐ যে পাহাড় দেখছ,
রাত্রি গভীর হ'লে
কোথায় যে যায়? শুধু প'ড়ে থাকে
কয়েকটি নীল পালক!

রোজ রাত জেগে আমি সে দৃশ্য দেখি,
হঠাৎ আকাশ ঢেকে এক রূপকথার পক্ষীরাজ
চাঁদ-কে ছাড়িয়ে আরো দূর সাতসমুদ্র মুছে দিয়ে
শূন্যে উধাও!

ভোর না হ'তেই সে আবার ফিরে আসে
পাহাড়ের রূপ ধ'রে।
মনেও হবে না, নীল পাহড়ের ডানার ছটফটানী
কখনো শুনেছে কেউ॥

বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত * প্রজাপতি

প্রজাপতিটি কখন
ফুলে ফুলে
দিশাহারা মধু মাখে
দু'-আঙুলে।

আমিও হারিয়ে গিয়ে
ঐ বুকে
পেয়েছি দু'হাতে যেন
কিংশুকে।

ফাল্গুনে

সে চাইলে—তার দু'টি আঁখি
ভাবতাম অবাক জোনাকি—
হেঁটে যেতে ফেললে নিশ্বাস
প্রবাহিত ফাল্গুন বাতাস।

মরামাছি

চুপচাপ দূরে চেয়ে থাকি :
তারা-ঝলমল নীল আকাশ,
ভাবি শ্বেত-কবুতর নাকি
বোনে মায়াময় আঁখি-বিলাস।

কাছে আসলেই নাচানাচি
থেমে যায়, ঠেকে মেকি বরং
আসলে একটা মরামাছি
খড়ের গাদায়—পাংশু রং।

প্রমোদ মুখোপাধ্যায় * একটি গ্রাম্য গাথা

গঞ্জের মেয়ে, গঞ্জের মেয়ে, উঠে এসো এই নায়ে,
ভয় থম্‌থম্‌ রাত্রি নামছে, কোথাও নেই কেউ :
ওই পারে কোথা তোমার আবাস, যাবে তুমি কোন্‌ গাঁয়ে ?
চাঁদমুখ দেখে পরাণে আমার উথাল-পাথাল ঢেউ।

জাম-রঙা শাড়ী শোভা পায় মরি গৌর অঙ্গ ছুঁয়ে,
হাতের চুড়িতে জল-তরঙ্গ তুলে মায়াজাল বোনো !
জল-থৈ-থৈ ঘাটে রাঙা পা'-র আল্‌তা যে যাবে ধুয়ে,
পা দু'খানি যদি দিতে নৌকায়, ক্ষতি হোতোনাক কোনো।
ক্ষতি হোতোনাক, দোহাই তোমার, শুধু গঞ্জের মেয়ে
সোনা হয়ে যেত নৌকা আমার, সোনা হতো সেইক্ষণ-ই
সাতগাঁ-র লোক বিস্ময়ে শুধু দেখে যেত চেয়ে চেয়ে
ঘরপানে আমি চলেছি গলায় গেঁথে কি পরশমণি।

সাতপুরুষের হাল ধরে আমি নদীকে এনেছি বশে,
শক্ত দু'হাতে বৈঠা তুফানে হয়নাতো চঞ্চল—
তোমার মনের দরিয়া ও মেয়ে, সে কোন রঙ্গে ফোঁসে ?
কুল-হারা সেই গহীন গাঙের পেলাম না আজো তল।

গঞ্জের মেয়ে, তুমি উঠে এলে সোনা হতো পাটাতন,
সোনা হয়ে যেত লোহার-নিগড়ে বন্দী এ-যৌবন।

সুনীল বসু * বাঁশিগুলি ভেঙে গেছে

বাঁশিগুলি সব ফুঁ দিতেই ফুরিয়ে যায় কান্নার ভিতর
সাবান ফেনার মত কতক্ষণ স্মৃতি, সূর্যের প্রচণ্ড নীল উপুড় আলোয়
ভিতরে বাহিরে শুধু প্রেম হৃৎপিণ্ডের ছাঁকনিতে ছাঁকা হয়
কতটুকু খাদ কতটুকু খাঁটি,
অথচ অঙ্কের মত চিরকাল এক ঘোর প্যাঁচ থেকে যায়
এদিকে আমার চুলে বার্ধক্যের দাগ ধরে আসে,
আপেল ডালিম পিচ্ কেমন বিষন্ন জরাজীর্ণ ঠেকে, সত্যি কি সবই
শুষ্ক, বাণিজ্য শেষের সওদা, নাকি চক্ষে 'রজনী ধীরে'-র মত পর্দা নেমে আসে
রুপোর বাঁশির রেখা মাঝে মাঝে ঝিলিক ওঠায়, বাজানোর শখ হয়
কিন্তু জানি ফুসফুসে আর ফুঁয়ের ক্ষমতা নেই,
সাদা ঠাণ্ডা শঙ্খ ধরাই আমার সার, কণ্ঠের মুখ-গহ্বরে
বাতাসের দামাল দস্যুতা নেই ;

ক্যালেণ্ডারে পাতাগুলি করাতের মত কাটে, ফর্‌ফর্‌ শব্দ ওঠে
স্বপ্নের ভিতর মনে হয় এক-একদিন কাটা মুণ্ডের ম্যাজিক
ফস্ করে ইলেক্‌ট্রিকের মত রূপসীর রুপোলি চুলে আগুন ধরে ওঠে
কাঞ্চনজঙ্ঘার মধ্য দিয়ে রাস্তা চলে যায় ব্রহ্মাণ্ডের পরপারে
নিদ্রায় ভ্রমণ হয় সহস্র যোযন দূর
তারপর হাওয়া ঢালে অজন্তা ইলোরা কুয়ালালামপুর

সন্তোষকুমার অধিকারী * শবযাত্রা

স্থির পদক্ষেপে ওরা এগিয়ে চলেছে
উত্তরসূরীরা এগিয়ে চলেছে পূর্বপুরুষের শবযাত্রার বাহক হ'য়ে।
স্থূলধূলির অবলেপে বিশীর্ণ আমাদের মুখ,
মৃত্যুর বিবর্ণ ছায়ায় ক্লান্ত আমাদের প্রতীক্ষার কাল,
স্পন্দমান অন্ধকারের গাঢ় অনুভূতিতে জান্‌ছি তাকে—
যে অমোঘ সময়ের মত।

জনতার দ্রুতপদচালনার শব্দে
পৃথিবী নতুন হ'য়ে উঠ্‌ছে প্রতিমুহূর্তে।
জীবনের উত্তপ্ত প্রকাশের বিচিত্রতায়
ধরা পড়ছেনা কালপুরুষের পদধ্বনি।
প্রাণময়তার অনন্ত ঐশ্বর্যে আমরা গর্বিত
বলেছি চিৎকার করে—"আমরা মৃত্যুর চেয়ে বড়"
অথচ দেখতে পাচ্ছি—হারিয়ে গেছে আমাদের স্বর,
আমরা মগ্ন হ'লাম এক নিবিড় মহাঅন্ধকারে।

জীবনকে পুড়িয়ে পুড়িয়ে সোনার মত
নিষ্কলঙ্ক ইস্পাতের মত করে নিতে
সময়ের ক্লান্তি নেই কোনদিন।
অপ্রতিরোধ্য আর অবারিত তার আবির্ভাব,
জীবন আর যৌবনের দুর্বার গতিচ্ছন্দে তার ছায়া,
হৃদয়ের তপ্ত আকাংক্ষার অগ্নিপুঞ্জে
তার স্থবিরত্বের ভস্মকণা;
জন্মের প্রথম অন্ধকারের নিবিড়তায়
তার সুনিশ্চিত পদক্ষেপ।

এগিয়ে চলেছে ওরা কালপুরুষের ছায়ায় ছায়ায়
স্কন্ধে বহন করছে আপন মৃত আত্মার শব॥

প্রদীপকুমার মুখোপাধ্যায় * ঘোড়া

জ্যোৎস্নার রূপোলি কাঠির ছোঁয়া লেগে গাঢ় ঘুমে ডুবে আছে
একা একা বাবলার মাঠ; তবু তা কি কোনদিন রূপকথা হবে,
কাজলরেখার মতো রাত্রির দেশ, তবু স্বপ্নে দেখ মুছে গেছে
কিছু কিছু, জলের ঝড়ের দাগ লেগে সেই দেহের পল্লবে।

এই মাঠ স্বপ্নের রাজ্য তবু, রূপকথার রাজারকুমার
ঘোড়া চড়ে এসেছিল, ঘুমের রাজ্য জয় করে নিতে রাতে,
বাদামি ঘোড়াটি তার এখনো আসে, এখনো সে ঘাস খায়
খুঁজে যায় রাজারকুমার এখনো সে মাঠে এলে জ্যোৎস্নাতে।

ঘোড়ার পিঠের থেকে নেমে কবে চলে গেছে সেই রাজারকুমার
রাত্রিকে বীভৎস পাহাড় মনে করে সে পাহাড় হয়ে যেতে পারে,
ঘোড়া একা জেগে থাকে তবু, রূপোলি শিশুদের রূপকথা হয়ে
জ্যোৎস্নার মাঠে কেউ এলে তাকে নিয়ে চুপি চুপি হবে সে ফেরার

নচিকেতা ভরদ্বাজ * দ্রষ্টার বিবেকে

আমাকে মঞ্চে থেকে ফিরে নাও। আমি আর রঙ্ মাখব না,
সাজব না, আলোর নীচে দাঁড়িয়ে থাকব না।
নেপথ্যের ইতিকথা জেনে গেলে—তারপর সমস্ত যান্ত্রিক।
তাছাড়া আপাতঃ দৃশ্য সমস্ত সম্বন্ধ সে তো শুধু প্রস্তাবনা।
কী হবে এ গোল হয়ে নৃত্যের মহড়া দিয়ে? এই সব ভালো অভিনয়
তির্যক নৈপুণ্য যত কেমন বিস্বাদ লাগে! জীবন-সরিক
হতে গিয়ে অতঃপর অন্ধকার আমাকে ডেকেছে,
শেষে আর মঞ্চ ছাড়া পথ চলতে অকারণ ভয়,
আমার রাত্রির আলো আমাকেই ব্যঙ্গ করে, আমার বিস্ময়
সমস্ত বিসর্জিত—সন্নিহিত হতে গিয়ে কাছে।
অভিনীত আত্মহত্যা অতঃপর আমাকে ছুঁয়েছে।

দ্রষ্টার ভূমিকা ভালো বিরক্তির যন্ত্রণা সত্ত্বেও।
হয়তো স্বভাবী বৃত্ত—রক্তে জ্বালবে বাসনার জ্বালা,
তবুও একান্তে যদি থেকে যেতে—এই সব প্রত্যাশিত পালা
পুনঃ পুনঃ অভিনয়ে ক্লান্তিকর হত না এমন! এই দেহ
গচ্ছিত যৌবন তুমি বুকে করে রাখতে পারবে না;
মৃত্যু শেষ সারাৎসার। তবু এই অনর্থক দেনা
বাড়িয়ে কি ফল হল? অতিরিক্ত প্রত্যাশায় কিছুই মেলে না।

নঞর্থক পরিণাম! এখানে কোথায় পাবে অন্তের পূর্ণতা?
তোমার দুরূহ তৃষ্ণা—অভীপ্সার নন্দনে নরকে
পচে গলে মরে যেত—তবু এই ক্লান্তিকর পৌনঃপুনিকতা—
এ ক্লান্তির হাত থেকে বেঁচে যেত, স্নায়ুর আড়ালে যত দুর্লভ কামনা
চুক্তিবদ্ধ করে তাকে পেতে গিয়ে—মৃত শব মুহূর্ত-সড়কে।
হায় অন্ধ আভিজাত্য! এই সব মৃত শব্দ ব্যর্থ কোজাগরে
হারালে অন্তিম স্বপ্ন; স্বপ্ন ছাড়া জীবন চলে না।
দ্রষ্টার বিবেকে যদি পথ চলতে বুকে নিয়ে যন্ত্রণার দেনা
অপ্রাপ্তির অপূর্ণতা, পূর্ণতাকে পেতে তুমি কখনো বা সম্মোহিত ঝড়ে।

শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায় * হাওয়ার কপাট

আছি কি না আছি কাঠে খোদিত দেয়ালে,
ইঁদুরের কলে দরজা পড়ে গেল অদ্ভুত নিয়মে—
যখনই লোভের বশবর্তী, তখনই পাবে না কেউ কেউ,
খুব ভোরে উঠে আমি ঝুলিয়ে দিলাম নেই, যেন কোন রায়বাহাদুর,
প্রণিপাত অর্থহীন—ঘাড় ধরে হাঁটায় হাওয়ায়,
খাঁজ-কাটা চৌকো ইচ্ছা গোল ফুটো যেখানে যতই
প্রবেশের চেষ্টা করি, বৃথা যায়, কোথাও লাগে না—
গৃহকর্তা এ-দরজায় এলে ঠিক ও-দরজায় পালাচ্ছে যুবক
অকর্মা, ভাতের বেলা সব রুচি জিভের আগায়—
অসম্ভব কিছু একটা করতে হবে সিগ্রেটের দীর্ঘ বিজ্ঞাপন,
রণপায় পদপ্রান্তে নগরের পথ করি গুঁড়ো।

অমিয়ভূষণ গুপ্ত

সাতটা তেরোর গাড়িটা

বাহুল্য কোলাহলবর্জিত ছোট গ্রামখানি—কোনো এক রেলওয়ের একটি ক্ষুদ্র স্টেশন।

ধরণীনাথ এই গাঁয়ে স্কুল মাস্টার। মাসান্তে তার যা প্রাপ্য তা উল্লেখযোগ্য নয়। আর, খাতায় কত লিখতে হয় সেটাও নানাকারণে অজ্ঞাত থাকাই ভালো।

স্ত্রী উমাকালী আর আটবছরের ছেলে মণিকে নিয়ে ধরণীর সংসার। বছর দুয়েক হতে চলল ওদের নিয়ে সে এখানে এসেছে। মফস্বল থেকে বি-এ পাশ ক'রে কটা বছর এদিক ওদিক ঘুরেও যখন কোথাও কিছু সুবিধে হল না তখন এই গাঁয়ে এসে এই স্কুলেই সে মাস্টারী নিয়ে বসে।

সংসারটা ছোট হলেও, চালাতে ধরণীর কষ্ট হয়। তবু যা হোক একভাবে সে চালিয়ে নেয়। একে পাড়াগাঁ, আজে বাজে খরচের হাঙ্গামা নেই, তার উপরে তারা স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই সতর্ক এবং হিসেবী। তরিটা-তরকারিটা, শাকটা-সবজিটা প্রায়ই ছাত্রদের বাড়ি থেকে উপহার আসে তাতে গৃহস্থালীর অনেকটা সাশ্রয় হয়। স্কুলে মণির মাইনে লাগে না। একটি অবস্থাপন্ন ছেলের

গৃহ-শিক্ষকতা ক'রেও কিছু আসে। এই সব দিয়েই একরকম ক'রে সংসারটা চলে। তবে তার বেশি আর নয়।

নিকটবর্তী ছোট শহরটিও মাইল তিনেক দূরে। এই তিন মাইল ধরনীকে প্রায়ই যাতায়াত করতে হয়। আজ হয়তো নিজের একটা গেঞ্জি কিনতে হবে, কাল উমাকালীর জন্যে তিলতেল এক বোতল, পরদিন হয়তো বা স্কুলের সেক্রেটারী-মহোদয়ের জরুরী তলব। এমনি সব। ধরণী এজন্যে সস্তায় একখানা পুরানো সাইকেল কিনে নিয়েছে। বলে: এটা অপব্যয় তো নয়ই, বরং লাভ।

ছোট ভাই নরনাথ কলকাতায় মেসে থেকে কাজ করে। তার আয় কিছুটা ভালো। ভালো মানে, ধরণীর চেয়ে ভালো। সে দাদাকে আর্থিক সাহায্য করতে চায় কিন্তু ধরণী তা নিতে চায় না। বলে: আহা, ও ছেলেমানুষ, কলকাতায় থাকে—কত খরচ ওর! এ বয়সে ওদের নানারকম সখ! আমাকে দিলে ওর আর থাকবে কী!

অথচ, নরনাথ ধরণীর চেয়ে মাত্র দু'বছরের ছোট।

উমাকালীরও সেই অভিমত: আমাদের তো একরকমভাবে চলেই যাচ্ছে। ঠাকুরপো বিদেশে থাকে, সে যেন কষ্ট না পায়!

নরনাথ কিন্তু শোনে না। প্রতি মাসেই সে নিজে থেকেই হয় কিছু টাকা, নয় কিছু প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র বা জামা কাপড় দাদার কাছে পাঠিয়ে দেয়। দাদার তাতে কত না আনন্দ, কত না গর্ব—পাঁচজনকে ডেকে সেকথা সে জানিয়ে দেয়।

স্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী জানকীবাবুকে ধরণী বলে: জানেন জানকী দা, অন্য কোথাও হলে আমরা এই ভাইটা কত বড় হতে পারতো, এমনি তার স্বভাব আর গুণ। আপনি তো দেখেননি তাকে, এবার এলে আপনার কাছে নিয়ে আসবো একদিন, দেখবেন কেমন ছেলে।...

ধরণীর অবসর সময়টা স্টেশনের গণ্ডীর মধ্যে এই প্রৌঢ়, মৃতদার ব্যক্তিটির সঙ্গেই কাটে। জানকীবাবু বয়সে ধরণীর চেয়ে অনেক বড়। স্ত্রীবিয়োগের পর থেকে ছেলেমেয়েরা মাতুলালয়ে থাকে, তিনি আর্থিক সাহায্য পাঠান এখান থেকে। সদানন্দ, সরল প্রকৃতির লোক। এই অল্পবয়স্ক স্কুলমাস্টারটির প্রতি তিনিও কি জানি কেন, বিশেষ অনুরক্ত।

ইষ্টার উপলক্ষে কটা দিন ছুটি। অর্থাৎ, ধরণীর বেশ কিছুটা অবসর।

একটু বেলা হতেই নিজের হাতে সাজা একটা পান গালে দিয়ে ধরণী রাস্তায় নামে জানকীবাবুর কাছে যাবার জন্য। মাত্র পাঁচ-ছ' মিনিটের পথ।

স্টেশনের হাতায় ঢুকতেই জান্‌লার ভেতর থেকে জানকীবাবু ধরণীকে দেখতে পান। চেঁচিয়ে অভ্যর্থনা জানাল: এসো ভায়া এসো! ছুটি বুঝি?

জান্‌লার ভেতর থেকে ধরণীর চোখে পড়ে শুধু একজোড়া চশমার ঝল্‌মলানি। সেটাকেই লক্ষ্য ক'রে সে হাসিমুখে জবাব দেয়: হ্যাঁ, দাদা, ছুটি। নইলে কি আর এ সময়ে আমাদের আসা চলে?

বলতে বলতে ঘরে ঢুকে একটা টুলের উপর ব'সে পড়ে। জানকীবাবুর ব্যস্তভাব দেখে জিজ্ঞেস করে: কী দাদা, গাড়ি-টাড়ি আসছে বুঝি? মানুষের না মালের?

জানকীবাবু মুখ না তুলে চাপা হেসে উত্তর দেন: ইলেভেন আপ্। তিনি জানেন এই রেলের ভাষা শুনলে ধরণী ক্ষেপে যায়।

হয়ও ঠিক তাই। ধরণী উত্তেজিতকণ্ঠে বলে: আপনার ওই আপ্ ডাউন রাখুন দাদা! স্পষ্ট করে বলুন কোন গাড়ি, কোত্থেকে, কটায় আসচে?

—আরে, কলকাতার গাড়ি, নটা ছ'য়ে যেটা এখানে আসে! রেগে গিয়ে তাও কি ভুলে গেলে নাকি! হাঃ হাঃ হাঃ···ব'সো, ব'সো, আগে ট্রেনটা বিদেয় ক'রে দিয়ে আসি···

বলতে বলতে জানকীবাবু কোম্পানীপ্রদত্ত কোটটা কাঁধে নিয়ে বেরিয়ে প্ল্যাট্‌ফর্মে আসেন।

ধরণীও আসে। ট্রেনের যাত্রীদের দেখতে ছেলেবেলা থেকেই তার ভালো লাগে। বিশেষতঃ এই অজ পাড়াগাঁয়ে। এখানে এটা তো একটা সমারোহের ব্যাপার। ওই তো কত লোক এসেছে, কত আসছে···ছেলে বুড়ো! তারাও ট্রেন দেখবে, উপভোগ করবে তার বিনিদ্র কলরব, অজানা আরোহীর সঙ্গে করবে সস্মিত দৃষ্টিবিনিময়। বৈচিত্র্যহীন জীবনে এক মুহূর্তের জন্যেও এই যে পরিবর্তন, এই যে কোলাহলের ক্ষণিক উৎসব এ তারা মনে প্রাণেই চায়।

ট্রেন সশব্দে এসে প্ল্যাট্‌ফর্মে ঢোকে,—সমস্ত স্থানটি অকস্মাৎ যেন মুখর, জীবন্ত হ'য়ে ওঠে।

মাত্র এক মিনিট···তারপরেই ঘণ্টা, সবুজ নিশান, তীব্র বংশীধ্বনি। ট্রেন আবার চলে যায়।

জায়গাটা আগের চেয়ে যেন দ্বিগুণ ফাঁকা হ'য়ে পড়ে। লাইনটা ধু ধু করতে থাকে।

চশমা জোড়া কপালের উপর তুলে দিয়ে কখানা টিকিট হাতে জানকীবাবু ধীরে ধীরে ফিরে আসেন, কোটটাকে এবারে একেবারে মাথার উপর চাপিয়ে। ধরণীও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে এসে ঘরে ঢোকে।

তার পরই আরম্ভ হয় একটি প্রবীণ আর একটি নবীনের সুখ দুঃখ, আশা আকাঙ্ক্ষার কথা। বেলা যে ওদিকে বাড়তে থাকে, কথাবার্তায় তা আর কারো যেন খেয়ালই হয় না।···

পোস্ট অফিসের পিওন জানকীবাবুর ডাক দিতে এসে ধরণীকে দেখে বলে: আপনারও একটা চিঠি আছে, মাস্টার বাবু! ব'লে, একখানা পোস্টকার্ড তার হাতে দেয়।

চিঠিটা প'ড়ে ধরণী প্রায় লাফিয়েই উঠে। উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে বলে: শুনুন জানকী দা'! নরু আসচে, আমার সেই ছোটভাই নরু, যার কথা আপনাকে বলেচি! আজ সন্ধ্যের গাড়িতে আসবে লিখেচে···ছুটিটা ওদেরও হয়েচে দেখচি!

জানকীবাবু নিজ হাতের চিঠিটা থেকে স-চশমা চোখ তুলে আনন্দ প্রকশে করেন: তাই নাকি! বেশ বেশ!

ধরণী সহসা যেন বড় ব্যস্ত হ'য়ে পড়ে। বলে: আচ্ছা, আমি তা হলে যাই···বাড়িতে খবরটা দিই গে। আর হ্যাঁ, সন্ধ্যের গাড়িটা এখানে ঠিক কটায় ধরে, জানকী দা'?

জানকীবাবু চিঠি পড়তে পড়তে অন্যমনস্ক ভাবে উত্তর দেন: অ্যাঁ,··· সন্ধ্যের গাড়িটা? হ্যাঁ, উনিশটা···এই পর্যন্ত বলেই মুখ তুলে হেসে বলেন: সাতটা তেরোয়! ওই গাড়িতেই বুঝি তোমার ভাই···

তাঁর কথা শেষ হবার আগেই ধরণী বাধা দিয়ে অসহিষ্ণুভাবে বলে: হ্যাঁ, ওই গাড়িতেই। তা হ'লে আমি আসি···

বাড়ি এসেই ধরণী উমাকালীকে খবরটা জানায়। উপদেশ দেয়: ওবেলা রান্নাটা একটু ভালো করতে হবে···আমি একবার যাই, দেখি ভালো মাছ-টাছ পাই কিনা···

ঠাকুরপো আসবে, উমাকালী ব্যস্ত হয়ে পড়ে। কাকাবাবু আসছে শুনে মণিরও কী আনন্দ!···

দুপুরবেলা একটু বিশ্রামের পর ঠিক আড়াইটে বাজতেই ধরণী আবার উঠে পড়ে। ভিজে গামছাটা কাঁধে নিয়ে উমাকালীকে এটা-ওটা ফরমাস করে। বলে: এসেই কিন্তু চা চাইবে, সঙ্গে অমনি একটু হালুয়াও ক'রে ফেলো। আর শোনো, রাত্তিরে যদি লুচি-টুচি খায়, সে বন্দোবস্তও তো ক'রে রাখতে হয়!

তা হ'লে জিনিষগুলো আমায় এনে দাও।...উমাকালী বলে।

বাড়ি ফিরতেই দৈবধর কুণ্ডুর সঙ্গে দেখা। ধরণীকে দেখতে পেয়ে দৈবধর বলে: আপনাকে একটু জানকীবাবু ডাকছেন এখুনি।...

দৈবধর গাঁয়েরই লোক।

বলো গে যাচ্ছি, ব'লে তাকে বিদেয় দিয়ে ধরণী স্ত্রীকে আরো কিছু উপদেশ আদেশ দেয়। মণিকে ডেকে বলে: রোদ্দুরে কোথাও বা'র হবি না— বাড়িতেই থাকবি, বুঝলি।...

স্টেশনে যেতেই জানকীবাবু জিজ্ঞেস করেন: তোমার ভায়ের এই সন্ধ্যের গাড়ীতে আসবার কথা ছিল না?

ধরণী একটু বিস্মিত হ'য়ে বলে: হ্যাঁ, কেন বলুন তো!

জানকীবাবু যেন একটু গম্ভীর হয়ে পড়েন। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ধীরে ধীরে বলেন: আউট রিপোর্ট দিতে গিয়ে কন্ট্রোলে একটা খপর পেলাম। ...ইলেভেন আপ্ ট্রেনে একটা অ্যাক্সিডেণ্ট্ হয়েছে...বোধ হয় ডিরেলমেণ্ট! অবশ্য সব খবরটা ঠিক পাই নি।

খবর শুনে ধরণী বিবর্ণ হয়ে যায়। শুষ্ক কণ্ঠে শুধু বলে: অ্যাক্সিডেণ্ট!...

জানকীবাবু জোর করে কাশতে থাকেন। জোড়াতালি দিয়ে বলতে থাকেন: হ্যাঁ...তবে মনে হয়, তেমন কিছু নয়...কলিশন্ তো আর হয়নি... সামান্য ডিরেলমেণ্ট, হয়তো তেমন কিছুই...

ব'লে চশমাটা খুলে কাশতে থাকেন।

ধরণী ব্যাকুলভাবে বলে: ভালো ক'রে খবরটা পাবার কি কোনো উপায় নেই জানকী দা'?...

জানকীবাবু চশমাটা আবার নাকে চড়িয়ে চিন্তিতভাবে বলেন: কন্ট্রোলে একবার চেষ্টা ক'রে দেখতে পারি। কিন্তু ছোট স্টেশন...জুরিসডিক্সনের বাইরে...ব্যাটারা বড় খিটু খিটু করে, বলতে চায় না কিছু...

ধরণী বাধা মানে না। জানকীবাবুর হাত জড়িয়ে ধরে বলে: জানকী দা, যেমন ক'রে হোক্, চেষ্টা করুন একটিবার...

অগত্যা জানকীবাবু আবার কন্‌ট্রোল ধরেন। বিস্তর বকাঝকা খেলেন কিন্তু ধরণীর মুখের দিকে চেয়ে সমস্তই সহ্য করে যান।

জানকীবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে ধরণী চক্ষু বিস্তৃত করে এক পক্ষের ভাব ও ভাষা থেকে যতটা পারে উদ্বেগের সঙ্গে তাই বুঝতে চেষ্টা করে। ব্যাপারটা তার কাছে ক্রমেই যেন ঘোরালো হয়ে উঠতে থাকে।

কন্‌ট্রোল ছেড়ে জানকীবাবু বলেন: যা বলেছিলাম, পয়েণ্ট ঠিকমত না থাকায় গার্ডের গাড়িটা আর তার পেছনের একটা কামরা লাইন ছেড়ে যায়। সেই কামরাতেই দু'একজনের যা কিছু জখম বেশি, আর সব সামান্য!···

ধরণী যেন কিছুটা স্বস্তি পায়। তার মুখে একটু একটু করে আবার রক্তের ছোপ ফিরে আসে। মনকে সে প্রবোধ দেয়, এত কামরা থাকতে নরু যে ওই কামরাতেই উঠবে, তার কী মানে? উঠলেও তারই যে জখম হয়েছে, এমনই বা কোন কথা? ঠিক সময়মত আসতে পারলে না এইটুকু যা ক্ষতি।

ধরণী জানকীবাবুর সঙ্গে তখন অন্য কথা শুরু করে। এ গাড়ির প্যাসেঞ্জারদের আসতে কত দেরি হবে, এই গাড়িটাই আসবে কিনা, জখ্‌মীদের বিধি-ব্যবস্থা কী হবে···ইত্যাদি।

খানিকপরে, অপেক্ষাকৃত নিশ্চিন্ত মনে সে বাড়ি ফেরে।

ঘণ্টাখানেক বাদে ধরণী আবার স্টেশনে যায়। জানকীবাবুকে বলে: রাত্তিরে কিন্তু আমার ওখানেই খাবেন জানকীদা।···গাড়ি যদি লেট্ হয়, একটু না-হয় অপেক্ষাই করা যাবে, কী বলেন?

নিশ্চয়, নিশ্চয়!···জানকীবাবু আন্তরিক সমর্থন জানান।

হঠাৎ ঘর্মাক্ত কলেবরে টেলিগ্রাম পিওন এসে দরজার কাছে সাইকেল থেকে নামে। জিজ্ঞাসা করে: ধরণীবাবু······আছেন এখানে?

ধরণী চম্‌কে ওঠে। জানকীবাবু জবাব দেন: হ্যাঁ, ইনিই, কেন?

পিওন ধরণীর নামের টেলিগ্রামখানা এগিয়ে দেয়। বাড়িতে খবর নিয়ে এখানে এসেছে।

ধরণী যন্ত্রচালিতের মত প্রসারিত ফর্মখানায় সই করে দেয়। পিওন চলে যেতেই ফস্‌ফস্ করে খামটা ছিঁড়ে ফেলে। তারপর পড়তে পড়তে তার মুখখানা কাগজের মত সাদা হয়ে যায়। জানকীবাবু তার হাত থেকে সেখানা নিয়ে পড়ে ফেলেন। প'ড়ে, তিনিও স্তম্ভিত হয়ে ধরণীর মুখের দিকে চেয়ে ব'সে থাকেন।

খবরটা এসেছে ইতিপূর্বে বর্ণিত দুর্ঘটনার স্থান থেকে, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ পাঠিয়েছেন। সংক্ষিপ্ত সংবাদের মর্ম-এই: নরনাথ চৌধুরী নামে জনৈক ভদ্রলোক উক্ত দুর্ঘটনায় মাথার স্থানবিশেষে গুরুতর আঘাত পেয়েছেন। অবস্থা খুবই আশঙ্কাজনক মনে হওয়ায় এই টেলিগ্রাম করা হল।

ধরণী অসহায় শিশুর মত ব'লে ওঠে: জানকী দা', এখন কী করবো আমি?…বলতে বলতে প্রায় কেঁদে ফেলে।

জানকীবাবু সান্ত্বনা দেন: না না, অত উতলা হ'য়ো না। ভয়ের কিছু নাও হতে পারে। তবু তুমি বরং এই সাড়ে ছটার গাড়িতেই চলে যাও সেখানে, আমি তো এখানে আছিই। কোন চিন্তা ক'রো না…মনে সাহস আনো!…

মুখে সাহস দেন, কিন্তু নিজেই যেন সাহস পান না।

জানকীবাবুর উপদেশমত ধরণী সাড়ে ছটার গাড়িতেই চলে যায় বটে, কিন্তু পরদিন সন্ধ্যের গাড়িতে ফিরে আসে একা, তার বড় আদরের ভাই নরনাথকে ইহজন্মের মত হারিয়ে। অথচ, আগের দিন এই সন্ধ্যা সাতটা তেরোর গাড়িতেই সেই নরনাথেরই আসবার কথা ছিল, একটি ক্ষুদ্র পরিবারের জন্যে অজস্র আনন্দ নিয়ে, এমনিই হয়!

মানুষের বুকে দুঃখ যদি চিরস্থায়ী বাসা বেঁধে থাকে, জীবনের দুঃসহ ব্যথা বেদনাগুলোতে কালের স্নিগ্ধ-প্রলেপ যদি না পড়ে, তা হলে মানুষ বাঁচত না। ধরণীর বুকের ক্ষতেও আবরণ পড়ে, কিন্তু স্মৃতি যায় না।

দু'বছর কেটে গেছে। ধরণী সেই গ্রামে সেই ফোর্থ মাস্টার হ'য়েই আছে। কিন্তু তার সকল কাজে এসেছে একটা নিরুৎসাহের ভাব, আগ্রহে এসেছে নিবৃত্তি। কালের পুতুলের মতই যেন সে চলে ফেরে, কাজকর্ম করে।

এই দু'বছরে তার সমস্ত অন্তর ভ'রে তিলে তিলে জমে ওঠে একটা অদ্ভুত অনুভূতি। সমস্ত যন্ত্র জগতটারই উপর তার একটা তীব্র বিতৃষ্ণা…একটা প্রতিহিংসার বিদ্বেষ! লোহালক্কড়, কলকব্জাগুলোকে সে রীতিমত ঘৃণামিশ্রিত ভয় ক'রতে থাকে। এমন কি যন্ত্র চালিত যানবাহনগুলোর উপরেও সে হয়ে পড়ে বীতশ্রদ্ধ!

সাইকেলখানায় আর এখন তার চড়তে ইচ্ছে হয় না। বলে: কবে আমায় খেয়ে ফেলবে! শহর পর্যন্ত রাস্তাটা আজকাল সে হেঁটেই সারে।

ট্রেনের নাম দিয়েছে, দানব।…লাইনটাকে বলে, নরকের পথ। যান্ত্রিক কোনো যানে চড়া সে ছেড়েই দিয়েছে। অবসর সময়ে জানকীবাবুর ওখানে

গিয়ে মাঝে মাঝে বসে বটে, কিন্তু কোনও ট্রেন আসবার সময় হ'লেই সেখান থেকে পালিয়ে আসে। সেই বিরাট লৌহ মূর্তি সে চোখে সহ্য করতে পারে না। বলে : হিংস্র, রক্তভুক্ দানব!

গ্রামের লোকেরা বলে : ইস্কুরূপ ঢিলে হচ্ছে!···

এমনি কাটে।

সেদিন বিকেলের দিকে একশো জ্বর নিয়ে মণি স্কুল থেকে বাড়ি ফেরে। এসেই শুয়ে পড়ে অসহ্য যন্ত্রণায় অস্ফুট কাতরধ্বনি করতে থাকে।

পাড়াগাঁয়ে অসুখ বিসুখ হ'লে অত সাত-তাড়াতাড়ি চিকিৎসা চলে না। এক্ষেত্রেও তাই হয়। জ্বর বেড়েই চলে এবং ক্রমশঃ অন্য উপসর্গও দেখা দেয়।

চতুর্থ দিনে ধরনী গ্রামের ডাক্তার অনঙ্গবাবুকে ডেকে তাঁরই হাতে মণির চিকিৎসার ভার ছেড়ে দেয়। অনঙ্গবাবু ডাক্তার বটে, কিন্তু পাশ করা নয়।

রোগ কমবার কোন লক্ষণই আর দেখা যায় না। বরং বাড়ে বলে বলেই যেন মনে হয়। বারোদিন পরে রোগীর অবস্থা দেখে অনঙ্গবাবু আর চিকিৎসা চালাতে অনিচ্ছা ও অক্ষমতা স্পষ্টই জানিয়ে দেন। সরলভাবেই বলেন : শহর থেকে বড় ডাক্তার নিয়ে আসুন, তাঁর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে যা হয় করা যাবে। কারণ, রোগের গতিকটা বড় ভালো লাগছে না!···

ধরণী ভালোমন্দ বোঝে না, সকলের উপদেশই শোনে। উমাকালী ঘোমটা টেনে এসে বলে : টাকার জন্যে ভেবো না। আমার হাতে কিছু আছে, তা ছাড়া দু' একখানা গয়নাও তো আছে। কী হবে আর ও দিয়ে?···

বহুদিন পরে কি জানি কী ভেবে ধরণী আবার সাইকেলখানাকে ঝেড়ে পুঁছে বা'র করে শহরে যাবার জন্যে। নিজের জন্যে করত কিনা বলা যায় না, মণির কথা ভেবে আর না ক'রে পারে না।

অনেক টাকায় এবং অনেক কষ্টেই বলতে হবে শহরের বড় ডাক্তারকে নিয়ে সে ফেরে। মণিকে পরীক্ষা ক'রে ডাক্তারবাবু বলেন : বেশ খারাপই হয়ে পড়েছে দেখছি, আগে ডাকা উচিত ছিল। যা হোক্, ওষুধ লিখে দিয়ে যাচ্ছি।

শহর থেকে ধরণী ওষুধ নিয়ে আসে। যথারীতি উপদেশ মেনে চলে, খরচের দিকে দৃকপাত করে না। তবু বিশেষ কোন পরিবর্তন বোঝা গেল না, বরং শেষরাত্রির দিকে মনে হয় খারাপের দিকটাই যেন বেশি।

ভোরে অনঙ্গবাবুকে খবর দিয়ে ধরণী শহরের দিকে সাইকেল ছুটায়, সেখানকার ডাক্তারবাবুকে খবর দিতে।

ডাক্তারবাবু যখন এলেন তখন নটা বেজে গেছে। ভালো ক'রে দেখে শুনে তিনি বললেন: ইঞ্জেকশন্ দিতে হবে। তাতে যদি ভালোর দিকে যায়, তবেই মঙ্গল। লিখে দিচ্ছি, নিয়ে এসে রাখুন, আমি ওবেলা এসে নিজেই দিয়ে যাবো। আর ওষুধটাও নিয়মিত খাওয়াতে থাকুন।

ডাক্তারবাবুর সঙ্গে ধরণী শহরে আসে। তিন চারটে ডাক্তারখানা খুঁজেও সে ইন্‌জেকশনটা পাওয়া গেল না, এমনি তার দুরদৃষ্ট। একজন শুধু জানাল: কাল পেতে পারেন!

ধরণী কাঁপতে কাঁপতে ডাক্তারবাবুর কাছে এসে মাথায় হাত দিয়ে ব'সে পড়ে। কান্নাহত গলায় বলে: বুঝেছি ডাক্তারবাবু, ও আমারই বরাত!··· ছেলেটাকে আর বাঁচাতে পারলাম না!···

ডাক্তারবাবু সাহস দিয়ে বলেন: অত অধৈর্য হলে তো চলে না! এখানে পাওয়া না গেলে কলকাতা থেকে আনাবার চেষ্টা করতে হবে।

ধরণী হতাশ হয়ে বলে: সে কী ক'রে হবে, ডাক্তারবাবু, আজ গিয়ে কালকের আগে কী ক'রে আসি! ততক্ষণ যদি ও···

তার মুখ থেকে আর কথা বা'র হয় না।

ডাক্তারবাবু বলেন: আপনাকেই যে যেতে হবে এমন তো কথা নয়। কলকাতায় আপনার আত্মীয় স্বজন বা জানাশোনা কি এমন কেউ নেই যাকে টেলিগ্রাম ক'রে দিলে একাজটা করতে পারে?

ধরণী ভাবতে থাকে এমন কে আছে, কে তার জন্যে এত কষ্ট স্বীকার করবে! থাক্‌তো নরু···ধরণীর বুকটা আবার যেন ভেঙে পড়ে নরুর কথা মনে পড়ায়। কেউ নেই তার···কেউ নেই! একবার, মনে পড়ে মামাতো ভাই চারুর কথা। কিন্তু সে কি আসবে। তা ছাড়া আছেই বা আর কে। ডাক্তারবাবুকে বলে: মামাতো এক ভাই আছে, ডাক্তারবাবু। আর তো কাউকে দেখছি নে!···

ডাক্তারবাবু বলেন: তবে এক্ষুনি তার কাছে জরুরী টেলিগ্রাম ক'রে দিন। এখনই করলে হয়তো সন্ধ্যের গাড়িতে পাওয়া যেতেও পারে। ততক্ষণ না হয় এই ওষুধের উপরই রাখা যাবে—চেষ্টা সব রকম করতে হবে তো।

নির্লিপ্ত কণ্ঠে ধরণী বলে: তবে তাই করি। আপনি একটু গুছিয়ে লিখে দিন, ডাক্তারবাবু—আমার কিছু ভাববার আর শক্তি নেই···

ডাক্তারবাবু লিখে দেন, যেমন ক'রে হোক অবিলম্বে এই ইন্‌জেকশন অন্ততঃ গোটা চারেক নিয়ে আসা চাই-ই, না হ'লে মণি বাঁচে না।

সারাটা দিন মণির অবস্থা খারাপই চলল। ধরণীর আরো খারাপ। তার নাওয়া খাওয়া বন্ধ, চিন্তাশক্তি বিলুপ্তপ্রায়। বেলা যত যায়, তত তার আশঙ্কাও বাড়ে। যদি চারু সময়মত টেলিগ্রামটা না পায়, যদি পেয়েও না আসে, যদি ট্রেন ধরতে না পারে! উমাকালী নীরবে পাখা নিয়ে মণির শিয়রে ব'সে থাকে।

সন্ধ্যার সময় ডাক্তারবাবু আসেন। তিনি আসতেই তাঁর উপর মণির ভার দিয়ে ধরণী স্টেশনের দিকে ছোটে। জানকীবাবুকে জিজ্ঞেস করে: জানকী দা' গাড়ী আসবার দেরী কত?

জানকীবাবু সবই জানেন। বলেন: এই তো এলো ব'লে, ব'সো ব'সো!

ধরণী বসে না, একা একা প্ল্যাটফর্মে অস্থিরভাবে পায়চারী করতে থাকে।

পাগলের মত হয়ে একবার ভাবে: এখানে এত সময় আমার থাকাটা অন্যায় হচ্ছে···যাই দেখিগে মণির কী হল। এর মধ্যে যদি কিছু···

এমন সময় হঠাৎ ধরণী চেয়ে দেখে আলোয় আলো করে ট্রেন আসছে। সেই সাতটা তেরোর গাড়ি। সার্চ লাইটের উজ্জ্বল আভা দেখা যায়, চলার শব্দ উত্তরোত্তর বাড়ে।

ধীরে ধীরে ট্রেন এসে প্ল্যাটফর্মে ঢোকে। দেহের সমস্ত শক্তি চোখে দিয়ে ধরণী প্রতিটি কামরার দিকে দৃষ্টিপাত করে।

ধরণী দা!···

চারু!···এই যে আমি।

ধরণী প্রাণপণ শক্তিতে চীৎকার করতে করতে দৌড়োতে থাকে।

তারপর হঠাৎ গেল গেল শব্দ, কি যে হয়ে গেল, প্লাটফর্মের ওপর ধরণীর অচৈতন্য দেহটা কাঠের মত পড়ে রইল।

অনিল চক্রবর্তী

সমালোচক মোহিতলাল

বাংলাসাহিত্যের যাঁরা চিন্তাশীল প্রবন্ধকার তাঁদের প্রায় সকলকেই কিছু না না কিছু সমালোচনায় হাত দিতে হয়েছে। যদিও বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের মতো দিকপাল ও যুগন্ধর সাহিত্যিকরাও এ ধারাটিকে অবহেলা করেননি, তথাপি আজ পর্যন্ত সমালোচনা সাহিত্য তার স্বকীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি ব'লে মনে হয়। তার পেছনের একটি বিশেষ কারণ এই হতে পারে যে, যেহেতু সাহিত্য আলোচনা সৃষ্টিশীল সাহিত্য হিসেবে গণ্য নয়, সেহেতু সাধারণ পাঠকমহলে তার প্রতি কৌতূহল স্বাভাবিক ভাবেই অনেক কম। অন্য সাহিত্যের প্রশ্ন তুলবো না, অন্তত বাংলাসাহিত্যের পক্ষে এ যুক্তি একেবারেই গ্রাহ্য হওয়া সঙ্গত নয়। রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন এবং আধুনিক সাহিত্য, এমনকি লোকসাহিত্য সম্পর্কেও সে আলোচনা করেছেন, তাকে জ্ঞানগর্ভ বললেই যথেষ্ট হয় না, পাঠকজনমনকে ভাষা ও ভঙ্গির উজ্জ্বলতায় উদ্ভাসিত করে তুলতে তাদের ক্ষমতা কিছু কম ছিলো না এ-কথা প্রমাণিত হয়েছে। কেউ কেউ যদি আপত্তি তোলেন, সে তো সুখালোচনা মাত্র তবে বিরোধিতা করবো না, কিন্তু আমরা 'কৃষ্ণচরিত্রের' উল্লেখ করে বলতে পারি সমালোচনা হিসেবে তা প্রায়

নির্মম, 'মেঘনাদবধের' আলোচনা তো অবশ্যই রবীন্দ্রনাথের লেখকচরিত্র স্বভাবতই সৃষ্টিধর্মী, উদার; সুতরাং আপত্তি-তিক্ততার প্রতি যথেষ্ট আকর্ষণ অনুভব করা তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক না হওয়াই সম্ভব ছিলো। সমালোচনা সাহিত্য সর্বাংশে লেখকের তিক্ত অনুভূতিকেই জাগ্রত করে এ কথা নিশ্চয়ই সত্য নয়, তবু তার মর্মকথা সৃষ্টিতত্ত্ব নয়, বস্তুত সৃষ্টকর্মের বিশ্লেষণ, এবং জনসন স্বয়ং সেক্সপীয়রকেও শিরোধার্য করেন নি। এ-অবস্থায় রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য সন্ধানী মন যদি অনুদার বিশ্লেষণের পথে চলতে যথেষ্ট আনন্দ না পেয়ে থাকে, তবে তাকে দোষ দেওয়া সম্ভবতঃ উচিত হবে না। তবু স্বীকার না করলে অন্যায় হবে যে, সমগ্র রবীন্দ্রসাহিত্যের তুলনায় তাঁর সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্র অত্যন্ত সংকীর্ণ হলেও, তিনি তাকে সাহিত্যের মর্যাদায় উন্নত করতেই চেয়েছিলেন, কেবলমাত্র নীরস বিশ্লেষণ পন্থায় বা ত্রুটি সন্ধানে নিজেকে ব্যাপৃত রেখে পাণ্ডিত্য এবং অহমিকাকে প্রচার করতে চান নি।

আমরা আজ স্বতঃসিদ্ধরূপেই জানি, আধুনিক বাংলাসাহিত্যের জন্ম হয়েছে বস্তুত ইংরেজী সাহিত্যের সংস্পর্শ পাওয়ারই ফলে। ইংরেজী সাহিত্য তখন নানাভাবে ও চিন্তায় আশ্চর্য রকম সমৃদ্ধ। বঙ্কিমচন্দ্র যে সমালোচনা সাহিত্যের পত্তন করেছিলেন, তাও বস্তুত সে সব রচনা থেকেই প্রেরণা পাওয়ার ফলেই। সুতরাং তাঁর বিদগ্ধ আলোচনা কখনও সুখালোচনামাত্র হয়নি, প্রকৃতপক্ষে সাহিত্যকে তার স্বরূপে চেনার সহায়ক হয়েই উঠেছে। তিক্ত ও বিরক্ত অনুভূতিকে প্রকাশ করার প্রয়োজন বলে—বঙ্কিমচন্দ্র এড়িয়ে যাওয়ার কিছুমাত্র চেষ্টা করেন নি। কিন্তু, শুধু ইংরেজী নয়, সমগ্র য়ুরোপীয় সাহিত্যের সঙ্গে সম্যক পরিচয় থাকা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ মনের তিক্ততাকে যথাসম্ভব পরিহার করার চেষ্টা করেছিলেন, এমন কি আধুনিক সাহিত্যের সমালোচনার ক্ষেত্রেও। এর জন্য তাঁর মানসিকতা দায়ী হতে পারে, কিন্তু তার কিছু কুফল প্রত্যক্ষভাবে পরবর্তীকালের বাংলাসাহিত্যের ওপর অবশ্যম্ভাবীরূপেই পড়েছে একথা স্বীকার না ক'রে উপায় নেই। সামান্য আলোচনায় তা প্রমাণ করা এমন কিছু কষ্ট সাধ্য নয়। বিপুল সাহিত্যক্ষেত্রের প্রায় সমস্তটা জুড়ে এমন অজস্র সোনার ফসল ফলিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ যে তার আশ্চর্য ঔজ্জ্বল্য বাঙালীমাত্রেরই চোখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে, বহুকাল পর্যন্ত এ দিকে কারো লক্ষ্যও পড়েনি যে এমন কিছু কিছু অংশ তখনও বাকী ছিলো, সেদিকে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও বিশেষভাবে দৃষ্টি দেন নি, অথচ যার প্রয়োজনকে অস্বীকার করা তাঁর মতো অমিতপ্রতিভার পক্ষেও সম্ভব ছিলো না। উদাহরণগত উল্লেখ করা যেতে পারে এ দুটি সাহিত্য

ধারার কথা—অনুবাদ ও পক্ষপাতহীন নিষ্কলঙ্ক সাহিত্য সমালোচনা। আমরা হাতে পাওয়া সোনার ফসলকে নিয়ে যদৃচ্ছা নাড়াচাড়া করেছি, তাকে পরিমাণে বাড়িয়ে তোলার চেষ্টা চলেছে পুরো উদ্যমে কিন্তু সে ক্ষেত্রটুকুকে রবীন্দ্রনাথ সামান্য ইঙ্গিতে নির্দেশ করে দিয়ে গেছেন মাত্র আমরা সেদিকে কিন্তু আর তেমন ক'রে নজর দিতে চেষ্টা করিনি। ফলে, না অনুবাদ সাহিত্য, না সাহিত্য সমালোচনা, কোনোটিই পরবর্তীকালে যথেষ্ট সমৃদ্ধ হয়ে ওঠার সুযোগ পায়নি।

এইজন্যই সাহিত্য সমালোচক মোহিতলাল মজুমদারের নাম বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। রবীন্দ্রসাময়িক কালেই আপন বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল সার্থক কবি হওয়া সত্ত্বেও তিনি জীবনের অধিকাংশ সময় সাহিত্য-আলোচনায় ব্যয় করে গেছেন। অনুবাদ সাহিত্যকেও সমৃদ্ধ করে তোলার দিকেও যে তাঁর সজাগ দৃষ্টি ছিলো তাও আজকের দিনের পাঠকদের অজানা নয়। এ বিষয়ে তাঁর অভিমত অত্যন্ত স্পষ্ট। একটি মাত্র দেশের ভৌগোলিক গণ্ডীর মধ্যে কোনো বিশেষ ভাষার সাহিত্য কখনও বর্ণোজ্জ্বল হয়ে বেঁচে থাকতে পারে না, বিদেশী সাহিত্যের অনুপ্রবেশ ভাবে ও ভাষায় দিনে দিনে সমৃদ্ধতর হয়ে উঠতে পারে। অন্য পক্ষে বিদেশী সাহিত্যের সঙ্গে সম্যক পরিচয় না থাকলে পাঠকদের পক্ষেও সম্ভব নয় নিজেদের যোগ্য করে গ'ড়ে তোলা। অবশ্য অনুবাদে মোহিতলাল যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি, তত সময় ও সুযোগও তাঁর হাতে হয়তো ছিলো না। বস্তুত বাংলাসাহিত্যে যার অভাব বিশেষভাবেই অনুভূত হচ্ছিলো, তিনি সেদিকেই নজর রেখেছিলেন বেশী এবং তাঁর পরিশ্রমের প্রায় সবটাই ব্যয় হয়েছে সেখানেই। মোহিতলাল অবশ্যই জানতেন, সাহিত্যসম্পর্কে তাঁর জ্ঞানটাই শেষ কথা নয়, এমন কি তাঁর চেয়েও বিদগ্ধ পণ্ডিত বাঙালী সমাজে নিশ্চয়ই আরো অনেকই ছিলেন তথাপি তিনি নিশ্চিতরূপেই অনুভব করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ একা সমগ্র বাংলাসাহিত্যকে সে অভ্রংলিহ মর্যাদায় পৌছে দিয়ে গেলেন, পরবর্তী কালের অসংখ্য সাহিত্যিক হয় তো সমন্বিত চেষ্টাতেও সে মর্যাদাকে রক্ষা করতে পারবেন না। তাই, বলতে গেলে বঙ্কিমচন্দ্রের মতোই গুরু দায়িত্ব নিজের স্কন্ধে বহন করার প্রয়োজন তিনি নিজে থেকেই গ্রহণ করেছিলেন। বলাবাহুল্য, এ দায়িত্ব পালন করার ক্ষমতা তাঁর ছিলো, সুতরাং অধিকারও ছিলো।

যে সময় বাংলাসাহিত্যের একমাত্র দীক্ষাগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠিক সে সময়ে কাব্যপথ থেকে সরে এসে মোহিতলাল যেখানে দাঁড়ালেন সেখানে রবীন্দ্রনাথ

প্রায় অনুপস্থিত। তাঁর কাছ থেকে যথেষ্ট পরিমাণে প্রশ্রয় পাওয়া তাঁর ভাগ্যে কখনো জোটেনি।

কারণটা আগেই বলেছি। সাহিত্য আলোচনায় নিশ্চিতরূপে প্রতিষ্ঠিত অন্যতর যে সাহিত্যগুরুকে পাওয়া সম্ভব ছিলো, বাংলার সাহিত্য বিধাতার অদৃশ্য নির্দেশে মোহিতলাল তাঁর পথ থেকেও দূরে সরে যেতে বাধ্য হলেন। আধুনিকতায় সাহিত্য কুলগুরু তখন প্রমথ চৌধুরী। মোহিতলালের সঙ্গে তাঁর পথের যে ঐক্য হতে পারে না, তা এ দুই লেখকের রচনার সঙ্গে যাঁর পরিচয় আছে তাঁকে বিশদভাবে বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন নেই। তাঁদের মূলগত পার্থক্যের কারণটা শুধুমাত্র ভাষায় দ্বন্দ্বেই কেন্দ্রীভূত, সাধারণ জনের কাছে খুব সম্ভব আজ পর্যন্ত এ-সংবাদটিই প্রচলিত। ভাষার স্বরূপ নির্ণয়ে দু'জনেই তাঁদের মতামত অত্যন্ত স্পষ্ট উচ্চারণে প্রকাশ ক'রে গেছেন এবং শেষ দিন পর্যন্ত কেউই নিজেদের চিন্তাজগৎ থেকে বিচ্যুত হন নি। কিন্তু তথাপি সে একান্তভাবেই বাইরের দিক। বস্তুত উভয়ের অনৈক্য মূল আলোচনা পদ্ধতিতেই। আমার মতো যাঁরা প্রমথ চৌধুরীর অনুরক্ত ভক্ত তাঁরা অবশ্যই জানেন, তিনি তাঁর বক্তব্য বিষয়কে কখনই ব্যাপকভাবে খুঁটিয়ে দেখার পক্ষপাতী ছিলেন না। একান্ত প্রয়োজনে যে আলোচনায় তিনি হাত দিতে মনস্থ করতেন, তা তাঁর ঐ প্রয়োজনটুকুর মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে থাকতে বাধ্য হতো, কিন্তু সেটুকু যে এখন রূপে রসে অনাস্বাদিতপূর্ব ব'লে সকলের কাছে মনে হয়েছে তার কারণ, ঐটুকু আলোচনা একদিকে যেমন বৈদগ্ধ্যে উজ্জ্বল অন্যদিকে তেমনি শিল্পশৈলীতে অনবদ্য। মনিমুক্তার সঙ্গে এ রচনার সহজ তুলনা চললেও স্বীকার না করে উপায় নেই যে, বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাপক আলোচনা কখনও এ পদ্ধতিতে করা সম্ভব নয়। বস্তুত জয়দেব ও ভারতচন্দ্র সম্পর্কে দুটি দীর্ঘ রচনা ভিন্ন অন্য কোনো আলোচনায় প্রমথ চৌধুরী যথার্থ ভূমিকা নিতে পেরেছেন ব'লে আমি মনে করি না। ভারতচন্দ্রকে তিনি পছন্দ করেন কিংবা জয়দেব তাঁর মতে অশালীন কবি কি না, এইটেই বড় কথা নয়, তিনি নিজের ব্যক্তিগত মতামতকে স্বাধীনভাবে প্রয়োগ করার আগে উভয়ের জনপ্রিয়তা ও প্রভাবের কথাকেও বিশেষভাবে চিন্তা ক'রে দেখেছেন, যা তাঁর আর কোনো সমালোচনামূলক রচনায় খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়।

মূলের দিকেই তাই ফিরতে হলো মোহিতলালকে। দীক্ষা নিলেন তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে। সুখালোচনা নয়, ক্ষণকালের প্রয়োজনে বিশেষ একটি চিন্তাসূত্রের উদ্ভাসমাত্রও নয়, বিষয়ের গভীরতায় প্রবেশ ক'রে ব্যাপক

আলোচনায় সাহিত্য ও সাহিত্যিকের স্বরূপটিকে উদ্ঘাটিত করার বীজমন্ত্র হয়তো তিনি আবিষ্কার করেছিলেন তাঁর মানসিকতার প্রতিমুহূর্তের উন্মোচন কিংবা বিদেশের উন্নততর কোনো আলোচনা পদ্ধতির প্রেরণায়, কিন্তু সাহিত্যকে সাহিত্যরূপে চেনা এবং সে সঙ্গে তাকে পাঠক সাধারণের সঙ্গে সঙ্গতভাবে পরিচিত করে দেবার দায়িত্ব বোধটিকে গ্রহণ করেছিলেন তিনি বঙ্কিমচন্দ্রেরই কাছ থেকে। পাঠকমহলে আজ পর্যন্ত এ রকম একটি জনরব প্রচারিত আছে যে, আধুনিক সাহিত্যের প্রতি বিশেষতঃ তাঁর অমনোনীত লেখকের প্রতি অন্যায় বিষবাক্য প্রয়োগ করাতেই ছিলো তাঁর অধিক আনন্দ। নিস্পৃহ সমালোচকের একটি বিশেষ গুণ, এবং পক্ষপাত দুষ্টতা সে গুণকে ভস্মই করে, এ বিষয়ে কারো দ্বিমত হওয়ার কারণ নেই। কিন্তু মোহিতলাল সম্বন্ধে এ উক্তি কি সর্বাংশে সত্য? কারো কারো প্রতি তাঁর কটূক্তি যে একটু বেশী মাত্রায় বর্ষিত হয়েছিলো তা মেনে নেওয়া যেতে পারে, কিন্তু তাকেই সত্য বলে মেনে নেওয়ার আগে মোহিতলালের মুখ্য উদ্দেশ্যটিকে একবার যাচাই ক'রে নেওয়া সঙ্গত ব'লে আমি মনে করি। ঐতিহ্যবাহী খাঁটি বাংলা সাহিত্যকেই মোহিতলাল বাঙালীর নিজস্ব সাহিত্য ব'লে স্বীকার করতে চেয়েছিলেন এবং তাঁর এই উদ্দেশ্যকে সরবে প্রচার করতেও তিনি কখনও কুণ্ঠা বোধ করেন নি। যে সাহিত্য বা যে সাহিত্যিককে তিনি তাঁর সে উদ্দেশ্যের পরিপন্থী ব'লে নিশ্চিতভাবে মনে করেছেন, স্বভাবতই তাঁকে বা তাঁর সাহিত্যসৃষ্টিকে তিনি যথাসাধ্য অগ্রাহ্য করার চেষ্টা করেছেন, নয়তো সে রচনার আলোচনায় কখনও বা উষ্মা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু আমার প্রশ্ন এ কি মোহিতলালের মতো একাগ্রমনা সাহিত্য প্রেমিকের পক্ষে নিতান্ত বিসদৃশ ব্যাপার? সমালোচক মাত্রেই আপন দীক্ষা ও শিক্ষা-নির্ভর একটি বিশেষ সাহিত্য ধারণাকে মনে প্রাণে লালন করে থাকেন নয়তো সমালোচক হিসাবে তাঁর ব্যক্তিত্বই অর্থহীন হয়ে পড়ে। সে বিশেষ সাহিত্য ধারণা দিয়েই যে তিনি সাহিত্যকে পরখ ক'রে দেখতে চাইবেন, তাতে আশ্চর্য হওয়ার মতো কিছু নেই, এবং মোহিতলাল কিছু আশ্চর্য ঘটনা ঘটান নি। যদি অন্যায় হয়, তবে প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, মোহিত-লালের দীক্ষাগুরু স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রও এ অপরাধে অপরাধী। রবীন্দ্রনাথ তার সাক্ষী: 'পূর্ব-অভ্যাসবশত সাহিত্যের সহিত যদি কেহ ছেলেখেলা করিতে আসিত তবে বঙ্কিম তাহার প্রতি এমন দণ্ডবিধান করিতেন যে, দ্বিতীয়বার সেরূপ স্পর্ধা দেখাইতে সে আর সাহস করিত না।" (বঙ্কিমচন্দ্র—আধুনিক সাহিত্য) তথাপি মোহিতলাল কারো প্রতি কখনও এতখানি দণ্ডবিধান

করেছিলেন কি সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। বস্তুত বঙ্কিমচন্দ্রেরই মতো একটা উন্নত সাহিত্য আদর্শকে তিনি পাঠকজনের সামনে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন, সে-আদর্শের সঙ্গে বিদেশী সাহিত্যের প্রত্যক্ষ বিরোধ নেই অথচ সব নিষ্কলঙ্ক বাংলাসাহিত্যকে আশ্রয় করেই গড়ে উঠেছে। কখনও কখনও মোহিতলালের রচনা যে ক্ষুরধার বিদ্রূপে-শ্লেষে ঝলছে উঠছে তার কারণ, তার সতর্ক দৃষ্টিতে এ বাস্তব ঘটনাটি এড়িয়ে যায় নি সে বাংলা সাহিত্য তার ঐতিহ্য থেকে স্বেচ্ছাচ্যুত হয়ে নিতান্ত নিষ্প্রয়োজনে বিদেশীয়ানার পায়ে বারবার মাথা কুটে মরতে চেষ্টা করেছে। মোহিতলালের সাবধানবাণী হয়তো সেদিন প্রতি-বিদ্রূপে জর্জরিত হয়েছে কিন্তু আজকের পাঠকরা কি ভুলে যাবেন সেদিনকার লেখকদের বিদেশীয়ানার ব্যর্থতার কথা? এবং আজ যে সব লেখকরা যে বাঙালী লেখক হিসাবেই পাঠকমনে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছেন তার কারণ মোহিতলাল না হতে পারেন অন্তত তাঁদের আত্মআবিষ্কারেই যে তা সম্ভব হয়েছে তাতে সন্দেহ করার কিছু নেই।

একদিকে ঐতিহ্যপ্রবাহী বাংলাসাহিত্যপ্রীতি, অন্যদিকে সমকালীন ইংরেজী সাহিত্যসমালোচনার প্রতি অনিবার্য আকর্ষণ, এ-দুয়ের সার্থক-সমন্বয়ে জন্মলাভ করেছেন সমালোচক মোহিতলাল। ইংরেজী আলোচনাপদ্ধতির সঙ্গে তিনি পরিচিত হয়েছিলেন দীর্ঘদিনের পাঠ্যাভ্যাসে। সুতরাং সে-পদ্ধতির নিরীখে বাংলাসাহিত্যকে বিচার করার চেষ্টা যে তাঁর মধ্যে দেখা দেবে তা আর বিচিত্র কি! কিন্তু কখনও তিনি ক্ষণেকের জন্য ভুলে যাননি, বস্তুত তাঁর আলোচনার বিষয়বস্তু বাংলাসাহিত্য। তাই তাঁর অনুসন্ধানের মূল লক্ষ্য বাংলারই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য এবং তার ফলে, রচনাশৈলীর প্রতি তাঁকে উদাসীন হয়ে অনেক সময় রচনার ভাবগভীরতার অতলে পরমানন্দে ডুবে যেতে আমরা লক্ষ্য করেছি। অবশ্য ভাব ও ভঙ্গিতে যা শেষপর্যন্ত সাহিত্য পদবাচ্য হওয়ার যোগ্য নয়, অথচ ক্ষণমোহের ভ্রান্তিবশত জনচিত্ত যাকে একদিন উৎফুল্ল হয়ে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন শুধু মাত্র বাঙালীপনার পাশপোর্টে নিয়েও সে কদাপি মোহিতলালের বাহবা কুড়োতে সক্ষম হয়নি। হেমচন্দ্র এবং নবীনচন্দ্র সম্পর্কে তাঁর উক্তি পাঠকরা নিশ্চয়ই ভুলে যাননি। অথচ তাঁদের চেয়ে ঢের অবজ্ঞাত কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন ও সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারকে তাঁদের প্রাপ্য সম্মান জানাতে তিনি দ্বিধাবোধ করেননি। পাঠকরুচির অপেক্ষা করে সাহিত্যসমালোচনাকে তিনি জনপ্রিয়তার প্রসারে আত্মহত্যা ক'রে মরতে দিতে নারাজ ছিলেন। সামান্য এই একটুকরো ঘটনা থেকেই আশা করি, সমালোচক হিসেবে

মোহিতলালের ব্যক্তি বৈশিষ্ট্যকে চিনে নেওয়া সহজ হবে। বাংলাসাহিত্যকে তিনি জাতির চরিত্র থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখতে চাননি, তার শিক্ষাদীক্ষা, তার ধর্মকর্ম, আচরণ-অনুষ্ঠান ইত্যাদি তুচ্ছাতিতুচ্ছ ব্যবহারিক জীবনের মধ্য দিয়ে সমগ্রভাবে একটি দেশ একটি জাতি তাঁর চোখের সামনে জীবন্ত ব্যক্তিসত্তারূপে ফুটে উঠেছে, এবং সেই সামগ্রিক প্রকাশকেই ধরবার খুঁজে বেরিয়েছেন তিনি বাংলাসাহিত্যের মধ্যে। সাহিত্যিকের প্রচণ্ড নামে ভোলার মানুষ তিনি নন, তাই যে রচনায় বাংলাদেশ কিংবা বাঙালীর জীবন তার স্বকীয় সত্তা, তার নিজস্ব চরিত্র নিয়ে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠতে পারেনি, শুধুমাত্র রচনাভঙ্গীর মনোহারিত্ব দিয়ে সে রচনা তাঁকে কখনও মুগ্ধ করতে পারেনি। সাহিত্য তাঁর কাছে জীবন বা সমাজের দর্পণমাত্র নয়, তা সমাজজীবনের সত্য প্রতীক। তত্ত্ব এবং তথ্য, দু'এরই প্রমোদনকে তিনি স্বীকার করেছেন বটে, তত্ত্ব এবং তথ্য ভিন্ন অন্য কোনো বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রাধান্য দিয়েও যে সাহিত্যালোচনাকে প্রাণবন্ত করে তোলা যায় আজ পর্যন্ত তার একমাত্র প্রমাণ বোধ হয় এই সত্যনিষ্ঠ কবি সমালোচকই আমাদের সামনে তুলে ধরতে পেরেছেন। তাঁরই সমসাময়িক দু' একজন প্রতিষ্ঠাবান সমালোচকের রচনাভঙ্গির সঙ্গে তাঁর রচনারীতির তুলনা করে দেখলেই বিষয়টি সহজবোধ্য হতে পারে। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় নিঃসন্দেহে একজন তত্ত্বাশ্রয়ী ভাষ্যকার। পাণ্ডিত্যের পরীক্ষায় তাঁকে পরাস্ত করতে পারেন বর্তমান বাংলাসাহিত্যে এমন একজনকেও হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে না, কিন্তু এ-কথা তো সত্যি যে মানুষের জীবন তথা জীবনের সাহিত্য শুধুই তত্ত্বকথা নয়। যে প্রাণের তাগিদে মানুষ অজ্ঞাত-অদৃশ্য এক নিয়তির টানাপোড়েনে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তত্ত্ব-ব্যাখ্যা দিয়ে সে প্রাণকে স্পর্শ করা যায় না, এমন নিয়তির অমোঘ বিধানেরও হদিস পাওয়া অসম্ভব। অথচ এ-প্রাণ সংসার-সমাজের বিচিত্র জীবনলীলার অবিচ্ছেদ্য অংশ, যার অভাবে জীবনের প্রকাশই অর্থহীন। তবে স্বীকার করতে বাধা নেই শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের গুণীজন-রচনায় সাহিত্যকে চিনতে পারা অধিকতর সহজ, কেন না, সাহিত্যের বিধিবদ্ধ ব্যাখ্যার মাপেই এগিয়েই চলে তাঁর রচনাপদ্ধতি। এরও মূল্য আছে, অন্ততঃ আমাদের দেশে, যেখানে সাহিত্য কখনও আদর পায় না, যেখানে রবীন্দ্রনাথ ও প্রভাবতী দেবী সরস্বতী পাঠকের কাছে তুল্য মূল্য। মোহিতলালের হৃদয়ের গভীরতায় অবগাহন ক'রে সাহিত্যের নিরীখে জীবনকে চেনবার কষ্টসাধ্য চেষ্টা যারা করতে নারাজ, অন্যত্র পদ্ধতি প্রকরণের নিয়ম মেনে সৎসাহিত্যের পরিচয় তাঁরা

পেতে পারেন শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে। সে-তুলনায় সুবোধ সেনগুপ্ত যে অনেকখানি মর্মসন্ধানী সমালোচক তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁর অসুবিধাটাই তাঁর প্রচণ্ড বাধা। তিনি আলোচ্য সাহিত্য ও সাহিত্যিককেই প্রত্যক্ষ বলে জানেন এবং বিচারও করেন তিনি সেই পরিধিটির মধ্যে থেকে। তাতে বিশ্লেষণের সূক্ষ্ম কারুকর্মে আমরা মুগ্ধ হই যত, সীমিত আলোচনার অনাবর্তনে ঘুরে-ফিরে ক্লান্ত হয়ে পড়ি ততখানিই। এ অসুবিধাটুকুকে বাদ দিয়ে দেখলে লক্ষ্য করা যাবে সুবোধ সেনগুপ্ত সত্যই সাহিত্যের মর্মের মধ্যে প্রবেশ করতে চেষ্টা করেছেন। রচনাকার তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যের মধ্যে আর অলক্ষ্য বিধাতা নন, তাঁকে যেন স্পর্শযোগ্যরূপেই প্রতক্ষ্য করা যায় সেনগুপ্ত বিশ্লেষণের দর্পণের ছায়ায়। মোহিতলালের সঙ্গে তাঁর এইখানেই পার্থক্য যে, তাঁর পন্থায় চলেও মোহিতলাল সে-ছায়ার শরীরে একটি জীবন্ত জাতির সমগ্রতাকে দেখতে পান। যদি না পান তবে ছায়া যতই স্পষ্ট হোক, তা নিয়ে তাঁর কোনো মাথাব্যাথা নেই।

বঙ্কিমচন্দ্রের কাছ থেকে প্রাথমিক দীক্ষা গ্রহণ করলেও রবীন্দ্রনাথের ধ্যান-ধারণাকে বুঝতেও মোহিতলালের অসুবিধা হয়নি, বরং সে-ক্ষেত্রে তিনি রবীন্দ্রনাথকেই সর্বান্তঃকরণে মেনে নিয়েছেন। যদিও রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের সাধনাকেই আত্মসাধনা বলে জানতেন, তবু সময়ের দিক থেকে দেখলে স্বীকার করতে হবে, রবীন্দ্রপ্রতিভার উন্মেষকালে এ-দেশটা সাধারণভাবে ইংরেজী শিক্ষাদীক্ষার প্রতি বড়ো বেশী ঝুঁকে পড়েছিলো, যার ফলে ভারতবর্ষের অতীত স্বরূপটি দেশের মানুষেয় মন থেকে প্রায় সরে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিলো। কিন্তু এ-অবস্থা কোনো দেশকে কখনও ভবিষ্যতের অমূল্য সম্পদ হাতে তুলে দেয় না। ভবিষ্যৎকে পেতে হলে অতীতকে জানতে হবে। তাই আত্মভোলা সাধারণ মানুষের কাছে রবীন্দ্রনাথ একে-একে অতীতের রংমহলের দ্বার উদ্ঘাটিত করে দিয়েছিলেন। তাঁর প্রাচীন সাহিত্যের আর কি ব্যাখ্যা হতে পারে। ভারতবর্ষের ইতিহাস ও ঐতিহ্য অর্বাচীন নয়, পথের বাঁকে-বাঁকে অনেক মণিমুক্তো সঞ্চয় করেছে সে তার ভাণ্ডারে। আর কিছু নয়, তিনি সে-কথাটাই নতুন করে আর একবার মনে করিয়ে দিয়েছেন আমাদের তাঁর সেই অনিন্দ্যসুন্দর ভাষায়। আমরা শুধু সাহিত্য বা সমালোচনা পাইনি, সে-সঙ্গে পরম সৌন্দর্যময় একটা হারানো অতীতকেও যেন করতলে ফিরে পেয়েছি। মোহিতলাল এ-প্রয়োজনটাই অনুভব করেছিলেন অন্য কোনো কারণে। তিনি, আরও অনেকেরই মতো, বুঝতে পেরেছিলেন, আধুনিক বাংলাসাহিত্যে ক্রমশঃ

অনাচার প্রবেশ করছে। বিদেশী সাহিত্যপাঠ ভালো, কিন্তু তার সর্বৈব অনুকরণ কদাপি সুস্থ মানসিকতার পরিচায়ক নয়। আমরা যে সাহিত্য-সংস্কৃতিকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি তা উপার্জিত হয়েছে আমাদের পূর্বসূরীদের বহু দিনরজনীর পরিশ্রমেরই ফলে। সুতরাং অবিবেচকের মতো তাকে উড়িয়ে দিয়ে হঠাৎ চোখ ঝলসানো বিদেশী সাহিত্যভঙ্গির প্রতি অত্যধিক, অনেকাংশে নিতান্ত অপ্রয়োজনীয়, কৌতূহল দেখাতে গেলে আমাদের স্বকীয়তাকেই বর্জন করতে হবে, এবং তা কখনও আমাদের পক্ষে মর্যাদার ব্যাপার হতে পারে না। সাহিত্য ও সংস্কৃতি উভয়েরই তাতে সলিল-সমাধি হওয়ার সম্ভাবনা। অথচ বহুদিনের কথা নয়, এই আধুনিক যুগেই বাংলা সাহিত্যে নব-জাগরণের সূচনা হয়েছিলো। যাঁরা পথিকৃৎ তাঁদের স্থান সর্বক্ষেত্রে চিরস্মরণীয় হতে না পারে, কিন্তু তাঁদের অধ্যবসায় ও পরিশ্রমই যে পরবর্তীকালের সমৃদ্ধতর বাংলা সাহিত্য, এ-কথাটাকে ভুলে গেলে আমরা শুধু যে তাঁদেরই অপমান করবো তা নয়, নিজের সাহিত্যের স্বরূপটিকেও পর্যন্ত চিনতে আমাদের ভুল হবে। আর, এ-ভুলের দাম এতই যে কোনো ধার করা বিদ্যা দিয়েও তার শোধ হতে পারে না। সুদূর অতীত নয়, নিকট প্রাঙ্গণের এই সব ছোট-ছোট সাহিত্যগুলোকে, তাই, মোহিতলাল নতুন করে স্মরণ করার প্রয়োজন বোধ করেছিলেন।

নাট্যমঞ্চের মালিকদের আকস্মিক খেয়ালের দরুণ এখনও হয়তো দীনবন্ধু আমাদের মন থেকে একেবারে মুছে যাননি, কিন্তু বিহারীলাল চক্রবর্তী ইতিমধ্যেই ছাত্রপাঠ্যপুস্তকের কবিতে পরিণত হয়েছেন। অথচ, বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে স্বীকার করেও আধুনিক বাংলার কবি-সাহিত্যিকরা যে তাঁদেরও কাছে সমধিক ঋণী, সে কথা মোহিতলাল কেন, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও স্বীকার করেছেন। দীনবন্ধু-প্রসঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা মোহিতলালই করেছিলেন। আমার তো মনে পড়ে না আধুনিককালে তেমন বিশ্লেষণীপন্থায় এ-বিষয়ে কোনো সাহিত্যিক আলোচনায়ঃহাত দিয়েছেন। হয় তো তাঁর সে রচনা সম্পর্কে তথাকথিত রুচিবান পাঠক আপত্তি তুলতে পারেন, নীলদর্পণের যে-অংশের উদ্ধৃতি দিয়ে সমালোচক দীনবন্ধুর প্রতিভাকে প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করেছেন তা নিঃসংশয়ে অশ্লীল, কিন্তু এ-মীমাংসায় আসার আগে ভুললে চলবে না যে, মোহিতলাল শুধু সাহিত্যের ভাষা নয়, ভাষারও যে প্রাণ প্রাকৃত বুলি, সে-আঞ্চলিক বুলির অসাধারণ শক্তিতেই বিশ্বাসী ছিলেন। বস্তুত তিনি

সেই বিশিষ্ট রাত্রিটিতে বিকালের আলোতে বেরুনোর বিপদের অর্ধেক বিপদও অন্ধকারে বেরুনোতে ছিল না, কারণ সেই জায়গাটিতে ইংরেজ আর ফরাসীরা জার্মানদের সঙ্গে লড়াই করছিল। দিনের বেলা প্রত্যেককেই ট্রেঞ্চের ভেতর লুকিয়ে থাকতে হচ্ছিল। যদি এক মুহূর্তের জন্য তারা মাথা দেখাত : দুম্! তাদের গুলি খেয়ে মরতে হ'ত। কতকগুলি ময়দান পারাপারে বাধা দেওয়ার জন্য পর্দা খাটান ছিল ; কেবল এই পর্দাগুলি জানালার পর্দার মতো ছিল না : সেগুলি আসলে ছিল গোলা, বোমার বৃষ্টি—সেগুলি ফাটছিল ও মাটিতে বড় বড় গর্ত তৈরী করছিল আর মানুষ, গরু বাছুর ও গাছপালাকে টুকরো টুকরো করে উড়িয়ে দিচ্ছিল ; সেইজন্য ঐগুলিকে বলা হ'ত আগ্নেয় পর্দা। রাত্রে কোন আগ্নেয় পর্দা ছিল না। যে সমস্ত সৈন্যেরা আপনাকে গুলি করবার জন্য নজর রেখে সারারাত জেগে বসে থাকত তাদের পক্ষে আপনাকে দেখতে পাওয়া সহজ ছিল না। তাহলেও ডাকাত বা ভূতের কল্পনা করা থেকে আপনাকে বিরত করা বেশ বিপজ্জনক ছিল। তার পরিবর্তে, যে-জায়গায় গুলি খেয়েছে সেই জায়গাতেই শুয়ে পড়ে থাকা, আহত লোকগুলি ও সমস্ত মৃত দেহগুলি সম্পর্কে এবং গোলাগুলি সম্পর্কে চিন্তা করা থেকে আপনি আত্মরক্ষা করতে পারতেন না। এটা মোটেই আশ্চর্যজনক নয় যে চন্দ্রালোক উপভোগ করতে ও বাজি পোড়ান দেখতে সেখানে কোন লোক ছিল না ; হাঁ, সেখানে বাজিও পোড়ান হচ্ছিল। যারা গুলি করবার জন্যে নজর রেখে বসেছিল তারা থেকে থেকে এক একটি তারাবাজি আকাশে ছুঁড়ছিল, তা' ফেটে পড়ে একটি করে উজ্জ্বল তারা আকাশে ছেড়ে দিচ্ছিল, এবং সেটি মাটির ওপরকার প্রতিটি লোককে স্পষ্ট ভাবে আলোকিত করছিল। যখন সেগুলি ফাটছিল তখন যে-সমস্ত লোক শত্রুদের গোপনে খবরা-খবর নেবার চেষ্টা করছিল বা আহত লোকদের খুঁজে বেড়াচ্ছিল কিংবা তাদের ট্রেঞ্চের আত্মরক্ষা ব্যবস্থা দৃঢ় করতে কাঁটাতারের বেড়া বাঁধছিল—তারা সকলে তারাটি নিভে না যাওয়া পর্যন্ত মৃতলোকের মতো ভাণ করে মাটিতে মুখ গুঁজে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ছিল।

ঠিক সাড়ে এগারোটার কিছু প'র একটি জায়গায়—যেখানে কোন লোক লুকিয়েও চলাফেরা করছিল না এবং তারাবাজিগুলিও এমন দূরে দূরে ফাটছিল যে মাটির সব কিছু স্পষ্ট করে দেখা যাচ্ছিল না সেখানে—একজন গর্বিত পদক্ষেপে অদ্ভুত ভঙ্গীতে এসে হাজির হলেন ; তিনি আহতদের খুঁজছিলেন না বা শত্রুদের খবরাখবরও করছিলেন না—এমন কিছুই করছিলেন না যা' সৈন্তরা

করে থাকে ; তিনি কেবল ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, এক একবার থামছিলেন আবার চলছিলেন, কিন্তু নিচু হয়ে কোন কিছু কুড়িয়েও বেড়াচ্ছিলেন না। কোন কোন সময়ে যখন তারাবাজিগুলি এমন কাছাকাছি আসছিল যে তাঁকে আপনি বেশ ভালো দেখতে পেতেন, তিনি থেমে যাচ্ছিলেন এবং তাঁর বুকের ওপর হাতগুলি ভাঁজ করে রেখে বেশ কঠিন ভঙ্গীতে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকছিলেন। যখন আবার চারদিক অন্ধকার হয়ে যাচ্ছিল তিনি অত্যন্ত গর্বিত ব্যক্তির মত লম্বা লম্বা পা ফেলে অদ্ভুত ভঙ্গীতে হাঁটছিলেন ; তাহলেও তাঁকে আস্তে আস্তে চলতে হচ্ছিল এবং কোথায় চলেছেন তা দেখে দেখে যেতে হচ্ছিল, কারণ গোলা ফেটে মাটিতে অনেক বড় বড় গহ্বর ও গর্ত হয়েছিল : এ ছাড়া তাঁর মৃত সৈন্যের দেহে হোঁচট খাবার সম্ভাবনাও ছিল। তাঁর এই ধরনের কঠিন ও গর্বিত ভঙ্গিতে চলাফেরা করার কারণ হ'ল যে তিনি স্বয়ং জার্মান-সম্রাট। যদি তিনি আপনার এবং চাঁদ কিংবা তারাবাজির মধ্যে কোন বিশিষ্ট কোণে আসতেন তাহলে আপনি তাঁর ওপরদিকে ঘুরিয়ে তোলা গোঁফের ডগাটি দেখতে পেতেন, ঠিক যেমন আপনি ছবিতে দেখে থাকেন। কিন্তু বেশির ভাগ সময় আপনি তাঁকে দেখতেই পেতেন না ; বস্তুতঃ, মেঘগুলি থাকার দরুন ও তারাবাজিগুলির বেশির ভাগই দূরে থাকার দরুন আপনি একেবারে কাছে না যাওয়া পর্যন্ত কোন কিছু অল্পই দেখতে পেতেন।

সম্রাট যদিও খুব সাবধানে চলছিলেন তবু অন্ধকার খুব বেশি থাকার দরুন তিনি মাইন ফেটে তৈরী, যাকে মাইন গুহা বলা হয় এমন একটি গর্তের তলায় প্রায় মাথা ঠুকে পড়ে যেতে বসেছিলেন, কিন্তু কিছু একটা ধরে তিনি নিজেকে সামলে নিলেন। তিনি ভেবেছিলেন সেটি বুঝি একটি ঘাসের চাপড়া, কিন্তু সেটি জনৈক মৃত ফরাসীর দাড়ি। এক মুহূর্তের জন্য চাঁদ আত্মপ্রকাশ করল এবং সম্রাট দেখলেন বেশ কিছু সংখ্যক সৈন্য—কতক ফরাসী কতক জার্মান, সেই মাইনের বিস্ফোরণে মারা গিয়ে গহ্বরের মধ্যে এখানে ওখানে পড়ে রয়েছে। তাঁর মনে হ'ল সকলেই যেন তাঁর দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

সম্রাট একটি ভয়াবহ চমক খেলেন। তিনি কি করছেন তা বোঝার আগেই তিনি মৃত লোকগুলির উদ্দেশ্যে জার্মান ভাষায় বলে উঠলেন, "Ich habe es nicht gewollt!" যার অর্থ, "এটা আমার কাজ নয়," বা "আমার এ ইচ্ছা ছিল না," বা কোন কোন সময়ে, "এ আমি নই" : ঠিক যে কথাগুলো কোন অন্যায় কাজ করে ফেলার দরুণ ভৎসিত হ'লে আপনি বলে থাকেন। তারপর

তিনি হামাগুড়ি দিয়ে সেই গর্ত থেকে বের হয়ে একটা দিক ধরে এগিয়ে চললেন। কিন্তু তাঁর ভেতরে এত অস্বস্তি-বোধ হচ্ছিল যে একটু যাবার পরেই তাঁকে বসে পড়তে হল। অবশ্য তিনি যদি চেষ্টা করতেন তাহলে চলতে পারতেন কিন্তু তাঁর পথের ওপর পড়ে থাকা একটি গোলার বাক্সের ওপর বসবার সুবিধা দেখে তিনি ভাবলেন যে একটু ভালো বোধ না করা পর্যন্ত তিনি বিশ্রাম করবেন।

তারপরে যে জিনিসটি ঘটল তা' অত্যন্ত বিস্ময়জনক ; একটি বাদামী রঙের জীব অন্ধকারের মধ্য থেকে বেরিয়ে এল এবং তিনি সেটিকে কুকুর বলেই মনে করতেন যদি তার প্রতি পদক্ষেপে একটি ঝন্‌ঝন্‌ ও ক্যাঁচ ক্যাঁচ আওয়াজ না উঠত, কাছে আসতে তিনি দেখলেন সেটি একটি ছোট্ট মেয়ে এবং রাত সওয়া বারোটার সময়ে ঘুরে বেড়াবার পক্ষে তার বয়সটা অনেক কম। ঝন্‌ঝন্‌ ও ক্যাঁচ ক্যাঁচ আওয়াজ হচ্ছিল তার কারণ, সে কাঁদছিল। যখন সে সম্রাটকে দেখতে পেল তখন সে একটুও ভয় পেলনা বা অবাক হয়ে গেল না : সে কেবল ফোঁস ফোঁস শব্দ করতে করতে কেবল কান্না বন্ধ করে ফেলল, এবং বলল, "আমি দুঃখিত ; কিন্তু আমার সমস্ত চোখের জল শেষ হয়ে গেছে।"

ছোটছেলেমেয়েদের ব্যাপারে সম্রাট অভ্যস্ত ছিলেন, তিনি বললেন. "আহা, রে ! তোমার কী খুব ভীষণ তেষ্টা পেয়েছে ? আমার কাছে একটা বোতল রয়েছে, দেখছ ; কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে তোমার খাবার পক্ষে জিনিসটা বড়ই কড়া হবে।"

"আমার তেষ্টা পায়নি," অত্যন্ত বিস্ময়ান্বিত হয়ে ছোট মেয়েটি বলল, "আপনার তেষ্টা পায়নি ? আপনি কী আহত নন ?"

"না", সম্রাট বললেন। "তুমি কাঁদছিলে কেন ?"

ছোটমেয়েটি আবার প্রায় কান্না শুরু করবার উপক্রম করল। আরও কাছে এগিয়ে এসে সম্রাটের হাঁটুতে ভর দিয়ে ঝুঁকে পড়ে সে বলল, "সৈন্যরা আমাকে বকাবকি করেছে। ঐ ঐখানে মাইনের বড় গর্তটার ভেতর চারজন রয়েছে ; তাদের মধ্যে একজন 'টমি' একজন 'হেয়ারি' আর দু'জন 'বশ'।"

সম্রাট কঠিন স্বরে বললেন, "তোমার জার্মান সৈন্যদের বশ বলা উচিত নয়। এটা ভীষণ অন্যায়।"

ছোট মেয়েটি বলল, "না। আমি আপনাকে বলছি। ইংরেজ সৈন্য টমি, ফরাসী সৈন্য হচ্ছে হেয়ারি, আর জার্মান সৈন্য হচ্ছে বশ। আমার মা তাদের তাই বলে থাকেন। সকলেই তাই বলে। বশেদের একজন হচ্ছে

চশমা পরা, ঠিক যেন কলেজের মাষ্টার। অন্য লোকগুলি দু'রাত্রি ধরে পড়ে রয়েছে। তারা কেউ নড়াচাড়া করতে পারে না। তাদের অবস্থা বেশ খারাপ। আমি তাদের জল দিলাম, আর তারা আমাকে ধন্যবাদ দিল, ভগবানের কাছে আমার ভালোর জন্য প্রার্থনা করল। অবশ্য কলেজের মাস্টারটি বাদে। তারপরে একটা গোলা ফাটল ; যদিও সেটি অনেক দূরে ফাটল, তারা আমাকে তাড়িয়ে দিল আর বলল আমি যদি তাড়াতাড়ি সোজা বাড়ীতে না ফিরে যাই তাহলে বন থেকে একটা ভালুক বেরিয়ে এসে আমাকে খেয়ে ফেলবে, আর আমার বাবা আমাকে চাবুক দিয়ে মারবে। কলেজের মাস্টারটি চেঁচিয়ে তাদের বলল যে তাদের মন ভীষণ নরম আর আমি এমন কিছু নই : কিন্তু সেও ফিস ফিস করে আমাকে তাড়াতাড়ি বাড়ী চলে যেতে বলল। আমি কী আপনার সঙ্গে থাকতে পারি ? আমি জানি আমার বাবা আমাকে মারবেন না, কিন্তু আমার ভালুককে ভীষণ ভয় করবে।"

"তুমি আমার সঙ্গে থাকতে পার," সম্রাট বললেন, "আমি ভালুককে তোমায় ছুঁতে দেবো না। আসলে এখানে কোন ভালুক নেই।"

"আপনি ঠিক জানেন ?" ছোট মেয়েটি বলল। "টমিটি বলল রয়েছে। সে বলল যে ভালুকটা ভীষণ বড়, সে ছোট ছেলেমেয়েদের গিলে ফেলে তাদের তার পেটের মধ্যে সিদ্ধ করে।"

"ইংরেজরা কখনও সত্য কথা বলেনা," সম্রাট বললেন।

"সে প্রথমে খুব ভালো ব্যবহার করছিল", আবার কান্না শুরু করে মেয়েটি বলল, "যদি তার ঘা-এর যন্ত্রণা তাকে ভালুক টালুকের কথা না ভাবাত আর যদি তা বিশ্বাস না করত তাহলে আমার মনে হয় না সে আমাকে তা বলত।"

"কেঁদোনা", সম্রাট বললে, "সে তোমার ওপর কোনো রূঢ় ব্যবহার করেনি : ওরা সকলেই ভয় পেয়ে গিয়েছিল, হয়ত তুমি তাদের মত জখম হয়ে পড়বে তাই তারা তোমাকে সেই বিপদ বাঁচিয়ে বাড়ী ফিরিয়ে দিতে চেয়েছিল।"

"ও, গোলাটোলা আমার অভ্যাস হয়ে গেছে," ছোট মেয়েটি বলল, "প্রতি রাত্রিতে বেরিয়ে আমি জখমী সৈন্যদের জল দিয়ে বেড়াই, কারণ আমার বাবা পাঁচ রাত্রি এই রকম পড়েছিলেন ও দারুণ তেষ্টায় কষ্ট পেয়েছিলেন।"

সম্রাট আবার ভীষণ অস্বস্তিভরে বললেন, "Ich haba es nicht gewollt !"

"আপনিও কী বশ নাকি ?" ছোট মেয়েটি বলল ; কারণ সম্রাট এর আগে

তার সঙ্গে ফরাসী ভাষায় কথা বলছিলেন। "আপনি তো বেশ ভালো ফরাসী ভাষা বলতে পারেন ; আমি কিন্তু ভেবেছিলাম আপনি ইংরেজ ?"

"আমি একজন আধা-ইংরাজ," সম্রাট বললেন।

"বেশ মজার তো," ছোট মেয়েটি বলল, "আপনার খুব সাবধানে থাকা উচিত, কারণ দুই দলই আপনাকে গুলি করতে পারে।"

সম্রাট একটু অদ্ভুত ধরণের হাসলেন ; আর আকাশের চাঁদটি বেরিয়ে পড়ে তাকে ঐ বালিকাটির কাছে আগের চেয়ে অনেক ভালো ভাবে প্রকাশ করে দিল। "আপনার তো বেশ সুন্দর পোষাক রয়েছে আর আপনার পোষাকটিও খুব পরিষ্কার রয়েছে দেখছি," মেয়েটি বলল, "কী করে আপনি আপনার পোষাক এত পরিষ্কার রাখেন তারাবাজি উঠলেই ত' আপনাকে ধুলো কাদার মধ্যে শুয়ে পড়তে হ'বে ?"

"আমি শুয়ে পড়ি না। আমি দাঁড়িয়ে থাকি। এই ভাবেই আমার পোষাক আমি পরিস্কার রাখি," সম্রাট বললেন।

"কিন্তু আপনার এভাবে দাঁড়িয়ে থাকা উচিত নয়," ছোটমেয়েটি বলল, "যদি ওরা আপনাকে দেখতে পায় তাহলে আমাদের দিকে গুলি ছুঁড়বে।"

"বেশ ভালো, তাহলে", সম্রাট বললেন, "যতক্ষণ তুমি আমার সঙ্গে থাকবে তোমার জন্যই আমি শুয়ে পড়ব ; কিন্তু এখন চলো তোমাদের বাড়ীতে তোমাকে পৌঁছে দিই। তোমাদের বাড়ী কোথায় ?"

ছোট মেয়েটি হেসে ফেলল। "আমাদের কোন বাড়ী নেই," সে বলল। "প্রথমে জার্মানরা আমাদের গ্রামে গোলা ফেলতে লাগল। তারপর ইংরেজরা এল আর গোলা মেরে জার্মানদের হটিয়ে দিল। এখন তিন দলই সেখানে গোলা ফেলছে। আমাদের বাড়ীতে গোলা লেগেছে সাতবার আর আমাদের খামারে উনিশবার। আর ব্যাপার দেখুন, একটা গরুও মারা পড়েনি। আমার বাবা বলেন যে আমাদের খামারবাড়ী ভেঙ্গে ফেলতে খরচ হয়েছে ২৫,০০০ ফ্রাঁ। এজন্য তিনি বেশ গর্ববোধ করেন।"

আবার সারা শরীরে অস্বস্তি বোধ করে সম্রাট বললেন, "Ich habe es nicht gewollt !" যখন একটু সুস্থ বোধ করলেন, বললেন, "এখন তোমরা কোথায় থাক ?"

"যখন যেখানে পারি," মেয়েটি বলল, "ও, ওটা খুব সোজা ব্যাপার আপনারও শিগ্রী অভ্যাস হয়ে যাবে। আপনি কী করেন ? আপনি কী ষ্ট্রেচার বইবার দলে ?"

"না, না," সম্রাট বললেন, "আমি হচ্ছি, যাকে বলে, কাইজার।"

"আমি তো জানতাম একজনের বেশি ও রকম কেউ নেই," ছোট মেয়েটি বলল।

"তিনজন রয়েছে," কাইজার বললেন।

"তাঁরা সকলেই কী তাঁদের গোঁফ পাকিয়ে ওপরে তুলে রাখেন?" ছোট মেয়েটি বলল।

"না," কাইজার বললেন, "যখন তাঁদের গোঁফ পাকিয়ে ওপরে তোলা যায় না তখন তাদের দাড়ি রাখতে দেওয়া হয়।"

"আমি ইস্টারের সময় যে রকম চুল বাঁধি তাঁদের দাড়িগুলিও সেইরকম ঢেউ-খেলাবার কাগজ দিয়ে বাঁধা উচিত", ছোট মেয়েটি বলল। "কাইজার কী করেন? তাঁকে কী লড়াই করতে হয়, না, তাঁকে জখমী লোকদের কুড়িয়ে বেড়াতে হয়?"

"তিনি ঠিক কিছু একটা করেন না," সম্রাট বললেন, "তাঁকে চিন্তা করতে হয়।"

"তিনি কী চিন্তা করেন।" ছোট মেয়েটি বলল। সে সমস্ত ছোটদের মতোই লোকদের সম্পর্কে এত কম জানত যে তাদের সঙ্গে দেখা হলেই হরেক রকম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে হ'ত এবং কোন কোন সময়ে অত অনুসন্ধিৎসু হ'তে তাকে বারণ করা হ'ত, তার মা প্রায়ই বলতেন, "কোন প্রশ্ন কোর না, তাহলে তোমাকে মিথ্যা উত্তর শুনতে হবে না।"

"যদি কাইজারকেই তা বলতে হয়, তাহলে সেটা আর চিন্তা করা হবে না। হবে কী?" সম্রাট বললেন। "সেটা হবে কথা বলা।"

"কাইজার হওয়াটা অবিশ্যিই বেশ মজার ব্যাপার হবে," ছোট মেয়েটি বলল, "সে যাই হ'ক, আপনি আহতও হননি অথচ এতরাত্রে আপনি এখানে কী করছেন?"

"তুমি কাকেও বলবে না বলে প্রতিজ্ঞা. কর, "সম্রাট বললেন, "কথাটা গোপনীয়।"

"সত্যি প্রতিজ্ঞা করছি", মেয়েটি বলল, "আমাকে দয়া করে বলুন না, আমি গোপনীয় কথা শুনতে ভীষণ ভালবাসি।"

"শোন তাহলে," সম্রাট বললেন, "আজ সকালেই আমাকে আমার সমস্ত সৈন্যদের বলতে হয়েছে, আমি যে তাদের মত ট্রেঞ্চে যেতে পারি না আর গোলাবৃষ্টির মধ্যে লড়াই করতে পারি না, তার কারণ, আমাকে তাদের সকলের জন্য কঠিন চিন্তা করতে হয়, এবং যদি আমি মারা পড়ি তাহলে

তাদের কী করা উচিত ঠিক করতে পারবে না আর হেরে গিয়ে সকলে মারা পড়বে।”

“এটা আপনার দুষ্টুমি”, ছোট মেয়েটি বলল, “কারণ, এটা মোটেই সত্যি কথা নয় তা আপনি জানেন, তাই না ? যখন আমার ভাই মারা পড়ল আর একটা লোক ঠিক তার জায়গায় গিয়ে বসল, যেন কিছুই হয়নি, এইভাবে লড়াই ঠিকই চলতে লাগল। আমার মনে হয় তাদের অন্তত: এক মিনিটও থামা উচিত ছিল ; কিন্তু তারা থামেনি। যদি আপনি মারা যান আপনার জায়গায় কেউ গিয়ে বসবে না ?”

“হাঁ,” সম্রাট বললেন, “আমার ছেলে বসবে।”

“তাহলে আপনি তাদের এরকম একটা বাজে মিথ্যা কথা বললেন কেন ?” ছোট মেয়েটি বলল।

“আমাকে দিয়ে বলানো হয়েছিল,” সম্রাট বললেন। “কাইজারদের এই জন্যই রাখা হয়েছে, তাঁদের দাঁড় করিয়ে এমন সব কথা বলানো হয় যা তিনি নিজে বা অন্য কেউ বিশ্বাস করে না। আজকে আমি কয়েকজনের মুখ দেখে বুঝলাম তারা আমার কথা বিশ্বাস করল না, ভাবল আমি কাপুরুষের মতো নিজের সাফাই গাইছি। তাই যখন রাত্রি হ'ল আমি শুতে চলে গেলাম এবং ভান করলাম যেন ঘুমিয়ে পড়েছি। সকলে চলে যাবার পর আমি লুকিয়ে চলে এসেছি, আমি যে সত্যিই ভয় পাইনি সে সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে। সেইজন্যই যখন তারাবাজি জ্বলে আমি দাঁড়িয়ে থাকি।”

“দিনের বেলা এলেন না কেন ?” ছোট মেয়েটি বলল। “সেই সময়েই তো সত্যিকারের বিপদ।”

“তারা আমাকে আসতে দিত না,” সম্রাট বললেন।

“বেচারী কাইজার !” ছোট মেয়েটি বলল। “আপনার জন্য আমার দুঃখ হচ্ছে। আশা করি, আপনি জখম হবেন না। যদি হ'ন আমি আপনাকে জল এনে দেব।”

এই কথাগুলি বলাতে সম্রাটের মেয়েটিকে এত ভালো লাগল যে তার হাত ধরে তাকে নিয়ে নিরাপদ স্থানে যাবার জন্য উঠবার আগে তিনি তাকে চুম্বন করলেন এবং তারও তাঁকে এত ভালো লাগল যে সেই মুহূর্তে তারও আর অন্য কোন চিন্তা রইল না। এই কারণেই তাদের মধ্যে কেউই লক্ষ করল না যে ঠিক তাদের ওপরেই একটি তারাবাজি জ্বলে ওঠাতে, তার আলোতে সম্রাটের দীর্ঘ শরীরটি বহুদূর থেকে দেখা যাচ্ছিল, যদিও মেয়েটির মলিন

খাদামী রঙের পোষাক পরা ছোট দেহটি, এবং সত্যিকথা বলতে কি, তার মুখটাও খুব পরিষ্কার না থাকাতে, অল্প দূর থেকে একটা ছোট উইঢিপি ছাড়া অন্য কিছুর মতো দেখাচ্ছিল না।

পর মুহূর্তেই একটা ভয়াবহ শব্দ হল: বাতাসের মধ্য দিয়ে দ্রুত আসা একটি গোলার শব্দ—এত দ্রুত যে তাঁদের দিক লক্ষ্য করে সোজা আসবার সময় সেটি কামানের আওয়াজকেও পিছনে ফেলে এসেছিল। সম্রাট দেখবার জন্য হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ালেন এবং তাঁর তা করার সঙ্গে সঙ্গে আরও দুটো তারাবাজি ফাটল এবং অনেক দূর থেকে আর একটি গোলা তাদের লক্ষ্য করে ছুটে আসতে লাগল। এইটি ছিল আরও বড় ধরণের: সম্রাট দেখতে পাচ্ছিলেন সেটি টানেলের-মধ্যে-ট্রেনের-শব্দের-মতো শব্দ করতে করতে পাগলা হাতির মতো বাতাস কেটে ছুটে আসছিল। প্রথম গোলাটা তাঁদের থেকে অল্প দূরে এমন শব্দ করে ফাটল যে সম্রাটের মনে হ'ল যেন সেটি তাঁর কানের মধ্যে বিস্ফোরিত হ'ল। দ্বিতীয় গোলাটি এই সময়ে ভয়াবহ গতিতে ছুটে আসছিল।

সম্রাট মুখ গুঁজে মাটিতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং বিপদ এড়াবার জন্য নিজেকে মাটির ভেতরে নিয়ে যাবার চেষ্টায় তাঁর দুই মুঠি দিয়ে মাটি আঁকড়ে ধরলেন। তারপরেই তাঁর ছোট মেয়েটির কথা মনে পড়ল; এবং সেই মেয়েটির টুকরো হয়ে উড়ে যাবার সম্ভাবনা আছে মনে পড়ল; নিজেকে ভুলে গিয়ে ও লাফিয়ে উঠে তার ওপরে তাঁর শরীর দিয়ে তাঁকে রক্ষা করবার জন্য ঢাকা দিতে চেষ্টা করলেন।

কিন্তু আপনি কোন কাজ করার চেয়ে দ্রুত চিন্তা করতে পারেন; এবং কামানের গোলার গতি চিন্তার মতোই দ্রুত। সম্রাট কাদা থেকে তাঁর আঙুল বার করে নিয়েও ওঠবার জন্য হাঁটু-মুড়বার আগেই একটি প্রচণ্ডতম শব্দ হ'ল। যদিও সম্রাট দূর থেকে গোলার শব্দে অভ্যস্ত ছিলেন তবু তিনি সেরকম ভয়াবহ আর কিছু কখনও শোনেন নি। তাকে বিস্ফোরণ কিংবা গর্জন অথবা সংঘর্ষ বলতে পারা যায় না। সেটি ছিল পৃথিবীর শেষ প্রলয়ের দিনের উপযোগী একটি ভয়াবহ, বিদীর্ণকারী, লণ্ডভণ্ড করা, প্রচণ্ড বিস্ফোরণ-সংঘর্ষ-গর্জন-বজ্র-সংঘাত-ভূমিকম্পের শব্দ। সম্রাট পুরো একটি মিনিট ধরে সত্যই বিশ্বাস করলেন যে তাঁর দেহাভ্যন্তর বিদীর্ণ হয়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছে; কারণ গোলাগুলি সোজাসুজি না লাগলেও কখনও কখনও ঝাপটা মেরে দেহাভ্যন্তরকে বিদীর্ণ করে ফেলে। যখন তিনি

উঠে দাঁড়ালেন বুঝতে পারলেন না তিনি মাথা না পা কিসের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছেন : আসলে তিনি দু'টার কোনটার ওপরই দাঁড়িয়ে ছিলেন না ; কারণ তিনি বার বার পড়েই যাচ্ছিলেন। শেষে তিনি যখন কোন কিছু একটা ধরে নিজের পায়ের ওপর দাঁড়াবার ব্যবস্থা করলেন, তিনি দেখলেন সেটি একটি গাছ—গোলাটি যখন আসে তখন সেটি তাঁর কাছ থেকে বহুদূরে ছিল, সুতরাং তিনি বুঝতে পারলেন বিস্ফোরণের ফলে অতখানি দূরে তিনি নিক্ষিপ্ত হয়েছেন। প্রথম তিনি যে কথাটি বললেন, তা হচ্ছে, 'বাচ্ছাটি কোথায় ?"

"এখানে," তার মাথার ওপরের গাছ থেকে কণ্ঠস্বর বলল, এবং সে স্বর ঐ ছোট মেয়েটির।

"God sei dank !" স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে সম্রাট বললেন, সেটি "ভগবানকে ধন্যবাদ" এই বাক্যটির জার্মান প্রতিরূপ। "তোমার কী লেগেছে, মা ! আমি ভেবেছিলাম তুমি বুঝি টুকরো টুকরো হয়ে উড়ে গেছ।"

"আমি টুকরো টুকরো হয়েই গেছি", ছোট মেয়েটির কণ্ঠস্বর বলল, "ঠিক দু'হাজার সাইত্রিশটি খুব ছোট্ট ছোট্ট টুকরো হয়ে উড়ে গেছি। গোলাটি সোজা আমার কোলের ওপর এসে পড়েছিল। সবচেয়ে বড় টুকরোটি হচ্ছে আমার পায়ের ছোট আঙুল ; সেটি ওদিকে আধ মাইল দূরে পড়ে রয়েছে ; আমার হাতের বুড়ো আঙুলের নখের একটি ওর উল্টোদিকে আধমাইল দূরে পড়ে রয়েছে ; সেই গর্তে যেখানে চারজন লোক তাদের দেহ ছেড়ে চলে এসেছে, যেখানে আমার চারটি চোখের পাতার রোঁয়া পড়েছে ; প্রত্যেকের জন্য এক একটি হিসাবে ; আমার সামনের দাঁতগুলোর একটি আপনার লোহার টুপির চামড়ায় আটকে রয়েছে। এতে অবশ্য আমি মোটেই অবাক হইনি কারণ, ওটি এমনিতেই ভীষণ আল্‌গা হয়ে গিয়েছিল। আমার বাকি অংশ পুড়ে গেছে আর ধুলো হয়ে উড়ে গেছে।"

"Ich habe es nicht gewollt", এমন স্বরে সম্রাট বললেন যে যে-কোন লোকই তাঁকে করুণা করতে বাধ্য হত। কিন্তু ছোট মেয়েটি তাঁকে মোটেই করুণা করল না : সে কেবল বলল :

"ও, আপনি কি করেছেন কী করেন নি জানতে কার দায় পড়েছে এখন ? যখন আপনি আপনার চমৎকার পোষাক নিয়ে থপাস করে মুখ গুঁজে পড়লেন আমি হেসে ফেলেছিলাম। আমি এত হাসছিলাম যে যদিও গোলাটি আমাকে এরকম ঘা দিয়েছে আমি একদম বুঝতে পারিনি। আপনাকে

এখনও বড় মজার দেখাচ্ছে, আমার ঠাকুর্দা মাতাল হয়ে যে রকম করতেন আপনি গাছটি ধরে সেইরকম টলছেন।"

সম্রাট তাকে হাসতে শুনলেন : কিন্তু তাঁকে যা বিস্ময়ান্বিত করল তা হচ্ছে, তিনি পুরুষের কর্কশ কণ্ঠে অন্য লোকদেরও হাসতে শুনলেন।

"আর কারা হাসছে ?" তিনি বললেন। "তোমার সঙ্গে কেউ রয়েছে ?"

"ও, অনেক, অনেক," ছোট মেয়েটির কণ্ঠস্বর বলল। "সেই গর্তটিতে যে চারজন লোক ছিল তারাও এখানে রয়েছে। প্রথম গোলাটা তাদের মুক্ত করেছে।

Du hast es nicht gewollt, Willem, was ?" কর্কশ কণ্ঠগুলির একটি বলল ; তারপরে সমবেত কণ্ঠে হাস্যধ্বনি উঠল ; বস্তুতঃ, একজন সাধারণ সৈনিক সম্রাটকে 'হিবলেস' বলে ডাকছে এটা শোনা সত্যই মজার।

"যে রকম সম্মান আমার প্রাপ্য বলে বিবেচনা করতে তা অস্বীকার করা উচিত নয়," সম্রাট বললেন। "আমি নিজেকে নিজে কাইজার বানাইনি। তোমরা সেইভাবে আমাকে গড়ে তুলেছ এবং সাধারণ লোকের স্বাভাবিক ভারসাম্য ও সাদাসিদে ব্যবহার থেকে আমাকে বঞ্চিত করেছ। আমি এখন তোমাদের আদেশ করছি, ভগবান আমাকে যেমন সোজা লোক হিসেবে গড়েছিলেন—সেভাবে না দেখে, তোমরা আমাকে যেরকম পুতুল গড়ে তুলেছ সেইভাবে আমার সঙ্গে ব্যবহার করবে।"

"ওদের সঙ্গে কথা বলে লাভ নেই,'' ছোট মেয়েটির কণ্ঠস্বর বলল, "তারা সকলে উড়ে চলে গেছে। তাদের আপনার সম্বন্ধে এমন কিছু আগ্রহ নেই যে আপনার কথা শুনবে। এখানে এখন আমি এবং সেই চশমা পরা বশটি ছাড়া আর কেউ নেই।"

একজন পুরুষের কণ্ঠস্বর সেই গাছ থেকে নেমে এল। "আমি ওদের সঙ্গে যাইনি তার কারণ আমি সৈন্যদের সঙ্গে মেলামেশা করতে চাই না," সেই কণ্ঠস্বরটি বলল, "তারা জানে যে আপনার ঠাকুরদাদার সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলবার জন্য আপনি আমাকে অধ্যাপক বানিয়েছিলেন।"

"মূর্খ", সম্রাট উদ্ধতভাবে বললেন, "তুমি কী কখনও তোমার নিজের ঠাকুরদাদার সম্পর্কে সত্যি কথা তাদের বলেছ ?"

কোন উত্তর এল না ; এবং একটু নীরবতার পরে মেয়েটির কণ্ঠস্বর বলল, "সেও চলে গেছে। তার ঠাকুর্দা যে আমার কিংবা আপনার ঠাকুর্দার চেয়ে ভালো ছিল, এ আমি বিশ্বাস করি না। আমার মনে হচ্ছে, আমাকেও চলে

যেতে হবে। আমি অত্যন্ত দুঃখিত, কারণ গোলাটি আমাকে মুক্তি দেবার আগে আপনাকে আমার বেশ ভালো লেগেছিল। কিন্তু এখন যার জন্যই হ'ক আপনাকে আমার তেমন কিছু বলে মনে হচ্ছে না।"

"বাছা," সে চলে যেতে চাওয়াতে দুঃখে অভিভূত হয়ে সম্রাট বললেন, "আমি যা ছিলাম তাই রয়েছি।"

"হাঁ," ছোটমেয়েটির কণ্ঠস্বর বলল, "আমার কাছে আপনি এখন কিছুই নন। দেখুন, আপনি কখনই তা ছিলেন না, কেবল যখন আমি, আপনি আমাকে মেরে ফেলতে পারেন ভেবে, ভয় পাবার মত বোকা ছিলাম; তখন ছাড়া। আমি ভেবেছিলাম মুক্তি দেবার বদলে আমাকে তা' আঘাত করবে। এখন আমি মুক্তি পেয়েছি, আর এই মুক্তি ক্ষুধার্ত, শীতার্ত ও ভয়ার্ত হয়ে থাকার থেকে অনেক বেশি ভালো, আপনি এখন একেবারে কিছুই নন। অতএব, বিদায়।"

"এক মুহূর্ত দাঁড়াও," ভিক্ষা চাইবার ভঙ্গীতে সম্রাট বললেন। "এমন কিছু তাড়াতাড়ি নেই; আর আমি অত্যন্ত নিঃসঙ্গ।"

"কেন আপনি আপনার সৈন্যদের বড় কামানটা আপনাকে লক্ষ্য করে ছুঁড়তে চাইছেন না—যেমন তারা আমার দিকে ছুঁড়েছিল?" ছোট মেয়েটির কণ্ঠস্বর বলল। "তাহলে আপনিও মুক্ত হবেন আর তখন, আপনি যতক্ষণ চান, আমরা একসাঙ্গ উড়ে বেড়াব। যে-পর্যন্ত তা' না করছেন আমি আপনার সঙ্গে থাকতে পারছিনা।"

"আমি তা' করতে পারিনা," সম্রাট বললেন।

"কেন পারেন না?" ছোট মেয়েটির কণ্ঠস্বর জিজ্ঞাসা করল।

"কারণ সেটা প্রচলিত রীতি নয়," সম্রাট বললেন, "এবং যে-সম্রাট অপ্রচলিত রীতি মাফিক কিছু করেন তিনি খতম হয়ে যান, কারণ তিনি নিজে একটি প্রচলিত রীতি ছাড়া আর কিছুই নন।"

"এটা বড্ড বড় কথা: আমি এর আগে কখনও শুনিনি", ছোট মেয়েটির কণ্ঠস্বর বলল। "এর মানে কী একটা মাটির ঢেলা যত চেষ্টাই করুক না কেন পৃথিবী থেকে দূরে চলে যেতে পারবে না?"

"হাঁ," সম্রাট বললেন, "ঠিক তাই!"

"তাহলে টমি কিংবা হেয়ারিরা যতক্ষণ না বড় গোলা দিয়ে আপনাকে ঘা দিচ্ছে ততক্ষণ আমাদের অবশ্যই অপেক্ষা করতে হ'বে," ছোট মেয়েটির কণ্ঠস্বর বলল। "মোটেই নিরাশ হ'বেন না: আমার মনে হয়, যদি আপনি আলোতে

দাঁড়িয়ে থাকেন তাহলেই তারা তা করবে। এখন আমি আপনাকে একটি চুমু খেয়ে বিদায় নিতে চাই, কারণ আমি মুক্ত হ'বার আগে আপনি আমাকে সুন্দর ভাবে চুমু খেয়েছিলেন। কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে, আপনি তা' অনুভব করতে পারবেন না।

সে ঠিকই বলেছিল; কারণ সম্রাট যদিও তাঁর সর্বক্ষমতা দিয়ে সেটি অনুভব করতে চেষ্টা করলেন কিন্তু পারলেন না, এবং যা তিনি দেখলেন তা' তাঁকে যুগপৎ আনন্দ ও নিরানন্দে ভরে তুলল। যে দিক থেকে সে বলছিল তাঁকে চুমু খাবে সেইদিকে তিনি মুখ ফেরালেন; নিখুঁত ভাবে পরিচ্ছন্ন ও নির্বাস অবস্থার জন্য বিন্দুমাত্র সঙ্কোচবিহীন একটি ডানাওয়ালা ছোট্ট মেয়ের অতি লাবণ্যময় গোলাপী রঙের দেহ তিনি সেই গাছ থেকে নেমে আসতে দেখলেন; সেটি উড়ে চলে যাবার আগে দু'হাত দিয়ে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে তাঁকে চুমু খেল।

এ ব্যাপারটি তিনি বেশ স্পষ্ট দেখতে পেলেন এবং এটি সত্যই আশ্চর্যজনক, কারণ তখন মৃদু চাঁদের আলো ছাড়া আর কোন আলো ছিল না, আর সে আলোতে তাকে সুন্দর গোলাপী রঙের না দেখিয়ে প্যাঁচার মতো ধূসর বা সাদা দেখা উচিত ছিল। তার বিচ্ছেদে তিনি দুঃখের একটি ভীষণ যন্ত্রণা অনুভব করলেন, কিন্তু সব নষ্ট হয়ে গেল কতগুলি সত্যিকারের লোক তাঁর সঙ্গে কথা বলাতে।

তাদের আসাটা তিনি লক্ষ করেননি। তারা তাঁরই দু'জন অফিসার, তারা অতি সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করল যে গোলাটি তাঁকে আঘাত করেছে কিনা। তাদের প্রথম কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই সেই স্বর্গীয় দেবশিশু অদৃশ্য হয়ে গেল। তাকে এইভাবে চলে যেতে বাধ্য করাতে সম্রাট এত রেগে গেলেন যে পুরো একমিনিট ধরে তাদের সঙ্গে কথা বলবার মতো আস্থা তাঁর নিজের ওপর রইল না; তারপরে তাদের সঙ্গে যা কথা বললেন তা' শুধু জেলখানায় ফিরে যাবার রাস্তা কোনটা জিজ্ঞাসা করতে।

ওরা তাঁকে বুঝতে না পেরে তার দিকে, যেন পাগল দেখছে এভাবে, চেয়ে আছে দেখে তিনি আবার তাদের তার আস্তানা, মানে তাঁর তাঁবুতে ফিরে যাবার রাস্তা জিজ্ঞাসা করলেন। ওরা পথ দেখিয়ে দিল: এবং তিনি গর্বিত পদক্ষেপে তাদের আগে সেখানে পৌছলেন, সমস্ত প্রহরীরা তাঁকে তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করল আর অফিসাররা তার জবাব দিয়ে তাঁকে সেলাম করল। তারপর তিনি অল্প কথায় তাদের শুভরাত্রি জানালেন এবং বিছানায় শুতে

চললেন, তখন তাদের একজন দুর্বলকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল যে সেদিন যা ঘটেছে তা' নিয়ে কোনো বিবরণ লিখতে হবে কিনা।

সম্রাট যা বললেন, তা হচ্ছে, "তোমরা একজোড়া বোকা গর্দভ," আর এই 'কথাটি' হচ্ছে একটি অতি ভীষণ কটূক্তি।

তখন ওরা পরস্পরের মুখ চাওয়া চাওয়ি করল, তারপরে ওদের একজন বলল, "বড় হুজুর এত টেনেছে আজ যে একেবারে '—' হয়ে গেছে", এবং এই '—'টিও একটি খারাপ গালাগালি। ভাগ্যভালো যে সম্রাট সেই ছোট মেয়েটির চিন্তায় মগ্ন ছিলেন ও ঐ অফিসাররা কী বলল তা' শুনতে পেলেন না।

কিন্তু এতে সত্যই কিছু এসে যায় না। কারণ সব সৈনিকেরাই কোন কিছু অর্থে প্রয়োগ না করেই নোঙরা বাক্য ব্যবহার করে থাকে।

স্কেচ—শৈলেন্দ্র মিত্র

শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

আধুনিক রুশ কবিতা

আধুনিক রুশ কবিতা সম্পর্কে আলোচনায় প্রথমেই মনে পড়ে কবিতা রাশিয়ায় আধুনিক যুগেরই অবদান। লোকসংস্কৃতির ধারায় আবর্তিত কবিতার জাতিগোত্রহীন পিতৃপরিচয়হীন সময়োত্তীর্ণ ভূমিকা বাদ দিলে সচেতন শিল্প প্রয়াসের ক্ষেত্রে রাশিয়ার কবিতাকে তরুণ না বলে পারা যায় না। আমাদের বাংলা কাব্য যখন চর্যাপদের দার্শনিকতায় বিভোর এবং সেকারণেই যখন তাকে লোকসাহিত্যের স্বভাবপটুত্বের চেয়ে কৃত্রিম সৃষ্টির বিশিষ্টতায় উজ্জ্বল মনে হয়েছিল, কিংবা ইংরেজিতে যখন চসারের অবদান আরম্ভ হয়ে গেছে—তখনো রাশিয়ার কাব্যের ইতিহাস আবছা, অস্পষ্ট।

কাব্যের ক্ষেত্রে আমরা যেমন বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের কাছে ঋণী, রাশিয়ার কাব্যও তেমনি খৃস্টধর্মের কাছে ঋণী। একাদশ শতকের শেষার্ধে খৃস্টধর্ম এ অঞ্চলে প্রবর্তিত হওয়ার পর কাব্যের স্ফুরণ ঘটে, কিংবা শিল্পের অন্তত একটি ধারাবাহিক আলোচনার সূত্রপাত হয়। কিয়েভ তখন রাশিয়ার শিল্পচর্চার শ্রীধাম। এখানেই রাজা, রাজপুত্র, ধর্মযাজক, উপাসকদের মিলিত প্রয়াসে গড়ে ওঠে সুচিহ্নিত রুশ সাহিত্য ও শিল্পের আদিরূপ। সেই একাদশ-দ্বাদশ শতকেই

পশ্চিমী সংস্কৃতি, ও বাইজান্টিয় সংস্কৃতির যোগে এবং স্থানিক মৌলিকত্বের সংশ্লেষে একটি ইউরোপীয় আদর্শ গড়ে ওঠে এ অঞ্চলে। ভাষাতেও ধর্মীয় রীতি ও লোকায়ত রীতির যোগে এক নতুন ভাষাদর্শের দিগ্‌দর্শন ঘটে যা পরবর্তীকালে দীর্ঘদিন রাশিয়ার শিল্পভাষা হয়ে বিরাজ করেছিল। সেই আদিযুগে গৃহবিবাদ ত ছিলই রাজায় রাজায়, তাছাড়া, বহিঃশত্রুর অভাব ছিল না। প্রাচীন ইংরেজী কাব্যের মতই এখানেও সেকারণে বীররসাশ্রিত গাথা রচিত হয়েছিল (যেমন, আইগরের যুদ্ধযাত্রার কাহিনী। 'বাইলিনি' নামধেয় বীরগাথা গ্রাম্য-কবির মুখে প্রচলিত ছিল, এবং সেগুলি লোকসাহিত্যেব সপ্রাণ স্বাচ্ছন্দ্যে চিরস্মরণীয় (যেমন, মুরোমের ইলিয়া)।

সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগ থেকেই বাস্তবিকপক্ষে রুশ কাব্যের সুস্পষ্ট চেহারা চোখে পড়ে। কিছু ব্যঙ্গকবিতা এবং কিছু নীতি প্রচারমূলক কবিতা লেখা হয় সে সময়। এই সাহিত্যকৃতির পিছনে ক্লাসিকসের অনুপ্রেরণা ছিল, ছিল তৎকালীন পোল্যাণ্ডের প্রভাব।

আধুনিক রুশ কাব্যের প্রথম কবি হিসেবে লোমোনোসভকেই চিহ্নিত করা হয়েছে। অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের কবি তিনি। বৃহত্তর ইউরোপীয় মান তাঁর কবিতায়। তাঁর জ্ঞানের পরিধি যেমন ছিল বিস্তৃত, তেমনি ছিল তাঁর কাব্যসম্পর্কিত সুচারু ধ্যানধারণা—যেমন তাঁর সেই বিখ্যাত কিছু পংক্তি: "দিন লুকোয় মুখ, রাত্রি ঢাকে সমতলভূমি, কালো ছায়া পাহাড়ে পাহাড়ে, আর সূর্যের কিরণ সব আমাদের থেকে অপসৃত। উন্মুক্ত ফাটল, তারায় ভরে গেছে ; অগণিত নক্ষত্র, অতল ফাটল।" ('সন্ধ্যাপ্রশস্তি···' ইত্যাদি)। তাঁর কবিতা ছিল দার্শনিক ; ঈশ্বরপ্রশস্তি ও ধর্মস্তুতিমূলক—এবং উদাত্ত 'ওড'ই ছিল প্রধানত সেগুলির রূপকল্প। সেই শতকেই আর কিছুকাল পরে প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। সহজ, ঝরঝরে, হাল্কা, মিষ্টি কবিতার দাবী উঠলো। সুমারোকোভ প্রমুখের প্রেমের কবিতা ও গান অনুভূতির গাঢ়তায় আধুনিক রুশ কবিতার ধ্রুপদী আদর্শ হয়ে আজো বিরাজমান। তাঁর সেই কবিতার কটি ছত্র: "আমাকে কি নির্দয় ভাগ্য এনে দিলে, আমার স্থৈর্য আন্দোলিত করলে, মুক্তির রূপান্তর ঘটালে বন্ধনে, সুখ বদলে দিলে দুঃখে ; হয়ত একথা জানো না, এবং আমার আরো তীব্র জ্বালার সঞ্চার, বোধ করি তুমি আরো অন্য কোন রমণীর জন্যে নিঃশ্বাস ফেলছো ··"।

অষ্টাশত শতকের ডারজাভিনই প্রথম মহৎ এবং নিবিড় দুরকমের ভাবধারার মিলন ঘটিয়েছেন। একদিকে লোমোনোসভের মহৎ ও উদাত্ত চেতনা, অন্যদিকে

সুমারোকোভের ব্যক্তি-চেতনা তাঁর কবিতায় যুগপৎ অবস্থান করছে। তিনি কাব্যের বিষয়ানুগ রূপাদর্শের গোঁড়ামি বর্জন করেছিলেন। কবির অন্তর্জগত ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা, নিসর্গের কথা এই শতকের কবিতায় সেই প্রথম স্পষ্ট প্রকাশ পেল। তাঁর কবিতাতেই পাওয়া গেল উত্তাল হৃদয়-বৃত্তির তরঙ্গবিক্ষোভ, যেমন, 'জিপসি মেয়ে গিটার নাও, বাজাও তার, গলা ছাড়ো—কামক্ষুব্ধ জ্বরের মতন, তোমার নৃত্যে প্রত্যেকের মূর্ছিতভাব জাগাও ·" ইত্যাদি ('জিপসির নাচ')। অষ্টাদশ শতকের শেষের ক'বছর আর উনিশ শতকের প্রথম কুড়ি বছর জুড়ে যে-নাম ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়েছিল তা হল কারামজিন। ক্লাসিসিজমের মহান্ ঐতিহ্য (যার আদিতে ছিলেন লোমোনোসভ) থেকে বিচ্যুত না হয়ে, তিনি রুশ কবিতায় আনলেন এক নতুন চেতনা। ফরাসী প্রভাবে তাঁর কাব্যের ভাষা এবং রূপকল্প হল শিক্ষিতের পক্ষে চিত্তাকর্ষক। উনিশ শতকে পুশকিন ত এই ভাষাকেই আরো সমৃদ্ধ করেছিলেন। কারামজিনের ধারাকে বহন করে চলেছিলেন জুকোভস্কি। ১৮২০।১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই পর্যায়ের কবিতা দেখতে পাওয়া যায়। এই পর্যায়ের বিখ্যাত কবি হলেন পুশকিন। এই কবিতা আঙ্গিককে অস্বীকার করতে পারে নি, অখ্যাত কবিদের রচনাতেও আঙ্গিকের শৈথিল্য নেই। এ যুগে এঁরা বাইরন ও সেক্সপীয়রের ভক্ত ছিলেন, এবং নিজেদের রোমান্টিক বলে প্রচার করেন। জুকোভস্কির কবিতার মাধুর্য ডারজাভিন ও পুশকিনের মধ্যে সেতু রচনা করেছিল বলে মনে হয়। বাটিউস্কোভও এযুগের স্বনামধন্য কবি। তাঁর কবিতার ভঙ্গিমা জুকোভস্কির চেয়ে ঘনসংবদ্ধ, ভাব তরঙ্গবলয়িত নয়। পুশকিনের মত তিনিও ধ্রুপদী সুষমার সাধনা করে গেছেন।

পুশকিন এ যুগের হলেও চিরকালের কবি। তাঁর পূর্ববর্তী দেশীয় কবিদের এবং ফরাসী ক্লাসিক্যাল কবি ও বাইরনের প্রভাব তাঁর কবিতায় থাকলেও, তাঁর মধ্যে ছিল বিশিষ্ট এক সমালোচকের অন্তর্দৃষ্টি যার ফলে তাঁর শিল্পভাষা নিপুণ, অভিজ্ঞতা ও জীবনাদর্শের সমাহার সুসমঞ্জস এবং মানসিক চেতনা সু-উচ্চারিত। পুশকিনের কাব্যিক অগ্রস্থতি তাঁর কবিতায় পরপর দৃষ্টিগোচর। ১৮৩০-র পর তাঁর গদ্যরচনাও আপন মহিমায় মহিমান্বিত। এঁর সময়কার কয়েকজন কবিকে পুশকিন গোষ্ঠীর কবি বলা হয়ে থাকে। এই যুগের সবচেয়ে নির্জন কবি হলেন বারাটিন্স্কি।

১৮৩০ সালের পরই কিন্তু রুশ কবিতার এ-পর্যায়ের মরশুম শেষ হয়ে গেল।

যদিও এসময়েই টিউটশেভ ও ল্যারমনটভ কবিতা লিখেছিলেন, তবু এরপর থেকেই কবিতার কাল যেন শেষ হয়ে গেল। কবিতার জায়গা দখল করে নিল গল্পরচনা। টিউটয়েভের মধ্যে রুশ কাব্যের বিভিন্ন ধারার সংমিশ্রণ দেখা যায়। তিনি মাঝে মাঝে পুরনো কাব্যরীতি অনুসরণ করেন। তাঁকে রাশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক কবি বলা হয়ে থাকে। প্রেম, নিসর্গ, সৌষম্য, বৈষম্য সমস্ত কিছুই তাঁকে নিদারুণ আলোড়িত করেছে। রুশ সিম্বলিস্টরা পরবর্তীকালে তাঁকে নিজেদের উৎস বলে স্বীকার করে নিয়েছে। ল্যারমণ্টভের ভাবাবেগভরা কবিতাগুলি নিজের বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল হয়ে আছে। প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে, গদ্যের রাজত্বে আর দুজন কবি স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে লিখতে পেরেছিলেন—তাঁরা হলেন ফেট ও নেক্রাসভ। ফেটের কবিতার শ্রুতিমাধুর্য স্মরণযোগ্য। তাঁর মতই গীতিকবিতা লিখেছিলেন এ্যালেক্সি টলস্টয়। নেক্রাশভের কবিতায় বাস্তব জীবনের অনেক ছবি চিত্রিত হয়েছিল, তিনি কবিতায় লোকসঙ্গীতের সারল্যও ফোটাতে পেরেছিলেন—সেকারণে সাধারণ্যে তাঁর কবিতার সমাদর ছিল।

১৮৯০-র সময় থেকেই সিম্বলিস্ট আন্দোলনের পূর্বচিহ্নগুলি দেখা গিয়েছিল। কিছুকাল আগে থেকেই যদিও কাব্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়েছিল রুশ সাহিত্যে, তবু কাব্যের সেই উদ্বেল ধারাপ্রবাহ এযুগে ও বিশ শতকের প্রথম দশকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। এ যুগেও সেই ১৮২০-র মত কবিতার রূপকল্পে, সৌন্দর্য চিন্তায় এবং সামগ্রিকতায় নতুনত্ব দেখা গিয়েছিল। প্রথম দিকের রুশ সিম্বলিস্টরা—যেমন ব্রিউসভ—বোদলেয়্যার, ভ্যার্লেন ও মলার্মের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে দেশের স্বকীয় কোন স্রোত ছিল না একথা বলা যায় না। টিউটশেভের বাস্তবাতিরিক্ত চেতনা, ফেটের সাঙ্গীতিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা যা কিনা কবিতাকে সঙ্গীতের নিকটবর্তী করা যায়, এই চিন্তাধারার পূর্বসূরী, সলোভিয়েভের মিষ্টিক কবিতা সমস্তই রুশ সিম্বলিস্ট কবিতার উপক্রমণিকা। প্রথম দিকের রুশ সিম্বলিস্ট চিন্তা ফরাসী দেশের মতই ছিল। বোদলেয়্যার ও ভ্যারলেনের মতামতগুলি তাদেরও উপজীব্য ছিল প্রথমে।

১৯১০ ও পরবর্তীকালে রুশ সিম্বলিস্ট চিন্তা ক্রমশ জটিল হয়ে ওঠে। স্টাইল ও রূপকল্পে বিভিন্ন কবির মধ্যে অনেক পার্থক্য দেখা গেল। ব্রিউসভ প্রমুখ অনেকেই সিম্বলিজমের ক্ষেত্র সাহিত্যের ক্ষেত্র বলে ধরে নিলেন, কিন্তু ব্লক প্রমুখ আরো অনেক কবি বললেন সাহিত্যের ক্ষেত্র ছাড়াও সিম্বলিজম মিষ্টিক ধর্মের মত, কবি যার মধ্যমণি। ব্লক এ যুগের শ্রেষ্ঠ কবি। সিম্বলের মাধ্যমে

অতিলৌকিক অভিজ্ঞতাগুলি প্রকাশ করলেও, কবিতায় তিনি প্রধানতঃ রোমান্টিক। কবিতায় তাঁর একটা অগ্রগতির ধারা পর্যবেক্ষণ করা গিয়েছিল। বলশেভিক আন্দোলনের মধ্যে তিনি পশ্চিমী মানবতার ফাঁকা আওয়াজ শুরু হতে দেখেছিলেন, পুলকিত হয়েছিলেন এই ভেবে যে সঙ্গীতের জয়যাত্রা সুরু হবে। তাঁর 'দি টুয়েলভ' (১৯১৮) কবিতাগুলিতে এই চিন্তাই প্রতিবিম্বিত; কিন্তু পরে তিনি বিশ্বাস হারিয়েছিলেন, বুঝেছিলেন সঙ্গীত তাঁকে ও তাঁর দেশকে ছেড়ে গেছে।

সিম্বলিজমের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ 'এ্যাকমি'-ইস্টরা সক্রিয় হলেন ১৯১২ থেকে ১৯১৭-র মধ্যে। কবিতায় স্পষ্টবাচন, বাস্তব চিত্রকল্প তাঁরা বেছেনিলেন। সিম্বলিজম তাঁদের কাছে হয়ে দাঁড়ালো ধূম্রবিলাস মাত্র। এই ধারার বিখ্যাত কবি হলেন—গুমিলেভ, আখমাটোভা ও ম্যান্ডেলস্টাম। তাঁরা সবাই রাশিয়ার ক্লাসিক স্পষ্টতার ধারায় নিজেদের যুক্ত করেন।

এর পরে এল ফিউচারিজমের ধারা। প্রথমদিকে ইটালীয় ফিউচারিজমের প্রতি আকর্ষণ থাকলেও, এই ধারা রাশিয়ারই। খে্‌ব্‌রনিকভ, মায়াকভস্কি ও আরো দুজন তাঁদের ফতোয়া জারি করেছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন, 'পুশকিন ডস্টয়েভস্কি, টলস্টয় ইত্যাদিকে আধুনিকতার স্টিমশিপ থেকে ছুঁড়ে ফেলে দাও।' ঐতিহ্যকে অস্বীকার করেছিলেন তাঁরা। তাঁরা কবিতাকে সিম্বলিস্টদের অতিলৌকিক বিষয়বিবিক্তকা থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চেয়েছিলেন। তাঁদের মতে কবিতায় সমসাময়িক শিল্প ও রাজনীতিক জীবনের ছায়া থাকবে, এবং কবিতা থেকে পচা পুরনো কাব্যিক চিত্রকল্প দূর করতে হবে। তাঁদের মতে কবিতার ভাষা হবে নতুন ও প্রাচীনত্বের গ্লানিমুক্ত। এই জন্যে ধাতুমূল থেকে এঁরা নতুন নতুন শব্দ সৃষ্টি করেন। ১৯১৭-র রাজনৈতিক আন্দোলনের যে-নতুনত্ব ছিল তার ঢেউ লেগেছিল এই ফিউচারিস্ট কবিতায়। মায়াকভস্কি উদাত্ত কণ্ঠে রাজনৈতিক কবিতা ও প্রেমের কবিতা রচনা করেছিলেন। তাঁর ব্যঙ্গ ছিল তীক্ষ্ণ, আবেগ উচ্ছ্বসিত।

ফিউচারিজমের কাল ১৯১৭-র কাছাকাছি ফুরিয়ে গেলেও, ১৯৩০ পর্যন্ত তার প্রভাব ছিল। ইম্যাজিস্ট বা চিত্রকল্পবাদীদের মধ্যেও এর প্রভাব দেখা গেল পরে। এসেনিনের অনেক কবিতাই চিত্রল, তাঁর কাব্যের গুণেই রাশিয়ার চিত্রকল্পবাদকে একটি বিশিষ্ট পর্যায়ে রেখে বিচার করা যায়। ১৯২২ ও ১৯৩০-র মধ্যে ফিউচারিজমের ধারায় কনস্ট্রাক্টিভিজম বা সংগঠনবাদের প্রচলন ঘটে কাব্যে। তাঁরা কবিতাকে সোশ্যালিষ্ট সমাজের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে

চেয়েছিলেন। তাঁরা বলতেন কাব্যের বিষয় কাব্যের রীতি নির্ধারণ করবে। কবিতায় তাঁরা অনেক বৈজ্ঞানিক শব্দাদি ব্যবহার করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে বিখ্যাত হলেন সেলভিন্স্কি ও বাগিরিটস্কি। সোভিয়েট আমলের একজন শক্তিশালী কবি হলেন জাবোলটস্কি। তাঁর প্রথম দিকের কবিতা ফিউচারিস্টদের মত—বর্ণনাবহুল, দারুণ বাস্তব। কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁর কবিতায় লিরিক গুণ, নিসর্গ ও মানুষের প্রতি প্রেম ইত্যাদি দেখা যায়। তিনি ফিউচারিজম থেকে সরে আসেন।

১৯৩০ থেকেই আবার নতুন হাওয়া বইতে স্বরু করে জাবোলটস্কি স্পষ্টবাচনে রুশ ধ্রুপদী রীতির দিকে মুখ ফেরালেন। এই বছরে মায়াকভস্কির আত্মহত্যার সঙ্গে একটি পর্যায় শেষ হয়ে গিয়ে আরেক পর্যায়ের স্বরু হল। এই পর্যায়ে রাজনীতিতে যেমন আন্দোলনের চেয়ে সংগঠনের ওপর দৃষ্টি ছিল, কবিতার ওপরও তেমনই নানারকম অনুজ্ঞা জারি হল—যার ফলে কবিদের পক্ষে নতুন নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা আর সম্ভব ছিল না, কবিতাতে কোন ব্যক্তিগত সুর ইত্যাদি নিষিদ্ধ হল। নতুন কবিরও উদ্ভব হল না এই পরিবেশে। পুরানো কবিদের মধ্যে আখমাটোভা, মাণ্ডেলস্টাম ও পাস্তেরনাক চুপ করে গেলেন।

পাস্তেরনাকের কাব্যভূমিকা একটু স্বতন্ত্র ধরণের। তাঁর প্রথম বই বেরোয় ১৬৪১-য়, ১৯১৭ ও ১৯২২-র মধ্যে তিনি প্রচুর লেখেন, কিন্তু বিরূপ সমালোচনা সত্ত্বেও তিনি কোনো আন্দোলনের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করতে পারেন নি। ১৯৩৪-এ সাহিত্যের ওপর সরকারী বাধা নিষেধ প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কাব্যের কলম চুপ করে যায় ন' বছর। ১৯৪৬-এ জড়ানভের বিরূপ খবরদারির (এই বলে যে, সরকারী ফতোয়া থেকে অনেক কবি বিচ্ছিন্ন করছেন নিজেদের কাব্যধারা যা ভীষণ অন্যায় ইত্যাদি) পর আবার তিনি চুপ করে যান ১৯৫৩ সালে স্ট্যালিনের মৃত্যুকাল পর্যন্ত। তারপরে তাঁর কবিতা পুনঃ প্রকাশিত হয়েছে, এবং তাঁর উপন্যাস 'ডাঃ জিভাগো'র সঙ্গে গ্রথিত কবিতাগুচ্ছ সারা বিশ্বের আদরণীয় সম্পদ হয়ে তাঁর কাব্যে সব আন্দোলনেরই ছাপ আছে। সবার উপরে কিন্তু তাঁর স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আমাদের দৃষ্টি এড়ায় না। কবিতায় তিনি যেন পুশকিন, টিউটশেভ, ল্যারমণ্টভ ও ব্লকের ধারায় অবগাহন করে, সেই ধারাকেই আরো বহু দূর এগিয়ে দিলেন।

স্ট্যালিনের আমলে টভারডভস্কি, মার্গারিটা আলিগার প্রমুখ কবিরা স্বাধীন কাব্যকৃতির চেষ্টা করলেও, জডানোভের খবরদারির পর কাব্য আর এগোয় নি।

স্ট্যালিনের শেষ পর্যায়ে একজন শক্তিশালী কবির আবির্ভাব হয়—তিনি হলেন বহু আলোচিত ইয়েভতুশেংকো। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে আরো অনেক কবির দেখা মিলছে। তবে যেহেতু তিনি নতুনকালে জন্ম নিয়েছেন, আন্দোলনের যুগের সংঘাত তাঁর কবিতায় আশা করা যায় না। পরিবর্তে আমরা পেয়েছি আত্মকথনমূলক 'জিমা জংশন', কিংবা 'জন্মদিন' 'রংবাহার ইত্যাদি কবিতাগুলি। মায়াকভস্কির মত সোচ্চার তিনি, তাঁর ভাষা মাঝে মাঝে আটপৌরে, তবু এসেনিনের সারল্যও আছে তাঁর কবিতায়। রুশ কবিতার সেই বৈশিষ্ট্য তাঁর মধ্যেও আছে যার ফলে অতি সহজেই তিনি সামাজিক দিক থেকে ব্যক্তিগত চিন্তায় চলে যান, বক্তৃতার ভাষা থেকে লিরিক মাধুর্যে স্বরবদল করেন—এবং এর সবগুলিই ঘটে একটি কবিতায়।

পাঠপঞ্জী

(১) **Yevtushenko—Selected Poems—Penguin**
(২) **Russian Verse—Penguin**

স্কেচ—শ্যামল বসু

সমরসেট মম

অনুবাদ :—আভা পাকড়াশী

জয়-পরাজয়

শহর থেকে ফেরার পথে বিকেল বেলা উনি একবার ক্লাব হয়ে বাড়ী ফেরেন। এটাই হেনরী গারনেটের অভ্যাস। ক্লাবে ব্রীজ খেলা হয়। উনি বেশ শান্ত মেজাজে খেলেন। হেরে গেলেও ক্ষেপে যান না এটাই ওঁর বৈশিষ্ট্য। হারেনই বেশী। বাই চান্স কখনো কখনো জিতেও যান। তবে সেটা ওঁর খেলার কৌশলে নয়। ভাগ্যগুণে। ওঁর যে পার্টনার হয় সেও অসঙ্কোচে খেলে যায়, তার সাংঘাতিক ভুলগুলোও উনি একরকম নির্বিবাদেই মেনে নেন।

এ হেন শান্ত মানুষ সেদিন তাঁর পার্টনার ভদ্রলোককে যখন বিরক্তিভরে বলে উঠলেন, তোমার মত বাজে খেলিয়ে আমি আর দেখিনি। সে সেটা হজম করে আবার একটু পরে যখন ইসারায় তাঁর একটা ভুল শুধরে দিতে গেল তখন আবার তিনি ভীষণ রেগে উঠলেন, চোখ গরম করে বললেন—কক্ষণো আমার ভুল হয়নি। ঠিকই করেছি আমি।

যাঁকে বললেন তিনি ওঁর খুবই বন্ধু। তাছাড়া অন্য সকলেও তাঁর এই মেজাজ গরমে বিশেষ কিছু মনে করল না, কিন্তু এই অসন্তোষের হেতুটা কি জানার জন্য তাঁকে প্রশ্ন করল :—

—আজ বাজার কেমন ?

—একেবারে টল্‌টলা বাজার—হাড় কেপ্পনগুলোও টাকা বানাচ্ছে। তারা বুঝল, নাঃ, সেয়ার মার্কেট তাহলে এই রাগের কারণ নয়। হেনরী গার্ণেট একজন ব্রোকার, নাম করা একটা ফার্মের পার্টনারও বটে। তাই ওরা ভেবেছিল নিশ্চয়ই সেয়ার বাজারের তেজী মন্দিতে বন্ধুর কিছু স্বার্থ হানী হয়েছে, তবে তা যখন নয় তখন হলটা কি ?

এমন হাসি খুশী মানুষটা সকলের ওপর গল্প চড়িয়ে কথা বলে, খেলতে বসে অকারণেই হেসে ঘর ফাটায়! আজ কিনা সে গোমড়া মুখে ভুরু কুঁচকে বসে আছে? মুখটাও যেন ঝুলে পড়েছে! অথচ মানুষটার স্বাস্থ্য বেশ ভাল। প্রচুর টাকা পয়সা আছে। বাড়ীতেও কোন অশান্তি নেই। স্ত্রী ছেলে মেয়ে সকলেই ওর প্রিয়, তবে! ওরা জানে গারনেট তার বড় ছেলে সম্বন্ধে আলোচনা করতে বেশী ভালবাসে তাই প্রশ্ন করল—হ্যাঁ হে হেনরী! তোমার ছেলের কি খবর ?. এবার টুর্ণামেণ্টেও নিশ্চয়ই খুব ভাল করেছে; কি বল ?

হেনরী গারনেটের ভুরু দুটো কিন্তু আরও কুঁচকে গেল। বলল—

—আমি যতটা আশা করেছিলাম, ততটা কিছু নয়।

—কবে ফিরবে, মণ্টে থেকে ?

—কাল রাত্রেই ফিরেছে।

—খুব হৈ চৈ করে এলো কি বল ?

—তা আর নয়, তবে এবার নিজের বুদ্ধিতে নিজেই বোকা বনে এসেছে।

—কি রকম ? ব্যাপার কি ?

—দেখ তোমরা কিছু মনে কোর না, এই বিষয় কথা বলতে আমার সত্যি ভাল লাগছে না। বাইরে সবুজ লনের দিকে চেয়ে রইলেন তিনি। আর ওঁরা তিনজন উৎসুক ভাবে ওকে দেখতে লাগলেন।

—আচ্ছা এবার তোমার ডাক, গারনেটের পার্টনার বললেন। নিঃশব্দে খেলা চলতে লাগল। কিন্তু গারনেট এত বিচ্ছিরিভাবে খেলছিলেন দু-বারই তিনি হেরে গেলেন। তিনবারের বার ওঁর অমনোযোগীতায় অল্পের জন্য রবারটা মিস্ করে যাওয়াতে ওঁর পার্টনার বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞেস করল,—হেনরী তোমার আজ কি হয়েছে বলতো ? একেবারে বোকার মত খেলছ কেন তুমি!

হাতের কাছে এসেও রবারটা না হওয়ায় অন্যদিনের মত তাঁর আফশোষ হল না।' কিন্তু তার জন্য বেচারী পার্টনার হেরে যাওয়ায় ওঁর খুব খারাপ

লাগল—বললেন—থাক, আজ খেলব না। গোটাকতক রবার করতে পারলে আমার মনটা একটু ভাল হত কিন্তু মন দিয়ে যে আমি খেলতেই পারছি না, কি করব তার। সত্যি বলছি আজ আমার মেজাজটা যেন কেমন খিঁচড়ে রয়েছে।

ওরা সব হো হো করে হেসে উঠল। বলল তার চেয়ে গারনেট তোমার মনের ঝালটা আমাদের বলে মিটিয়ে ফেল। আরাম পাবে।

ওদের দিকে চেয়ে একটু মুচকি হাসলেন গারনেট। তারপর বললেন—তোমাদের আর কি! আমি বাজি রেখে বলতে পারি আমার অবস্থায় পড়লে তোমাদেরও এমনি মেজাজ হত। বেশ তো আমাকে একটু পরামর্শ দাও না, কি করি আমি। ভারী মুস্কিলে পড়েছি।

—দাঁড়াও গলাটা ভিজিয়ে নি একজন K. C. আর একজন সার্জেন, অন্যজন হোমরা চোমরা অফিসার, আরে আমরা যদি না সাজেসন্ দিতে পারব তো কে পারবে?

K. C. উঠে বেল বাজালেন। ওয়েটার এলো। কিছু মদ্য এলো। এবার হেনরী গারনেট তাঁর বন্ধুদের সামনে এই গল্পটি তুলে ধরলেন।

ব্যাপারটা তাঁর একমাত্র ছেলে নিকোলাস কে নিয়ে। তার ডাক নাম নিকি। উপস্থিত তার বয়েস আঠারো। ওছাড়া গারনেটএর দুটি মেয়ে আছে। তাদের বয়েস যথাক্রমে ষোল আর বার। যদিও বাপেরা মেয়েদেরই সাধারণতঃ বেশী ভালবাসে উনিও এদের জন্মদিনে বেশ দামী দামী ভাল উপহারই দিয়ে থাকেন কিন্তু সেটাই তো সব নয়? সত্যি বলতে কি তাঁর টানটা যেন নিকির ওপরেই বেশী যদিও সে ছেলে তবু। অবশ্য কারণ আছে তার। নিকির সঙ্গে সঙ্গে যেন তিনি আবার অতীত জীবনে ফিরে যান। বেশ লাগে তার। অবশ্য নিকির মত গুণের ছেলেকে ভালবাসা মোটেই দোষের নয়। অমন ছেলে সত্যিই মা বাপের গর্ব। চেহারাটাও তেমনি সুন্দর। এখনই সে ছ ফুট দু ইঞ্চি লম্বা। রোগার ওপর বেশ মজবুত গড়ন। চওড়া কাঁধ সরু কোমর। মাথার সুন্দর গড়নটি বেশ একটা ব্যক্তিত্ব এনে দিয়েছে তাকে। হালকা সোনালী রংএর ঢেউ খেলান চুল, টানা ভুরুর নীচে লম্বা লম্বা ঘন পাতায় ঘেরা নীল চোখ। স্বাস্থ্যে উজ্জ্বল লাল ভরাট মুখ। হাসলে ঝকঝকে দুধসাদা দাঁতের সারিটি দেখা যায়। মোটেই লাজুক নয় সে, কিন্তু সুন্দর একটি সৌম্য ভাব আছে ওর মধ্যে যা সত্যি আকর্ষণ করে অন্যদের। তাকে দেখলেই মনে হয় ছেলেটি বেশ সৎ স্বভাবের, উঁচু মনের

ছেলে। তার চলায় বলায় বেশ একটা আভিজাত্যের প্রকাশ আছে কিন্তু মোটেই অহঙ্কারী নয়। বিনয়ী, নম্র; অথচ বেশ হাসাতে পারে। রসিক কিন্তু ছ্যাবলা নয়। বড় ঘরে ভাল মা বাপের আওতায় যে মানুষ হয়েছে এটা বুঝতে মোটেই অসুবিধে হয় না। মা বাপ ছেলের কাছে যা আশা করে তা সে সবই দিয়েছে। খুব সুনাম পেয়েছে স্কুলে। একরাশ প্রাইজ পেয়েছে সে প্রতিবছর। ফুটবল টীমের ক্যাপ্টেন হয়েছিল। এছাড়া সে মাত্র চোদ্দবছর বয়েসে চমৎকার লন্ টেনিস খেলতে পারে। ছেলের এই কৃতিত্বে বাপ তো মহাখুশী। তার ছুটির দিনে প্রফেসনাল প্লেয়ার রেখে আরও ভাল করে খেলা শেখাতে লাগলেন। মাত্র ষোল বছর বয়েসে সে অনেকগুলো টুর্নামেণ্ট জিতে এলো। হেনরী গারনেট নিজে একজন লন টেনিস প্লেয়ার, কিন্তু ছেলে তাঁকে ছাড়িয়ে গেল। আঠার বছর বয়েসে কেম্ব্রিজে পড়তে গেল। ওঁর খুব আনন্দ হল এবার তাঁর ছেলে ইউনিভার্সিটির হয়ে খেলবে। ভাল টেনিস প্লেয়ার হতে গেলে যা কিছু গুণ থাকা দরকার তার সবই নিকির ছিল। সে খুব চটপটে, টাইমিংএর জ্ঞান তার তীক্ষ্ণ, সে বেশ লম্বা, অনেক উঁচু পর্যন্ত লাফাতে পারে। বল কোন দিক আসতে পারে সে ক্যাল-কুলেশন তার আছে। তার ফোর হ্যাণ্ড ড্রাইভ লো, লঙ, এগুলো তো দেখার মত, চমৎকার সার্ভ করতে পারে। শুধু ব্যাক হ্যাণ্ডটা তার ভাল নয় দেখে গরমের ছুটিতে ইংল্যাণ্ডের বেষ্ট টিচারকে রেখে দিলেন মিঃ গারনেট। এই শিক্ষানবিশীতে আরও নিখুঁত হবে ওর খেলা। ওঁর আশা ছেলে তাঁর Wimbledon ও খেলবে কে বলতে পারে তারপর যদি তাকে Davis Cup-এ খেলার জন্য ডেকে নিয়ে যায়? তিনি কল্পনায় দেখতে পান ছেলে তাঁর খেলার শেষে বিজয়ী হয়েছে। খেলায় হারিয়ে দিয়ে সেও অ্যামেরিকান চ্যাম্পিয়ানের সঙ্গে খেলার শেষে হাত মিলিয়ে, মাথা উঁচু করে, জোর দমে যেন বেরিয়ে আসছে।

উনি নিজে একজন পরিশ্রমী ভাল টেনিস প্লেয়ার ছিলেন। Wimbledon-এ যথেষ্ট যাতায়াত ছিল। সেইসূত্রে টেনিস জগতের অনেকের সঙ্গেই রীতিমত পরিচিত উনি। কিছু বন্ধু আছে ওঁর। শহরের একটা ডিনার পার্টিতে তাঁর পাশেই পেয়ে গেলেন বন্ধু কর্ণেল বারবারান কে। ইনিও ঐ টেনিস জগতের মানুষ। কথায় কথায় নিকির কথা উঠল। গারনেট বললেন পিটির ইউনিভার্সিটির হয়ে খেলবার খুব চান্স আছে। উত্তরে কর্ণেল বারবারন বললেন—

ওকে ওই স্প্রিং টুর্নামেণ্টে মণ্টে-কার্লোতে পাঠালেনা কেন?

—ওঃ এখনো সে সময় আসেনি। এখনো ওর উনিশ বছর বয়েসই হয়নি। এই অক্টোবরে সবে মাত্র কেম্ব্রিজে ভর্ত্তি হয়েছে। অতো সব বাঘা বাঘা প্লেয়ারদের সঙ্গে পারবে নাকি ও?

—বাঃ তাতে কি হয়েছে? না হয় ফার্ষ্ট রেট প্লেয়ারদের সঙ্গে খেলেই আসুক। বুঝুক সি-সাইড টুর্নামেণ্ট কিরকম হয়। কতবড় একটা অভিজ্ঞতা হবে ওর। যদিও Austin আর Von Cramm এর মত প্লেয়ারদের সঙ্গে পেরে ওঠা ভার, তবু আমার বিশ্বাস একটা দুটো খেলায় ও চান্স পাবেই। ছেলেমানুষ ছেলে, দুটো তিনটে ম্যাচে জিতলেই যথেষ্ট।

—বছরের মাঝখানে কেম্ব্রিজ থেকে ছুটি নিলে ওর পড়া শোনার ক্ষতি হবে। এমনিই আমি ওর কানে অনবরত জপছি—টেনিসখেলাটাই একটা খেলাই, পড়াশোনার ওপর এর স্থান দিওনা। তাই ভাবিওনি এটা।

কর্ণেল বারবারন উৎসুকভাবে জিজ্ঞেস করলেন, ওর টার্ম শেষ হবে কবে? তাছাড়া মাত্র তিনদিন ওর কামাই হবে। আমাদের ভাল প্লেয়ার বলতে মাত্র দুজন, তারমধ্যে একজন বসে গেলেই গেল। আরও ভাল প্লেয়ার আমাদের পাঠান উচিত। দেখনা, জার্মানী, আমেরিকা তাদের সব বেষ্ট প্লেয়ারদের পাঠায়।

—সে হয় না ভাই। নিকি সেরকম একটা কিছু বেষ্ট প্লেয়ার নয় তাছাড়া ছেলেমানুষ, একা ওকে মণ্টে-কার্লোর মত জায়গায় কি করে পাঠাই বল? এক আমি যদি সঙ্গে যেতে পারতাম তবে একটা কথা ছিল।

—আরে আমি তো যাচ্ছি। ইংলিশ টীমের ননপ্লেয়িং ক্যাপ্টেন হিসেবে যেতেই তো হচ্ছে আমাকে। আমি নজর রাখব ওর ওপর।

—আরে তুমি তো ব্যস্ত থাকবে, এরকম একটা দায়িত্ব আমি তোমার ঘাড়ে চাপাই কি বলে? তাছাড়া ও কখনো বাইরে যায়নি। আমি তো একদণ্ডও স্বস্তি পাবনা ওকে এভাবে ছেড়ে দিয়ে।

কিন্তু হেনরী গারনেট কর্ণেল বারবাজনএর কথায় এত খুশী হয়েছিলেন যে বাড়ীতে এসে স্ত্রীকে সব না বলে পারলেন না। নিজেকেই যেন আশ্বাস দেওয়ার মত করে একবার বললেন—যাকগে, আর একটু ভাল করে প্র্যাকটিস করলে একদিন দেখবে আমাদের ছেলে Wimbledon-এর সেমি ফাইন্যালস্ও খেলছে। কি বল আঁ্যা?

কিন্তু ওঁকে আশ্চর্য করে দিয়ে স্ত্রী বললেন,—তাবলে এত বড় একটা সুযোগ থেকে তাকে বঞ্চিত করবে তুমি? মাত্র আঠার বছরের ছেলে, ও কবে কি অন্যায় করেছে শুনি যে আজ করবে? আর তার জন্য তুমি ওকে মণ্টে-কার্লো পাঠাতে এত ভয় পাচ্ছ?

—না, পরীক্ষার আগে এভাবে ছুটি নেবার কোন মানে হয় না।

—মাত্র তিন দিনে কি যাবে আসবে শুনি?

একটা নিঃশ্বাস ফেলে উনি কল্পনা করতে লাগলেন যদি Austinএর শরীর খারাপ হয়, কিম্বা Von Crammএর খেলায় বাধা পড়ে। আর নিকি যদি সেখানে চান্স পেয়ে যাবে? কিন্তু এগুলো যে ঘটবেই এমন তো নয়। মুখে বললেন—নাঃ সে হয় না। যা বলেছি তাই হবে।

মিসেস গারনেট আর কোন উপায়ান্তর না দেখে ছেলেকে সব জানালেন। একথাও লিখে দিলেন, বাবাকে খুব করে লেখ, এটা তোমার লাইফ চান্স।

ছেলেও তেমনি বাবাকে খুব মিষ্টি করে লিখল, যে আমাদের এখানকার টিউটারও যেতে বলছেন আমায়। তিনি নিজে একজন টেনিস প্লেয়ার তাই ব্যাপারটার গুরুত্ব দিচ্ছেন। তুমি যদি হ্যাঁ বল, তবে আমি যাই। আমি কথা দিচ্ছি ফিরে এসে আমি খুব মন দিয়ে পড়াশুনো করে পরীক্ষায় ঠিক ভাল রেজাল্ট করব, তুমি দেখো। তাছাড়া পরের টার্ম তো রয়েছেই হাতে, মেকাপ করবার যথেষ্ট সুযোগ পাব।

মিসেস গারনেট স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়েই বুঝলেন চিঠিটা খুব মিষ্টি করেই লিখেছে পিচি।

কিন্তু ওঁর দিকে চিঠিটা ছুঁড়ে দিয়ে মিঃ গারনেট বললেন—নাও ধর।

—আচ্ছা, তোমাকে আমি গোপনে একটা কথা বললাম, আর তুমি কিনা সেটা ছেলেকে লিখে দিলে? এখন ও নাচছে যাবে বলে? তুমিই ওকে নাচিয়ে দিয়েছ।

—না আমি ওকে তা বলিনি—আমি তো শুধু কর্ণেল বারবাজনএর ওর সম্বন্ধে কি আইডিয়া শুধু সেটুকু লিখেছি। দুঃখিত ভাবে আবার বলেন—কে জানে বাপু কেউ কারু নিন্দে করলে তাকে সেটা বললে দোষ হয় না আর প্রশংসার কথাটা বললেই দোষ? তবে তার যাওয়া সম্ভব নয়, এ কথাও আমি তাকে পরিস্কার করে লিখেই দিয়েছিলাম।

—ছিঃ, তুমি আমাকে একটা বিশ্রীরকম ফলস্ পজিসনে ফেললে। ও ভাববে

আমিই বুঝি গোঁয়োতুমী করে ওকে যেতে দিচ্ছি না। ওর উন্নতির পথে আমিই মস্ত বড় বাধা।

—না, না, তা কেন ভাববে ও, আমি বলছি, তুমি দেখ, ওরই ভালর জন্য যে তুমি বারণ করছ সেটা ও নিশ্চয়ই বুঝবে।

মিসেস গারনেটের কিন্তু ভারী হাসি পাচ্ছিল। মনে মনে তিনি বুঝেছিলেন যে যুদ্ধে তাঁরই জিত হয়েছে। করুণাও হচ্ছিল তাঁর, ভাবছিলেন পুরুষমানুষকে নিজের মতে আনা কতটা সোজা, ইস বেচারা বুঝতেও পারল না যে তাঁরা মা ছেলেতে কী চালাকীটা খেললেন ওঁর সঙ্গে। এরপরও প্রায় আটচল্লিশ ঘণ্টা যুঝেছিলেন মিঃ গারনেট। তারপর মত বদলাল। দিন পনেরর মধ্যেই নিকি লণ্ডনে এলো। তার পরদিনই ও মণ্টি কার্লো রওনা হবে। ডিনার শেষ যখন সবাই উঠে গেল সেই সুযোগে ছেলেকে একা পেয়ে গারনেট তাকে কয়েকটি মূল্যবান উপদেশ দিলেন। বললেন—তোমাকে এই বয়েসে, একা একা, বিশেষ করে মণ্টে কার্লোর মত জায়গায় পাঠাতে আমার একটুও ভাল লাগছেনা নিকি। শুধু আমার এইটুকু সান্ত্বনা যে তোমার বিবেচনা আছে, আর বুদ্ধি আছে। গুরুগম্ভীর বাবা হতে পারবনা আমি। তোমার সঙ্গে আমার সে রকম সম্পর্কও নয়। তবে শুধু তিনটে বিষয় আমি সাবধান করে দিতে চাই—এক নম্বর হল জুয়োখেলা, কখনো জুয়ো খেলবেনা। দু নম্বর হল টাকা, কাউকে টাকা ধার দেবেনা। আর তিন নম্বর হল মেয়েছেলে,—কোন দরকার নেই তোমার মেয়েছেলের সঙ্গে মেশার। এই তিনটে বিষয় যদি সাবধান থাকো তো সহজে বিপদে পড়বেনা। এই তিনটে কথা সব সময় মনে রেখ।

—নিশ্চয়ই মনে রাখব বাবা। একটু হাসে নিকি।

—আমার যথেষ্ট বয়েস হয়েছে; দুনিয়াটা বেশ চিনি, তাই আমার এই উপদেশটা যথেষ্ট মূল্য আছে, এটাতো মানো?

—আমি তোমার কাছে প্রতিজ্ঞা করছি বাবা, কখনো তোমার উপদেশ ভুলে যাবনা।

—লক্ষ্মী ছেলে। চল এবার তোমার মার কাছে চল।

মণ্টে কার্লো টুর্নামেণ্টে নিকি Austin Von Cramm কাউকেই অবশ্য বিট করতে পারল না কিন্তু তার খেলার যে যোগ্যতা আছে এটা স্বীকার করতে বাধ্য হল সবাই। শেষে একটা স্প্যানিস প্লেয়ারকে রীতিমত হারিয়ে দিল ও। একজন অষ্ট্রীয়ানএর সঙ্গে ক্লোজার ম্যাচ খেলল। মিক্সড্ ডাবল্‌স ও সেমি ফাইন্যাল হল।

তার খেলার ধরণে, আচার ব্যবহারে, সে সকলকার মন কেড়ে নিল। কর্ণেল বারবাজন্ তো মহা খুশী, তাকে সাবাস দিয়ে বললেন, এই রকম বড় প্লেয়ারদের সঙ্গে খেলে আর রীতিমত প্র্যাকটিস করে আর একটু বড় হয়ে নাও নিকি তখন তো তোমার বাবার তোমার জন্য গর্বে পা পড়বে না মাটিতে। টুর্নামেন্ট শেষ হয়ে গেল। পরদিন সকালের প্লেনে লণ্ডন ফিরে যেতে হবে। এই কদিন সে তার মনপ্রাণ ঢেলে খেলেছে। সামান্য কিছু খেয়েছে, তাড়াতাড়ি ঘুমোতে গেছে, মোটেই ড্রিঙ্ক করেনি। আজ শেষ রাত্রে নিকি ভাবল একটু একটু ঘুরে ফিরে দেখবে মণ্টে কার্লোকে। এত সব শুনেছে, যদি এলো তো দেখবেনা? টেনিস প্লেয়ারদের একটা অফিসিয়াল ডিনার দেওয়া হল। ডিনার শেষে ওদের কয়েকজনের সঙ্গে ও স্পোর্টিং ক্লাবে গেল। এই প্রথম সে এখানে এল।

সিনেমায় ছাড়া সে এর আগে রুলে খেলা চাক্ষুষ কখনো দেখেনি। একটা সবুজ চাদরের ওপর একরাশ টাকা পয়সা ছড়ান। একজন লোক একটা চাকা জোরে ঘুরিয়ে দিচ্ছে, তারপর টিপ করে ঠিক সেই চাকাটার মাঝখানে একটা বল ছুঁড়ে দেয়। যে নম্বরে এসে বলটা থামছে সেই নম্বরের লোকটা হারছে বা জিতছে। খানিকক্ষণ দেখে তার ভাল লাগলনা। একঘেঁয়ে। অন্য ঘরে এসে দেখল চকচকে পেতলের রেলিংএর এধারে একরাশ লোক। ওদিকে একটা টেবিল ঘিরে নজন লোক বসেছে। বাকারো খেলা। তাসের বাজী হচ্ছে। হাজার হাজার টাকার লেন দেন হচ্ছে মাত্র মুখের কথায়। ভাব-লেশহীন মুখে দেখছে নিকি, কারণ সেতো আর খেলছেনা যে হারজিত নিয়ে মাথা ঘামাবে? কিন্তু হিসেবী ঘরের ছেলে সে, এমন বেহিসেবী ব্যাপার জীবনে কখনো দেখেনি, আশ্চর্য! যে হারছে সেও অতগুলো টাকা হারিয়ে শোক করছে না, আবার যে জিতছে তারও কোন উল্লাস নেই সবটাই যেন একটা বিরাট ঠাট্টা, শুধুই মজা। ভারী অবাক লাগে নিকির। একজন বন্ধু এসে জিজ্ঞেস করল—

—জিতেছ কিছু?

—আমি খেলছিলামই না।

—বুদ্ধিমানের কাজ করেছ। বাজে খেলা। চল একটু ড্রিঙ্ক করিগে।

—বেশ, চল।

—মণ্টে ছাড়ার আগে একবার নিজের ভাগ্য পরীক্ষা করবে না? একশো ফ্রাঁতে আর তোমার কি যাবে আসবে?

—না। আমার বাবা তিনটে জিনিষ বারণ করেছেন। তার মধ্যে একটা হল জুয়ো খেলা।

বন্ধুর কাছ থেকে ছাড়া পেয়ে নিকি ঘুরতে ঘুরতে আবার এসে সেই রুলে খেলার সামনে দাঁড়াল। ওঃ কত টাকা! থাক দিয়ে দিয়ে সাজাচ্ছে! যারা জিতছে তারা দুহাত ভরে নিয়ে যাচ্ছে। নেশা লেগে যায় দেখতে। দেখতে। বন্ধু কিন্তু মিথ্যে বলেনি, মণ্টেতে এসে জুয়ো না খেললে অভিজ্ঞতাটা কি হল? এই তো ভাগ্যপরীক্ষার বয়স। মনে মনে ভাবে, বাবার কাছে তো আর প্রতিজ্ঞা করিনি যে জুয়ো খেলব না, বলেছি তাঁর উপদেশ ভুলে যাবনা। দুটো কথা তো আর এক নয়? এক কি? শেষপর্য্যন্ত একটু দ্বিধাগ্রস্তভাবে পকেট থেকে একটা একশো পাউণ্ডের নোট বার করল। তারপর আঠার নম্বরে বাজী ধরল। কারণ এটাই তার বয়েস। তারপর উদগ্রীব হয়ে লক্ষ্য করতে লাগল চাকাটা কোন দিকে ঘুরছে। বুকটা ধুকধুক করছে তার। সাদা বলটা যেন একটা ক্ষুদে শয়তান কে জানে কোনদিকে যাবে? উঃ চাকাটা বড় আস্তে আস্তে ঘুরছে, এইবার কাঁপছে চাকাটা, থেমে আসছে, বলটাও খুব ধীরে গড়াচ্ছে, তার চোখদুটো যেন বেরিয়ে আসছে, ওকি ওটা যে আঠারতেই এসে কাঁপতে থাকবে এটাতো সে স্বপ্নেও ভাবেনি। একরাশ টাকা জিতল নিকি, উত্তেজনায় থরথর কাঁপতে লাগলে তার হাত। কাঁপা কাঁপা হাত রেলিংএর ফাঁক দিয়ে গলিয়ে দিয়ে সে টাকাগুলো নিল। এত অভিভূত হয়েছিল যে চাকাটা দ্বিতীয়বার ঘোরার সময় আবার ও কিছু রাখতেই ভুলে গেল। ভাবল থাকগে একবারই যথেষ্ট। কিন্তু আশ্চর্য বলটা আবার সেই আঠারর ঘরেই থেমেছে।

—আরে আপনি যে আবার জিতে গেলেন। নিকির পাশের লোকটি উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বলল।

—আমি? আমি তো কিছু রাখিইনি চাকার ওপর।

—নাইবা রাখলেন, ওরিজিন্যাল কলতো আপনার, বারণ তো আর করেন নি, সুতরাং আপনার প্রাপ্য আপনি পাবেন। জানেন না নিয়ম?

আবার একরাশ খুচরো টাকা পেলো ও। মাথা ঘুরতে লাগল নিকির। গুণে দেখল সবশুদ্ধ তার সাতহাজার ফ্রাঁ হয়েছে। বেশ মজা তো! টাকা রোজগার কার করার সবচেয়ে সহজ উপায়। আনন্দে চক চক করে তার চোখদুটো। সেই দৃষ্টি মিলে যায় পাশের মেয়েটির সঙ্গে। সে একটু ভাঙ্গা ইংরিজীতে বলে, তোমার বরাত ভাল, বেশ জিতলে।

—হ্যাঁ আমি নিজেই বুঝতে পারছিনা কি করে জিতলাম। এই প্রথম খেললাম কিনা?

ধীরে ধীরে বুঝবে। আচ্ছা শোনো আমাকে তুমি একহাজার ফ্রাঁ ধার দেবে? আমি আধঘণ্টার মধ্যে তোমায় শোধ করে দেব।

—বেশ নাও।

আর কথা নয়, মেয়েটি ওর টাকার তাড়া থেকে হাজার ফ্রাঁ তুলে নিল।

—পাশের সেই লোকটি বলল ও আর আপনি ফেরত পেয়েছেন।

একটু দুঃখ হল নিকির, বাবা তাকে টাকা ধার দিতে বারণ করেছিলেন। আর সে জন্মে যাকে কক্ষনো দেখেনি তাকেই কিনা এক কথায় ধার দিয়ে বসল। কিন্তু এখন এই মুহূর্তে তার কাছে টাকার যেন কোন একটা বিশেষ মূল্যই নেই। উত্তেজনার বুঁদ হয়ে আছে সে। সুতরাং আরও একজন সে এই উন্মাদনার আনন্দ থেকে বঞ্চিত করে কেন? আর এখনো তো ছ হাজার ফ্রাঁ তার হাতে। আবার খেলে আরও জিতে নেবে। ফের টাকা রাখল, বড় বোনের বয়েস ষোল, ষোল নম্বর, বেকার গেল। তারপর ছোট-বোন বার, বার নম্বরও অমনি গেল। সব ফ্রাঁ গেল তার খেলতে খেলতে। কিন্তু আবার সে জিতল। এবার এত ফ্রাঁ পেল যে, দু পকেটে ধরছেনা। কারেন্সি অফিসে গেল খুচরোগুলো ফেরত দিয়ে নোট করতে। কুড়ি হাজার ফ্রাঁর নোট যখন তার সামনে ধরে দিল, তখন তার মনের অবস্থা অবর্ণনীয়। একসঙ্গে এতটাকা সে জীবনে হাতে পায়নি। এখানেই আবার তার সেই মেয়েটির সঙ্গে দেখা।

—আরে তোমাকে আমি ছিষ্টি খুঁজে বেড়াচ্ছি তুমি আমাকে কি ভাবছ এই ভেবে যা লজ্জা করছিল না আমার। নাও তোমার টাকা। সত্যি অনেক ধন্যবাদ।

নিকি বেশ একটু অবাক হয়ে গিয়েছে। বাবা তাকে জুয়ো খেলতে মানা করেছিলেন, ও খেলেছে, কিন্তু জিতেছে। টাকা ধার দিতে না করেছিলেন, দিয়েছে, কিন্তু ফেরত পেয়েছে। এর মানে তিনি তাকে যা ভাবেন অতটা বোকা সে মোটেই নয়।

—কি ব্যাপার, হল কি তোমার?

—নাঃ তেমন কিছু নয়। টাকাটা যে ফেরত পাব সেটাই আমি ভাবিনি এই আর কি।

—ছিঃ, এর মানে তুমি আমাকে একটা জোচ্চোর মেয়ে ভেবেছ!

ভারী লজ্জা পেল নিকি। উত্তর দিল।

—আরে না না মোটেই তা নয়।

—আমাকে দেখলে কি তাই মনে হয়? দুষ্টু হাসি মেয়েটির মুখে।

—বারে? তা কেন?

চেয়ে দেখে মেয়েটির দিকে, তার চেয়ে বড় জোর বছর তিন চারের বোধহয় বড় হবে মেয়েটি। কালো রংএর একটা সাধারণ ফ্রকেই ওকে বেশ মানিয়েছে। হাল্কা শরীর, চুলে ঘেরা মুখটা বেশ মিষ্টি। রোগা কিন্তু শুকনো চেহারা নয়। ভরাট গলায় একটা সোনার মটর মালা। মুখে বেশ একটা বন্ধুত্বের হাসি। বলে আমার স্বামী মরক্কোতে আছেন। কাজ করেন সেখানে। আমার একটু চেঞ্জের দরকার ছিল, তাই আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন মণ্টে-কার্লোয়।

—আমি তো আজই চলে যাচ্ছি। আর কি বলবে ভেবে পায়না নিকি।

—এক্ষুনি চলে যাবো?

—এক্ষুনি মানে এই কাল সকাল বেলার প্লেনে লণ্ডনে ফিরব।

—ও আজই তো তোমাদের টুর্নামেণ্ট শেষ হল। না?

—তুমি দেখেছ নাকি আমার খেলা?

—হ্যাঁ, প্রায় বার তিনেক দেখেছি তোমার খেলা। সুন্দর খেলার ষ্টাইল তোমার। তাছাড়া সর্বোপরি তোমাকে বেশ মানায়।

—নিকি ভাবে টাকা ধার দিয়েছিলাম তাই একটু খোসামোদ করছে।

—তুমি এখানকার নিকার-বোকার দেখছে?

—না আমি কিছুই দেখিনি।

—বাঃ তুমি সেখানে না গিয়েই লণ্ডনে ফিরে যাবে নাকি?

তাহলে আর মণ্টে কার্লোর দেখলে কি? চলনা আমরা একটু নাচি সেখানে গিয়ে। তাছাড়া আমার ভীষণ ক্ষিধে পেয়ে গেছে, ঘুরে ঘুরে।

নিকি মনে ভাবল। বাবা যদিও মানা করেছিলেন মেয়েদের সঙ্গে মিশতে কিন্তু এতে আর দোষটা কি? এতো একজন ভদ্রমহিলা? এর স্বামীও নিশ্চয়ই সিভিল সার্ভিসে আছেন। তাদের বাড়ীতেও সিভিল সার্ভিসম্যানরা স্ত্রীকে নিয়ে ডিনারে আসেন। অবশ্য যদিও তাঁদের স্ত্রীরা এত অল্প বয়েসী আর এরমত এমন সুন্দরী নয়। মনে একটু দ্বিধা জাগে, শেষে যাক্‌গে, এত টাকা পকেটে আর একটু আনন্দ করবেনা? বলে—

—বেশ, যাচ্ছি তোমার সঙ্গে। কিন্তু বেশীক্ষণ না থাকলে কিছু মনে কোরনা।

—ঠিক আছে। তোমার যখন ইচ্ছে হবে চলে এসো।

নিকার-বোকারে এসে কিন্তু নিকির বেশ ভালই লাগল। ওর সঙ্গে সেও পেটভরে ডিম আর বেকন খেল। এক বোতল শ্যাম্পেন আনিয়ে দুজনে ভাগ করে নিল। ওরা নাচল। মেয়েটি বলল, তুমি বেশ নাচতে পার তো। তোমার সঙ্গে নাচতে আমার একটুও অসুবিধে হচ্ছে না। নিকি ভাবল, কি নরম আর পালকের মত হাল্কা মেয়েটা। গালে গাল ঠেকিয়ে নাচছে তারা। চোখাচোখি হতে মেয়েটি যেন কিরকম করে হাসছে। বুকটা কেমন কেঁপে উঠছে নিকির, ফ্লোরটা লোকে লোকে ভরা। একটি মেয়ে তার ভরাট গলায় বেশ একটা মনমাতানো সুর গেয়ে চলেছে।

—এই! তুমি খুব সুন্দর, একথা তোমায় কেউ কখনো বলেনি?

—কেজানে মনে পড়ছে না। খুব নীচু স্বরে কথা বলছে ওরা।

নিকি মনে মনে ভাবে। মেয়েটির তাকে ভাল লেগেছে। তাকে যে মেয়েদের ভাল লাগে এটুকু বোঝার মত বুদ্ধি তার আছে। এই কথার পর সে মেয়েটিকে আর একটু কাছে টানল। ও চোখ বন্ধ করে মুখটা তুলে ধরল।

—এই। এতগুলো লোকের সামনে তোমায় আমি চুমু খাব নাকি?

নিকি বিল মিট আপ করল। পরিণাম দেখে একটু চমকাল। তবে পকেটে এখনো যথেষ্ট রেস্ত আছে। ট্যাক্সিতে উঠল ওরা। ট্যাক্সিতে উঠেই মেয়েটি কিন্তু জড়িয়ে ধরল ওকে। নিকি চুমু দিল ওকে। মনের মধ্যে বাবার কথাগুলো আর একবার ভেসে গেল। আবার ও মনকে প্রবোধ দিল সেতো আর প্রতিজ্ঞা করে নি শুধু বলেছে তাঁর কথা মনে রাখবে। আর এমন সুন্দর ছোট্ট একটা মিষ্টি মেয়ে—নিজে এসে ধরা দিচ্ছে—আবার ভাবে কেন এমন করছে? তার কারণ মনে হয় বেচারীর স্বামী বিদেশে। মেয়েটির হোটেল এসে গেল। ও বলল—

—আমি এবার হেঁটে আমার হোটেলে ফিরব। ঐ গরম ঘর থেকে বেরিয়ে খোলা হাওয়া বেশ লাগছে। ট্যাক্সির ভাড়াও ঐ দিল।

—মেয়েটি বলল, বেশ তো তাই যেও, তবে যাবার আগে একটি বার আমার ঘরে চল, তোমাকে বেশ একটা সুন্দর জিনিষ দেখাব।

—বলনা কি?

—আমার ছোট্ট একটা ছেলে আছে, তার ফটো।

—ছেলে আছে নাকি তোমার?

—তা নয়তো কি?

—নিকি ভাবে তাকে ও তাহলে নেহাৎ ছেলেমানুষ ভেবেছে। গেল ওপরে। দরজা খুলল ও। কিন্তু ভেতরে ঢুকে ছবি টবি কোথায় কিঁ, ওকে নিবিড় করে জড়িয়ে ধরে, চুমু খেতে লাগল মেয়েটি। নিকির কাছে এই অনুভূতি একেবারে নতুন। এই পাগলকরা নিবিড় উষ্ণ চুম্বনের স্বাদ সে কখনো পায়নি আগে। তবু সেই মুহূর্তেও তার বাবার উপদেশ মনের পর্দায় একবার ভেসে গেল। তারপর সব ভুলে গেল। যৌবন জোয়ারে তলিয়ে গেল নিকি।

প্রায় দু তিন ঘণ্টা গভীর ঘুমের পর হঠাৎ কি একটা শব্দে নিকির ঘুমটা ভেঙ্গে গেলে। কোথায় সে শুয়ে আছে এটা মনে করতেই কিছুক্ষণ সময় গেল। কেমন ধাঁধা লাগছে। ঘরটা কিন্তু একেবারে অন্ধকার নয়। বাথরুমের দরজার তলা দিয়ে একটা আলোর রেশ আসছে। তার মনে হল ঘরে যেন কেউ ঘুরে বেড়াচ্ছে, খুব নিঃশব্দে। এবার তার মনে পড়ল সে কোথায় শুয়ে আর কে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সে একপা একপা করে এগুচ্ছে, আর একটু থামছে, চমকে তার দিকে চাইছে আবার এগুচ্ছে। আবার তার দিকে ফিরে দেখছে, কি করতে চাইছে ও? এবার নিকি দেখতে গেল পা টিপে টিপে সেই ছায়ামূর্ত্তি এগিয়ে চলেছে ঐ চেয়ারটার দিকে। তার জামা কাপড়গুলো ছাড়া রয়েছে সেই চেয়ারে। ছায়ামূর্ত্তি আর কেউ নয় তারই বন্ধু, সেই মিষ্টি মেয়েটি। এবার ধীরে সে প্যাণ্ট-পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিল, বার করে আনল কুড়ি হাজার ফ্রাঁ। উঃ ঐ অতগুলো টাকা, ওগুলো পেয়ে তার কত আনন্দ হয়েছিল। প্যাণ্টটা আবার জামা কাপড়ের তলায় চালান করে দিল। নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, লক্ষ্য করছে তাকে। নিকির ইচ্ছে করছে এক্ষুনি ছুটে গিয়ে মেয়েটির হাত থেকে টাকাগুলো ছিনিয়ে নেয়। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলাল সে, তক্ষুনি মনে পড়ল, ও একটা অজানা অচেনা জায়গায় রয়েছে। এটা পরের ঘর। মেয়েটা যদি তাকেই পুলিশে ধরিয়ে দেয়? কেলেঙ্কারীর একশেষ হবে তাহলে। এই হোটেলে ওর একটা দলও থাকতে পারে। আবার সরছে মেয়েটা একপা দুপা করে। ফিরে ফিরে দেখছে ওকে। মড়ার মত পড়ে আছে নিকি। ঘুমন্ত মানুষের মত জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলছে। কিন্তু পুরো চোখ খুলে চেয়ে আছে মেয়েটার দিকে। ও যখন বুঝল যে না নিকি ঠিকই ঘুমুচ্ছে, তার কাণ্ড বুঝতে পারছে না, তখন নিঃশঙ্ক ভাবে এগিয়ে গেল জানলায় ধারে। জানলার ওপরে একটা সিনেয়ারিয়া ফুলের টব রয়েছে। অমন ফুলসুদ্ধ গাছটা অনায়াসে উপড়ে বার করে নিল, আর হাত গলিয়ে সেই টাকাগুলো ওর ভেতর রেখে আবার গাছটা বসিয়ে দিয়ে আলগা মাটিগুলো

হাত দিয়ে বেশ করে চেপে চেপে ঠিক করে দিল। এবার পেছন ফিরে আবার তাকে দেখে নিয়ে ধীরে ধীরে এসে তার পাশে শুয়ে পড়ল। ঘুম ঘুম আওয়াজে তাকে একবার "ডারলিং" বলে ডাকল। কিন্তু নিকি ঠিক তেমনি করে গভীর ঘুমের ভান করে চলেছে। একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়ল মেয়েটা। অতগুলো টাকা এমন সহজে হাতাতে পেরে মনটা বেশ নিশ্চিন্ত হয়েছে তো?

নিকি কিন্তু ঐ ভাবে পড়ে থেকে চিন্তা করছিল। ভাবছিল মেয়েটা যা বলেছে সব মিথ্যে। ছেলে স্বামী সব বাজে। আসলে এই ওর ব্যবসা। একটা ঠক; জোচ্চোর মেয়ের পাল্লায় পড়েছে সে। ঐ টাকার জন্যই জাল পেতেছিল মেয়েটা তাকে নিয়ে। কিন্তু এখন কি করা যায়? কি করে এই জাল ছিঁড়ে বেরুনো যায়? অতগুলো টাকা এমনি করে ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে? সে কোথায় ভেবেছিল ঐ টাকায় একটা নিজস্ব গাড়ী কিনবে। বাবাকে একটু চমকে দেবে। বেশ সুন্দর একটা সেকেণ্ড হ্যাণ্ড গাড়ী হত। তা কিনা একটা মেয়ের কাছে বোকা বনে গেল ও? আচ্ছা ও যদি চেঁচামিচি করে এই চুরি নিয়ে! কিন্তু তাহলেই বা প্রমাণ করবে কি করে যে এগুলো ওরই টাকা? এই হোটেলেও সে কাউকে চেনে না। শেষে ঐ মেয়েটার গোটাকতক গুণ্ডা বন্ধু এসে যদি পিস্তল বার করে দাড়ায়? মেয়েটা কিন্তু ভীষণ ঘুমোচ্ছে। যেন একটা বাচ্চা মেয়ের মত সরল ওর মুখখানা। কিন্তু কি বিচ্ছু মেয়ে বাবা! হঠাৎ একটা উপায় তার মাথায় এলো।

রোজ এক্সাসারসাইজ করা অভ্যেস আছে তার, তাই অনায়াসেই শরীরটাকে হাল্কা করে ঠিক বেরালের মত নিঃশব্দে একটা লাফ দিয়ে খাট থেকে মাটিতে নামল। তারপর একটু আগে মেয়েটাকে যা করতে দেখেছিল তাই ও করতে লাগল। অতি নিঃসাড়ে ফার্নিচারগুলো থেকে গা বাঁচিয়ে যাতে শব্দ না হয় এমনি করে ধীরে ধীরে সে এগুতে লাগল। তার লক্ষ্য জানলার ঐ সিনেরারিয়া ফুল গাছটা। ঠিক ঐ মেয়েটার মত করেই ও গাছের মাথাটা ধরে তুলল, টাকাগুলো বার করল, আবার গাছটা আগের মত করে বসিয়ে দিল। ও কিন্তু হাতে কাজ করছে, আর নজর রেখেছে ঐ বিছানায় শুয়ে থাকা শরীরটার দিকে। এবার আবার নিঃশব্দে এলো চেয়ারটার কাছে আর টাকার বাণ্ডিলটা প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে দিল। কিন্তু যতক্ষণ না এই অপয়া হোটেলটা থেকে বেরিয়ে আসতে পারছে ততক্ষণ নিশ্চিন্ত নেই। সেই অন্ধকারেই তাড়াতাড়ি কাপড় জামা পরে ও। বিনা আয়নায় টাইটা ঠিক করে বাঁধতে পারবে না। না হল ঠিক করে বাঁধা, কে আর দেখছে

এখন? সব হয়েছে, শুধু জুতোটা, সেটা পরবে না, শব্দ হবে হাতে নিয়ে বেরিয়ে যাবে। নিঃশব্দে দরজার কাছে গিয়ে যেই দরজার একটা খুলেছে অমনি একটা শব্দ হল ক্লিক করে। সঙ্গে সঙ্গে,

—কে? কে ওখানে? চমকে চেঁচিয়ে উঠল মেয়েটা।

—আমি! আমি! আর কেউ না। একেবারে বিছানায় উঠে বসেছে মেয়েটা। বুকটা ধড়াস ধড়াস করছে নিকির। তবু সে সহজভাবেই উত্তর দিল।

—আরে তুমি উঠে পড়লে? আমি ভেবেছিলাম তোমায় জাগাব না। ছটা যে বাজে, আমায় যেতে হবে না। তাই চলে যাচ্ছিলাম।

—ওঃ আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। সত্যিই তো।

আবার শুয়ে পড়ল ও।

—আচ্ছা তুমি যখন উঠেই পড়েছ তাহলে আমি জুতোটা পরেই নিই বিছানার একধারে বসেই জুতোটা পরে নেয় নিকি।

—এই! আমার ভীষণ ঘুম পাচ্ছে। দেখ যেন শব্দ কোরনা যাবার সময়। এই ভোরবেলা শব্দ করলে হোটেলের অন্য লোকেরা বিরক্ত হবে।

—না। করব না। তুমি ঘুমোও। আমি যাই।

—যাবার আগে চুমু দিয়ে যেও আমায়। ঘুম ঘুম আওয়াজে বলে মেয়েটা।

—নীচু হয়ে ওর কপালে চুমু দিল নিকি।

—সত্যি তুমি বড্ড ভাল। Bon Voyage.

এখনো নিকি ভাবছে এখান থেকে না বেরুনো পর্যন্ত স্বস্তি নেই।

বাইরে এসে দম ফেলল নিকি। ভোরের বাতাসে শরীর মন জুড়িয়ে গেল ওর। সে ঘুমন্ত আকাশ; শান্ত নীল সমুদ্র, সবে জেলেরা নৌকা ভাসাচ্ছে। সকালের আলো ফুটছে ধীরে ধীরে। বুক ভরে সেই ভোরের বাতাসে নিঃশ্বাস নিল নিকি। হন হন করে নিজের হোটেলে চলল ও। হোটেলে এসে বেশ করে গরম জলে স্নান করল। নিজের রোজকার এক্সারসাইজ করল। তারপর খেতে গেল। খুব ক্ষিধে পেয়েছিল ওর। পরিজ, বেকন, ডিম, গরমভাজা ফিস রোল, একেবারে মচমচ করছে, চমৎকার লাগল খেতে। তার ওপর তিনকাপ কফি। এবার যেন জুত হল শরীরটা। একটা সিগারেট ধরাল। যথেষ্ট বড় হয়ে গেছে আর যথেষ্ট বুদ্ধি আছে তার। না হলে ঐ খপ্পর থেকে বেরুতে পারে? বিল মেটাল। তার টাকা নয়। বাবার

দেওয়া টাকা দিয়ে এবার মটরে গিয়ে বসল। গাড়ীটা তাকে এরোড্রোমে নিয়ে যাবে বলে অপেক্ষা করছিল।

গাড়ীতে বসে সে তার পকেট থেকে সেই হাজার ফ্রাঁর নোটগুলো টেনে বার করল, তার কত সাধের আর কত মুস্কিলে ফেরত পাওয়া টাকা, আরও যেন মূল্য বেড়ে গেছে তাই। একটা একটা করে ছুঁয়ে ছুঁয়ে বেশ যত্ন করে গুনতে লাগল ও। একি! বেশী হচ্ছে কেন? কুড়ি হাজারের থেকে বেশী হচ্ছে কি করে ছখানা নোট? ছাব্বিশ ফ্রা হচ্ছে যে? বাঃ তাকি করে হবে? আবার গুনল একটা একটা করে, আবারও সেই ছাব্বিশ ফ্রাঁ। কি হল? কেমন করে বাড়ল? লোকটা তো বিশ হাজার ফ্রাঁই দিয়েছিল সেই কাউণ্টারে? তারপর নিকার-বোকারে ও বিল দিয়েছে প্রায় হাজার ফ্রাঁর মত। তা সেতো সেই মেয়েটা যে টাকা ফেরত দিয়েছিল সেই টাকা, এর মাঝে পুরোপুরি বিশ ফ্রাঁই তার ছিল। তবে?

ও হো হো, নিজের মনেই হৈ হৈ করে হেসে ওঠে নিকি, বেশ হয়েছে, ঠিক জব্দ হয়েছে, নিজের মনেই চেঁচিয়ে ওঠে ও। এতক্ষণে ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে ও। সেই ফুলের টবের মধ্যে যা ওর হাতে ঠেকেছে সবই যে তুলে নিয়েছিল তখন। ওটা তাহলে মেয়েটার টাকা। এর মানে তারটাও নিয়েছে আবার নিজেরটাও নিয়েছে ও। কেমন জব্দ। খুব শিক্ষা হবে। সকালে উঠে খুব আনন্দ করে অতগুলো টাকা দেখতে গিয়ে দেখবে একেবারে ফক্কা। নিজেকে খুব বড় হয়ে গেছে মনে করেও কিন্তু, একেবারে ছেলে-মানুষের মত আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে নিকি। উত্তেজনাটা একটু কমলে ভাবে—কিই বা করতে পারে সে? ফেরতই বা দেবে কি করে? না জানে মেয়েটার নাম, না জানে হোটেলটার নাম। মরুক গে যাক। উচিত শিক্ষা হবে মেয়েটার।

হেনরী গারনেট এতক্ষণ ধরে তার বন্ধুদের এই গল্পটি বললেন। বাড়ী ফিরে কাল রাত্রে খেতে বসেছিল নিকি সবার সঙ্গে। তারপর ওর মা বোনেরা উঠে যেতে তাকে একলা পেয়ে সব ঘটনা বলে, শেষে বলেছে—বাবা তোমার উপদেশে কোথাও ভুল আছে। না হলে দেখ—তুমি মানা করেছিলে জুয়ো খেলতে আমি খেলেছি; জিতেছি। টাকা ধার দিতে মানা করেছিলে, দিয়েছি ফেরত পেয়েছি মেয়েদের ব্যাপারে থেকনা বলেছিলে—সেখানেও আমি ছ হাজার ফ্রাঁ জিতে এসেছি। তাহলেই বল? অবশ্য আমি তোমার কাছে

প্রতিজ্ঞা করিনি বলেই এসব করেছি। বড় বড় চোখে আমার দিকে চেয়ে সে তার এই প্রশ্নের জবাব চাইল। এখন আমাকে সে ভাবছে একটা বোকা। সবজান্তার একটা মিথ্যে অহঙ্কার নিয়ে বসে আছি আমি। ছিঃ, আর সে আমাকে আগের মত মান্য করবে না। আগে আমি একটা কথা বললে সেটা ও বাইবেলের সারমনের মত জপ করত আর এখন ?

বন্ধুরা ওয়া কথা বলার ধরণে হো হো করে হেসে উঠল।

—হাসো তোমরা। হাসবেই তো। দুঃখিত ভাবে বলেন, হেনরী গারনেট—দুদিন পরে আমার ছেলেই আমায় দেখে হাসবে। মোটেই ভয় করবে না। অবশ্য আমি তাকে বলেছি যে আমার উপদেশটা ঠিকই, কোন ভুল নেই তাতে। "এক মাঘে শীত পালায় না।" বার বার এ রকম কিছু জিত হয় না, এটা বাইচান্স ঘটে গেছে। কিন্তু ওতো ভাবছে ওর বুদ্ধির জোরে জিতেছে ? বল দেখি কি করি ? ভাবতো ওর চোখে কতটা নেমে গেলাম আমি ?

—সত্যি। কে আর কি বলবে। কি আর বলা যায় এর পর। তবু অ্যাডভোকেট ভদ্রলোক সান্ত্বনা দিল। বলল,—মিথ্যে মন খারাপ করনা গারনেট, তুমি কিছু ভেবোনা। তোমার ও ছেলে সত্যিই ক্ষণজন্মা পুরুষ। চিরকাল ও জিতেই যাবে নিজের বুদ্ধির জোরে। দেখো, একদিন কত বড় হবে ও। তখন আমার কথা বিশ্বাস হবে তোমার।

স্কেচ—শ্যামল বসু

প্রবন্ধ

অনিল চক্রবর্তী

মুহূর্তের দায়

যদিও বাংলাদেশে ছোটগল্প-সাহিত্য বহুজন অধ্যবসায়ের ফলে নিজেকে একটি গৌরবজনক স্থানে অধিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে, তথাপি আশ্চর্য এই যে, সেই ছোটগল্প-সাহিত্যই গত দু' তিন দশক ধরে ক্রমশ নীচের দিকেই নেমে চলেছে। তার কারণ, যাঁরা লিখতে জানেন তাঁরা আর গল্প লেখেন না, উপন্যাস লেখেন। অথচ এমন নয় যে এই কয়েক বৎসরে খুব একটা স র বে উল্লেখ করার মতো উপন্যাসও রচিত হয়েছে। মোটামুটি হিসেব করেই বলা যায়, সম্প্রতি বাংলা কথাসাহিত্য তার কষ্টার্জিত পূর্ব গৌরব তো অক্ষুণ্ণ রাখতে পারছেই না, বরং যেটুকু সুনাম এতকাল তার ছিলো তা-ও সে ক্রমশ হারাতে বসেছে।

আধুনিক কালের খ্যাত অখ্যাত সকল লেখকই যে সরাসরি উপন্যাস রচনায় হাত দিচ্ছেন, তার পেছনের মুখ্য কারণটি এতই স্থূল যে, এ নিয়ে অবান্তর আলোচনা করারও প্রয়োজন নেই। ক্বচিৎ কদাচিৎ দু' একটা ভালো উপন্যাসের সন্ধান হয়তো পাওয়া যায়, কিন্তু তা নিয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করার মতো এমন কিছু নেই। আলোড়ন বলতে যেটুকু তার স্রষ্টা মূলত

সে সব উপন্যাসের প্রকাশকরাই এবং তাদের স্বরচিত ভাবোচ্ছ্বাসের মাতামাতি কতগুলো বিজ্ঞাপনের পাতাতেই পরিব্যাপ্ত। এ দেশের পাঠকরা শুধুই বাংলা উপন্যাস পড়েন না এবং পড়লেও গত দু'শ বৎসরে যে কয়টি সত্যিকারের ভালো উপন্যাস রচিত হয়েছে তা তাঁরা পড়েছেন। সুতরাং উপন্যাসের নামে কতগুলো সুখদ কাহিনী রচনা করলে লেখকরাই ঠকবেন, এবং তাঁরা ঠকছেনও। নগদ মূল্যে নগদ বিদায় ছাড়া আর কিছু তাঁদের বরাতে জুটছে না। আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের, এমন কি হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর উপন্যাসকেও আজ পর্যন্ত ভুলতে পারিনি, কিন্তু মজার কথা, সাম্প্রতিক কালের কোনো একটি উপন্যাসের কথা আজকের পাঠক কয়েকটা দিনের বেশী মনে রাখতে পারেন না। ঠিক আধুনিক বাংলা গানের মতো। উভয়েরই জন্ম ও মৃত্যুর ইতিহাস এক। অথচ যাঁরা ছোটগল্প লিখতে পারেন, উপন্যাস লিখতে পারেন না, তাঁরা যদি এ বিড়ম্বনা ভোগ না করে কেবলমাত্র ছোটগল্প লেখাতেই নিজেদের ব্যাপৃত রাখতেন তবে বাংলা সাহিত্য এবং তাঁরা—উভয়েরই প্রভূত উপকার হতো। সে-সঙ্গে বাংলা দেশের অগণিত পাঠক সাধারণও পাঠক হিসেবে পতিত হওয়ার সুযোগ পেতেন না।

তবু ছোটগল্প লেখা হচ্ছে, হবেও। কেন না বাংলাদেশে পত্র-পত্রিকার অভাব নেই এবং সেখানে গল্প চাই-ই। আমাদের দেশের পাঠকদের এ এক আশ্চর্য মানসিকতা। বিক্ষিপ্ত পত্রিকার পাতায় তাঁরা বিশেষ ক'রে ছোটগল্প খুঁজে বেড়ান, অথচ বই কেনার সময় কিংবা লাইব্রেরী থেকে বই নিতে হলে ভুলেও উপন্যাস ছেড়ে গল্পগ্রন্থে হাত দেবেন না। তার ফলে ব্যতিব্যস্ত লেখকরাও যে গল্প রচনা থেকে বিরত হতে চাইবেন এ রকম সংকটের কথা একবার মনোযোগ দিয়ে ভাবেন না পর্যন্ত। এ অবস্থায় ছোট গল্পসাহিত্যের মান যে অবধারিতভাবে নীচের দিকে নেমে যেতে বাধ্য হবে তাতে আর আশ্চর্য হওয়ার কি আছে। তবু গল্প লেখা হচ্ছে, যদিও মানিক, প্রেমেন্দ্রর গল্পের মত আজ আর এ নিয়ে কেউ হৈ-চৈ করে না। যদিও পড়ার পরেই আজকের দিনের অধিকাংশ গল্প লেখককেই পাঠকরা ভুলে যাচ্ছেন, তবু গল্প লেখা হচ্ছে। যাঁরা এখন আর ছোট গল্পে হাত দিতে চান না, তাঁরা উপন্যাসে ব্যস্ত থাকুন, কিন্তু এখনও যাঁরা ছোটগল্পের মায়া কাটাতে পারেন নি এবং ব্যক্তিগত স্বার্থের খাতিরে বৃহত্তর কোনো প্রলোভনে ভরাডুবি হন নি, আমাদের কর্তব্য তাঁদের যথাযোগ্য সম্মান জানানো। সুতরাং যে কয়জন গল্পলেখক এখনও ছোট গল্পসাহিত্যের প্রাণকে এ দুঃসময়েও বাঁচিয়ে রাখার

চেষ্টা করছেন এখানে আমি তাঁদেরই কয়েকজনের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনায় হাত দিতে চাই। এঁদের সকলেই আজ থেকে প্রায় উনিশ-কুড়ি বৎসর আগে একই সঙ্গে বাংলাসাহিত্যের ক্ষেত্রে এসে জড়ো হয়েছিলেন এবং এ দীর্ঘকাল বহু প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হয়েও গল্প রচনা থেকে নিরস্ত হন নি।

এ পর্যায়ে সর্বপ্রথম হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখ করলে বোধ হয় অন্যায় হবে না। যদিও অপরিচিত পটভূমিকায় লেখা নতুন স্বাদের উপন্যাস 'ইরাবতী' লিখে তিনি প্রথম যাত্রা শুরু করেছিলেন, তথাপি লেখক হিসেবে তাঁর নিজের স্থানকে তিনি অচিরেই বুঝতে পেরেছিলেন। তাই প্রথম থেকেই তিনি গল্প রচনার প্রতি মনোযোগ দিতে ভুল করেন নি। হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে একটি কথা নিঃসন্দেহে ঘোষণা করা যায় যে, অধুনাকালের সাহিত্যিকদের মধ্যে বোধহয় একমাত্র তিনিই তাঁর রচনার ক্ষেত্রে বিচিত্র রসের আমদানী করতে নারাজ। মূলত তিনি রোমান্টিক গল্প লেখক, এবং প্রথম দিকে এই জন্যেই তাঁর রচনায় স্পষ্টতই পূর্বতন গল্পলেখক নরেন্দ্রনাথ মিত্রের কিঞ্চিৎ প্রভাব লক্ষ্য করা গিয়েছিলো। একজন রচনাকার যখন ধীর গতিতে পরিণতির দিকে এগুতে থাকেন তখন ক্রমশ তাঁর ওপর থেকে প্রাক্তণ প্রভাব সব সরে যেতে থাকে, কিংবা তাঁকে সচেষ্টায় সমস্ত প্রভাব থেকে মুক্ত হতে হয়। হরিনারায়ণও পরবর্তীকালে প্রভাবমুক্ত সাহিত্যিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছেন এবং তখন তাঁর যে প্রকৃত স্বরূপ পাঠকদের সামনে উদ্ঘাটিত হয়েছে তা নিবিকল্প একজন রোমান্টিক গল্পকারের চেহারা। যতই তিনি নিজেকে দিক্‌বিদিকে ছড়িয়ে দিতে চেষ্টা করুন না কেন শেষপর্যন্ত সমস্ত লেখার মধ্যেই যে তাঁর নিজস্ব রোমান্টিক সত্তা অগোচরে প্রাধান্য বিস্তার করে চলে তার প্রমাণ তাঁর সমগ্র রচনাবলী। বিশেষ দৃষ্টান্ত দিয়ে এ কথাকে প্রমাণ করার প্রয়োজন বোধ করি না। হরিনারায়ণ অনাবশ্যক বৈচিত্র্যের আমদানী করার প্রলোভনে নিজের সীমাকে অতিক্রম করতে রাজী নন। সে জন্য ব্যর্থতাও তাঁর রচনাকে বড় একটা বিড়ম্বিত করে না।

নিজের স্বধর্মকে অতিক্রম না করেও বৈচিত্র্যবিলাসী হতে পেরেছেন শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি সব্যসাচীর মত গল্প উপন্যাস ও নাটকের ক্ষেত্রে সমানভাবে বিচরণ করতে সক্ষম হলেও, বলতে বাধা নেই, ছোট গল্প রচনাতেই তাঁর ক্ষমতা বিশেষভাবে স্ফুট হয়ে উঠেছে। তার কারণ বোধ হয় এই যে, বিভিন্ন ছোট গল্পের বাহনে শচীন্দ্রনাথ তাঁর পাঠকদের বহুবিচিত্র পটভূমিকায়, বিচিত্রতর নরনারীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে পারেন। আসল

কথা, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে তিনি ব্যর্থ হয়ে যেতে দেন নি। সন্দেহ কি যে সাহিত্য ব্যাপারে অভিজ্ঞতার মূল্য সামান্য নয়। কিন্তু সে-সঙ্গে একথাও সত্য যে শুধু মাত্র অভিজ্ঞতাকে সম্বল করে সাহিত্য সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। শচীন্দ্রনাথ অভিজ্ঞ পরিব্রাজক এবং সৎ সাহিত্যিকও। সুতরাং তাঁর বিভিন্ন ছোট গল্পে আজ পর্যন্ত, বৈচিত্র্য সত্ত্বেও, পাঠক অস্বস্তি বোধ করার মতো কোনো গুরুতর কারণ খুঁজে পান নি। তবু বলবো, শেষ পর্যন্ত এ-লেখক ধর্মত রোমান্টিক। নরনারী মনোবিশ্লেষণের প্রতি যেমন অতি উৎসাহী নন, তেমনি বাইরের আচরণ দিয়েও তিনি তাদের চিনতে রাজী নন, অথচ তাঁর তৈরী নরনারীরা আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ সত্য। এ ফলশ্রুতির পেছনের আসল কারণটি আমার কাছে এই মনে হয়েছে যে, নরনারীর পারস্পরিক সম্পর্কে লেখক একটি বিশেষ অনুভবে বিশ্বাসী, সে অনুভবের প্রতি পাঠক মনের বিশ্বাস তাঁর নিজের চেয়ে কিছু কম নয়।

ভৌগোলিক পটভূমির দিক থেকে শচীন্দ্রনাথ সমগ্র দক্ষিণ ভারত পর্যটন করেছেন, এমনকি ভারত মহাসাগরও তিনি পাড়ি দিয়েছেন, কিন্তু নিজের সমাজে বসে থেকেও মদন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ছোট গল্পে কম বিচিত্র স্বাদকে আহরণ করেন নি। অবশ্য স্বীকার করা ভালো, তিনিও ক্ষমতা প্রদর্শনের জন্য অভাবনীয় কৌশলের আশ্রয় নিতে রাজী নন। সুতরাং মেনে নেওয়া যায় তিনি সীমাকে অতিক্রম করে যান নি। কিন্তু মদন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ছোট পরিধিটির অপার রহস্যকে আশ্চর্য কুশলতায় বার বার উদ্ঘাটিত করে চলেছেন তাঁর বিভিন্ন বিচিত্র ছোট গল্পগুলোর ভেতর দিয়ে। তবু তাঁকে লেখক হিসেবে বিশেষভাবে চিনতে পারা যায়। সে সব গল্পের পটভূমিতে যেখানে তিনি পরমানন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছেন বাংলাদেশের অখ্যাত অবজ্ঞাত নীচু মহলের বাসিন্দাদের ঘরে ঘরে। যেমন অনাড়ম্বর বিষয়বস্তু, তেমনি সহজ সরল সাবলীল বর্ণনাভঙ্গি। লেখক জানেন, সাহিত্যের যাদুঘরের চাবিকাঠিটি কেমন করে ঘোরাতে হয়। মদন বন্দ্যোপাধ্যায় অলস লেখক কিনা জানি না, এটুকু জানি জনপ্রিয়তার মোহে নিরলস লেখক হতে চান নি। তাই যত কম রচনাই তিনি তৈরী করুন তাতে অভিজ্ঞতার সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে সত্যিকারের সাহিত্যের স্বাদ—যা কেবলই ভাষা নয়, ভঙ্গি নয়, চমকপ্রদ কাহিনী নয়, যা এ সব কিছুকে আশ্রয় করেও সব কিছুরই আয়ত্তের বাইরের জিনিস।

ঠিক একই কারণে এ মুহূর্তে যাঁর নাম মনে পড়া স্বাভাবিক তিনি সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। খুব সম্প্রতি তিনি একাধারে গল্প ও উপন্যাস রচনায় মনোযোগী

হলেও দীর্ঘকাল পূর্বে বাংলা সাহিত্যের আসরে উপস্থিত হয়েছিলেন ছোটগল্পের ডালা সাজিয়েই। কিন্তু এতকাল তিনি খুব কমই লিখেছেন, এত কম যে আমরা, যারা সব সময় একটি নামকে চোখের সামনে ঝুলে থাকতে না দেখলে অকৃতজ্ঞের মতো সত্যিকারের ভালো লেখককেও ভুলে যেতে লজ্জা পাই না, সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে আজ একজন নতুন লেখক বলেই মনে করছি। কিন্তু এ দীর্ঘ সময় সনৎকুমার বৃথাই কাটান নি। তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে তাঁর নতুন পর্যায়ের গল্প উপন্যাসগুলো পড়ে। এবার তিনি এসেছেন সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়েই। মানবমনের রহস্যের প্রতি তাঁর অপরিসীম কৌতূহল অবশ্যই পাঠকজনের কৌতূহলকে জাগ্রত করে তুলবে। সনৎকুমার মুহূর্তের জন্যও সমাজের বাইরে পা বাড়ান নি, কিন্তু এ সমাজ তার সমগ্রতা নিয়েই ধরা দিয়েছে তাঁর লেখায়। তাঁর দৃষ্টি শুধু গভীরই নয়, সে দৃষ্টি সত্যসন্ধানীও—যার জন্য তাঁর উপন্যাস যেমন ছোট গল্পগুলোও অত্যন্ত সহজে পাঠকের হৃদয়-মনে আঘাত করে।

এদিকে যেমন মানবমনের সন্ধান চলছে, অন্য দিকে মননশীলতার প্রতিও বাংলা দেশের কিছু কিছু লেখক সমান দৃষ্টি দিতে সচেষ্ট হয়ে উঠেছেন। এতকাল সাহিত্যে মননকে স্থান দেওয়ার রেওয়াজ ছিলো শুধুমাত্র কবিতাতেই। বিগত দু'এক দশক আগে মননধর্মী উপন্যাস রচনায়ও মনোনিবেশ করেছিলেন কয়েকজন গুণী সাহিত্যিক। কিন্তু ছোটগল্পে মননকে যথাযোগ্য স্থান দেওয়ার কথা ভাবছেন আজকের দিনের দু'একজন লেখক। আশার কথা সন্দেহ নেই। রবীন্দ্রনাথ শেষ জীবনে ছোটগল্পে এই মননধর্মিতাকে আশ্রয় ও প্রশ্রয় দিয়েছিলেন, কিন্তু যে কারণেই হোক, বাংলাদেশের পাঠকরা পরবর্তীকালে মননধর্মী গল্পকে গ্রহণ করতে সঙ্কোচ অনুভব করতে থাকেন। পাঠকের গুণগ্রাহিতার ওপরই যখন নির্ভর করে লেখকের অদৃষ্ট, তখন স্বভাবতই লেখকরা সহজে এ-পথে নামার বিপদকে এতকাল এড়িয়ে চলেছিলেন। কিন্তু একটা দেশ সকল কালের জন্যই পিছিয়ে থাকতে পারে না। আমাদের দেশও একটা অদ্ভুত কিছু নয়। সুতরাং দেরী হলেও আজ আমাদের ছোটগল্প-সাহিত্যে মননধর্মিতা নিজের জায়গা বুঝে নিতে চেষ্টা করছে।

এ পর্যায়ের প্রথম নামের দাবীদার অচ্যুৎ গোস্বামী। আজ পর্যন্ত আমি তাঁর যে কয়টি গল্প পড়ার সুযোগ পেয়েছি, তাতে আমি নিঃসন্দেহ যে, অচ্যুৎ গোস্বামী মননধর্মী গল্প রচনাতেও নতুন কিছু দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। সার্থকতা সম্বন্ধে স্থির মতামত দেওয়ার সময় এখনই আসে নি, কিন্তু তাঁর সাধু প্রচেষ্টাকে

অভিনন্দন জানিয়ে রাখতে দোষ কি! অচ্যুৎ গোস্বামী পণ্ডিত ব্যক্তি, ইতিপূর্বে বহু প্রবন্ধে তিনি তাঁর পাণ্ডিত্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। কথা সাহিত্যেও যে মাঝে-মাঝে সে মনটি উঁকিঝুঁকি দেবে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয় এদিক থেকে তিনি বিচিত্র এক কৌশলের আশ্রয় নিতে চান। বস্তুত তাঁর প্রায় সবগুলো গল্পই রূপকধর্মী, এবং তাঁর রচনার বিষয়বস্তু একটিমাত্র কেন্দ্রের অভিমুখী। লেখক এক কথায় সমাজদর্শী। অধিকন্তু সমাজব্যবস্থার এ ত্রুটি-বিচ্যুতি স্খলন-পতনই তাঁকে বিচলিত করে অত্যধিক। একে সমাজ সমালোচনা তায় বর্ণনায় রূপকাশ্রয়। অবধারিতভাবে প্রতিটি রচনাই বিদ্রূপাত্মক হতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু এখানে একটা প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক, কেবল বিদ্রূপ দিয়ে একটা সমাজের বহুকালার্জিত ক্ষতকে কি সংশোধন করা সম্ভব। একটু স্নেহ, একটু বা সমবেদনার প্রলেপ কি তাকে সং পথে চলতে সাহায্য করে নি!

বিদ্রূপ নয়, সহানুভূতি দিয়েই সমাজকে বুঝতে চেষ্টা করেন তারাপদ গঙ্গোপাধ্যায়। অসংলগ্ন দ্রুত ধাবমান সমাজের রূপকই যেন তাঁর রচনাভঙ্গি। অনভ্যস্ত পাঠকের কাছে তারাপদ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পগুলো বিচিত্র ব'লে বোধ হতে পারে, এমনকি অস্বস্তিকরও। কিন্তু পটভূমিকে মনে রাখলে, পারিপার্শ্বিক সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে সদাসচেতন থাকলে পাঠকের বুঝতে বিলম্ব হবে না, কেন এ লেখক বিশেষভাবে এই অপ্রচলিত পদ্ধতির আশ্রয় নিয়েছেন। তবু বলবো, তারাপদ গঙ্গোপাধ্যায় বিষয়বস্তু নির্বাচনে তাঁর নিজের পরিধিকে কখন-কখনও অতিক্রম করে যেতে চান। সেখানে অপরিচয়ের ঘূর্ণাবর্তে তিনি দিক্‌ভ্রান্ত হন, মননশীলতা তাঁকে স্থির বিন্দুতে পৌছতে দেয় না। কিন্তু স্বস্থানে তিনিই আবার প্রায় অতুলনীয়। নিজের সমাজহৃদয়ের ক্ষতটিকে তিনি চেনেন, তাকে স্বীকার করেন কিন্তু বিদ্রূপ দিয়ে সে ক্ষতমুখকে উন্মোচিত করেন না। তার ফলে এ-পর্যায়ের গল্পগুলো পাঠকের মনের মধ্যে মধুর বেদনার মতো বাজতে থাকে।

কাহিনীর দেহে মননধর্মিতাকে প্রাণের মতো মিশিয়ে দিয়ে সত্যিকারের সার্থক গল্প লিখতে পেরেছেন একমাত্র অমিয়ভূষণ মজুমদার। সমাজ সংস্কারের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করেন নি, রাতারাতি সাহিত্যের চেহারাকে পাল্টে নিয়ে নতুন দিক্ নির্দেশ করার গুরুদায়িত্বও তাঁর নয়। তিনি প্রথমত এবং মুখ্যত ছোটগল্প রচনা করেছেন। সুতরাং মননধর্মিতাকে তিনি কতখানি প্রশ্রয় দিয়েছেন তাঁর রচনায় তার পরিমাপ নেওয়া একটা আবশ্যক কর্তব্য নয়।

সাধারণ সংজ্ঞা মেনেই বলা যায় অমিয়ভূষণ স্বয়ংসম্পূর্ণ গল্প রচনায় সক্ষম। কিন্তু সত্যিই এইটুকু বললে তাঁর রচনা সম্পর্কে সবটুকু বলা হয় না। সচেতনভাবে লক্ষ্য না করলেও বুঝতে অসুবিধা হয় না, যে তিনি নিতান্তই ছাঁচে-ঢালা কাহিনী তৈরী করতে সম্মত নন। তাঁর লিখনভঙ্গিই এমনি যে আর দশজন গল্প লেখকের রীতি থেকে তিনি যে একান্তভাবে পৃথক তা প্রথম পাঠেই বুঝতে পারা যায়। এইখানেই তাঁর বিশেষত্ব। কাহিনীর ক্রমপরিণতি ছোটগল্প বা উপন্যাসের পক্ষে অবধারিত ঘটনা হলেও, এ পরিণতি তাঁর রচনায় অবলীলায় নাও ঘটতে পারে। অবশ্য পরিণতি একটা আছে এবং তা নিশ্চিতও, কিন্তু সে নিশ্চিত পরিণামের জন্য লেখক যেন বিন্দুমাত্র দায়ী নন। এ জন্য অমিয়-ভূষণের কোনো কোনো গল্প আমার কাছে আশ্চর্যরকম অর্থবহ বলে মনে হয়েছে, যাকে গল্পপাঠের অভ্যাস দিয়ে বোঝা যায় না, বুদ্ধি দিয়েও বুঝতে হয়। অথচ এমন নয় যে, এই অর্থময়তা তাঁর গল্পকে শুধুই রহস্যময় ক'রে তোলে। তা হলে তাঁকে একজন সফল গল্পলেখক ব'লে চিহ্নিত করবার প্রয়োজন বোধ করতাম না। প্রসঙ্গত তাঁর রচনাভঙ্গি সম্বন্ধেও কিছু বলা দরকার। পাঠক-মাত্রই লক্ষ্য করেছেন অমিয়ভূষণ অত্যন্ত মিতবাক্ সাহিত্যিক এবং তাঁর গদ্য রচনার ভঙ্গিটিও মোটামুটি রমনীয় নয়। কিন্তু এ তাঁর একটি বিশেষ ভঙ্গি। যে একটি বিশেষ প্রত্যয় থেকে তাঁর এক-একটি ছোটগল্পের জন্ম সম্ভব হয়, এ ভাষা ও ভঙ্গি সেই অনমনীয় প্রত্যয়েরই নির্দ্বিধ প্রকাশরূপ মাত্র। বাংলা সাহিত্যের কোনো একনিষ্ঠ পাঠকও যদি বলেন অমিয়ভূষণের ছোটগল্প তাঁকে মুগ্ধ করে না, এমনকি তাঁর ভালোও লাগে না, তা হলে তাঁর প্রতি কৃপাপ্রদর্শন করা আমার কাজ নয় এবং আমি আশ্চর্যও হই না। তার কারণ, লেখক জ্ঞাতসারেই তাঁর লেখন পদ্ধতিকে একটা সংযমের আবরণে ধরে রাখতে চান এবং সেজন্যই বহু-আকাঙ্খিত জনপ্রিয়তাও তাঁর চরম কাম্য নয়। মননধর্মী লেখকের ভাগ্য তাঁকে বিড়ম্বিত করে না।

সত্যপ্রিয় ঘোষকে মননধর্মী লেখক বললে ভুল হবে, কিন্তু তিনি যে প্রচলিত ধারার গতানুগতিক লেখকও নন তা তাঁর পাঠকমাত্রই স্বীকার করবে। অন্তত একটি বিষয়ে তিনি সাম্প্রতিক কালের ছোটগল্প লেখকদের মধ্যে একক, যার উল্লেখ অবশ্য প্রয়োজন। সত্যপ্রিয় ঘোষ ধোঁয়া-ধোঁয়া মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের নামে চেতনপ্রবাহে অবগাহন করার পক্ষপাতী নন। যে মনটিকে নিয়ে মানুষের বিবিধ কারবার, তিনি জানেন, সে মনটি একজন মানুষের ব্যক্তিসত্তা হলেও তা নিছক নিরলম্ব কিছু নয়। সে মানসিকতার গঠনও ব্যক্তিসমষ্টি বা

বস্তুসাপেক্ষ। সুতরাং ব্যক্তিসমষ্টি ও বস্তুর যুগ্ম সাধনার ফলে গড়ে ওঠে একটি বিশেষ মানুষ। তাই সত্যপ্রিয়র গল্পে শুধু মন, মনন বা চেতনার প্রাধান্য নেই, সেখানে একসঙ্গে এসে ভীড় করে মানুষ, ঘটনা ও পারিপার্শ্বিক। তাই তিনি বিস্তৃত বর্ণনায় কুণ্ঠিত নন, যদিও তাঁকে বর্ণনাবিলাসী বলতে কুণ্ঠা বোধ করি। অন্য পক্ষে, অধুনা লক্ষ্য করেছি, সত্যপ্রিয় ঘোষ গল্পের কাঠামোয় কোনো একটা চিন্তাপ্রসূত উদ্দেশ্যকেও যেন প্রকাশ করতে চাইছেন। বলা বাহুল্য, এ এক বিপজ্জনক পরীক্ষা উত্তীর্ণ হতে চেষ্টা করছেন তিনি। কারণ, সাহিত্যকে ছাপিয়ে উদ্দেশ্য যদি ক্ষণেকের জন্যও মাথা তুলে দাঁড়ায় তবে সাহিত্য হিসেবে তার মূল্য সামান্য হয়ে পড়তে বাধ্য। উদ্দেশ্য যাই হোক, রচনা-রীতিতেও এ লেখক বিশেষ একটি পদ্ধতিকে মেনে চলেন। আজকাল কাহিনীসাহিত্য থেকে সহজ রসরসিকতার স্থান প্রায় লুপ্ত হতে বসেছে বললে বোধ হয় অন্যায় হবে না। সত্যপ্রিয় ঘোষ কিন্তু তাকে নির্বাসন দিতে রাজী নন। ফলে তাঁর রচনা প্রত্যক্ষ বাস্তবানুগ হয়েও কখনও নীরস কঠিন নয়।

আমি জানি, এ প্রবন্ধ বহু পাঠকেরই বিস্ময় উদ্রেক করবে। কারণ, আমি যাঁদের লেখা সম্বন্ধে আলোচনা করেছি তাঁরাই শুধু আধুনিক বাংলা ছোট গল্প-সাহিত্যের প্রধিনিধি নয়, অধিকন্তু অনেক অনেক বিখ্যাত লেখকের নাম পর্যন্ত আমি উচ্চারণ করি নি। কিন্তু রচনার প্রয়োজনীয়তা এবং কৈফিয়ৎ আগেই দিয়েছি, তার পুনরুল্লেখ করতে চাই না। তবু এই ব'লে আমি থামতে চাই যে, একদিন যে ছোট গল্পসাহিত্যকে নিয়ে গর্ব বোধ করেছি, এবং এখনও করি, তার মান আজ যে পর্যায়ে এসে পৌঁচেছে তা এমন কিছু গর্ব করার মত নয়। ব্যক্তিগত লাভ লোকসানের কথা তুলবো না, কিন্তু সাহিত্যের প্রতি যদি সত্যিকারের ভালোবাসা থাকে তবে প্রত্যেক সফল শিল্পীরই আজ কর্তব্য হবে আবার এই ছোটগল্পের ক্ষেত্রটিকে প্রসারিত করা। অক্ষমের আস্ফালনের কিছু মূল্য নেই, কিন্তু যাঁদের প্রতিটি অক্ষরের মূল্য আছে তাঁরা কেন এমন সময়েও পিছিয়ে থাকবেন?

সাহিত্যের প্রতিটি শাখাই গর্বের বিষয়, সুতরাং একদিকে মনোযোগ কমালে সমগ্রভাবে সাহিত্যেরই ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা।

গল্প

খগেন্দ্র দত্ত

পাশাপাশি

সেদিন একটু সকাল সকাল রাতের খাওয়া সেরে নিয়েছিলাম। রাত আটটার মধ্যেই। হাতে কোন কাজ কর্ম না থাকলে ওরকমই হয়। সকাল সকাল খিদে পায়। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসে আমার।

আমাদেরও তাই হয়েছিল। আটটা বাজতে না বাজতেই পেট বিদ্রোহ করে উঠেছিল। নাড়িভুড়ি পর্যন্ত মোচড় দিয়ে উঠেছিল খিদেয়। মনে হয়েছিল সারাদিন কিছু খাইনি। তাই খাওয়ার আয়োজনে মেতে ছিলাম। আয়োজন মানে, যে ছেলেটা আমাদের জন্যে রান্না করে তাকে একবার হুকুম করা।

এক মুহূর্তও দেরি করবে না ছেলেটা। অমনি ঘর ঝাঁট দিয়ে আসন পেতে দেবে। গ্লাসে জল ঢেলে পাশে রাখবে। ভাতের থালা সাজিয়ে আমাদের ডাক দেবে। আমরাও কালবিলম্ব না করে খেতে বসে যাই। আমাদের ঝামেলাও তো বেশি নেই। চারজন মাত্র থাকি। চার বন্ধু। বিকেলে কাজ থেকে ফিরে এসে হয়তো তাস খেলি কিংবা ক্যারম। সময়ে খাই সময়ে ঘুমোই। তাতে করে রান্না-বান্না করার জন্য যে ছেলেটাকে রাখা হয়েছে তার উপর চাপ পড়ে না।

অবশ্যি ব্যতিক্রমও আছে। দুর্ভোগ যে ভুগতে হয় না ছেলেটাকে নিয়ে তা নয়। মাঝে-মধ্যে ঝামেলার সৃষ্টি হয়। যদি কেউ রাতের শো'তে সিনেমায় যাই কিংবা জরুরী কোন কাজে গিয়ে ফিরতে রাত হয়ে যায়।

এ ক'দিন বেশ নিরুপদ্রবেই কাটছে ওর। সময়ে বেরুচ্ছি সময়ে ফিরে আসছি। তার উপর গত তিনদিন তো ঘরে বসেই কাটছে। ধৈর্যচ্যুতি ঘটছে। কতক্ষণ কাটানো যায় তাস আর ক্যারম খেলে ?

এ ছাড়া উপায়ও নেই। পর পর তিন দিন কারফিউ। বাইরে বেরুবার উপায় কোথায় ? কোনদিন এক ঘণ্টা, কোনদিন তিন ঘণ্টা মাত্র শিথিল করা হচ্ছে। সে অবকাশে বড় জোর বাজার হাট করা যায় তার বেশি কিছু নয়। না যাওয়া যাচ্ছে কাজে, না কোন দূরের রাস্তায়।

বেশ কাটছিল দিনগুলো চাতুরী করে, খেয়ে দেয়ে, হেসে খেলে পেছনে রাখছিলাম একটার পর একটা দিন। মাঝে মাঝে একঘেঁয়ে মনে হয়েছে, নিতান্ত গতানুগতিক। মনে হয়েছে দুঃসহ। মনটা হাহাকার করে উঠতো একটু নতুনত্বের জন্য। একটু বৈচিত্র্যের আশায়।

তাই বলে কি এই বৈচিত্র্য ? এই নতুনত্বের জন্য তো আমাদের মন কোনদিন উন্মুখ ছিল না। আমার তো নয়ই। এর নাম কিছুতেই নতুনত্ব দেওয়া যায় না। বরং বলতে পারি বিভীষিকা।

সেই বিভীষিকাই দেখা দিয়েছে সমাজজীবনে। একেবারে আকস্মিক ভাবে বদলে গেছে মানুষগুলো। দশদিন আগে যে ছিল সৎ প্রতিবেশী সে আজ হৃদয়হীন শত্রু। অদৃশ্য কোন এক ধর্মবিশ্বাসের জন্য কি প্রতিবেশীদের মধ্যে এতটা ব্যবধান সৃষ্টি হয় ? নিজেকে এতটা দূরে সরিয়ে রাখে একে অপরের কাছ থেকে। দু'দিন আগেও যে ছিল সৎ প্রতিবেশী, বিপদ আপদে বন্ধু সে আজ কিকরে রাতারাতি শত্রু হয়ে গেল বুঝে উঠতে পারি না। বিশ্বাস, সততা, প্রীতি সব শুধু কথার কথা হয়ে গেল ?

গত তিন দিন বেরোই নি। আমরা যে রাস্তায় থাকি তার মোড়ে একটা বস্তীজুড়ে থাকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। সেই বস্তীর উপর আক্রমণ হয়েছে কয়েকদিন আগে। ঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে বেশ কয়েকটা। কিছু কিছু পরিবার পালিয়েছে। সরে গেছে অন্যত্র। কিছু এখনও আছে মিলিটারী পাহারায়।

কখন কোথা দিয়ে কে যে আক্রান্ত হয়ে পড়বে কে জানে ? সে জন্যে কারফিউ শিথিল করা হলেও রাস্তাঘাটে আগের মতো লোকজন গিজ গিজ করে না। কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগে ! চারদিক থমথমে !

প্রাণের মায়া সকলের আছে। আমাদেরও। তাই সকাল সকাল খেয়ে উঠে অনেকক্ষণ তাস খেলবো ভেবেছিলাম। মুখ হাত ধুয়ে এসে বিছানা পেতে বসলাম। তাস বের করা হল দু'জোড়া। যে ছেলেটি আমাদের রান্না করে, সে খেতে বসেছে রান্নাঘরে।

ব্রিজ না টোয়েন্টি নাইন?

সমীরই প্রশ্নটা করলো।

টোয়েন্টি নাইন আবার খেলা নাকি? ওটা বাদ দিয়ে ভাই।

রজত উত্তর দিতে গিয়ে বললো।

তোর কি মত?

সমীর আমার মতামত জানতে চাইলো।

আমার কোনটাতে আপত্তি নেই।

এবার মিহিরের পালা। ওর মতামতেরও প্রয়োজন আছে। তাই সবাই ওর দিকে চাইলো। আমি নিজেও।

মিহির মুখ খুললো, বললো—টোয়েন্টি নাইন হলো মেয়েদের খেলা। ব্রীজই আমার কাম্য।

বেশ, ব্রীজই চলুক।

সমীর তাস খুলে ভাঁজ করলো। বিছানার উপর রেখে দিয়ে বললো—আমার পার্টনার কে?

মিহির সোজাসুজি বললো—আমি।

আমি বসলাম মিহিরের ডানদিকে। ওর বাঁ দিকে আমার পার্টনার রজত।

তাস কাটতে গিয়ে সমীর বললো—পেছনের দরজাটা দিয়ে দে।

দরজা তো বন্ধই আছে।

—আমি উত্তর দিলাম দরজার দিকে তাকিয়ে।

নারে, ভালো করে বন্ধ কর। হুক লাগিয়ে দে।

তাই দিলাম। কোন দ্বিরুক্তি না করে। বলা যায় না, কখন হৈ চৈ শুরু হয়ে যাবে। শুরু হবে গণ্ডগোল। কোথা থেকে এসে ঢুকে পড়বে ঠিক কি? মিলিটারীও তো এসে পড়তে পারে! ধরে নিয়ে গেলে কি আর রেহাই আছে? কৈফিয়ৎ, জামিন—লাঞ্ছনার একশেষ। উত্তম মধ্যমও বিচিত্র নয়।

দরজা বন্ধ করে খেলতে আরম্ভ করলাম। কিন্তু এক দান খেলা হতে না হতেই দরজায় টোকা। কেমন যেন ত্রস্ত হাতের মৃদু আঘাত।

প্রথমটা হকচকিয়ে গেলাম। তাস রেখে দিলাম বিছানায়। ভীত, সন্ত্রস্ত চোখে তাকালাম দরজার দিকে। চার জোড়া চোখ একসঙ্গে স্থির হলো দরজার গায়—!

আঘাতটা তখন ঘন ঘন পড়ছে এবং দ্রুতও। একে অপরের মুখের দিকে তাকালাম আমরা। কিন্তু মুখ খুললাম না কেউ। মুখ খুলতে ভরসা পেলাম না।

এবার আঘাতটা আরও জোরে। আম মনে হল আঘাতটা যেন হাতের নয়, পায়ের। নিজেরই অজ্ঞাতসারে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—কে?

সঙ্গে সঙ্গে জবাব এল—আমি। দয়া করে দরজাটা খুলুন। আমাকে বাঁচান।

নারী কণ্ঠ। সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলাম। বিস্ময়টা ঘনীভূত হল। ভয়টাও। ভয়ের হিমেল স্পর্শে দু'পাটি দাঁত পযন্ত জমে যাচ্ছে।

আবার সেই কণ্ঠ। সেই করুণ আবেদন। কাতর প্রার্থনা। নরম গলায় অনুনয় বিনয়। আমাকে বিচলিত করলো। হয়তো রজতকেও। আমি উঠে দাঁড়াবার আগেই রজতই হুক খুলে দিল। দরজাটা ফাঁক হয়ে গেল।

আর সেই মুহূর্তে চোখের পলক পড়তে না পড়তেই হুট করে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়লো কালো একটা মূর্তি। মূর্তি কি? মূর্তির কিছুই দেখা গেল না প্রথমে। ভয় পেয়ে গেলাম আমরা। দরজার পাশ থেকে সরে এসে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়ালাম। সবকটা চোখই কপালে উঠে গেল।

দরজাটা তখনও ফাঁক হয়ে আছে। সেজন্যেই শব্দটা কানে পোঁছালো আমাদের। একটা গণ্ডগোলের শব্দ পাচ্ছি। আমাদের ঘরের সামনে রাস্তাটা—যেখানে গিয়ে ট্রাম লাইনে মিশেছে, তার কাছ-বরাবর যেন একটা সোরগোল। হাত বোমা ফাটাবার বিকট আওয়াজ।

এতক্ষণে ভয় কেটে গেল আমাদের। বোরখা ঢাকা মূর্তিটিও আর রহস্যময় নয়। নিজেই বোরখা খুলে নিজমূর্তি নিয়ে দাঁড়িয়েছে। একজন নারী।

দুটো চোখে রাজ্যের ভয় আর মিনতি। ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছে। দুটো হাত যুক্ত করে বুক অবধি তুলে কাঁপা অথচ স্পষ্ট উচ্চস্বরে বললো—আমাকে আশ্রয় দিন আপনারা, আমাকে বাঁচান। ভেতর দিকে একটা নিরাপদ জায়গা দেখিয়ে দিয়ে আমাকে রক্ষা করুন।

ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে গেল আমার কাছে। রাস্তার মোড়ে যেখানে গণ্ডগোলটা হচ্ছে সেখান থেকে আত্মরক্ষার জন্য পালিয়ে এসেছে এই মহিলাটি। কি করে যেন ছিটকে বেরিয়ে এসেছে প্রাণ বাঁচাতে।

কিন্তু কোথায় আশ্রয় দিই? কোথায় লুকিয়ে রাখি? ঘর তো আমাদের একটি।

কি হয়েছে আপনার?

—মিহিরই প্রশ্নটা করলো।

আমাদের ঘরে আগুন দিয়েছে। ঘরের পেছনের দরজা দিয়ে আমি পালিয়ে এসেছি। কিন্তু পেছন পেছন ধাওয়া করছে। বাঁচান বাবু—বাঁচান আমাকে।

রজত বললো—এখানে কোথায় জায়গা দিই বলুন তো আপনাকে। এই ঘরের অবস্থা। না আছে কোন আড়াল না আছে কোন আবডাল।

মেঝের উপর লুটিয়ে পড়লো মহিলাটি। আমার পা জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেললো: আমাকে বাঁচান বাবু, আমার পাঁচ ভরি সোনা আছে, পাঁচশো টাকাও। সব আপনারা নিন। তবু প্রাণে বাঁচান আমাকে।

পা ছাড়িয়ে নিলাম। সরে দাঁড়ালাম। বললাম—আপনার সোনা আর টাকা নিয়ে কি করব? আপনাকে লুকিয়ে রাখবার জায়গা থাকলে নিশ্চয় রাখতাম। দেখছেন তো ঘরের চেহারা।

এখানে শুইয়ে রাখা যাক। একখানা লেপ চাপা দিই।

সমীরই প্রস্তাবটা করলো। এতক্ষণে ওর মুখে যেন একটু হাসি দেখা দিয়েছে। ওর মাথায় সুন্দর চকচকে মতলবটা খেলেছে বলেই হয়তো।

তোর যেমন বুদ্ধি···ব্যঙ্গ করে উঠলো রজতের কণ্ঠ—যারা তাড়া করছে তারা যদি ঘরে ঢোকে? লেপের তলা না দেখে চলে যাবে?

দরজাটা বন্ধ করে দেব?

আরে রাখ তোর মতলব। একজনকে বাঁচাতে গিয়ে আরও চারজন মরবো তোর বুদ্ধি নিলে।

সে মহিলা এখনও আশা ছাড়েনি। আমাদের কথাগুলো যেন গিলে গিলে খাচ্ছে। কাঁদো কাঁদো মুখ। ক্ষণে ক্ষণে চোখের মুখের রং পাল্টাচ্ছে। সমীরের কথায় ওর মুখের রেখা স্থির, শান্ত হয়ে আসছে আর আমার কথায় অস্থির হচ্ছে, বিকৃত হচ্ছে।

আবার কান্না। হাউ-মাউ করে আশ্রয় ভিক্ষা—এবার দয়া করুন বাবু, এবারের মতো বাঁচান আমাকে।

এখানে এ ঘরে থাকলে বাঁচবেন না আপনি। আমরাও না। দুর্বৃত্তরা নিশ্চয় খোঁজ করবে, এদিকের বাড়ি-ঘর সব দেখবে, তন্ন তন্ন করে খুঁজবে। আর সন্ধান

পেলে আস্ত রাখবে না। তার চেয়ে এক কাজ করুন—আপনাকে আমরা একটা গলি দেখিয়ে দিচ্ছি। সেই গলি দিয়ে সোজা চলে যান। মিনিট দশ যেতে পারলেই বেঁচে যাবেন। স্বজাতিদের মধ্যে গিয়ে পড়বেন। গলিটা আমরাই দেখিয়ে দিচ্ছি।

এই অন্ধকার রাত্তিরে কি করে যাব বাবু?

কথা আর বাড়াবেন না। তাহলে জীবনটা যাবে বলে রাখছি। আসুন··

কাঁচু মুখে রজতকে অনুসরণ করলো সেই মহিলা। দরজার বাইরে বেরিয়ে এদিকে ওদিকে দেখে নিলাম। সেই মহিলাও।

উত্তর দিক থেকে তখনও সোরগোল ভেসে আসছে। হৈচৈ চীৎকার! সে অবস্থাতেই কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে গেল, পথে নামলো। আমাকে অনুসরণ করলো। গলিটা দেখিয়ে দিলাম, বললাম—সোজা চলে যান।

পা বাড়ালো আমাদের নির্দেশিত পথে।

তাড়াতাড়ি চলে যান, কারা যেন ছুটে আসছে।

চলে গেল সেই মহিলা। মুহূর্তের মধ্যে চোখের আড়াল হয়ে গেল।

আমরা ঘরে এসে ঢুকে দরজা বন্ধ করতে যাব এমন ছুটতে ছুটতে এল তিনটে যুবক। বাইশ তেইশের মধ্যে বয়েস। একহারা চেহারা। আমাদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে হাঁফাতে লাগলো।

এদিকে একটা লোককে পালিয়ে যেতে দেখেছেন?

কাকে?

বোরখা পরা একটা লোককে?

না তো!

অবাক হওয়ার মতো উত্তর দিলাম আমি।

সে কি! এদিকে যেন এল দেখলাম।

কথার সঙ্গে সঙ্গে ওদের চোখ ঘুরতে লাগলো আমাদের ঘরের ভেতর। একটা গন্ধ এসে লাগলো নাকে। কেমন এক অদ্ভুত গন্ধ। রাস্তার মোড়ে ভাটিখানার পাশ দিয়ে যেতে যেতে এরকম গন্ধই পাই।

আমরা কাকেও দেখিনি।

রজত মুখ খুললো এবার।

তাহলে?

অন্যদিকে গেছে হয়তো।

ওরা বেরিয়ে গেল। যে পথ ধরে এসেছিল সেই পথ ধরেই ছুটতে লাগলো।

খানিকটা গিয়েই শাখা পথ ধরলো উত্তর দিকের গণ্ডগোলের জায়গা থেকে আসতে গেলে বাঁ দিকে প্রথম গলি।

আমরা দরজা বন্ধ করলাম। আবার তাস নিয়ে বসলাম। খেলতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু খেলা আর জমলো না। সকলেই অন্যমনস্ক।

রজত চেষ্টা করলো সেই প্রসঙ্গটা উত্থাপন করতে। কিন্তু বাধা দিল সমীর, বললো :

চুপ কর, কে কোথায় আড়ালে দাঁড়িয়ে শুনবে তারপর যান নিয়ে টানাটানি।

সত্যি তাই। যদি কেউ শোনে, যদি কেউ জানতে পারে আমরা সেই মহিলাকে পালাবার পথ বাতলে দিয়েছি, বিশেষ করে সেই তিনজন গুণ্ডার যদি কানে ওঠে তাহলে ?

ভাবতে গিয়ে বুক কেঁপে উঠলো। খেলা বন্ধ করলাম। শুয়ে পড়লাম। শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলাম। এলোমেলো ভাবনা, বিক্ষিপ্ত চিন্তা।

আচ্ছা, ওকে আশ্রয় দিলে কি হতো ? কি করতে পারতো ঐ তিনজন যুবক। আমরা তো চারজন ছিলাম। গায়ে কি জোরেরও কমতি আছে আমাদের। রজত তো একাই ঘায়েল করতে পারে ওদের তিনজনকে।

শক্তি দেহে আছে বটে মনে নেই। তাই কি ? তাই তো। তা যদি না হবে আশ্রয়প্রার্থীনিকে নিরাশ করলাম কেন ? কেন পথে বের করে দিলাম ? কেন অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে ওকে ছেড়ে দিয়েছি ?

সে কি কোন নিরাপদ আশ্রয়ে পৌছাতে পেরেছে। ঐ গলিপথ ধরে ছুটতে গিয়ে অন্য কোন দুর্বৃত্তের হাতে পড়েনি তো ? হয়তো পড়েছে, হয়তো পড়েনি। কে জানে কি অবস্থা হয়েছে মেয়েটার ?

সে রাতে ঘুমোতে পারলাম না। দুটো চোখ এক করতে পারলাম না।

কিছুতেই ঘুম এল না। শুধু আমার নয়। আমাদের তিনজনের কেউ ঘুমোতে পারিনি। একে অপরের নিশ্বাস গ্রহণ-বর্জন, এপাশ-ওপাশ করাটাকে পর্যন্ত নীরবে অনুভব করেছি। কোন কথা বলার উপায় নেই। বাইরে রাস্তায় মিলিটারী গাড়ি, থেকে থেকে কর্তব্যরত পুলিশ কিংবা মিলিটারীর ভারী বুটের শব্দ তন্দ্রার ঘোরটুকুকে পর্যন্ত কেড়ে নিয়েছে। কখনও ধ্বনি, কখনও আল্লা হো আকবর চীৎকার, চেতনাকে চমকে দিয়ে গেছে। আমরা ছটফট করেছি শুয়ে শুয়ে।

বারবার মনের সামনে এসেছে একটি প্রশ্ন। কেন মেয়েটিকে আশ্রয় দিলাম না ? কেন একটা প্রাণ বাঁচাবার দায়ীত্ব গ্রহণ করলাম না ?

তন্দ্রাহীন রাত শেষ হল এক সময়। প্রভাতী সংবাদপত্র পড়ে জানতে পারলাম কারফিউ সারাদিন শিথিল। কলতলায় স্নান করতে গিয়ে অসীম একবার প্রসঙ্গটাকে তুলবার চেষ্টা করলো, এবং তার ক্ষেত্র তৈরী করতে গিয়ে মিটিমিটি হাসছিল।

ওর দিকে তাকিয়ে বললাম—কি ব্যাপার, হাসছিস কেন ?

—হাসছিলাম, তোদের বোকামী দেখে।

—কি বোকামী ?

এতবড় একটা সুযোগ হাতে পেয়েও যারা ছেড়ে দেয় তারা বোকা নয় তবে কি ?

অসিতের ইঙ্গিতটা বুঝলাম। গম্ভীর হয়ে গেলাম। রাগ হল ওর ওপর। ভাবলাম, একবার ধমকে দিই ওকে। বিরক্তি বোধ হলো আমার। মানুষের জীবন মরণ প্রশ্নে এমন বিশ্রী ইঙ্গিত আমি প্রত্যাশা করিনি অসিতের কাছ থেকে। তবু সহ্য করে গেলাম। নিঃশব্দে।

অসিত আমার নীরবতা থেকে ওর ভুলটা হয়তো বুঝতে পেরে থাকবে। তাই কথাটাকে ঘুরিয়ে দিতে গিয়ে বললো—যে ক'দিন থাকতো আমাদের রান্না-বান্নাটা করতে পার তো। পুরুষের হাতের রান্না খেয়ে খেয়ে মুখে অরুচি ধরে গেছে।

হেসে উত্তর দিতে যাব, এমন সময় দরজার কড়া নাড়তে শুনলাম। বাইরের দোর গোড়া থেকে একটা গলার আওয়াজও পেলাম। অপরিচিত কণ্ঠ কিন্তু মনে হল আমাদের উদ্দেশ্যেই কিছু বলছে। উৎকর্ণ হলাম। স্নানের কাজ অসমাপ্ত রেখে সেদিকে গেলাম।

ঘরের ভেতর দিকে গিয়ে দোর খুললাম।

লোক একজন নয় চার জন। তিন জনের পরনে ধুতি অন্য জনের পাজামা।

পাজামা-পরা লোকটার মুখে দুর্ভাবনার ছায়া। বড রকমের একটা ক্ষতি হয়ে গেছে এনন একটা ভাব। চোখের দৃষ্টিতে ত্রাস।

বললাম—কি বলছেন আপনারা ?

ধুতি-পরা তিন জনের মধ্যে একজন দু'পা এগিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়ালো। বললো—আমি রাজাজী কলেজ ইউনিয়নের সম্পাদক। নাম চন্দন চ্যাটার্জী। এ পাড়াতেই থাকি। আর এরা দু'জন এ পাড়ার সমাজসেবী কর্মী। সুজন বসু আর অতনু বক্সি। তারপর পাজামা-পরা যুবকটির দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে বললো—এ হলো শেখ ওসমান, রাস্তার মোড়ের ঐ বস্তীর বাসিন্দা। শিপ্রা ইঞ্জিনীয়ারিং-এর শ্রমিক।

চন্দন চ্যাটার্জী একটু থামলো। হয়তো তার পরের কথাগুলো গুছিয়ে নিল। ভাবলো কিভাবে বলা যায় আসল ব্যাপারটা। তার পরমুহূর্তেই বলতে শুরু করলো একটু আগে ছেড়ে দেওয়া প্রসঙ্গ। ওসমানের বিপদের কথা।

আর এক বিপদ। কি জবাব দেব ঠিক করে উঠবার আগেই হাতের ইসারায় আমাকে চুপ করতে বললো অসিত। আমি চুপ করলাম।

অসিত বলল—দেখুন, কাল রাত্তিরে আমরা ঘরে দোর দিয়ে তাস খেলছিলাম তখন দরজায় কে বা কারা যেন ধাক্কা দিয়েছিল। একটা মেয়েলি গলাও পেয়েছিলাম। কিন্তু আমরা কোন সাড়া দিইনি।

সে কি!

চন্দন চ্যাটার্জী বিস্ময় প্রকাশ করলো। উৎকর্ণ হল রঞ্জন অতনু।

হ্যাঁ, ভয়ে আমরা দরজা খুলিনি। তখন মনে হলো সেই মহিলা পাশের গলি দিয়ে ছুটতে ছুটতে চলে গেল। শঙ্কিত ত্রস্ত পায়ের শব্দ আমরা শুনেছি।

—এই পাশের গলি দিয়ে?

হ্যাঁ, পাশের গলি দিয়ে।

ধন্যবাদ।

চন্দন চ্যাটার্জী কথাটা উচ্চারণ করেই ঘুরে দাঁড়ালো। সঙ্গে ওর স্বধর্মীরাও। পাজামা-পরা সেই ওসমানের চোখে যেন বিদ্যুৎ-শিখা চমকে গেল। সে আগেই পথে নামলো।

রাস্তায় নেমেই ডান দিকে ঘুরলো ওরা। সেই গলিপথ ধরলো। পাজামা প্রথমে, ধুতি-পরা তিনজনে পেছনে।

অসিত আর আমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলাম। প্রথমে পাজামা, পেছনে ধুতি। চন্দন চ্যাটার্জী আর শেখ ওসমান। আরও দু'জন ধুতি-পরা যুবক। রঞ্জন বসু আর অতনু বসু কখনও পাশাপাশি, কখনও আগু-পিছু হয়ে এগুচ্ছে। দ্রুত অথচ তালে তাল রেখে পা ফেলছে।

মনের মধ্যে হাজারো প্রশ্ন উতরোল হয়ে উঠলো। কারফিউ, শঙ্কা, হৈ-চৈ, গুণ্ডা, পুলিশ, আগুন। আর তার পাশাপাশি এরা চারজন। খুঁজতে বেরিয়েছে গুণ্ডার তাড়া খাওয়া শেখ ওসমানের বৌকে। চোখে-মুখে উৎকণ্ঠা, অথচ পদক্ষেপ সংকল্প দৃপ্ত।

অগ্রসরমান চারজোড়া পা-এর দিকে তাকিয়ে আমার মনে হলো ওরা চারজন নয়, চারজনে একজন। এক চিন্তা, এক ভাবনা, এক লক্ষ্য। চন্দন, শেখ ওসমান, রঞ্জন, অতনু আলাদাভাবে কেউ নয়—একাত্ম এবং অভিন্ন।

উইলিয়ম সারোয়ান

অনুবাদ—ভবানী মুখোপাধ্যায়

বাঁচার মত বাঁচা

বাঁচার মত বাঁচা কাকে বলে, ছেলেটি মেয়েটিকে বল্‌ল, বাঁচার মত বাঁচা বল্‌তে আমি বলি—

এই বলে সে আর একটু হুইসকি গলায় ঢালে।

তারপর প্রশ্ন করে, বিরক্ত করছি না ত'?

মেয়েটি বলে, তুমি জানো আমি বিরক্ত হই না।

আমি যে কথা বল্‌ছি তাতে তোমার তেমন মন নেই। ছেলেটি বলে।

খুব মন আছে আমার। মন দিয়েই ত' শুন্‌ছি।

ছেলেটি বলে, বাঁচার মত বাঁচা বল্‌তে আমি যা বল্‌ছিলাম, বাঁচতে গেলে সব সময়—এই বলে সবটা হুইস্‌কি গলায় ঢেলে ছেলেটা ওয়েটারকে ডাকে—

আরো ডুটো লাগাও, সে হুকুম করে।

ছেলেটাকে বেশ তৃপ্ত, সন্তুষ্ট এবং সুখী দেখাচ্ছে, এদিকে আবার সে বিভ্রান্ত এবং ক্রুদ্ধ এবং দুঃখিত।

সে বল্‌ল—আমি যা সব সময় বলি, বাঁচার মত বাঁচা একে বলে।

মেয়েটি কোনও কথা বলে না। কারণ তার শঙ্কা জাগ্‌ছে মনে ছেলেটা মাতাল হয়ে পড়বে, তারপর ওকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে অনেক হাঙ্গাম পোয়াতে হবে, তা ছাড়া মেয়েটির ভয় সে নিজেও ত' একটু মাতাল হয়ে উঠ্‌তে পারে। মেয়েটি যদি কিছু বলে আর ছেলেটি যদি ওর ভয়ের কথা বোঝে তাহলে হয়ত নম্র হবে আর নয়ত নিশ্চয়ই মাতাল হয়ে উঠে চড়া গলায় কথা বল্‌তে সুরু করবে।

সহসা ছেলেটি বলে উঠে, আমার কিন্তু এ সব ভাল লাগে না, আমার দুঃখ হয় বল্‌তে। কিন্তু আমি আর তোমাকে একটুও ভালবাসিনা।

এই নিছক সারল্যের জন্য মেয়েটি কৃতজ্ঞ, মনে মনে কিন্তু আহত, এক মুহূর্তে মেয়েটির আর কোনো কথা না বলেই উঠে চলে যাওয়ার বাসনা হয়, আর জীবনে কখনো ছেলেটির সঙ্গে সে দেখা করবে না। অথচ সে জানে তা হবার নয়।

এই একটা কাজ, (মেয়েটি বেশ জানে)। সে কখনও করতে পারবে না।

প্রবন্ধ

বিনয় সেনগুপ্ত

কবিতায় ক্ল্যাসিক ও রোম্যাণ্টিক রীতি

কবিতায় ক্ল্যাসিক ও রোম্যাণ্টিক রীতির ব্যবহার, কাব্য সমালোচনার ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য বিতর্কের বিষয় হয়ে আছে। এ দু'টি কেবল বাহ্যিক রীতি বা আঙ্গিকের সমস্যা নয়, এ' কাব্যাত্মার সমস্যা। বহু সমালোচক ক্ল্যাসিক ও রোমাণ্টিক মতবাদকে স্পষ্ট সূত্র দিয়ে সংজ্ঞা দিতে চেয়েছেন। কিন্তু আজও এর কোনও স্পষ্ট সংজ্ঞা নেই, যদিও এ রীতির মধ্যে যে পার্থক্য আছে তা কাব্যপাঠক এবং রসজ্ঞ ব্যক্তিরা বোঝেন।

রোম্যাণ্টিক শব্দটি খুব সাধারণ অর্থে গ্রহণ করে বলা যায় যে কাব্য সৃষ্টি মাত্রেই রোম্যাণ্টিক। কল্পনার ইন্দ্রজালই কবিতা, যা দেখি, যা শুনি, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধে যে জগতকে পাই, তাকে ফটোগ্রাফ করলে কাব্য হয় না। রঙ্ দিতে হয়, সুর দিতে হয়,—সুতরাং এ অনির্বচনীয় ব্যঞ্জনাকে রোম্যাণ্টিক বলতে হবে।

কিন্তু সাহিত্যতত্ত্বে ক্ল্যাসিক ও রোম্যাণ্টিক রীতিকে দু'টি বিশেষ অর্থে ব্যাখ্যা করা হয়। কাব্য-প্রেরণা, কাব্যরূপ সমস্তই এ দু'টি ভিন্ন রীতিতে ব্যাখ্যা করা সম্ভব।

অনেকে মনে করেন ক্ল্যাসিক বলতে পুরান দিনের সাহিত্য বোঝায় বা চিরকাল বেঁচে থাকবে এমন কোন সাহিত্য বোঝায়। ক্ল্যাসিক সুরু হয় প্রাচীন কালে সন্দেহ নাই, কিন্তু আধুনিক কালেও ক্ল্যাসিক রীতি ব্যবহার করা হয়। সুতরাং একে চিরকালীন কিম্বা বিগত দিনের এমন মনে করবার কোন কারণ নেই।

মহাকাব্য হোল প্রাচীন ক্ল্যাসিক রীতির সার্থক রূপ। মহাকবি দুর্লভ বাচনভঙ্গীর অধিকারী হবেন। মহাকাব্য হবে সব দিক থেকে বিরাট। উদাত্ত, সমুন্নত, গৌরবময় ভাব এবং গম্ভীর স্থাপত্য ধর্মীরূপ মহাকাব্যকে সার্থক কোরে তুলবে। সমুদ্র, পাহাড়, অরণ্য, রাজার বিলাস, যুদ্ধ, বিবাহ ইত্যাদি বিরাট বিষয়বস্তু এবং প্রকৃতিরও বিশালরূপ মহাকাব্যে থাকবে। রামায়ণ, মহাভারত, ওডেসি ও ইলিয়ড পৃথিবীর মহাকাব্য—ভাবে, ভাষায়, কাহিনীতে ও বর্ণনায় বিশাল। মহাকাব্যের আদি, অন্ত ও মধ্য থাকবে, সমগ্রতা এবং ঘনসংবদ্ধ জীবন ছবি মহাকাব্যের প্রধান উদ্দেশ্য। মহাকাব্যের যুগে মানুষ মাটির কাছাকাছি ছিল, তাই মানুষের ব্যবহারে বিরাটত্ব থাকত। সূক্ষ্মতা এসেছে জটিলতার সঙ্গে, সুতরাং মহাকাব্যের চিত্রকর সূক্ষ্ম চিত্রাঙ্কণে অভ্যস্ত ছিলেন না। মানুষের প্রেম, যুদ্ধ, বিলাস, জীবন ও মৃত্যু সবই প্রকৃতির খুব কাছাকাছি ছিল ; এজন্যই মহাকাব্যে মহৎভাবের সঙ্গে বীভৎস হিংসা, নিষ্ঠুর মৃত্যু, ব্যাভিচার সহজ সরল ভাবে মিশে আছে। কিন্তু মহাকাব্যের উপসংহারে বিরাট শান্তি, অসীম পবিত্রতা। মহাকবি মহা কল্পনা দিয়ে যে ভাররূপ সৃষ্টি করেছেন, তা সমস্ত খণ্ডকে, সমস্ত অসুন্দরকে আচ্ছন্ন করে সর্বকালের সুন্দরকে প্রতিষ্ঠা করেছে।

মহাকাব্যের যুগ আর নেই। চারখানা মহাকাব্যের পর প্রকৃত মহাকাব্য আর লেখা হয় নি। মিলটনের Paradise Lost বা মধুসূদনের "মেঘনাদ বধ" মহাকাব্যের রীতিতে লেখা গম্ভীর ভাববাহী কাব্য—যথার্থ মহাকাব্য নয়। কিন্তু মহাকাব্যের যুগবিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ক্ল্যাসিক রীতি শেষ হ'য়ে যায় নি। ক্ল্যাসিক রীতি এবং মহাকাব্য এক নয়। ক্ল্যাসিক রীতির বৈশিষ্ট্য হোল বিষয়বস্তু এবং আঙ্গিকে সঙ্গতি সাধনা করা, ভাব ও রূপকে সমন্বয় করা। ক্ল্যাসিকধর্মীতা সংযতসুন্দর আত্মবিশ্বাস ও সংহত সামাজিক জীবনের 'পর নির্ভরশীল। ক্ল্যাসিক কবি প্রেমে আত্মহারা হন না, প্রিয়ার কালোচুলের মধ্যে মৃত্যুর আস্বাদ পান না—তাঁরা প্রেমকে পবিত্র, গভীর, সংযত, সুষম, সৌন্দর্য মনে করেন। মহাকাব্যের যুগ শেষ হবার পর ক্ল্যাসিক রীতির

অনুকরণে প্রাচীন যুগের উত্তাপ, জীবনচাঞ্চল্য অনেকখানি কমে গেল, এমন কি গ্রীকদেশের ক্ল্যাসিক নাট্যকার ও কবি সোফক্লিস ও এসকাইলাস জীবনের ট্র্যাজেডিকে যেমন করে বলেছেন, জীবনের উত্তাপকে, প্রেমের গভীরতাকে তেমন ভাবে প্রকাশ করেন নি। কিন্তু জীবনের দ্বন্দ্বকে তাঁরা অপূর্ব সৌন্দর্যে ফুটিয়ে তুলেছেন।

ইংরেজী সাহিত্যে ড্রাইডেন জনসনের যুগকে ক্ল্যাসিক যুগ বলা হয়। যদিও রেনেসাঁস যুগ ক্ল্যাসিক রীতিরই নবজাগরণ, তবুও নূতন মানবতাবোধ এ জাগরণকে ক্ল্যাসিক মতাবলম্বীদের মত মানুষের সামান্যকরণ (Generalisation) না করে ব্যক্তি মানুষের জয়গানে, উদ্দাম আনন্দে, নূতন সৃষ্টির কাঁপন জাগান উচ্ছ্বাসে মুখরিত করে তুলল—সেক্‌স্‌পীয়র ইংলণ্ডের রেনেসাঁসের কবি ও নাট্যকার। ড্রাইডেন ক্ল্যাসিক রীতি অনুকরণ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ক্ল্যাসিক কাব্যের স্থাপত্যধর্মী বিরাটত্ব তাঁর পক্ষে সৃষ্টি করা সম্ভব হয় নি। সমস্ত ইংরেজী সাহিত্যে মিলটনই ক্ল্যাসিক রীতির প্রধান বাহক। তার শব্দচয়ন, ব্লাংক ভার্স, সর্বব্যাপী বিরাটত্ব তাঁকে ক্ল্যাসিক সাধনার সিদ্ধিতে নিয়ে গেছে। ক্ল্যাসিক কল্পনার দোষ-গুণ সবই তাঁর আছে। Paradise Lost এক বিরাট কবিকীর্তি। এখানে কবির দৃষ্টিতে প্রকৃতি সুন্দর হলেও মানুষের সঙ্গে এক নয়, প্রেম কেবল স্বামী-স্ত্রীর আচরণ ও সমাজ সম্মত বাক্যালাপ—এ প্রেমে গভীরতা হয়ত আছে, অনন্ত শান্তি আছে, সুখ দুঃখে দু'জনে সমভাগ আছে কিন্তু এ প্রেমে গতি নেই, স্থির অচঞ্চল সমাহিত মাধুর্য। কিন্তু নরকের দৃশ্যে, শয়তানের বর্ণনায় মিলটন্ বিচিত্র রঙে, বিপুল Paradise Lost-এ সর্বত্রই চাকচিক্য, মহৎ ভাব, বিরাট রূপ, বিশাল গৌরব।

> "Like that pygmean race
> Beyond the Indian mount ; Or faery elves,
> What midnight, revels by a forest-side
> Or fountain, some belated peasant sees,
> Or dreams he sees, while overhead the Moon
> Sits albetress, and nearer to the Earth
> Wheels her pale course ; they, on their mirth and dance
> Intent, with Jocund music charm his ear ;
> At once with joy and fear his heart rebounds.

সমস্ত Paradise Lost-ই এমনি উপমা দিয়ে সাজান—সর্বত্রই বিরাট ভাববাহী শব্দঝঙ্কার ; চিত্র ও ধ্বনি দুই-ই এ কাব্যগ্রন্থের সম্পদ।

বাংলা কাব্যে মধুসূদন ক্ল্যাসিক রীতিতে মেঘনাদবধ কাব্য লিখেছিলেন—বাংলা সাহিত্যে এ কাব্য একক এবং অদ্বিতীয়। মেঘনাদবধ কাব্যে সর্বত্র

বিরাটত্ব। উপমার পর উপমা সাজিয়ে বিশাল রূপ সৃষ্টি করতে চেয়েছেন মধুসূদন। কবি রাবণের রাজপুরীর বর্ণনা দিচ্ছেন—

> শ্বেত, রক্ত, নীল, পীত স্তম্ভ সারি সারি
> ধরে উচ্চ স্বর্ণছাদ, ফণীন্দ্র যেমতি
> বিস্তারি অযুত ফণা, ধরেন আদরে
> ধরারে! ঝুলিছে ঝলি ঝালরে মুকতা,
> পদ্মরাগ, মরকত, হীরা; যথা ঝোলে
> (খচিত মুকুতা ফুলে) পল্লবের মালা
> ব্রতালয়ে।

মেঘনাদবধ কাব্য বর্ণনার বিশালতায়। উদাত্তভাব সমৃদ্ধতায় ও গৌরব-সমুন্নতিতে ক্ল্যাসিক রীতি সন্দেহ নেই। কিন্তু মধুসূদনের কাব্যে রোমাণ্টিক রীতিও একই সঙ্গে মিশে আছে। ক্ল্যাসিক ভঙ্গীর যে পরিবেশ তা মধুসূদন পান নি, বাংলাদেশে সে পরিবেশ ছিল না, তাই অবিমিশ্র ক্ল্যাসিক কাব্য তিনি রচনা করেন নি।

ক্ল্যাসিক আঙ্গিকের যোগ্য পরিবেশ হোল প্রতিষ্ঠিত সমাজ—মানুষ যেখানে তৃপ্ত, কোন কিছু সাফল্যলাভে আত্মপ্রতিষ্ঠ। এ অবস্থায় তারা কাব্যে সাহিত্যে তাদের ভাবাদর্শের প্রতিচ্ছবি প্রত্যাশা করে। জীবনকে মহৎরূপে, বিরাটরূপে দেখতে চায়। ক্ল্যাসিক রীতি তাই রীতিপ্রধান—ভঙ্গীটি বিশাল হোতেই হবে। ক্ল্যাসিক ভঙ্গী হোল সামান্যীকরণ; এ রীতিতে সবই হোল শ্রেণী প্রতিনিধি। এ জন্যই ক্ল্যাসিক কবি আঙ্গিকে বিশেষ জোর দেন। মানুষের মধ্যে মহৎ ভাব এনে বিহ্বল করে দেন, কাছে টেনে নিয়ে হৃদয়ের মধ্যে আহ্বান করেন না; দূরে থেকে দেখা, মুগ্ধ হওয়া, বিহ্বল হওয়া কিন্তু উত্তাল হৃদয়াবেগে অস্থির হওয়া নয়।

রোমাণ্টিক ভাবনা ও রীতির প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হোল কল্পনা, সাহিত্য সৃষ্টি মাত্রই কল্পনা। কিন্তু রোম্যাণ্টিক কবিরা কল্পনাকেই পরম এবং চরম সত্য বলে মনে করেন। কল্পনাকে একমাত্র সত্য বলে বিশ্বাস করা, ভাবকে বস্তুর চেয়ে বড় মনে করা সহজ নয়। কল্পনার মধ্যে একটি সঙ্গতি, একটি কাল্পনিক যুক্তি, সব মিলিয়ে এক স্বপ্ন জগৎ সৃষ্টি করা, তাতে অচঞ্চল বিশ্বাস করা এবং পাঠককে তা দিয়ে জাগরিত করা কঠিন ব্যাপার। কখন কখন মন রোম্যাণ্টিক হয়ে ওঠে, আকাশ বাতাস, মানুষকে নূতন দৃষ্টিতে দেখতে সুরু করি, আবার পর মুহূর্তেই বাস্তব জগতের দৈনন্দিন সংকীর্ণতায় মগ্ন হই—এমন মনকে রোম্যাণ্টিক বলা যায় না। যিনি পৃথিবীর সমস্ত বাস্তবকে স্বপ্ন দিয়ে

দেখেন, সমস্ত জীবন কল্পনার পাখায় উড়ে চলেন, অথচ এ কল্পনার জগৎই সত্য বলে মানেন তিনিই রোম্যান্টিক কবি। তিনি বাস্তবকে মিথ্যা বলেন না। তিনি বাস্তবকে কল্পনার রসদৃষ্টিতে গ্রহণ করেন। তাই রোম্যান্টিক কবি সব কিছুতে বিস্ময় অনুভব করেন। বিস্ময়, বিমুগ্ধ, সুন্দর রোম্যান্টিক কবির লক্ষ্য। দু'চোখ ভরে যা দেখি তাকে ছাড়িয়ে রয়েছে সৌন্দর্য, অধরা, অদেখা, ভাষাতীত, অনির্বচনীয়, অভাবনীয় ঘিরে আছে মাটির পৃথিবীকে। এ-কে অনুভব করাই মানুষের জীবনের সার্থকতা।

"Sense sublime
Of something far more deeply interfused,
Whose dwelling is the light of setting sun,
And the round ocean and the living air
And the blue sky, and in the mind of man,"
(Wordsworth)

পৃথিবীর মধ্যে Sense sublime-কে পেতে হবে। রোম্যান্টিক কবির এ ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা গানের মত, নিঝরের মত তাঁর কাব্যে প্রবাহিত হয়েছে। রোম্যান্টিক যুগ অস্থির, নূতন কোন দিনের সম্ভাবনায় চঞ্চল, পুরান মূল্যবোধের জীর্ণতায় বিরক্ত। তাই রোম্যান্টিক কবিরা মুক্তি চান, সুন্দরের মধ্যে, কল্পনার মধ্যে—

If I were a swift cloud to fly with thee ;
A wave to pant beneath thy power, and share
The impulse of thy strength, only less free
Than thou ; O uncontrollable. (Shelley)

প্রচণ্ড পশ্চিম হাওয়ার ঝড়ে কবি মুক্তি পেতে চেয়েছেন। "সহে না সহে না আর জীবনেরে খণ্ড খণ্ড করি, দণ্ডে দণ্ডে ক্ষয়"—এ জীবনে মন নেই, ভাব নেই কেবল আছে সংকীর্ণ দৈনন্দিনতা। বাস্তব জগতের এ বন্ধনের বেদনা কবির প্রকৃতিপ্রেম, মানবপ্রেম বা সৌন্দর্যবোধকে নষ্ট করে নি। যেদিকে তাঁরা দেখছেন বিস্মিত হচ্ছেন—

"I can not see what flowers are at my feet,
Nor what soft incense hangs upon the boughs,
But in embalmed darkness, guess each sweet
Wherewith the seasonable month endows.
The grass, the thicket, and the fruit tree wild,"
Or
Charmed magic casements, opening on the foam
Of perilous seas, in faery lands forlorn.

কবি যখন প্রকৃতি বর্ণনা করেন তখন তা স্থাপত্যধর্মী নয়, সূক্ষ্মচিত্রধর্মী।

আমরা হৃদয়ের দোলা দিয়ে কবির হৃদয়স্পন্দন অনুভব করি, কান পেতে শুনি কবি কণ্ঠের ব্যাকুল আকুতি। এ কাব্য ক্ল্যাসিক কাব্যের মত কেবল বিমুগ্ধ করে না, টেনে নেয়, ভরে দেয়, ডুবিয়ে দেয়। এ দূর থেকে সমুদ্র দেখা নয়, সমুদ্রের মধ্যে ডুব দেওয়া।

বাংলা সাহিত্যে শ্রেষ্ঠতম রোম্যান্টিক কবি রবীন্দ্রনাথ। প্রভাত সঙ্গীতে কবি ফেনিল সলিলকে ফুলতে দেখেছেন, দুলতে দেখেছেন, চারিদিকে পাষাণ কারার বাঁধন দেখতে পেয়েছেন, আর সমস্ত জীবন বসে ঐ কারা ভেঙ্গেছেন।

রবীন্দ্রনাথ কল্পনাকেই একমাত্র সত্য বলে জানতেন। বস্তু সত্যকে তিনি কল্পনা সত্যের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছিলেন তাই কোনদিন তাঁর কাব্যে দ্বিধা নেই। প্রেমে, প্রকৃতিতে, মানুষে সর্বত্র কবি কল্পনার সত্য প্রয়োগ করেছেন—

> দুয়ার বাহিরে যেমন চাহি রে,
> মনে হোল যেন চিনি, কবে নিরুপমা
> ওগো প্রিয়তমা, ছিলে লীলাসঙ্গীনী।

সমস্ত প্রেমের মধ্যেই এ লীলা সঙ্গিনী ; কখন সুধা নিয়ে, কখনও দৈনন্দিন জীবনের সামগ্রী নিয়ে। এক মানসলোকের অধরা মানসী চিরদিন কবিকে হাসাল, কাঁদাল, চিরদিন দিল ফাঁকি। রবীন্দ্রনাথ জন্ম-রোম্যান্টিক—

> আমারে বলে যে ওরা রোম্যাণ্টিক
> সে কথা মানিয়া লই রসতীর্থ পথের পথিক।
> মোর উত্তরীয়ে,
> রঙ লাগায়েছি প্রিয়ে।
> দুয়ার-বাহিরে তব আসি যবে
> সুর করে ডাকি আমি ভোরের ভৈরবে।

কিন্তু যেখানে দুঃখ, দৈন্য, কুশ্রীতা--

> শৌখিন বাস্তব যেন সেথা নাহি হই।
> সেথায় সুন্দর যেন ভৈরবের সাথে
> চলে হাতে হাতে।

প্রকৃত রোম্যান্টিক কবি জগতের দুঃখকে অস্বীকার করে পালিয়ে যান না। মৃত্যু বা ধ্বংসকেও তিনি রোম্যান্টিক ভাবে দেখেন। আমাদের বাস্তব বুদ্ধিতে মনে হয়, এ বুঝি পলায়নী ভাব।

রোম্যান্টিক কবিরা সামান্যের মধ্যে অসামান্যকে দেখেন। মানুষকে শ্রেণীগত না ভেবে, ব্যক্তিগত মানুষের সুখ, দুঃখ, আবেগ-অনুভবের সামান্য

ওঠা-নামা তাঁদের কল্পনায় তাঁরা স্থান দেন। রোম্যান্টিক কবিতায় কোন মানসী মূর্তি কবির কল্পনা জুড়ে থাকে। "তুমি" বা অন্য কোন নারী কবির কল্পনার সৃষ্টি মাত্র, এক মানসী প্রতীক। অন্তরতম আকুতির বাইরের একটা প্রতীক পরিচয়।

> "সব পাখি ঘরে আসে—সব নদী—ফুরায় এ-জীবনের সব লেন দেন ;
> থাকে শুধু অন্ধকার ; মুখোমুখি বসিবার। বনলতা সেন।"

এ বনলতা সেনের কোন ঠিকানা নেই—অন্ধকার বিদিশার নিশায় ঘিরে আছে তাকে। হয়ত কোন মুহূর্তে পাখির নীড়ের মত চোখ তুলে সে তাকায়—মন ভরে ওঠে, মাঝে মাঝে পরশ পায় সকলে কিন্তু সে অধরা।

> "দেখলাম তোমার নীল চোখ মিলেছে
> সমুদ্রের নীলিমায়।
> মনে হলো কোন হারান দিনের সীমা ভেঙ্গে দিয়ে এলো
> বিগত কোন চঞ্চল সুন্দর বিষন্ন বিস্মরণ।
> কোন অতল থেকে তোমার ডাক
> নূতন করে আমার রক্তে বান ডাকল।"

এ হোল মনের আকুতি, অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ সব কাল জুড়েই এর সন্ধান। ক্ল্যাসিক কবি ভাবকে জানেন, সে ভাব দিয়ে রূপকে সাজান, রোম্যান্টিক কবি ভাবকে খোঁজেন, রূপের মধ্যে অরূপকে চান।

অনেকে বলেন ক্ল্যাসিক কাব্য স্বাস্থ্য, আর রোম্যান্টিক কাব্য রোগ। ক্ল্যাসিক কবিতা একটি প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধে রূপায়িত হয়, তাই দৃঢ় সংযম, উদাত্ত বিরাটত্ব দিয়ে এ-কবিতা সমৃদ্ধ ভাব বহন করে। আর ক্ল্যাসিক যুগ বলতে যে যুগ বোঝায় সে যুগে সামাজিক জীবনও প্রতিষ্ঠিত ; আত্মবিশ্বাস স্থির। এজন্যই এ যুগকে স্বাস্থ্য বলা হয়। রোম্যান্টিক যুগ অস্থির, রোম্যান্টিক কবিরাও অস্থির, অস্থিরতা একটা রোগ। কিন্তু এ রকম সিদ্ধান্ত অর্থহীন। প্রকৃতপক্ষে সাহিত্যের রীতি হিসাবে একটি ভঙ্গীর পার্থক্য আছে কিন্তু এ রীতির কোনটিই রোগ বা স্বাস্থ্যের পরিচয় বহন করে না।

ক্ল্যাসিক রীতির সীমাবদ্ধতা আছে। ক্ল্যাসিক রীতির ভঙ্গী-সর্বস্বতা অনেক সময় কবিতাকে ম্লান করে, প্রেরণাহীন আঙ্গিক কেবল কবিতার বহিরঙ্গ নিয়ে ব্যস্ত থাকে।

রোম্যান্টিক রীতিরও সীমাবদ্ধতা আছে। কল্পনার সঙ্গতিপূর্ণতা এবং ভাবসত্যে বিশ্বাস অনেক সময় রোম্যান্টিক কবিরা হারিয়ে ফেলেন। অনেক সময় বাস্তবকে এড়াবার জন্য একটা কল্পনাকেন্দ্রিক আশ্রয় তৈরী করেন। জীবনবোধ অগভীর হোলে কেবল রোম্যান্টিক ভঙ্গীতে মানুষ বেঁচে থাকতে চায়। একে অসুস্থ রীতিই বলতে হয়। ক্ল্যাসিক রীতি কঠিন, রোম্যান্টিক

রীতিও কঠিন, কিন্তু সাধারণ কবির পক্ষে ক্ল্যাসিক রীতির চেয়ে রোম্যান্টিক রীতি অনুসরণ করা সহজ, কারণ এতে জীবনের বিমর্ষতাকেই কাব্য বলে চালান যায়। নিম্নস্তরের রোম্যান্স, অগভীর ও সম্পূর্ণ বহির্মুখীন ভঙ্গীসর্বস্ব কবিয়ানাও অনেক সময় রোম্যান্টিক কবিতা বলে প্রচলিত হয়। রবীন্দ্রনাথ, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, শেলী বা কীটস্‌-এর মত মহৎ কল্পনার অধিকারী এবং যথার্থ রোম্যান্টিকধর্মী কবি পৃথিবীতে আর নেই।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যে এ দু'টি ভঙ্গীই মিশে থাকে। মহাকাব্যগুলিতে রোম্যান্টিক রীতি অনুপস্থিত নয়। শেলী, কীটস্‌ বা রবীন্দ্রনাথের কবিতায়ও ক্ল্যাসিক রীতি আছে। রবীন্দ্রনাথ রোম্যান্টিক আবেগ প্রকাশ করবার সময়ও ক্ল্যাসিক সংযম রক্ষা করেছেন।

> "অচল অবরোধে আবদ্ধ পৃথিবী, মেঘলোকে উধাও পৃথিবী
> গিরিশৃঙ্গমালার মহৎ মৌনে ধ্যান নিমগ্না পৃথিবী,
> নীলাম্বুরাশির অতন্দ্রতরঙ্গে কলমন্দ্রমুখরা পৃথিবী
> অন্নপূর্ণা তুমি সুন্দরী, অন্নরিক্তা তুমি ভীষণা।"

এখানে রোম্যান্টিক কবি ক্ল্যাসিক সংযম এবং উদাত্ত বিরাট ভাব প্রকাশ করেছেন। মিলটন বা মধুসূদনেও রোম্যান্টিক ভাব আছে। হৃদয়াবেগ যখন তরঙ্গের মত অস্থির, তাকে চঞ্চল রেখেও যদি স্থির সংযমে প্রকাশ করা যায় তবেই তো প্রকৃত কাব্য। এখানেই ক্ল্যাসিক ও রোম্যান্টিক আঙ্গিকের সমন্বয়।

> **"Let us go then, you and I,**
> **When the evening is spread out against the sky**
> **Like a patient etherised upon a table ;**
> **Let us go, through certain half-deserted streets,**
> **The muttering retreats**
> **Of restless nights in one-night cheap hotels**
> **And sawdust restaurants with oyster-shells :**

এলিয়টের এ কাব্যাংশে আধুনিক জীবনের দুঃসহ বেদনার অস্থির বেগ রয়েছে কিন্তু প্রকাশভঙ্গীতে কবি সংযত।

সুতরাং ক্ল্যাসিক ও রোম্যান্টিক রীতির পার্থক্য থাকলেও তারা সহঅবস্থানে অক্ষম নয়। ক্ল্যাসিক রীতি হোল সুন্দরের মধ্যে সঙ্গতি (quality of order in beauty); রোম্যান্টিক রীতি হোল সুন্দরের সঙ্গে বিস্ময়বোধ বা (strangeness to beauty) ক্ল্যাসিক কবি তাই অনেক সময় order সঙ্গতি রাখতে গিয়ে beauty-কে ত্যাগ করেন, রোম্যান্টিকগণ বিস্ময়ের আত্যান্তিক আতিশয্যে সুন্দরকে অস্পষ্ট করে ফেলেন। এ দু'টি বিপদ থেকে কাব্যকে বাঁচিয়ে এ দু'টি রীতির সার্থক প্রয়োগে কাব্য যথার্থ মহৎ কাব্য হবে।

গ ল্প

রমাপতি বসু

অলাতচক্র

—টুলু ভেতরে এসো। বিভার কণ্ঠে কেমন যেন উদ্বিগ্ন ভাব।

পাঁচ বছরের মেয়ে টুলুকে সামলাতেই বিভার সারাদিন কেটে যায়। মুহূর্তের জন্য চোখের আড়াল হ'লেই বিভাকে ভাবনায় পেয়ে বসে।

বিভা আবার ডাকে: টুলু ভেতরে এসো।

টুলু মার ডাক শুনেও যেন শোনে না। কার সংগে যেন সে কথা বলছে। বিভা শুনতে পায়—টুলু বলছে, 'আমি এখন খাব। আমার খুব খিদে পেয়েছে। তুমি বিকেল বেলা এসো—আমি তখন তোমার সংগে খেলা করবো। সত্যি বলছি, বিকেল বেলা খেলা করবো।'

বিভা ব্যস্ত হ'য়ে ঘরের বাইরে চলে যায়। সে দেখে টুলু এক দৃষ্টে চেয়ে আছে হাস্নুহানা গাছের দিকে। কে যেন এই মাত্র চলে গেল—তারই চলে যাওয়া পথের দিকে টুলু চেয়ে আছে।

বিভা এসে মেয়ের হাত ধরে। তারপর সে জিগ্যেস করে: কার সঙ্গে কথা বলছিলে?

টুলু বলে : কেন সণ্টু দার সংগে।

—সণ্টু দা ? সে আবার কে ? বিভার মুখে বিস্ময়ের ভাব !

টুলু বেশ সহজ ভাবেই বলে : আমার দাদা।

বিভা আর কোন উত্তর না দিয়েই মেয়েকে সংগে করে ঘরে চলে আসে।

এক মাসও হয়নি বিভারা এ পাড়ায় ভাড়া এসেছে। পাড়া প্রতিবেশী কারু সংগে এখন তেমন আলাপ হয়নি। তা ছাড়া, এ পাড়ার লোকজনরা খুব একটা মেলামেশা করে বলে মনে হয় না। সামনের বাড়ীর মেয়েদের সংগে বিভার সারাদিন অন্তত একশোবার চোখাচোখি হয়, কিন্তু ওদের কেউই বিভার সংগে আলাপ করতে এগিয়ে আসে না। যে যার নিজের ব্যাপার নিয়ে থাকে।

বিভা অবশ্য চায় তার প্রতিবেশীদের সংগে আলাপ জমাতে। কিন্তু প্রতিবেশীরা যদি আলাপ করতে না চায় তো—বিভা সে জন্য কি করতে পারে ?

মেয়েকে নিয়েই বিভা ব্যস্ত। সব সময়ই শোনা যায় বিভা ডাকছে : টুলু… টুলু…টুলু।

হাস্নুহানা ফুলের গন্ধ, বৃষ্টি আর অন্ধকার।

বিভার বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে ওঠে। বাড়ী বদল করেও তার স্বস্তি নেই। স্বামী স্ত্রীর সংসার। স্বামী—নিখিলেশ সেই সকালে অফিসে চলে যায় আর আসে রাত্রি আটটা নটায়। সংসারের সব কিছুই বিভা করে। পাড়ার লোকেরা দেখে বিভা টুলুকে নিয়েই দোকান বাজার করে। চাকর বাকরদের কাছে মেয়েকে রেখেও বিশ্বাস হয় না বিভার।

পরের দিন টুলু বাড়ীর বাইরে ছোট্ট বাগানে আপন মনে খেলা করে। বিভা ওকে হাস্নুহানা ঝোপের দিকে যেতে বারণ করে দিয়েছে। বাড়ীর বাইরে—সামনেটায় ঘাসের ওপর টুলু খেলা করুক—তাতে কিছু যায় আসে না, কিন্তু ঝোপ ঝাড়ে গিয়ে লাভ কি ? হানাগাছে নাকি সাপ থাকে।

বিভা শোনে টুলু যেন কার সংগে আজ আবার কথা বলছে। টুলু বলছে : 'ঝোপের দিকে আমি যাব না। মা যেতে বারণ করেছে। চকলেট খাব। আমি রোজ চকলেট খাই। জানো না তুমি—মা আমাকে ভীষণ ভালবাসে। আমাকে নতুন জামা দিয়েছে। এই তো আমি পরে আছি। মা আমাকে খুব আদর করে। না—না আমি এখন খেলতে যাব না।'

—টুলু। বিভা চীৎকার করে ডেকে ওঠে।

টুলুর কোনও সাড়া পাওয়া যায় না। বিভা ব্যস্ত হ'য়ে বেরিয়ে পড়ে।

টুলু মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে আছে। বিভা টুলুর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করে : কার সংগে কথা বলছিলে ?

টুলু বলে : সণ্টুদার সংগে।

—কোথায় সণ্টুদা ?

—ঐ তো চলে গেল। টুলু হাস্নুহানার ঝোপের দিকটা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়।

বিভার মোটেই ভাল লাগে না।

বিভা জিগ্যেস করে : কে সণ্টুদা ?

—আমার দাদা হয়। আমার চেয়ে বড়। টুলু তার হাত উঁচু করে বিভাকে বোঝাতে চেষ্টা করে।

—কি বলছিল ?

—আমার সংগে খেলতে চায়। আমি চকলেট দিলুম, খেল। তোমার কথাও বললুম। এই বলে টুলু বিভার কাপড়ে মুখ লুকাল। ঠিক লজ্জা নয়, মার কাছে অনেকটা আব্দার করার মত। কিম্বা, মা যাতে সণ্টুর সংগে কথা বলতে বা খেলতে দেয়।

বিভা মেয়েকে সংগে করে ঘরে নিয়ে আসে। সে শুনতে পায় টুলু কার সংগে কথা বলছে, কিন্তু বাইরে গিয়ে আর তাকে দেখতে পায় না। সণ্টু কে ? কাদের বাড়ীর ছেলে—তা জানতে ইচ্ছে করে বিভার। রাত্রে নিখিলেশ যখন ফিরলো—তখন বিভা তাকে টুলুর কথা বললো। বিভা এ বিষয় নিয়ে যত বেশী চিন্তা করে, নিখিলেশ বিভার মুখ থেকে সব কিছু শোনার পরও সব কিছু হাল্‌কা ভাবে নেয়।

বিভা বলে : তুমি যত সহজ ভাবে সব কিছু নিচ্ছ, এ ব্যাপারটা ততো সহজ নয়।

নিখিলেশ বলে : কিছু ভেবো না। ছেলেরা আপন মনে কথা বলে থাকে। মেয়েরা যখন পুতুল খেলে তখন একবার সে বর হয়, আবার একবার সে বৌ হয়ে কথা বলে। নিজের মনে মনে কথা বলে, ভাবে, হাসে আবার সব কিছু ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মা কি বাবার কাছে ছুটে আসে। বড় হলে সব ঠিক হ'য়ে যাবে। তুমি এ নিয়ে কিছুই ভেবো না।

বিভা বলে : আমার কিন্তু মোটেই ভাল লাগছে না।

নিখিলেশ বিভাকে বলে : এখানে ওর খেলার কোন সংগী নেই, তাই একজন সণ্টু বা মণ্টু মনে করে ও কথা বলে।

—তা হ'তে পারে, কিন্তু এও তো একটা ভাবনার কথা। নিজে নিজে এমনি কথা বলতে বলতে শেষে মাথার গোলমাল না হ'য়ে যায়।

নিখিলেশ বিভার কথা শুনে জোরে হেসে ওঠে।

বিভার কিন্তু তা মোটেই ভাল লাগে না। সে বলে: তুমি সব ব্যাপারটাকে হাসির ব্যাপার বলে উড়িয়ে দিচ্ছ। আমি নিজের কানে শুনেছি টুলু বেশ জোরে জোরে কথা বলছে। ছেলেটা ওকে ওদিকের ঝোপের মধ্যে খেলতে যেতেও বলেছে।

—না—না। ঝোপ ঝাড়ে যেন টুলু যায় না।

—আমার তো তাই ভয়। আমি ক'দিন ধরেই লক্ষ্য রাখছি। টুলু কথা বলে। আমি ডাকলে সাড়া দেয় না। চুপ করে যায়।

নিখিলেশ বলে: তুমি ঐ সণ্টু না মণ্টু—ওকে দেখেছো?

বিভা একটু রাগ দেখিয়ে বলে: আসল ব্যাপারটা তুমি কিছুই বুঝতে পার নি। সণ্টু—মণ্টু কারুকে আমি কখন দেখতে পাইনি। টুলুকে কথা বলতে শুনলেই আমি বাইরে গিয়ে জিগ্যেস করি: কার সংগে কথা বলছো? কোথায় সণ্টুদা? টুলু অমনি বলে, ঐ চলে গেল।

নিখিলেশ বলে: আমি তো তাই জিগ্যেস করছি, তুমি কি সণ্টু বলে কারুকে কোনদিন দেখতে পেয়েছো?

—না। কোনদিন নয়।

—দেখতে পাবে না। টুলু নিজের মনে কল্পনা করে আর কথা বলে।

—কিন্তু…

—এর মধ্যে কিন্তুর কিছু নেই। ছেলেমেয়েরা ছোটবেলায় এমন করেই থাকে।

বিভা বলে: আমার কি ইচ্ছে জানো—

নিখিলেশ জিগ্যেস করে: কি?

—একজন কোন বড় ডাক্তারকে দেখাও।

ঠিক হ'লো তাই হবে। পরে একদিন বিভা ও নিখিলেশ টুলুকে নিয়ে গেল একজন বিশেষজ্ঞের কাছে।

স্বামী-স্ত্রী ওরা বাহিরের ঘরে অপেক্ষা করে আর টুলুকে নিয়ে পরীক্ষা করে ডাক্তার। ওরা শুনতে পায় টুলু প্রাণ খুলে হাসছে। এমন ভাবে ওকে হাসতে কখন দেখা যায় নি। ডাক্তার বোধ হয় কোন মজার কথা বলেছে তাই সে হাসছে। নয় তো বিকৃতির লক্ষণ দেখা দিয়েছে।

সমস্ত জিনিসটা বিভার কাছে কেমন যেন গোলমাল বলে মনে হয়।

নিখিলেশ বলে : অত ভাবছো কেন? দেখই না ডাক্তার কি বলে!

বিভা অনুমান করে নেয়—টুলুর মাথা খারাপের লক্ষণ দেখা গেছে। মেয়েকে নিয়ে সে এতদিন ঘর করছে, অথচ তাকে এমনভাবে হাসতে কখন দেখেনি।

ওদের স্বামী-স্ত্রীর মুখে চোখে কেমন যেন উদ্বিগ্ন ভাব।

ডাক্তার টুলুকে নিয়েই ঘরে এলেন। নিখিলেশ ও বিভা দুজনেই এগিয়ে গেল ডাক্তারের কাছে। ওরা কিছু বলার আগেই ডাক্তার বললেন : কিচ্ছু হয়নি। খুব নর্মাল কেস।

বিভা বলে উঠলো : তবে যে ও হাসছিলো।

—হাসবে না?

—না না। হাসবে না কেন? তবে বাড়ীতে ও এমন ভাবে কখনো হাসেনি।

ডাক্তার বললেন : আমি ওর সংগে মজার কথা বলছিলাম, তাই ও হাসছিল।

বিভা ও নিখিলেশ চুপ করে থাকে। টুলুকে দেখে ডাক্তার কি বলেন তার জন্য ওরা অপেক্ষা করে থাকে।

ডাক্তার বেশ পরিষ্কার জানিয়ে দেয় : আপনাদের মেয়ের মধ্যে কোন অস্বাভাবিকতার লক্ষণ নেই। শিশুদের মধ্যে এমন ভাব দেখা যায়। স্কুলে গেলে বা সংগী পেলে সব ঠিক হ'য়ে যাবে। নিখিলেশ ও বিভা মেয়েকে নিয়ে বাড়ী ফিরলো।

নিখিলেশ যা এতদিন বলে এসেছে—ডাক্তারও সেই কথা বললেন। কিন্তু বিভার মন এতে কিছুতেই সায় দেয় না।

বিভা লক্ষ্য করে টুলু কথায় কথায় সন্টুদার কথা বলে। খেতে বসে সন্টুদার জন্য কিছু না কিছু গোপন করে সরিয়ে রাখে। বিকেল বেলা ঘরের বাইরে ছোট মোড়ার ওপর বসে একবার হয়তো চীৎকার করে ডাক দেয় : সন্টুদা—সন্টুদা। এদিকে এসো। আমাকে দেখে লুকিয়ে পড়ছো কেন?

টুলুর কথা শুনে বিভা ছুটে বাইরে আসে। কিন্তু কোথায় টুলুর সন্টুদা।

হাস্নুহানার ঝোপের দিকে আঙুল দেখিয়ে টুলু বলে : ঐ দেখ লুকিয়ে পড়েছে তোমাকে আসতে দেখে।

বিভার সন্দেহ আরো বেড়ে যায়। নিখিলেশ অফিস থেকে ফিরলেই বিভার

মুখে এক কথা। শুধু তার অভিযোগ—সারাদিন সে মেয়ের জন্য হয়রান হ'য়ে থাকে।

ওরা স্থির করে টুলুকে নার্সারি স্কুলে ভর্তি করে দেবে। স্কুলে সংগী পেলে টুলুর মনের পরিবর্তন হবে। এত নিঃসংগতা তখন আর থাকবে না।

স্কুলে যাবার দিন টুলু আর স্কুলে যেতে চায় না। সণ্টুদা স্কুলে না গেলে সে কিছুতেই যাবে না। বিভার এখন অসহ্য লাগে সণ্টুর নাম। মেয়েকে এক রকম ধমক দিয়েই সে স্কুলে পৌঁছে দেয়। কিন্তু এতে খুব সুফল দেখা গেল না। মেয়ে স্কুলে যায় শুকনো মুখে এবং বাড়ী যখন ফেরে যেন আবার কেমন আনমনা ভাব।

নিখিলেশ ও বিভা লক্ষ্য করে টুলুর স্বভাবটা যেন ক্রমে বদলে যাচ্ছে।

বিভা তাই একদিন টুলুকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে গেল "অনাথ আশ্রমে"র সুপারিনটেনডেণ্ট শান্তিলতা মিত্রের সংগে দেখা করতে। বিভাকে দেখে শান্তিলতা খুব প্রীত হন, কিন্তু তার অনুরোধ জানতে পেরে তিনি বেশ মুষড়ে পড়েন। এমন অনুরোধ সহজে কেউ তাঁকে করে না, আর তা ছাড়া অনুরোধ রক্ষা করাও বেশ কঠিন। বিভা একরকম পীড়াপীড়ি শুরু করলো।

শান্তিলতা বললেন: তোমার জন্য আমি আশ্রমের নিয়ম ভংগ করলাম। অনাথ শিশুদের অতীত বলা নিয়মবিরুদ্ধ। তবে তোমাকে আমি বিশ্বাস করি। আর তা ছাড়া তোমার সংগে আমার একটা আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে। শোন—টুলু খুব গরীবের ঘরের মেয়ে। ওরা থাকতো মাণিকতলার কাছে একটা বাড়ীতে। ওর বাবার আয় খুব কম ছিল। ওর মা, বাবা ও আর একটি ভাই ছিল। ওরা এত গরীব যে প্রতিদিন ওদের দু'বেলা দু'মুঠো খাবারও জুটতো না। টুলুর আগমন তাই ওদের কাছে সম্পূর্ণ অবাঞ্ছিত বলে মনে হয়েছিল। টুলুর একটি ভাই ছিল তার নাম সণ্টু। সণ্টু টুলুকে ভীষণ ভালবাসতো। একটি মুহূর্তের জন্যও সে তার বোনকে কাছ-ছাড়া করতো না।

হঠাৎ একদিন ওদের বাড়ীর একতলার বাসিন্দা মিসেস বিশ্বাস দেখলেন, কি যেন একটা ভারী মতন জিনিষ ওপর থেকে পড়লো। তখন আবার সবে সন্ধ্যে হ'য়েছে। মিসেস বিশ্বাস আলো জেলে দেখেন সণ্টু ওপর থেকে পড়ে গেছে আর বুকের ওপর পড়ে রয়েছে তার বোনটা। দেখতে দেখতে খুব ভীড় জমে গেল। সবাই মিলে ওদের ঘরে গিয়ে দেখে ঘর ভিতর থেকে বন্ধ। পুলিশ

এসে দরজা ভেঙে ফেললো। তখন দেখা গেল—টুলুর মা ও বাবা বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছে, আর একটা চিঠিতে লিখে গেছে—দারিদ্র্যের জ্বালা অসহ্য। তাই সপরিবারে বিষ খেয়ে আমরা মৃত্যুর পথ বেছে নিয়েছি। এর জন্য আমাদের কারু বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। আমাদের মৃত্যুর জন্য আমরাই দায়ী। টুলু ছাড়া ওদের পরিবারের সবাই মারা যায়। তারপরই আমরা টুলুকে এই আশ্রমে এনে রেখেছিলাম।

বিভা সব কথা শোনার পর শুধু জিজ্ঞেস করলো: আচ্ছা মাণিকতলার কোথায় ওদের বাড়ী ছিল?

শান্তিলতা বললেন: আমার সঠিক জানা নেই, তোমাকে আমি ঠিকানা দিতে পারি। তবে কি জানো বিভা সে-বাড়ীতে এখন শুধু মিসেস বিশ্বাস আছেন, আর কেউ নেই। বাড়ীটা কর্পোরেশন থেকে পুরোনো বাড়ী বলে ভেঙে ফেলার হুকুম হ'য়েছে। তুমি একটু বোস—আমি তোমাকে ঠিকানাটা বলে দিচ্ছি।

ঐ দিনই বিভা খুঁজে খুঁজে যায় মাণিকতলায় টুলুরা যে বাড়ীতে থাকতো সেই বাড়ীতে। মস্ত এক চারতলা বাড়ী, সারা বাড়ীটা ইঁটের স্তূপ। যে কোন মুহূর্তে হুড় মুড় করে পড়ে যেতে পারে। বিভা ঘুরে ঘুরে দেখে।

সব কিছু খুঁটিয়ে দেখতে থাকে। হঠাৎ এক বৃদ্ধার কণ্ঠ স্বর শুনে চমকে ওঠে বিভা। বৃদ্ধার দিকে চোখ পড়তেই বিভার মনে হয় বৃদ্ধা এই বাড়ীটার মতনই প্রাচীনা। পঙ্গু, অথর্ব। বিভার দিকে তাকিয়ে এক রকম মুখঝামটা দিয়েই বৃদ্ধা বলল: কি চাই? দুপুর বেলা এত উঁকি ঝুঁকি মারছো কেন বাছা?

চমকে ওঠে বিভা বৃদ্ধার কথা বলার ভংগী দেখে।

—কি চাই তোমার বল তো?

বিভা খুব শান্তভাবেই জিগ্যেস করে: এ বাড়ীটা কি ভাড়া দেবে?

এই কথা শোনার পর বিভার খুব কাছে এসে সে বললে: এ বাড়ীতে কোন মানুষ বাস করতে পারবে না। প্রতি রাত্রে ভুতুড়ে কাণ্ড হয়। কেউ এখানে তিন দিনের বেশী টিকতে পারে না। কত লোকই তো এখানে এসে থাকতে চেষ্টা করেছে।

বিভা জিগ্যেস করে: কতদিন এমন কাণ্ড চলছে?

—তা প্রায় তিন বছর হবে। একটা ছেলে ওপর থেকে পড়ে মারা যায়।

বিভা বলে ফেলে : সণ্টু না মণ্টু।

বৃদ্ধা প্রতিবাদের সুরে বললে : মণ্টু কেন হতে যাবে? আমার চোখের সামনে কাণ্ড হ'য়েছে। ছেলেটা তার বোনকে খুব ভালবাসতো। মা বাবা বিষ খেয়ে মরে। ছেলেটা নিজেও তার বোনকে বাঁচাবার জন্য ওপর থেকে ঝাঁপ দেয়। আহা কি সুন্দর না দেখতে ছিল সণ্টুকে! দু'জনেই ওপর থেকে পড়েছিল। মেয়েটা ভগবানের কৃপায় বেঁচে যায়, কিন্তু ছেলেটা বাঁচেনি। রাত্রে সারা বাড়ীতে সে দৌরাত্ম্য করে বেড়ায়। ওর জন্য এ বাড়ীতে কেউই টিকতে পারে না। আর তা ছাড়া বাড়ী তো খসে পড়ছে। ভাড়া নেবেই বা কে?

বিভা আর কোন কথা না বলে ওখান থেকে চলে আসে। বড় দেরী হ'য়ে গেছে বিভার। টুলুকে স্কুল থেকে বাড়ী নিয়ে যেতে হবে। জোরে জোরে পা ফেলে সে চলে। বাস স্টপেজে এসে দেখে বাস নেই। কোথায় যেন কি একটা গোলমাল হ'য়েছে। বড় দেরী করে ফেলেছে বিভা।

বাসের জন্য অপেক্ষা করার মতন তার মনের অবস্থা নয়। ব্যস্ত হ'য়ে ওঠে বিভা। একটা ট্যাক্সি ডেকে উঠে বসে বিভা। ট্যাক্সি বেশ জোরে চলে। পথে শিক্ষকদের মিছিল বেরিয়েছে—পথ বন্ধ। বিভা ট্যাক্সিকে ঘুরিয়ে নিয়ে ভিন্ন পথ দিয়ে যায়। যখন সে স্কুলে পৌঁছলো—তখন বেশ দেরী হ'য়ে গেছে। স্কুলের ছুটী হ'য়ে গেছে ছেলেমেয়েরা যে যার বাড়ীও চলে গেছে। বিভা খুব ব্যস্ত হ'য়েই স্কুলে গিয়ে উপস্থিত হয়। একজন শিক্ষিকা কয়েকটি মেয়েকে কি যেন শেখাচ্ছে।

শিক্ষিকাটি বিভার খুব মুখ-চেনা। আলাপ নেই কিন্তু এই ক'দিন দেখা-শোনা হওয়ায় যা চোখে চোখে আলাপ।

বিভাকে ব্যস্ত হ'য়ে আসতে দেখেই শিক্ষিকা বললেন : আপনার মেয়েকে নিয়ে যেতে এসেছেন?

বিভা সংক্ষেপে বলে : হাঁ।

শিক্ষিকা এবার বললে : কিন্তু টুলু তো বাড়ী চলে গেছে।

—কার সংগে গেল?

—কেন ওর দাদা এসেছিল নিয়ে যেতে। টুলু তো বললে—এ আমার সণ্টুদা।

বিভা এবার যেন বিমূঢ় হ'য়ে যায়!

শিক্ষিকা বললেন : আপনার ছেলে ও মেয়ে দু'জনেই বেশ সুন্দর। ওদের বাবা নিশ্চয় খুব ভাল দেখতে—তাই না?

বিভা একেবারে নির্বাক।

শিক্ষিকা বললে : ভাবনার কি আছে! বাড়ী চলে যান—দেখবেন ওরা এতক্ষণে নিশ্চয় পৌছে গেছে।

বিভা আর কোন কথা না বলেই সেই ট্যাক্সি নিয়েই বাড়ী ফিরে আসে, কিন্তু কোথায় টুলু?

টুলুকে দেখতে না পেয়ে বিভা একেবারে ভেঙে পড়ে। এমনি একটা কিছুর আশংকাই সে করেছিল। আকাশ ভাঙা বৃষ্টি। হাস্নুহানা ফুলের ঝোপটা আজ বেশীরতম কুৎসিত বলে মনে হয় বিভার।

এরপর থেকে হাস্নুহানা, বৃষ্টি ও সণ্টু নামটা বিভা কিছুতেই সহ্য করতে পারে না। এখন পর্যন্ত, বিভা যদি পথে বার হয়—তবে তার তুটি চোখ টুলুকে খুঁজে বেড়ায়। পুলিশের খাতায় এই ঘটনার বিবরণীতে লেখা আছে—নিখোঁজ। পুলিশ এই কেসটির কোন কূল কিনারা ঠিক করতে পারেনি।

এই ঘটনার পর নিখিলেশের মনে যে কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তা আমার জানা নেই। তবে বিভা আমাকে এই ঘটনা বলার সময় সবশেষে বলেছিল : জানেন এর পর থেকে আমি হাস্নুহানা গাছ, বৃষ্টি আর সণ্টু নামকে কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারি না।

স্কেচ—শ্যামল বসু

অন্নদা মুন্সী

সত্যজিৎ ও আমি

কলিকাতা, ৯ই জানুয়ারী, ১৯৫০। 'অধিনায়ক' সাপ্তাহিক সংবাদপত্রে মহাবীর মহোৎসবের চিঠি। প্রথম ছত্র: আমি কিছু জানিনে মাণিক? একমাত্র তুমিই সব জানো। ওরা কলার নৈবেদ্য সাজিয়ে পাঁচ নম্বর কাউন্সিল হাউসে লাইন দেবে। তা দিক।.....শেষ ছত্র: বাঙালীর গুণের অবধি নেই। হে মহাবীর! এবার তোমার পালা। ভেল্‌কী দেখাও! ইতি॥ যুগাবতার।

সেই ভেল্‌কী সুরু হলো পথের পাঁচালী দিয়ে। তবে এই "ভেল্‌কী দেখাও" শব্দটা ব্যবহার করবার আগে বলা প্রয়োজন যে সত্যজিতের সঙ্গে আমার ১৯৪২ সাল থেকে নিবিড়, গভীর পরিচয় যেটা ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত এক ভাবে, কর্মসূত্রে, Art in Industry প্রতিষ্ঠাকল্পে, পুস্তক প্রকাশনের মাধ্যমে এবং সহজ, সরল সঙ্গীত জ্ঞান চর্চায়, যুদ্ধে, বিগ্রহে, জাপানী বোমা ও আমেরিকান রেকর্ড ও বই-কেতাবে, ১৬ই আগস্টের হত্যালীলায় ও ভারতের স্বাধীনতা লাভের উৎসবে কেটে গেছে। সে ছিল মানুষের কঠিন অবস্থা। তার মাঝে এসে-ছিলো এমন একটা দিন যে দিন সত্যজিৎ নিজে হাতে তুলে এনেছিলো ইংরাজী রেকর্ডের এক বিরাট পাহাড়, একসঙ্গে দুশো টাকার রেকর্ড, সে কেবল আমার

জন্য! আমার ছেলে বেহালা শিখবে ব'লে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর দান সত্যজিতের নিজের বেহালাখানা আমায় দিয়ে দিলো! আমায় নিয়ে সত্যজিৎ কত সিনেমা-রেস্টুরেণ্ট-কফিহাউস্ করেছে তার কি ঠিক-ঠিকানা আছে! তার গুণের অবধি নেই এটা আমি বুঝেছিলাম তার সঙ্গীত শুনে! পথের পাচালীর আগে আমি দেখেছিলাম তার প্রথম স্ক্রীপ্ট রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরে! প্রথমে একটা ঢং ঢং ক'রে ঘড়ি বাজছে, তারপর একটা দেয়াল বেয়ে ক্যামেরাটা এগিয়ে আসছে, ধীরে ধীরে একের পর এক খুলে যাচ্ছে চোখের পরদা, স্বদেশী যুগের রবীন্দ্রনাথকে দেখতে পাচ্ছি, সত্যজিতের দৃষ্টিতে। কী অসম্ভব খাটুনী খেটেছে ঐ বাঙালী ছেলেটা! রাতে ঘুম নেই, দিনের পর দিন ব'য়ে নিয়ে বেড়িয়েছে ঐ অদম্য উৎসাহের পাঁচালীর বোঝা! তবে ত' তারিফ এলো! নির্জ্জীব, নিশ্চল বাহুর জয় কে কবে শুনেছে! কাজ! কাজ! কাজের মাধ্যমে জনতার সঙ্গে যোগ, জনতার সঙ্গে যোগ মানেই ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ। সবাই যখন বলছেন—সত্যজিৎ রায় বাংলা মায়ের অঞ্চলের উজ্জ্বলতম নিধি, তখন আমাকেও ব'লতে হচ্ছে, যে হাঁ, তবে তুমিও অনুশীলন করো, "কি হবে!" এই কথা ভেবে থেমে যেও না, যতক্ষণ না তুমিও সত্যজিতের মতো একজন প্রতিভাবান হ'য়ে ভারতবর্ষে মাথা তুলে দাঁড়াবে! লোকে তোমায় ফুলের মালা ও হাততালি দিয়ে সম্বর্ধনা জানাবে। কিন্তু ঐখানেই থেমে যেও না। বলবে—দেখুন! আমি উপযুক্ত নই! পাঁচসিকে খরচা ক'রে একটা অন্ধকার ঘরে ব'সে সিনেমা দেখে হাসবার ও কাঁদবারও আমি উপযুক্ত নই। স্বাধীনদেশে সব জিনিসেরই স্বাধীনতা থাকা উচিত। সিনেমা দেখাও বিনামুল্যে হওয়া উচিত। যাত্রাগান, কবি, তরজা, পলিটিক্যাল পার্টি মিটিং যেমন বিনামুল্যে দেখান হয়, পাড়ায় পাড়ায়, পার্কে পার্কে, সন্ধ্যার পর মোবাইল্ ইউনিট্ পাঠিয়ে সরকারের উচিত সত্যজিৎ রায়ের ছবির পর ছবি আবাল-বৃদ্ধ-বণিতাকে দেখিয়ে দেওয়া। অন্য সভ্য দেশ হ'লে তাই করতো। কিন্তু আমাদের ত' সভ্য হ'তে এখনও অনেক বাকী আছে! মহাবীর মহোৎসবের দিনটা বোধ হয় এখনও এসে পড়েনি। সত্যের ও সত্যজিতের জয় নিশ্চয়ই হবে।

সত্যকে জয় করা সম্ভব কিন্তু পরাজয় করা মোটেই সম্ভব নহে। সত্যজিৎ সত্যযুগের মানুষ কারণ বর্তমান যুগকে স্বামী বিবেকানন্দ ঠাকুর আবির্ভাবের দিন থেকেই সত্যযুগ গণনা করে আসছেন, ইহা সত্য কিনা স্বামীজীর প্রকাশিত রচনাবলী হতেই জানা যাবে।

সত্যের অজ্ঞাত কিছু নয়, সকল তথ্যই জ্ঞাত। শিল্পীর কাজ সত্যকে

প্রকাশ করা, সত্যযুগের লোকদের নিকট সত্য তথ্যকে জ্ঞাত করা। সত্যই ঈশ্বর। রাম ও আল্লা সত্য। ইন্দ্রজিৎ ও রাবণও সত্য। রাবণ বধের পর রাম বিভীষণকে বলেছিলেন – তুমি লঙ্কার রাজা হও! একথা ঠাকুর রামকৃষ্ণ প্রকাশ করেছিলেন, ত্রেতাযুগের সত্যকে কলিনাশের পরেই রামকৃষ্ণ অবতীর্ণ হ'য়ে প্রচার করতে আরম্ভ করেছিলেন, মা কালীর পুজা সমাপনান্তেই, অর্থাৎ ঈশ্বরী ভবতারিণী ঠাকুরকে দিয়ে যে-সব কথা বলিয়েছিলেন—সেইসব কথাই শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত। সেইসব কথাই বর্তমান যুগের কথা, তাই লোকে ঠাকুরকে বলে—যুগাবতার! কিন্তু দেশের লোকে ঠাকুরের কথামৃত যথাযথ ভাবে পাঠ করেনি বলেই দেশের লোকে ভবিষ্যৎ ভারতে ঠাকুরের কি দান, এটা বুঝতে পারছে না। বুঝিয়ে দাও ত' সত্যজিৎ!

মহাশয়েরা ত' ইংরাজ রাজাকে অনেক কষ্টে বিতাড়ন করেছেন দেখছি, কিন্তু এই ভারতে, এই বৃহৎ এশিয়ায় আর একটি তদপেক্ষা সবল রাজা লিক্‌লিক্ করে তার প্রভাব-জিহ্বা বিস্তার করে চলছে তা খেয়াল করেছেন কি? এর হেড কোয়ার্টার রোম নগরীর ভ্যাটিক্যান্ সিটিতে অবস্থিত! জগদীশ্বর মহামান্য পোপ্! তাঁর কথাবার্তায় ইংলণ্ড, আমেরিকা ইতালী, ফ্রান্স, জার্মানী, অস্ট্রেলিয়া উঠা বসা করে। এই দেশে তাঁদের স্থাপিত চার্চ, ক্যাথিড্রাল্, মেট্রোপোলিটান্—বিশপ্-ফাদার্-মাদার্ সর্বদাই ভারতীয় শিশুগণকে উদ্ধার করবার মানসে অভারতীয় শিক্ষা দিয়ে চলছে, তার বিরুদ্ধে আপনি রুখে দাঁড়ান কি?

ভারতীয় রাম, ভারতীয় কৃষ্ণ কিন্তু খ্রীষ্ট কি অভারতীয়?

তিনি কি প্যাণ্ট পরতেন?

তিনি কি ইংরাজীতে কথা বলতেন?

তিনি কি ঈশ্বরের রাজ্য প্রচার করেন নি?

তিনি যদি ঐ দেশে দুঃখ ও কষ্ট ভোগ করে মৃত্যুবরণ করে থাকেন, পুনরুত্থানের পরেও কি তিনি ঐ দেশে থাকবেন?

তিনি কি রামকৃষ্ণের দেশে আসতে পারেন না?

অতএব, এখন হ'চ্ছে সত্যজিতের স্বর্গরাজ্য! কোথায় বার্লিন, কোথায় রোম, কোথায় ন্যু' ইয়র্ক, কোথায় লণ্ডন! সর্বত্রই সত্যজিতের সম্মান! বাংলাদেশের লোকে এখনও ওঁকে চিনতে পারেনি কিন্তু যখন চিনবে, প্রলয় কাণ্ড ঘ'টে যাবে!

চলচ্চিত্র উৎসবে আমি একটা ফিল্‌ম্‌ পাঠাবো ঠিক করেছি তার নাম হ'বে কানাইলাল। স্বর্গীয় মতিলাল রায়ের লেখা কানাইলাল! চিত্ররূপ শ্রীঅন্নদা মুনসী। সঙ্গীতে গৌর নিতাই। কানাইলালের ভূমিকায় অমর সেন। নরেন গোঁসাই-এর ভূমিকায় অমুক গোঁসাই। সার্জেণ্টের ভূমিকায় সার্জেণ্ট্‌! ছবিটা খুব শীঘ্রই শেষ হ'বে। প্রযোজকের ভূমিকায় রমা বসু। গল্পটা এইরূপ: দেশদ্রোহীতার দায়ে কানাইলাল রাজবন্দী হ'লো! রাজসাক্ষী নরেন গোঁসাইকে যদি অবিলম্বে না মারা হয় তাহলে সে দলের কার্যকলাপ সরকার পক্ষকে জানিয়ে দিতে আরম্ভ করেছে! পুলিশ-পাহারায় গোঁসাইও জেল-হাসপাতালে। পরিকল্পনা কার্যে পরিণত হ'লো, কানাইলালের পিসিমা কাঁঠালের পেট কেটে রিভল্‌ভার ভর্তি ক'রে কানাইলাল খাবে ব'লে জেলে পাঠিয়ে দিলেন, পরদিন সকালে হ'লো কানাইলালের পেটে অসহ্য যন্ত্রণা! কোমরে রিভল্‌ভার। ডাক্তারবাবু বললেন, এক্ষুনি হাসপাতালে পাঠিয়ে দাও; তারপর শুরু হলো গুড়ুম্‌ গুড়ুম্‌ গুড়ুম্‌! একটার পর একটা—ছ'টা গুলি নরেন গোঁসাইকে চিরজনমের মত চুপ করিয়ে দিলে, থেমে গেলো কানাইলালের পেটের ব্যথা! তারপর শুরু হ'লো বিচার। নরেন গোঁসাইকে হত্যার অপরাধে কানাইলালের প্রতি ইংরাজ ম্যাজিষ্ট্রেট দিলেন প্রাণদণ্ড। To be hanged till dead.

ফাঁসীর পূর্বদিন। কারাকক্ষে কানাইলালের হাসিমুখ দেখে ইংরাজ সার্জেণ্ট জিজ্ঞাসা করলো: তুমি ত' আজ হাসছ, কিন্তু আগামীকাল তোমার এই হাসি কোথায় থাকবে? কানাইলাল তখন সে প্রশ্নের জবাব দেয় নি, কিন্তু তার যখন অন্তিম সময় এলো, সে হাসিমুখে ফাঁসীর মঞ্চে এগিয়ে গেলো, তখন সেই সার্জেণ্টটিও সেইখানে দাঁড়িয়ে ছিলো, তার দিকে তাকিয়ে কানাইলাল যে শেষ কথা বলেছিলো, ইংরাজী ভাষায় সে প্রশ্ন শেষ প্রশ্ন: How do you see me mister? Smillng? মিস্টার! তুমি আমায় কেমন দেখছো? হাসছি ত'? ধীরে ধীরে কানাইলালের চোখের ওপরে কালো কাপড়ের পর্দা নেমে এলো!

এই হ'বে আমার চলচ্চিত্র। পৃথিবীর সব দেশে দেখানো হ'বে এই ছবি। বাঙালী কিভাবে তিলে তিলে আত্মদান করে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এনেছে, এই ছবি তার একটিমাত্র আভাস। গত দু'শো বছরে ভারতে যে ইতিহাস রচিত হ'য়েছে, তার প্রতিটি অধ্যায়ে চলচ্চিত্র সৃষ্টির দারুণ সম্ভাবনা।

হয়ত সেদিন সত্যজিৎ হবে আমার এই ছবির দর্শক!

গল্প

তারাপদ গঙ্গোপাধ্যায়

বৃষ্টি, নারী ও প্রেম

'ব্যক্তিবিশেষকে যদি ভাল ক'রে বোঝা যায়, তবে বোধহয় নিজকেও ভাল ক'রে বোঝা যায়।'

এটুকু বলেই সদানন্দ থেমে গিয়েছিলো। যাদের কাছে এ কথাটা বললো তারা একটু আগে মানুষের চরিত্র-প্রসঙ্গে আলোচনা করছিলো। সময়টা বিকেল ছিলো, এবং মনে হচ্ছিলো যে-কোন সময়ে আকাশ ভেঙ্গে কলকাতাকে প্লাবিত করবে, স্ত্রী সরমা ছিলো এবং সরমার কয়েকজন বন্ধুবান্ধব। সবাই শিক্ষার সাথে যুক্ত এবং ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাগত আলোচনা প্রসঙ্গেই চরিত্রগত প্রসঙ্গটা উঠে পড়েছিলো। সদানন্দ জানে, সরমা যেমন ঘরে আলোচনা করতে আনন্দ পায় ছাত্রছাত্রীদের কাছেও সে-রকম আনন্দ বিতরণ করে, এবং সরমার বন্ধুবান্ধবরাও জানতো, সদানন্দ বুদ্ধিমান এবং সেই বুদ্ধি কিছু কিছু বুদ্ধিজীবিরা গ্রহণ করে, যে-মানুষের ব্যবহারিক জীবনে স্কোয়ার এবং কিউবিক ফুট নিয়ে পেশা সেই মানুষই অবসর সময়ে কল্পনার ক্ষেত্র নিয়ে বিচরণ করে। বয়স কত? সরমা কোন কোন সময় বয়সের প্রসঙ্গ নিয়ে সদানন্দকে ঠাট্টা করতে চায়। মাথায় টাক, ঠোঁটে সিগারেট, অনেক সময় এই সিগারেটটা চার্চিলের চুরুট

বলে ঠাট্টা করে। সদানন্দ হাসতো, স্ত্রীকে দেখতো, স্ত্রী কি চিরকাল উর্বশীর মত মুকুলিকা আর সে যযাতির মত তরুণ থাকবে? 'যযাতি কি জীবনে খুব সুখী ছিলো, অবশ্য তুমি হয়তো বলবে সুখটা বার্ধক্যের ধারণা! একটি কথা কি বলবো, তোমার বন্ধুরা এখানে কেন এত আসে, এ কি তোমার সাথে সময় কাটাতে না আমাকে দেখতে!'

'যদি আসে বেশ করে!' সরমা বলতো।

কি সুন্দর কথা, বেশ করে! স্ত্রীর এই 'বেশ' শব্দের ভিতর ওর মন কত স্পষ্ট হয়তো ওর নিজেরই ধারণা ও এখনো যুবতী, এবং যুবক স্বামীই ওর প্রাপ্য! টাকটা ঢেকে দিলে নিশ্চয় ওকে যুবক বলে ভাবে, সদানন্দ স্ত্রীর এই মানসিক রূপকের কথা চিন্তা ক'রে আনন্দ পেতো। সরমা কি খুশি, এক ছেলে দেওঘরে, মেয়ে—সে কলকাতার মেয়ে হোটেলে; এবং সরমা একা নিশ্চিন্ত জীবন যাপন করতে চায়। মাতৃভাগ্যে গরবিনীর চিন্তা, তার চেয়ে কত সুখ এই ঘর, স্বামী, ভৃত্য! কিংবা যদি কোনদিন ইচ্ছে হয়, স্বামীসহ চৌরঙ্গী পাড়ায় গিয়ে সিনেমা দেখা যাক। এবং যে-কোন মানুষ ওদের সুখী দম্পতি বলে ভাবতে পারে, হয়তো ভাবেও!

সদানন্দ ভাবছিলো, সরমার স্বাস্থ্য যৌবন এবং ধর্ম!

'বলতে গিয়ে থেমে গেলেন?'

'আমি বাইরের মেঘের দিকে তাকাচ্ছিলাম, কলকাতায় মনসুন আসে না, দেখুন বাইরে এবার বৃষ্টি নামলো।' পরক্ষণেই হেসে উঠলো: 'আপনাদের বোধহয় ধারণা হোয়েছে আমি একটি কাহিনী আরম্ভ করতে যাচ্ছি।'

'না-হয় করলেন!'

সদানন্দ হেসে উঠলো। কালিদাস নিশ্চয় ধূর্ত ছিলো, সে শব্দের দলা পাকিয়ে বিক্রমাদিত্যকে ঠকাতে পারতো, সদানন্দ ওদের দিকে তাকাতে লাগলো, নিশ্চয় সরমাই এদের ভিতর একমাত্র সুন্দর এবং বিশিষ্ট! এই সৌন্দর্য না থাকলে কি সরমাকে কেউ পছন্দ করতো? এবং সদানন্দ কি আশ্চর্য মন নিয়ে তাকালো, কেউ অত্যন্ত কৃশ, কেউ স্থূল, যে-ধরনের আধুনিক পোষাক প্রচলিত হচ্ছে সেই ব্লাউজকাট যদি ওদের গলায় থাকতো, সদানন্দ ভাবতে আনন্দ পাচ্ছে, হয়তো পাইরেক্সের বিজ্ঞাপনের কথা মনে হ'তো, কিংবা বর্তুলাকার মাংসের দলা! কিংবা কূর্ম!

'আমি ঘটনা জানি না, চরিত্র সৃষ্টি করতে পারি।'

'আপনার সেক্‌স্‌পীয়রের ওপর ধারণা সরমাদি অনেক সময় ক্লাসে ব্যবহার করে!'

'হয়তো স্বামীকে অনুসরণ করা শাস্ত্রীয় বিধি!'

ওরা হেসে উঠেছিলো।

'আমি যদি সেক্‌স্‌পীয়রের ওথেলোর মত একটি চরিত্র সৃষ্টি করি সরমা কী খুশি হ'বে? কিংবা আমিই যদি একটি ব্ল্যাক ডিমন হ'তাম সরমা কী আমার দিকে তাকিয়ে আনন্দ পেতো?'

'কী বাজে বকছ?' সরমা বলে উঠেছিলো।

এবং সদানন্দ শব্দ করে হেসে উঠে একটি সিগারেট ধরালো।

'সরমা সিগারেট নিয়ে আমায় দু'টি ব্যক্তিবিশেষের সাথে সঙ্গতি রক্ষা করতে চেয়েছে, যেমন চেম্বারলেনের ছাতা ছিলো, চার্চিলের চুরুট, আমায় বলে সিগারেট!' সদানন্দ সিগারেটটা ধরিয়ে নিলো: 'আপনারা মহাজনবাক্য নিশ্চয় জানেন, পুরুষের একটি নেশা থাকা ভাল তবে সেটা মেয়েমানুষ না হ'লেই ভাল!'

কেউ কেউ হাসিটা ঠোঁট দিয়ে চাপা দিতে চাইলো।

'আর এক কাপ ক'রে চা-পর্ব হ'লে ভাল হয় না কী?' সদানন্দ স্ত্রীকে জিগ্যেস করলো: 'আপনাদেরও আপত্তি নেই বোধহয়! মিশিরকে ডাক দিয়ে না-হয় কফিরই অর্ডার দেও। বাইরে বৃষ্টিটা জোর নেমেছে!' সদানন্দ বাইরে তাকাল, বৃষ্টিটা কি উপলক্ষ্য? সরমাও কি বাইরে তাকিয়ে এই বৃষ্টিটা উপভোগ করছে! উপভোগ করার জন্যে যে প্রয়োজনীয় বস্তু হাতের কাছে রাখা যায় সরমা তা পাচ্ছে, ওর উপার্জন সুন্দর, হয়তো এ-ও জানে—স্বামী ওর দেহের প্রতি অনুগত। সরমার যুবতীর ভাব কবে কমবে? সদানন্দ লক্ষ্য করলো, স্ত্রীর কাঁধ কি নিটোল, দেহ দূরত্ব রক্ষা করে কী? সদানন্দ গোল-গোল তাক ক'রে ধুয়োর বলগুলো ছাড়ছিলো: 'সরমা, তুমি কী উঠবে? কফি হ'লে আমার মেজাজ আরো তাজা থাকবে! মনে হয় অন্যান্যদেরও!' ওদের দিকে তাকিয়েও সদানন্দ নিজের মেজাজ আরো বিস্তৃত করতে চাইলো! ওরা কী সরমার বন্ধুপ্রীতির জন্যেই আসে, না সরমার কি ধরনের স্বামীপ্রীতি আছে তা জানতে! আবার ওদের দিকে তাকিয়ে বুঝতে চাইল।

'আপনি হাসছেন?' ওদের একজন জিগ্যেস করে বসলো।

'আমি ভাবছি বৃষ্টি মানুষের মনকে পরিষ্কার করে! কালিদাসের যখ মেঘ দেখে লিপি পাঠিয়েছিলো, আমি বৃষ্টি দেখে সেই লিপি তৈরী করতে পারি!'

'নিশ্চয় তা প্রেম-সংক্রান্ত !'

'প্রেম-সংক্রান্ত ? অত্যন্ত সুন্দর শব্দ ! প্রেম শব্দে পুরুষের লোভ হয় নারীর আকর্ষণ !'

ওরা ঠোঁটের ওপর আঁচল টেনে বোধ হয় হাসি লুকাতে চাইলো। সদানন্দের মনে হ'লো, একটি ষোড়শীর ব্রীড়াণতা হ'লে ভাল লাগে কিন্তু প্রায় চল্লিশের প্রান্তে এসে এই ভঙ্গি, সদানন্দের হাসি দলা পাকাচ্ছিলো, নাকি চিরযৌবনের প্রচেষ্টা মানুষের ধর্ম !

'যযাতি বৃত্তিটা বোধহয় একটা পিপাসা !' সদানন্দ স্ত্রীর কষ্ট লক্ষ্য করছিলো : 'তাই কী ?' বলেই আবার অন্যান্যদের একবার দেখে নিলো। কিন্তু প্রশ্নটা শুনে ওরা অনুধাবন করতে চেষ্টা করছিলো, প্রসঙ্গের মধ্যকেন্দ্র কোন্ দিকে : 'ক্লাসে মেয়েদের পড়তে পড়াতে কোনদিন কী আপনাদের মনে হয় যে বয়স আপনাদের বেড়েছে ?'

ওরা হাসছিলো।

'সরমা, তুমি উঠে চা কিংবা কফির কথাটা কি বলবে, চা কিংবা কফি ছাড়া এ কথার কোন উত্তর মিলবে না।'

'পুরুষরা কি বয়স নিয়ে ভাবে ?'

'আমরা ?' সদানন্দ স্ত্রীর দিকে তাকাল, স্ত্রী তখন বেরিয়ে যাচ্ছিলো : 'ওটা আর্টিষ্টদের চিন্তার মত, প্রায় প্রতি আর্টিষ্টের একজন মডেল থাকে, আমার মডেল আমার স্ত্রী ! ও ঘুমুলে ওর ঠোঁট কিভাবে ঝুলে থাকে সেটা লক্ষ্য করতে হয়, রাগান্বিতা হ'লে চোখের তারা কিভাবে বড় এবং স্থির হয় ! আপনারাও আপনাদের স্বামীদের লক্ষ্য করলে এটা টের পেতে পাবেন ! আমার এক বন্ধু বলছিলো, তাঁর স্ত্রীর নাসিকাধ্বনির জন্যে সে রাত্রে একটু অস্বস্তি বোধ করে !'

সরমা ঢুকে পড়েছিলো।

'আমি এদের কাছে বলছিলাম তুমি আমার মডেল।'

'বেশ করেছো !'

সদানন্দের মনে হ'লো, স্ত্রী 'মডেল' শব্দে বোধহয় খুশি হোয়েছে ! এবং এ-ও মনে হ'লো স্ত্রী এই সময়টুকুর ভিতরেই আয়নার কাছে দাঁড়িয়ে মুখ একটু ঘসে মেজে এসেছে। এবং এদেরও যদি সময় দেয়া যায়, ওদের দিকে তাকিয়ে মনে হ'লো, এরাও বোধহয় এরকম ভাবে নিশ্চয় আঁচল কিংবা রুমাল দিয়ে মুখ ঘষে নেবে।

'ফ্যানের স্পীড একটু বাড়িয়ে দাও।'

একজনের নাকের ডগায় ঘাম দেখে সদানন্দ সরমাকে বল্‌লো।

সরমাও রেগুলেটরে হাত দিলো, পুরোপুরি অন্‌ করে দিলো।

'মানুষের মুখ কখন সুন্দর দেখায় বলতে পারেন ?'

'কখন ?'

আশ্চর্য, ওরা বোধহয় আনন্দ পাচ্ছে।

'স্নানের পরে ? বেবুনের মত যার মুখ, তার মুখও স্নানের পর কোমল ও মসৃণ হয়।'

ওরা হাসছিলো, আশ্চর্য ওদের কারো মুখ বেবুনের মত নয়।

'বিয়ের জলের পড়েও কারো কারো হয়!' সদানন্দ স্ত্রীর নাকের দিকে তাকাচ্ছিলো, যেই নাক দেখেই সদানন্দ স্ত্রীর প্রেমে পড়েছিলো। সদানন্দ একটি সিগারেট ধরিয়ে একমুখ ধুয়ো ছেড়ে নিজের মুখটাও আড়াল করতে চাইলো। ও কী অভিজ্ঞতা অর্জন করছে ? অভিজ্ঞতা মানে, স্ত্রীকে দেখছে, স্ত্রীর বন্ধুবান্ধবদের। এই বৃষ্টি না নামলে ওরা এতক্ষণ থাকতো না। ও কী চায়, সদানন্দ নিজের দিকেও তাকালো, সদানন্দের ইচ্ছে করতে লাগলো, ও বলে বন্ধু এবং বান্ধব কথাটা অত্যন্ত ভ্রান্ত। একটি ঘর যদি চৌদ্দ বাই বার হয় তবে কি খরচ এবং কত ইট লাগে সদানন্দ নির্বিবাদে বলে দিতে পারে, কিন্তু একটি মনের ভিতর কতখানি খাদ আছে এ আয়তন দেখে বলা কি সম্ভব ?

বয় ট্রে নিয়ে ঢুকছিলো।

'কি এনেছো, চা না কফি ?' সদানন্দ উঠে দাঁড়ালো।

'কফি!'

'চমৎকার! সরমা, তুমি তৈরী করো।'

কফি, প্রকৃতপক্ষে সরমাই ওকে কফি খেতে শিখিয়েছে। হাওড়ার হোষ্টেল থেকে যখন সরমার কাছে যেতো, তখন দু'টো জিনিস দেখতো, একটি সরমার চুলের লাল রিবন আর কফির গন্ধ।

'আপনি উঠছেন।'

'উঠছি না, আমি বৃষ্টিটা অনুধাবন করতে যাচ্ছি। দেখছেন বৃষ্টি কী জোর নামলো!' সত্যিই জানালার ধারে সদানন্দ বোধহয় বৃষ্টি দেখবার জন্যেই গেলো: 'আপনাদের এখানে কি শেষ পর্যন্ত রাত্রিবাস করতে হবে? মাই গড্‌! সদানন্দ বিস্ময়জনিত ধ্বনি করলো: 'রাস্তায় কি পরিমাণ জল! সরমা, লক্ষ্য করেছো—বৃষ্টি কি দুরন্ত হয়ে নামলো!

ঘরের অবস্থা মুহূর্তে চঞ্চল হ'লো।

'সত্যি কি জল জমেছে?' ওরাও জানালার কাছে এলো: 'ওমা, এই জল সরবে কতক্ষণে? ঐ মোটরটার ভিতরে জল ঢুকছে না?'

'ঢুকলেও ওটা চলবে।'

ওরা নীচে মোটরযান আর জল দেখছিলো, সদানন্দ দেখছিলো, মোটর কিংবা বাসের ধাক্কায় যে-জল ফুটপাথ থেকে দেয়ালের গায়ে নাচছে।

'নৌকা চালাতে জানেন?'

'নৌকা?'

'নৌকা' শব্দ উচ্চারণ করেই একজন এমনভাবে সরে এসেছিলো, যে তার নাভিকেন্দ্র সদানন্দের কনুই স্পর্শ করছে। বয়স পার হোয়ে আসার জন্যেই হ'বে, সদানন্দ ভাবতে লাগলো, কিংবা স্পর্শচেতনা বোদা হোয়ে যাবার জন্যেও হোতে পারে, কিংবা এই নারীর চেয়ে সরমা অনেক সুন্দর, স্বাস্থ্যবতী বলেও হ'তে পারে—সদানন্দ কোন স্পন্দন বোধ করছে না, বরঞ্চ বস্তার ঘসা লাগলে যে-রকম অস্বস্তি লাগে, সেই অস্বস্তি বোধ করার জন্যেই সদানন্দ সরে এসে কুশনে বসেছিলো। ভদ্রমহিলা কি স্থূল—বসে আবার ভদ্রমহিলার দিকে লক্ষ্য করলো! এটা চাকরী জীবনের লক্ষণ বোধ হয়, যেমন সদানন্দের মাথায় টাকের অংশ দেখে সরমা মাঝে মাঝে মন্তব্য করে, তোমার মাথাটা কি রকম হচ্ছে! মাথার দিকে তাকিয়ে সরমার নিশ্চয় অস্বস্তি হয়! এবং ঐ পঞ্চনারীর পেছন দিকটার দিকে তাকিয়ে পাঁচটি ছাতার কথা মনে হচ্ছে, এবং এদের ভিতর সরমা নিতম্বিনী! টাকার ঘসা মেখে সরমা সুস্থ সুন্দর হচ্ছে! সুন্দর এবং নিতম্বিনী! হোষ্টেলে থেকে জানালায় বসে বৃষ্টি দেখছে না। তার বন্ধুবান্ধবদের সাথে সরমার মতনই গুলতানী করছে, না তার পিতার মত এমনি চরিত্র চিত্রণ করছে! বৃষ্টি কি অস্বস্তিকর, না সময় বিশ্বাস করনা!

'সরমা, কফি বোধহয় ঠাণ্ডা হচ্ছে!' সদানন্দ ডাকলো।

'আপনি কফির জন্যে পাগল আমরা ভাবছি বাসায় যাব কি করে?'

'বিপদেই বন্ধু, সম্পদে নয়! সরমা নিশ্চয় সেই ব্যবস্থা করবে।'

ওরা একজন নিজের হাত ঘড়িটার দিকে তাকালো।

'কটা বাজে?'

'সাতটা পনর।'

'সাতটা পনর? কলকাতায় সাতটা পনর, গড়ের মাঠের সন্ধ্যা।'

গড়ের মাঠের নাম করলে কী সরমা বিরক্ত হয় না সুখী? সরমা কফির

টি-পটে লিকার দেখছিলো, ওর ঠোঁট নীচে নামানো, ঠোঁট দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু বাহু দেখা যাচ্ছে—ওর বাহু কত চকচকে মসৃণ! সরমা কী ওদের মনের নার্সিসাস, না হয় সরমাকে ওরা পছন্দ করে কেন? না সরমার একটি ব্যক্তিত্ব আছে, সেই ব্যক্তিত্বর জন্যে ওরা দল বেঁধে এখানে ভীড় করে, না সরমার রূপ দেখতে আসে, তার দাম্পত্য জীবন! সদানন্দের ভাবতে ভাল লাগছে।

'বৃষ্টিতে আড্ডা জমে ভাল।' সদানন্দ বললো: 'পৃথিবীর অনেক বিখ্যাত গল্প এমনি কথায় কথায় তৈরী হোয়েছে।'

'আপনি কি সেরকম কাহিনী একটি বলবেন!'

'আমি বলবো!' সদানন্দ একটি বিস্কুট ভেঙ্গে মুখে ফেললো: 'প্রেমের কাহিনী? প্রেম শব্দ আপনারা একটু আগে উচ্চারণ করেছেন!'

'কি বাজে বকছ?'

কাকে ধমক দিলো সরমা, আমাকে না ওর বন্ধুচতুষ্টয়কে? কফিতে চুমুক দিতে দিতে স্ত্রীর চিবুকের অংশটুকু লক্ষ করছিলো, ডিমের মত আয়তনের ওপর বিদ্যুতের আলো!

'নিশ্চয় আপনাদের বন্ধু প্রেম পছন্দ করে না! বয়স্ক সময়ে প্রেম অবশ্য বাড়তি মনে হয়।'

বলেই আবার স্ত্রীর ওপর চোখ রাখলো, সরমার ঠোঁটে কুঞ্চন এসেছে, সদানন্দের হাসতে ভাল লাগছে, বাঁশীতে ফু দেবার পরেই সাপের ঘাড় বাতাসের ওপর লাফিয়ে ওঠে, সাপ কি সত্যিই বাঁশীর শব্দে চনমন করে ওঠে? সরমা কি নিজেই এখন ধারনা করতে পারছে ও-ও একসময় প্রেম ক'রে বিবাহ করেছিলো? প্রেম, শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনের হোষ্টেল থেকে কোনো রবিবার যদি না পৌছুনো যেতে সরমা অস্বস্তি বোধ করতো, এবং নিজেও সরমার চুলের রিবন দেখবার জন্যে উদগ্রীব হ'তো! সেই রবিবার, রিবন এবং প্রেম!

'ঘটনাটা যদি প্রেমেরই হয়!'

সরমা তখনো সদানন্দের দিকে তাকাচ্ছে।

সদানন্দেরও এই সময় ভীষণ ইচ্ছা করছিলো, স্ত্রীকেও এই সময় আর একজনের কাহিনী ভাল করে বলে, প্রতিমা শব্দ কি সরমার মনে বিরূপ ধারনা আনে? কালো, অদ্রষ্টব্য, প্রতিমার এই বিশেষণে সরমা আনন্দিত হয়, এবং এই আনন্দের ওপর আর একটি প্রতিলেপন দিলে কী হয়, এবং ওর বন্ধু চতুষ্টয়ই বা কি ভাবে!

'কালিদাস মেঘের ধারনা নিয়ে মেঘদূত তৈরী করেছিলো, এবং এই বৃষ্টিতে

যে-কোন লোকের প্রেম সম্বন্ধে একটি ঘটনা সম্বিদ দিতে পারে!' বলেই সদানন্দ বাইরের বৃষ্টির দিকে একবার তাকাল।

: 'প্রেম শব্দটি কী সত্যিই অবাঞ্ছিত?' এই কথা বলে স্ত্রীর দিকে আবার তাকাচ্ছিলো।

সরমা কী সত্যিই ওর ধারনার কথা বলতে পারবে? সদানন্দ একটি সিগারেট ধরিয়ে নিলো। যদি প্রতিমা শব্দটি উচ্চারিত হয় নিশ্চয় সরমা অস্বস্তি বোধ করবে! আশ্চয, সদানন্দ সিগারেট টানতে টানতে মনোরম একটি অনুভূতি বোধ করতে লাগলো।

'শেলি সমুদ্র দেখে উচ্ছল হোয়ে উঠেছিলো, চৈতন্যদেব—নিশ্চয় তা সমুদ্রের প্রেমাকর্ষণের জন্যে।' সদানন্দ একগাল ধুয়ো ছাড়লো: 'প্রেম বোধহয় ততক্ষণেই সুন্দর যতক্ষণ তা জান্তবধর্ম বিবর্জিত।' সদানন্দ ওদের দিকে তাকিয়ে স্পষ্ট বুঝতে পারছে ওরা কথাটা ধরতে পারে নি: 'একটি মেয়ের জন্যে একটি পুরুষকে অন্য একটি পুরুষকে হত্যা করতে পারে! সরমা তোমার নিশ্চয়ই প্রতিমাকে মনে আছে!'

কি আলগোছে প্রতিমা শব্দটি স্ত্রীর কাছে তুলে ধরলো, এবং এটাও লক্ষ করলো মুহূর্তের জন্যে সরমার গালে একটি কুৎসিৎ রং এসেছিলো, শুধু মুহূর্তের জন্যে!

'মনে আছে কী?'

'তোমার যা বলতে হয় বলো!'

সঙ্গে সঙ্গে সদানন্দও নিজেকে গুছিয়ে আনতে চাইলো, ওর বন্ধুদের চোখের তারাদ্বয় কি উজ্জল চকচকে, নিশ্চয় ওরা ধারনা করে নিচ্ছে, প্রতিমা শব্দ কী আমাদের দাম্পত্য জীবনের প্রতিবন্ধক! প্রতিবন্ধক, সদানন্দও শব্দটি আওড়ে নিলো, প্রতিবন্ধক না সীমা নির্ধারক! সদানন্দ দগ্ধ সিগারেটটা এ্যাসট্রের ভিতর গুঁজে দিলো। ঘড়িতে তখন পৌনে আট! দেয়াল ঘড়ির শব্দ কি স্পষ্ট, এবং ঘরে কি নিশব্দ পরিবেশ।

'সীমাবদ্ধ জীবনের ভিতর ঘটনা কিংবা দুর্ঘটনা।' প্রতিমা সম্বন্ধে সরমাও এখন পর্যন্ত যা জানে না, কিংবা কৃপাজনক একটি অনুভূতি যে হয়তো এখনও পোষণ করে, সদানন্দের মনে হলো সেখানে স্বীকারোক্তি দিলে, ফল দর্শন হয়!

'আট-এ যদি ঘটনা আরম্ভ করি, নয়-এ শেষ হবে!' সদানন্দও ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছিলো, ওরাও: 'ফলিত জ্যোতিষে আট শব্দের অর্থ যন্ত্রণাভোগ, আর নয়-এ মৃত্যু! আমি যদি আট-এ কাহিনী আরম্ভ করি!'

বলেই ঘড়ির ডায়েলের দিকে তাকিয়ে সদানন্দ একটি সিগারেট ধরালো। কিন্তু সরমা প্রায় একটি নিঃশব্দ স্তূপের মত। সদানন্দের আনন্দ লাগছে, ওর কি ধারনা প্রতিমা নামক মেয়েটি এখনো ওর স্বামীর মনে ঘর ক'রে রেখেছে?

'আপনাদের বোধহয় ঔৎসুক্য আসছে, কারণ এইমাত্র একটি মেয়ের নাম আমি উচ্চারণ করেছি, এক শব্দে বলে জিবে জল আসে।'

বলেই তারপরে সিগারেটের ধুয়ো এমন ভাবে ছাড়তে লাগলো, যেন মনে হচ্ছে ওদের মনও তুড়ি দিয়ে দিয়ে নাচাচ্ছে। এবং সদানন্দ যখন বলতে আরম্ভ করেছে, ওরা ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছিলো, ঘড়িতে তখনো আটটা বাজে নি।

'প্রতিমা, নামটি কি সুন্দর? আমিও যেমন প্রতিমাকে চিনি সরমাও তেমনি। হয় তো সরমা একটু বেশী, কারণ প্রতিমা সম্পর্কে ওর মামাতো বোন!'

(সরমা স্বস্তি পাচ্ছিলো না, সদানন্দ লক্ষ করলো, সরমা জিভ দিয়ে ওর ঠোঁট একবার চেটে নিলো। অস্বস্তি কেন, যদি কিছুই ঘটে থাকে সেটা ওর জীবনের পাপ না, হয়তো অন্য কারু, হয়তো প্রকৃতির, হয়তো দুর্ঘটনার! সদানন্দের মনে হ'লো, ওকে কী ক্লান্ত দেখাচ্ছে। ও যদি এখন ওর গাল পুঁছে নেয় ওর গাল বোধহয় একটু ঝক্‌ঝকে দেখাবে! ওর বুক দুটো কি ঘন ঘন নড়ছে!)

'নামের সৌন্দর্য অনেক সময় দেহের সৌন্দর্য রক্ষা করে না। প্রতিমা এমন একটি মেয়ে ছিলোনা যাতে দৃষ্টি আকর্ষণ করে!' (সরমা কী এই বর্ণনা শুনে এখন স্বস্তি পাচ্ছে?): 'অত্যন্ত অদ্রষ্টব্য একটি দেহ, সেই কালো রং-এর ভিতর ছাই-ছাই আভা সৌন্দর্যের কারক না! কিংবা অত্যন্ত কৃশ দেহের ওপর সামান্য লালভ চুল আরো বিসদৃশ! কিন্তু...' সদানন্দ সিগারেটের শেষ অংশটুকু অ্যাসট্রের ভিতর না গুঁজে টোকা দিয়ে বাইরে বৃষ্টির ভিতর গলিয়ে দিতেই বৃষ্টিটা যেন সেই আগুন লুফে দিলো: 'কিন্তু পাঁকের জন্ম বোধহয় পদ্মের আবির্ভাবের জন্যে! পদ্ম কী?' সদানন্দ স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে হাসলো: প্রতিমার সাথে পরিচিত না হ'লে সরমার সৌন্দর্য কতখানি টের পেতুম না।'

বলতেই ওর বন্ধু চতুষ্টয়ও হেসে উঠলো, সরমাও নিজের মুখে রক্তের ঝলক দুই ঠোঁট চেপে একবার আটকাতে চাইলো।

'আপনারা শুনে কী খুশি হচ্ছেন?' সদানন্দ বলে উঠলো।

'আমরা শ্রোতা।'

'শ্রোতা? শব্দটি ভাল।' সদানন্দ একটু অন্যমনস্কভাবে বাইরে বৃষ্টির দিকে তাকালো: 'উত্তরবঙ্গে সান্তাহার বলে একটি জায়গা আছে!' সদানন্দ বলছিলো: 'সেখানে যখন চাকরী নিয়ে প্রথম রওনা হ'তে চলেছি সরমার একটি কথা আমার মনে আছে। সরমা তোমার কি মনে আছে কি কথা সেদিন লেকের ধারে বসে হচ্ছিলো?' সদানন্দ স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে একটু হেসে উঠলো: 'আমরা বোধহয় সেদিন ভেনিসের খালের গণ্ডোলার কথা আলোচনা করছিলাম! নিশ্চয় সরমা বোধহয় একটু বিষাদমগ্ন ছিলো!' (শেষ শব্দটা উচ্চারণ করে সদানন্দ আবার হাসলো): 'বজবজ লাইনের ওপর দিয়ে একটি গাড়ী চলে গেলো। যেই রেলে চড়েছি দূর থেকে দেখেছি সেই রেলের কথা-তো কিছু বলছো না!' আমি জিগ্যেস করতেই আর একজনের ঠোঁটে হাসি এলো, ওর ঘাড়ের ওপর রোদের শেষ আভা পড়ে ওর ঘাড় চক চক করছিলো! (অন্যান্যেরা এই বর্ণনায় ঠোঁটে আঁচল টেনে হাসি লুকোতে চাইলো!): 'আপনাদের বোধহয় বর্ণনা শ্রুতিগ্রাহ্য হচ্ছে না!' সদানন্দও একটু সামনে ঝুঁকে বসলো: 'যদ্দূর মনে হয় সান্তাহারে ওর এক মামা থাকে, সরমা এই সংবাদ সেদিন দিয়েছিলো!: রেলে কাজ করে?' : সেই রকম শুনেছিলুম। : যদি সত্য হয়, চিঠি লিখে জানিও আলাপ করবো! এই প্রসঙ্গটাও সেদিন অত্যন্ত অবান্তরভাবে এসে গিয়েছিলো, কিংবা এমনো হ'তে পারে মানুষের মন যখন কোন কথা খুঁজে পায় না তখন যে-কোন প্রসঙ্গ অবতারণা করে নীরবতা ভাঙ্গতে চায়। তাই না?'

সদানন্দ সরমাকে জিজ্ঞেস করলো।

'কিন্তু এই সান্তাহার, ভেনিসের গণ্ডোলা রাখবার মত যায়গা না, কিংবা আমার শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনের বহু গাছের মত বৃক্ষালোড়িত স্থান নয়, অত্যন্ত ধূসর প্রান্তরের ভিতর একটি রেলওয়ে কলোনী, কেবল মাঠে গিয়ে লক্ষ্য পড়লো সেখানের মাটি গেরুয়া, এই গেরুয়া রং আমায় একটু টানলো। এবং এই কথা বোধহয় সরমাকেও, এক চিঠিতে এই গেরুয়া রং-এর বর্ণনা দিয়েছিলুম! সারাদিনের মেজারমেণ্ট, স্কোয়ার ফুট, নক্সার কাগজ—ঠিক এই থেকে মীমাংসার সূত্র সন্ধানের জন্যেই বোধহয় মনে ক'রে সরমা আমায় জানালো, যদি আমি ইচ্ছে করি ওর মামার বাসায় গিয়ে সময় কাটাবার জন্যে একটি সূত্র পেতে পারি। সরমা, এই 'সূত্র' শব্দে কী তুমি প্রতিমাকে মীন করেছিলে?' সদানন্দ কি স্থির দৃষ্টি নিয়ে নিজের স্ত্রীকে দেখে নিলো: 'আমি কী প্রতিমার সঙ্গে দেখা হ'বার সেই প্রথম দৃশ্যটা আঁকবো?' সদানন্দ স্ত্রীর দিকে তাকাতেই মনে করে

নিচ্ছিলো সরমা কিছু বলবে ! কিন্তু সরমা পাশ ফিরে টেবিলের ওপর থেকে পাউডারের পাফটা টেনে আচড় কাটছিলো : 'বিকেল বলবো না, সন্ধ্যার প্রারম্ভ। স্কুলের কাম্পাউণ্ডটা নির্জন, পুবে সিণ্ডার্স-এর রাস্তার ধারে কয়েকটা পতিত আম্রবৃক্ষের সারি !

ঠিক এই সময়েই উঠে সরমা জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো, ওর কাঁধের কাছের আঁচল বাতাসে ফুরফুর ক'রে উড়ছে। সযত্নে রাখা ঘাড়ের পাশে চুলগুলো পর্যন্ত নড়ছে।

'আমি পরিচয়টা এইভাবে দিলাম !' সদানন্দ স্ত্রীর লোভনীয় ঘাড়ের দিকে তাকিয়েই বলতে লাগলো : 'আমি সরমার পিতার পরিচয় টেনে বললাম, আমি তাঁদের কাছেই আপনাদের কথা শুনেছি। ওরা আমার দিকে তাকাচ্ছিলো, নিশ্চয় আমি সেই সময় ভদ্র, সুন্দর যুবক ছিলাম !' সদানন্দ নিজের এই বর্ণনাটুকু দিয়ে একটু হেসে নিলো : 'কিন্তু আমার মনে হচ্ছিলো, আমি যেন কোন জীর্ণ আবহাওয়ার ভিতর এসে পৌছে গেছি ! জীর্ণ কথাটাই কী এখানে ঠিক প্রতিশব্দ ?' সদানন্দ আবার একটি সিগারেট কৌটো থেকে টেনে তুলে হাতের তালুর ওপর গড়াতে লাগলো : 'টেবিলটা প্রায় পুরানো, চৌকির ওপর তোষকের চেহারা কি নগ্ন, যদি আমি সংবাদ দিয়ে আসতাম নিশ্চয় এই তোষক ওরা ঢেকে রাখতো !

: আমি শুনেছিলাম আপনি রেলে কাজ করেন ! : করতাম, এখন অবসর নিয়েছি ! : ও ! এই স্কুলের কোয়াটার্সে থাকেন ! মেয়ে কাজ করে ! : এই যায়গাটার পরিবেশ সুন্দর ! সুন্দর, সত্যই সুন্দর বোধহয় ছিলো। কয়েকটি ছেলেমেয়ে এসে একবার চৌকাটে দাঁড়িয়ে আগন্তুককে দেখে গেলো। প্যাণ্ট এবং ফ্রকের ধারগুলো কী পুরাণো ! : আপনি কলকাতায় গেলে ওদের ওখানে যান ? : তা যাই ! একজন মহিলা এসে চৌকাটে দাঁড়িয়েছিলেন প্রতীপ-বাবুদের পরিচিত ! সরমার মামা আমায় তাঁর স্ত্রীর সাথে পরিচয় করালেন। আমি কী দৃশ্য আঁকছি ? দৃশ্য শব্দ মনে হ'লেই আমার অভিনয়ের কথা মনে হয় !' অভিনয়, ঐ শব্দটাও বোধহয় পরিমাণজ্ঞাপক শব্দ ! দৃশ্য এবং অভিনয়, সরমা শুনে নিশ্চয় বোধহয় একটু বিচলিত হোয়ে উঠেছিলো, সরমার মনে আছে কিনা জানি না !'

সদানন্দ সরমার দিকে তাকিয়ে একগাল সিগারেটের ধুয়ো ছাড়লো :

'সরমা বলছিলো, শুনেছি ওরা অত্যন্ত কষ্টে আছে ! নিশ্চয় একথা সরমা ওর পিতৃদেব কিংবা মাতৃদেবীর কাছে শুনেছিলো, কিংবা লোক-পরম্পরায়—

কিন্তু আমি সেদিন ওর চোখে একটা সহানুভূতি দেখেছিলুম, সেই সহানুভূতি দরিদ্র জীবনের ওপর। সরমা জিগ্যেস করছিলো : প্রতিমার বয়স কত ?

: তোমার মনে নেই ? : অনেক ছোট সময়ে দেখেছি ! দেখতে কেমন ! এগুলো ঔৎসুক্য এবং জানবার পিপাসা। সরমাদের পার্লারে সেদিন শীতের দুপুরের রোদ গোল হোয়ে পড়েছিলো, ক্যাক্‌টাসের টবগুলো দিয়ে একটি সুন্দর আয়ল্যাণ্ড পারলারের নাভিকেন্দ্র, সরমা জিগ্যেস করতে করতে এক পা একটি টাবের গায়ে ঠেকিয়ে ঘসছিলো। : দেখবে তোমার শাড়ী ক্যাকটাসের ধারে লেগে টাবটা উল্টিয়ে ফেলতে পারে। সরমা পা-টা নামিয়ে টাবের ভিতর রাখা প্রায় সরমার শাড়ীর মতই লাল নুড়িগুলো সরমা আঙুল দিয়ে নাড়ছিলো। : তুমি যা ধারনা করছো তা নয়, প্রতিমা সুন্দর নয়। আমি বলতেই সরমা একটি চলতি ভঙ্গি নিয়ে শব্দ করে হেসে উঠলো : আমি কি তাই বলেছি ? : বলছো না, বলতে পার ! তোমার চেয়ে প্রতিমার শরীর দরিদ্র ! : ম্যাট্রিক পাশ করেই স্কুলে মাষ্টারি পেলো ? : তোমার মামা বলছিলো এটা ভাগ্যের গুণেই পেয়েছে। : আমার ওকে দেখতে ইচ্ছা করে !······সরমা তোমার এসব বোধহয় কিছু মনে নেই।'

সদানন্দ স্ত্রীর দিকে তাকালো, সরমা যেন একটি নির্জন স্তূপের মত নির্বিকার।

'ভাগ্য তৈরী হয় বুদ্ধির দৌলতে। তাই না ?' সদানন্দ অন্যান্যদের দিকেও তাকালো : 'বুদ্ধি এবং ভাগ্য সমান্তরালে চলছে। 'আমি সরমার কাছেই শুনেছি, আমার শ্বশুরের একটি ব্রিফ্ দশ হাজার টাকা উপার্জন করে ! তাই না ?' সদানন্দ আবার স্ত্রীকে দেখলো : 'এগুলো বুদ্ধির উপহার ! এবং এই বুদ্ধির দানা দিয়ে সিলভার স্পুণ তৈরী হয়। এবং এই বুদ্ধিমান লোক বর্তমান বাজারে দুর্ঘট। আমার শ্বশুর জানতেন কিভাবে ছেলেমেয়েদের মানুষ করতে হ'বে ! যে সময়ে ছেলেমেয়েদের মন অপরিণত থাকে সেই সময়ে একজন বাইরের লোকের আবির্ভাব ছেলেমেয়েদের পড়ায় বিঘ্ন স্থষ্টি হ'তে পারে ! এই অজুহাতেই না তোমার বাবা প্রতিমাকে তোমাদের বাসায় রাখতে রাজী হন নি ?'

(সরমা একবার জিব দিয়ে ঠোঁটে ঘসা দিলো) : 'আমি অবশ্য এসব সংবাদ সরমার কাছ থেকেই জেনেছি ! এবং সময়ে একটি মেয়ে ম্যাট্রিক পাশ করে জ্ঞান আহরণের জন্যে পড়াশুনা করতে চেয়েছিলো। অবশ্য আমি জ্ঞান সম্বন্ধে, সরমার ডায়েরীর একটি মূল্যবান লাইন উদ্ধৃতি দিতে পারি। স্কুল কলেজ জ্ঞান দিতে পারে না, অর্জন করতে হয়—লাইনটি এই রকম না ?'

সরমা উঠে দাঁড়িয়েছিলো।

'তুমি কি উঠছো?'

ওর বন্ধুরাও বললো: 'যাচ্ছিস্ কোথায়?'

'আমি একথা বহুবার শুনেছি।'

'তাহ'লেও বোস্।'

ওরা ওকে আবার জোর করে বসালো।

'কথা ব্যবহারে ব্যবহারে চামরা হোয়ে যায়।' বসতেই সদানন্দও বললো। আবার একটি সিগারেট ঠোঁটে আটকে ম্যাচটা হাতে তুলে নিলো: 'কথাটা কি সত্যি? লাইফ ইজ এ্যান এম্পটি ড্রীম—সেক্স্পীয়রের এই লাইন কী এখন এম্পটি?' সদানন্দ সিগারেটটা জালিয়ে নিয়ে ধুয়ো পেটের মধ্যে যেন ঢোক গিলে চেপে রাখলো: 'কিংবা তোমাদের সেই পার্লারের তাইতি দ্বীপের সেই মেয়ের দৃশ্যগুলো কি পুরানো, সেই শিল্পীর নাম যেন কী?' সদানন্দ চেয়ারে ঠেস দিয়ে এক পা আর এক হাটুর ওপর উঠিয়ে নিলো: 'অবশ্য শুধু তাইতি দ্বীপ না, সরমা আমাদের ঘরেও একটি ন্যুড্ এনে রেখেছে, শিল্পীর নাম জানি না! তুমি কী আমায় সাহায্য করবে?'

সরমা এদিকের জানালাটা খুলে দিলো, এবং খুলে দিতেই মনে হ'লো বাইরে বৃষ্টি বোধহয় নেই।

'তাইতি দ্বীপ না, কিংবা ন্যুড্, আমিও একটি দৃশ্য উপহার দিই। তার মধ্যে আপনারা এতক্ষণ যা আশা করেছিলেন, সেই প্রেমে শব্দ বোধহয় পাবেন।'

সরমার গালে বাদামি রং আসছে বলে মনে হ'লো। সত্যিই কি বাইরে বৃষ্টি নেই, কিন্তু হাওয়াটা সুন্দর লাগছে। এবং সরমাও এইসময় জানালার বাইরে দৃষ্টি ছড়িয়ে ওর মুখাবয়বে একটি প্রোফাইল তৈরী করেছে।

'ঘটনাটা আমি কিভাবে দাঁড় করাবো ভাবছি! সরমাকে আমি অসন্তুষ্ট করতে চাই না, হয়তো নিজকেও! একটি বাদামী রং-এর বিকেল ছিলো, আকাশে মেঘের স্তর ভেদ ক'রে যে আলো আসছিলো, তা ধূসর হলুদাভ রং-এর বোধহয় ছিলো। সরমার মামা বারান্দায়, আমিও বারান্দায়—আমি জিগ্যেস করছিলুম, ওরা পড়াশুনায় নাকি ভাল? প্রতিমার ছোট বোনটি তুলসী তলার ধারে একটি খেলনার ঘর তৈরী করছিলো, সেদিকে তাকিয়ে বলেছিলুম। : গরীবদের আর পড়াশুনা! সরমার বাবা বলছিলো। : শুনলাম ওরা নাকি ফ্রী স্টুডেন্টসীপ পাচ্ছে। : তা অবশ্য পাচ্ছে! আলোচনাটি কী আপনাদের

কাছে মনোরম লাগছে ?' ফস করে সদানন্দ সরমার বন্ধু চতুষ্টয়ের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো।

'আপনি বলে যান !'

'তাই বলে যাই !' (সরমাও, একবার তার বন্ধুদের দিকে তাকালো) : 'আমাদের সময় আর এই সময় অনেক বদলে গেছে, না-হয় মেয়েই শেষ পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখবে এটা ভাবিনি ! প্রতিমার বাবা বলছিলো, অবশ্য কোন চিন্তাই আগে থেকে ক'রে রাখা উচিৎ নয়। (কথাগুলো আমারও ভাল লাগছিলো) কিন্তু একটা পুরুষের শরীর থেকে মেয়েদের শরীরের অনেক পার্থক্য, আমাদের দেশের জলবায়ু মেয়েদের অত পরিশ্রমের জন্য নয় বোধহয়। প্রতিমার মা চা-র কাপ এনে হাতে দিলো। : শুনলাম সরমা এম. এ. পাশ করেছে ! প্রতিমার মা আমায় জিগ্যেস করলো। : আপনাদের জানিয়েছে ? : কাল চিঠি এসেছে ! একটু চুপচাপ তারপর : অতগুলি টিউসনি করে, আমিও ওকে বলেছিলুম কয়েকটি টিউসনি ছেড়ে না-হয় প্রাইভেটে পরীক্ষাগুলো দিয়ে দেও ! আমি শুনতে শুনতে ভাবছিলাম, টিউসনি, পরীক্ষা, সম্মান, আনন্দ। আনন্দ শব্দটি কি আমি ঠিক ব্যবহার করেছি ?' সদানন্দ স্ত্রীর দিকে তাকালো : 'পরীক্ষার পর সরমা আমায় জানিয়েছিলো, রেজাল্ট আমায় আনন্দ দান করেছে। আনন্দ শব্দটা চমৎকার, আবার আনন্দের অপর পৃষ্ঠের অস্তিত্বটুকু চমৎকার, সেটা বোধ হয় আমার স্ত্রী জানে না। অবশ্য সর্বজ্ঞানই মানুষের আয়ত্তে থাকবে এটা স্বতসিদ্ধ নয়। আমি সেই চিত্রটা তুলে ধরি !'

সরমা আবার চেয়ারে বসে পড়ার পর মনে হ'লো ওর এক'দিকের ব্লাউজটা ঝুলে ওর কাঁধটাকে একটু নগ্ন করেছে। বাইরে আবার বোধহয় নির্দয় বৃষ্টি নামছে।

'কাল রক্তধর বিল দেখতে গিয়েছিলুম, দেখলুম সেখানে অনেক বেলেহাঁস আছে। আমি প্রতিমাকে বলছিলুম। হাঁটতে হাঁটতে আমরা অনেকদূর এসে পড়েছিলুম, পেছনে সেই সান্তাহারের রেলওয়ে কলোনী, ইয়ার্ডটা একটি ছবির মত মনে হচ্ছে। সামনে যতদূর তাকানো যায় ধানক্ষেত। দৃশ্যটা কী আপনাদের ভাল লাগছে ?'

একটু থেমে সদানন্দ ওদের দিকে তাকালো, পরক্ষণেই এক টুকরো হাসি ঠোঁটের ওপর ছড়িয়ে দিলো।

'কাল গিয়েছিলেন ?'—প্রতিমা বললো।

: হাঁ কাল।

: সেখানে অনেক বেলেহাঁস আছে ? আমি যাইনি কোনদিন।

: তা দেখলাম। আপনার দিদি বেলেহাঁস পছন্দ করে।

: সরমাদি ?

: কলকাতায় যাবেন ?

: সরমাদিদের ওখানে।

: তাই।

ও উত্তর করছিলো না।

: আপনি প্রাইভেট আই. এ-টা দিয়ে দিতে পারেন।

: পরীক্ষা !

: তাই।

প্রতিমা নিজের আঙুল আঁচলের মাথা দিয়ে ঘসছিলো।

: মাষ্টারী নিয়েছেন—স্কুলের চাকরীতে আরো উন্নতি হবে।

: প্রাইভেটে দিতে বলছেন ?

: তাই।

: পড়া বোধহয় আমার ভাগ্যে নেই !

: ভাগ্য বিশ্বাস করেন ?

: অতটা বুঝি না।

: আপনার মা বলছিলো, অনেকগুলো টিউসনি করে।

: মা বলছিলো ! ও কেন যেন হেসে উঠলো : মেয়েদের ভয়টা বেশী ! বাবা বোধহয় ভয় করেন, আমার খুব বেশী ঘরের বাইরে থাকা উচিত না। কিন্তু আমি অনেক সময়েই ভাবি কোন উচিতই কারো ইচ্ছায় চলে না।

পরক্ষণেই ও হেসে উঠলো। এবং সেই সঙ্গেই মনে হলো, ওর চোখ দু'টো কি নীল, যে নীলাভাস আমার কোনদিনই চোখে পড়ে নি। হয়তো সামনের সবুজ ধানক্ষেতের জন্যে তা নীল দেখাচ্ছিলো কিংবা এমনো হ'তে পারে যারা মনে নির্মল, তাদের চোখই অত নির্মল হ'তে পারে।'

সরমা উঠে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলো।

'সরমা তুমি বোধহয় এটুকু জান না।'

সরমা নিরুত্তর।

'বাইরে কী বৃষ্টি কমেছে ?'

'সরমাদি কমেছে কী ?' ওর বন্ধুরাও জিগ্যেস করছে।

'কমেছে।'

সরমার শাড়ির ধারগুলো বাতাসে নাড়াচ্ছে।

'ঘটনাটা আর একদিন শুনবো।'

সদানন্দের কানের পাশে একজন ফিসফিসিয়ে উঠলো, এবং সদানন্দ হেসে উঠলো, কিন্তু ভদ্রমহিলা বলেই জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, ওরা ধারনা করে নিয়েছিলো, ঘটনা শেষ পর্যন্ত প্রেম হ'বে। প্রেম, সরমাও কি এইরকম কিছু ধারনা করে নিলো, নাকি চিন্তা করছে—প্রতিমা ওর জীবনের মূর্তিমতি দুর্ঘটনা।

'সরমা একটি কথা শুনবে?' সদানন্দ ডাকলো।

সরমা জানালার কাছ থেকেই ঘাড় ঘুরালো।

আর একপ্রস্ত কফি খাওয়াও। সদানন্দ বললো।

স্কেচ—শৈলেন্দ্র মিত্র

প্র ব ন্ধ

সুধীর করণ

রবীন্দ্রনাথ ও লোকসঙ্গীত

"বাঙলাদেশে আধুনিক যুগের যখন সবে আরম্ভকাল তখন আমি জন্মেছি। ...দেখেছি তখনকার বিশিষ্ট পরিবারে সঙ্গীতবিদ্যার অধিকার বৈদগ্ধ্যের প্রমাণ বলে গণ্য হ'তো। বর্তমান সমাজে ইংরেজ রচনায় বানান বা ব্যাকরণের স্খলনকে যেমন আমরা অশিক্ষার লজ্জাকর পরিচয় বলে চমকে উঠি, তেমনি হ'তো যদি দেখা যেত, সন্মানী পরিবারের কেউ গান শোনবার সময় সমে মাথা নাড়ায় ভুল করেছে, কিংবা ওস্তাদকে রাগ-রাগিনীর ফরমাশের বেলায় রীত রক্ষা করেনি।"—রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি থেকেই ঠাকুরবাড়ীর পরিবেশ এবং সঙ্গীতচর্চা সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

ঠাকুরবাড়ীর যে সাঙ্গীতিক পরিবেশে রবীন্দ্রনাথ আশৈশব বর্ধিত সেই পরিবেশটি সম্পূর্ণরূপে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের। খ্যাতনামা সঙ্গীতজ্ঞদের তত্ত্বাবধানে রবীন্দ্রনাথ শৈশবেই সঙ্গীতচর্চা সুরু করেছিলেন। বিষ্ণু চক্রবর্তী, যদুভট্ট প্রভৃতি প্রখ্যাত ওস্তাদদের কাছে তাঁকে শিক্ষানবিশী করতে হয়েছিল। তাই লোক-সঙ্গীতের কোন পরিবেশই রবীন্দ্রনাথের কাছে অলভ্য ছিল না।

শৈশবে পাঁচালি, যাত্রা, কথকতা প্রভৃতির সঙ্গে তাঁর কিছু কিছু পরিচয় ঘটেছিল, কিন্তু তা' কোনক্রমেই তাঁর উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুচর কিশোরী চাটুজ্যে মাঝে মাঝে পাঁচালির গান ধরতেন। সুকণ্ঠ রবীন্দ্রনাথ পাঁচালির দলে ভর্তি হতে পারলে কিশোরী চাটুজ্যের আনন্দের পরিসীমা থাকতো না। কিন্তু তা' হয় নি বলে—চাটুজ্যে মশায়ের খুব দুঃখ। বলতেন—'আহা, দাদাজি, তোমাকে যদি পাইতাম তবে পাঁচালির দল এমন জমাইতে পারিতাম, সে আর কি বলিব।' পাঁচালির দলে ভিড়ে দেশ দেশান্তর ঘুরে পাঁচালি গান গাইবার জন্য ভারী লোভ হ'তো রবীন্দ্রনাথের। বোধহয় এই লোভেই কিশোরী চাটুজ্যের কাছ থেকে কিছু পাঁচালি গানও তিনি শিখেছিলেন। জীবনস্মৃতিতে, রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

> 'সেই কিশোরীর কাছে অনেকগুলি পাঁচালী গান শিখিয়াছিলাম,—'ওরে ভাই জানকীরে দিয়ে এসো বন', 'প্রাণ তো অন্ত হ'লো আমার কমল আঁখি, রাঙা জবায় কি শোভা পায়, কাতরে রেখো রাঙা পায়, মা অভয়ে, ভাবো শ্রীকান্ত নরকান্তকারীরে নিতান্ত কৃতান্ত ভয়ান্ত হবে ভবে'—এই গানগুলিতে আমাদের আসর যেমন জমিয়া উঠিত, এমন সূর্যের অগ্নি উচ্ছ্বাস বা শনির চন্দ্রময়তার আলোচনায় হইত না।

বলাবাহুল্য পাঁচালি গানের প্রসঙ্গে, অর্বাচীন পাঁচালি গানের কথাই এক্ষেত্রে প্রযোজ্য। লোকসঙ্গীত হিসাবে তাঁর কোন স্বীকৃত পাওয়া অসম্ভব, তবু 'পাঁচালি' নামটি লোকসংস্কৃতির অন্তরঙ্গ বলেই এর উল্লেখ করা হ'লো।

বর্তমান কালে 'যাত্রা'র আধুনিকীকরণের ফলে, তার লোক-চরিত্রের পরিবর্তন ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথের শৈশবকালে যাত্রাগানের রীতির মধ্যে লোক-চারিত্র্য বহুল পরিমাণেই ছিল। এই যাত্রাগানের প্রভাব রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের গীতিনাট্যের মধ্যে একেবারেই পড়ে নি, একথা বলা চলে না; তবে—'যাত্রা'র সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যতটুকু প্রাথমিক পরিচয় ঘটেছিল, তা' তাঁর উপর প্রভাব বিস্তার করার পক্ষে যথেষ্ট নয়।

জনসাধারণের উপর এই যাত্রাগানের একটি প্রবল প্রভাবকে বর্তমান কালেও অস্বীকার করা যায় না। শৈশবে রবীন্দ্রনাথ জনসাধারণের এই সম্পত্তির অংশীদারী লাভ ক'রে আনন্দিত হয়েছিলেন। তাঁর একটি স্মৃতিচিত্রন আছে 'ছেলেবেলায়। বলা বাহুল্য—যে-সখের যাত্রার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ঘটেছিল, সেই সখের যাত্রার দলপতি ছিলেন তাঁর মেজকাকা। সেই মেজকাকা পালা রচনাও করতেন এবং ছেলেদের তৈরী করার ভারও গ্রহণ করতেন।

এই যাত্রাগানের মধ্যে নাগরিকতা যতটুকু ছিল তার চেয়ে স্বাভাবিক ভাবেই বেশী ছিল গ্রাম্যতা।

শৈশবে, ঠাকুরবাড়ীর প্রাঙ্গনে যে 'যাত্রা'র সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটেছিল,, সেই যাত্রার পালা রচয়িতা কোন খ্যাতনাম লেখক নয়। বড় জোর খাগড়া-কলমে হাত পেকেছিল তার, সে কোনদিনই ইংরেজি কপি-বুকের মক্শো করে নি।

এই যাত্রাগানের আসরে—'বড়োয় ছোটয় ঘেঁসাঘেঁসি। তাদের বেশির ভাগ মানুষই—ভদ্দর লোকেরা যাদের বলে 'বাজে লোক'। আর যাত্রাগানের সুর, নাচ এবং গল্প বাঙলাদেশের ঘাট-মাঠের পয়দা করা; এর ভাষা পণ্ডিতমশায় দেন নি পালিশ ক'রে।'

'ঘাটে-মাঠের পয়দা করা' যাত্রাগানের লোক-চারিত্র্য তৎকালে যে অনেক-খানি অকৃত্রিম ছিল, তা' রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য থেকেই বোঝা যায়। কোলকাতা শহরের ধনীলোকেরা মাঝে মাঝে সখের যাত্রার অনুষ্ঠান করিয়ে একটু যেন মুখ বদলে নিতেন। একটু-বা জনসাধারণ হ'বার আকাঙ্খা প্রকাশ করতেন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

> 'শহরে আজকাল আমোদ চলে নদীর স্রোতের মতো। মাঝে মাঝে তার ফাঁক নেই। রোজই যেখানে-সেখানে, যখন-তখন সিনেমা, যে খুশি ঢুকে পড়ছে সামান্য খরচে। সে কালে যাত্রাগান ছিল যেন শুকনো গাঙে কোশ দু-কোশ অন্তর বালি খুঁড়ে তোলা জল। ঘণ্টা কয়েক তার মেয়াদ, পথের লোক হঠাৎ এসে পড়ে, আঁচলা ভরে তেষ্টা নেয় মিটিয়ে।'

সাধারণতঃ ঠাকুরবাড়ীর ছেলেদের যাত্রাগান শুনতে দেওয়া হতো না। এর কারণ হয়তো, তৎকালীন যাত্রার অভিনয়, ভাবভঙ্গি, ভাষার গ্রাম্যতা। বড়োদের এই নিষেধের জন্য স্বাভাবিকভাবে ছোটদের আগ্রহ বর্ধিত হ'তো। রবীন্দ্রনাথ দুঃখ ক'রে বলেছেন ছেলেমানুষ ব'লে তাকে কোনক্রমেই সেই নিষিদ্ধ ফলের কাছাকাছি আসতে দেওয়া হ'তো না। 'আমাদের বাড়ীতে যাত্রাগান হয়েছে মাঝে মাঝে। কিন্তু রাস্তা নেই, ছিলুম ছেলেমানুষ। আমি দেখতে পেয়েছি তার গোড়াকার যোগাড়যন্তর। বারান্দা জুড়ে বসে গেছে দলবল, চারিদিকে উঠছে তামাকের ধোঁওয়া। ছেলেগুলো লম্বা চুলওয়ালা, চোখে কালি-পড়া; অল্প বয়সে তাদের মুখ গিয়েছে পেকে, পান খেয়ে খেয়ে ঠোঁট গিয়েছে কালো হয়ে। সাজগোজের আসবাব আছে রঙ করা টিনের বাক্সোয়।

দেউড়ির দরজা খোলা, উঠোনে পিলপিল করে ঢুকে পড়েছে লোকের ভীড় চারিদিকে টগবগ করে আওয়াজ উঠছে, ছাপিয়ে পড়ছে গলি পেরিয়ে চিৎপুরের রাস্তায়। রাত্রি হবে ন'টা ; পায়রার পিঠের ওপর বাজপাখির মতো হঠাৎ এসে পড়ে শ্যাম, কড়া-পড়া শক্ত হাতের মুঠি দিয়ে আমার কনুই ধরে বলে, 'মা ডাকছে, চলো শোবে চলো।' লোকের সামনে টানা হেঁচড়ায় মাথা হেঁট হয়ে যেত, হার মেনে চলে যেতুম শোবার ঘরে। বাইরে চলছে হাঁকডাক, বাইরে জলছে ঝাড়লণ্ঠন। আমার ঘরে সাড়াশব্দ নেই, পিলসুজের উপর টিমটিম করছে পিতলের প্রদীপ, ঘুমের ঘোরে মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে নাচের তাল সমে এসে ঠেকতেই ঝমাঝম করতাল।'

পরে অবশ্য তিনি একদিন নলদময়ন্তীর পালা দেখার অনুমতি লাভ করেছিলেন ; এমন কি রুমালে কিছু টাকা বেঁধে দাদাদের কাছে বসবার অনুমতিও পেয়েছিলেন। বাহবা দেবার ঠিক জায়গাটিতে ঐ টাকা ছুঁড়ে দেবার রীতি ছিল। তাতে গৃহস্থের সুনাম হত আর যাত্রাওয়ালার হ'তো উপরি-পাওনা।

ঠাকুরবাড়ীতে যাত্রাগানের আসর প্রসঙ্গ থেকে একটি দিক আমাদের কাছে স্পষ্ট হচ্ছে যে রবীন্দ্রনাথ যে পরিবেশে লালিত সে পরিবেশে পাঁচালি, যাত্রা অথবা কথকতা ততখানি ঘাঁটি গেড়ে বসতে পারে নি, মাঝে মাঝে উঁকিঝুঁকি দিয়ে গেছে মাত্র।

রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীত-প্রেরণা লাভ করেছিলেন হিন্দুস্থানী সঙ্গীত থেকে। কোনরূপ লোকসঙ্গীত অথবা হাল্‌কা ধরনের গানও ঠাকুরবাড়ীর সঙ্গীতচর্চার আসরে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে নি। রবীন্দ্রনাথ নিজেই স্বীকার করেছেন যে ছেলেবেলায় যে-সব গান সবসময় তাঁর শোনার অভ্যাস ছিল, তা' লোকসঙ্গীতও নয়, সখের দলের গানও নয়। কালোয়াতী সঙ্গীতের রূপ ও রসই তাঁর মনের মধ্যে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং হিন্দুস্থানী গানই যে তাঁর সংস্কারের মধ্যে পাকাপাকি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল, বাল্যকালেই সে কথা রবীন্দ্রনাথ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন। 'ছেলেবেলা থেকে ভালো হিন্দুস্থানী গান শুনে আসছি বলে তাঁর মহত্ত্ব ও মাধুর্য সমস্ত মন দিয়েই স্বীকার করি। ভালো হিন্দুস্থানী গান আমাকে গভীরভাবে মুগ্ধ করে।' বলেছেন— 'বিষয়বস্তুহীন ছবির নিছক বিশুদ্ধ রূপ আমার ভালোই লাগে, যেমন ভালো লাগে বাক্যহারা সঙ্গীতের আলাপ। বস্তুতঃ আমার নিজের ঝোঁক ঐদিকে।'

বাঙলাদেশে নানা ধরনের দেশী সঙ্গীত, অনেকদিন থেকেই প্রচলিত ছিল কিন্তু রবীন্দ্রনাথ মূলতঃ দেশী সঙ্গীতের সঙ্গে গোড়া থেকেই ঘনিষ্ঠ পরিচিত ছিলেন না। হিন্দুস্থানী সঙ্গীত পদ্ধতির দরবারী সঙ্গীতের সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথের পরিচয় দৃঢ় হয়েছিল। হিন্দুস্থানী লোকসঙ্গীতের সঙ্গেও তাঁর কোন পরিচয় স্বাভাবিক কারণেই ঘটে নি।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের বৈশিষ্ট্যের কথা সম্পর্কে অধিকারী পণ্ডিতগণ তাঁদের সুষ্ঠু অভিমত ব্যক্ত করেছেন এবং সে প্রসঙ্গ বর্তমান ক্ষেত্রে অবান্তর।

লোকসঙ্গীতের কোন ঘনিষ্ঠ পরিবেশে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতচর্চার সূত্রপাত হয় নি। তাই লোকসঙ্গীতের গ্রাম্যতা, তার অসংযত আবেগ ও চীৎকার তাঁর সঙ্গীত সৃষ্টির ক্ষেত্রে কোনরূপ রেখাপাতও করতে পারে নি। কিন্তু আর একটি সত্য আমাদের বিস্মৃত হলে চলবে না যে তাঁর সুর সৃষ্টির দ্বিতীয় পর্যায়ের শেষভাগে তিনি বাঙলাদেশের লোকসঙ্গীতের মর্ম গ্রহণ ক'রে নিজস্ব রীতিতে প্রকাশ করেন। এ বিষয়ে ধূর্জটিপ্রসাদ মূল্যবান অভিমত প্রকাশ ক'রে বলেছেন—

> "কিন্তু এই দ্বিতীয় যুগের শেষভাগে তিনি এক নতুন পরীক্ষা করলেন। শুধু এক সুরের সঙ্গে সেই জাতেরই অন্য সুর মিশিয়ে তিনি হলেন না; সৃষ্টির এক নতুন উৎসের সন্ধান পেলেন। সে উৎস অতি নিকটেই ছিল, একেবারে হাতের কাছে, দ্বারের পাশে পল্লীগ্রাম। কবি চিরকালই পল্লীজীবনের ভক্ত, সহরের কৃত্রিমতা তাঁর কখনো ভালো লাগে নি। তাঁর জীবনের বোধহয় সবচেয়ে সুখের সময় ছিল যখন তিনি পদ্মার দুধারের গ্রামের ঘাটে নৌকা ভেড়াতেন। মাঠে ঘাটে নদীর ধারে, তিনি বৈরাগীর বাউল, ভাটিয়াল, মাঝিদের, সারিগান, পল্লী-উৎসবের ঐক্য সঙ্গীত শুনে বেড়াতেন—তাঁর প্রাণে ঐ প্রকার গানের সুরের আবেগ, ভাবের সবল স্বাধীনতা ও গভীরতা সাড়া দিত। নিতান্ত স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার মতো তিনি এই পল্লী-সঙ্গীত, এই লোকসঙ্গীতের মর্ম গ্রহণ করলেন। এইখানেই তাঁর প্রতিভা। জীবনের সমগ্র ধারাকে নিজের সৃষ্টির মধ্যে বহমান করান প্রতিভার কাজ।"

বলা বাহুল্য যে সংযমের মধ্যে সঙ্গীতের সঙ্গে তাঁর প্রাথমিক পরিচয় এবং যে রুচিশীলতার মধ্যে তাঁর অনুশীলন, তাতে পরবর্তীকালে বাঙলাদেশের লোক-সঙ্গীতও তাঁর সান্নিধ্য লাভ ক'রে ভাবে, ভাষায় এমনকি সুরের ক্ষেত্রেও—

নবতর রূপে আবির্ভূত হয়। তাই লোকায়ত সুরবিন্যাসকে গ্রহণ করলেও রবীন্দ্রসঙ্গীতের কোন অংশই লোকসঙ্গীত নয়।

শৈশবে সঙ্গীতশিক্ষার আসরে একজাতীয় সঙ্গীতের উপর নির্ভর ক'রে রবীন্দ্রনাথের হাতেখড়ি হয়েছিল, যেগুলি মূলতঃ লোকসঙ্গীত। অন্ততপক্ষে ভাবে ও ভাষায় পরিপূর্ণ গ্রাম্যতাই তার একমাত্র পরিচয়। তখন প্রখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ বিষ্ণু চক্রবর্তী ঠাকুর পরিবারের ছেলেমেয়েদের সঙ্গীতশিক্ষক। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—'বিষ্ণু যে-গানে খড়ি দিলেন এখনকার কালের কোন নামী বা বেনামী ওস্তাদ তাকে ছুঁতে ঘৃণা করবেন। সেগুলো পাড়াগেঁয়ো ছড়ার অত্যন্ত নীচের তলার।'

উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি গানের নমুনাও দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ—

এক যে ছিল বেদের মেয়ে
এল পাড়াতে
সাধের উল্কি পরাতে।
আবার উল্কি পরা যেমন তেমন
লাগিয়ে দিল ভেল্কি
ঠাকুরঝি,—
উল্কির জ্বালাতে কত কেঁদেছি
ঠাকুরঝি।

গণেশের মা কলাবউকে জ্বালা দিও না
তার একটি মোচা ফললে পরে
কত হবে ছানাপোনা।
... ...
এক যে ছিল কুকুর-চাটা
শেয়াল-কাঁটার বন
কেটে করলে সিংহাসন।
ইত্যাদি।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন

"শিশুদের মন-ভোলানো প্রথম সাহিত্য শেখানো মায়ের মুখের ছড়া দিয়ে, শিশুদের মন-ভেলানো গান শেখানোর সুরু সেই ছড়ায়—এইটে আমাদের উপর দিয়ে পরখ করানো হয়েছিল।"

বলা বাহুল্য, এই অভূতপূর্ব শিক্ষণ পদ্ধতিও রবীন্দ্রনাথের মনে কোন কৌতূহলের সঞ্চার করে নি। বিভিন্ন শুদ্ধ রাগ-রাগিনীর গানই তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল বেশি।

'সেজদা বেহাগ আওড়াচ্ছেন—অতি গজগামিনীরে', আমি লুকিয়ে মনের মধ্যে তার ছাপ তুলে নিচ্ছি। কিংবা শ্রীকণ্ঠবাবুর সঙ্গে গলা মিলিয়ে গাইতেন—'ময় ছোড়োঁ ব্রজকী বাঁশরী।'

এ হেন পরিবেশে, প্রথম জীবনে কোনরূপ লোকসঙ্গীতের সঙ্গে তাঁর পরিচয়ও হয় নি। শান্তিদেব ঘোষ বলেন, 'বাল্মীকি প্রতিভার গান রচনার সময় পর্যন্ত গুরুদেবের গানে বাঙলাদেশের সর্বত্র প্রচলিত বাউল, ভাটিয়ালি বা কীর্তনের প্রভাব কম। তখন পর্যন্ত তাঁর রচনায় হিন্দী রাগসঙ্গীতের প্রভাব খুব বেশি।'

আসলে ঠাকুরবাড়ীর সুসংস্কৃত পরিবেশে লোকসঙ্গীতের প্রবেশ একরূপ নিষিদ্ধই ছিল। লোকসঙ্গীতের মধ্যে সাধারণতঃ এমন একটি স্থূলতা বর্তমান থাকে, যা' হাসি-পরিহাস-ঠাট্টার ক্ষেত্রেও অনেক সময় অশালীন মনে হতে পারে। এই গ্রাম্যতার জন্যই প্রচলিত লোকসঙ্গীত ঠাকুরবাড়ীতে প্রবেশাধিকার পায় নি। পরবর্তীকালেও যে লোকসঙ্গীতের মাধুর্যে রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ হয়েছিলেন, তার লোকচরিত্র্যে গ্রাম্যতা অনেক কম।

ছিন্নপত্রাবলীর একটি পত্রে রবীন্দ্রনাথ উত্তরবঙ্গের একটি লোকসঙ্গীতের কথা প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করেছেন। গানটি হাস্যকর মনে হলেও গ্রাম্য পরিবেশে বে-মানান নয় বলে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

> "ঠিক সূর্যাস্তের কাছাকাছি সময় যখন একটি গ্রাম পেরিয়ে আসছিলুম, একটা লম্বা নৌকায় অনেকগুলো ছোকরা—ঝপ্‌ঝপ্‌ করে দাঁড় ফেলছিল এবং সেই তালে গান গাচ্ছিল—
>
> 'যোবতী ক্যান্ বা কর মন ভারী ?
> পাবনা থাক্যে আন্যে দেব টাকা দামের মোটরি।'

……গানটা শুনে বেশ মজার লাগল। যুবতীর মন ভারী হলে জগতে যে আন্দোলন উপস্থিত হয়, এই বিলের প্রান্তেও তার একটা সংবাদ পাওয়া গেল। এ গানটি কেবল অস্থানেই হাস্যজনক, কিন্তু দেশ, কাল, পাত্রবিশেষে এর যথেষ্ট সৌন্দর্য আছে। আমার অজ্ঞাতনামা গ্রাম্য কবি-ভ্রাতার রচনাগুলিও এই গ্রামের লোকের সুখ-দুঃখের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক, আমার গানগুলি সেখানে কম হাস্যজনক নয়।"

যাই হোক, এই ধরনের লোকসঙ্গীত রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতের উপর কোন রেখাপাতই করে নি। রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গানের ভাষায় লোকচরিত্রের সন্ধান পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তার মধ্যে গ্রাম্যতা অথবা অসংযমতার কোন

প্রকাশ নেই ; শুধু ভাষার ক্ষেত্রে তাঁর গ্রামীণ সত্তাটুকু—স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান। 'প্রেম' সংগ্রহের একটি গান······'ওলো সই, ওলো সই' এবং 'বিচিত্র' সংগ্রহের' 'হাদে গো নন্দরাণী, আমাদের শ্যামকে ছেড়ে দাও'—গানটির মধ্যে এই গ্রামীণ সত্তা স্পষ্টতঃ বর্তমান। এ ধরনের আরও দু' একটি গান সমগ্র রবীন্দ্রসঙ্গীতে হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে, কিন্তু এভাবে রবীন্দ্রসঙ্গীতের উপর লোকসঙ্গীতের প্রভাব খোঁজা নিরর্থক।

সাধারণতঃ বাউল ও কীর্তনকে লোকসঙ্গীত হিসাবে গ্রহণ করে, রবীন্দ্র সঙ্গীতের উপর তার প্রভাব বিচার করা হয়। বাউল-সঙ্গীত, রবীন্দ্রনাথের গানে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে এ কথা সর্ববাদীসম্মত। কিন্তু বাউল-সঙ্গীতকে কতখানি লোকসঙ্গীতের পর্যায়ভুক্ত করা যায় সে বিষয়ে মতানৈক্য আছে। একটি বিশেষ আধ্যাত্মিক সাধনমার্গের অনুগামীদের মধ্যে তার পরিমণ্ডল সীমিত বলে স্বাভাবিক ভাবেই তার মধ্যে লোকচারিত্র্য অল্প। লোক-সঙ্গীতের মধ্যে যে গ্রাম্যতা, যে স্থূলতা, যে সহজ সারল্য বর্তমান, তা' বাউল-সঙ্গীতের ভাষায় অলভ্য। বাউল সুরের মধ্যে যে প্রাণ-মাতানো আবেগ স্পন্দিত হয়, তাই বাউলকে জনসাধারণের প্রিয় করেছে। কিন্তু জনপ্রিয়তাই লোকসঙ্গীতের একমাত্র লক্ষণ নয়। যে লালন ফকিরের গান রবীন্দ্রনাথের প্রিয় ছিল, সেই লালন ফকিরের গানকে লোকসঙ্গীতের পর্যায়ে ফেললে, তার যাথার্থ্য অস্বীকার করা হয়। রবীন্দ্রনাথ বাউলকে লোকসঙ্গীত হিসাবে স্বীকৃতি দিলেও, আধুনিক সংজ্ঞায় তার যথার্থতা সম্পর্কে সন্দেহ জাগতে পারে। পল্লী-পরিবেশে, পল্লীর অশিক্ষিত মানুষের রচনা বলে এর মধ্যে লোকচারিত্র্য কিছু কিছু পরিমাণে পাওয়া যায় বলেই, বাউলকে অকৃত্রিম লোকসঙ্গীত হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। শ্রীযুক্ত শান্তিদেব ঘোষ বাউলকে স্বরগত ভাবে লোকসঙ্গীত হিসাবেই গ্রহণ করে একথাও বলেছেন যে বাউল গানের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে হিন্দী রাগ-রাগিণীর প্রভাব পরিলক্ষিত হয় এবং এ কথাও বলেছেন যে অন্যান্য লোক-সঙ্গীতের তুলনায় বাউল গানের ছন্দপ্রাচুর্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

নৃতাত্ত্বিক সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে লোকসঙ্গীতের যে সংজ্ঞা তাতে বাউলকে হয়তো অকৃত্রিম লোকসঙ্গীত নামে অভিহিত করা যাবে না। এ বিষয়ে অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্যের অভিমত সমর্থনযোগ্য। তাঁর মতে, বাংলার বাউল গানকে লোকসাহিত্যের অন্তর্ভূক্ত মনে না ক'রে এ দেশের আধ্যাত্মিক দর্শনরূপেই গ্রহণ করা উচিত। যেহেতু, এর মধ্যে লোকসমাজের সামগ্রিক চৈতন্যের কোন সম্পর্ক নাই।

ভাষা ও ভাবগত ভাবে বাউল সঙ্গীতের লোকচরিত্র সম্পর্কে মতভেদ থাকলেও সুরগত ভাবে এর বৈশিষ্ট্যকে লোকসঙ্গীতেরই অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষপাতী সুরজ্ঞ পণ্ডিতদের সংখ্যাই বেশী। শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়ও বাউলকে প্রকৃত লোকসঙ্গীত মনে করেন।

বাউল সঙ্গীত কতখানি লোকসঙ্গীত, কতখানি লোকসঙ্গীত নয় এ বিতর্ক স্থগিত রেখেই বলা যেতে পারে বাউল সঙ্গীতের ভাষার সরলতা, ভাবের গভীরতা এবং সুরের মধুরতা রবীন্দ্রসঙ্গীতের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। বাংলায়—স্বদেশী আন্দোলনের যুগে—বাউল সুরে অসংখ্য গান তিনি রচনা করেন। সারিগানের সুরেও কয়েকটি গান তিনি রচনা করেন, কিন্তু ভাটিয়ালী ঢঙে কোন গানই তিনি রচনা করেন নি।

কীর্তনের লোকচরিত্রও প্রশ্নাতীত নয়। নামকীর্তনের মধ্যে যদিও লোকসঙ্গীতের স্থূল পুনরাবৃত্তি তার চরিত্র বিশ্লেষণের পক্ষে সহায়ক, পালা কীর্তনের আভিজাত্যে তা' নয়। ব্যক্তি চেতনায় সমৃদ্ধ এই সব গান উচ্চতর মানসিকতার পরিচয় বহন করে। শ্যামাসঙ্গীত, পালাকীর্তন প্রভৃতি সুরের বৈচিত্র্যে, রচনার স্বকীয়তায় লোকসাহিত্যের গণ্ডী অতিক্রম করে গেছে। সেই হিসেবে রবীন্দ্রসঙ্গীতের উপর কীর্তনের প্রভাবকে লোকসঙ্গীতের প্রভাব হিসেবে গণ্য করা ঠিক নয়। দিলীপকুমার রায় কীর্তনকে মহান নাট্যসঙ্গীত বলার পক্ষপাতী এবং কোনক্রমেই একে লোকসঙ্গীতের পর্যায়ভুক্ত করার পক্ষে উৎসাহী নন। কীর্তন লোকপ্রিয় বটে, কিন্তু লোকপ্রিয়তাই লোকসঙ্গীতের মাপকাঠি নয়। তিনি এও বলেছেন যে কীর্তনের যে অংশে ছোট আবেদন বর্তমান, যেখানে মাতামাতি, ঝাঁপাঝাঁপি হৈ-হৈ রৈ-রৈ বেশী সেইখানেই কীর্তনের জনপ্রিয়তা। তাই কীর্তনকে তিনি 'ক্লাসিক' নামেই বিশেষিত করেছেন। বলেছেন—কীর্তনকে লোকসঙ্গীতের পর্যায়ে ফেললে জহুরিপনার পরিচয় দেওয়া হয় না। কীর্তনের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে এবং হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের কাছ থেকে কিছু কিছু ঋণ গ্রহণ করলেও তার স্বাভাবিক আভিজাত্য বজায় আছে।

তিনি এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের একটি পত্রেরও উল্লেখ করেছেন : রবীন্দ্রনাথ তাঁকে লিখেছিলেন—"বাঙলাদেশে কীর্তনগানের উৎপত্তির আদিতে আছে একটি অত্যন্ত সত্যমূলক গভীর এবং দূরব্যাপী হৃদয়াবেগ। এই সত্যকার উদ্দাম বেদনা হিন্দুস্থানী গানের পিঞ্জরের মধ্যে বন্ধন স্বীকার করতে পারলে না, সে বন্ধন হোক না সোনার, বাদশাহি হাটে তার দাম যত উঁচুই হোক। অথচ

হিন্দুস্থানী রাগ-রাগিনীর উপাদান সে বর্জন করে নি। সে সমস্ত নিয়েই সে আপন নূতন সঙ্গীতলোক সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করতে হলে চিত্তের বেগ এমনিই প্রবলরূপে সত্য হওয়া চাই।"

রবীন্দ্রনাথের এই বক্তব্যের পরে, কীর্তনকে যে নামেই অভিহিত করা যাক না কেন, তাকে লোকসঙ্গীত বলা চলে না। কীর্তনকে যাঁরা লোকসঙ্গীত বলেন, তাঁরা ভুলে যান যে পল্লীর সঙ্গীতমাত্রই লোকসঙ্গীত নয়; এমনকি লোকায়ত সুরারোপেই কোন সঙ্গীতের লোকচারিত্র পরিস্ফুট হয় না।

স্কেচ—শৈলেন্দ্র মিত্র

গল্প

সুকুমার রায়

কাক

জুয়োলজির অধ্যাপক। ডক্টর সমীর দাস প্রাণীতত্ত্বে মন দিয়ে কাজ করেছে, ছাত্র পড়িয়েছে। প্রাণীর দেহবৈচিত্র্য এবং প্রাণীর প্রকৃতি নিয়ে সারা জীবন ভাবছে। সংসারের কোন খবরাখবরের ধার ধারে না। তা ছাড়া জীবনটা তাঁকে বিপর্যস্ত করেছে, পশ্চাতের জীবনের দিকে ফিরে তাকাতে আগ্রহ সমীর দাসের মনে মোটেই নেই। অনেক চেষ্টা করেছে কোলকাতা ছেড়ে চলে যেতে, কিন্তু সুবিধে সুযোগ হয় নি। একটি ছাত্রীকে বিয়ে করে নতুন ঘর সাজিয়ে বসেছে।

সন্ধ্যার অন্ধকারে কে এসে দরজা ঠুকছে? খোলা দরজা ঠেলে ঢুকে পড়ল ঘরে। আমার নাম এডভোকেট চাটার্জী পুরো নাম মণি চট্টোপাধ্যায়।

ডক্টর দাস বলল, আসুন, আমার কাছে কোন প্রয়োজন আছে কি?

হ্যাঁ নিশ্চয়। আপনার কাছেই। আমি আসছি পুরুলিয়া থেকে।

সমীর চঞ্চল হয়ে পড়ল, পুরুলিয়া থেকে আমার কাছে এসেছেন কেন?

কোন একটি জরুরী মোকদ্দমার ব্যাপারে আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে। বিষয়টি জুয়োলজি সম্পর্কিত।

সমীর দাস যেন নিশ্চিন্ত হল। কোন একটি অজ্ঞাত ভাবনা সমীর দাসকে ভাবিয়ে তুলেছিল। লোকটি ঘরে ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গেই স্ত্রী বিনীতা এসে পেছনে দাঁড়িয়েছে। বিনীতা স্বামীর মুখে চমক দেখতে পেয়েছে। কি একটা ছায়া নেমে আসে সমীর দাসের মুখে সর্বদা, নব পরিণীতা স্ত্রী সাহায্যের জন্যেই এসে দাঁড়ায় যেন বিপদের সহায় হয়ে। ডক্টর সমীর দাস যেন রুটিনের বাইরে যা কিছু ঘটনা ঘটে যায় তাকে সহজ ভাবে স্বীকার করে নিতে পারে না। এডভোকেটের দিকে ন্যস্ত হল সন্দেহের দৃষ্টি।

মণি চট্টোপাধ্যায় বলল, আমি আপনার খবর, আপনার রিসার্চ-ওয়ার্ক—সব কিছুর সম্বন্ধেও জানি। আপনি নতুন বিয়ে করে সংসার রচনা করেছেন্ তাও শুনেছি। এবারে আমি পুরো কেসটি আপনাকে বলব, আপনার মতামত আমার দরকার।

বেশ বলুন। কি কেস? সংক্ষেপে বলুন।

স্ত্রী বিনীতা এবারে ঘরের ভেতর থেকে এগিয়ে এসে বলল, ব্যস্ত হচ্ছো কেন? ইনি কেস বলতে এসেছেন। ফিস দেবেন তো?

কথাটি এড়িয়ে নিয়ে মণি চট্টোপাধ্যায় বলল, অনেক দীর্ঘ। একটি ছোট গল্প। শুনে আপনার মতামত দেবেন। আমাকে একটু সময় দিতে হবে।

বিনীতা বলল, বেশ বলুন। আমি আপনাদের জন্যে চা নিয়ে আসছি। বিশেষতঃ আপনি অতিথি। এখানে তো বিশেষ কেউ আসে না!

বিনীতা ভেতরে চলে গেল।

সমীর চঞ্চল হয়ে বলে, নিছক জুয়োলজির ব্যাপার হলে শুনতে প্রস্তুত।

হ্যা, স্রেফ প্রাণীতত্ত্ব। এর বাইরে কিছু নয়—জীববিদ্যার অন্তর্গত ব্যাপার।

তা হলে আরম্ভ করুন।

খানিকটা ভঙ্গি করে নীরবতা অবলম্বন করল মণি চট্টোপাধ্যায়। হাত উঁচু করে কিছুক্ষণের জন্যে বিশ্রাম কামনা করে। অল্পক্ষণেই বিনীতা চা-এর ট্রেতে চা-এর উপকরণাদিসহ প্লেট কাপ ইত্যাদি ট্রেতে সাজিয়ে সমীরের কাছাকাছি বসল। বলুন আপনার কেসটি বলুন।

আমার কেসটিকে একটু বিস্তৃতভাবে বলতে দিন। আমি সমস্ত কাহিনী বলে শেষ করব ধীরে ধীরে।

বিনীতা বলল, আচ্ছা বেশ, আরম্ভ করুন। আমি আপনাদের চা দিচ্ছি।

সমীর দাস চঞ্চল হয়ে তীব্রভাবে তাকায় মণি চট্টোপাধ্যায়ের দিকে। লোকটির গালে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি—বেশ বড় হয়েছে। লোকটির চোখ দুটো

সামান্য বোঝা। চেহারাটি মনে হয় পরিচিত। কিন্তু বসন ভূষণে এডভোকেটের পরিপূর্ণ ছাপ দেখে কিছুতেই চেনা-চেনা মনে হয় না।

সমীরের বড়ভাই ওর ছেলেবেলায় ডাকাতির দায়ে জেলে গিয়েছিল। দুটো ভাই ও মা নিয়েই ছিল সংসার। জেল থেকে ফিরে বড়ভাই কখনো বাড়ী এসেছে, কিন্তু ছোট ভায়ের সঙ্গে দেখা হয় নি। কয়েকটি ডাকাতি ও রাহাজানি করে মা ও ভাইকে প্রচুর টাকা দিয়ে উধাও হয়ে যায়। সমীর মাকে জিজ্ঞেস করে নি ওদের টাকা কোথা থেকে আসে। কিন্তু বড় ভায়ের টাকায় মানুষ হয়েছে, একথা মনের ভেতরে একটা চিরন্তন অনুশোচনার ছায়া নিয়ে আসে। সমীর গভীর ভাবে পড়াশোনা করে, রিসার্চের কাজে ডুবে যায়, ডক্টরেট হয় জুলজিতে। প্রাণীর জীবন চর্চা জীবনের ধ্যান হয়ে দাঁড়ায়। অধ্যাপক হবার সঙ্গে সঙ্গে মায়ের মৃত্যু হয়। ভায়ের খোঁজও পাওয়া যায় নি, মনে হয়, সে আর বেঁচে নেই।

অধ্যাপনার জীবনে বিনীতা একদিন লেবরেটরিতে এসে কথায় কথায় জিজ্ঞেস করে ডক্টর দাসের মুখে কেন দুঃখের ছায়া? সমীর দাস খোলাখুলি বলে, জীবনে সে একাকী, অন্যায় উপার্জনের টাকায় সে মানুষ হয়েছে তাই তার দুঃখ। বিনীতা হাসে। এরূপ ন্যায় অন্যায়ের বিশ্বাস বিনীতার নেই। বিশেষ প্রাণীতত্ত্বের চর্চা যারা করে তারা এরূপ মানবিক ভাব গ্রাহ্য করবে কেন। সমীর দাসের বিয়ের এই হচ্ছে মুল উৎস। এরপর সামান্য কিছুকাল কেটেছে। ডক্টর সমীর দাসের জীবনে পরিবর্তন এসেছে। কিন্তু মানুষের প্রতি বিশ্বাস, জীবন সম্বন্ধে নিশ্চিন্ততা এখনও আসে নি।

ডক্টর দাস দপ্তর থেকে ফিরে এসে নির্দিষ্ট আসনে বসে বইয়ের ভেতরে মুখ রেখে দিন কাটায়। বিনীতা বহু কথার প্রস্তাবনা করে। বহু প্রসঙ্গ উত্থাপন করে—সমীর দাসের কাছে সবই সামান্য এবং অবান্তর। শুধু প্রাণীতত্ত্ব আর ব্যক্তিগত জীবনের ইতিহাস—এ দুটোই ভাবনার রাজ্য।

এডভোকেট মণি চট্টোপাধ্যায় আসার সঙ্গে সঙ্গেই ডক্টর দাস তাই সচকিত হয়েছে। বিনীতার উপস্থিতিতে নিজেকে সামলে নিয়েছে। এডভোকেট কালো কোটে ভাজ ঠিক করে কালো টাইটিতে হাত বুলিয়ে বলতে শুরু করে—

সুরেশবাবু নামে এক ভদ্রলোক কয়লা খনি অঞ্চলে, বাংলাদেশের পশ্চিম প্রান্তের একটি শহরে, মাঘের দুপুর বেলায় এসে উপস্থিত হলেন। শহরের নামটি বলবার প্রয়োজন নেই। সঙ্গে এনেছেন একটি সুটকেস ভর্ত্তি জিনিসপত্র,

বিছানা, আর পোর্টফোলিও ব্যাগ। ব্যাগের ওপরে এস চৌধুরী নামটি বড় করে লেখা। যেন কোনো কোম্পানীর রিপ্রেজেন্টেটিভ এলেন শহরে।

এ শহরে রেলওয়ে স্টেশনের কাছেই ডাক বাংলো। সামনে খানিকটা মাঠ, মাঠ ভর্তি কতকগুলো ঝাঁকড়া গাছ ; সেগুলো পার হয়ে গিয়েই ডাক বাংলোর একতলা দালান।

মুটের মাথায় মোট চাপিয়ে সুরেশবাবু ডাক বাংলোতে আসেন। ঝাঁকড়া গাছগুলোতে হাজার হাজার পাখীদের বাস, পাখীদের সহাস্য সম্বর্ধনা চলতে থাকে। মুটের পয়সা চুকিয়ে দিয়ে তাকান রহমানের দিকে।

রহমান স্মিত হাসি হেসে সেলাম জানায়। সে একাধারে ডাকবাংলোর বাবুর্চি এবং ম্যানেজার। ব্যবস্থাপনার জন্যে পুরুষানুক্রমে ওরা এখানে চাকরী করছে। রহমান বেশভূষা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—সযত্ন পারিপাট্যে বেশ উজ্জ্বল। প্রয়োজন অনুসারে অতিথি অভ্যাগতের ব্যবস্থা করে, সরকারী দপ্তরে যাতায়াত করে এবং সৌখীন বাবুদের ফরমায়েসে মাঝে মাঝে ডিনার পরিবেশন করে। তাছাড়া—আরও কাজ রয়েছে। রহমান মাঝখানের ঘরটির দরজা খুলে দেয়। সুরেশবাবু ভেতরের দিকে তাকিয়ে বলেন, এবারে যে বড়ো খারাপ ঘরটি দিলে রহমান!

আপনাকে ঘর দেওয়া যে বে-আইনী, স্যার!

আজকাল তুমি আইন ঘাঁটছ বুঝি?

না স্যার, ও ঘর রিজার্ভ রয়েছে। এটা শীগ্‌গির চুণকাম হবে। তালা বন্ধ হয়ে পড়ে আছে তাই আপনাকে দিলুম।

একরকম দয়া করেই দিলে?

আপিস থেকে পারমিশান তো নিতে হবে।

তাই নিও তাহলে, বলেই সুরেশবাবু ভেতরে এগিয়ে যান।

সুরেশবাবু গায়ের চাদরটা আলনায় রেখে বিছানাটা টেনে নিয়ে যান। রহমান সাহায্যের জন্যে এগিয়ে আসে।—থাক থাক আমি নিচ্ছি, তুমি শুধু একটু চা দাও। আর কিছু করতে হবে না।

যো হুকুম!

সুরেশবাবু রহমানকে বিছানা স্পর্শ করতে দিচ্ছেন না।

কোথা থেকে এলেন, স্যার?

কোলকাতা থেকে।

এখন তো কোলকাতার গাড়ী আসে নি।

সুরেশবাবু বললেন, তা তোমার তাতে কি দরকার? আমি কখন এসেছি, কোথা থেকে এসেছি—সেকথা তোমাদের দপ্তরের খাতায় লিখে দেব। তুমি আমাকে চা দাও।

বাক্স থেকে খুলে একটি বিস্কিটের টিন রহমানের হাতে দিলেন, বললেন, এই নাও এতে মাল আছে, তোমার মুনাফা মিলবে।

রহমান বলল, আমি তো স্যার এখন নিতে পারব না।

সুরেশবাবু সন্দেহের দৃষ্টিতে এক মুহূর্ত চেয়ে দৃঢ় কণ্ঠে বলেন, বুঝেছি? চালাকী করে তুমি আমাকে পুলিশে ধরিয়ে দিতে চাও? তুমি কোথায় থাকবে ভেবে দেখেছ? নাও টাকাটা হাতছাড়া করো না। যেখানে খুশি রেখে দিও।

নীরবে রহমান বাক্সটি হাতে নেয়। চালে ভুল হয়ে গেল—বলে, সেজন্যে নয় স্যার। আজকালের মধ্যে এখানে একজন পুলিশের কর্মচারী আসবার কথা আছে।

তা আসুন, তাতে তোমার তো আরো সুবিধে। এখানে কেউ টোপ ফেলতে পারবে না। যাও।

বাক্সতে ভরে এনেছেন আফিম।

সুরেশবাবু এগিয়ে গিয়ে বাথরুমের মধ্যে তাকিয়ে দেখলেন, ভেতরে এক কোণে দুটো কাক বসে রয়েছে মুখোমুখি, যেন দুজনা নিভৃতে আলাপ করছে কোনো গুরুতর প্রসঙ্গ। বাইরের দিকে দরজা বন্ধ।

সুরেশবাবু মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে রহমানের দিকে তাকালেন, রহমান!

সায়েব?

কাক দুটো ওখানে কেন?

থাক, ওরা আপনার ক্ষতি করবে না।

তা হোক, কাক দুটো তাড়াও।

স্যার, তাড়াতে পারব না যে!

তা হলে আমাকে তাড়াবে?

ঘরটা বন্ধ রাখা হয়েছে বলেই তো আপনার পক্ষে নিরাপদ।

তার মানে?

এখানে অন্য কেউ আসবে না। বেশ নিরিবিলি!

আসার দরকার কি?

যদি সেই মেয়েটি আসে দেখা করতে? অলক্ষ্যে রহমানের মুখে হাসি মিলিয়ে যায়।

সুরেশবাবু বিরক্তি প্রকাশ করেন, কিন্তু তুমি কোন যুক্তিতে কাক পুষবে ?

পোষবার জন্যে নয় স্যার। ওদের আশ্রয় দিয়েছি।

মানে ?

যেমন মানুষকে আশ্রয় দিতে বাধ্য, তেমনি জন্তু, জানোয়ার পাখীকেও যে আশ্রয় দেওয়া উচিত স্যার।

সুরেশবাবু ধৈর্যচ্যুতি হতে চায়। বা থ রু মে ?

আমি আপনাকে অন্য বাথরুম দেব, স্যার।

সুরেশবাবু আর কথা বলেন না। ঠোঁট দুটো আকস্মিক দৃঢ়তার চাপে একবার অস্বাভাবিক ভাবে ছড়িয়ে বিকৃত হয়ে ওঠে। একটা আড়ষ্ট ক্রোধ ঢোক গিলে নে'ন। রহমানের ইঙ্গিত হজম করেন সুরেশবাবু অনেক বড়ো লাভের আশায়। ছোট ক্ষতি, ক্ষতি নয়।

সুরেশবাবু হাতের ব্যাগটি খুলে কয়েকটি কাগজপত্র পরীক্ষা করেন, সিগারেটের কৌটো বার করে, মৌনতা ভঙ্গ করলেন, রহমান, তোমাকে তো মুর্গী-রসিক বলেই জানতুম। কবে থেকে কাক-রসিক হলে ?

রহমানের সদম্ভ উক্তি ধ্বনিত হয়, স্যার, বাবুর্চিগিরি আমার পেশা হতে পারে কিন্তু আমি নবাবের বংশধর ছিলুম।

ও তাই বুঝি ? সেজন্যে কাক পোষমানাতে চাও ? করো। কিন্তু আমাদের সাংসারিক ভদ্রতা রক্ষার মধ্যে বাধা দিও না।

রহমান এবার স্পষ্ট করে বলে, স্যার আপনাকে জায়গা দেয়া বে-আইনী। কিন্তু জায়গা দিতেই হবে। এ কাকটিও ওর সমাজের আইন ভেঙেছে বলে ও পালিয়েছে। ওকেও যায়গা দিয়েছি—আশ্রয় দিয়েছি।

সুরেশবাবু রহমানের উদ্ধত উক্তিতে ভেতরে ভেতরে দগ্ধ হলেন। একবার চোখের কোণে তাকালেন।

ধন্যবাদ নবাবজাদা, আমাকে শুধু এক কাপ চা দাও, তারপর শুনব তোমার দয়ার কথা।

রহমান সুরেশবাবুর এ শ্লেষ মেনে নিতে পারল না, বলল, স্যার তা হলে একটি কথা বলব। দয়া নয়, আশ্রয়দান আমার কাজ। পুলিশ আপনার খোঁজ করেছিল, কিন্তু তবু আমি আপনার সহায়।

তা তো হবেই রহমান। তোমার তো তা না হয়ে উপায় নেই। তুমি দোস্ত বটে। কিন্তু কেন খোঁজ করেছে জানতে পারি ?

রহমান কি যেন বলতে সুরু করে।

সুরেশবাবু আবার বলেন, কিন্তু, কেন খোঁজ করেছে? আফিম আর কোকেনের জন্যে করলে তুমি তো ছাড়া পাবে না। তা হলে আর কিসের জন্যে?

স্যার সেবারে মণিমালাকে নিয়ে এসে রাত্রিবাস করলেন, তারপর হাসপাতালে নার্স করে দিলেন—এসবের জন্যে।

একবার ঢোক গিলে ফেললেন সুরেশবাবু,—তা তোমার কাগজপত্র আর ডাক বাংলোর ডায়েরী অনুসারে এক ঘরে বাস করি নি তো। আর সে সব কথা ছাড়ো, মেয়েটি সরকারি চাকরী নিয়েছে, ওর পুলিশ ভেরিফিকেশান তো হবেই। সেজন্যে ভয়ের কি আছে? তোমার উৎকণ্ঠার কি প্রয়োজন? যাও, চা নিয়ে এসো।

রহমান চা তৈরী করতে চলে যায়। সামনেই একদল শালিক ঝগড়া করতে করতে আছড়ে পড়ে মাটির ওপর। ওরা একটির পর একটি আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। ওপরে পায়রাগুলো শব্দের রেখা এঁকে উড়ে চলে যায়।

সুরেশবাবু চেয়ারটিতে গা এলিয়ে দিয়ে চারদিকে তাকাতে থাকেন। সুরেশবাবুর দেহটি দীর্ঘ ও ঋজু। বয়স বোঝবার উপায় নেই। মাথায় চুলে ঢাকা টাক। কানের আশে পাশে কয়েক স্তর কেশগুচ্ছে কলপের ব্যবহার চলে। গা এলিয়ে দিয়ে সিগারেট ধরালেন। রহমান বারান্দায় একটি টি-পয় এনে চা-এর ট্রে নামিয়ে দিলে। সুরেশবাবু রহমানকে একটি সিগারেট দিলেন। রহমান আবার অন্তরঙ্গ হয়ে বলল, স্যার, ডাক বাংলোতে দুদিন লোকজন নেই। কেউ আসবে না আজ। নার্সকে একবার খবর দেব।

রহমান সুরেশবাবুকে স্মরণ করিয়ে দিতে চায় যে ইনি মণিমালাকে নিয়ে এর পূর্বে এখানেই রাত্রি যাপন করেছেন।

সুরেশবাবুর অস্বীকার করবার কোনো স্পৃহা নেই, জিজ্ঞেস করেন, রহমান, সেই মণিমালা মেয়েটি ভাল আছে তো?

রহমাস আগ্রহে এগিয়ে আসে। ফিক করে হাসে, যেন এতক্ষণ যে কথা বলতে চেয়েছে তা প্রকাশ করতে পারছে, হ্যাঁ স্যার এখন আরো ভাল হয়েছে।

মুল বিষয়টি হচ্ছে এই যে কিছুকাল আগে মণিমালা নামে একটি মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে এসে ডাক বাংলোতে রাত্রিবাস করেছিলেন। পরিচয় দিয়েছিলেন আত্মীয়া। একদিনের মধ্যেই এখানকার হাসপাতালের সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ করে মেয়েটিকে নার্সের কাজে ভর্তি করিয়ে দেন। রহমানের ধারণা ছিল সুরেশবাবুর সব কিছুতেই রহমানের ভাগ রয়েছে, কিন্তু এক্ষেত্রে মণিমালা হাত ছাড়া হয়ে গেল বলে রহমানের মনে ক্ষোভের অবধি ছিল না। সুরেশবাবু সহজেই বুঝতে পেরেছিলেন, কিন্তু রহমান সুবিধে করতে পারে নি।

সুরেশবাবু রহমানের মনের প্রত্যন্ত দেশটি পর্যন্ত দেখতে পেলেন। ওর দুর্নিবার লোভ সুরেশবাবুর আশা আকাঙ্ক্ষাকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছে। আলোচনার মোড় ফিরিয়ে দিয়ে বলেন, রহমান বাথরুম থেকে কাক দুটো তাড়িয়ে না দিলে আমার বড়ো অসুবিধে হবে।

রহমান উত্তর দেয়, কিছু ভাববেন না। সব ব্যবস্থা করব। মেয়েটাকে কি খবর দেব?

ধীরে বলেন, না? তুমি আমার একটি প্রশ্নের জবাব দিচ্ছ না—কাক তাড়াতে চাও না কেন?

ডাক বাংলোর সংলগ্ন গাছগুলোতে অসংখ্য পাখীর গোলমাল চলেছে। মানেপালে অনেকগুলো কাক যেন রহমানকে লক্ষ্য করেই চেঁচাচ্ছে। রহমান বলল, স্যার আপনার সন্দেহ যখন হচ্ছে বলতে হবে। আমি কাক বড়ো ভালবাসি।

ভালবাসলে ঘরে নিয়ে যাও। এখানে বাথরুমে রেখেছ কেন?

তাহলে সব কথা খুলেই বলতে হচ্ছে। এ হচ্ছে কাক-পুলিশের হাত থেকে আগলে রাখার ব্যাপার। এই কাকটাকে আমি অনেক দিন থেকেই জানতুম। কাকটা একবার আমার মাথায় ঠুকরে আমার জীবন রক্ষে করেছিল। দেয়ালের ধারে ছিল একটা কেউটে সাপ। আমি যাচ্ছিলাম ওদিকে। আমার মাথায় ঠুকরে সামনে উড়ে যেতেই সাপটা আমার নজরে এসে যায়।

তা যেন হোল, কিন্তু কি করে ওই কয়েকটি কাককে চেন?

অনেকগুলো কাকই চিনি।

সুরেশবাবু উৎসুক হয়ে তাকালেন।

হ্যাঁ স্যার, বিশ্বাস করুন। ও আর ওর সঙ্গের কাকটি মিলে আমার মেজো মুর্গীটাকে বাঁচিয়ে দেয়। জানেন তো আমার মেজো রাণীই সবচেয়ে বেশি ডিম দেয়। মেজরানী বেশ একটা খোলা জায়গায় ডিমে তা দিতে বসে পড়ে। ওপর থেকে একটা বাজ পাখী তাক করছিল ওকে, ছোঁ মেরে নিয়ে যাবার জন্যে। উড়ে এসে মাটিতে পড়বার আগেই বাধা দেয়। সেই থেকে ওরা আমার বন্ধু।

সুরেশবাবুর ঔৎসুক্য বাড়ল। কিন্তু কাক দুটো এখানে কেন? সুরেশবাবু জিজ্ঞেস করেন।

জানি না কেন, ঠিক দুদিন আগে অনেকগুলো কাক মিলে ওকে মারবার মতলব করেছিল। কাক-পুলিশেরা ওকে ধরেছিল। আমি তাড়িয়ে দিয়েছিলাম। সেই থেকে ওকে এই ঘরের মধ্যে রেখেছি।

সুরেশবাবু হেসে বলেন, ওখানে একটি তো নয়, তোমার দুজন বায়স-বন্ধু দেখতে পাচ্ছি যে।

রহমান হাসির প্রত্যুত্তর দেয়, বিবেচনা করুণ, দুনিয়ার কেউ তো একলাটি নেই। ওরাও দুজন। অন্যজনা ওর পরিবার মনে হয়, ওকে খুঁজে বের করেছে। লুকিয়ে দেখাশোনা করে যায়। দিনের বেলায় কোনো এক সময়ে এসে আকুলি বিকুলি করে জানাতে থাকে—"দরজা খুলে দাও"। আমি ঠিক বুঝতে পারি ওর মনের কথা।

ভালো, তুমি কাকের ভগবান হয়েছ? ইয়ে আল্লা!

রহমান এ বিদ্রুপের জবাব দেয়, মানুষেরও। মানুষেরা এসে অনুরোধ করে—দরজা খুলে দাও এখানে পালিয়ে বাঁচি।

সুরেশবাবু বলেন, পলাতককে যায়গা না দিয়ে তোমার উপায় কি? তুমি যাবে কোথা?

রহমান ইঙ্গিত স্পষ্টই বুঝতে পারে কিন্তু হেসে উড়িয়ে দেয়। সুরেশবাবু উঠে এসে, ব্যাগ নিয়ে, সামনেই পাইকিরি দরে বিক্রি করবার জন্যে কতগুলো জিনিষপত্র বের করেন। একটি কালো চশমা খুলে চোখে পরে মাথার চুল পাল্টে দিয়ে বেরুবার জন্যে প্রস্তুত। রহমান তখনও দাঁড়িয়ে।

বিছানাটা গুছিয়ে রাখব?

দরকার নেই, সুরেশবাবু বলেন।

রহমান সুরেশবাবুর দিকে তাকিয়ে থাকে?

দেখছো কি? ভাবছো বিছানায় হাত দিলেই মালের সন্ধান পাবে? তা পাবে না। বালিশের ভেতরে কিছু নেই। যা ছিল তোমাকে দিয়েছি। টাকা এনে দাও।

ব্যাগ হাতে নিয়ে সুরেশবাবু গটগট করে বেরিয়ে যান। রহমান দরজা টেনে তালা লাগাতে সুরু করে। সুরেশবাবু গাছের তলায় দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ ভেবে নেন—তারপর এগিয়ে যান রাস্তার দিকে।

দু ঘণ্টা পর সুরেশবাবু ফিরে এসেই রহমানকে ডাকেন।

চৌকীদার এসে তালা খুলে দেয়; সুরেশবাবু জামা কাপড় ছেড়ে বিশ্রামের জন্যে তৈরী হ'ন।

একবার স্নান ঘরের মধ্য দিয়ে এগিয়ে গিয়ে ওপাশের দরজা খুলে রহমানকে ডাকেন। দূর থেকে চৌকীদার জানায়, 'রহমান আয়া নেহি। কোর্টমে গিয়া হোগা।' সুরেশবাবু ঘরের কোণে তাকিয়ে দেখেন, কাক দুটো সভয়ে

সুরেশবাবুর দিকে চেয়ে রয়েছে। বিবর্ণ দেয়ালের গায়ে মাকড়সা নির্ভাবনায় থাকতে না পেরে ওপরের দিকে ছুটে যাচ্ছে। কালি ঝুল জমেছে প্রচুর। রহমানকে না পেয়ে অন্যমনস্ক হয়ে সুরেশবাবু দরজা খোলা রেখেই ফিরে আসেন বিছানায়।

বিছানায় শুয়ে হয়ত ভাবেন, সেবারে ওই খাটটিতে মণিমালার বিছানা ছিল। বোধ হয় একটি রাত্রির পুরোনো স্মৃতির কোলে আড়মোড়া দিয়ে দেহের মধ্যে বিষধর জেগে ওঠে। মণিমালার স্নিগ্ধ কোমল শরীরটাকে ওখানেই পেয়েছিলেন। একটি চাকুরি যোগাড় করে দেয়ার বিনিময়ে—শুধু একটি রাত্রির জন্য।

সুরেশবাবুর চোখ বুজে আসে। এখানেই আবার হয়ত পাবেন মণিমালাকে। রহমানকে বিশ্বাস করে ওর মারফতেই খবর পাঠাতে হবে। চোখে তন্দ্রা নেমে আসে। বাইরে পাখীদের কলরব বাড়তে থাকে।

অনেকটা সময় কেটে গিয়েছে। আধ-ভেজান দরজার ফাঁক দিয়ে পড়ন্ত রোদ এসে ঘরে ঢুকেছে। সুরেশবাবু কতক্ষণ ঘুমিয়েছেন বুঝতে পারেন নি। ঘুম ভেঙেছে কিন্তু তন্দ্রা কাটছে না। চোখ বুজেই শুনতে পেলেন, রহমান কাকে চেঁচিয়ে বলছে, এ্যাঁ এরেস্ট করিয়ে দিলে ?

তন্দ্রা ছুটে গেল। সুরেশবাবু উঠে দাঁড়ালেন। এরেস্ট ? না : হয়ত তা নয় !

রহমান ?

রহমান ছুটে এসে বলল—বাবু আপনি কী সর্বনাশই না করলেন ! এসে দেখুন !

সুরেশবাবু বাইরে এসে বলেন, কেন ? কি হল রহমান ?

রহমান বলল, ওই দেখুন বাবু, ওদের বিচারসভা বসেছে।

কাদের ?

কাকদের।

সুরেশবাবু অবাক হয়ে দেখতে লাগলেন। ঝাঁকে ঝাঁকে কাকেরা সব চারদিকে ছড়িয়ে বসে রয়েছে। কতকগুলো কাক ডাকবাংলোর বারান্দায় রহমানের মতিগতি পরীক্ষা করছে। এক ঝাঁক কাক চারদিকে গোল হয়ে বসেছে গাছের তলায়।

রহমান বলছে, ওই দেখুন স্যার, কাকদের পঞ্চায়েৎ বসেছে। যে অন্যায় করে, তার বিচারের জন্যে সভা বসে। দরজা বন্ধ রেখে যাকে আমি লুকিয়ে

রেখেছিলাম—তাকে আপনি দরজা খুলে এরেস্ট করিয়ে দিলেন। ওকে ওরা বন্দী করেছে এখন সবাই মিলে ওকে মেরে ফেলবে।

কথাটি বলেই রহমান ছুটে যায় বন্দী কাকটিকে রক্ষে করবার জন্যে।

শান্ত, স্থির, অচঞ্চল জলের মধ্যে ঢিল পড়ল। অসংখ্য কাকের ঢেউ ছড়িয়ে গেল ডাক বাংলোর সামনের আকাশটুকুতে। একদল কাক ছুটে এসে পড়ল বন্দীর ওপর। বন্দী কাকটি দাপাদাপি করতে লাগল। জীবনটি নিস্পন্দ হতে আর কয়েকটি মুহূর্তমাত্র সময় লাগল।

রহমান স্তব্ধ হয়ে গাছের তলায় দাঁড়িয়ে, পায়ের কাছে কাকটি তখন একটু একটু নড়ে উঠছে। বায়সের দল চারদিকে ছুটে চলে যাচ্ছে। সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসছে ধীরে ধীরে। রহমান ফিরে এসে সুরেশবাবুর সামনে দাঁড়াল, আমার দোস্ত গেল।

তোমার দোস্ত! কিন্তু, অবাক ব্যাপার!

অবাক নয় স্যার, দুনিয়ায় পালাবার পথ নেই। সবারই সমাজ আছে, ন্যায়-অন্যায় আছে।

তুমি যে বড় দার্শনিক হয়ে দাঁড়ালে হে?

রহমান ক্ষুব্ধ হয়েছিল। তাই বলতে ছাড়ল না একটুও।—দেখুন স্যার পালিয়ে বাঁচবার পথ নেই। ধরা পড়তেই হল।

সত্য কথাটি সুরেশবাবু রহমানের মুখে শুনতে চান নি। একটা মৌন অভিসন্ধি কীটের মতো নাড়া দিচ্ছে রহমানের মনটিতে। সুরেশবাবু জিজ্ঞেস করেন, কাকের মৃত্যুতে রেগে গিয়েছ? আমি জানতুম না ও তোমার দোস্ত। কিন্তু তা বলে আমাকে ওদের পঞ্চায়েৎ, ন্যায়-অন্যায়, পলায়ন—এসব কথা শোনাচ্ছ কেন? কাক, মুর্গীর কথা ছেড়ে দিয়ে এবারে মানুষের কথা বলো। মণিমালার খবর এনেছ নিশ্চয়ই।

রহমান চোখ দুটো উজ্জ্বল করে তাকায়। লোকটি যেন বুঝতে পারে মনের ভেতরকার কথা, যেন বুঝতে পারে কে কোথায় কি করছে। রহমান বললে, মা কি করে জানব? আপনার ফরমাশ তো পাই নি। ওখানে যাবার এখতিয়ারও নেই আমার।

সুরেশবাবু হাসতে থাকেন। হেসেই বুঝিয়ে দেন রহমান মিথ্যে কথা বলেছে। সে ওখানে গিয়েছে, মণিমালার খবর নিয়েছে এবং সে জানে।

রহমান কোমর থেকে একতাড়া নোট বের করে দেয় সুরেশবাবুর হাতে। সুরেশবাবু কয়েকটি নোট ফিরিয়ে দেন রহমানের হাতে।—টাকা সংগ্রহ

করতে গিয়েছিলে সত্যি? ভালই করেছ রহমান, কিন্তু তুমি ওখানেও যে গিয়েছিলে, আমি বুঝতে পারি।

রহমান বলল—বসুন, চা খেয়ে নিন।

চা নিয়ে এল রহমান। সন্ধ্যা নেমে এসেছে। সুরেশবাবু আর বাইরে বেরুতে চান না। রহমান বললে, আচ্ছা আমি আপনার বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি স্যার। আমি মণিমালাকে আপনার কথা বলে আসব।

কি বলবে?

কি বলতে হবে আমি জানি স্যার। যে আপনার সঙ্গে রাত কাটিয়েছে—সে আপনার ডাক শুনলে না এসে পারবে?

রহমান চলে যায়। সুরেশবাবু বুঝতে পারেন—সে আকাশের চাঁদ হাতে পাবে না, শুধু সুরেশবাবুকে ধরিয়ে দিয়ে আশা চরিতার্থ করবে। সুরেশবাবুকে আফিম বা অন্যান্য নিষিদ্ধ জিনিস আমদানীর জন্যে ধরাতে যাবে না। মণিমালাসহ ধরিয়ে দেবার চেষ্টাও করতে পারে।

সুরেশবাবু নোটগুলো খুলে একবার পরীক্ষা করেন—তাতে নানারকমের সহি ও চিহ্ন।

রহমান বেরিয়ে গিয়েছে। অনেক করে উত্তরবঙ্গের একটি ক্যাম্প থেকে মেয়েটিকে এখানে নিয়ে এসেছিলেন। ডাক্তারের হাতে দিয়েছিলেন। রহমান এসব বুঝতে পেরেছিল। কিন্তু এখন সুরেশবাবুকে সে আর বরদাস্ত করবে না। প্রথমে সুরেশবাবুর হাতের মুঠো থেকে আফিম আর নিষিদ্ধ জিনিস বিক্রয় বিপজ্জনক। অথচ সুরেশবাবুকে ধরিয়ে দিলে, রহমান ছাড়া পাবে না। কাজেই একমাত্র পন্থা, মেয়েমানুষ সহ ধরিয়ে দেয়া।

সুরেশবাবু অকস্মাৎ বেরিয়ে যান গাছটির তলায়—যেখানে কাকেরা বিচার সভা বসিয়েছিল। মৃত পলাতক কাকটা তখনো ডানা ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে নিস্পন্দ। কয়েকটা কাক সুরেশবাবুর মাথার ওপরে এসে চিৎকার করছে।

জীবনের বহুদিন কেটেছে পলায়নবৃত্তিতে শহর থেকে শহরে, নতুন গোপন ব্যবসা ওঁকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে। কিন্তু পলাতক কাকের মৃত্যু জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতা। সুরেশবাবুর চক্ষু চারদিকে রহমানকে খোঁজে।

সুরেশবাবু রিক্সা ডেকে নিয়ে বেরিয়ে আসেন জিনিস পত্র নিয়ে। ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সময় একদল কাক চিৎকার করতে করতে তাঁর পেছনে পেছনে ছোটে।

সুরেশবাবু এরেস্টেড হয়ে যান। সে মোকদ্দমার উকীল হিসেবে আমি সে কেস কণ্ডাক্ট করেছি। রহমান ওর বিরুদ্ধে সাক্ষী।

বিনীতা জিজ্ঞেস করে, তারপর?

কেস জিততে পারেনি। সুরেশবাবুর জেল হয়ে গেল।

রহমান?

রহমান কোর্টে বলল, চোখের ওপর যে সব কদর্য্য ব্যাপার দেখেছে সেই সব! তারপর কাকের ব্যবহার থেকে ওর মনে শিক্ষা হয়ে গিয়েছে যে অন্যায়ের ব্যবস্থা হওয়া দরকার।

এরপর সুরেশবাবুর অবস্থা কি হ'ল?

সেই কথাই বলতে এসেছি।

সমীর বলল, বলুন।

এখন হাইকোর্ট করব।

তা বেশ করুন।

এডভোকেট বলেন, জজের রায় থেকে বুঝতে পেরেছি, ইনি কাকের চরিত্রের গুণে খুশি হয়েছেন, এবং কাক যে মানব চরিত্রে পরিবর্তন নিয়ে আসতে পারে সে কথাও উল্লেখ করেছেন। এমনি করে রহমান রক্ষা পেয়েছে।

ডক্টর সমীর দাস বলল, হ্যাঁ কাক পক্ষীর মধ্যে ভালবাসা, প্রতিহিংসা-পরায়ণতা, পঞ্চায়েৎ, বিচারস্পৃহা সবই ঠিক। কিন্তু মানুষের চরিত্রের সঙ্গে সম্পর্ক কি আমি বুঝতে পারি নি। আর এই কেস-এ আপনার কাকচরিত্র সম্বন্ধে জানবার দরকার কি, বুঝতে পারছি না।

এবার মনি চট্টোপাধ্যায় বললে, তাহলে শুনুন। সুরেশবাবুকে সরকার দোষী সাব্যস্ত করতে পারেন নি। সুরেশবাবু ও রহমান—দুজনের ওপরই সরকারের এখন কড়া নজর। সুরেশবাবুর এখনকার ভাবনা শুধু, যে কাকেরও প্রিয়জন আছে। কিন্তু জীবনের এই অবস্থায় তাঁর প্রিয়জন কি তাঁকে স্বীকার করে নেবে না? প্রশ্নটি জিজ্ঞেস করে সুরেশবাবু আমাকে একটি পত্র দিয়েছেন। এই সেই পত্র—এই নিন। সুরেশবাবুর প্রকৃত নাম—"অমরচন্দ্র দাস।"

এক মুহূর্তে এডভোকেট মণি চট্টোপাধ্যায় উঠে বেরিয়ে উধাও হয়ে গেলেন।

দরজাটা দুম করে সজোরে বন্ধ করে রেখে গেলেন।

ডক্টর সমীর দাস বিবর্ণ স্তম্ভিত ও বিপর্যস্ত হয়ে চুপ করে বসে রইল। বিনীতা জিজ্ঞেস করল, অমরচন্দ্র দাস কে?

সমীর চিৎকার করে বলে, ও নাম উচ্চারণ করো না—আমার দাদা, আমার আপন ভাই। না—না আমার কেউ নয়।

বিনীতা উঠে দাঁড়িয়ে দরজাটা ছিটকিনি আটকে রেখে এসে এনভেলপটা খুলে ফেলল, একতাড়া নোট—হাজার ও একশত টাকার বেশ অনেকগুলো নোট। বেশ চকচকে নোট, কোন নাম সইও নেই। কালি বা হাতের লেখার চিহ্নমাত্র নেই তাতে। সঙ্গে একটি চিরকুট—"তোমাদের জন্যে।" তলায় একটি সূক্ষ্মহাতে লেখা ঠিকানা।

সমীর উত্তেজিত হয়ে উঠে বলে, দাও! সব পুড়িয়ে দিতে হবে। দাও—

বিনীতা বলল, না—না—কক্ষনো না।

দাও—আমি ওকে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দেব।

বিনীতা বলল, কক্ষনো নয়। এই এনভেলাপ আমি তোমাকে দেব না।

বাইরে সমীর আবার দরজা ঠুক্ ঠুক্ ঠুক্!

চিৎকার করে সমীর বলে, দরজা খুলবে না।

বিনীতা বলল, না, দাদা নিশ্চয় ফিরে এসেছেন, খুলে দেব।

তর্ক-বিতর্কের মধ্যে ঠুক্ ঠুক্ শব্দ বাড়তে থাকে। বিনীতা ছুটে গিয়ে দরজা খুলে দেয়—আসুন। ডক্টর সমীর একটা ভীষণ আক্রমণের জন্যে তৈরি হয়।

দুজন পুলিশের লোক প্রবেশ করে। ডক্টর দাস আপনি?

হ্যাঁ। কেন?

এখানে মণি চট্টোপাধ্যায় এসেছিল?

বিনীতা বলেন, না তো!

স্তম্ভিত সমীর বলে, না না। এখানে নয়।

পুলিশের লোক দুজন পরস্পরের দিকে চেয়ে বললে, কিন্তু মণি চট্টোপাধ্যায় এদিকেই এসেছিল। কিছুক্ষণ নীরবতার পরে আসতে পারে। আপনারা সাবধান থাকবেন। ইনি বহুনামেই পরিচিত—যথা সুরেশবাবু, মণি চট্টোপাধ্যায়, অমরচন্দ্র—আরও অনেক। ইনি একজন—

সমীর দাস বলতে থাকে, না না এমন কেউ এখানে আসতে পারে না। এটা একজন অধ্যাপকের বাড়ী, দাগী আসামী এমনকি পলাতক কারও এখানে আসতে পারে না—আপনারা যেতে পারেন।

পুলিশের লোক দুজন অবাক হয়ে বেরিয়ে যায়।

রেইনার মারিয়া রিলকে * হে ঈশ্বর প্রতিবেশী

হে আমার প্রতিবেশী ঈশ্বর, রাত্রিতে যদি বা কভু
তোমায় জাগিয়ে দিই সজোরে ঘা মেরে, সে একই
কারণে শুধু, শুনিনি তোমার কোনো নিঃশ্বাসের ধ্বনি ;
জানি আমি, তুমি আছ একা।
আর তুমি যদি কখনো পানীয় চাও, কেউ কাছে নেই যে
তোমায় তা' দিয়ে আসবে ; তাই কেবলি অন্ধকারে হাতড়ানো।
সর্বদাই আমি তাই কান পেতে রাখি, ছোট্ট করে ইঙ্গিত দিয়ে যাই—
আমি আছি অত্যন্ত কাছেই।

আমাদের মাঝখানে একটি মাত্র ছোট দেয়াল,
এবং তাও হঠাৎ গড়ে ওঠা দেয়াল, কারণ
ঠোঁট খুলে তুমি বা আমি একটি মাত্র ডাক দিলেই
তা' ভেঙ্গে পড়বে,
এবং ভেঙ্গে পড়বে একটুও শব্দ না করে।

সে দেয়াল তোমারই নানা ছবি দিয়ে গড়া।

তারই অন্তরালে তুমি যেন আচ্ছাদিত নামের বেড়ায়,
এবং আলোর শিখা দীপ্ত যেই আমার ভেতর
সে প্রভায় সমুজ্জ্বল প্রান্তসীমা যত সে ছবির ;
আত্মার গভীরে আমি জেনে নিই তখন তোমায়।

আর সে থেকেই ইন্দ্রিয় সব, শীঘ্র যারা পঙ্গু হয়ে পড়ে,
তোমা থেকে নির্বাসিত, কক্ষচ্যুত পথে বিচরণ।

অনুবাদ : দক্ষিণারঞ্জন বসু

জর্জ সেফেরিস * প্রান্তরে

প্রান্তরের সামনেই আমি ছিলাম দাঁড়িয়ে।
বিস্তৃত সেই সমতলভূমিতে পড়ছিলো আমার চোখে
কতগুলি ব্যস্ত দেহ—
ওরা মাটি কাটছিলো সবল হাতে।
আকাশের মাঝে মাঝে মেঘের রঙীন বৃত্ত,
গোলাপের রঙীন পাপড়ি ছোঁয়ানো গোধূলি।
মাঠের গুচ্ছ-গুচ্ছ ঘাস আর ঝোপের ওপর দিয়ে
একঝলক ঠাণ্ডা বাতাস ব'য়ে গেল :
পাহাড়ের গায়ে হয়ত বৃষ্টি নামছে,
তারই পূর্বাভাস।

ওরা কাজ করছিল মাঠে ;
আমি সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম—
খুঁড়ে খুঁড়ে মাটির বুক থেকে ওরা টেনে তুলছে
এক প্রাচীন নগরীর অবশেষ।
ভাঙ্গা দেয়াল, চাপাপড়া রাস্তা—
আর বিজন ঘরগুলির খণ্ড খণ্ড ছবি—
যেন এক অতিকায় দানবের প্রস্তরিভূত পেশীপুঞ্জ।
এক প্রত্নতাত্ত্বিকের চোখের সামনে উদ্‌ঘাটিত অতীত
শল্যবিদ্ ডাক্তারের হাতে তার দেহ-রহস্য
স্তব্ধতার আবরণকে উন্মুক্ত করেছে।
জেগে উঠছে এক কবরখানার নগ্ন ছবি।

আমি দেখছিলাম সেই ব্যস্ত মানুষগুলিকে—
শ্রমের স্বেদ জমেছে তাদের কপালে।
দ্রুত ওঠানামা করছে তাদের হাতগুলো ;
সেই ধ্বংসস্তূপের আবর্জনা সরিয়ে
এগিয়ে চলেছে সময়।

চমকে উঠলাম—হঠাৎ !
জানি না তখনও পথ চলছিলাম কি না ;
আমি একঝাঁক পাখির দিকে তাকালাম,
আকাশের গায়ে গায়ে পাথরে গড়া ছবি,—
আমি সেই উজ্জ্বল আকাশের দিকে চাইলাম।
এক নির্বাক বিস্ময়ের স্বর বেজে উঠলো বাতাসে ;
সেই শ্রমিক মেয়েপুরুষের দল যেন
স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলো।
আমি দেখলাম—তাদের মাঝখান দিয়ে
একটি জ্যোতিপুঞ্জের আঁকা মুখ।
গুচ্ছ-গুচ্ছ কালো চুলের ঢেউ তার পিঠে।
চোখের ভুরুতে এক উড়ন্ত বুলবুলির ডানা
দু'টি সযত্নে টানা ঠোঁটের ওপরে
স্ফুরিত নাসারন্ধ্র।
তার নগ্ন বক্ষের তরঙ্গিত ছন্দে কোনো চাঞ্চল্য নেই ;
পরিপূর্ণ নিরাবরণ দেহে
সেই জনতার উর্ধ্বে সে উঠে দাঁড়ালো।

আমার দৃষ্টি গিয়ে পড়ে চারধারে :
যেখানে মেয়েরা কাজ করছে—অথচ
একটুও নড়ছে না তাদের হাত।
যে জল তুলছে তার হাতের দড়ি বালতিতে
স্পন্দন নেই।
মাঠে মুখ নামিয়েছে গরু—তার জিভ্ যেন
আটকে আছে পাথরের মত।
রাখাল ছেলেটার হাতের লাঠি আকাশের দিকেই তোলা।
একটা পটে আঁকা ছবির মত স্থির নিশ্চুপ পৃথিবী।
আবার আমি তাকালাম সেই নগ্ন বালিকাদেহের !
মনে হ'লো, সমস্ত পৃথিবীর আস্ফালনকে
উপেক্ষা করে সে দাঁড়িয়ে আছে।

তার কটিদেশের জ্যোতিতে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে আকাশ
আমার মনে হ'লো এই আকাশই ত' তার জন্মদাত্রী।
মায়ের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লো জানকী মেয়ে;
অদৃশ্য হ'লো তার সাদা পাথরের মত মসৃণ দু'টি পা।
মিলিয়ে গেল একটা স্বপ্ন।
ফিরে এল আবার সেই সহজ ও সাধারণ
চিরকালের জানা পৃথিবী।

স্মৃতির ঘোলাটে পথ বেয়ে
মিষ্টি একটা গন্ধের রেশ শুধু পেলাম।
পাতার গুচ্ছের ফাঁকে তার অনাবৃত বক্ষ—
আর মুখের আর্দ্রতা
বাতাসের মধ্যে মিলিয়ে গেছে।
দূরবিস্তৃত প্রান্তর আর পাহাড়ের বিজনতায়
মিশে গিয়েছে বিদ্যুতের লেখায় আঁকা স্মৃতি।
বিরল ঘাস আর কাঁটাবনের ঝোপে
নগ্ন প্রান্তরের রেখা,—
এক নাগিনীর দেহ যেন পলকে মিলিয়ে গেল
অথচ অনেক অনেক সময় ধরে তার অস্তিত্বের অনুভূতি
ঘিরে রইলো মাঠের সেই প্রায় বিজন শূন্যতাকে।

অনুবাদ: সংস্তাষ অধিকারী

এ ম্যাগনুসন (আইসল্যাণ্ড) * দর্পণ

আমরা কি খুব পবিত্র ?
তুমি প্রশ্ন করলে—
তখন আমরা দর্পণে তাকালাম
ভালোবাসা প্রতিফলিত
স্পষ্ট নগ্নরূপে।
নগ্নতা আর প্রেম
দিন আর উজ্জ্বলতা
রাত আর অন্ধকার।

আমাদের নগ্নতার দিকে চোখ ফেরাই
আয়নায় উত্তর পাওয়া যায়
হ্যাঁ !
আমার দিকে তুমি ফিরে তাকালে—
তোমার চোখে ভাসছে ত' সেই দর্পণের জবাব।

অনুবাদ : প্রদীপ মুখোপাধ্যায়

জোহান জ্যালমারসন (আইসল্যাণ্ড) * অপরূপ মাছেরা

অপরূপ মাছগুলো
সাঁতার দিত লাল সমুদ্রে,
কালো এবং হলুদ ছিল তাদের রঙ
চুপি চুপি কথা বলতো তারা
অস্পষ্ট স্বরে।

একটি মেয়ে বাস করতো সেই সমুদ্রের ধারে,
আমায় সে বললো এক প্রত্যুষে
তাদের কথা, আর আমরা
তাদের সাথে
রাতের পর রাত
একা একা খেলা করে গেলাম।

অনুবাদ : প্রদীপ মুখোপাধ্যায়

ড. এইচ. লরেন্স * ভালবাসার প্রয়াস

মানুষকে ভালবাসতে
আমি রিক্ত
এবং ব্যর্থ।

স্থির করেছি
আর ভালবাসা নয়,
ভালবাসতে আর যাবনা কাউকে
আর মিথ্যাশ্রয়ী হবো না,
—এই স্থিরধার্য।

এখানে সেখানে যদি কোনো মানুষ থাকে,
অথবা কোনো নারী,
যাকে আমার ভাল লাগে
সেই আমার যথেষ্ট।

এবং যদি যাদু মন্ত্রে কোনো এক আশ্চর্য নারী
হঠাৎ এসে পড়ে।
যে আমার হৃদয়ের শুক্তিকে নাড়া দিয়ে যাবে,
সেই নারী, আর আমার হৃদয়ের—
মাতাল শুক্তিকে নিয়ে মেতে উঠব ;
সব উত্তেজনা—
মিলাবে না যতকাল
কথায় কথায়।

অনুবাদ : জয়দেব চট্টোপাধ্যায়

ই ই কামিংস * পূর্বাশা

ডেকেছি তোমায়—
হাসিতে উচ্ছল, কিন্তু তুমি তার
দিলে না উত্তর।
তোমার মুখের রঙ
সুর ছোঁয়া রক্তিম আবেগ
এসো এইখানে
অয়ি মনোরমে !
জীবন কি হাসিমাখা নয় ?

ডেকেছি তোমারে—
গানে গানে, সুরে সুরে ;
সে গান তুমি ত' হায়
নিলে না কানে।
তোমার চোখের চাওয়া
কি মাধুরী ভরা
এসো এইখানে
অয়ি অবন্ধনে !
জীবন কি গানে ভরা নয় ?

ডেকেছি তোমায়—
আত্মার আত্মীয় তুমি
তবু তুমি চমৎকৃত নও।
তোমার মুখের ছায়া
ভরা সুষমায়
এসো এইখানে
অয়ি প্রিয়তমে !
জীবন কি প্রেমে ভরা নয় ?

খুঁজেছি তোমারে—
হাতে নিয়ে বাঁকা তলোয়ার
তবুও নীরব কেন ?
বুকে যেন মৃতের কবর
নরম ফুলের মত
সৌরভ মাখানো।
এসো এইখানে
অয়ি পলাতকা !
প্রেম তবে নয় কি মরণ ?

অনুবাদ : অনিলকুমার ভট্টাচার্য

রবার্ট ফ্রস্ট * বনপথে যেতে

বনপথে যেতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়েছি,
দেখছি কেমন বনভূমি ঢাকে বরফে—
মনে মনে ভাবি মালিক আমার চেনা
পল্লীপ্রান্তে নিভৃত কুটিরে বাস।
এভাবে এমন দেখাটা আমার
চোখে নাহি তার পড়বে।

ঘোড়া ভাবে মনে মজা ত' মন্দ নয়,
সামনে কোথাও নেইক খামার বাড়ি,
এ পারেতে বন ওদিকেতে হ্রদ
বরফে রয়েছে ঢাকা।
একি এ কাণ্ড! সারাবছরের মলিনতম এ সাঁঝে?

গলাটা ঈষৎ নাড়িয়ে বাজায় ঘণ্টা,
ভুল হ'ল কিনা চাইছে সে কথা জানাতে
আর শোনা যায় শনশনে ঝড়ো হাওয়া
এদিকে তুষার টুপটাপ্ করে ঝরছে।

গহীন গভীর বনটি চমৎকার
নিবিড় আঁধারে ভরা
সময় ত' নেই হায়, কথা দেওয়া আছে আগে
অনেকটা পথ এখনো যে আছে বাকী
ঘুমিয়ে পড়ার আগে
অনেকটা দূর এখন যে যেতে হবে
ঘুমিয়ে পড়ার আগে।

অনুবাদ : ভবানী মুখোপাধ্যায়

মনোজিৎ বসু
(৭)

উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত

বাংলার লোকসঙ্গীতের ক্ষেত্রে উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীতের স্থান যেমন বিশিষ্ট, তেমনি তার রূপও বৈচিত্র্যময়। উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত বলতে আমরা প্রধানতঃ বুঝি রংপুর-কোচবিহার অঞ্চলের গান; যদিও দার্জিলিঙ, জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর, মালদহ, রাজশাহী ও পাবনা অঞ্চলে প্রচলিত লোকসঙ্গীতগুলি তারই অন্তর্ভুক্ত। রংপুর-কোচবিহার পাশাপাশি দুই জেলা—একটা পূর্ব-পাকিস্তানের, অন্যটা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের। এই দুই জেলার লৌকিক ভাষা যেমন এক, সংস্কৃতিও প্রায় তেমনি। ফলে, লোকসঙ্গীতের ধারাটাও একই খাতে প্রবাহিত হয়ে চলেছে বহু যুগে ধ'রে। রংপুর-কোচবিহার অঞ্চলের সেই সব গান শুধু যে ঐ দুই জেলাতেই সীমাবদ্ধ থেকেছে তা নয়, ছড়িয়ে পড়েছে পার্শ্ববর্তী অন্যান্য অঞ্চলে—বিশেষ ক'রে জলপাইগুড়ি ও দিনাজপুরে। উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীতকে কয়েকটি বিশেষ ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন—সমাজজীবনের গান, ব্যক্তিজীবনের গান, পৌরাণিক বিষয় সংক্রান্ত পালাগান।

সমাজজীবনের গানে আছে সামাজিক সুবিধা-অসুবিধার কথা, চাষ বাস ও লৌকিক আচার-আচরণের কথা, সমসাময়িক ঘটনাবলীর কথা। পাল-পার্বণ বিষয়ক গানগুলিকেও আমরা এই সমাজজীবনের গানের অন্তর্ভুক্ত করতে পারি। এই সমাজজীবনের গানেই পাই 'বারমাস্যা'-র রূপ। যেমন—

"জ্যৈষ্ঠ মাসের মিষ্টি ফল
আষাঢ় মাসের নয়া জল রে।
ওরে শাওন মাস গেল কন্যার
উঠিতে বসিতে রে।
পাষাণ বাইন্ধাছ পতি মনোতে॥
ভাদ্র মাস বর্ষার শেষ
আশ্বিন মাসে আউল্যা ক্যাশ রে।
ওরি কাতি মাস গেল কন্যার
শয়নে স্বপনে রে।
পাষাণ বাইন্ধাছ পাত মনোতে॥
অগ্রাণ মাসে হেমতি ধান
পৌষে নারীর শীতের বান রে
ওরে মাঘ মাস গেল কন্যার
কাঁপিতে কাঁপিতে রে।
পাষাণ বাইন্ধাছ পতি মনোতে॥
ফাগুন মাসে অধিক জ্বালা
চৈতে নারীর বদন কালা রে।
ওরে বৈশাখ মাস গেল কন্যার
ভাবিতে ভাবিতে রে।
পাষাণ বাইন্ধাছ পতি মনোতে॥"

গানের ধুয়া—'পাষাণ বাইন্ধাছ পতি মনোতে।' অর্থাৎ, বারমাস ধরে এই যে সময় বয়ে চলেছে, তবু তোমার হুঁশ নেই, মনটাকে তুমি কী পাষাণ ক'রে রেখেছ? —এই প্রশ্ন কোন একক স্ত্রীর নয়, সমগ্র স্ত্রী-সমাজেরই প্রশ্ন। বাড়িতে বিয়ের বয়সী মেয়ে, অথচ স্বামীর সেদিকে হুঁশ নেই।—এ-আক্ষেপ যে-কোনো জননীর আপেক্ষ। কারণ, মাসের পর মাস পার হয়ে যাচ্ছে, মেয়ের বর জোগাড় হচ্ছে না—মুখ কালো ক'রে মেয়ে সংসারের কাজকর্ম ক'রে যাচ্ছে, সেদিকে বাপের কোনো দৃষ্টি না থাকলেও, মায়ের দৃষ্টি বড় সজাগ। জ্যৈষ্ঠ মাসে মেয়ে হয়তো সঙ্গীসাথীদের সঙ্গে আম-জাম কুড়িয়ে খাচ্ছে, আষাঢ় মাসের নতুন জলে উল্লসিত হয়ে নদী-পুকুরে সাঁতার কাটছে, কিন্তু শ্রাবণ-ভাদ্রের অবিশ্রান্ত বর্ষায়

সে ঘরে বন্দী। আশ্বিন-কার্তিক মাসও যায় নানা বিশৃঙ্খলায়, কিংবা অলস-মধুর স্বপ্নে। অগ্রাণ মাসে ধান পাকে, মাঠে-মাঠে সোনালী-ধানের হাসি দেখে মেয়ে হয়তো ভবিষ্যতের রঙীন আশায় উল্লসিত হয়ে ওঠে। কারণ, এ-সময় বাপের হাতে টাকা আসে, হয়তো বা তিনি এবার মেয়ের বিয়ের জন্য তোড়-জোড় করবেন। কিন্তু পার হয়ে যায় অগ্রাণ মাস—আসে পৌষ-মাঘের হাড়-কাঁপানো শীত। উপযুক্ত গাত্রাবরণের অভাবে যুবতী কন্যার দিন কেটে যায় কাঁপতে কাঁপতে। মলিন মুখে সে ঘুরে বেড়ায়, মায়ের মন বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। বিয়েটা হয়ে গেলে আর মেয়ের এই দুঃখ দেখতে হ'ত না, স্বামীর ঘরে গিয়ে সে নিশ্চয়ই শীতবস্ত্র পেত, না-পেলেও বরের বুকের যে-উত্তাপ পেত, সে-উত্তাপে সে ভুলে যেত প্রাকৃতিক শৈত্যের কথা। কিন্তু, তা আর হয় না। শীত পেরিয়ে আসে বসন্ত। সে-সময় গাছে গাছে ফুল ফুটে, থেকে থেকে কোকিলের কুহু শোনা যায়—যত জ্বালা তো ঐখানেই। বিবাহযোগ্যা কন্যার মুখের দিকে কোন্ ভরসায় তাকাবেন মা? তবু আশা রাখেন, বৈশাখ মাসে মেয়ের হয়তো বিয়ের একটা ব্যবস্থা হবে। কিন্তু, গৃহকর্তার সেদিকে কোনো চাড়ই নেই। এক কান দিয়ে কথা শোনেন, অন্য কান দিয়ে তা বেরিয়ে যায়। মনের গলায় পাথর বেঁধে তিনি ব'সে আছেন! ওদিকে কন্যার দিন কেটে যায় —'ভাবিতে ভাবিতে রে!'

উপরে উদ্ধৃত গানটি যেমন প্রাচীন রীতির গান, তেমনি অতি আধুনিক ধারার গানেও সমাজজীবনের পরিচয় মেলে। ছেলেবেলায় একসঙ্গে খেলা করেছে, একই পাঠশালায় পড়েছে কোনো এক ছেলে আর কোনো এক মেয়ে। দু'জনের মধ্যে ভারি ভাব। তারপর বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে, ছেলে গেছে ছেলেদের স্কুলে, মেয়ে গেছে কোনো বালিকা বিদ্যালয়ে। ম্যাট্রিক পর্যন্ত পড়ল মেয়েটি, কিন্তু পাস করতে পারলে না। বাপ-মা বললেন—ঢের হয়েছে, আর যেতে হবে না স্কুলে, বয়স হয়েছে এবার পাড়া-বেড়ানোও বন্ধ কর। ফলে, ঘরের কোণেই দিন কাটে মেয়েটির নানা কথা ভাবতে ভাবতে। বিশেষ ক'রে সেই বন্ধুটির কথা, তার প্রিয়তমের কথাই সে ভাবে শয়নে, স্বপনে, জাগরণে। ওদিকে সে-ছেলে স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে, কলেজে ঢুকল। ক্রমে বি-এ পাসও করলে সে। কিন্তু ছেলেবেলাকার সেই মেয়েটির কথা সে যেন ভুলেই গেল একেবারে। চিঠি পাঠিয়েও তার কোনো জবাব মেলে না। মেয়েটি তাই চোখের জলে বুক ভাসায়, কৈশোরের সেই প্রেমের কথা স্মরণ ক'রে যৌবনে যেন আরও অস্থির হয়ে ওঠে। ওদিকে সামাজিক ক্ষেত্রে তাদের দু'জনের সেই প্রেমের কথা

গেছে রাষ্ট্র হয়ে। এখন যদি সেই ছেলে এসে তাকে বিয়ে না করে তাহ'লে তো তার সেই কলঙ্ক আর ঘুচবে না। সামাজিক কলঙ্কের ভয়েই সে যেন আরও অস্থির হয়ে তার সেই প্রিয়তমকে স্মরণ করে।

"বন্ধুধন, তুমি আমি শিশুকালে
খেলা খেলেচি এক সাথে
ইস্কুল পড়েচি দিনহাটার বন্দরে।
কতু-পরীক্ষায় পাস করিয়া
মেট্রিক পরীক্ষাৎ ফ্যাল করিয়া
ইস্কুল ছাড়লাম মনের দুঃখেতে॥
বাপো-মায়ের মন হইল ব্যাজার
মোক্ ইস্কুল যাবার না দে আর
আরও না দে মোক্ বাড়ির বাহির হ'তে।
বন্ধুধন, না দেখিয়া তোমার মুখ,
ভাঙ্গে মোর নারীর বুক
মন কান্দে মোর তোমার বাদে॥
তোমরা ইস্কুল ছাড়ি' কলেজ গেইলেন
চলিয়া গেলেন দিনহাটা ছাড়িয়া।
বন্ধুধন, সদায় সদায় চিঠি পাঠাং
তেওঁ বন্ধু তোর খবর না পাং
মোক্ ভুলিলেন বি-এ পাস করিয়া॥
তোমরা করলেন বি-এ পাস,
মোর করলেন সর্বনাশ,
পীরিত্ করি' ছাড়িয়া গেইলেন মোরে।
বিয়াও যদি না করেন মোকে
সত্য নষ্ট কইলেন ক্যানে?
কলঙ্ক রইল জগতের মাঝারে॥"

সামাজিক-সমস্যা বিষয়ক এ-জাতীয় গানের সংখ্যা অবশ্য খুব বেশি নয়। বেশী গান ব্যক্তিজীবনের সুখ-দুঃখ, মিলন-বিরহের কথা নিয়েই রচিত। সেই সব গানে জনপদ-কবিদের কবিত্বশক্তিরও যথেষ্ট পরিচয় মেলে।

অল্পবয়সী কোনো বিধবার মনের দুঃখ যেমন ফুটে উঠেছে একটি লোকগীতেতে—

"আহা রে!
ওরে বাবার দেশের ওরে হংসা,
তুই কাঁদিস ক্যানে রে বয়ড়ার গাছৎ পড়িয়া?
বাবার দেশের হংসা তুই
টিটুল বিধুয়া মুই রে।
ওরে বাবার দেশের ওরে হংসা॥

ওরে বাবার দেশের হংসা তুমরা
মুইও হনু স্বামীহারা রে।
ওরে বাবার দেশের হংসা তুমরা
মুইও হনু স্বামীহারা রে॥"

'চিটুল বিধুয়া' অর্থে অল্পবয়সী বিধবা। সে একদিন কোনো 'বয়ড়া' গাছের (কুলগাছের) উপর একটা হংসীকে প'ড়ে যেতে দেখল। দেখল, গাছের কাঁটায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে সে কাঁদছে। তার দুঃখে নিজের দুঃখের কথাও মনে প'ড়ে গেল তার। স্বামীহারা হয়ে শ্বশুরবাড়ির নানাজনের ব্যবহার-কণ্টকে ক্ষতবিক্ষত তার মন। স্বভাবতঃই সে তাই হংসীর দুঃখে সমব্যথী হয়ে উঠল। হঠাৎ সে যেন আবিষ্কার করল, ও-রকম হংসী তো কেবল তার বাপের বাড়ির দেশেই পাওয়া যায়। কাজেই, মনের সমবেদনা আরও যেন গাঢ় হয়ে উঠল। সেই সঙ্গে সে যেন একটা পথ খুঁজে পেল বাপের বাড়িতে খবর পাঠাবার। হংসী যখন দেশে ফিরে যাবে তখন যেন সে তার বাপকে গিয়ে তার দুঃখের কথাটা জানায়। এই অনুরোধ জানাতে সে বলে—

"হংসা হাত ধরন্ ত' রে
হংসা পাও ধরন্ ত' রে,
উড়া উড়া উড়া হংসা উড়া হও রে,
অকাশৎ পাওখা মেলি'
বাবার দেশে বলিয়া যাও রে—
ওরে বাবার দেশের ওরে হংসা,
মুই হনু স্বামীহারা রে॥"

ঘর-গেরস্তালির কাজে উদ্ব্যস্ত হয়ে বাড়ির গিন্নীর কী দশা হয় তার সুন্দর একটি চিত্র পাই উত্তরবঙ্গের একটি লোকগীতিতে। স্বামীকে উদ্দেশ করে স্ত্রী বলে—

"ওকি বাপরে বাপ, ওরি মাও রে মাও
না পাই মুঁই কামাই করিবার।
হাল বয়য়া আসিলু বাড়ি
ঝাপি মাথাৎ দিয়া।
অতি থো লাঙল যোঙাল
বারা বানেক আসিয়া।
ওকি বাপরে বাপ, ওরি মাও রে মাও
না পাই মুঁই কামাই করিবার॥"

(পাং=পাই; মুঁই=আমি)। তুমি তো (দিব্যি!) মাঠে লাঙল চ'ষে মাথায় টোকা প'রে বাড়ি ফিরলে (বয়য়া=বহিয়া; ঝাপি=চাষীর মাথার

টোকা, মাথাৎ=মাথায়)! ওখানে লাঙল-টাঙল রেখে এবার আবার সঙ্গে ধান ভানতে লেগে যাও (অতি=ঐখানো; থো=রাখো; বারা বানেক=ধান ভানো)। ওরে বাপরে বাপ, মারে মা, একটি দিনের জন্যও কাজ থেকে ছুটি নেবার জো কি আছে।

স্ত্রীর কথামতো স্বামী তখন সাংসারিক কাজে লেগে যায়। কিন্তু স্ত্রীর ফরমাশের অন্ত নেই। সে বলে—

"বারা বানিলু, ভালো করিলু,
খুদি চারটা খা।
কলসী দুইটা ভার সাজয়া
জল বুলিয়া যা।"

(বানিলু=ভান্‌লি। করিলু=করলি। খুদি=খুদ। সাজয়া=সাজাইয়া। জল বুলিয়া=জলের জন্য, অর্থাৎ জল আনতে)।

তাতেও নিস্তার নেই। বাসন মাজবার নির্দেশ দেয় স্ত্রী—

"জল আনিলু ভালে করিলু,
ঘরের কোণাৎ থো।
তিন দিনিয়া বাসিয়া ডোগা
ভাল্ করিয়া খো।"

(কোণাৎ=কোণে তিন দিনিয়া=তিন দিনের। বাসিয়া=বাসী। ডোগা=ডেক্‌চি জাতীয় পাত্রবিশেষ। ভাল=ভালো)।

ডেক্‌চি তো ধোওয়া হ'লো। এবারে রান্না করবার হুকুম—

"ডোগা ধুলু, ভালে করিলু,
তুই তো প্রাণের নাথ।
চট্ করিয়া চড়ায়া দে তুই
দুইটা মানুষের ভাত।"

ডেক্‌চি ধুয়েছ, বেশ করেছ। তুমি তো প্রাণনাথ আমার! (ভাবটা এই, সেইজন্যই তো বলতে সাহস করছি) এবার তাহ'লে চট্ ক'রে দুটো মানুষের ভাতটা চড়িয়ে দাও। আজ্ঞাবহ প্রাণনাথ তখন প্রাণের দায়ে না হোক, পেটের দায়ে ভাত রাঁধতে বসেন। ভাত খাওয়ার পর—

"ভাত রান্ধিলু, ভালে করিলু,
তুই যে প্রাণের পতি!
বিছনাখান পারেক এলা
ছাওয়া ধরিয়া শুতি।
ওকি পাপরে বাপ, ওকি মাও রে মাও
না পাং মুঁই কামাই করিবার।"

(পারেক=পেড়ে দাও। এলা=এখন। ছাওয়া=ছেলে।)

কৌতুকরসের আমেজে ভরপুর এই শ্রেণীর লোকসঙ্গীত উত্তরবঙ্গে বহুল প্রচলিত। বেশির ভাগ প্রেমসঙ্গীতই কৌতুক রসাশ্রিত। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আদিরসের প্রাবল্য ঘটলেও, শালীনতার সীমা ছাড়িয়ে যায় না। অবশ্য, ব্যতিক্রম যে নেই, তা নয়। তবে, ইদানীংকার গায়কেরা অশালীন শব্দগুলিকে সযত্নে পরিহার করবার চেষ্টাই করে।

রাধাকৃষ্ণের লীলাকাহিনীর প্রভাবও পড়েছে অনেক লোকসঙ্গীতে। উত্তরবঙ্গের জনৈক অজ্ঞাত কবির ভাষায়—

"কালা আর না বাজান্ বাঁশরী
সাধের ঘরে আর রইতে না পারি।
কালা রে!
ওরে তোর কালার ঐ বাঁশির সুরে
নারীর মন মোর না রয় ঘরে
ক্যান রে কালা বাজান বাঁশরী
সাঁজে সকালে।"

কিংবা,

"হামার গলার হারটা খোলেন
ওগো ললিংতে!
মুঁই কৃষ্ণনামে গাথিম মালা
বন্ধুর গলেতে।
হামার গলায় হারটা খোলেন,
কী ফল হবে সখি!
প্রাণবন্ধু নাই যে বগলে
ওগো ললিতে॥"

[হামার = আমার। গাথিম = গাঁথব। গলেতে = গলায়। বগলে = কাছে।]

উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীতে দেওর-বোদিও বিশেষ একটা স্থান পেয়েছে। বলা বাহুল্য, স্বাভাবিক কারণেই ঐ জাতীয় লোকসঙ্গীতে যেমন আছে কৌতুকরস তেমনি আছে কিছুটা আদিরসাত্মক ইঙ্গিত। সেই সঙ্গে গ্রামজীবনের অর্থ-নৈতিক দুর্দশার রূপটাও রয়েছে কিছুটা প্রচ্ছন্নভাবে। যেমন—

"মুখকোনো তোর ডিবো ডিবো,
ও ভাবী, গুয়া কোন্টে খালু?
গালাৎ হইল্ রুদ্রমালা
রুপা কোন্টে পালু?

ভাবী ও।
কাঞ্চা সোনার বন্ন তোমার,
মনৎ শতেক আশা।
কোন্ রসিয়ার বাদে তোমার
কদমতলে বাসা ?
ভাবী ও!''

অর্থাৎ, ও বৌদি! তোমার মুখটা দেখছি আরক্তিম। পান-সুপারী কোথায় খেলে? সাধারণ লোকের পক্ষে পান-সুপারীর জন্য অর্থ ব্যয় করা একটা রীতিমত বিলাসিতার ব্যাপার। কাজেই, দরিদ্র দেওরের কথায় বিস্ময়ের ভাব। (গালাৎ = গলায়। পাবু = পাবে। বন্ন = বর্ণ। বাদে = জন্য।)

উত্তরবঙ্গের লৌকিক পালাসঙ্গীতগুলি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পৌরাণিক কাহিনীভিত্তিক! তবে সর্বত্র পুরাণের বর্ণনা যে হুবহু অনুসরণ করা হয় না—তা বলাই বাহুল্য। কেন না সাধারণ লোকসমাজের কাছ থেকে তা আশাও করা যায় না। তারা যেমনটা শুনে আসছে, সেইরকম কাহিনী অবলম্বন ক'রে, কিছুটা কল্পনা মিশিয়ে পালাগান রচনা করে। পালাসঙ্গীতের ক্ষেত্রে ময়নামতী গোপীচাঁদের প্রাধান্য আজও স্বীকৃত।

এই সব পালাগানের গোড়ায় দেবদেবীর বন্দনা একটা আবশ্যিক ব্যাপার। এরীতি বোধকরি, বাংলাদেশের সকল আঞ্চলিক লোকসমাজেই প্রচলিত। নমুনাস্বরূপ—

'তিন দ্বারে পরিমাণ স্বর্গ দ্বারে হনুমান
সিংহদ্বারে সিংহ রক্ষা করে।
তাহাতে জাতেক তীথ শুন ভাগবত গীত
অক্ষয় বটের জনমকথা।
বৃক্ষরূপী ভগবান প্যাগলে যাহার থান
প্রলয়ে ভাসিল যার পাতা॥''

[জাতেক = যতেক, যত। তীথ = তীর্থ। থান = স্থান।]

সাধারণ লোকসমাজে বিবাহসঙ্গীতের একটা বিশেষ কদর আছে। বিহার, উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, রাজস্থান, গুজরাট প্রভৃতি সব রাজ্যেই তার প্রমাণ সুস্পষ্ট আধুনিক কালের বাংলাদেশের সাধারণ লোকসমাজে সে রীতি অনেকটা স্তিমিতই বলা চলে। কিন্তু, উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে সেকথা খাটে না। সেখানকার গ্রামীণ সমাজের কৃষক-শ্রমিক পরিবারে এখনও বৈবাহিক লোকসঙ্গীতের ধারাটা অব্যাহত। রংপুরজেলার লৌকিক বিবাহসঙ্গীতের নমুনা—

"যখোন তামাকুর মাথাৎ ফুল,
ঢেনা করে ফুলবুল;
বর করে যুক্তি,
কই না মিলি কুর্তি।
হাড়ির ঘর বাজায় ঢোল
তারো কন্যার গণ্ডগোল—
এও চাঁদে না হইল্ ঢেনার বিয়াও রে॥"

বিয়ে করতে হ'লে বরকে টাকা দিতে হয়। কাজেই টাকার জোগাড় করাটাই আসল কথা। রংপুরে তামাকচাষের প্রসিদ্ধি আছে। তামাক-চাষী যখন দেখে চারায় ফুল ধরেছে, তখন থেকেই বিয়ের জন্য তার মন চুলবুল করতে থাকে। সে বন্ধুজনের সঙ্গে পরামর্শ করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মনের মতো কনেই মেলে না। 'ঢেনা' অর্থাৎ অবিবাহিত পুরুষটি তখন ঢোল বাজিয়ে হাড়ি অর্থাৎ ঘটককে ডাকে। কিন্তু শেষকালে যখন কনে সম্পর্কে কিছু গোলমেলে কথা বেরিয়ে পড়ে, তখন বিয়ে যায় ভেঙে।

কনে যখন স্বামীর ঘর করতে যায় তখন কনের বাপ তাকে শ্বশুরালয়ের সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে বলে—

"ও সুন্দর ময়না ও,
চিনিয়া নে তোর দালান কোঠাবাড়ি রে!
তোর মায়ের মতন্ শাশুড়-কোনা পাছিস্,
তোর বাপের মতন্ শ্বশুর-কোনা পাছিস্,
তোর ভায়ের মতন্ দেওর-কোনা পাছিস্,
তোর বইনের মতন্ ননদ-কোনা পাছিস্।
ও সুন্দর ময়না ও!!"

বিবাহসঙ্গীতে রঙ্গরসিকতাও প্রচুর। যেমন, কনের মা সম্পর্কে বরের জবানীতে—

"কন্যার মায়ের গলা মোটা, মুঁই তো জানো না।
দশ ভরিয়া হাঁসলী দিনু—তাও তো আটে না॥

শাশুড়ীর গলা যে এত মোটা সেকথা তো জানতাম না আমি।

অথবা, ছড়াজাতীয় লৌকিক বিবাহসঙ্গীত—

"উলু উলু মান্দাবের ফুল,
কন্যার বাড়ি কত দূর॥
হাটিয়া ডাঙ্গা মধুপুর—
তাক্ ছাড়িয়া অনেক দূর॥
কন্যা আলু ঘামিয়া,
ছাতি ধরে'া টানিয়া,
ছাতির উপর গামছা—
'ভন বইনের তামাসা॥"

মীরা রায়

সোনার হরিণ

কর্পোরেশনের মুষ্টিভিক্ষা কুড়িয়ে ক্ষীণজীবী হয়ে কোন রকমে শহরের একধারে পড়ে ধুঁকছে এই গলিটা। ইলেকট্রিক সাপ্লাই-এর কার্পণ্যের ইঙ্গিত নিয়ে ছড়ানো ছিটানো আলোর বিন্দু টিমটিম করে জ্বলছে এদিক ওদিকে। শহরের দুয়োরানী হয়ে বেঁচে রয়েছে, এই গলিটার গ্লানিময় জীবন-শহরের আমীর ওমরাহের আনাগোনা ওর ধারে কাছে নেই। সমাজের অপাংক্তেয়দের দল এসে আশ্রয় নিয়েছে ওর জীর্ণ খুপরীগুলোতে। দুয়োরানীর উপেক্ষিতার জীবন তাদের রিক্ত নিঃশ্বাসে প্রতিদিনই ভারী হয়ে ওঠে—সে হিসাব নিকাশের খতিয়ান করবার সময় কর্মব্যস্ত মহানগরের নেই। যুদ্ধোত্তর জীবনযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হয়ে কোন রকমে নিজেদের টিকিয়ে রেখেছে এ কানাগলির বাসিন্দারা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এদের জীবনের সরলতা সজীবতাকে শুষে নিয়ে নিলর্জ্জ কাঙালের বেশ পরিয়ে সভ্য সমাজের চোরাবালির ওপর বসিয়ে দিয়ে গেছে। এই অভ্যস্ত কাঙালপনায় ওদের জীবন চাকা ছন্দোবিহীন গতির আয়াসে ঘুরে চলে রিক্ততার যে কর্কশ সুর তোলে সেটা ক্রমশঃই জীবনের সুরলোকের কথা বিস্মরণ করিয়ে দিয়েছে। বড় রাস্তা থেকে বেরিয়ে গলিটা

শেষপ্রান্তে গিয়ে যেখানে মুখ থুবড়িয়ে পড়ে আছে সেখানে কায়ক্লেশে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা জরাজীর্ণ একতলা বাড়ী, তারই অন্ধকারাচ্ছন্ন দুখানা পায়রার খোপের মত কুঠরীতে দুই কন্যা ও রুগণ স্ত্রী নিয়ে নিজের সংসারকে সমর্পণ করে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করে চলেছেন পাকিস্তান প্রত্যাগত অবিনাশ হালদার। নিজের সর্বস্ব আর্থিক খেসারৎ ওপারে দিয়ে, এপারে চলে এসে কোন রকমে কেরাণীকুল বৃদ্ধি করে পরম নিশ্চিন্তে ঐ দুটো চোরা কুঠরীতেই স্বর্গসুখ অনুভব করে দিন কাটিয়ে দিচ্ছেন।

এরই মাঝে তাঁর খেয়াল হল কাল তার পরিক্রমা ঠিক বজায় রেখে চলেছে রূপ থেকে রূপান্তরে পট পরিবর্তন করে, মেয়েদের কৈশোরের রূপ খসিয়ে যৌবনের রূপসজ্জা পরিয়ে দিয়ে। খালিহাতে ও খেয়ালের কোন মূল্যই হলনা, টাকার যেখানে সংস্থান নেই সেখানে ও খেয়াল শুধু মাথায় টাকই বৃদ্ধি করল, হাতে টাকা বৃদ্ধির কোন উপায় করল না। বড় মেয়ে অনুভা যখন রান্নার ফাঁকে ফাঁকে টুকিটাকি কাজে এদিক ওদিক চর্কীপাক খেতে থাকে তখন ওর যৌবনপুষ্ট অপূর্ব দেহ-সৌন্দর্যের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন অবিনাশ হালদার। নিজের বড়লোক পাত্র যোগাড় করবার অর্থসঙ্গতি নেই, মেয়েটারও পাকড়াও বৃত্তির সপ্রতিভতা নেই—লাজুকের একশেষ। অথচ স্নেহান্ধ-পিতা তিনি স্বপ্ন দেখেন, অনুভার ধনী শ্বশুর ঘরের ও সুন্দর স্বামীর। তাঁর মেয়ে তাঁর মতে অনন্যসাধারণ। বড়লোক পাত্র একবার দেখলেই লুফে নেবে অনুভাকে।

বাড়ীটার সর্ব পেছনের ঘরটায় থাকে সুদেব চক্রবর্তী, মোটরের কারখানায় কাজ করে, সকাল আটটা থেকে রাত আটটা ডিউটি করে। রাত্রে অবিনাশ হালদারের সংসারে কিছু করে টাকা ধরে দিয়ে খায় এবং ঘরটাতে থাকে, এতে এ দুর্মূল্যের বাজারে দুই পক্ষেরই সুবিধা হয়। বাইরের পুরুষ বলতে ঐ সুদেবের সঙ্গেই অনুভার একটু সংযোগ আছে—তাও এ সংযোগটুকু লজ্জার সঙ্কীর্ণতায় বড় শীর্ণ। সুদেব খুব সহজ হতে পারে, কিন্তু পুরুষ দেখলে অনুভা যেন বাক্ সরস্বতীর সঙ্গে বিবাদ করে বসে থাকে, জোড়ালাগা ঠোঁট দুটো খুলতে ভুলে যায়। তবুও সুদেব কথা বলে বলে ওকে বেশ কিছু সপ্রতিভ করে তুলছে, ফলে ছুটির দিনে কাজকর্মের পর প্রায়ই দুটো-একটা বই নিয়ে অনুভার পদসঞ্চার ঘটে সুদেবের ঘরে। বিদ্যার আদানপ্রদান ঘটে এবং বই খাতার নৌকা বেয়ে সুদেবের মনটা যে কখন অনুভার হৃদয়তীরে এসে পৌছে গিয়েছিল তা সুদেবের খেয়াল হয়নি। অনুভার মনের মাঝে যখন তার মন

তালাচাবীর মধ্যে বন্দী হয়েছে তখন তার টনক নড়ল। একি করেছে সে! অবিনাশবাবু ধনী জামাই করতে ইচ্ছুক সে সেটা ভালোরকমই জানে, আরও জানে অনুভার সঙ্গে তার খুব বেশী মেলামেশার পক্ষপাতী অবিনাশবাবু নন। আভাসে ইঙ্গিতে অনেকবার সে বুঝেছে এটা। আর সতি কথাই তো, সামান্য কারখানার একটা কারিগর, সে করবে বিয়ে, সে করবে সংসার প্রতিপালন? সে তার ম্যাট্রিক পাশকরা স্বল্পবিদ্যা নিয়ে কি জীবনে উন্নতি করতে পারবে? পারবে কি সে অনুভাকে বড়লোকের মত সুখে রাখতে? নিজের এই বন্দীদশায় সে সভয়ে শিউরে উঠল। সে নিজে বাঁধা পড়েছে ক্ষতি নেই কিন্তু অনুভাকে জানতে দেবে না তার এ অনুভূতি, তার এই দুর্ভাগ্যের মাঝে অনুভাকে কিছুতেই টেনে আনবে না। আত্মনিগ্রহের ও সংযমের বর্ম এঁটে অতি সন্তর্পণে ও চলাফেরা করতে লাগল, অনুভাকে ও জানতে দেবে না তার রং লাগা যৌবনের এই নতুন রূপ, তাকে টেনেও আনবে না তার এই বাস্তবময় দুঃখ-দুর্দশার মাঝে। এজন্য অনুভার দৈনন্দিন বিদ্যাচর্চায়ও বেশ ছেদ পড়তে লাগল। তার এই সযত্নে এড়িয়ে যাওয়াটুকু অনুভার চতুর লক্ষ্যপথে অবিলম্বে ধরা পড়ল। অনুভা মাঝে মাঝে অনুযোগ করত, 'সুদেবদা তুমি আজকাল বড় গম্ভীর হয়ে গেছ। আগে আমায় মুখচোরা বলতে, আজকাল নিজেই ঐ পদটা দখল করছ। স্কুলে তো কোনদিন যেতে পেলাম না, তোমার কাছ থেকে তবু ইংরিজি শব্দগুলোর সঙ্গে ভালোভাবে পরিচয় ঘটল, হঠাৎ এ ঘটকালিটা বন্ধ করে দিলে কেন বলত? দোহাই তোমায়, এই পড়ানটুকু বন্ধ করো না, এটুকুর মধ্যেই তবু একঘেয়েমির ব্যতিক্রমটা ঘটে।'

ওদিক থেকে ছোট বোন বিনতা চেঁচিয়ে ওঠে, 'বা রে সুদেবদা, দিদি কেবল একলাই পড়বে, আমাকেও পড়িয়ে দিতে হবে কিন্তু।'

সজোরে এক ধমক দিয়ে ওঠে অনুভা, 'হ্যাঁ সারাদিন খেটে খুটে এসে সুদেবদা এখানে বিনি পয়সার মাষ্টারীতে যোগ দিক এবার! যা পার নিজে পড়, আর তাছাড়া তোমার তো স্কুল রয়েছে, আবার বাড়ীতেও পড়ানোর প্রয়োজন হবে?'

বেশ একটু স্নেহের দৃষ্টি নিয়ে সুদেব ওদের দিকে তাকিয়ে থাকে। এই পরিবারটির সঙ্গে ইদানীং সে বেশ ঘনিষ্ঠভাবেই মিশে গেছে, শুধু তার মনের নতুন ভাবের গোপন অভিসারটুকু ঢেকে রাখবার জন্য এক একসময় অহেতুক ব্যবধান সৃষ্টি করে চলতে হচ্ছে তাকে। কোন্ ছোট বেলায় পিতৃমাতৃহীন হয়ে কলকাতায় এক দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়ের আশ্রিত হয়ে এসে ওঠে। সেখান থেকেই

জীবন-সংগ্রাম সুরু হয়, কোন রকমে ম্যাট্রিকটা পাশ করে কারখানার চাকরীটা পেয়ে যায়। অনেক ঘোরফেরের মধ্য দিয়ে ঘুরে সে আজ এদের পরিবারের একটা ঘরে এসে আশ্রয় পেয়েছে, পেছে একটি অনাত্মীয় পরিবারে আত্মিক যোগাযোগ, সর্বোপরি লাভ করেছে প্রেমের এক অনির্বচনীয় অনুভূতি—যা তার যৌবন-হৃদয়ের প্রথম নৈবেদ্য সম্ভারকে ফলে ফুলে উপচীয়মান করে তুলেছে। বিনতার এ আব্দারটা তর্কের খাতিরে অযৌক্তিক হলেও সে তাকে একেবারে বিমুখ করতে পারল না। সুদেব বোঝে বদ্ধ ঘরের জানলার ফ্রেমে আঁটা সঙ্কীর্ণ আকাশের টুকরোটা যেমন বাইরের জগতের স্বল্প পরিচয়ের মুক্তির স্বাদ আনে ঐ বদ্ধ ঘরে, তেমনি এই বিদ্যাচর্চার ক্ষণিক অবকাশটুকুই ওদের এই নিত্যকার একঘেয়েমি থেকে কিছু কথোপকথনের বৈচিত্র্যের স্বাদ আনে।

সুদেব সস্নেহে বিনতাকে কাছে টেনে নেয়, বলে, 'আচ্ছা বিনতা এবার থেকে পালা করে তোমাকে আর অনুভাকে পড়াব কেমন? তুমি রোজ রাত্রে এস তোমায় পড়া দেখিয়ে দেব। বরং অনুভাকে কিছুদিন আর পড়াব না, তোমার স্কুলের পড়াটা আগে তৈরী করিয়ে দেব।'

অনুভা ফোঁস করে বলে ওঠে, 'তা হবে না সুদেবদা ওর তো তবু স্কুল রয়েছে পড়াবার, আমার তো তোমার কাছ ছাড়া আর কারুর কাছে পড়বার কোন উপায় নেই। আমায় যদি না পড়াও রাত্রে তোমার রান্নায় এত নুন দিয়ে দেব তখন খেতে পারবে না খুব জব্দ হবে। আমার পাওনা থেকে বঞ্চিত করো না ভালো হবেনা বলছি।'

'অনু, তোমায় যে পাওনার কত বেশী দিয়েছি তা' কি দেখতে পাওনি?' বলতে বলতে সুদেবের গলাটা কেঁপে উঠল, পাছে নিজেকে আরও প্রকাশ করে ফেলে এই ভয়ে কথা শেষ না করেই অনাবশ্যক কাশতে কাশতে চট করে ওদের সামনে থেকে উঠে গেল। বিনতা নিজের বিজয়োল্লাসেই তখন ব্যস্ত সুদেবের এই আকস্মিক পরিবর্তন ওর নজরেই এল না, কিন্তু অনুভার নজরে সবই ধরা পড়ল, সে একটি কথাও আর বলতে পারল ন ।

হঠাৎ সদর দরজাটার জীর্ণ পাল্লা দুটো খুলে গেল, ওদের তৈল-তৃষিত কব্জার কর্কশ আর্তনাদে বোঝা গেল কেউ আসছে। সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল একটি অপরিচিত যুবকের হাতের ওপর ভর দিয়ে আস্তে আস্তে ঢুকলেন অবিনাশ বাবু। খুঁড়িয়ে খুড়িয়ে এগিয়ে এসে বারান্দার এক ধারে তিনি বসে পড়লেন। অনুভা ত্রস্তে এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে বাবা?' তখনই সামনে অপরিচিত ছেলেটিকে দেখে একটু থমকে চুপ করল। অনুভাকে দেখে

রজতেশ এগিয়ে এল, বল্লে, 'আমার গাড়ীর সঙ্গে ওঁর ধাক্কা লেগেছে, রাস্তায় পড়ে গিয়েছিলেন। আঘাত বিশেষ লাগেনি হাঁটুতে চোট লেগেছে। ওঁকে আমি হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে এনেছি। ভয়ের কোন কারণ নেই।' অবিনাশবাবুর আঘাত সামান্য, কিন্তু মানসিক উত্তেজনায় তিনি যেন শৈশবের আকুলতা ফিরে পেয়েছেন। গমনোদ্যোগ রজতেশের হাত দুটো সবলে চেপে ধরে বল্লেন, 'এখনি যেও না বাবা একটু বসো, এত কষ্ট করে যখন আমায় বাড়ী অবধি পৌঁছেই দিয়ে গেলে তখন গরীবের বাড়ীতে সামান্য কিছু খেয়ে যেতে হবে। আমার এ দারুন দুর্ঘটনায় ভগবানই তোমায় পাঠিয়ে দিয়েছেন, নৈলে কি আমি আজ বাঁচতাম? রাস্তায়ই পড়ে থকেতে হ'ত নৈলে হাস-পাতালে পড়ে থাকতাম। এত যত্ন করে কে বাড়ীতে দিয়ে যেত। তোমায় বসতে দেবার মত খেতে দেবার মত জায়গা আমাদের নেই বাবা, তবু গরীবের খুদ কুঁড়ো একটু মুখে দিতে হবে।'

এতগুলো কথা একসঙ্গে বলে অবিনাশবাবু জোরে জোরে নিঃশাস ফেলতে থাকেন। রজতেশের ফিরে যাওয়া হল না, দালানের মাঝখানে রাখা হাতলভাঙা চেয়ারটাতেই আশ্রয় নিতে হল। অনুভা বসে পড়ে বাবার হাঁটুতে হাত বুলোচ্ছিল, অবিনাশবাবু অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে তাকে উঠিয়ে দিলেন, 'যা মা যা, একটু চা খাবার রজতেশকে এনে দে, বড় কষ্ট করেছে আমার জন্য। শুধু মুখে চলে গেলে মনে শান্তি পাব না।' অনুভা উঠে ঘরে গেল চা তৈরী করতে।

অবিনাশবাবু পিকারীর দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন রজতেশের দিকে। সর্বাঙ্গে ওর বিশিষ্ট একটা আভিজাত্যের ও প্রাচুর্যের ছাপ রয়েছে। বসনে ভূষণে, চাল-চলনে সবেতেই ওর ঐশ্বর্যের একটা প্রখর দৃপ্তভঙ্গী যেন পরম ঔদ্ধত্যের সঙ্গে আত্মপ্রকাশ করছে অথচ কথাবার্ত্তায় খুবই অমায়িক বলে মনে হয়। তিনটে কলিয়ারীর মালিক কলকাতার বিশিষ্ট ধনী নিখিলেশ রায়ের একমাত্র ছেলে যে রজতেশ রায় এটা ভাষায় বলার দরকার করে না, রজতেশের সর্বাঙ্গ দিয়ে ওর এ পরিচয় যেন ফুটে বেরোচ্ছে। গাড়ীতেই প্রাথমিক আলাপ পরিচয়ের পালাটা সাঙ্গ হয়েছে। তবুও কিছুটা সংশয়ান্বিত কণ্ঠে অবিনাশবাবু জিজ্ঞাসা করেন, 'তুমি কলকাতার বাড়ীতে একা থাক কেন বাবা বুঝতে পারলাম না, আত্মীয়স্বজন কেউ কাছে থাকেন না?'

একটু মৃদু হেসে রজতেশ বলে, 'এ প্রশ্নটা আমাকে অনেকেই করেছেন, কিন্তু দশ বছর বয়সে মাকে হারিয়েছি বাবাও বরাবর কলিয়ারীতে থাকেন।

সেই থেকেই পড়াশুনার খাতিরে কলকাতায় ম্যানেজার কাকার অধীনে বরাবর থাকতে হয়েছে। আত্মীয়স্বজনরা সব কলিয়ারীর জায়গায় থাকেন। এখন পড়াশুনা শেষ হয়েছে বটে কিন্তু কলকাতার ঐ বিরাট বাড়ীটায় দেখাশুনার দায়দায়িত্ব সবই আমার ওপর এসে পড়েছে। কাজেই একলাই থাকতে হয় বেশীর ভাগ সময়। মাঝে মাঝে বাবা আসেন তখনই দোকলা হই। নৈলে একলা ছাড়া আর দ্বিতীয় সঙ্গী কোথায় পাব বলুন? বিয়ে করবার সুযোগও হয়নি, ইচ্ছাও হয়নি, একলা তে বেশ ভালোই আছি।'

. ঘরে বসে চা তৈরী করতে করতে বাবার এই গায়ে পড়া আলাপ শুনতে শুনতে অনুভা বিরক্ত হয়ে উঠছিল, বড়লোক বলেই কি বাবার এটা নিছক খোসামুদী? রজতেশ তো চলেই যাচ্ছিল বাবা তাকে বসিয়ে রেখে চা-খাবারের ছুতা করে গায়ে পড়ে আলাপ সুরু করে দিয়েছে। তাদের এ ভাঙা বাড়ীতে ওঁদের মত বড়লোককে আপ্যায়ন করবার কি প্রয়োজন ছিল বাবার? চটা ওঠা চায়ের কাপ আর হাতলভাঙা চেয়ার দিয়ে রজতেশকে আপ্যায়ন করতে গিয়ে কুণ্ঠায় অনুভা এতটুকু হয়ে গেল। তবুও সেই চটা ওঠা মলিন কাপে ততোধিক মলিন বর্ণের চা নিয়ে ওকে এগিয়ে গিয়ে রজতেশের হাতে দিতে হল। রজতেশ চা ও একটা লাড্ডু মুখে পুরে দিয়ে মালিশের ওষুধটা অনুভার হাতে দিয়ে যাবার জন্য উঠে দাঁড়াল। অবিনাশবাবু উঠে দাঁড়াতে পারছিলেন না, বসে বসেই একান্ত করুণ কণ্ঠে বললেন, 'আমি আর উঠতে পারছি না বাবা, তুমি মনে করে আবার এ গরীবের কুঁড়েতে এসো। অনু যা মা ওঁকে একটু এগিয়ে দিয়ে আয়।'

'আপনি অত ব্যস্ত হবেন না, আমি এদিকে এলে নিশ্চয় আপনার খবর নিয়ে যাব, আপনি একটু শুতে যান'—বলে আর অপেক্ষা না করেই রজতেশ দৃপ্তভঙ্গিতে ভাঙা দরজাটার মধ্য দিয়ে মাথা নীচু করে বেরিয়ে গেল। অনুভা দরজা অবধি এগিয়ে এল ততক্ষণে রজতেশের দীর্ঘ দেহটা গলির শেষে দাঁড়িয়েছে, সামনেই নীল ডানা মেলে শুয়ে পড়া বিরাট গাড়ীটা তখনি নড়ে কঠে নিঃশব্দে মিলিয়ে গেল।

দুর্ঘটনার মধ্য দিয়েই রজতেশের সঙ্গে অবিনাশবাবুদের পরিবারের সঙ্গে এই ঘনিষ্ঠতা ঘটে। ওটা যেন পরবর্তী এক দুর্যোগ বয়ে আনবার ইঙ্গিত নিয়ে এসেছিল তার। রজতেশ বলে গেলেও সেদিনের পর থেকে আর একবারও আসেনি। এটাই স্বাভাবিক বলে মেনে নিলেও অনুভার মনে রজতেশের আশাটা বড় উজ্জল হয়ে জলতে থাকে। তাই যখন সুস্থ হয়েই বারবার অবিনাশবাবু রজতেশের বাড়িতে যাতায়াত আরম্ভ করে দিলেন, মনে মনে

এক নতুন পুলকের অনুভূতিকে কিছুতেই ঠেকিয়ে রাখতে পারেনি। রজতেশ কলকাতায় অভিভাবকহীন অবস্থায় একলাই থাকে, অনুভার মত মেয়েকে দিয়ে তার তরুণ মনকে আকর্ষণ করতে বেগ পেতে হবে না, সুতরাং হবু লক্ষপতি জামাই-এর স্বপ্নটা সম্ভব করাবার জন্য ভগবান যদি এমন সুবর্ণ সুযোগই এনে দিয়ে থাকেন তার অপব্যবহার করা মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ হবে না ভেবেই অবিনাশবাবু রজতেশের বাড়ী ঘন ঘন যাতয়াত আরম্ভ করে দিয়েছেন। শেষে তাঁর আতিশয্যে রজতেশকে দু'একবার এই ভাঙা বাড়ীটার 'পায়রার খোপগুলো'তে উঁকি দিতে আসতে হয়েছে। তার শিকারী মনটা শিকারের পায়রাও জুটিয়ে নিয়েছিল ঐ 'খুপরীতে'। তাই অবিনাশবাবু যত চেষ্টা করেছিলেন মেয়েদের সঙ্গে রজতেশের সম্পর্কটা ঘরোয়া করে তুলতে, রজতেশও সে চেষ্টাকে তার কাজে লাগাতে কসুর করেনি। এদের এই দৈন্যের সংসারে তার অযাচিত করুণার অপচয় ঘটাবার জন্য মাঝে মাঝে তার আবির্ভাব ঘটতে লাগল।

এই নতুন অতিথির আনাগোনায় কানা গলিটার চারিদিকের ঝিমিয়ে পড়া চোখগুলো কৌতূহলের উদ্দীপনায় হঠাৎ যেন জেগে উঠল। গতানুগতিকতার ছকে বাঁধা গলির এ জীবনে সে ছককে বানচাল করে দেবার জন্য কোন সুরলোকের মোহিনী মায়া এল? এ ছকের খেলায় অবিনাশ হালদার কি কিস্তীমাৎ-এর চেষ্টায় আছেন না ওর পেছনে রয়েছে সর্বনাশা ভাঙ্গনের এক অতি মায়াবিনী রূপ? এরকম নানা জল্পনা কল্পনা নিয়ে এতদিনে নির্জীব গলিটা হঠাৎ প্রাণবন্ত মুখর হয়ে উঠল। দু'একজন গায়ে পড়ে পরামর্শও দিতে এলেন, 'ভালো করছেন না অবিনাশবাবু, চাঁদ কখনও মাটিতে নেমে আসে না, আলো দেখিয়ে ভুলিয়ে সরে পড়ে। তেলে জলে মিশ খায় না, ওদের কাছ থেকে দূরে থাকাই ভালো।' ১৪—৪

গর্বের হাসি হেসে অবিনাশবাবু বলে, 'রজতেশকে জানেন না অদ্ভুত ভালো ছেলে, আমার মত লোককে ওরা কিনে রাখতে পারে তবু আমার খোঁজ খবর নেবার জন্য ওর কি আগ্রহ, এত বিনয়ী সরল ছেলে আজকাল সত্যিই দুর্লভ।' অবশ্য রজতেশের এই আগ্রহের মূলে যে ওঁর নিজের কতখানি আগ্রহ, সনির্বন্ধ উপরোধ, অনুরোধ, এবং মাসের মধ্যে দশবার ওর বাড়ীতে যাতায়াতের কাহিনী রয়েছে সেগুলো উহ্য থেকে যায়।

প্রথম প্রথম রজতেশ ওদের দারিদ্র্যের এ কঠিন রূপ দেখে বিস্মিত হয়েছে এবং এতে সে করুণা না করে সত্যিই পারেনি। সমাজের উচ্চশ্রেণীর

নারীকুলের কাছে সে সর্বত্র সুপরিচিত, তার বিপরীত দিকে আর একটি বিভীষিকাময় রূপ সমাজকে প্রতিনিয়ত কুরে খাচ্ছে এ-রূপটি এতদিন তার কাছে অজ্ঞাতই ছিল। একটা দুর্বল সহানুভূতির সোপান বেয়ে ওর মনটা কিছুদিনের জন্যও অনুভার আশে পাশে চলে গিয়েছিল যার জন্য মাঝে মাঝে এটা ওটা সে কিনে আনত ওদের দু'বোনের জন্য। শহরের অভিজাত পাড়ার সিনেমাগুলো সম্বন্ধে অনুভারা এতদিন অজ্ঞ ছিল, সেগুলোর সঙ্গে চৌরঙ্গীপাড়ার হোটেল রেস্তোঁরাগুলোর সঙ্গেও পরিচয় ঘটিয়ে দিল রজতেশ ওদের দু'বোনের। শহরের এই ঐশ্বর্য্যবান জীবনকে প্রাণভরে দু'চোখ মেলে অবাক বিস্ময়ে ওরা উপভোগ করত। রজতেশ এক নতুন পৃথিবীর জন্ম দিয়েছে ওদের কাছে। সে পৃথিবীতে নেই তাদের মত অভাবের যাঁতাকলে তিলে তিলে মৃত্যু—সেখানে আছে শুধু রূপ রস শব্দ স্পর্শ গন্ধভরা বিচিত্র অনুভূতি, পঞ্চেন্দ্রিয়তৃপ্তির ষড়ৈশ্বর্য্যময় বিপুল উপচার। এর সঙ্গে যে ঘটকালি করেছিল সে তার রান্নাঘর নামক গহ্বর থেকে টেনে এনে তাকে এক নতুন জীবনের সন্ধান দিল, তার প্রতি অনুভা কৃতজ্ঞতা না জানিয়ে পারল না। প্রথম প্রথম অনুভা নিজের শাড়ী-জামার অনুপযুক্ততার লজ্জায় রজতেশের সঙ্গে যেতে চাইত না কিন্তু বাবার আগ্রহাতিশয্যে তাকে রজতেশের সঙ্গে বেরোতেই হত। এর পেছনে বাবার অভিসন্ধির ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে ও যেন লজ্জায় মিশে যেত। তার এই আড়ষ্টতার জন্য বাবার কাছে বকুনীও কম খায়নি।

অবিনাশবাবু অভিযোগ তুলতেন, 'আচ্ছা অনু রজতেশকে দেখলে তুই ওরকম আড়ষ্ট হয়ে জবুথবু হয়ে যাস কেন? যত ভাব সুদেবের সঙ্গে! সুদেবের সঙ্গে যেমন স্বাভাবিক কথা বলিস সে-রকম রজতেশের সঙ্গে বলতে পারিস না? হ্যাঁ একটা কথা, রজতেশ এখন তোকে নিয়ে বেড়াতে-টেড়াতে যাচ্ছে, এখন সুদেবের সঙ্গে অত মেলামেশা করিস না কখন রজতেশ জানতে পারবে, কিছু মনে করতে পারে।' গলাটা একটু নামিয়ে বললেন, 'আর সুদেব কি আর আমাদের সঙ্গে মেশবার উপযুক্ত স্তরের লোক? কেউ কোথাও নেই, আছে খায় এই পর্যন্ত ব্যাস। ওকে একদম এড়িয়ে চলবি।'

বাবার এই উক্তিটায় অনুভার মনটা তেতো হয়ে ওঠে। নীরবে সরে যায় সেখান থেকে। রজতেশের সঙ্গে ওদের সঙ্গে আশমান জমীন তফাৎ, কি করে ও সহজ হতে পারে রজতেশের সামনে। ঐশ্বর্য্যের ব্যবধান মানুষে মানুষে অনেক তফাৎ সৃষ্টি করে এটা বাবা বুঝেও বুঝতে চান না, অন্ধ আবেগে ছুটে

চলেছেন মেয়ের ভাগ্যলক্ষ্মীকে স্বরলোক থেকে মর্ত্যলোকে টেনে নামিয়ে আনবেনই। মনে মনে অনুভা বাবার এই আচরণে সুদেবের প্রতি এই উক্তিতে ক্ষুণ্ণ না হয়ে পারে না। আজকাল সুদেবও বুঝতে পেরেছে, কোন রকমে নিজের ঘরে চলে যায়, এদের সঙ্গে কথাবার্তা খুব কম বলে।

সেদিন রাত্রে জোর করেই অনুভা সুদেবের ঘরে ঢুকল, 'কি সুদেবদা তুমি তো আজকাল আমাদের ভুলেই গিয়েছে। আমাদের সঙ্গে একদম কথা বল না, কি হয়েছে বলত?' হঠাৎ অনুভার আগমনে সুদেব বিস্মিত হয়ে ওঠে একটু গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলে, 'আমাদের মত লোকের খোস গল্প করে সময় নষ্ট করবার মত সময় কোথায় অনুভা? আর তুমি যদি বড়লোকের গিন্নীই হও তখন কি আমাকে মনে থাকবে? তখন তো আমাকে চিনতেই পারবে না, তার চেয়ে আগে থাকতেই সরে যাওয়া ভালো।' মুহূর্তে সমস্ত ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরে অনুভা লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে সঙ্গে সঙ্গে ব্যথিতও হয়। ভারী গলায় বলে ওঠে, 'সুদেবদা তুমি আমাদের ঘরের লোকের মত, রজতেশবাবু কি তাই? বাবার একান্ত ইচ্ছা মেটাতে গিয়ে ওঁর সঙ্গে মিশতে হয়। আমি তো জানি উনি যে উঁচু জগতে বাস করেন সে উঁচুতে হাত বাড়াবার ক্ষমতা আমার নেই। তবে রজতেশবাবু খুব ভদ্র এবং দয়ালু, আমাদের দুর্ভাগ্য ওঁকে বিচলিত করে। আমাদের একটু আনন্দ দেবার জন্য উনি বহু চেষ্টা করেছেন, ওঁর আন্তরিকতায় মুগ্ধ না হয়ে পারা যায় না। উনি বহু উপকার আমাদের করছেন কাজেই ওঁকে বিমুখ করতে পারে না, আর বাবা জানতে পারলে ভীষণ দুঃখিত হবেন। তাই বলে তুমি সরে যাবে কেন সুদেবদা?

একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে সুদেব বলে, 'না না অনুভা, তুমি রজতেশবাবুকে বিমুখ করো না যদি সত্যিই রজতেশবাবু তোমায় গ্রহণ করেন এর চেয়ে সৌভাগ্য তোমার আর হতে পারে না, এ সৌভাগ্যকে ফিরিও না। তোমার বিয়ের সময় সুদেবদাকে কোমর বেঁধে কাজে লাগতে দেখবে। কিন্তু এখন তোমার বাবা এতরাত অবধি তুমি আমার ঘরে আছ জানতে পারলে হয়ত রাগ করবেন যাও চলে যাও।' সুদেবের হাতের কোমল স্নেহস্পর্শ অনুভার অবাধ্য উড়ে-পড়া চুলগুলো বহন করে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

নায়কের ভূমিকা নিয়েছিল রজতেশ। অনুভার অবাক-বিস্মিত চিত্তের সকৃতজ্ঞ আলতো স্পর্শটুকু পেয়ে ওর খেয়ালী মনে আরও জেদ চেপেছিল অনুভাকে কি করে আরও নতুনত্বের স্বাদ দিয়ে হতবাক করে দেওয়া যায়। ওর দেখতে ভালো লাগে কি করে অনুভার কৃতজ্ঞকুণ্ঠিত চিত্ত নীরবে আত্মাঞ্জলি

দিচ্ছে ওর এই ক্রীড়াপটীয়সী বৃত্তির কাছে। রজতেশ বেশ কৌতুক দেখে ওর এই খেয়াল চরিতার্থের মাঝে অনুভার ভীরু নির্বাক চিত্তে ধীরে ধীরে জন্ম নিচ্ছে এক অপার্থিব সুমহান বৃত্তি, তার মাধুর্যটুকু ভোগ করতেও ভালো লাগে বৈকি! আজকাল প্রায়ই অনুভাদের নিয়ে রজতেশ বেড়িয়ে নিয়ে আসে। অবিনাশবাবু এতে খুশীই হয়েছেন। হঠাৎ তাঁর কল্পনার জাল ছিন্ন হয় ঘড়ির রাত্রি দশটা বাজার সঙ্কেতে। নিশ্চিন্ত হয়ে যন্ত্রটা চুপ করে যায় কিন্তু অবিনাশবাবু নিশ্চিন্ত হতে পারেন না। রজতেশ অনুভাদের বেড়াতে নিয়ে গেছে এখনও ফেরেনি। রজতেশ ক্ষুণ্ণ হবে, শিকার হাত ছাড়া হয়ে যাবে এই আশঙ্কায় তিনি কিছু বলতেও সাহস করেন না। অনেক রাত্রে ওদের বাড়ী ফেরার পর অনুভার হাতে উপহারের বাণ্ডিল দেখে ওঁর মুখর অভিযোগ বোবা হয়ে যায়। অনুভারও মনে হয় রজতোশের সেই উঁচু জগৎটা যেন অনেক নেমে এসেছে তার নাগালের মধ্যেই। তাকে স্পর্শ করবার মত আভাষও বোধহয় রজতেশের কাছে পেয়েছে। একদিন যা অলীক বলে মনে হোত আজ তা একেবারে অসম্ভব মনে হয় না। শুধু এক এক বার সুদেবের কথা মনে পড়ে ওর জন্য দুঃখ হয়। ওর আশীর্বাণীটা অনুভার মনে খুব শক্তি যোগাচ্ছে।

কিন্তু তবুও পুরো নির্ভর রজতেশের ওপর করতে পারে না, বড়লোকের খেয়ালী ছেলে, কখন খেয়াল মিটে যাবে ওদেরও ভুলে যাবে। হয়ত ভালো লেগেছে মেলামেশা করছে তাই বলে ঘর সংসার বাঁধবার আশা অনুভার করা উচিৎ হয় না অনুভার মনের এথিকস এই কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। রজতেশের কত সুন্দরী ধনী বান্ধবী রয়েছে তাদের পাশে সে দাঁড়াতেই পারে না। কিন্তু তবুও রজতেশ যে নতুন জগতের সন্ধান তাকে দিয়েছে তাতে রজতেশকে বাদ দিয়ে সে কিছুই কল্পনা করতে পারে না।

এরই মাঝে একদিন বর্ষায় ভিজে অবিনাশবাবু শক্ত অসুখে পড়লেন। প্রায় তিনমাস তাঁকে শয্যাশায়ী হয়ে থাকতে হল। এ তিনমাস তিনিও রজতেশের কোন খবর নিতে পারেন নি, রজতেশও এ বাড়ীতে আসেনি। অসুস্থতার মাঝেও রজতেশের এই নীরবতা তাঁকে বেশ ব্যস্ত করে তুলেছিল। অনুভার মনেও সেই প্রশ্নই ঘুরপাক খাচ্ছিল কিন্তু বহিঃপ্রকাশের অবকাশ মেলেনি। মনকে সান্ত্বনা দিয়েছে বড়লোকের ছেলে এ বাড়ীতে আসতে অসুবিধা হয় তাই আসে না, তবে কি তার নিজস্ব কোন আকর্ষণই রজতেশের কাছে নেই? ঠিক উত্তরটা যেন সদর দরজায় কড়া নাড়ার শব্দে মুখর হয়ে উঠল। রজতেশের বাড়ী থেকে লোক এসেছে রজতেশের শুভবিবাহের

নিমন্ত্রণলিপি নিয়ে। খুবই সম্ভাব্য ব্যাপার তবুও এই প্রত্যাশিত পরিণতিতে এক অপ্রত্যাশিত ভারী বোঝা অনুভার সমস্ত বুকখানা নিঃশ্বাস বন্ধ করে চেপে ধরল কেন? হৃৎপিণ্ডের প্রতিটি স্পন্দন যেন ওর কানে ভারী হয়ে বাজছে; থামাতে চাইলেও ওটা থামবে না কিছুতেই। এই অবাধ্য হৃদয়টাই যে জন্ম দিয়েছে অবাধ্য বাসনার আজ সেটা লজ্জায় কোথায় মুখ লুকোবে? কাঁপা হাতে চিঠিখানা নিয়ে বাবার বিছানার পাশে এসে অনুভা দাঁড়াল। রজতেশবাবুর বিয়ে, তোমায় নিমন্ত্রণ পত্র পাঠিয়েছেন বাবা' অনুভার গলার স্বর পরিষ্কার কাটা কাটা কথা।

অবিনাশবাবু যেন ঠিক শুনতে পাননি, একটু ব্যস্ত হয়ে পাশ ফিরলেন। ওঁর আধা-জাগ্রত চেতনায় এই সংবাদটা কিরূপ নিয়ে গিয়ে হানা দেবে তা দেখবার আগেই অনুভা ঘর থেকে বেরিয়ে বাইরে অন্ধকার দালানের কোণে গিয়ে নিজেকে মিশিয়ে দিতে চাইল। নিজের অস্তিত্বটা সে যেন ঐ ঘন তমিস্রায় লোপ করে দিতে পারলে বাঁচত। রাজ্যের পরাজয়ের গ্লানির মলিনতায় ওর ভেতর বাইর কালো হয়ে উঠল। নিজেকে উড়িয়ে দিতে চাইলেই পারা যায় না—এই চাওয়ার মধ্যে থাকে সব কিছুকে অস্বীকার করার প্রবৃত্তি তাই সবকিছুকে অস্বীকার করতে গিয়ে ঐ 'সবকিছু' যেন সুদ আসলের দাবী নিয়ে এসে আরও ঘাড়ে চেপে বসে।

মুহূর্তে ঐ দালানের কোণে জড়-করা আঁধারের সঙ্গে অনুভা দেহে মনে এক হয়ে মিশে গেল। যেন সে ক্রমশঃ ডুবে যাচ্ছে বিস্মৃতির কোন্ অতল গহ্বরে। চারিদিকে অন্ধকার, অন্ধকার—আর কিছু নেই। দু'হাত বাড়িয়ে ঐ গাঢ় নিঃসীমতার মাঝে কাকে যেন ও ধরতে গেল কিন্তু পারল না। ঝুপ করে কোথায় তলিয়ে যাচ্ছে সে, ধারে কাছে তার কেউ নেই তাকে বাঁচাবার। চির আঁধারেই সে বাস করত, আঁধারের রুক্ষ রূপকে সে জানত না, জানত না ওর কঠিন বেদনাকে, কিন্তু কোথা থেকে একটু আলোর বিন্দু তাকে ডাক দিল, লোভ দেখাল এক উজ্জ্বল জীবনের প্রতি। ও ছুটে গিয়েছিল সেই ক্ষণিক আলোর মায়াময় ইঙ্গিতে, আলো সরে গিয়েছিল, সে শুধু চোখ ঝলসানো জ্বালা নিয়ে আঁধারের বহু-বহু নীচে নেমে যাচ্ছে। একটা গাঢ় অনুভূতি তাকে চেপে ধরছে, এ নিশ্ছিদ্র আঁধারের কি নিঃসঙ্গতা, কি রিক্ততা, কি না পাওয়ার মরুতৃষা!

ক্রমে সব কালোয় কালোয় ছেয়ে গেল। অনুভার যেন সব ইন্দ্রিয়ে নেমে এসেছে নিষ্ক্রিয়তার মহাসুষুপ্তি। অনুভা আর যেন কিছুই মনে করতে

পারল না, চারপাশ শূন্য, কেউ নেই কিছু নেই, এই আঁধারই যেন তার দেহমনের শেষ সমাধি। তারপর?

না এখানেই শেষ নয়, অন্ধকার জন্ম দিচ্ছে আলোর। ঐ তো বুঝি পুবের আকাশে সাদা হয়ে আসছে দেখা দিচ্ছে নতুন দিনের সূর্যের আলো। এ আলোয় ফাঁকি নেই, নেই বঞ্চনার মিথ্যা আড়ম্বর। রাত্রির আঁধার অনুভার সকল দৈন্য যেন মুছে নিয়ে চলে গেছে। দিনের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে অনুভার চৈতন্য ফেরৎ এসেছে গত রাত্রের চৈতন্য লুপ্তির কথা সে ভাবতেও পারছে না। উজ্জল সূর্যালোকে সমস্ত ঘর ভরে উঠেছে—আর ভরে উঠেছে অনুভার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়া সুদেবের স্নেহ ছলছল দু'টি চোখ। গভীর স্নেহেও অনুভার সদ্য জেগে-ওঠা ক্লান্ত মুখে ও মাথায় হাত বুলোচ্ছে। তার সমস্ত অন্ধকার ধুয়ে মুছে দিয়েছে আলোর আশীর্ব্বাদ। এই কানা গলিতেই অনুভা এতদিন পরে পেয়েছে প্রাণচাঞ্চল্য।

সুলেখা
স্পেশাল
ফাউণ্টেনপেনের
কালি
Sulekha
৪ টি
স্থায়ী রঙে
পাওয়া যায়
ব্লু-ব্ল্যাক
রঅ্যাল ব্লু
কালো
ব্রাউন
সুলেখা ওয়ার্কস লিঃ
কলিকাতা—৩২
PRO/SW-৭

শারদীয়

বৈতানিক ১

সাহিত্য সংকলন

PIONEER
VESTS
ARE
HYGIENICALLY
BLEACHED
EVERY BODY NEEDS
PIONEER VESTS
They are standard
in size too
PIONEER KNITTING MILLS LIMITED
BUILDINGS, CALCUTTA-2

শারদ সাহিত্য সংকলন

সম্পাদক

ভবানী মুখোপাধ্যায়

এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

প্র কা শ ক

শ্রী সুপ্রিয় সরকার

এম, সি, সরকার অ্যাণ্ড সনস্, প্রাইভেট লিঃ

১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট ॥ কলিকাতা-১২

প রি বে শ ক

পত্রিকা সিণ্ডিকেট (প্রাঃ) লিমিটেড

লিণ্ডসে ষ্ট্রীট কলিকাতা-১৬

আশ্বিন—১৩৭৩

মূল্য : দুই টাকা মাত্র

মু দ্রা ক র

শ্রী ক্ষীরোদচন্দ্র পান

নবীন সরস্বতী প্রেস ॥ ১৭ ভীম ঘোষ লেন ॥ কলিকাতা-৬

সূচীপত্র

প্রবন্ধ ও আলোচনা

গল্প

ক বি তা

অচ্যুত চট্টোপাধ্যায় (৯১) অজিত মুখোপাধ্যায় (১৯) অনিল ভট্টাচার্য (২৯) অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় (২৬) অতীন্দ্র মজুমদার (২১) আনন্দ বাগচী (৮৭) কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত (১৬) ক্ষীতিশ দেব সিকদার (৯২) গণেশ বসু (২০), গোপাল ভৌমিক (৮২) গোবিন্দ চক্রবর্তী (৮৪) গৌতম গুহ (২৮), চিত্ত ঘোষ (৮৫) জয়ন্তী সেন (৮৮) জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায় (১৭) দুর্গাদাস সরকার (৯১) নচিকেতা ভরদ্বাজ (২৪) প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৩) পূর্ণেন্দু ভট্টাচার্য (২২) পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় (৯৩) বিষ্ণু দে (৮১) বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত (১৭) বিশ্বনাথ কয়াল (১৮৮) বাসুদেব দেব (৮৩) বেণু দত্তরায় (৮৩) মণীন্দ্র রায় (৮১) মলয় শঙ্কর দাশগুপ্ত (৯৬) মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় (২৩৮) মানস রায়চৌধুরী (২২) মৃণাল বসু চৌধুরী (৮৫) রমেন্দ্র মল্লিক (২৭) শঙ্করানন্দ মুখোপাধ্যায় (৯৪) শক্তিব্রত ঘোষ (২৯) শ্যামল ঘোষ (৯২) শচীন দত্ত (২৩) শুদ্ধসত্ব বসু (৮৬) শিবশম্ভু পাল (১৮) শান্তনু দাস (৯৫) শিপ্রা পাল (২৫) সুভাষ মুখোপাধ্যায় (১৪) সুনীল বসু (৮৯) সুশীল রায় (৮৭) সুসিতকান্তি রায় (২৪), সমীর ঘোষ (৩০) সুনীল হাজরা (২৬) সুবন্ধু ভট্টাচার্য (১৮) সামসুল হক (৮৮)।

বি দে শী ক বি তা

এলিনর ফার্জন (অনু: মনীশ ঘটক—২৪৪) ব্রেটলট ব্রেখট (অনু: দিনেশ দাস —২৪৫) (ব্রেটলট ব্রেখট—অনু: জীবন বন্দ্যোপাধ্যায় (২৪৬) কমলা দাস— অনু: সন্তোষকুমার অধিকারী (২৪৭) পল ভেরলেন (অনু: গোবিন্দ মুখোপাধ্যায় (২৪৫)।

আশ্বিন ১৩৭৩

স্ব গ ত

শক্তিপূজা বাঙালীর জাতীয় উৎসব। এই শক্তিপূজাকে স্বদেশজননীর পূজা হিসাবে কল্পনা করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। তিনি আশা করেছিলেন—

> "কিন্তু একদিন দেখিব—দিগ ভুজা, নানা প্রহরণধারিণী, শত্রুমর্দিনী, বীরেন্দ্রপৃষ্ঠ বিহারিনী—দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী, বামে বাণী বিদ্যা বিজ্ঞান মুর্তিময়ী, সঙ্গে বলরূপী কার্তিকেয়, কার্যসিদ্ধিরূপী গণেশ—আমি সেই কালস্রোতমধ্যে দেখিলাম এই সুবর্ণময়ী বঙ্গ প্রতিমা।"

বঙ্কিমচন্দ্রের মাতৃমূর্তি তাঁর সুবর্ণময়ী স্বদেশজননীর মূর্তি। তাঁর কল্পনায় আকুলতা ছিল, দৃঢ়তা ছিল, আন্তরিকতা ছিল, আর ছিল ভক্তি।

বর্তমান যুগে আকুলতা, আন্তরিকতা, ভক্তি প্রভৃতি বিভিন্ন ধরণের চিত্তবৃত্তি দুর্লভ, মানুষ এখন অন্যভাবে বিভোর। এখন আর অধ্যাত্ম সাধনার দিন নেই, এখন জড়বাদের ভোগসাধনাই সর্বশ্রেষ্ঠ পদার্থ। তাই দেখি দুর্গাপুজা হয়ে উঠেছে, প্রতীকি পুজা, দুর্গার নামে আমরা হুল্লোড় করি, টুইষ্ট, রক এন রোল নৃত্য করি, বানর সেজে লরীতে অঙ্গভঙ্গী করি আর বাংলাদেশের যারা চিরদিনের শত্রু তাঁদের মনকে ভরিয়ে তুলি ঘৃণা ও অশ্রদ্ধায়। শারদোৎসবের সূত্রে আগস্ট মাস থেকে সুরু হয় আন্দোলন, ঘেরাও, শোভাযাত্রা, শারদোৎসব উপলক্ষ্যে দূরপাল্লার যাত্রী বিমান ও ট্রেনগুলিতে ভীড় বাড়ে, রাস্তার খবরের কাগজওলার সাইকেল অসংখ্য উপন্যাসপুষ্ট স্ফীতোদর পুজাসংখ্যার ভারে টলমল

করে। জুতা, জামার দোকান এবং সিনেমা ও থিয়েটারের দোরগোড়ায় ভীড়ের চাপ বৃদ্ধি পায়।

পুজা অবশ্য দীর্ঘস্থায়ী নয়, মাত্র চারদিনের খেলা, কিন্তু সেই চারটি দিনকে কেন্দ্র করে যে আনন্দ উৎসব তার প্রস্তুতিপর্ব স্থরু হয় বৈশাখ থেকেই।

পুজা ঠিকমত হয় না এই বিষয়ে সকলেরই যথেষ্ট জ্ঞান আছে, ভক্তির অভাব তাও সকলের অজ্ঞাত নয়, তবু একটা প্রতীককে কেন্দ্র করে স্ফূর্তি করার বাধা কোথায়! এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তথাপি চিরদিনই রঙ্গভরা, কবির এই অমর উক্তিটাই এইকালে বিশেষভাবে স্মরণে জাগে।

দেবী দুর্গার প্রতিমা আজ একটি প্রতীক মাত্র, একটা উৎসবের প্রতীক, কিন্তু অতীতে যে ঐতিহ্য বাঙালীর দুর্গাপুজাকে কেন্দ্র করে একদা গড়ে উঠেছিল তার কথাও স্মরণ করা কর্তব্য। যাঁরা অতীতের পুজা দেখেছেন তাঁদের মধ্যে মধ্যে খুব কম সংখ্যক ব্যক্তি আজো জীবিত আছেন। যাঁরা মধ্যবয়সে তাঁরাও কিছু ছিটে ফোঁটা দেখেছেন, কিন্তু যাঁরা এ যুগের তাঁরা কোনো সংবাদই পেলেন না, শুধু বাঙালী বলেই তাঁরা যে কি মহৎ উত্তরাধিকার লাভ করেছেন সে বিষয়ে তাঁদের অবহিত করার কোনো চেষ্টা নেই।

বাঙালী আত্মবিস্তৃত জাতি, এই আত্মবিস্মৃতি আজ আমাদের চরম পর্যায়ে নিয়ে এসেছে।

এই স্থত্রে স্বামী বিবেকানন্দের একটি প্রিয় কাহিনী স্মরণে এল, আজ এই মহাপুজার লগ্নে সেই কাহিনীটি উল্লেখ করা অনুচিত হবে না মনে করি—

—একটি অঞ্চলে কোনোক্রমে একটা মাতৃহারা বাঘের বাচ্চা ভেড়ার দলে মিশে গিয়েছিল, সে তাদের সঙ্গেই থাকৃত, মাঠে চরত, সেই ধরণের স্বভাবও তার। একদিন ভেড়ার পালে বাঘ পড়ল, ভেড়ারা সবাই প্রাণভয়ে পালাল, ভেড়াসদৃশ ব্যাঘ্রসন্তানটিও সেই পথ ধরার উপক্রম করতেই, বাঘ পিছন থেকে এসে তাকে টুঁটি টিপে ধরে নিয়ে জলের ধারে গেল, তারপর বল্‌লে—ছাখ, হাঁড়িমুখো তুইও যা আমিও তাই, পালাচ্ছিস কোথায়?—

এই কাহিনীর পরে স্বামীজী বলেছেন আমরা সবাই সেই ব্যাঘ্র শিশুর মতো আমরা যে ব্রহ্মের সন্তান কিন্তু তা ভুলে আছি।

বাঙালী জাতিরও আজ এই অবস্থা আজ আমরা ভেড়ার পালে পড়ে আপন শক্তিতে সন্দিহান হয়েছি, ঐতিহ্য বিস্মৃত হয়েছি।

মহাপুজার দিনটিতে এই সব কথা উচ্চারণ করাও মহাপাপ কিন্তু এই মন্তব্যটি যদি একজনেরও নজরে পড়ে এবং বাঙালী সন্তান হিসাবে তিনি

তাঁর গৌরবভরা অতীত ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করেন তাহলেই আমরা ধন্য হব।

শারদোৎসবের দিনগুলি সকলের কাছে নতুন বাণী বহন করে আসুক, নতুন দিগন্তের সন্ধান দান করুক, মনের পরিধি প্রসারিত হোক, শুধু সীমিত সীমানায় বিচরণ করে আমরা যেন কূপমণ্ডুকের মত সঙ্কীর্ণ দৃষ্টির হাত থেকে ত্রাণ পাই মহাপূজার মহালগ্নে মহাদেবীর শ্রীচরণে এই প্রার্থনা। আয়ু, আরোগ্য, শক্তি, শান্তি, কান্তি, যশ, বিদ্যা; রূপ, বিজয় প্রভৃতি যাবতীয় বস্তুর সঙ্গে এই প্রার্থনাও করি যে মা আমাদের চৈতন্য দাও, যেন আর অন্ধকারে রেখ না।

*　　　*　　　*　　　*

ইতিহাসের পাতায় এই যুগটি কি সত্যই নিকৃষ্টতম, হয়ত এমন দুর্দিন আগে আর আসেনি, এমন জঘন্য দিন কেউ কখনো দেখিনি। ষ্টেটসম্যান পত্রিকার ভূতপুর্ব সহকারী সম্পাদক এবং পরে 'পাঞ্চ' পত্রিকার সম্পাদক হয়েছিলেন মিঃ ম্যালকম মাগারিজ। মাগারিজ একজন জীবন বিতৃষ্ণ লেখক। নিজের চিন্তাভাবনাকে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করতে তাঁর বাধে না। তিনি একটি বিখ্যাত ইংরাজী সাপ্তাহিক পত্রিকায় লিখেছেন—

> "The half-century in which I have been consciously alive seems to me to have been quite exceptionally destructive, murderous and brutal. More people have been killed and terrorized, more driven from their homes and native places, more of the past's heritage has been destroyed, more lies propagated and base persuasions engaged in, with less compensatory achievement in art, literature and imaginative understanding than in any comparable period of history."

ম্যালকম মাগারিজের কথাগুলি চিন্তাশীল মানুষদের একটা নতুন ভাবনার খোরাক দেবে। এই যুগ কি নিষ্ঠুর, মমতাহীন, হৃদয়হীন? এর উত্তর খুঁজে পাওয়া হয়ত কঠিন নয়। শিল্প সমৃদ্ধ দেশগুলির নৈতিক মূল্যবোধ পরিবর্তিত হয়েছে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে, সেই দ্রুতগতির সঙ্গে তাল রেখে আমরা চল্‌তে পারিনি, তাই আজ পুরাতন মূল্যবোধের' মাপকাঠিকে নূতনকে বিচার করতে গিয়ে বিপাকে পড়ি।

অত্যাচার অতীতকালে কিছু কম হয়নি, নৃশংসতা ও বর্বরতার বীভৎসতার যা পরিচয় পাওয়া যায় তা হিটলারের ইহুদীদলন এবং হিরোশিমার বীভৎসতাকে ম্লান করে দেয়। তবে মনে হয় বর্বরতা সেই আদিম যুগের মতই আছে পদ্ধতি ও প্রকরণগুলি কিঞ্চিৎ মার্জিত। পোষাক যত উজ্জ্বলই হোক না কেন,

ভাষা যতই প্রাঞ্জল হোক আসলে কোট-প্যান্টের অন্তরালে আমরা যে ডারউইন আবিষ্কৃত বনমানুষের বংশধর তার পরিচয় পাওয়া যায়। সাম্প্রতিককালে ভিয়েতনামের পথে ও প্রান্তরে যে নিষ্ঠুরতার পরিচয় পাওয়া যায় কোনো অভিধানে কি তার কোনো উপযুক্ত বিশেষণের সন্ধান মিলবে?

* * * *

একজন মধ্যবয়সী মহিলা চীৎকার করে উঠেছিলেন—

"Preposterous! The man is undressing her! Oh how obscene!"

অর্ধ-সজ্জিত অবস্থায় একটি রমণীর পাশে জনৈক পুরুষকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মধ্যবয়সী রমণীর এই অভিব্যক্তি। শিল্পীর পক্ষে পায়ে চলা সহজসাধ্য ছিল না, তথাপি তিনি অতি কষ্টে এগিয়ে এসে সবিনয়ে নিবেদন করলেন:

"Madam, on the Contrary, she is dressing herself."

প্যারিস শহরে উনবিংশ শতাব্দীতে অনুষ্ঠিত বিখ্যাত ফরাসী ইম্প্রেসনিষ্ট শিল্পী অরি ত্যুলোস লুয়েকের এক শিল্প প্রদর্শনীতে এই ঘটনাটি ঘটেছিল। তুল্যেস লুত্রেকের একটি বিখ্যাত ছবির বিষয়বস্তু নিয়েই মধ্যবয়সীর এই মন্তব্য! লুত্রেক বলেছিলেন যে দেখে তার চোখের দৃষ্টিই শ্লীল অশ্লীলের মাপকাঠি।

কি যে শ্লীল এবং কি অশ্লীল এই দ্বন্দ্ব বোধ হয় পিতা আদমের যুগ থেকেই সুরু হয়েছে, এর মীমাংসা সহজ নয়। গতকাল যা অশ্লীল বিবেচিত হত, আজ তা পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ শিল্প বস্তু। স্পেন থেকে শিল্পী গোইয়াকে নির্বাসিত করা হয় অশালীন ছবি আঁকার অপরাধে আজ তাঁর ছবি পৃথিবীর এক মহা আকর্ষণীয় সম্পদ। কয়েক শতাব্দীর পর ফ্যানী হিলের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। ট্রপিক অব ক্যানসার, ইউলিসিস, লোলিতা, লেডী চ্যাটারলী আজ আর অশ্লীল নয়। অথচ সরকার অশ্লীল সাহিত্যের আমদানী বন্ধের জন্য আইন করেছেন। আর বিদাসার (রাজস্থান) সম্মেলনে কিভাবে সিনেমা পোষ্টার এবং সিনেমাকে শ্লীল করা যায় তার জন্য একটা আন্দোলন গড়ে তোলার প্রস্তাব করা হয়েছে। যে কোনো বিষয় নিয়েই যে কোনোরকম আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব এই কথাটিই বিদাসার সম্মেলনে প্রমাণিত হল। আইন বেঁধে অশ্লীলকে শ্লীল করা যায় না।

* * * *

এই সংখ্যার সমস্ত লেখক লেখিকা, পাঠক-পাঠিকা বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীদের আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করি। শারদীয় উৎসবের অবসর আনন্দমধুর হয়ে উঠুক এই প্রার্থনা।

অনশ্বর

প্রেমেন্দ্র মিত্র

দেখি অনেক কিছুই
বিস্ময়ে, অনুরাগে উদ্‌ভ্রান্ত বিমূঢ়তায়।
তুচ্ছ একটি বালির কণা
একদিন চমক লাগায় চোখে,
সকালের সোনালী রোদে
ক্ষীণ ঝলক দেয় বারেক
যেন আমার চোখেই পড়তে।
আকাশছোঁয়া আমার নগর শিখর
অতুল আমার বৈভব আর বিক্রম।
কি দেখব একটা বালির কণায়।
তবু পারি না তাকে হেলায় ফেলে যেতে!
সহসা যেন দেখতে পাই
মহাকালের কৌতুকের হাসিই চমকাচ্ছে
ওই বালির কণাটিতে।
কত ইতিহাস মুছতে মুছতে
ও আছে।
ওর পিছনে বিস্মৃতির কি অনিবার্য প্লাবন!
এক থেকে অগনন হয়ে
পুঞ্জ পুঞ্জ সুষুপ্তির অন্ধকারে
একদিন আমার এ শহর
ও দেবে তলিয়ে!

তখন কি থাকব শুধু
প্রত্নতাত্ত্বিকের তর্ক হয়ে?

তার চেয়ে এই শহরের
সমস্ত হাসি কান্না নিংড়ে
আশ্চর্য একটি রূপকথা
যদি রচনা করতে পারতাম,
কুহেলী জালের মত বিছিয়ে রাখতে নীল শূন্যে,
আর আমাদের সমস্ত খোঁজা, বোঝা ও বোঝার
যন্ত্রনা ও উল্লাস
স্বাতী তারার শিশিরের মত
ভাবীকালের শুক্তিকোষে ঝরিয়ে দিতে !

সুভাষ মুখোপাধ্যায় * বর্ষা গেলে

আমরা বড়রা কেন বার বার
পালিয়ে ঘরে এসে
চোখ মুছি ?
মেয়েটা অবাক হয়,
ভাবে—

আমরা নিশ্চয় কাঁদছি
তা যদি না হবে—
আমাদের চোখে কেন জল ?

বোকা মেয়ে !
কী করে বোঝাই—

কখনও কখনও
চোখের কুয়োর জল তোলে
কান্না নয়
—জ্বালা।

বোকা মেয়ে!
ভিজে কাঠে যখনই ফুঁ দিই
কিছুতে ধরে না আঁচ—
ধোঁয়ায় ধোঁয়ায়
চোখে ধরে জ্বালা।
যেদিকে তাকাই দেখি
সমস্ত ধোঁয়ায় ধোঁয়াকার!
চোখের জ্বালায়
আমরা বাইরে আসি
চোখ মুছি

চোখে আমাদের তাই জল।

জীবনের এই হাল
তা বলে বন্দর নয়—
কেবল বর্ষার ক'টা মাস।

শুক্‌নো কাঠে
গন্‌গণে আগুন হবে
দেখতে দেখতে ভাত—
তখন আবার সব যেখানে যা আছে
ঠিকঠাক
স্পষ্ট দেখতে পাব।

বর্ষা গেলে
কাঠ-কুটো ভিজে সব কিছু
রোদে দেব
রোদে দেব
এমন কি হৃদয়ও॥

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত * বুকের আগুন চেপে

কে কোথায় যেতে চাইবে আর দেখব না
তোমরা যাও তোমরা যাও সব ;
অন্ধকারে তলিয়ে গিয়ে কোথায় প্রবঞ্চনা
দেখব গড়ে দীর্ণ আশার শব।

ভয়ঙ্কর অন্ধকারে সবাই বসে আছি,
ক্লান্তি নামে, বুকে পাথর জমে ;
তোমরা যদি বাইরে যাও আমি বরং বাঁচি,
দীর্ঘশ্বাসের অস্থিরতা কমে।

রোদনভরা বসন্তে কি শ্রাবণধারার ফাঁকে
পুরণো রোদে পুরণো ঘ্রাণে,
বুকের আগুন চেপে
জ্বলছি আর পুড়ছি ইতস্তত,
ভয়ঙ্কর অন্ধকারে সবাই বসে আছি।

যদি যাও ত দরজা খোলা,
বাইরে কলরব ;
তোমরা যাও, তোমরা যাও সব ॥

বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত * কোনো ত্যক্ত ঘরে —

আবার এলাম ফিরে একদিন। করে আকর্ষণ।
কে যেন সর্বদা ডাকে অন্ধকার সেই ত্যক্ত ঘরে—
যেখানে নামেনা হাওয়া, ভৌতিক স্তব্ধতা কাজ করে,
ধুলায় ধূসর মাটি—মানুষের নেই পর্যটন,
সেখানে এলাম ফের। দাঁড়ালাম। বিস্মৃত-স্পন্দন,
অনেক আশ্চর্য সন্ধ্যা, গীতস্রোত-মূর্চ্ছনা ভিতরে
এখানে-ওখানে ঘুরে খুঁজলাম—বহুকাল পরে
স্থানে-স্থানে স্নিগ্ধঘ্রাণ, ধূলিস্তরে লুপ্ত পদাঙ্কন।

নিবিড় জঞ্জাল থেকে, কড়িকাঠে, বিবর্ণ দেয়ালে
সামান্যই ইতিকথা—বিস্মৃত-সমুদ্রতল থেকে
—মণিমুক্তা পাওয়া যায়। প্রেতায়িত ইটের কংকালে
ইতিহাস সাড়া আনে তারপর কুয়াশায় ঢেকে
কোথায় হারায়। শুধু অস্ফুট করুণ হা-হা স্বর
সঞ্চারিত। কাঁদলাম—এলাম-যে কতদিন পর!

জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায় * ছড়া

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
সজ্ঞানে বা অ-জ্ঞানে হোক
লেখেন কয়েক অধ্যায়
পুতুল নাচের ইতিকথা পদ্মানদীর মাঝি
এদের পাশে হাজার পাতা
নেহাৎ মশা মাছি—
পাব্‌লিসিটির জোরে যতই হোক না গলাবাজি ॥

সমর সেনের ঠাট্টা
ঠাট্টা তো নয় গাঁট্টা
মাথায় যখন পড়ে তখন
নিদেন পক্ষে আটটা
শূন্য গড়ের মাঠটা ॥

সুবন্ধু ভট্টাচার্য * স্বগতোক্তি

ভুলে যাইনি, ভুলে যাবোনা, অসম্ভব ভোলা,
স্মৃতির মণি-কোঠায় আছো, কি করে বল ভুলি ?
কেমন করে ফিরিয়ে আনি অতীত দিনগুলি ?
বাহিরে যত আগল দিই, ভিতর দ্বার খোলা।

প্রথম যৌবনের স্মৃতি, হায়, কে বল ভোলে ?
নিজের বুকে গভীর ক্ষত নিজেই সেধে নেওয়া;
নির্জনতা সাক্ষী রেখে বৃথাই মন দেওয়া;
অনুতাপের জ্বালায় মন ধূপের মত জ্বলে।

বাদলদিনে ভেসে আসে লুপ্তদিনের স্মৃতি,
অরণ্য কোন্ মন্ত্রবলে মনের কথা জানে ?
পুষ্পরাজি বলে দিল গন্ধবহের কানে
ভুলে যাইনি, ভুলে যাবো না, তোমার সম্প্রীতি।

অন্ধকারে বৃষ্টি ঝরে সারাটি রাত ধরে
ঝোড়ো হাওয়া কেঁদে বেড়ায়, ভুলি কেমন করে ?

শিবশম্ভু পাল * শবসাধনা

কথা ছিল পর্যটনে যাব।
ছুটির দরখাস্তখানি হাতে নিয়ে রাক্ষসের কাছে যাব এই
কথা ছিল আমাদের। অথচ যাবার আগে আমার বুকের আধখান'
খসে গেল। সামনে পড়ে নিথর নিস্পন্দ দেহখানি,
করবী, তোমার।

কথা ছিল মানচিত্র চিনে নেব শারীরিক ঘনিষ্ঠতা দিয়ে,
আমার আলেখ্য দেখব ভূমধ্যসাগর জলে, তোমার হাসির মধ্যে, আমি
কোলাহলে স্তব্ধতায় ছায়াচ্ছন্ন ফেলে আসা গ্রামে
আত্মপ্রতিকৃতি খুঁজে নিতে পারব, অথচ আমার
চোখের উপর স্তব্ধ শরবিদ্ধ আদরের ভ্রমণসঙ্গিনী।

আমি তাকে বারবার বলে যাব : কথা রাখবই
দৃশ্যহীন শব্দহীন বৈতরণী পারে বসে আমি তপশ্চারী ;
রৌদ্র মেঘ অনাবৃষ্টি বজ্রপাত যত অস্ত্র নিষ্ঠুরের তূণে আছে সব
আঘাতে নিক্ষিপ্ত হোক, পর্যটনে আমরা যাবই।
তোমাকে বাঁচাতে হবে, কেননা আমার বাঁচা ভীষণ জরুরী।

অজিতকুমার মুখোপাধ্যায় * সূর্যাস্ত টিলার নাম

পুবের জানলাটা দাও খুলে। ওদিকে আকাশ
বাঁধা আছে সূর্যাস্ত টিলায়। আমি সূর্যাস্ত
দেখিনি বহুদিন। অনাবৃষ্টি শেষ হয়ে গেছে ;
খাজনার দায়ে বাঁধা বাগানে সমস্ত ফুলগুলি
তোমার আমার মাঝে অপমানে ক্ষোভে ও লজ্জায়
এত দীর্ঘদিন ম্রিয়মান ছিল। আজ তারা আলোকের করাঘাতে
অনুভূতি উৎসগুলি একে একে মেলে দিল সূর্যাস্ত টিলায়।

পুবের জানলাটা খুলে দিলে হয়ত বা তাজা হাওয়া
ডাকে আসা চিঠির মতন মনে হবে। সমস্ত শিরার মাঝে
আপোষে মিলিয়ে যাওয়া অগ্নিকাণ্ড সুরু হবে ফের।
চোখে পড়বে কবিতার দৃশ্যাবলী : স্নায়ুযুদ্ধে কে বা জয়ী হবে।

সূর্যাস্ত টিলার নাম। সব ধুয়ে শ্রাবণের বিপুল বর্ষণে
বিহ্বল আকাশে মেশা। হস্তান্তরিত হওয়ার আগে
কয়েকটি মুহূর্ত শুধু দেখে নেব, বাগানে সমস্ত ফুলগুলি
খাজনার দায় থেকে মুক্ত হয়ে গেছে।

গনেশ বসু * দ্বিতীয় উপস্থিতি

আবার মৃত প্রান্তরে আজ ভয়ংকর
তুললো ঝড়
তোমার উপস্থিতি বুকে, আর শপথ।
ভবিষ্যৎ
হোক না যত বাঘিনীদের তীক্ষ্ণ রাত,
অশ্রুপাত
যদি বা ঘটে কি ভয় তায়? এ ইতিহাস
মিথ্যে তো নয়, থাকনা সামনে সর্বনাশ।

কণ্ঠে এখন তৃষ্ণা উটের তীব্র হয়,
প্রবল ভয়
তখন চোখের স্ক্রিনে দেখি মাকড়সার
হিংস্রতার
কুচকাওয়াজ, এবং ছায়াচ্ছন্নতায়
ভীষণ দায়
পরস্পরের বিপ্রতীপে, হাজার দাঁড়
ছলাৎ ছলাৎ তবু তোমার ভালোবাসার।

ভালোবাসার শব্দে জানি উচ্চাশার
স্কাইস্ক্রাপার
প্রতিরোধের দেয়াল ভেঙে দীর্ঘতর।
অবান্তর
অন্ধকার সমুদ্রেও ফস্‌ফরাস
কী আশ্বাস
প্রবাল জলে, কিন্তু তবু অহঙ্কার
কেমন যেন বিচুর্ণন, শঙ্কা সার।

শঙ্কা জাগে আত্মঘাতী মেঘান্তরে
এবং ঝরে
চতুর্দিকে রক্ত শুধু, কণ্ঠরোধ,
ভ্রান্তিবোধ
এখন ঢাকে মাথার খুলি ভয়ংকর,
অতঃপর
সুনিশ্চিত তোমার যদি পোতাশ্রয়
আমার বুকে, ভালোবাসাও কী দুর্জয়

অতীন্দ্র মজুমদার * বুকের গভীরে

এ ঘরের দেওয়ালের বুক চিরে তীব্র যন্ত্রণায়
কে যেন ককিয়ে ওঠে—'অতীন. 'অতীন'—
কে যেন দিনের সব অকথিত ব্যর্থ বেদনায়,
কান্নায় ফুঁপিয়ে ওঠে—'অতীন', 'অতীন'—

ঘর ছেড়ে মাঠে আসি, যন্ত্রণায় কুঞ্চিত তৃণের
বিবর্ণ ওষ্ঠের থেকে অস্ফুট কান্নায় সেই ডাক—
শুষ্ক দগ্ধ ফলহীন বৃক্ষের সমস্ত পাতায়
সেই একই আকুতির হাহাকার রয়েছে নির্বাক

বিকেলের নদী সেও কান্নায় বিধুর চোখ দুটি
তীরের আঁচল দিয়ে বারবার মুছে নিতে চায়।
গোধূলির ম্লান ছায়া অকস্মাৎ ঘণীভূত হয়ে
অরণ্যের অন্তরালে অন্ধকার হয়ে ঝরে যায়।

অনিবার্য রজনীর কুয়াশার স্তব্ধতায় সব
গাছ মাটি নদী তৃণ একে একে হয়েছে বিলীন—
তখনও পাঁজর-ভাঙা যন্ত্রণায় বুকের গভীরে
কে যেন ককিয়ে কাঁদে—'অতীন', 'অতীন'!

পূর্ণেন্দুবিকাশ ভট্টাচার্য * শব্দিত কুহকে

অন্ধকার ঝিক্‌মিকয় ঝড়ের ধাতব সৈন্যদল!
ফলত উত্তাপ বাড়ে বাতাসের! উদ্দাম ডালপালা
সংগোপনে সমুদ্রের গান শোনে! নেবেছে বাদল
বেতারের অনুষ্ঠানে। নীপবনে মাথুরের পালা!
অথবা উদাসী আলো কোন মনে মেঘের উল্লাস
জাগায়। বিনিদ্র দ্যুতি দুই চোখে বিবিক্ত মেদুর
গান ধরে। বিপ্রতীপ দৃশ্যে ক্ষুব্ধ সহসা কৈলাস
অবিদিত হাত বাড়ায়,—যেন কাছে পেল যক্ষপুর।

আয়ত্তে সকলই যদি, শব্দের স্পন্দিত অন্ধকার
বটগাছের কুয়াশাকে গাঢ় করে পেচকের চোখে,
এবং যেখানে তিক্ত নিমপাতার সুকৃতোর প্রসাদ,
আকাশ নিষ্প্রভ করে স্নায়ুহীন কার্তিকের চাঁদ;
যদিও রাত্রির শেষে শিউলিতলা শিশিরে আলোকে
মনে করবে, কবে ছিল ভালোবাসা, নীল মুক্তদ্বার ॥

মানস রায়চৌধুরী * দূর কল্পনা

কল্পনায়, প্রাচীন শহর আজ তোমার রুমালে লেগে থাকে
আতর, মেওয়ার ঝুড়ি, উজ্জ্বল ওড়নার স্বচ্ছতাকে
একটি আঙুলে তুলে নাও যেন যাদুকর
সমস্ত খেলার সেরা খেলা তুলে ধরে
আমার কিছুই দেখা হয়নি, কেবলই এই দৃশ্যের বিস্তরে
শূন্যতাকে বুঝে নেওয়া যে শূন্যতা ডালিম গাছের ডালে চিরদিন
পাখীদের করে সম্মোহিত
ফুলের নিদ্রায় কিছু সুরভির অধিকার নেই
যেমন তোমার নেই রুমাল হারিয়ে গেলে যাদুর সম্ভার
অথচ কখন এলো আমন্ত্রণ সন্তর্পণে বৈকালী আবিরে
ত্রস্ততায় প্রাচীন ভাস্কর্যে-ঘেরা গম্বুজ, বিশুদ্ধ টাঙা বাজারের
বাদশাহী ভিড়ে···

শচীন দত্ত * নন্দিনীর ডায়েরী থেকে

আব্ছা আলোর প্রলেপে বিকেলের নিঃসঙ্গতা
ছোট্ট ঘরখানার সর্বাঙ্গে। ওদিকে কেউ নেই
অথচ আছে এমনি সব ছায়া-মানুষের
চলা ফেরা, যারা সন্ধ্যে, রাত্রির প্রহর গুন্‌ছে
কিংবা দিনশেষের দিনলিপির অক্ষর সাজিয়ে
গুছিয়ে নির্জন নিস্তব্ধতার অবগাহনের অপরিসীম
অকুণ্ঠ তৃপ্তি পাচ্ছেনা—কিংবা জঠরাগ্নির
নিরন্তর তাড়নার গর্ভে নিঃশেষে বিলীয়মান
যাদের ভালোলাগা, ভালোবাসা

…না, আর্শিতে মুখ দেখতে
পাইনি, কেননা আর্শি ছিলনা। তোমাকে দেখতে
পাইনি, কেননা আলো ছিলনা। অথচ আর্শি-আলোর
মাঝখানে কী-এক উজ্জ্বল উর্মিল বেদনায় শুচিশুভ্র
আমরা আমাদের অবিকল চিনে ফেললাম—
: তুমি কী সুন্দর!

…পরিয়ে দিলাম আমি
তোমার ধবধবে শাদা আদ্দির পাঞ্জাবিটায়
আমার কস্মিনকালের যত্নে রাখা কৌটো খুলে
সাত রাজার ধন চন্দনকাঠের বোতাম। তোমার
হাতের সান্ধ্য প্রসাধনী আমার মুখে চোখে তখন
আদর হ'য়ে নরম তুলির স্পর্শ বুলালো।

টেবিলে রাখা টাইমপিস্ হয়তো তখনো একমনে
আমাদের মাঝখানে বিচ্ছেদের বন্ধ্যা-বিবর্ণ শব্দের
তরঙ্গ তুলছিলো কিন্তু তা' মনে পড়ে কই॥

নচিকেতা ভরদ্বাজ * নিবিড় শূন্যে

আমার নিবিড় শূন্যে কে দিয়েছে আকাশের রঙ,
বিকেলের ব্যাপ্ত শান্তি, রাত্রির নক্ষত্র, নীল নীহারিকা—,
আমি তো জানি না নাম। কবে
এ নীল আকাশ ফের বৃষ্টিপ্রসূ হবে,
আহা আনন্দিত আঁধারে কখন
হৃদয় রহস্য হবে, মৃদু পল্লবিত শত সূর্যের সৌরভে।
আলোছায়া অন্ধকারে সমর্পিত জীবন যৌবন—
নিঃসীম উদার শূন্যে—আকাশের প্রত্নলিপি পড়তে পারি না।
নিজেকে তবুও আজ কেন যেন আকাশের মত মনে হয়।

মাটির বেহালা ভাঙে, জানি এক সময়ের ভয়
আমাদের পরাস্ত করে। তবুও বৃষ্টির ঘরে, রৌদ্রের ঝংকারে
বর্ণের বিপ্লবে আমরা কিছুক্ষণ অপার্থিব হতে পারি কিনা
তারই নানা নিরন্ত আয়োজনে জীবনকে ছুঁয়েছি এখানে
নানাভাবে। তবু বলো—"জীবনকে কে রাখিতে পারে—,
আকাশের গ্রহতারা ডাকিছে তাহারে।"

সুসিত রায় * একই মাত্রার নীচে

আমি চাই না, এই নির্জন রাত্রে
নৈঃশব্দ্যের বুকের ভিতর
হাতে হাত রেখে বসে থাক
আমাদের ভালবাসা।

চেয়ে দেখো, ভাঙা ভাঙা হরপগুলো
কেমন নিশ্চল দৃষ্টি মেলে
আমাদের
নিঃশব্দ মুখের দিকে তাকিয়ে।

আমি চাই
হরপগুলো শব্দ ফিরে পাক
আমি চাই প্রতিটা শব্দ
একই মাত্রার নীচে
কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াক
প্রতিটা কবিতা ধারালো অস্ত্রের মতো
আমি চাই
শয়তানের বুক
এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় ক'রে দিক।

শিপ্রা পাল * কুসুম সঙ্কাশ

একটি আকাঙ্খা শুধু হৃদয়কে প্রদক্ষিণ করে
খদ্যোত হৃদয় যেন যন্ত্রণার ইমনকল্যাণ ;
বিপ্রলব্ধা ত্রিনয়ন প্রতীক্ষায় পঞ্চতপা জলে,
মৃত্যুর অমোঘ মন্ত্রে শুচিস্মিত যৌবনের স্নান।

অথচ আমারো ছিলো যন্ত্রণার হোমাগ্নিশিখায়
হৃদয় জ্বালার ব্রত : ঈশ্বরের শোকার্ত আরাধনা,
বিশ্বের অনন্য খ্যাতি ! দেবতার অলীক বৈভব ;
চৈতন্যের অন্ধকারে মৃত্যুলীণ নিরস্ত বেদনা।

বিশ্বস্ত আয়ুর বৃন্তে কতো ইচ্ছে কতো স্বপ্নসাধ
পূর্ণ হোল না : তবু সেই মন হৃদয়কে ঘিরে
এখনো আকাঙ্খা কাঁপে : সেই শিশু হিরণ্য সকাল,
মনে পড়ে যৌবন সায়াহ্নের সীমান্ত শিবিরে।

স্বয়ংসম্ভবা মাটি ব্যর্থতার ইমন সন্ধ্যায়
কবে আর ধন্য হবে ? এই অশ্রু সঞ্জীবনী শোক ;
সকল আকাঙ্খা ঘিরে জানিনা ফুটবে আর কবে
কুসুম সঙ্কাশ : যার অন্য নাম রক্তের কোরক।

সুনীল হাজরা * স্বপ্নের হরিণ

জীবন জরিপ করে মানচিত্র। স্বপ্নের হরিণ
কত দূর ছুটে গেল যশের হাটের পথে একা,
ক্ষুধার্ত বিড়াল-চোখ, পথে পথে জলন্ত জিজ্ঞাসা;
চিন্তারা সোচ্চার কেন ফুটপাতে ক্লান্ত দেহ রেখে।

কলকাতার মনুমেণ্ট চেয়ে আছে লিপ্সার নিওনে,
ভাড়াটে গাড়িতে রূপোপজীবনী। পুলিশের বুটে—
ক্রমাগত শব্দ ওঠে শেষ হলো বার-এর ব্যস্ততা।

রাত্রির জগৎ হতে ভোরবেলাকার যত হিম
মুখে মেখে, ট্রাম-বাস রাজপথে ছোটে ঊর্দ্ধশ্বাসে,
তখন পারিনি উঠতে গান হয়ে আকাশের দিকে
যদিও পাখির কণ্ঠ শোনা গেল রেড রোডে এসে,
রাত্রির দ্বিধার মতো কুয়াশা পাতায় লেগে থাকে;

ফুটেছে একটি ফুল চোখে তার সপ্রেম চাহনি।
গভীর আকাশে লীন জ্যোৎস্নার বিবর্ণ মুখচ্ছবি।
ভোরের প্রত্যাশা নিয়ে শিশিরেরা হলো কথাকার;
মুগ্ধতার স্বর্ণকণা বিস্তারিত মানচিত্র শেষে।

তবুও জরিপ চলে – চলে বিদ্রুপের পরিমাপ।

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় * ভাড়াবাড়িতে স্বপ্ন

ঘুমের ভিতর জেগে উঠেই দেখলাম
বুকের উপর চলে পুরাতন সাগরের জল,
মনে হল সর্বাঙ্গ শৈবালে ছেয়ে আছে
সিক্ত একা পড়ে আছি পোষাকবিহীন, তলদেশে—
আচম্বিতে, পাতালের ফোয়ারা ঘুরিয়ে তুলে
আন্দোলিত নাচে

লবণকল্লোলে ফোটে সুপ্তসুখ সমুদ্রের মুখের আদল—
আমার আলস্যলিপ্ত শরীরে সে-মুখ
রমণীয় আক্রমণে উৎসুক সজল,
আমার বুকের ঢেউয়ে খুলে রেখে বক্ষোবাস
কোমল পীড়নে তার বুক
ঝুঁকে পড়ে কয়েক লহমাভর শারিরীক উজ্জ্বল উদ্দেশে ;

ঘুম হতে অন্য জাগরণকালে মনে হল ধুয়ে যেতে পারি
অতল উল্লোল মূলে বালির শিকড়ে অবিরল ;
মনে হল ধুয়ে যাবে এই নষ্ট দালাল, গণিকাদষ্ট
ভ্রষ্ট জাল সময়ের দেশাতীত অজন্মা-অঞ্চল
যেন ভেসে যাবে অন্নদাস অন্ধ ক্লীব লোকায়তে
শয্যাশায়ী উনিশটি বছর অক্লেশে।
ঘুমের ভিতর জেগে উঠেই দেখলাম—
চঞ্চল সফেন স্বপ্নে গুঁড়ে গুঁড়ো জোয়ারের জল
বুকের উপর চলে মুক্তধারা ক্ষিপ্রক্ষেপ মিলিত প্রবল,
যেন ঐ তরঙ্গতটিনী দম্‌কা ভেঙে দেয় গুপ্ত আর্তনাদ…

স্পষ্টতম জাগরণে বোধ হল প্লাবিত জলের চলাচল
বেগার্ত সিন্ধুর শ্যাম রসায়নে এনে দেবে উর্বর আবাদ
এরকম ভিখারী স্বদেশে।

রমেন্দ্রনাথ মল্লিক * সকাশে

সবুজ পাতার ভিড় ঠেলে
ভোরের রোদ্দুর এসে ঘাসের নিবিড়ে যবে মেলে
পাখির কাকলি যবে গাছের নীড়ের থেকে ক্রমে
ভোরের আকাশে ওড়ে আপন গানের সম্ভ্রমে।

কটি প্রাণ কেঁদে ওঠে হেসে ওঠে যেন
নিজেদের কোন্ ভাগ্য পরিহাসে কত প্রকারে
বস্তুত চিন্তার যত বিবিধ স্রোতের
অভিমুখী যাত্রা তার নানা বৈচিত্র্যের।

চিত্তলোকে চাঞ্চল্যের কত ঢেউ কত না বিস্তার
পরিতাপ পরিণত চেতনার সিন্ধু-গঙ্গা অথবা তিস্তার।
জীবন-যৌবনচিত্ত নিত্য খোঁজে আপন বন্ধন
সংসার শিবের ধ্যানে তবু কালাপাহাড়ের ধ্বংসের ইন্ধন।

চিত্তের রচিত বৃত্তে যোগযুক্ত কোনো মন কোনো হৃদয়
হয়তো প্রণয়,
আতিশয্য আশ্চর্যের বিস্তৃত বিকাশে
অন্তর আনন্দলোক আসে
একটি কলির বুকে মধুর গুঞ্জনে
হয় তো পাবেই দেখা অন্বেষার শেষপ্রান্তে প্রেয়সী প্রকাশে রঞ্জনে।

জীবনের সৌরভটুকু শবরীর প্রতীক্ষা প্রকাশে—
আদর্শ আশ্চর্য লাগে নেশার সকাশে।

গৌতম গুহ * ভাবনার ঘুমে

আমিও উদাস হয়ে যাই…
আকাশের মতো মেলে দিয়ে গান
ডানায় ডানায় নিজেকে নিঃশেষ ক'রে
যেখানে সীমানা নেই, সময়ের মতো শেষ নেই কোনো ;

ভাবনার গভীরতম ঘুমে ধীরে অচেতন হই
গোপন আশ্লেষে এসে নিঃশব্দে কে বুকে
নির্মল শীতল কুঁয়ো খোঁড়ে
হলুদ খড়ের মতো শুকনো দুচোখ মেলে
তাকে কাছে ডাকি
পালকের মতো স্নেহ ঝরে, কোমল পালক
আমার বুকের ঘ্রাণে তার সব স্মৃতি ঢেকে দিয়ে যাই
ভাবনার গভীরতম ঘুমে জলমগ্ন হলে
বুকের অন্দরে সে নির্মম কুয়ো খোঁড়ে

আমাকে ডুবিয়ে দেয় আততায়ী
অতল আঁধারে
নীরব নির্বোধ
কখনো জানে নি ; কান্না
আবেগ অরণ্যেই মিথ্যার গুপ্তবাদ্য বাজে রাতদিন।

শক্তিব্রত ঘোষ * যে কোন কেন্দ্রে

যে কোন কেন্দ্রে গান থাকে,
যে কোন সৃষ্টি অভিমান :
শুধু রাষ্ট্র ছাড়া, শুধু রাজনীতি,
খাদ্যসমস্যা ও বেশ্যাপ্রীতি,
ছাড়া,—যে কোন হৃদয় বেদগান।

এমন কি যুদ্ধ, আদিহীন ভবিষ্যৎহীন ;
প্রতীকে প্রচ্ছন্ন গ্রীবা চৌরঙ্গীতে
মধ্যদিন :
তার সানাই বেতারে ;
ভাদরের শেষ ভোরে যে ছেলেটা ছাত থেকে পড়ে
জীবন হারালো,
তার শূন্য মায়ের কোলও
অশ্রুবর্ষণের নির্জনতা।

যে কোন কেন্দ্রে গান থাকে,
যে কোন সৃষ্টি অভিমান :
যে কোন মমতা
একসঙ্গে গান
আর প্রথা।

অনিলকুমার ভট্টাচার্য * শরীর

তুমি এলে
কতদিন পরে
স্বপ্ন-সায়রে।

নীল চেতনায়
নির্জন রাত্রির দ্বীপ
দু'একটি তারায়
ছায়ায় ছায়ায়
নেমে এলে
নৈঃশব্দের নিস্তরঙ্গ হাওয়ায় হাওয়ায়।

শব্দ নেই,
স্পর্শ নেই হাজার ভিড়ের
নেই নেই কিছু নেই,
শুধু তোমাতেই
মগ্ন এক প্রতীক্ষায়।

তুমি এলে
নেমে এলে
মেঘের ছায়ায়
ময়ূর পাখায়।
হঠাৎ অবুঝ স্বর
আর্তনাদ হাজার কথার!

নাড়া দেয় হৃদপিণ্ড
কারা বার বার
চেতনারে নাড়া দেয় দুরন্ত হাওয়ায় ৩—
দীর্ঘশ্বাস আর্তনাদ হাজার কথার।

তুমি নেই,
আমি আছি,
আর আছে যন্ত্রনার ভিড়
শব্দের শরীর॥

সমীর ঘোষ * চিল

বার বার জানিয়েছি করুণ মিনতি হৃদয়কে
তুমি হও চিল।
কাঞ্চনজঙ্ঘার কোলে দেবদারু বন,
বৈকালের জলমাখা শৃঙ্গ আলতাই,
আরো যদি দূরে যাই আন্দেজ পাহাড়,
অথবা তুষার রোদে ঝকমকে রোম্যান্টিক
কিলিম্যান্‌জারোয়,
স্বপ্নের অনেক দূর ঈথারের বিমান পাখায়
পার হোয়ে চলে যায় আলো যবনিকা

আকাশের নীল অনর্গল—
তুমি সেই হোয়ো না ঈগল।

তোমার চোখের কাঁচে নাই ঝলসালো
ইতিহাসে-পড়া সেই আশ্চর্য অদ্ভুত
কারাকোরামের পথ,
সিডার কি নারিসাস ছায়া মাখা,
বরফের জলে-ফোঁটা
সুগন্ধ সুন্দর।
নীল কি কটাসে চোখ কাজলের স্বাভাবিক ঘর,
আঙুরের ফেটে-যাওয়া উপচানো রসের মতোন
হোয়ো নাকো ঘনফেনা মন—
চাঁদের সমুদ্রে ভেসে মিনিটে মিনিটে
হোয়ো নাকো চন্দ্রনীল রাত।
হে হৃদয়, হয়ো না ঈগল
—আমি সেই সুদূরের দিই নি বরাত।

হে হৃদয় পারো যদি হও চিল।
চকলেট রঙ ছাড়া আরো থাক
কিছু সাদা রেখা,
কিছু থাক অজানা অদেখা
ভারি গরমিল।
—অথচ এ জীবনের বাইরের রকে
ঠোঙার খাবারে দিয়ে ঠোঁট
পায়ের নখের সাথে ডানা মেলে দিয়ে
একটি সেকেণ্ডে সব ওলোট পালোট।
তারপর ভাঙা কোনো কার্নিশের
অনেক উঁচুতে
চিল-ও চিল-ও ডাক—
চোখে তার ইথারের স্বপ্ন লেগে নেই
—সংসারের পাশে বসে অথচ অনেক দূরে
চলে যেতে পারে সে বেবাক।

হে হৃদয় তাই ভয় হয়,
যদি হও অকস্মাৎ আলোর ঈগল।
তোমার সে পাইনের পাতায় পাতায়
আন্দেজ কি আলতাই পাহাড় চূড়ায়
অনেক অনেক বড়ো দিন—
কিন্তু এ জীবনের আশে পাশে থেকে
ক্ষুধাতুর লোভাতুর
পাওনা-আড়াল-করা
দিন গুণে গুণে
কেঁপে কেঁপে মরে মরে ভয়ে ভয়ে বেঁচে উঠে
অপুর্ব রঙীন
হবে কি সে কার্নিশের চিল ?

হে হৃদয় ভাবি তাই যাবে কি সে
কিলিম্যান্‌জারোয় ?
অথবা সে জাফরান-মাখানো ভূ বুকে,
ব্রীহি গোধূমের পারে দ্রাক্ষাবন বেয়ে
ক্ষীণকটি গুরুভার উরু।
তার চেয়ে আচমকা ছোঁ মেরে ঠোঙায়,
পায়ের থাবায় নিয়ে হাসি কি কান্নায়
চেয়ে দেখা একটু আকাশ—
শূন্যের সমুদ্রে নয়,
ক্ষুধা লোভ মেখে
কার্নিশের পারে যদি পারি নিই
অন্য কোনো আকাশের কিছু বা তল্লাশ
ছড়ানো শিথিল—
আলোর ঈগল নয় নয়—
হে হৃদয়, ছোট কোনো চিল !!

ডঃ লোকনাথ ভট্টাচার্য

সাহিত্যের মরু ও ভিয়েৎনাম

'কণ্ঠ আমার রুদ্ধ আজিকে……', ইত্যাদি ইত্যাদি, এককালে বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ; বলেছিলেন, 'নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিশ্বাস…', এবং কত উপলক্ষ্যে দুর্দম ক্রোধের, অভিশাপের, মরীয়া ক্ষোভের এ-ধরণের আরো কত কালজয়ী বাণী। কিন্তু যে-আমরা রবীন্দ্র-সাহিত্যের চর্চা আজ ছেড়ে দিয়েছি, তবু কারণে-অকারণে রবীন্দ্রনাথের দোহাই পাড়ি সর্বত্র, রবীন্দ্র-নাথের সাহস ও আদর্শের দ্বারা কতটুকু উদ্বুদ্ধ সেই আজকের আমরা! সভ্যতার বিবর্তনে কোন দুর্নিবার সংগীতের পদধ্বনি শুনে মাত্র কয়েকটি বৎসরের ব্যবধানে হুবহু একই দেশ এবং প্রায় হুবহু একই সমাজ কী ক'রে জন্ম দিতে লালায়িত হয় রবীন্দ্রনাথের মত সর্বদেশের ও সর্বকালের এক ক্ষণজন্মা মানবকে ও একই সঙ্গে আজকের আমাদের মত এই সকল শিরদাঁড়াহীন, নপুংসক, আয়েশী ও শুধু কতকগুলো তুচ্ছ ও মারাত্মকভাবে স্বার্থপর ব্যক্তিগত সুযোগ-সুবিধায় উন্মত্ত সন্ধানী বাঙালী কবি-সাহিত্যিক দল,—তার চুল-চেরা বিশ্লেষণের দায়িত্ব চোখ বুজে ইতিহাস বা সমাজতত্ত্ববিদদের হাতে ছেড়ে দিলেও লেখক হিসেবে—এবং তার চেয়ে যা বড়, মানুষ হিসেবে একটা প্রচণ্ড প্রশ্ন আমাদের সামনে থেকে যায়ই। এবং অল্প কথায় সেই প্রশ্নটি হ'ল

এই : এক বৃহত্তর (অর্থাৎ, যা নিছক ব্যক্তিগতের ধ্যান-ধারণা-অভিনিবেশের গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ নয়), মহত্তর অর্থ যে-সাহিত্য মানবমুখী নয়, সে-সাহিত্য হাজার পাঁয়তাড়া ক'ষেও, ভঙ্গী বা আংগিকের অযুত-লক্ষ-নিযুত-কোটি চোখ-ঝলসানো কসরতি দেখিয়ে বাজি মাৎ ক'রেও সৃষ্টিশীল সাহিত্যের সংজ্ঞা কোনোদিন অর্জন করিবে না।

ঘুরিয়ে নাক দেখানোর প্রয়োজন নেই, কথাটাকে সোজাসুজিই পাড়া যাক। গত কয়েক বছর ধ'রে ভিয়েৎনামে এক নৃশংস হত্যার তাণ্ডব লীলা চলেছে—যতই দিন চলেছে, সে-লীলা ক্রমশই নৃশংস থেকে নৃশংসতর আকার নিচ্ছে, এবং সেই লীলার একমাত্র নট মার্কিন সমরবাহিনী। অর্থ ও শক্তির দম্ভপিশাচ মানুষের এমন নখদন্তের সমারোহ পৃথিবীর ইতিহাসে আগে কখনো দেখা গেছে বলে জানি না। আমি বা আমরা কম্যুনিজম পছন্দ করি কি না, সে-প্রশ্ন এখানে অবান্তর, কারণ ভিয়েৎনামের যুদ্ধ এর চেয়ে বহুগুণে প্রচণ্ডতর যে প্রশ্নটা তুলেছে, যেটাকে আর না দেখে বা স্বীকার না ক'রে উপায় নেই, সেটা একেবারে সমগ্র মানুষের মনুষ্যত্ববোধ নিয়েই। অথচ একটি-দুটি নমস্য ব্যতিক্রম বাদ দিলে আমাদের কোনো কবি-সাহিত্যিককেই দেখি না এর সম্বন্ধে উচ্চবাচ্য করতে। কেন? এ নয় যে আমরা অজ্ঞ, খবর পাই না, সে-খবর যতই একপেশে হোক না কেন—সেই যুদ্ধের বহু অমানুষিক অত্যাচারের কাহিনী রক্তের অক্ষরে লিখিত আমাদেরও চোখের সামনে।

এখানে জানি, বাংলাদেশের অনেক নীতিবাগীশ ও তথাকথিত বিদগ্ধ সাহিত্যরসিক হৈ হৈ করে চেঁচিয়ে উঠবেন, ঐ রবীন্দ্রনাথেরই দোহাই আবার পাড়বেন, বলবেন, ছি ছি, সাহিত্যের নামে সাংবাদিকতা করতে চাও, সাহিত্য আর রাজনীতিকে এক ক'রে মেলাতে চাও? তাঁদের প্রতি এই সবিনয় নিবেদন হবে তখন: এটা রাজনীতি নয়, সাহিত্যেরও প্রশ্ন, কারণ এটা ভয়ংকর ভাবে মানুষকে নিয়ে প্রশ্ন, তার আশা-অভীপ্সা প্রেম নিয়ে প্রশ্ন, তার ন্যায়-অন্যায় নিয়ে প্রশ্ন। এ যদি সাহিত্যের বা সাহিত্যিকদের বিষয়বস্তু না হয়, তা'হলে কোন মুখে আমরা আসি রবীন্দ্রনাথকে বা তাঁর মত অন্যান্য মহাপুরুষদের শ্রদ্ধা নিবেদন করতে? আমাদের লজ্জা করে না? ব্যক্তিগত-ভাবে মনে হয়, আজ লজ্জাও নাই অধিকাংশ বাঙালী কবি সাহিত্যিকদের। হয়তো ততটা লজ্জাও নয়, হয়তো তাঁরা ধীরে ধীরে নিঃসাড়, নির্জীব হ'তে চলেছেন, হয়তো তাঁদের প্রাণগঙ্গা শুকিয়ে এসেছে—আর জাগতে পারছেন না, পাশের ভাইয়ের কী হচ্ছে, তা চোখ মেলে দেখতে চাইছেন না।

কিন্তু তাঁদের নির্জীব বা নিঃসাড়ই বা কেমন ক'রে বলি! মাত্র কয়েকমাস আগেই, ঐ রবীন্দ্রনাথেরই গত জন্মোৎসব উপলক্ষ্য ক'রে, দেখলাম তো তাঁদের প্রাণপণে সাড়া জাগানোর ব্যর্থ উদ্যমের ব্যাপারটা—কবিতা নিয়ে কী বালখিল্য মাতামাতিই না করলেন! দৈনিক তো দূরের কথা, ঘণ্টায় ঘণ্টায় এমন কবিতা-পত্রিকা প্রকাশ নাকি সারা পৃথিবীতে অশ্রুতপূর্ব; এমন বিজ্ঞাপনও কানে তালা ধরিয়ে চীৎকার ক'রে জানাতে তাঁরা ছাড়লেন না। সেই হাস্যকর ও মর্মান্তিক করুণ উদ্যমে দুয়েকজন প্রৌঢ় কবিকেও দেখলাম শিং ভেঙে বাছুরের দলে ঢুকতে। এ সব কাণ্ডের আগেই, এই ধরণের কবিদের উদ্দেশ ক'রে একটা লংকা-মরিচ মেশানো কবিতা লিখেছিলাম, যেটা এখানে সবিনয়ে উদ্ধৃত করার লোভ সামলাতে পারলাম না।

প্রার্থনা

দুনিবার দেওদার অরণ্য পাওয়ার নেই, হয়তো তাই জেনেই কবিতা লেখা
বন্ধ ক'রে ওরা সুগন্ধ সাবানের ফ্যাক্টরি খুলল।
আমিও স্নান করিনি বহুদিন, তাই যখন শুনলাম, বললাম, ভালোই
করলে।
আমিও আমার অশুচিতায়, নিজেরি দুর্গন্ধে-উপদংশে অবাক হয়েছি
অনেক। নর্দমানিবিড় মহানগরীর ঘৃণ্য মরণে মুখর ধ্বনি আমাদের
শিরায়, সেই ড্রেনের গঙ্গায়।
আছে আকাশ জানি, আছে কমলারঙের রোদ, তবু আর নেই কবিতা
জীবনে, নেই মনে—শুধু কবির নামে অকবির অগভীর দৌরাত্ম্য আছে।
পাল পাল গাধার বড় বড় কান হাওয়ায় নড়ছে। মিথ্যুক, দাম্ভিক,
বাচাল গাধা, নপুংসক। পুরুষাঙ্গ ওদের প্রকাণ্ড কাঁচি দিয়ে কাটো।
এর চেয়ে ভালো নিথর নীরবতার রাত, আশাহীন নিষ্প্রভাত। হে ঈশ্বর,
নীরবতা দাও, এই অকবিগুলোকে চুপ করাও, আর ঐ শ্রদ্ধানন্দ
পার্কের লাউডস্পীকারকে।
হে ঈশ্বর, প্রেম দাও ভাইকে ভালোবাসার, ভাইকে প্রেম দাও আমায়
ভালোবাসার, দাও সহজ শুচিতার গন্ধ মনের নাসিকায়—কবিতা
পরে হবে।

অবশ্য আমাদের দেশে যাই হোক না কেন, অথবা কিছুই না হোক, ভিয়েৎনাম নিয়ে দেখছি দেশবিদেশের সাহিত্যিকদের মধ্যে সাড়া প'ড়ে গেছে,

এবং এইসব দেশ বা সাহিত্যিকদের কোনোক্রমেই কম্যুনিষ্ট আখ্যা দেওয়া চলে না। বলা বাহুল্য, কম্যুনিষ্ট লেখকেরাও এর মধ্যে আছেন, খুব জোরের সঙ্গেই আছেন, তবে তাঁদের বর্তমান আলোচনায় টানছি না শুধু এই কারণেই যে পাছে সন্দিগ্ধ পাঠক সাহিত্যিক প্রসঙ্গে আবার রাজনীতির ঘোলা জলের গন্ধ আবিষ্কার করতে প্রয়াসী হন। ফ্রান্স-ইটালী-ইংল্যাণ্ডের কয়েকটি বিশুদ্ধ সাহিত্য-পত্রিকায় প্রায় প্রতি সংখ্যাতেই দেখছি কোনো না কোনো আকারে ভিয়েৎনাম প্রশ্নের অবতারণা বা তা নিয়ে তর্ক, আলোচনা। এ-ধরণের আলোচনা যে কত বিচিত্র রূপ নিতে পারে, তার ইয়ত্তা নেই। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, এক প্রখ্যাত অ-কম্যুনিষ্ট ফরাসী সাপ্তাহিকে এই মুহূর্তেই চলছে বিরাট চিঠির যুদ্ধ—সিনিয়াভস্কি ও দানিয়েল নামে যে-দুজন লেখককে রুশ সরকার দোষী সাব্যস্ত ক'রে বন্দী করেছেন, তাঁদের সঙ্গে এক ইতালীয় সাংবাদিকের সাক্ষাৎকার অন্য একটি ফরাসী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, তর্কের সুরু এই ঘটনাতেই। সেই অন্য ফরাসী পত্রিকাটির মার্কিন-প্রীতি যেহেতু বহু বিদিত, এবং যেহেতু মার্কিন অর্থসহায়তার দরুণই সেই পত্রিকাটির প্রচার নিতান্ত সামান্য নয়, উপরিউক্ত প্রথম সাপ্তাহিকের এক লেখক এই সন্দেহ একবার প্রকাশ ক'রে বসেন যে ভিয়েৎনাম-যুদ্ধের এই ঘূর্ণিক মুহূর্তে রাশিয়ার কেচ্ছা প্রকাশ ক'রে আমেরিকার প্রেমিকরা পরোক্ষে সান্ত্বনা খুঁজতে চান। যেই না এই সন্দেহ একবার প্রকাশ হওয়া, সঙ্গে সঙ্গে যেন ভীমরুলের চাকে ঢিল পড়ল—বিপক্ষদল কোমর বেঁধে এগিয়ে এলেন, বললেন, ভিয়েৎনাম ও রাশিয়া-কৃত বন্দী লেখক, এ-দুটি বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে কোনো সম্পর্ক খুঁজতে চাওয়া অন্যায়। তবু এই তর্কাতর্কির মধ্যেও, ভিয়েৎনাম-যুদ্ধ যে আসলে সত্যিই একটা অত্যন্ত জঘন্য ব্যাপার, তা অল্পবিস্তর সকলেই মেনে নিচ্ছেন। সব থেকে আশ্চর্য হ'ল এই যে, যে-মার্কিন প্রীতিবদ্ধ দ্বিতীয় ফরাসী পত্রিকাটির কথা আগে উল্লেখ করেছি, তার সম্পাদকও মাঝে মাঝে ভিয়েৎনাম সম্বন্ধে এমন দুয়েকটি আলোচনা প্রকাশ করতে বাধ্য হন যা সরকারী আমেরিকার পক্ষে খুব মুখরোচক নয়। তা ছাড়া উপায়ও নেই, কারণ ভিয়েৎনাম সম্বন্ধে ফ্রান্সের লেখক সাধারণের মতামত ইতিমধ্যেই একটি নিশ্চিতির রূপ নিয়েছে।

এ ধরণের আরো অজস্র উদাহরণ একটার পর একটা দেওয়া যেতে পারে নানা দেশ থেকে, নানা দেশের সাহিত্যিকদের ক্রমবর্ধমান লেখা বা আলোচনা হ'তে। আর অন্যান্য দেশের প্রসঙ্গেরই বা দরকার কী, চোখ ফেরানো যাক না

হয় আমেরিকার দিকেই, এই নৃশংস হত্যালীলার যে-একমাত্র নট, তার উপরই। বলছেন আর্থার শ্লেসিঙ্গার—প্রেসিডেণ্ট কেনেডির এককালীন মুখ্য সহকারী ও 'কেনেডির হাজার দিন' নামক গ্রন্থের প্রণেতা—ভিয়েৎনামকে কেন্দ্র ক'রে আমেরিকায় নাকি এক নতুন ধরণের ম্যাকার্থিজমের সূত্রপাত হচ্ছে ইদানীং। কারণ এই যুদ্ধ সম্বন্ধে বহু মার্কিন বুদ্ধিজীবী নাকি ক্রমশই বিমুখ হচ্ছেন, কিন্তু সরকারী চাপ এত প্রচণ্ড যে মুখ খুলতে সকলেরি ভয়। সেই চাপ যে আমেরিকান জাতীয় জীবনের কত গভীরে গিয়ে পৌচেছে, তার প্রমাণ পাওয়া যাবে এই ঘটনাটিতে : ফিলাডেলফিয়ার এক বিচারপতি নাকি সম্প্রতি প্রস্তাব করেছেন যে, যে-ছাত্রছাত্রীরা ভিয়েৎনাম-যুদ্ধের কোনো প্রতিবাদ-আন্দোলনে মাত্র একবারও যোগদান করেছে, তাদের যেন অবিলম্বে কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় হ'তে বহিষ্কৃত করা হয়। কিছুকাল আগেই নাকি আমেরিকান শিক্ষক সংঘও এক অধ্যাপককে সভ্যপদচ্যুত করেন এই কারণে; অধ্যাপকটি ভিয়েৎনাম সম্পর্কে আমেরিকান রাষ্ট্রনীতির বিরোধী, এবং তাই তিনি তাঁর শিক্ষালয়ের এক অনুষ্ঠানে জাতীয় পতাকাকে অন্যান্য সমবেত জনতার মত নমস্কার না ক'রে দাঁড়িয়ে থাকেন। এই রকমের বহু সাম্প্রতিক ঘটনা, শ্লেসিঙ্গার জানাচ্ছেন, ম্যাকার্থি-যুগের কুখ্যাত 'ডাকিনী-তাড়ানোর' কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

তবু এত সত্ত্বেও, সেই আমেরিকাতেও, কবি-সাহিত্যিকরা ব'সে নেই—তাদের একটি সংখ্যালঘু কিন্তু অতি উজ্জ্বল সর্বজনশ্রদ্ধেয় অংশ এই যুদ্ধের প্রতিবাদে ক্রমশই মাথা তুলছেন দৃঢ় সঙ্কল্পে। দেখে ভালো লাগল, এঁরাই হয়েছেন আলোচ্য বিষয় লণ্ডনের 'Times Literary Supplement'-এর ইদানীংকার এক সংখ্যার প্রধান সম্পাদকীয়ের। সুরুতেই সম্পাদক জানাচ্ছেন : 'In our recent special number, "Sounding the Sixties—U. S. A.," we suggested that if the graphic emblem of American culture and society in the 1950s might well have been Mr. Eisenhower humming his favourite piece of music, the "Indian Love Call", the image now would be of Robert Lowell or Arthur Miller turning down an invitation to the White House "not because Mr. Kennedy is no longer there to greet them—though that counts grimly—but because Vietnam is now the business of poets.",

ঐ সম্পাদকীয়তেই আছে নমস্কার এই মহান খবরটির প্রতি : আমেরিকান

সাহিত্যিকেরা আজ অন্তরের দুর্জয় শক্তিতে সম্পন্ন হ'য়ে ভিয়েৎনাম-যুদ্ধের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হচ্ছেন। বিশেষতঃ সেখানকার কয়েকজন মুখ্য কবি (যাঁদের মধ্যে আছেন রবার্ট লোয়েল, লরেন্স ফার্লিঙ্গেত্তি, ডোনাল্ড হল, উইলিয়াম স্ট্যাফোর্ড, জন লোগান, লুই সিম্পসন, জেমস রাইট ও আরো অনেকে) ইতিমধ্যেই এক প্রচণ্ড আন্দোলন স্নুরু ক'রে দিয়েছেন—'Against Vietnam Movement'। 'সিট-ইন'-এর ঐতিহ্য অনুসরণ ক'রে 'রীড-ইন' স্নুরু হ'য়ে গেছে, বিরাট বিরাট সভায় কবিরা তাঁদের স্বরচিত কবিতা পাঠ করছেন কখনো রীড কলেজে, কখনো পোর্টল্যাণ্ড ষ্টেটে, কখনো ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ে ; কখনো বা হার্ভার্ড, কোলাম্বিয়া, প্রিন্সটন ও ফিলাডেলফিয়াতে। এ-ধরণের কোনো কোনো কবিতা-পাঠের সভা চলতে থাকে তিন-চার ঘণ্টা ধ'রে সমানে, এবং সেখানে যে সব কবিতা পড়া হয়, তাতে রাজনীতির বাড়াবাড়ি কোথাও নেই, প্রোপাগাণ্ডার গণ্ডারের বিদঘুটে গন্ধ নেই, তাতে একমাত্র যে-অঙ্গীকার নিহিত মেঘাচ্ছাদিত বজ্রের মত, তা (দেশবিদেশের সাহিত্যরসিকরা শুনে প্রীত হবেন) সুস্থ সবল সাহিত্যেরই। তাঁর এমন একটি কবিতায় লুই সিম্পসনকে বলতে দেখি :

> **'Every day I wake far away**
> **From my life, in a foreign country.**
> **These people are speaking a strange language.**
> **It is strange. I think, even to themselves.'**

এই ক'টি পঙক্তির মধ্য দিয়ে প্রকাশিত যে-স্থির স্তব্ধ বিস্ময়, যে-মূক মূঢ় তিক্ততা, যে-সংযত আত্মিক গ্লানি, তার অনেকখানিই আজ বহু চিন্তাশীল আমেরিকান কবি-সাহিত্যিককে বিচলিত করতে সুরু করেছে। এঁরাই আমেরিকার আশা, এবং আমাদেরও সকলের নমস্য।

কিন্তু আমরা, এই বাঙালী কবি সাহিত্যিকেরা, এই ভারতীয়রা? ভিয়েৎনাম-যুদ্ধে আজ যখন দেশে দেশে সমগ্র মানুষের বিবেক ক্ষতবিক্ষত, তখনো কি আমরা শুধু ব্যক্তিগত খোস-পাঁচড়ার চুলকানিতে ব্যস্ত থাকব? বাংলাদেশের, ভারতবর্ষের, বুঝি টুঁ শব্দটিও করার নেই, কোনো দায়িত্বই নেই। রবীন্দ্রনাথেরই দোহাই পেড়ে বলি আবার :

'সে কি রহিল লুপ্ত আজি সব জন-পশ্চাতে?'

জয়দেব বন্দ্যোপাধ্যায়

অবনীন্দ্রনাথ ও বাঙ্গালা গদ্য

বাঙ্গালা গদ্য রচনার যে সাহিত্যিক আদর্শ—Standard তা আমরা বঙ্কিমের হাত থেকেই লাভ করেছি। তাঁর অসামান্য প্রতিভার স্পর্শে বাঙ্গালা গদ্য যে কতখানি সুন্দর, উন্নত এবং বলিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল, সবদিক থেকেই তার পরীক্ষা এবং প্রমাণও প্রায় হাতে হাতেই পাওয়া গিয়েছিল। কারণ, বাঙ্গালার নব-জাগৃতির যে প্রবল এবং ব্যাপক প্রবাহটি সাহিত্য-দর্শন-বিজ্ঞান-অর্থনীতি-সমাজ-নীতির নানা ধারায় বিপুল বেগে ছুটে চলেছিল তার সমস্ত প্রচণ্ডতাকে অবলীলায় ধারণ করেছিল বঙ্কিম-রচিত বাঙ্গালা গদ্য-রীতি। অর্থাৎ বাঙ্গালা গদ্যকে বঙ্কিম শৈশব থেকে একেবারেই পরিণত যৌবনে উত্তীর্ণ করে দিয়ে গিয়েছিলেন। আর ভাব-প্রকাশের এই মুক্তধারাকে অবলম্বন করেই হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, রামেন্দ্রসুন্দরের মতো মনীষীরা তাঁদের প্রতিভা, জ্ঞান ও কর্মের সমস্ত সোনার ফসল আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথও বঙ্কিম-নির্মিত ভাষার এই আদর্শকে গ্রহণ করতে দ্বিধা করেন নি। যদিও বঙ্কিমের গদ্যে এবং রবীন্দ্রনাথের গদ্যে পার্থক্য আসমান্-জমিন্। কিন্তু সে পার্থক্য দুই অসামান্য প্রতিভাধরের ব্যক্তিত্বের পার্থক্য,

style-এর পার্থক্য, দৃষ্টিভঙ্গি, উপলব্ধি এবং দর্শনের পার্থক্য। স্বাতন্ত্র্যে রবীন্দ্রনাথের মতো না হলেও, বঙ্কিম রীতিকে গ্রহণ করে বহু লেখকই তাঁদের নিজ নিজ রচনায় একটি বৈশিষ্ট্য আরোপ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সাহিত্যিক অবনীন্দ্রনাথকে এই বিশিষ্টদের সমশ্রেণীতে ফেলা যায় না। কেননা, সাহিত্যে তিনি এতই original যে তাঁর রচনাকে বাঙ্গালা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাসে একটি স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদই বলতে হয়।

বাঙ্গালা সাহিত্যের আসরে অবনীন্দ্রনাথের আবির্ভাব ১৩০২ সনে। ততদিনে শিল্পী হিসেবে তিনি খ্যাতির শীর্ষবিন্দু স্পর্শ করেছেন। বলা বাহুল্য, এই প্রতিষ্ঠা শিল্পাচার্যের জীবনে অনায়াসে ঘটে নি। কঠোর সাধনা ও সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে অন্তরে বাহিরে নৈরাশ্য ও বিফলতার নিষ্ঠুর প্রহারে তাঁর হৃদয় বিদীর্ণ হয়েছে। কিন্তু তারই ফলে সুন্দরের সেই পরম উপলব্ধিটি লাভ করেছিলেন তিনি—সকল শিল্পীরই যা অন্বিষ্ট—যা পেলে কলা-লক্ষ্মীর কুঞ্জে কুঞ্জে স্বচ্ছন্দ-বিহারের সকল বাধা ঘুচে যায়।

তাই রবীন্দ্রনাথ যেদিন তাঁর হাতে কলম তুলে দিয়ে বললেন, "তুমি লেখো না, যেমন করে তুমি মুখে মুখে গল্প কর তেমনি করেই লেখো", সেদিন সুন্দরের সেই আমন্ত্রণে সাড়া দিতে অনুমাত্রও দেরি হয় নি অবনীন্দ্রনাথের। বাঙ্গালা ১৩০২ সনে তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'শকুন্তলা' প্রকাশিত হয়। দেখা গেল এক পরিণত কথাশিল্পী একেবারে যেন প্রস্তুত হয়েই তাঁর মধ্যে অপেক্ষা করছিল মহাকবির মুখ থেকে ঐ সাহসবাণীটুকু শোনার জন্যে। সাহস না পেলেও তাঁকে আসতে হত। তাঁর শিল্পী-সত্তা তাঁকে শান্তি দিত না। রবীন্দ্রনাথকেও দেয় নি আজীবন নানা মাধ্যমে শিল্পসেবা করেও অনেক কথাই বাকী থেকে গিয়েছিল তাই শেষবয়সে রং-তুলি ধরতে হয়েছিল তাঁকে। বহুমুখী প্রতিভার ক্ষেত্রে এ অভিজ্ঞতা কিছু নতুন নয়। অবনীন্দ্রনাথও তুলি ফেলে কলম ধরলেন। কারণ, আরও যে কথা তিনি বলতে চান, ঈজেলের বুকে রঙের টানে টোনে তাকে আর বলা গেল না।

কিন্তু বিস্ময়ের কথা হলো এই যে, ভাষা তাঁর হাতে আরেকপ্রস্থ রঙের সরঞ্জামে পরিণত হল। কথা দিয়ে তিনি রঙ ফোটালেন। ছবি এঁকে চললেন একের পর এক 'ক্ষীরের পুতুল', 'রাজকাহিনী', 'ভূতপত্‌রীর দেশ', 'নালক', 'খাতাঞ্চির খাতায়'। ইতিহাসের উপাদান, পৌরাণিক কাহিনী, বিদেশী রূপকথা, ঠাকুমা-দিদিমার মুখের বুদ্ধু-ভুতুম, গ্রাম্য ছড়া যেখানে যা কিছু ছিল ছবি লিখিয়ে অবন ঠাকুরের যাদু-হস্তের স্পর্শে সে সমস্ত এক অপরূপ রূপকথার

জগৎ সৃষ্টি করল। যেখানকার মানুষ-পশু-পাখি-গাছপালা-পাহাড়-নদী সব মিলে যেন এক রঙ-বাহার শোভাযাত্রা। পড়তে পড়তে মনে হয় সব যেন মিছিল করে চোখের সামনে দিয়ে গান গাইতে গাইতে এগিয়ে চলেছে।

মহর্ষি কণ্বের শান্ত, স্নিগ্ধ আশ্রম এমনি একটি চিত্রময় শোভাযাত্রা। যেখানে, "এক নিবিড় অরণ্য ছিল। তাতে ছিল বড় বড় বট, সারি সারি তাল-তমাল, পাহাড় পর্বত, আর ছিল—ছোট নদী মালিনী। মালিনীর জল বড় স্থির—আয়নার মতো। তাতে গাছের ছায়া, নীল আকাশের ছায়া, রাঙা মেঘের ছায়া—সকলি দেখা যেত। আর দেখা যেত গাছের তলায় কতগুলি কুটিরের ছায়া। নদীতীরে যে নিবিড় বন ছিল তাতে অনেক জীবজন্তু ছিল। কত হাঁস, কত বক, সারাদিন খালের ধারে, বিলের জলে ঘুরে বেড়াত। কত ছোট ছোট পাখি, কত টিয়াপাখির ঝাঁক গাছের ডালে ডালে গান গাইত, কোটরে কোটরে বাসা বাঁধত। দলে দলে হরিণ, ছোট ছোট হরিণ শিশু, কাশের বনে, ধানের খেতে, কচি ঘাসের মাঠে খেলা করত। বসন্তে কোকিল গাইত, বর্ষায় ময়ূর নাচত।"

এই হলো অবনীন্দ্রনাথের 'শকুন্তলা'। সেই একই পৌরাণিক উপাখ্যান যাকে অবলম্বন করে আর এক মহাকবির 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা' কালজয়ী হয়েছে। অবনীন্দ্রনাথের হাতে সেই উপাখ্যানই রূপকথার পক্ষীরাজে চড়ে শিশু মনের সুরলোক জয় করল। 'ক্ষীরের পুতুল' তো আগাগোড়া একখানি নিখাদ রূপকথা। পড়তে পড়তে শৈশব স্মৃতির সঙ্গে ঠাকুরমার সেই কম্পিত মধুর কণ্ঠ যেন আবার কানে গুঞ্জন তোলে। ষষ্ঠী ঠাকরুণের আপন দেশের সেই ছবিটি আবার একটু দেখা যাক—

'ষষ্ঠী ঠাকরুণ বানরের চোখে হাত বোলালেন—বানরের দিব্যচক্ষু হলো। বানর দেখলে—ষষ্ঠীতলা ছেলের রাজ্য···সে এক নতুন দেশ, স্বপ্নের রাজ্য সেখানে কেবল ছুটোছুটি কেবল খেলাধুলো, সেখানে পাঠশালা নেই, পাঠশালের গুরু নেই, গুরুর হাতে বেত নেই, সেখানে আছে দিঘীর কালো জল তার ধারে সর বন, তেপান্তর মাঠ তারপরে আম কাঁঠালের বাগান, গাছে গাছে ন্যাজঝোলা টিয়েপাখি, নদীর জলে গোল-চোখ বোয়াল মাছ, কচুবনে মশার ঝাঁক আর আছে বনের ধারে বনগাঁ-বাসী মাসি-পিসি—তিনি খৈয়ের মোয়া গড়েন—ঘরের ধারে ডালিম গাছটি তাতে প্রভু নাচেন, নদীর ধারে জন্তী গাছটি তাতে জন্তী ফল ফলে; সেখানে নীল ঘোড়া মাঠে মাঠে চরে বেড়াচ্ছে, গৌড় দেশের সোনার ময়ূর পথেঘাটে গড়াগড়ি যাচ্ছে, ছেলেরা সেই নীল ঘোড়া নিয়ে সেই

সোনার ময়ূর দিয়ে ঘোড়া সাজিয়ে ঢাক, মৃদং ও ঝাঁঝর বাজিয়ে ডুলি চাপিয়ে কমলাপুলির দেশে পুঁটুরাণীর বিয়ে দিতে যাচ্ছে।"

ইতিহাস, ভূগোল, সন-তারিখের উর্দ্ধে এ সেই রূপকথার স্বপ্নরাজ্য—স্বর্গে-মর্ত্যে কোথাও এর জুড়ি নেই।

অবনীন্দ্রনাথের হাতে ইতিহাসেরও যে কি অভাবনীয় রূপান্তর ঘটতে পারে এবারে তারই একটু পরিচয় নেওয়া যাক 'রাজকাহিনী' থেকে। একদিকে যুদ্ধক্ষেত্রের দূরান্তে শিলাদিত্যের মৃত্যুশয্যা, অপরদিকে রাজপ্রাসাদের নিভৃতে বসে রাণী "পুষ্পবতী যত্ন করে নিজের কালো চুলের চেয়ে মিহি, আগুনের চেয়ে উজ্জ্বল, একগাছি সোনার তার, সরু হতেও সরু একটি সোনার ছুঁচে পরিয়ে একটি ফোঁড় দিয়েছেন মাত্র, আর চাঁপার কলির মতো পুষ্পবতীর কচি আঙুলে সেই সোনার ছুঁচ বোল্‌তার হুলের মতো বিঁধে গেল! যন্ত্রণায় পুষ্পবতীর চোখে জল এল ; তিনি চেয়ে দেখলেন, একটি ফোঁটা রক্ত জ্যোৎস্নার মতো পরিষ্কার সেই রুপোর চাদরে রাঙা এক টুকরো মণির মতো ঝকঝক করছে।"

ইতিহাসের সত্য তথ্য বর্জন করতে করতে কখন রূপকথার মেঘরাজ্যে মিশে গেল তা আমরা জানতেও পারলুম না। তাঁর সকল বই থেকেই এমনি অসংখ্য অংশ তুলে তুলে বেশ একটি ছবির গ্যালারি সাজান যায়। কিন্তু তার আর বিশেষ প্রয়োজন নেই। অবনীন্দ্রনাথের রচনার মূল বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে এখন আমাদের পরিচয় হয়ে গেছে। একটি-দুটি কথায় কেমন করে একটি সম্পূর্ণ ছবি ফুটে ওঠে তা আমরা দেখেছি। ভাষা যেন লঘুপক্ষ বলাকার মতো আমাদের চোখের সামনে দিয়ে তাদের ভাসিয়ে নিয়ে যায়—পড়তে পড়তে মনে হয় এর কিছুই যেন লেখা হয়নি, সবটাই আপনা থেকে হয়ে আছে। রচনার এই সরল অনায়াস ভঙ্গি সব দেশে, সব কালেই দুর্লভ। আমরা জানি, যে কথাটি সহজ, লিখতে গেলে সেটাই সবচেয়ে কঠিন হয়ে বাজে। কেবল অবনীন্দ্রনাথের মতো শিল্পসিদ্ধ প্রতিভাধরদের পক্ষেই এমন রচনা সম্ভব। 'ঘরোয়া' এবং 'জোড়াসাঁকোর ধারে'র মধ্যে এই রচনা শক্তির চরম পরিণতি পরিলক্ষিত হয়।

রূপকথা শিশু সাহিত্য। দেশ তাঁকে শিশু সাহিত্যিক হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। এই স্বীকৃতির উল্টো পিঠের মনোভাবটি হলো সাহিত্য-জগতে অবনীন্দ্রনাথও যেন একটি শিশু। অথচ সাবালকদের জন্য, অন্য সব দিক বাদ দিলেও, কেবল মাত্র গদ্য রচনার ক্ষেত্রে প্রচলিত সংস্কার ভেঙ্গে তিনি যে নতুন

আদর্শের নজির সৃষ্টি করে গেলেন, তার জন্য অভিনন্দনের পরিবর্তে অবহেলাই জুটল তাঁর কপালে।

যেমন করে তিনি মুখে মুখে গল্প করতেন তেমন করেই তিনি সব কিছু লিখেছিলেন। কিন্তু তাতে লোকের ধারণা হলো এই যে, ও ভাষায় ছেলে-ভুলোনো রূপকথাই লেখা চলতে পারে, অন্য কিছু নয়। ছেলেদের তিনি ভোলাতে পেরেছিলেন কিনা জানি না, কিন্তু বুড়োদের যে ভোলাতে পারেন নি, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। পারলে সাধুভাষা বনাম চলিত ভাষার আন্দোলন সেই ১৩০২ সনেই সুরু হত। সবুজ পত্রের অপেক্ষায় একুশ সাল পর্যন্ত বসে থাকতে হতো না। আমরাও এই অদ্বিতীয় কথাশিল্পীকে যথোচিত মর্যাদা দান করতে পেরে ধন্য হতাম।

ভাবলে বিস্ময় ও কৌতুক বোধ হয়, যখন দেখি রবীন্দ্রনাথের মতো মানুষও রচনারীতির এই নব্য আদর্শ সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন। অথচ তাঁরই সাহিত্য-শিষ্য অবনীন্দ্রনাথ তাঁর মুখের ভরশাটুকু পাথেয় করে সঙ্গীহীন, একক অভিযাত্রীর মতো নির্ভয়ে পথ চলেছেন। কোন দ্বিধা বা সংশয় তাঁর ছিল না। তাই প্রতিদিনের ব্যবহৃত মৌখিক ভাষাতেই সাহিত্যের অভিজাত সমাজকে তিনি অসংকোচে সম্ভাষণ করতে পারলেন। শিল্পী হিসাবে শ্রেষ্ঠ সম্মানে ভূষিত করে যারা তাঁর প্রাপ্য হিসেব মিটিয়ে দিয়েছিল, নববেশে অবনীন্দ্রনাথের এই পুনরাবিভাব তাদের বেশ বিব্রত করে তুললো এবার। কোনমতে সস্নেহ প্রশ্রয়ে তাঁকে ডেকে নিয়ে একপাশে আসন করে দেওয়া হলো বটে, কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ যা চেয়েছিলেন তা হলো না। একথা কেউ বুঝল না যে, যে ভাষায় সার্থক রূপকথা লেখা হলো, সে ভাষার শক্তি ও সম্পদের চরম পরীক্ষাটাও সেই সঙ্গেই হয়ে গেল।

গাম্ভীর্য বা ওজন ভাষার নিজস্ব গুণ নয়। ও বস্তু বিষয়নির্ভর। তাঁর সমকালের মনীষী লেখকদের অন্যতম মাত্র একজনের গদ্যরচনার সঙ্গে তুলনা করলেই একথার সত্যতা প্রমাণিত হবে। লিপিকুশলতা, প্রসাদগুণ এবং বক্তব্য উপস্থাপনের ঋজুতার দিক থেকে আচার্য রামেন্দ্রসুন্দরের গদ্য প্রবন্ধের আদর্শ। সৌন্দর্যতত্ত্বের আলোচনায় তিনি লিখছেন, "সৌন্দর্য-বোধ মানব জীবনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত। সৌন্দর্য উপভোগের ক্ষমতা মানব জীবনের প্রধান সম্পত্তি। কেবল যে কবি-নামধেয় মনুষ্য বিশেষই সৌন্দযমধুর অন্বেষণে ভ্রমরবৃত্তি হইয়া জীবনপাত করিতেছে, তাহা বলা চলে না। কেননা জগৎ হইতে তাহার সৌন্দর্যটুকু কোনরূপে হরণ করিতে পারিলে সম্পূর্ণ

কাব্যরসবর্জিত বিষয়ী লোকদিগের জন্যও দড়ি কলসী সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে।"

বিজ্ঞানীর হাতের প্রবন্ধ। সুন্দর, স্বচ্ছন্দ এবং বিষয়োচিত গাম্ভীর্যে সংবৃত। নিঃসন্দেহে চিন্তাপূর্ণ, গভীর বিষয় প্রকাশের একান্ত উপযোগী ভাষা। একান্ত উপযোগী হলেও একমাত্র উপযোগী ভাষা এমন কথা অবনীন্দ্রনাথ মানতে পারেন নি। জটিল, চিন্তাপূর্ণ, গম্ভীর প্রসঙ্গ যদি মুখে মুখে আলোচনা করা যেতে পারে তবে তা লেখাও যায় তেমনি ভাবেই। এ বিষয়ে তাঁর অনুমাত্রও সংশয় ছিল না। তার প্রমাণ 'বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী'।

সৌন্দর্যতত্ত্ব সম্বন্ধে নিজের পরম উপলব্ধি পরিচয় দিয়ে তিনি লিখছেন, "পাখির ডানার মধ্যে নানা কলবল কি ভাবে কাজ করছে তার খোঁজই নেই, ওড়ার সুন্দর ছন্দ সেখানে দেখা দিয়ে মনকে উড়িয়ে নিয়ে গেল কোন দেশে তার ঠিক নেই। সৃষ্টির নিয়মে সমস্ত সুন্দর জিনিষ আপনার নির্মাণের কৌশল লুকিয়ে চলল দর্শকের কাছ থেকে এবং এই নিয়মই মেনে চলল সমস্ত সুন্দর জিনিষ যা মানুষ রচনা করলে—যেখানে নির্মাণের নানা কৌশল ও প্রকরণ ধরা পড়ে গেলো সেখানেই রচনার সৌন্দর্যহানি হল, ফলের দিক ফুটল কিন্তু রসের দিক ও সৌন্দর্যের দিক চাপা পড়ে গেলো।"

সেই 'শকুন্তলা', 'ক্ষীরের পুতুলে'র ভাষা কিন্তু বিষয়ভেদে সমস্ত চেহারাটাই পাল্‌টে গেছে। এ ভাষার সঙ্গে একমাত্র ভরা গঙ্গার স্রোতের তুলনা চলে। টলটল করে বয়ে চলেছে। চিন্তাগুলো যেন বেগের মধ্য থেকে ঢেউয়ের মতো আপনা হতে জেগে ওঠে আর তার ওপর যখন কল্পনার আলো পড়ে সমস্ত রচনাটিই তখন ঝলমল করে ওঠে। এর পেছনে যে কোন প্রয়াস, কোন কলা-কৌশল থাকতে পারে তা যেন ভাবাই যায় না। সম্ভবতঃ এই কারণেই অবনীন্দ্রনাথের সমকালের পাঠক তাঁর রচনাকে জলবৎ তরল মনে করে ছেলেদের খেলাঘরেই ফেলে রেখেছিল। সংস্কার বশে তারা ওর মধ্যে ফলের দিকটা হাতড়ে ফিরেছিল কিন্তু বিফল হওয়ায় ওর মধ্যেকার ঐশ্বর্যের দিকটা আবিষ্কারের কথা তখন মনে পড়ে নি।

অবশ্য খেতাব বা শিরোপার বিষয়ে অবনীন্দ্রনাথও ছিলেন সমধিক উদাসীন। সৃষ্টির আনন্দই ছিল এই অভিজাত শিল্পীর জীবনে পরম পুরস্কার। কেবল যে তাঁর আপনকাল তাঁর প্রতি অবিচার করেছে একথা বলে দায় খালাস হওয়া যায় না। অবনীন্দ্রনাথের রচনার সামগ্রিক এবং যথার্থ মূল্যায়ন তো আজও অপেক্ষিত।

শম্ভু মহারাজ

হিমালয় ও বাংলা-সাহিত্য

হিমালয় ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতির ধারক। তিন হাজার বছর আগে লেখা ঋগবেদে হিমালয়কে বলা হয়েছে গিরিরাজ। উপনিষদে উমাকে কল্পনা করা হয়েছে হিমালয়ের কন্যারূপে। গঙ্গা হয়েছেন হিমালয়ের ভগিনী। শিব মূর্ত্ত হয়েছেন হিমাচ্ছাদিত শৈলে। মেরু পর্বত হয়েছে বিশ্বের কেন্দ্র বিন্দু। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে কত সত্যদ্রষ্টা ঋষি কত উপাচারে সাজিয়েছেন হিমালয়কে। নিজেদের চিন্তা ভাবনা আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতীক তাঁরা খুজে পেয়েছেন হিমালয়ে।

বাঙ্গালীর সঙ্গে হিমালয়ের সম্পর্ক সুপ্রাচীন। প্রাচীন কাল থেকেই বাঙ্গালী তার জ্ঞানের প্রচার আর বুদ্ধির বিকাশের জন্য যুগে যুগে, দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। প্রায় হাজার বছর আগে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান গিয়েছিলেন ব্রহ্মদেশ ও তিব্বতে। বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে তিনি তিব্বতে ভারতের সংস্কৃতিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তিনি তিব্বতী লিপির জনক।

গাড়োয়ালী রাজপুতদের মধ্যে বঙ্গারী রাউত বলে এক সম্প্রদায় আছেন। সম্ভবতঃ এরা বাঙ্গালী। সাধারণের জন্য লেখা কাতন্ত্র ব্যাকরণের বাংলা টীকার খুবই আদর ছিল গাড়োয়ালে। ত্রিপুরা জেলার মেহারের সাধক স্বামী সর্বানন্দের তান্ত্রিক মতাবলম্বী শিষ্য এখনও গাড়োয়ালে আছেন। পরমব্রহ্মের

উপাসক রামকৃষ্ণ, যিনি শ্রীহট্টে বিল্বমঙ্গল মঠ স্থাপন করেছিলেন, তিনি প্রায় চারশ বছর আগে কেদার-বদ্রী ও গঙ্গোত্রী গিয়েছিলেন, রাজস্থান ও কাথিওয়ারে তাঁর বহু ভক্ত আছেন। এদের পরেই বলতে হয় শরৎচন্দ্র দাস, রাধানাথ সিকদার ও তিব্বতী বাবার (নবীনচন্দ্র চক্রবর্তী) কথা। শরৎচন্দ্র দাসের তিব্বতী অভিযান থেকে আমরা কৈলাস মানস সরোবর এবং তিব্বতের বহু মূল্যবান তথ্য জানতে পারি। রাধানাথ সিকদার হিমালয়ের অন্যান্য কয়েকটি সুউচ্চ শৃঙ্গসহ এভারেষ্টের উচ্চতা নিরূপণ করেন। তিনিই প্রমাণ করেন যে এভারেষ্ট বিশ্বের উচ্চতম গিরিশৃঙ্গ। তিব্বতী বাবা গত শতাব্দীতে বত্রিশ বছর তিব্বত, তিরিশ বছর ব্রহ্মদেশে ও কয়েক বছর শ্যামদেশে অতিবাহিত করে-ছিলেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় তিনি বা তাঁর কোন শিষ্য এই সুদীর্ঘ প্রবাস বাসের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কাহিনী সংকলিত করেননি। করলে তা নিশ্চয়ই স্বেন হেডিনের ট্র্যান্স হিমালয়ার চেয়ে কম মূল্যবান বলে বিবেচিত হত না। এ কথা কেবল তাঁর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়, মধ্য যুগের সমস্ত বাঙ্গালী পর্যটকের ক্ষেত্রেই সত্য। তাঁরা হিমালয় পরিক্রমা করেছেন, কিন্তু হিমালয়ের কথা বাংলায় লিখে যাননি। ফলে তাঁদের ভ্রমণে বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়নি।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম হিমালয় ভ্রমণ কাহিনী কি, তা নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। তবে সম্ভবতঃ রাজেন্দ্র মোহন বসুর 'কাশ্মীর কুসুম' বাংলায় প্রকাশিত প্রথম ভ্রমণ কাহিনী। ১৮৭৫ সালে এই বইটি প্রকাশিত হয়। গ্রন্থকার ১৮৬৯ সালে কাশ্মীর ভ্রমণে গিয়েছিলেন। এর পরেই প্রকাশিত হয় রায়বাহাদুর জলধর সেনের 'হিমালয়'। ১৯০০ সালে এই বইটি প্রকাশিত হয়েছে। লেখক ১৮৯০ সালে বদ্রীনাথ দর্শনে গিয়েছিলেন।

কাশ্মীর কুসুম প্রথম প্রকাশিত হিমালয় ভ্রমণ কাহিনী হলেও প্রাচীনতম ভ্রমণ বিবরণ নয়। পরে প্রকাশিত হলেও প্রথম ভ্রমণ কাহিনী রচিত হয় শতাধিক বছর আগে। লেখক যদুনাথ সর্বাধিকারী ১৮৫৩ সাল থেকে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত, এই চার বছর গরুর গাড়ী, ঘোড়া ও ডাণ্ডী চেপে পায়ে হেঁটে কেদার-বদ্রী সহ সারা উত্তর ভারত ভ্রমণ করেন। পরিক্রমাকালে তিনি দৈনিক রোজ নামচা লিখতেন। তাঁর বংশধরগণ ১৯১৫ সালে 'তীর্থ-ভ্রমণ' নাম দিয়ে সেই রোজনামচা প্রকাশ করেন। সাত শতাধিক পৃষ্ঠার এই গ্রন্থখানি আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম ভ্রমণ বিবরণ।

তার পর থেকে বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবেই বাংলা সাহিত্যে হিমালয়ের পরিধি প্রসারিত হয়েছে। এখন হিমালয় নিয়ে

প্রায় শখানেক বাংলা বই আছে এবং এর প্রায় অর্ধেক কেদার-বদ্রীকে কেন্দ্র করে। দুটি মাত্র তীর্থক্ষেত্র বা দর্শনীয় স্থানকে অবলম্বন করে পৃথিবীর খুব কম সাহিত্যেই এত অধিক সংখ্যক পুস্তক প্রণীত হয়েছে। যদিও এর মধ্যে চিরস্থায়ী আসন লাভ করেছে মাত্র দুখানি—জলধর সেনের 'হিমালয়' ও প্রবোধকুমার সান্যালের 'মহাপ্রস্থানের পথে'।

হিমালয়ের অন্যান্য অঞ্চল যথা গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী বসুধারা, নন্দন কানন, হেমকুণ্ড, কাশ্মীর, কুমায়ুন, কৈলাস, পাঞ্জাব ও হিমাচল প্রদেশ—এমন কি নেপাল ও সিকিম ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ প্রভৃতি স্থান নিয়েও বহু বাংলা ভ্রমণ কাহিনী রচিত হয়েছে। এই সব কাহিনীর মধ্যে 'বিগলিত করুণা জাহ্নবী যমুনা', শ্রী প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় 'হিমালয় পারে কৈলাস' ও 'মানস সরোবর', শ্রী প্রবোধকুমার সান্যালের 'দেবতাত্মা হিমালয়' ও 'উত্তর হিমালয় চরিত', শ্রী উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'হিমালয়ের পথে পথে' ও শ্রী বীরেন্দ্রনাথ সরকারের 'রহস্যময় রূপকুণ্ড' উল্লেখযোগ্য।

এই সবই হিমালয় ভ্রমণ কাহিনী। এর অধিকাংশই গড়ে উঠেছে তীর্থ পরিক্রমা কিম্বা হিমালয়ের অপরূপ রূপলাবণ্য দর্শনের বর্ণনাকে কেন্দ্র করে।

অনন্তকাল ধরে হিমালয় আমাদের অনেক দিয়েছে। শিবালয় হিমালয়ে অসংখ্য দেবালয় আর অগণিত তীর্থ—যা না থাকলে ভারত শিবহীন হত, ধর্মহীন হত। হিমালয়ের হিমানী গলে সৃষ্টি হয়েছে নদী—যে নদী না থাকলে উত্তর ভারত জলহীন হত। হিমালয়ে রয়েছে কুবেরের ভাণ্ডার—অজস্র প্রাকৃতিক সম্পদ। এই সম্পদকে কাজে না লাগাতে পারলে ভারত সম্পদহীন থেকে যাবে। হিমালয়ে বাস করে লক্ষ লক্ষ মানুষ ; যাদের জীবনে উন্নতি না আসতে পারলে, ভারতের সকল উন্নয়ন পরিকল্পনা ব্যর্থ হবে।

হিমালয়ের ঐশ্বর্য আহরণ, তার অধিবাসীদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও ভারতকে সুরক্ষিত করার প্রয়োজনে আজ হিমালয়ের সঙ্গে আমাদের সুপরিচিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। এই পরিচয় কেবল তীর্থপথ পরিক্রমার মধ্য থেকেই হবে না, এই পরিচয়ের জন্য নব নব অভিযান ও পদযাত্রার আয়োজন করতে হবে হিমালয়ের প্রতিটি গিরিশৃঙ্গে, প্রতিটি গিরবর্ত্মে, প্রতিটি গ্রাম রেখায়। দেবতাত্মা হিমালয়ের অনন্ত রহস্যকে আবিষ্কার করতে হবে। সেই আবিষ্কারের কথা ও কাহিনীকে সাহিত্যের মাধ্যমে পৌঁছে দিতে হবে সকলের কাছে।

বিশ্বের বৃহত্তম পর্বতমালা হিমালয়। কিন্তু পর্বতাভিযানের জনক ইওরোপ। ভারতীয় পর্বতারোহণ আরম্ভ হয়েছে মাত্র পনেরো বছর আগে।

এরই মধ্যে ভারতীয় পর্বতারোহীরা হিমালয়ের ছত্রিশটি গিরিশৃঙ্গে আমাদের জাতীয় পতাকা প্রোথিত করেছেন। গৌরবের কথা যে পর্বতাভিযানের ক্ষেত্রেও বাঙ্গালীরা পিছিয়ে নেই। বহু বিদেশী ও সর্বভারতীয় অভিযানে বাঙ্গালীরা অংশ গ্রহণ করেছেন। এবং এ পর্যন্ত বাংলা দেশ থেকে ছটি বে সরকারী পর্বতাভিযান আয়োজিত হয়েছে—১৯৬০ সালে নন্দাঘুন্টি (২০৭০০'), ১৯৬১ সালে মানা (২৩৮৬০') ও নন্দা খাত (২১৬৯০'), ১৯৬২ সালে নীলগিরি (২১২৬৪'), ১৯৬৪ সালে দেওদেখানি (২০২৬০'), ও ট্রেল্‌স পাস্‌ এবং ১৯৬৫ সালে কাবরুডোম (২১৬৫০') ও ত্রিশুলি (২৩৪৬০)। এর মধ্যে নন্দা ঘুন্টি, নন্দাখাত, নীলগিরি, দেওদেখানি ও কাবরু ডোম অভিযান সফল হয়েছে। এই বছরও কয়েকটি দল অভিযানে বেরিয়েছেন।

পর্বতারোহণে বাঙ্গালীরা অনেকটা এগিয়ে এলেও বাংলা সাহিত্য পর্বতারোহণের ক্ষেত্রে তেমনটি অগ্রসর হতে পারেন নি। এত অভিযানে বাঙ্গালী অংশগ্রহণ করলেও এ পর্যন্ত মাত্র ন খানি বাংলা বই লেখা হয়েছে পর্বতাভিযান নিয়ে—'হিমালয় অভিযান' (যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত—১৯২৪), 'হিমালয় অভিযান' (নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়—১৯৩৭) 'অন্তরীক্ষে হিমালয় অভিযান' (কমলেশচন্দ্র ভঞ্জ চৌধুরী— ৯৪৯) 'এভারেষ্ট কাহিনী' (প্রিয়নাথ জানা—১৯৫৩) ছোটদের এভরেষ্ট অভিযান (হীরালাল ও লোকেশ্বর ভট্টাচার্য—১৯৫৫), 'কাঞ্চনজঙ্ঘার পথে' (বিশ্বদেব বিশ্বাস—১৯৫৯) 'নন্দকান্ত নন্দাঘুন্টি' (গৌরকিশোর ঘোষ—১৯৬১), 'এভারেষ্ট ডায়েরী' (ক্যাপ্টেন সুধাংশুকুমার দাশ—১৯৬১), ও নীল দুর্গম। কিন্তু কেবল শেষের তিনখানি পুস্তকই ভারতীয় পর্বতারোহণ নিয়ে লেখা। ফলে হিমালয় সম্পর্কে কোন খবরাখবর পেতে হলে আমাদের সম্পূর্ণরূপে বিদেশী সাহিত্যের উপর নির্ভর করতে হয়।

এ অবস্থাটি কোন সাহিত্যের পক্ষেই গৌরবের নয়। অনেকে হয়তো বলবেন তবু তো বাংলা সাহিত্যে পার্বতাভিযান নিয়ে নয় খানি বই আছে; কিন্তু ভারতের অন্যান্য সাহিত্যে তো তাও নেই। এ জাতীয় আত্মপ্রসাদ সাহিত্য সমৃদ্ধির পরিপন্থী। বাংলা সাহিত্য চিরকাল অন্যান্য ভারতীয় সাহিত্যকে নতুন দিগন্তের পথ-প্রদর্শন করেছে। তাই আজ আমাদের নজর দিতে হবে বিদেশী অভিযাত্রী সাহিত্যের দিকে। যে সব দেশের অভিযাত্রী সাহিত্যিকরা হাজার হাজার মাইল দূর থেকে আমাদের দেশে এসে, প্রাণ তুচ্ছ করে, আমাদের হিমালয়ের গহন গিরিকন্দরের রহস্য উদ্ধার করে তাঁদের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে গেছেন।

বীরেশ্বর বসু

ফসল

চার বছর আগে আর পরে এর মধ্যে অনেক ব্যবধান। সময়ের দূরত্ব তেমন কিছু উল্লেখযোগ্য না হলেও আবর্তন, বিবর্তন ও পরিবর্তনের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। যেমন বর্ষা আর হেমন্ত। বর্ষায় নদী কানায় কানায় ভরে ওঠে, জল থই থই করে, কুল কুল শব্দ করে। জল ও আকাশের রঙ বদলে যায়। আকাশ সজল মেঘে থম থম করে তারপর এক ফাঁকে কেঁদে ফেলে। আবার কখনও বা এক ঝিলিক রোদ হাসে। আকাশটা হেসে ওঠে। নদীর বালির কণাগুলো ঝিকমিক করে। মনের স্তব্ধ তারগুলো বেজে ওঠে। এই হাসি ও কান্নার সংমিশ্রণে নতুন এক অনুভূতি জাগে, মনে দৃঢ়তা আসে। নতুন এক বোধশক্তি কাজ করে তখন। ভাল মন্দ, ন্যায় অন্যায়ের প্রশ্ন থাকে না। বিচার স্তব্ধ। অন্ধ মনের সমস্ত রঙ একাত্ম হয়। অন্য রঙ আবার যে আসবে বা আসতে পারে সে-কথা মনেই আসে না।

এরপর শরৎ আসে। বৃষ্টি থেমে যায়। আকাশ অন্যরূপ ধরে। সূর্য ওঠে, চাঁদ হাসে, তারা জ্বলে। নদীর জল কমে যায়। স্রোতও। পাড় মাথা চাগিয়ে ওঠে। গেরুয়া রঙের জল নীলচে হয়। গাছে গাছে দোয়েল, শ্যামা ডাকে, আকাশে বলাকা উড়ে যায়। ক্ষেতে দুধ-ভরা ধানের শিষ হাসে।

আরো নীল হয়। নদীর জল আরো শুকিয়ে যায়। কেমন শান্ত, ধীর ধ্যান-গম্ভীর একটা ভাব। নতুন ফসল ফলে। জলের বুকে হাসি। একটা নতুন স্বাদ। পরিপূর্ণ স্বাদ। মাতৃত্বের!

পৃথিবীর সব কিছুরই ঋতু বদল হয়। আকাশ, বাতাস, নদী নালা, গাছ-পালা, জীবজন্তু; সব কিছুর। মানুষেরও। এ-কথা ঠিক জানা ছিল না ভবেশের। হয়ত জানা ছিল কিন্তু বুঝবার মত বয়স হয়নি তখন অথবা হয়ে থাকলেও সময়ের চোখ তাকে ফাঁকি দিয়েছিল। কি জানি, হয়ত স্মিতাদিরও। হয়ত জমিদার শশাঙ্কশেখর এ সব জানতেন।

বাতাস যখন বয় সে তখন জানতে পারে না যে একদিন না একদিন এক জায়গায় গিয়ে থামতেই হবে তাকে। মানুষের জীবনেও এ-রকম অনেক বাতাস আসে। যখন সেটা আসে সেটাকেই তখন পরিপূর্ণ, শাশ্বত বলে মনে হয়। মনে হয় এরপর আর কিছু নেই। কিন্তু এই কি শেষ···

শশাঙ্কশেখর বেশ ভারিক্কি মেজাজের লোক। জমিদার লোক, ঠিক এই মত না হলে মানায় না। খুব হাসি খুশি। কথাবার্তা কম বললেও মাঝে মধ্যে এমন এক একটা রসিকতা করতেন যা সহজে ভুলবার নয়। কিন্তু এ-হেন লোকটি সময়ে সময়ে কেমন যেন অসম্ভব রকম গম্ভীর হয়ে ওঠেন। তখন ঐ হাসিটা থাকে না, মুখটা বিকৃত হয়ে যায়। চোখমুখের রঙ বদলে গিয়ে কেমন একটা বিশ্রী রকম অস্বস্তি, বিতৃষ্ণার ছাপ ফুটে ওঠে। নিজেকে অক্ষম, অসহায় ও অপদার্থ বলে মনে করেন। হয়ত ঘৃণাও করেন।

এই শশাঙ্কশেখরকে ভবেশ প্রথম দেখে কলেজের একটা মিটিংএ। তিনিই ছিলেন প্রেসিডেণ্ট আর তাঁরই অক্লান্ত পরিশ্রম, অর্থ ও আনুকূল্যে এই কলেজ। ভবেশ তখন সতরো বছরের উঠন্ত ছেলে, ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে। প্রথমদিন প্রথম দর্শনেই শশাঙ্কশেখরকে খুব ভাল লেগে যায় ভবেশের। কেন, কি জন্য লেগেছিল তা জানে না ভবেশ। হয়ত তাঁর অনুগ্রহ লাভ করার জন্য অথবা তাঁর কার্তিকঠাকুরের মত সুঠাম সুন্দর চেহারাই তাকে আকৃষ্ট করে। মনে মনে বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন করে।

সেই থেকে শশাঙ্কশেখরের বাড়ির ধার দিয়ে কলেজে যায় ভবেশ। শশাঙ্কশেখরকে দেখার একটা অদম্য স্পৃহা তাকে ঐ রাস্তায় টেনে নিয়ে যায়। প্রতিদিনই আসা-যাওয়ার সময় বাড়িটার দিকে তাকায়। প্রাচীরঘেরা

বিদেশী মনোরম গাছপালায় ভরতি। এই ফুল, লতাপাতার অনেকগুলোই দেখতে পাওয়া যায় না রাস্তা থেকে, উঁচু পাঁচিলের গহ্বরে তলিয়ে থাকে। বড় বড় গাছগুলোর মাথাটা দেখা যায়। বাড়ির নীচের তলার কিছুই দেখতে পাওয়া যায় না তবে বড় ফটকটা খোলা থাকলে দক্ষিণদিকের ছোট একটা অংশ চোখে পড়ে। রাস্তা থেকে বড় গাছের ডালপালা পাতাপুতির ফাঁক দিয়ে দোতলার লম্বা চওড়া একটানা বারান্দার জিনিসপত্তরগুলো কোনটা স্পষ্ট কোনটা অস্পষ্ট আবছা আবছা দেখা যায়। দরজা জানালা খোলা থাকলে ঘরের ভেতরকার কোন কোন আসবাবপত্রও নজরে পড়ে।

এই উপরের তলার দিকে চেয়ে চেয়ে পথ চলে ভবেশ। তার বিশ্বাস জমিদার শশাঙ্কশেখর বড় একটা নীচে আসেন না, উপরেই থাকেন। সে প্রতিদিনই দেখতে পায় রেলিং-এ নানারঙের শাড়ি, ব্লাউজ, সায়া রোদে শুকোতে দেওয়া হয়। দু'চারটে ধুতি, গেঞ্জি, পাঞ্জাবীও থাকে। খোলামেলা জায়গা, প্রচুর হাওয়া বাতাস। শাড়ি, ব্লাউজ, সায়া, ধুতি, পাঞ্জাবী ফরফর করে উড়তে থাকে। ভবেশ শব্দ শুনতে পায় না তবে অনুমান করে মনে মনে। ধুতি, গেঞ্জি, পাঞ্জাবী আর শাড়ি ব্লাউজ সায়া একসঙ্গে লাগোয়া মেলে দেওয়া নয়। এদের মধ্যে খানিকটা ফাঁক থাকে। ভবেশের মনে হয়, এখানে যেন মেয়ে পুরুষ আলাদা, ওদের বাড়ির মত নয়। ওদের বাড়িতে তো ওর মা বাবার কাপড় জামা একসঙ্গেই মেলে দেওয়া হয়ে থাকে। বাতাস হলে এ-ওর গায়ে ঢলে পড়ে লুটোপুটি খায়। বড়লোকের কথা আলাদা, যে যার মত, মনে হয় মনের কোথাও ফাঁক আছে এঁদের।

বড় নির্জন, নিঃসঙ্গ এই উপর তলাটা। নির্জন ভালবাসে ভবেশ তবে এই রকম নিঃসঙ্গ জায়গা আদৌ পছন্দ করে না। মনে হয় নির্বাসন। ওখানে যারা থাকে তাদের কথা ভাবতেই ভবেশের মনটা চঞ্চল হয়ে ওঠে। তবু শশাঙ্কশেখরের প্রতি আকর্ষণ তাকে টেনে নিয়ে যায় ঐ পথে। ঐ নিঃসঙ্গতার মধ্যেই একটা নিগূঢ়ের ধ্বনি শুনতে পায়, আর ঐ সব শাড়ি, ব্লাউজ, ধুতি, পাঞ্জাবীর সঙ্গে তার মনটাও ফরফর করে উড়তে থাকে।

বেশি পুরনো কথা নয়, বার বছর আগে আর পরে। সময়ের ব্যবধান তেমন কিছু নয় কিন্তু জীবনের ব্যবধান অনেক। শুধু ওঠানামা, হাসি-কান্না আর নানা টানাপড়নের মধ্যে হাবুডুবু খেতে হয়। এই বয়সের বোধহয় এই

আবার ধপ্ করে মাটিতে পড়ে যাওয়াও অসম্ভব নয়!

ইতিমধ্যে সুমিতাদির সঙ্গে পরিচয় হয় ভবেশের। এই পরিচয় নিতান্ত আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত। কেউ ধারণা করতে পারে না। ভবেশও পারে নি। সে অতি সাধারণ ঘরের ছেলে আর সুমিতাদি বড়লোকের মেয়ে। বিয়েও হয়েছে বড়লোকের সঙ্গে। এঁদের মেয়েছেলে বড় একটা বাইরে বেরোয় না, আর কখন কালে-ভদ্দরে বেরোলে মোটরে বের হয়। মোটরটা হু-হু শব্দ করে বাতাসের মত আসে আর যায়। সব কিছু মুহূর্তের মধ্যে পিছনে পড়ে থাকে আর পথচারিরা তাদের মনের অতৃপ্ত বাসনা ও বেদনা নিয়ে হাঁ করে মোটরের দিকে তাকিয়ে থাকে। মনের রঙ বদলে যায়। কিন্তু এই শ্রেণীর বড়লোক মেয়ে পুরুষের মন স্পর্শ করে না তা। তাই সুমিতাদির সঙ্গে পরিচয়ের কথা মনে হলেই অবাক হয় ভবেশ।

প্রথম যেদিন সুমিতাদিকে দেখে ভবেশ, তার মনে হয় সুমিতাদি একটা আধোফোটা গোলাপ। কিন্তু এর মধ্যেও একটা অব্যক্ত বেদনা ও অস্বস্তির ভাব লক্ষ্য করে ভবেশ। ফুলটি ফুটতে চায় পরিপূর্ণ হয়ে অথচ ফুটতে পারছে না। যে গাছটাকে আশ্রয় করে আছে তার যেন শক্তি নেই। আকাশটা আগুনে, একবিন্দু শিশির নেই কোথাও!

ভবেশ গরিবের ছেলে হলেও চেহারা রাজপুত্রের মত। টানাটানা চোখ, নিখুঁত মুখ, জোড়া ভ্রূ। গায়ের রঙ ফর্সা, ঈষৎ রক্তাভ। সুমিতাদির হয়ত খুব ভাল লেগেছিল তাকে। একদিন হাসতে হাসতে বললেন—তোর নামটা কেমন বুড়োটে। আমি তোর নাম দিলাম মনোজ। মনু বলে ডাকবো তোকে।

সুমিতাদির সঙ্গে ভবেশের বয়সের তেমন একটা তফাত নেই, মাত্র চার বছরের। সুমিতাদির একুশ আর তার সতরো। একুশ হলে কি হবে ওঁকে যেন অনেক বড় দেখায় ভবেশের চেয়ে। মেয়েরা যেন চৌদ্দ পার হলেই ধা-ধা করে বেড়ে ওঠে আবার পড়েও যায় দ্রুত। অল্পেতেই বুড়িয়ে যায়, মনের রঙ বদলে যায়। অন্য জগতের অন্য মানুষ বনে যায়। সুমিতাদিও পঁচিশ বছর পার না হতেই বুড়ি হয়ে যায়। এ-কথা ভাবতে পারে নি ভবেশ।

এই সুমিতাদির কাছেই শশাঙ্কশেখরের সমস্ত সুখ দুঃখ বেদনার কথা জানতে পারে ভবেশ। এতে তাঁর ওপর ভয়ানক করুণা হয় তার। আবার শ্রদ্ধা ও ভক্তি অসম্ভব রকম ঘন হয়। মানুষ যে এত সদাশয় হতে পারে তা সে বিশ্বাস করতে পারে না। নিজের জিনিস অপরকে বিলিয়ে দিয়ে কেমন

করে এমন নির্বিকার জীবন-যাপন করতে পারে মানুষে। কিন্তু ভোগের উপকরণ সামনে দেখলে কে স্থির থাকতে পারে? কিছু ভয় কি থাকে? আর করুণাই বা কতক্ষণ থাকে।

প্রতিদিনই শশাঙ্কশেখরের বাড়ির নিকট দিয়ে যে রাস্তাটি কলেজে গিয়েছে সেই পথে আসা-যাওয়া করে ভবেশ। হঠাৎ একদিন গেটের ধারে তাঁর সঙ্গে দেখা হয় ভবেশের। একটা লোক ঘাসকাটা মেসিন দিয়ে উঠোনের ঘাস কাটছে। মেসিনের দাঁতের ফাঁক দিয়ে কাটা ঘাসগুলো ফর্ ফর্ করে বেরিয়ে আসছে। দেখতে খুব ভাল লাগে তার তাই নিষ্পলক চেয়ে চেয়ে ভাবছিল—দিনগুলোও এমনি করে ঘাসের মত নির্বিকার থাকে তারপর নানা আবর্তের মধ্যে পড়ে খণ্ড খণ্ড হয়ে যায়। আলো আর অন্ধকার, দিন আর রাত! জীবনটাও। মনটার মধ্যে স্যাঁৎ করে ওঠে ভবেশের। একটা অজ্ঞাত আতঙ্কে দেহটা কেঁপে ওঠে। পরক্ষণেই দোতলার রেলিং-এ মেলা কড়া সবুজ রঙের শাড়ি আর ব্লাউজের দিকে নজর পড়ে। দুটি জিনিসেরই এক রঙ। এতে বেশ সুন্দর মানায় কিন্তু ফর্সা লোকের। তবে এই রকম কড়া রঙের সঙ্গে গায়ের রঙও বিশেষ ফর্সা হওয়া দরকার। ব্লাউজটি ছোট নয়, বেশ চওড়া সওড়া। যে এই কাপড় ব্লাউজ পরে মনে মনে তার দেহের রূপ ও বিস্তার কল্পনা করে ভবেশ।

ভবেশের তন্ময়তা কাটে শশাঙ্কশেখরের কথায়। তিনি গম্ভীরভাবে জিগ্যেস করেন—কি দেখছ, এখানে দাঁড়িয়ে?

ভয়ে চমকে ওঠে ভবেশ। জমিদার বাড়ির দিকে এমন করে তাকিয়ে থাকা সঙ্গত হয়নি তার। হয়ত দারোয়ান দিয়ে এখনই গলাধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেবেন অথবা নিজেই দু'ঘা মেরে বসবেন। নীরব থেকে দু'পা পিছিয়ে যায় ভবেশ।

শশাঙ্কশেখর আবার জিগ্যেস করেন—কি চাই?

ভবেশ খানিকটে সাহস সঞ্চয় করে নিয়ে বললে—কিছুই না, ফুল দেখছিলাম।

শশাঙ্কশেখর ভাল করে ভবেশের আপাদ-মস্তক পরীক্ষা করেন। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে তার নাড়ি নক্ষত্রের খবর নিয়ে কি একটু ভেবে বললেন—আমার সঙ্গে এসো।

ভবেশকে বাগিচার মধ্যে নিয়ে গিয়ে জিগ্যেস করেন—কি ফুল ভালবাসো তুমি?

ভবেশ নিশ্চুপ থাকে। তার মনের মধ্যে তখনও কম্পন হচ্ছে।

একটা গাছে শুধু একটা মাত্র গোলাপ ফুটে আছে। মস্ত বড় গোলাপ। গাছটির চারিধারের আর আর গাছ লতাপাতার সৌন্দর্য বাড়িয়ে দিয়েছে ঐ গোলাপটা। শশাঙ্কশেখর মালির নিকট হতে ছুরি নিয়ে গোলাপটা কাটতে যান।

ভবেশ কেন যেন ভয় ভুলে গিয়ে তাঁকে বাধা দিয়ে বললে—আ, হা, করেন কি, অমন সুন্দর ফুলটি কাটছেন, চারিদিক যে আঁধার হয়ে যাবে?

এর মধ্যে ফুলটি কেটে ফেলেছেন শশাঙ্কশেখর। ভাবশের হাত সরে না ফুলটি নিতে। বিবেকে বাধছে। তার মনে হয় অপরের জিনিস এইভাবে লওয়া সঙ্গত নয়।

শশাঙ্কশেখরের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর দুই বছর তাঁকে বেশ হাসিখুশিই দেখেছে ভবেশ। ভবেশকে দেখতে পেলে উচ্ছ্বসিত হয়ে অনেক কথা জিগ্যেস করতেন। শেষ পর্যন্ত ভবেশকে তাঁর বাড়ি থেকেই পড়াশুনার ব্যবস্থা করে দেন। তার পড়ার যাবতীয় খরচ-খরচা এমন কি পোশাক পরিচ্ছদও তিনিই দেন।

এর দুই বছর বাদে হঠাৎ একটা আনন্দের দিনে তিনি অন্যরূপ ধারণ করেন। আগের সেই হাসি, করুণা, দাক্ষিণ্য কোথায় যেন হারিয়ে যায়। কাজে-কর্মেও নিস্পৃহ। এই বিরূপতা, রুক্ষতা দিন দিন বাড়তে থাকে। ভবেশের মনে হয় পালিয়ে যায় সেখান থেকে কিন্তু এই দুই বছর ধরে এই বাড়িতে সে যে দেহ, মন ও রক্ত দিয়েছে সে-কথা মনে হলেই তার পা দুটো আর সরে না। তার মনে হয় শশাঙ্কশেখরের মত সেও এ-বাড়ির একজন। এখানকার এই যে বিরাট চকআটা বাড়ি, ঘরদুয়োর, লোকজন, গাছপালা, ফুলপাতা সবই তার উঠন্ত যৌবনপ্রাণের সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে আছে। গোলাপের যে গাছটি থেকে শশাঙ্কশেখর ফুল তুলে দিয়েছিলেন সেই গাছটি একটুকুও ম্লান হয়নি বরং আরো বড় উজ্জ্বল হয়েছে। এ-সমস্তই তার আদর যত্নের ফল!

এর পাঁচ মাস বাদে একদিন সত্যই চলে যায় ভবেশ। পালিয়ে নয়, সুমিতাদির অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারেনি সে।

সুমিতাদিও যেন কেমন হয়ে গেছেন, বড় একটা দেখতে পাওয়া যায় না তাঁকে। সেই হাসি খুশি উচ্ছল ভাব আর নেই। কেমন মনমরা, বিশীর্ণ, বিত্রস্ত। এর কোন কারণ খুঁজে পায় না ভবেশ। অথচ আগের চেয়ে আরো বেশি খুশি হওয়া উচিত। তাঁর একটি ছেলে হয়েছে। পাঁচ মাস বয়স হলো তবু এ পর্যন্ত সুমিতাদি ছেলেটিকে দেখতে দেননি ভবেশকে। তার খুব দেখতে ইচ্ছা করে ছেলেটিকে কিন্তু সুমিতাদির সঙ্গে যখনই দেখা হয় তাঁর মুখের ভাব দেখে মনের কথা মনেই থেকে যায়, মুখে আসে না। কথাগুলো আর কথা থাকে না তখন তারা মনের পোকা হয়ে মনটাকে কুরে কুরে খায়। সুমিতাদি যে এত কঠিন, নির্মম হতে পারেন এ-কথা বিশ্বাস করতে পারে না সে।

যেদিন ভবেশ শশাঙ্কশেখরের বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে সেদিন তিনি নিজে এসেই তার সঙ্গে দেখা করেন। বেশ হাসি খুশি সন্তুষ্ট সন্তুষ্ট ভাব। সেই আগের দিনের মত। হাসি হাসি মুখে বললেন—কলকাতা গিয়ে ভাল কলেজে ভর্তি হোস কিন্তু। যখন যা প্রয়োজন আমাকে জানাস, পাঠিয়ে দেব। এই কথাগুলো বলেই একশো টাকার কয়েকটি নোট এগিয়ে ধরেন ভবেশের দিকে।

ভবেশ নেয়নি। বলেছিল—টাকার দরকার নেই। কথা কটি বেশ কর্কশ। বিশেষ করে শশাঙ্কশেখরের মত একজন সম্ভ্রান্ত জমিদারকে তাঁর মুখের ওপর এমন উদ্ধতভাবে কথাগুলো উচ্চারণ করা তার পক্ষে দুঃসাহসের কাজ। জমিদার শশাঙ্কশেখর যে যা খুশি করতে পারেন এ-কথা যে ভাবতে পারেনি। তখন তার কাছে টাকার কোন মূল্য ছিল না। সে যা হারাতে বসেছে তা টাকা দিয়ে কিনতে পারা যায় না।

ভবেশের কথায় শশাঙ্কশেখর খুশি কি ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন তা বুঝতে পারেনি সে। তিনি চোখ দুটো অপেক্ষাকৃত নত করে নির্বিকার চিত্তে চুপচাপ সরে পড়েন।

সমস্ত বাড়িটির অলিগলি ঘর বারান্দা তন্ন-তন্ন করে দেখে ভবেশ, কোথাও এতটুকু পরিবর্তন নেই। যেমনটি ছিল আগে তখনও তেমনি আছে। রেলিংএ আগের মতই রঙিন শাড়ি, ব্লাউজ, সায়া, ধুতি, পাঞ্জাবী, গেঞ্জি উড়ছে বাতাসে।

সুমিতাদির জন্য মেজাজ আরো বিগড়ে যায় ভবেশের। এত নির্মম, নির্দয় এই সুমিতাদি! জেনেশুনেও তার এই বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার সময় একবারটা তার সামনে এসে দাঁড়ালেন না কিংবা তাঁর ছেলেটিকে দেখালেন না!

কলকাতা এসে শশাঙ্কশেখর বা সুমিতাদি কারো কাছে কোন খবর দেয়নি

ভবেশ। মাঝে মাঝে ইচ্ছা হলেও মনটাকে সাত-পাঁচ কথা দিয়ে প্রবৃত্তি দমন করেছে। শশাঙ্কশেখরকে ভুলতে পারে সে কিন্তু সুমিতাদিকে কিছুতেই ভুলতে পারে না। শশাঙ্কশেখরের রূঢ়তা সহ্য করতে পারে, সুমিতাদির রূঢ় নির্মম আচরণ তার সহ্য হয় না। তাঁর ছেলেটিকেও খুব দেখতে ইচ্ছা করে। এতদিনে নিশ্চয়ই অনেক বড় হয়েছে সে। হাঁটতে পারে। সারা ঘর বারান্দা দিয়ে খুর খুর করে হেঁটে বেড়ায়। ভবেশের মনে হয় সে যেন তার চলাফেরার পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছে। কথা বলতে শিখেছে—বা-বা, মা-মা করে ডাকে, হৈ-চৈ করে। ভবেশ কথাগুলো শুনতে পাচ্ছে। তার বাপ মা হাসছে। বাড়ির দাসদাসী হাসছে। শুধু হাসতে পারছে না ভবেশ। তার মনের পাড় ভেঙে কান্না আসে। হয়ত সারাজীবন ধরেই এই রকম কাঁদতে হবে তাকে।

ভবেশের বিশ্বাস সুমিতাদি ভুলতে পারেনি তাকে। ভুলতে পারবে না কখনও। তাঁর মনের খাঁজে খাঁজে ভবেশের অনেক কথার ঢেউ আছে। সে-গুলো মাঝে মধ্যে তুফান তুলবেই, সুমিতাদি অনড় হয়ে তার কথা ভাবছে যেমন ভবেশ তাঁর কথা ভাবে।

ভবেশের বড় ভাল লাগে সুমিতাদিকে। এই রকম দয়া মায়ার শরীর বড় একটা চোখে পড়ে না। সে তাঁর কে তবু তার খাওয়া দাওয়া সাজসজ্জা সবই হতো সুমিতাদির খেয়ালে। নিকটে বসে খাওয়াতেন। বাইরে যাওয়ার সময়ে কোন জামা কাপড় পরবে, কোনটাতে তাকে ভাল মানাবে এ-সবই তিনি বলে দিতেন। ভবেশকে তাঁর মনের মত করে সাজিয়ে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকতেন তার দিকে। বলতেন—কী সুন্দর মানিয়েছে তোকে, একবার আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখ। কোন কোনদিন গাল টিপে, থোতনায় ঠোক্‌না মেরে বলতেন এখনও দুধ গলে, বড় কচি তুই। এই থেকেই ভবেশের একটা নতুন অনুভূতি জাগে মনে। অনুভূতিটা দিন দিন গাঢ়তর হতে থাকে। এজন্য খুব ভয় হতো ভবেশের, সুমিতাদির কিন্তু কোন ভয় ভীতি ছিল না। তিনি হাসি হাসি চোখে চেয়ে থাকতেন তার দিকে। ভবেশ মুখ নিচু করতো। তখন কি যে হতো ভবেশের তা বুঝতে পারতো না সে। লজ্জা, ভয়, সংশয় অথবা আরো অন্য কিছু! মুহূর্তের মধ্যে ভবেশের নিষ্পাপ মনে একটা পাপবোধ জন্ম নিত।

সুমিতাদি তাঁর নরম মিষ্টি হাত দিয়ে মুখটা উঁচু করে ধরে বলতেন—এত বড় হয়েছিস, আই, এ পড়িস তবু যেন কেমন কেমন।

ভবেশ স্মিতাদির দিকে তাকাতো। ভারি সুন্দর দেখাতো তাঁকে। তাঁর দেহে যেন মনের সমস্ত সুপ্ত রঙগুলো ফুটে উঠতো। গোলাপী ঠোঁট দুটো থর থর করে কাঁপতো। অপলক অতৃপ্ত চোখ দুটোর মণি জ্বলজ্বল করে জ্বলতো। এক ফাঁকে চোখ দুটো নামিয়ে দীর্ঘশ্বাস ছাড়তেন। জলে ভরে উঠতো চোখ দুটো। আবার পর মুহূর্তেই তার দিকে চেয়ে হেসে ফেলতেন। ভবেশের পিঠে মাথায় মুখে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলতেন—তুই বুঝি রাগ করেছিস ?

ভবেশ কি জবাব দেবে ভেবে ঠিক করতে পারতো না। তারপর এক ফাঁকে সাহস সঞ্চয় করে হেসে বলতো—রাগ করবো কেন, আপনি তো খুব ভালবাসেন আমাকে।

স্মিতাদি উচ্ছ্বসিত হয়ে হেসে উঠতেন।

চার বছর আগে আর পরে।

এই স্মিতাদির সঙ্গে তার পরিচয় ঘটিয়ে দেন জমিদার শশাঙ্কশেখর নিজে। তিনি গোলাপ ফুলটি তার হাতে দিয়ে উপরের তলায় তাঁর সাজঘরে নিয়ে যান তাকে। সিঁড়ি বেয়ে উঠতে পা টলছিল, গা কাঁপছিল ভবেশের।

ঘরে আর কেউ ছিল না, শুধু স্মিতাদি। তিনি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বুকের কাপড় খানিকটা আলগা করে পাউডার ছিটাচ্ছিলেন। বুকে হাত ঘষতে ঘষতে সেদিকে চেয়ে আনমনা হয়ে কি যেন ভাবছিলেন। পিছন ফিরে থাকলেও আয়নার মধ্যে দিয়ে সব কিছু দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল। ভবেশ লজ্জিত ও অপ্রতিভ হয়ে ওঠে। শশাঙ্কশেখর কিন্তু নির্বিকার। তিনি স্মিতাদিকে লক্ষ্য করে বলে ওঠেন--এই দেখ স্মু, কাকে নিয়ে এসেছি। এর সমস্ত ভার তোমার ওপর, মনের মত করে গড়ে তোল।

স্মিতাদি অত্যন্ত রাগ করেছিলেন মনে মনে। হওয়ার কথাও। এইরকম অসংবৃত অবস্থায় একটা অপরিচিত যুবকের সামনে…।

স্মিতাদি তাঁর নিজের রুচিমাফিক গড়ে তোলেন ভবেশকে।

শশাঙ্কশেখরকে খুব খুশিই দেখতো। স্মিতাদিকেও।

ধীরে ধীরে স্মিতাদি শশাঙ্কশেখরের সব কথাই বলেছিলেন ভবেশকে। তিনি বলেছিলেন—জমিদারের একমাত্র পুত্র শশাঙ্কশেখর। যৌবনে অপরিমিত অত্যাচার করে দেহ ও মনে তিনি আজ দেউলিয়া, বীতবহ্নি।

এর মাঝে কখন যে বর্ষা গিয়ে শরৎ আসে তার খেয়াল ছিল না ভবেশের। তারপর শরৎ গিয়ে হেমন্ত আসে। নদীর বুকে রোদ হাসে। ক্ষেতে সোনার ফসল ফলে। সুমিতাদির কোলে একটি শিশুর আবির্ভাব হয়।

ভবেশ লক্ষ্য করে হঠাৎ শশাঙ্কশেখর কেমন রূঢ় এবং সত্যিকার জমিদার হয়ে উঠেছেন। আর সুমিতাদি ঠিক রূঢ় না হলেও তেমন খুশি নন।

ভবেশ ছেলেটিকে দেখার জন্য কেমন উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ওঠে। দূর থেকে উপরের রেলিংএর দিকে তাকায়। ছেলেটির জামা কাঁথাকুথিগুলো মেলা রয়েছে। নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে ভবেশ। এরপর একদিন কাউকে না জানিয়েই সে নিরুদ্দেশ হয়।

বিনিদ্র রজনীতে স্বপ্নের মত সোনার অতীত চোখে চোখে ভাসে।

সহসা ভবেশের কি খেয়াল হয় সে ধড়মড়িয়ে বিছানা থেকে উঠে দাঁড়ায়। তখন ভোর হয় হয়। কলকাতার সমস্ত রাস্তাঘাট শান্ত। নিঝুম। হু হু করে দু'একটা মোটর চলছে। দু'চারটে লোকও। জায়গায় জায়গায় পুলিস পাহারা-ওলারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঝিমুচ্ছে। উদ্‌ভ্রান্তের মত ভবেশ শিয়ালদা স্টেশনে আসে।

দৌলতপুর স্টেশন। বেলা বারোটা। পাঁচ ঘণ্টার ওপর দৌলতপুরের সমস্ত রাস্তাঘাট দিয়ে পাগলের মত ঘুরে বেড়ায়। যেমন দৌলতপুর তেমনই আছে। কলেজটাও। শশাঙ্কশেখরের বাড়িরও কোন পরিবর্তন হয়নি। আগের মত রেলিংএ শাড়ি, সায়া, ব্লাউজ, ধুতি, পাঞ্জাবী, গেঞ্জি, ছোট ছোট অনেকগুলো রঙ বেরঙের জামা, ইজের মেলা হয়েছে। বাতাসে লুটোপুটি খাচ্ছে, এ ওর গায়ে এসে পড়ছে।

চারিদিকে তাকিয়ে ভবেশ সহসা দেখতে পায় একটা লোক পেরামবুলেটর ঠেলছে। এগিয়ে যায় সেদিকে। পেরামবুলেটরের মধ্যে বসে একটা ছেলে অস্পষ্ট অনেক কথা বলছে। ভবেশ হাত বাড়ায়। ছেলেটি চোখ দুটো বড় বড় করে তার দিকে তাকায়। একটু বুঝি হাসলো। ভবেশের মনে হলো এই চোখ ও হাসি বহুবার দেখেছে সে। ছেলেটির মুখ টিপে আদর করে। ছেলেটি আবার হাসে। সেই হাসি। ভবেশের মনে হয় সে যেন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেরই ছবি দেখছে!

আর সে স্থির থাকতে পারে না, ছুটে পালায় সেখান থেকে। সমস্ত পটভূমির মধ্যে ফাঁকটা কোথায় তা বুঝি টের পায় এতদিনে।

বিনয় সেনগুপ্ত

বিষ্ণু দে

আধুনিক বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে কবি বিষ্ণু দে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে আছেন। আধুনিক বাংলা কবিতা বললে, আধুনিকতার স্বরূপ নিধারণের কঠিন দায়িত্ব এসে যায়। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"বিশ্বকে ব্যক্তিগত আসক্তভাবে না দেখে বিশ্বকে নির্বিকার তদ্‌গতভাবে দেখাই আধুনিকতা। এই দেখাটাই উজ্জ্বল বিশুদ্ধ; এই মোহমুক্ত দেখাতেই খাঁটি আনন্দ।" রবীন্দ্রনাথের মতানুসারে বিশ্বের সমস্ত শ্রেষ্ঠ সাহিত্যই আধুনিক। আধুনিক বলে কোন চিহ্নিত কালের বিশেষ কোন সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য সাহিত্যের পক্ষে উল্লেখযোগ্য নয়। অর্থাৎ সাহিত্যের চিরকালীনতার দিক থেকে বিষয়টি আলোচনা হচ্ছে। কিন্তু যুগের ব্যবধানে, বিশেষ সাহিত্যের আবেদন ম্লান হয়ে যায়, এতেও কোন সন্দেহ নেই। অবশ্যই শুধুমাত্র কালপ্রভাব মেনে নিলে, বিভিন্ন যুগের সাহিত্যের মিলন সেতু, এমনকি সভ্যতার ইতিহাসে মানুষের মনের ও ভাবের ঐক্যসূত্রের বিষয়টি অমীমাংসিত থেকে যায়।

বিংশ শতকের তৃতীয় বা চতুর্থ দশক থেকে যে সাহিত্য বা কাব্য রচিত হয়েছে ও হচ্ছে, তার মধ্যে কালাতিক্রম করে স্থায়ী সাহিত্যে স্থান পাবার মত

শিল্পকর্ম আছে কিনা সন্দেহ। তবুও এ সাহিত্যে এমন কিছু আছে যা আগে ছিল না, এমন আকর্ষণ আছে যা অনাস্বাদিত।

আধুনিকতা কথাটা চরম অর্থে না নিয়ে আপেক্ষিক ভাবে নেওয়া যেতে পারে। আধুনিক যুগ, যন্ত্রের, বিজ্ঞানের আর সমাজচেতনার। সাহিত্য কোন বাস্তব চিন্তার প্রত্যক্ষ প্রতিফলন নয়। কাজেই প্রভাব বিচার বিশ্লেষণ করা কঠিন ব্যাপার। কবি যখন বলেন—"দাও ফিরে সে অরণ্য। লও এ নগর। বুঝতে হবে কবি যন্ত্রযুগ সম্বন্ধে সচেতন। বিজ্ঞান পদার্থ জগতের, মনস্তত্ত্ব মনের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে, আমিত্বকে প্রায় বাদ দিয়ে সবই বিষয়নির্ভর করে তুলেছে। কিন্তু সাহিত্যে 'আমিত্ব' অস্বীকার করা অসম্ভব। উপন্যাসে অবচেতন, সচেতন ও অচেতন মনের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া নিয়ে বহু পরীক্ষা চলছে। আকাশ, বাতাসের উদ্দাম বর্ণনায় কবিরা দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে পড়েছেন। গত যুদ্ধের পর থেকে মানুষের মধ্যে গণতন্ত্র, রাজনৈতিক ও আর্থিক অধিকার বোধ ক্রমেই স্বাধিকার লাভ করছে। মানুষকে সমাজের সঙ্গে মিলিয়ে দেখবার কথা মনোবিজ্ঞানীরাও বলছেন। সাহিত্য ও সমাজচেতনার পরিবেশ এসেছে। অনেকে মনে করেন, ব্যক্তিসত্তাই সাহিত্যের বিষয়; নিসঙ্গ মানুষের নীরব, অবচেতন সংশয়, তৃপ্তি, অতৃপ্তি নিয়েও সাহিত্য তৈরী হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে এও সমাজচেতনারই এক রূপ সামাজিক অস্বস্তি।এড়াবার জন্য ব্যক্তির মনস্তাত্ত্বিক জটিলতায় মগ্ন থাকা। কিন্তু "অন্ধ হোলে কি প্রলয় বন্ধ থাকে?" সংবেদনশীল সাহিত্যিক প্রলয় থেকে দূরে যেতে পারেন না। কাব্য দেহের গঠন, মনন, ভাব, প্রতিকল্প; সকল ক্ষেত্রেই আধুনিক জীবনের ছাপ খুঁজে পাওয়া যায়—অর্থাৎ বিজ্ঞানের বিষয় নির্ভর মননিরপেক্ষ বাস্তব বিশ্ব, মনস্তত্ত্বের আবিষ্কার, রাজনৈতিক মতবাদের জটিলতা, রাষ্ট্রনৈতিক অস্থিরতা অপ্রত্যক্ষ এবং সূক্ষ্ম জটিলতায় অবশ্যই সাহিত্য প্রভাব বিস্তার করে আছে। যারা ব্যক্তি-স্বাধীনতার নামে এসব সমস্যা বা বর্তমান যুগের চলমান (হয়ত অপ্রীতিকর) শক্তিগুলি এড়িয়ে যেতে চান, তারা অজ্ঞাতসারে জীবনকে সংকীর্ণ করে গেলেন, কখনও হতাশাময় মাধুর্য অস্পষ্ট আত্মকেন্দ্রিক কল্পনাবিলাস এসব কবিতায় একটা আপাতঃবৈশিষ্ট্য আনলেও এর আবেদন সীমাবদ্ধ। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কাব্য সাহিত্যে মানুষের জীবন বিধৃত হয়, টলষ্টয় বা রবীন্দ্রনাথ আধ্যাত্মিক বিশ্বাস নিয়েও জীবনমুখীন কাব্য ও উপন্যাস রচনা করেছিলেন। "বিশ্বাস নিয়েও" বলছি, এজন্য যে অনেকে মনে করেন অলৌকিক আধ্যাত্মিকতা বাস্তব জীবন থেকে মানুষকে সরিয়ে দেয়। কোন কোন বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর পক্ষে একথা প্রযোজ্য হোলেও সাহিত্যে এ কথা সঠিক নয়।

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাবের আত্যন্তিক ব্যাপকতায় সর্বদা সংকুচিত, অথচ সামাজিক জীবনে মিথ্যাচার, ভণ্ডামী, মানবতাহীন স্বার্থপরতা এমন সনিপুণভাবে দৃঢ়মূল হয়ে আছে যে একে মেনে নেওয়া অসম্ভব, অস্বীকার করাও অবাস্তব।

ব্যক্তি সমাজের দাস নয়, কলের পুতুল নয়, ব্যক্তিকে সংগ্রাম করতে হবে। সমাজের দুর্নীতি এড়াবার জন্য নয়, দূর করবার জন্য। কারণ সমাজের দুর্নীতি কেউ এড়াতে পারে না, যে হেতু জীবনধারণকরা দুর্নীতির সঙ্গে মিশে আছে— জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে। এ দায়িত্ব কবিরও; তাই কবির ধ্যানে, সুস্থ মানুষের জীবনবোধের পরিচয় থাকতে হবে। যে প্রেম মানুষকে জাগ্রত করে, যে ঘৃণা অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঘৃণা জাগাতে পারে—সে প্রেম, সে ঘৃণা, সে জীবন কবির কাব্যে থাকলেই তা সকলের কবিতা হবে।

আধুনিক কাব্যের দু'টি দিক স্পষ্ট। একটি হোল সমাজ ও পরিবেশ সচেতনতা, অন্যটি ইংরেজী ও পশ্চিম দেশীয় সাহিত্যের প্রভাব। সমাজ-সচেতনতা কাব্যকে বিস্মৃতি দেয়। সংকীর্ণ আত্মকেন্দ্রিকতা থেকে মুক্ত করে, রবীন্দ্রনাথের কবিতায় একটা প্রচ্ছন্ন দেশচেতনা সর্বত্র আছে,—তাঁর প্রকৃতি রূপায়ণে, প্রেমে, এমন কি বিশ্বদেবকে তিনি বিশ্বের সঙ্গে মিলিয়ে স্বদেশেই দেখতে পেয়েছেন। আধুনিক কাব্যে দেশচেতনা সমাজচেতনায় মিশে গেছে, কারণ বণিক সভ্যতার নগ্নতা, মানুষেধ মধ্যে শ্রেণী অস্তিত্বের ব্যবধানকে স্পষ্ট করে তুলেছে, দুঃখী ও দুঃখদাতাকে চিনতে না পারলে মানুষকে জানা যেন অসম্ভব হয়ে উঠেছে, তাই সমাজচেতনার প্রশ্নটি উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠেছে, কিন্তু অনেক দুবল কবি এ চেতনাকে যান্ত্রিকভাবে বা অ-সাহিত্যিকভাবে সাহিত্য ব্যবহার করেন। এতে মানুষের ব্যক্তিরূপ আচ্ছন্ন হয়ে যায়, আর রস সৃষ্টি ব্যাহত হয়।

ইংরেজী বা পাশ্চাত্য প্রভাবও আধুনিক কাব্যের বৈশিষ্ট্য। বঙ্কিম-মাইকেল যুগ থেকে আমাদের সাহিত্যে সাহিত্যে, পশ্চিমের প্রভাব সুরু হয়েছে। ইংরেজীভাব আমাদের সামাজিক জীবনে এবং সাংস্কৃতিক জীবনে এমন ভাবে মিশে গেছে যে আমাদেব চেতনায় পুব-পশ্চিমের সমন্বয় হয়ে গেছে। অজ্ঞাতসারে আমরা কিছু পরিমাণ ইংরেজ হয়ে গেছি।

"আমি পৃথিবীর কবি, / সেথা তার উঠে যত ধ্বনি/ আমার বাঁশীর সুরে সাড়া তার জাগিবে তখনি!" এ শুধু কবির আকাঙ্ক্ষা নয়, এ হোল সভ্যতার লক্ষ্য।

মিলনের পর বিশেষ গুরুত্ব দিতেন, এ মিলন বা সমন্বয় কাব্যের অন্যতম একটি প্রধান লক্ষ্য মনে করতেন। ইংরেজী প্রভাবকে যাঁরা সাহিত্যিক ভাবে ব্যবহার করেছেন, তাঁরা অনেকেই কাব্যের গঠনরীতিতে, চিত্রকল্পে, ভাবনায় অনেক নূতন সমৃদ্ধি এনেছেন। কিন্তু এর একটা বিপদের দিকও আছে। সমন্বয় যথার্থ না হলে তা ব্যর্থ অনুকরণ হয়। আমাদের দেশের জল, বাতাস, মানুষ আমাদের দেশের মতই হতে হবে। কবিতা বা উপন্যাস যদি বিদেশী সাহিত্যের অনুকরণ মাত্র হয় তবে তা আমাদের দেশের মানুষের আত্মপ্রকাশকে সাহায্য করে না। আমাদের এই শতকে বিশ্বভাবনা স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে, এ ভাবনাকে কাব্য সাহিত্যে বহন করতে হবে।

সুতরাং আধুনিক যুগের বৈশিষ্ট্য কৃত্রিম নয়, এ বৈশিষ্ট্য আকস্মিকও নয়। কিন্তু একে সুন্দর ভাবে রূপ দেওয়া কঠিন। অনেকেই আধুনিক কবিতা দুর্বোধ্য বলে অভিযোগ করেন। অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা নয়, কারণ অনেক ক্ষেত্রে আধুনিক কবিতা বেশী রকম আত্মকেন্দ্রিক, অনেক ক্ষেত্রে যান্ত্রিক—কলাকৌশলহীন। দুর্বোধ্যতা অনেক সময় পাঠকের অজ্ঞতা থেকেও মনে হতে পারে। আধুনিক কবিরা যে জটিল জীবনে, ছবি আঁকেন, অনেক পাঠক হয়ত সে সম্বন্ধে সচেতন নন। কিন্তু বক্তব্যহীন, সৌন্দর্যহীন দুর্বোধ্য গঠনরীতি দিয়ে কবি যখন জীবনবোধের দৈন্য প্রকাশ করেন, সে দুর্বোধ্যতা নিসঃন্দেহে নিন্দার্হ। প্রকাশরীতিই কাব্যের প্রধানতম ঐশ্বর্য, শব্দচয়নে, চিত্রকল্প ব্যবহারে কাব্যবোধের পরিচয় না থাকলে তা শুধু দুর্বোধ্য নয়, অবোধ্য এবং অপাঠ্য হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের কবিতা ভাবের দিক থেকে সহজবোধ্য নয়, কিন্তু গঠনরীতিতে দুর্বোধ্যতা নেই। অন্য দিক থেকে আবার আলোচনা হতে পারে যে গঠনরীতি ও ভাবনা পরস্পর অচ্ছেদ্য। আধুনিক জীবন জটিল বলে, তার কাব্যিক প্রকাশরীতিও জটিল, এ বক্তব্যও অযৌক্তিক নয়। কিন্তু সাহিত্য ব্যাপারটাই সমাজের "সহিত", কাজেই পাঠকের দিক থেকেও বলবার কিছু আছে। কাব্য সূক্ষ্ম ও সুন্দর ; কাঠিন্য ও জটিলতা তার অপরিহার্য ভূষণ কোন কারণেই হতে পারে না।

আধুনিক কাব্যের স্বরূপ নির্ণয়ের এ সীমাবদ্ধ প্রচেষ্টার পরিপ্রেক্ষিতে বিষ্ণু দের কাব্যরচনার বৈশিষ্ট্য আলোচনা করলে তাঁকে সার্থক আধুনিক কবি বলতে হয়। কবি বিষ্ণু দে দীর্ঘকাল কবিতা চর্চা করে এসেছেন। তাঁর কাব্যরীতি ঋতু বদল করেছে, বুদ্ধিতে উজ্জ্বল তাঁর কাব্য, তাঁর কাব্যসাধনায় স্থির সংযম, ধীর

সৌন্দর্যকে অম্লান রেখে সমন্বিত হয়েছে।

কবি জীবনের সুরুতে কবি রোম্যান্টিক কবিতাতে আত্মপ্রকাশ করেন। রোম্যান্টিক ভাব সরল নয়। অতীন্দ্রিয় জগতের দিকে অস্পষ্ট আভাস, আলো-আঁধারের গোধূলি রহস্য এ রোম্যান্টিক দৃষ্টিতে নেই। কবি প্রচ্ছন্ন নিরাশা, বিক্ষুব্ধ ও অশান্ত মন নিয়ে প্রেম ও পৃথিবীকে দেখছেন। হৃদয়াবেগ সপ্তমে, কল্পনার বেশ সীমীত, কাব্যের গতি দূরগামী—বুদ্ধি, দেশ ও সামাজিক অভিজ্ঞতা কবিকে নির্ভেজাল স্বপ্ন থেকে বঞ্চিত করেছে, তবুও স্বপ্ন দেখেন কবি—দূর অতীতের, অনাগত ভবিষ্যতের :

"হেলেনের প্রেমে আকাশে বাতাসে ঝঞ্ঝার করতাল।
দ্যুলোকে ভুলোকে দিশাহারা দেবদেবী।"

*　　　*　　　*　　　*

"ক্রিসিডা : তোমার থমকানো চোখে চমকায় বরাভয়।
আশ্লেষে তব অনন্ত স্মৃতি ক্রতুকৃতমের শেষ
তোমাতেই করি মত্ত মরণে জয়।"

প্রেম বার বার আসে, কবির বার্ধক্য বাসরে ; চৈত্রের চঞ্চল প্রেম যখনই কবির দরজায় আঘাত করে, কবি খোঁজেন—কোথায় পুরুষকার ?

এ যুগে উর্বশী বিভ্রান্ত—

"ব্যর্থ ধনঞ্জয় আজ, হে ভদ্রা আমার।
হে সঞ্জয়, ব্যর্থ আজ গাণ্ডীব অক্ষয়।"

বিষ্ণু দে ব্যর্থপ্রেমের যে বিরাট পটভূমি তৈরী করেছেন, শতরূপে শতবার তা প্রেমকে লোকোত্তর মহিমায় প্রকাশ করেছে, আত্মকেন্দ্রিক দুর্বল রোম্যান্টিক প্রেমের চেয়ে এ প্রেম অনেক গভীর, অনেক কঠিন।

কবি ভীরু হৃদয়ের দ্বারা উন্মোচন করতে চেয়েছেন—

"হালকা হাওয়ায় বল্লম উঁচু ধবো
সাত সমুদ্র চোদ্দ নদীর পার—
হালকা হাওয়ায় হৃদয় দু'হাতে ভরো,
হঠকারিতায় ভেঙে দাও ভীরু দ্বার।"

আমাদের নিরুদ্ধ জীবনে 'ঘোড়সওয়ার' আসুক, চোরাবালির ছলনা থেকে জীবনে সত্য অঙ্গীকার আসুক। প্রেমের অনন্ত অভিসার পৃথিবীর সীমা পার হয়ে মৃত্যুর সঙ্গে জীবনকে মিলিয়ে দেবে। পৃথিবী ছেড়ে শূন্যতার অশেষ সাগরে ঝাঁপ দিতে কবি দ্বিধাগ্রস্থ। তার চেয়ে প্রেমকে কাব ফিরিয়ে দেবেন—আমরা

রুদ্র বজ্রপাণিই আমাদের সাথী।

আমাদের অনুভূতি কবির ভাষায় নবরূপায়ণ হয়েছে। যে জীবনবোধ আমাদের ঘিরে আছে—তা আসলে অস্পষ্ট। আধুনিক যুগের যন্ত্রণা আর অনিশ্চয়তা হৃদয়াবেগকেও আবিল করে তুলেছে; মানুষ মানুষের সঙ্গে সহজ ব্যবহার ভুলে গেছে, আত্মকেন্দ্রিক সংকীর্ণ বাতায়নে অনেকে পালাতে চান, কিন্তু সাধারণ ভাবে জীবনের চলমান দিকটি হোল বঞ্চনা, আর স্বার্থপরতার। তবু, মানুষের মুক্তি মানুষের মধ্যেই—"যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে মুক্ত কর হে বন্ধ।" কবি বিষ্ণু দের সমস্ত কাব্যভাবনার মধ্যে আধুনিক জীবনের এ ছলনার রূপটি সুন্দর ভাবে ফুটেছে, কবি মানুষের সঙ্গে মিলনের আকুতিও প্রকাশ করেছেন সর্বত্র। এ প্রকাশে একটা বৈশিষ্ট্য আছে—হৃদয়াবেগ দিয়ে সকলকে আহ্বান করেন নি, বিশ্লেষণ করেছেন আমাদের জীবনকে, প্রায় বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের মত বিশ্লেষণের পথ ধরেই 'মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনের অপরিহার্য প্রয়োজনের সিদ্ধান্তে কবি পৌঁছেছেন। সমাজতাত্ত্বিক সত্যের মত একটা সত্য সিদ্ধান্তে কবি আসতে চেয়েছেন। কিন্তু কাব্যিক সৌন্দর্য অম্লান। 'প্রচ্ছন্ন স্বদেশ' কবিতায় কবি স্বদেশের যে ছবি দিয়েছেন তা, "যেদিন সুনীল জলধি হইতে" বা "হে মোর চিত্ত পুণ্য তীর্থ" কবিতার মত নয়। কবি ফিরে ফিরে যেতে চেয়েছেন সাধারণ্যে, যে সাধারণ জনের মধ্যে প্রকৃতি, ঐতিহ্য মিশে আছে। দেশ আমাদের কাছে চির নূতন।

> তবু তাকে পাওয়া আজো হল না নিঃশেষ
> বাহুর নাগালে নেই অস্পষ্ট অধরা
> অথচ সূর্যের মতো সত্য মাটি যেন ফসলের কাছে,
> * * * *
> তবু তাকে খুঁজি সারাক্ষণ
> খুঁজি সাধারণ্যে তাকে সাধারণে জনতার চকিত নিবিড়ে
> * * * *
> সাগর উত্থিতা উল্লাসে শপথে শপথে
> দীপ্ত মিলিত ভাষায়
> লবনাম্বুরাশি রাশি নিবদ্ধ ধারায় মেলে বনরাজি নীলা
> সভায় মিছিলে তোমাদের আমাদের ভিড়ে।

মানুষ ও প্রকৃতি মিলে বিস্ময় বিমুগ্ধ ছবি আমাদের দেশ-মানুষও—যেমন প্রকৃতিও তেমনি দেখার মধ্যে অদেখা, ধরার মধ্যে অধরা। দেশ কোন দিন পুরান হয় না, কারণ মানুষ চিরনূতন। মানুষ নিয়েই দেশ।

'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ' কাব্যগ্রন্থটি কবির পরিণত মনন বহন করে। এতদিন তিনি বিভিন্ন কবিতায় যে বক্তব্য বলেছিলেন, তা আরো গভীর সুরে এ গ্রন্থটিতে প্রকাশ হয়েছে, 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ' কবিতাটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ কবিত্যটিতে কবি, অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানকে মিলিয়েছেন। কালের মধ্যে, দেশের মধ্যে, ইতিহাস চেতনার মধ্যে সত্তার রূপ খুঁজেছেন। এ কবিতাটির গঠনরীতিও আশ্চর্য। ইংরেজ কবি এলিয়টের প্রভাব এখানে স্পষ্ট, তাঁর কাব্য সূত্রের প্রয়োগও রয়েছে, কিন্তু বিষ্ণু দের স্বকীয়তা অম্লান আছে।

আমাদের চৈতন্যের স্মৃতি হোল "ভূমিদাস স্মৃতির যন্ত্রণা"। পরাধীন ভারতবর্ষে সকলেই ভূমিদাস। তবুও ভূমিদাসেরা স্বাধীনতার সংগ্রাম করেছে। "শচীশকে বিনয়কে, তবু গোরা আরো বহু স্বদেশী ছেলেরা / কলকাতাকে চিনেছিল, সুস্থ হতে চেয়েছিল সম্পূর্ণ স্ববশ" / কিন্তু আজ দেশ স্বাধীন, তবুও চারিদিকে মুমূর্ষ বিকার, অবান্তর উন্মাদ বিলাসী খেলা। কবি প্রার্থনা করেন— "রৌদ্র হানো, বান দাও, হে সূর্য, হে চৈতন্য আকাশ / এই নিত্য অপঘাত দূর করো।" বর্তমান কালের একটি ছবি দিচ্ছেন কবি—

> "এ নরকে,
> মনে হয় আশা নেই জীবনের ভাষা নেই,
> যেখানে রয়েছি আজ সে কোনো গ্রাম নয়, শহরও তো নয়,
> প্রান্তর পাহাড় নয়, নদী নয়, দুঃস্বপ্ন কেবল
>
> *   *   *   *
>
> সেখানে মড়ক অবিরত
> সেখানে কান্নার সুর একঘেয়ে নির্জলা আকালে
> মরমে পশে না আর, সেখানে কান্নাই মৃত
> কারণ কারোই কোন আশা নেই—"

চৈতন্যের মড়কের মধ্যে মানুষ আপন সত্তা খোঁজে। সত্তা বিকাশে বিকৃতিই যুগ যুগ ধরে সভ্যতার সংকট সৃষ্টি করেছে। তাই আগামী যুগের রাজার ছেলে আর রাজার মেয়ে প্রতীক্ষা করছে—আপন স্বভাবের প্রতিষ্ঠার জন্য।

> "আমরা নরকে আছি, অথচ সে জ্ঞান নেই মনে
> তাই বিবাহসভায় প্রচ্ছন্ন নরকে আজ বর নেই,
> অথচ রাজার মেয়ে এবং রাজার ছেলে নরকের দেউড়িতে
> রাস্তায় প্রস্তুত আছে স্বাগতের প্রতীক্ষায়,
> শুধু স্বভাবে প্রতিষ্ঠা চায় প্রতিবাদে
> প্রাণ মান চায় বরাভয়, তারাই যে বর কনে—

এলিয়টের ওয়েষ্ট্‌ল্যাণ্ডের সঙ্গে নরক বর্ণনায় এ কবিতাটি সমধর্মী, কবির উপসংহার এলিয়টের মত হতাশাব্যঞ্জক নয়, কারণ বিষ্ণু দে ভবিষ্যতে বিশ্বাস করেন। এ কাব্য সংকলনে আরো অনেক উল্লেখযোগ্য কবিতা রয়েছে। কবির গঠনরীতির বৈশিষ্ট্য ও মননরীতি দুই-ই এ কাব্যগ্রন্থে স্পষ্ট। স্বহস্তে বাজাবে, কবিতায় আমাদের স্বাধীনতা লাভের পরও দাস মনোভাবের, দেশের সাধারণ জীবন থেকে বিচ্যুত থাকবার মিথ্যা দম্ভ থেকে মুক্ত হবার আহ্বান করছেন, "বিশ্বকে মেলাতে পারো ঘরে / নবান্নের মতো আড়ম্বরে।" নবান্নের মত আড়ম্বরে ছত্রটির একটি বিশেষ ব্যঞ্জনা আছে। আমাদের জীবনবোধকে দেশের দিকে, দেশের মাটির দিকে, সাধারণ মানুষের দিকে আনতে হবে, তবেই বিশ্ব সেখানে মিলবে। আমরা ইংরেজী ফরাসী কাব্যসাহিত্য আর পোশাক পরিচ্ছদে যে কৃত্রিম জীবনের মহিমায় মগ্ন হই তা যে লজ্জার সে কথাও ভুলে গেছি আমরা, 'আমিও তো' কবিতায় প্রকৃতির সঙ্গে মনের মিলনের বিচিত্র রীতি অনুভব করা যায়। সারা মনে প্রাণে মেঘের কাঙাল সত্তা পোড়া ক্ষেতের জন্য জল প্রার্থনা করে।

"আমার ও স্নায়ুতে আজ মাটির আষাঢ় / পাকে পাকে হয়ে ওঠে বর্ষার উৎসব / হৃদয় ভাসায়, নামে ঢল / মুক্তাবিন্দু গেঁথে গেঁথে লাবণ্যে চৈতন্য ভরি / গলায় পরাই তাকে যার বাহু আমার গলায় / শরীরের অন্ধকার হয়ে ওঠে মেঘময় গান / তীব্র ছটা সূর্যোদয়-সূর্যাস্তের স্তব।" মেঘের সঙ্গে ফসলের যে সম্বন্ধ, বর্ষার ধারার সঙ্গে নূতন ফসলের যে সম্বন্ধ কবি সে সম্বন্ধ দিয়ে মেঘের বর্ণনা দিয়েছেন—রঙে নয়, রূপে নয়, সমারোহে নয়—মাটির সঙ্গে মিশে থাকবার সম্বন্ধকে নবজীবনের লাবণ্যময় চৈতন্যধারায় এক করে দিয়েছেন।

মুখ তো দেখিনি কবিতায় প্রতীক ও ব্যঞ্জনার অপূর্ব সমন্বয় করেছেন। সমস্ত কবিতাটির মধ্যে স্থপিত পায়ের চলার ছন্দ রয়েছে। "দেখেছি পৃথিবী সমতায় স্মিত আদরে উন্মুখর। শুনেছি কেবল পায়ের দশটি পাপড়ির মৃদু-ভাষা।"—"সে যে প্রাণ-উচ্ছল। আমার প্রাণ ও পিয়াল তরুতে থরো থরো সে কি আশা।"—"ভরেছে আমার জীবনে আকাশ, প্রতিটি দিনের সৃষ্টি। দেখেছি সে মুখ; তাই তো আজকে সত্য আমার স্বপ্নে।" যে সত্য আমরা অন্বেষণ করি তা পৃথিবীতেই আছে, প্রাণের উচ্ছ্বাস, আকাশের ব্যাপ্তিতেই, সূর্যই প্রাণের কেন্দ্র, বাইরের এ আলো এ বাতাস, পাপড়ির এ মৃদুভাষাই অন্তরের স্বপ্ন হয়ে ওঠে, তাই কল্পনা সত্য।

কবির গঠনরীতির বৈশিষ্ট্যও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অনেক সময়

প্রথম পাঠে অনেক কবিতাতেই অকারণ কাঠিন্য আনা হয়েছে মনে হয়, একটু মন দিয়ে পড়লেই সে ভুল ভেঙ্গে যায়। ইংরেজী ও গ্রীক দেশীয় নাম বা লাইন, সংস্কৃত শ্লোকের অংশ, রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতার একটি ছত্র (কাল রজনীতে ঝড় হয়ে গেছে রজনীগন্ধা বনে) ব্যবহার করা হয়েছে।

এতে কবিতার মূল বক্তব্য বোঝবার সুবিধা হয়েছে কিনা বলা কঠিন, তবে সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সমন্বয়ের এ চেষ্টার একটি বৌদ্ধিক মূল্য আছে। এ কৌশল এলিয়টও খুব ব্যবহার করতেন। বিষ্ণু দে-র গঠনরীতির সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল সংযত শব্দচয়নে। এক একটি বিশেষণ দিয়ে বা সহজ উপমা দিয়ে সুন্দর ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছেন কবি। কবি চিত্রকল্প রচনায় খুব ব্যস্ত নন, কারণ সর্বত্রই তিনি ভাবনাকেই বড় করে দেখেছেন। সুপ্ত রোমান্টিক ভাব তার গভীর ভাবনাকে সুন্দর করে তুলেছে। "তোমার চাউনি বরাভয়। তীক্ষ্ণ দুপুরে ছায়া মেলেছিল শতমেঘ। খর মুহূর্তে আঙুল বিছালে মোলায়েম" ইত্যাদি ছত্রগুলিতে সুন্দর চিত্রকল্পের আভাস আছে। কবির সব চেষ্টা হল শেষ কথাটি বোঝাবার—সূর্যের শান্ত শুদ্ধ সাহসে। আসন্ন রাত করবে কি আজ মোলায়েম ?" চপলতা থেকে পরিণতিতে, ব্যক্তি থেকে সমষ্টিতে; আত্মকেন্দ্রিকতা থেকে দেশের মাটির দিকে কবি বার বার এসেছেন। তাই ভাবনাকে, বুদ্ধিকে কল্পনার সঙ্গে মিশিয়েছেন, হয়ত সহজ স্বচ্ছন্দ ছবি আঁকবার তাগিদ অনুভব করেননি। গভীর অনুভূতিকে গভীর ভাবে প্রকাশ করেছেন ও প্রকাশরীতির দ্বারা অনুভবকে গভীরতর করেছেন।

মিহির পাল

সীমানা পেরিয়ে

সূর্য দিগ্‌বলয়ের আড়ালে চলে যাবার পর রেল লাইনের উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তে যখন ডিসটাণ্ট সিগনালের লাল ও সবুজ আলোগুলো স্পষ্ট প্রত্যক্ষগোচর হচ্ছিল—ঠিক সে সময় ট্রেণখানা নির্জন বন্দরে এসে নোঙর করার মত ছোট্ট ষ্টেশন দেবীপুরে এসে দাঁড়িয়েছিল, এবং জলের বুকে আলোর প্রতিফলনের মত প্ল্যাটফরম আর ওপাশের ডাউন লাইনের ওপর ছড়িয়ে পড়া ইলেকট্রিক ট্রেনের আলোর প্রতিভাস ও কিছু লোকের দ্রুত নেমে পড়া স্থানটিতে খানিক সজীবতা সঞ্চার করেছিল। কিন্তু ইলেকট্রিক ট্রেনের তার সমস্ত উজ্জ্বল আলোর অঙ্গসজ্জাসহ অপসৃত হওয়া ও স্থানীয় লোকগুলোর পোটলাপুটলী অথবা রেশন বা পোর্টফলিও ব্যাগ নিয়ে ষ্টেশন চত্বর পেরিয়ে স্ব স্ব গন্তব্যস্থল অভিমুখে যাত্রা করার সাথে সাথে আবার সেই থমথমে নৈঃশব্দ্য, ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক, রেলওয়ে কোয়ার্টার্সের দিক হতে ভেসে আসা শিউলি ফুলের সুবাস—ছোট্ট অখ্যাত ষ্টেশনটিকে আবার স্বকীয় গ্রাম্য স্বভাবে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। টিম টিমে গ্যাস বাতিগুলোর চারপাশের স্তিমিত আলো সেই নির্জনতার রহস্যটিকে যেন আরও ঘনীভূত করেছিল।

অনাদিপ্রসাদ ট্রেণ থেকে নেমে ষ্টেশন মাষ্টারের ঘরের দিকে যাচ্ছিলেন। তার বগলে ষোল টাকায় কেনা চকচকে একটি পোর্টফলিও ব্যাগ। তার ভেতরে ঠিকানা, নানা প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় তথ্যাদিসহ গত বছরের একটি ডায়েরী, শূন্য টিফিনের কৌটা, কিছু পুরোন চিঠিপত্র, খুচরো কাগজ, ডাক্তারের পুরোন প্রেসক্রিপসন, জমির খাজনার রসিদ ইত্যাদি আর কি কি রয়েছে জিজ্ঞাসিত হলে অনাদিপ্রসাদের পক্ষে সদুত্তর দেওয়া কঠিন।

অনাদিপ্রসাদ ষ্টেশন মাষ্টার সুশান্তবাবুর ঘরের দিকে চলতে গিয়ে একটু ঝুকে ঝুকে হাঁটছিলেন। এ সময়টায় রোজই তাকে পরিশ্রান্ত অথবা অন্যমনস্ক দেখায়, এবং একটু বয়স্কও। নিত্যকার আড্ডা দিতে দিতে চা কাপ শেষ করার পর তিনি যখন বেরিয়ে আসেন এবং রেল লাইন ধরে উত্তর দিকে কয়েক মিনিট হাঁটার পর যখন বাঁ দিকের লেভেলক্রসিংএর রাস্তা ধরে নেমে পড়েন, তখন তাকে অত্যন্ত ব্যস্ত ও গৃহকাতর মনে হয়। তারপর রায়েদের বাড়ীর পাশের সড়কের ওপর দিয়ে বুড়োবটতলার কোল ঘেসে মিত্তিরদের দীঘির পাড় দিয়ে তিনি দ্রুত পা বাড়ান।

কিন্তু এখন ষ্টেশনে তিনি ল্যাভাটারির পাশ ঘেঁসে ধীরে ধীরে হেঁটে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ দেয়ালে চোখ পড়তেই অনাদিপ্রসাদ ভীষণ চমকালেন এবং চমকে দাঁড়ালেন। ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াগুলোর দ্রুততা এতই স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ যেন মনে হতে পারে যে আততায়ীর আকস্মিক উদ্যত ছোরা তার চোখের সামনে ঝলসে উঠেছে। হয়ত ব্যাপারটি অনাদিপ্রসাদের কাছে তার চেয়েও গুরুত্বপুর্ণ। এক অপ্রত্যাশিত বিপদের মুখোমুখি হবার মত তার এক আকস্মিক উদ্‌ভ্রান্ত চেহারা। ল্যাভাটারির দেয়ালের ওপরে তার দৃষ্টি বিস্ফারিত। আসলে তার প্রিয় প্রাণভ্রমরার হননের যে সর্বমুখী পরোক্ষ আয়োজনের ব্যাপকতা সর্বসময় তাকে বিদ্ধ করে, করতে থাকে—তার সূচীমুখের এক তীক্ষ্ণ আস্বাদন সেইক্ষণে তাকে প্রচণ্ড এক সংকটের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। অনাদিপ্রসাদ চিল-চীৎকারে বিস্তৃত হতে চাচ্ছিলেন।

কাঁধের পরে ঠিক সে সময় কার এক স্নেহশীল হাতের স্পর্শ তিনি অনুভব করলেন। সে হাতের অধীশ্বর অধিদেবতার মতই যেন স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলল—পোষ্টারগুলো দেখে কষ্ট পাচ্ছেন তো! যুদ্ধটা শহরাঞ্চল পেরিয়ে এই অজ পাড়াগাঁয়ে এসেও হানা দিচ্ছে। অনাদিপ্রসাদ ঘুরে দাঁড়িয়ে ষ্টেশন মাষ্টার সুশান্তবাবুর মুখোমুখি হলেন। যেন বিশ্বের কোলাহল, চিৎকার, দুন্দুভি নিনাদের পরিপ্রেক্ষিতে জনশূন্য ষ্টেশন প্ল্যাটফরমের আবছা আলোর বিষণ্ন ছায়ায়

দুটি যন্ত্রণাকাতর মানুষ নিজেদের অসহায় একাকীত্ব আবার নোতুন করে অনুভব করল।

সুশান্তবাবুর মন্তব্যের উত্তরে অনাদিপ্রসাদ ম্লান কণ্ঠে বলল—সে জন্যেই তো ভয় সুশান্তবাবু। দেবীপুরকে আমি এখনি একটি এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করতে চেয়েছিলাম যেখানে মানুষের পক্ষে মুক্তমনে স্বচ্ছন্দ বিচরণ সম্ভবপর। তাই ছেলের মানসিক বৃত্তিগুলোর স্বাভাবিক স্ফুরণের সুযোগ সন্ধানেই এককালে দেবীপুরে এসে আমি বসতি গড়ে তুলেছিলাম। ভেবেছিলাম দেবীপুরে ভীতি, লোভ, কলুষ, বিভীষিকা ও অন্যায় প্রভৃতির ছায়াপাত ঘটবে না। কিন্তু আমার আশা আকাঙ্খার শুভ্রতা, উজ্জ্বলতা কেবল কীটদ্রংষ্ট্র ফলের মত মলিন ও অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়ল। কথা বলতে বলতে অনাদিপ্রসাদ অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন। মাথা ঘুরিয়ে রেল লাইনের আঁধারের মাঝে কি যেন এক ঈপ্সিত বস্তুর তিনি সন্ধান করলেন। শুধু একরাশ জোনাকী পোকা অন্ধকারের মধ্যে বিন্দু বিন্দু আলো ছড়িয়ে কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেল।

সুশান্তবাবু ডাকলেন—চলুন, কানাই চা আনতে চলে গেছে। আমার ঘরে আসুন।

সুশান্তবাবুর পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে অনাদিপ্রসাদ বলছিলেন- আসল কথা কি জানেন সুশান্তবাবু। একদল সভ্য মানুষের পক্ষে শান্ত মস্তিষ্কে আর একদল নিরীহ মানুষ নিধনের আয়োজন করা সম্ভবপর একথা ছেলের কাছে স্বীকারে আমি লজ্জা অনুভব করি। কারণ মানুষে মানুষে হানাহানির গোটা বিষয়টিই আমার এতকালের প্রদত্ত শিক্ষাধারার বিরোধী হয়ে দাঁড়াবে। অথচ দেখুন কাগজে কাগজে আসন্ন যুদ্ধের বার্তা ছড়াচ্ছে, রেডিওর সংবাদে তা আভাসিত হচ্ছে। চায়ের দোকানে দোকানে, বুড়োদের মজলিশেতে, খেলার মাঠে, পল্লী পঞ্চায়েৎ অফিসে—সর্বত্রই আলোচনায় উত্তেজনায় লোকগুলো যুদ্ধের গন্ধটাকে ছড়াচ্ছে। লক্ষ্য করে দেখছি আমার ছেলেটিকেও যুদ্ধের চিন্তাটা যেন কেমন নেশার মত পেয়ে বসেছে। ষ্টেশন মাষ্টারের টেবিলের পরে পোর্টফলিও ব্যাগটি রেখে অনাদিপ্রসাদ অন্যমনস্ক ভাবে একটা চেয়ার টেনে বসলেন।

চায়ের কাপ টেনে নিলেন অনাদিপ্রসাদ। ধীরে ধীরে গুটি কয়েক চুমুকে চা টুকু গলাধঃকরণ করে তিনি এক দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করলেন। তারপর গভীর মর্মবেদনা প্রকাশের মত দীর্ঘ বিলাপোক্তির সুরে তিনি কথা বললেন—জানেন, নয় বছরের ছেলে অতু আমায় রোজ ঘুরে ফিরে জিজ্ঞেস করবে পাহাড়পুরের লোকেরা নাকি আমাদের ওপর বোমা ফেলবে? না হলে কালী-

তলায় কামান বসাবে কেন? বুঝলে বাবা, ক্লাশ টিচারের মুখে শুনে আমরা সবাই দেখতে গিয়েছিলাম। ইয়া পেল্লায় এক কামান বসিয়েছে। নান্টুর বাবা বলছিল যে বম্ বম্ করে নাকি সব গোলা বেরোবে কামানের মুখ দিয়ে। কি মজা হবে দেখতে। আচ্ছা বাবা, পাহাড়পুরের লোকেরা আমাদের বাড়ী ঘরের ওপর বোমা ফেলবে কেন? আমরা ওদের কি করেছি?

একটু দম নিয়ে অনাদিপ্রসাদ নরম সুরে বললেন—জানিনা, কতকাল এই এক ধরণের নেতিবাচক বালির বাঁধ দিয়ে ছেলের এ ধরণের কৌতূহল আর প্রশ্ন ঠেকিয়ে রাখতে পারব! সান্ত্বনার সুরে সুশান্তবাবু বললেন—এত ভাবছেন কেন। অতু এখনও ছেলেমানুষ।

অনাদিপ্রসাদ সাথে সাথে জবাব দিল—ছেলেমানুষ বলেই তো আরও ভয় সুশান্তবাবু। জানেন, কোন কোন দেশে এই স্বাভাবিক সময়েও স্কুল বাড়ীর পাশাপাশি মাটির তলায় সব প্রিফেব্রিকেটেড কনক্রিটের রাশিরাশি বাড়ী তৈরী হয়েছে। সেই সব দুগ্ধপোষ্য শিশুগুলোকে যুদ্ধে আত্মরক্ষায় অভ্যস্ত করার মানসে মাঝে মাঝে নকল সাইরেন বাজান হয়। আর সাথে সাথে ছাত্ররা শিক্ষাভবন পরিত্যাগ করে মাটির তলাকার নিরাপদ ভবনে আশ্রয় নেবার মহড়া দেয়। ভেবে দেখুন সুশান্তবাবু, যে পৃথিবীতে শিশুদের কাছে শিক্ষাভবনের চেয়েও বাঞ্ছিত কোন আলয় থাকে তাদের ভবিষ্যৎ কোন সুস্থ পরিবেশের ওপর গড়ে উঠছে। আর মানুষ সম্বন্ধেই বা তাদের কোন অভিজ্ঞান জন্মাচ্ছে। এটা কি আসলে শিক্ষাধর্মেরই বিরোধী হয়ে দাঁড়াচ্ছে না?

কিছুটা তো বটেই! তবে দেবীপুর সম্বন্ধে বোধ হয় এতটা আশাহত হবার কারণ ঘটেনি। সুশান্তবাবু সান্ত্বনা দেওয়াটা কর্তব্য বিবেচনা করলেন। অনাদিপ্রসাদ কথাটা শুনে শান্ত হতে পারলেন না। আসলে সচিত্র প্রাচীর-পত্রগুলো দেখার পর থেকে তিনি ভেতরে ভেতরে কেমন উত্তেজনা বোধ করছিলেন। এক প্রচ্ছন্ন অশুভ আভাষ তাঁর মনে বারংবার বিদ্যুৎ রেখা এঁকে এঁকে যাচ্ছিল। এক সময় তিনি অস্থিরপদে বেরিয়ে পড়লেন।

উত্তর দক্ষিণ বিস্তৃত রেল লাইনটায় এখন বুকজোড়া অন্ধকার আর বুনো ঝোপঝাড়ের গন্ধ। মাঝে মাঝে জোনাকির নিঃশব্দ শান্ত আলোকোৎসব। অভ্যাসগত ভাবে কাঠের স্লিপারে মেপে মেপে তিনি পা ফেলছিলেন। কিন্তু অন্যান্য দিনের মত সে চলায় প্রাণাবেগের স্পর্শ ছিল না।

একমাত্র ছেলে অতু সম্পর্কিত চিন্তার গতিরোধ করা অনাদিপ্রসাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না। তিনি বুঝতে পারছিলেন, যুদ্ধের গন্ধটা যেন আকাশ

বাতাস লোকালয় হতে চুইয়ে চুইয়ে অতুর শিশু মনের ওপর কৌতুহলের আবছায়া ছড়াচ্ছিল। ফুলের বুকে পোকা লাগার মতই তিনি অবস্থাটিকে অসুন্দর, অনিষ্টকর ও অস্বাভাবিক বলে বিবেচনা করছিলেন। তাই তিনি ফু দিয়ে জামা কাপড়ের ওপর ঝরে পড়া সিগারেটের ছাই উড়িয়ে দেবার মত করে ছেলের এ ধরণের অনুসন্ধিৎসা সমূলে বিনষ্ট করার চিন্তায় নিরত ছিলেন।

কিন্তু সর্তকতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে রাস্তার আলোগুলো যখন নেভান হল, কালীতলা ঘোষপাড়া চড়ক মাঠে যখন একে একে বিমান বিধ্বংসী কামানগুলো বসান হল তখন অনাদি প্রসাদের পক্ষে সবকিছু উড়িয়ে দেওয়া দুরুহ হল। মাইল পাঁচেক দূরত্বে অবস্থিত ছোটখাট বিমানঘাঁটিটি যে কোনদিন পাহাড়পুরের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হয়ে পড়তে পারে—সে সম্ভাবনা তিনি আর জোরাল কণ্ঠে উড়িতে দিতে পারছিলেন না। আর সে সময় ইতস্তত বিক্ষিপ্ত আগ্নেয়াস্ত্রের আশেপাশের জনপদের ওপর মৃত্যুর বা ধ্বংসের দূত হয়ে নেমে আসাটাও যে অস্বাভাবিক—সে কথাটাও তাঁর পক্ষে দৃঢ়প্রত্যয়ে অস্বীকার করা সম্ভব হচ্ছিল না।

বস্তুতপক্ষে অনাদিপ্রসাদ অত্যন্ত বেদনাবোধ করছিলেন। বধের জন্যে নীত রজ্জুবদ্ধ ছাগশিশুর মত তিনি ছটফট করছিলেন। কারণ ছেলে অতুর অমলিন অস্তিত্ব, নিষ্কলঙ্ক মানবিক সত্তা যা একান্ত আকাঙ্খিত সামগ্রী, অত্যন্ত কাম্য বস্তু বলে তিনি বিবেচনা করতেন—তার শুভ্রতা ও স্বাভাবিকতা তিনি রক্ষা করতে পারছিলেন না। রেল লাইনের স্লিপারের ওপর পা ফেলে হাঁটতে হাঁটতে তিনি কেমন এক অসহায়তা অনুভব করলেন। চোখ তুলে ডিসট্যান্ট সিগনালের রক্তচক্ষুর দিকে তাকিয়ে তিনি তাঁর স্বকীয় অস্তিত্বকে যাচাই করে নিতে চাইলেন।

লেভেল ক্রসিংয়ে পৌঁছে বাঁ দিকের সড়কে পা দিতেই ডানহাতে অজিত ভট্টাচার্যের ভূতুড়ে বাড়ীটার দিকে চোখ পড়ল। বড় মেয়ে তাপসীর মস্তিষ্ক বিকৃতির পরে কলকাতা ছেড়ে যদিও অজিত ভট্টাচার্য দেবীপুরের গ্রামের বাড়ীতে সপরিবারে ফিরে এসেছেন—তবুও নিষ্প্রদীপ ব্যবস্থানুযায়ী তাপসীদের দরজা জানালাগুলো বন্ধ। সে দিকে তাকাতে অনাদিপ্রসাদের স্মৃতিস্তর ভেদ করে নাগরিক রোষ ও নিষ্ক্রিয়তা, জটিলতা ও নিঃসঙ্গতা, কোলাহল ও বিচ্ছিন্নতার কথা স্মরণ হল। সিনেমার পোষ্টারে পোষ্টারে, বিজ্ঞাপনের চকিত উপস্থাপনায় কলকাতার পথে ঘাটে বিলসিত স্থূল জীবন বিকার, রাস্তায়-পার্কে-মাঠে-বাজারে-স্কুলে-কলেজে-ট্রামে-বাসে অনাত্মীয় উপচীয়মান সব জনতার

শ্রদ্ধাহীন, বিবেকহীন আচরণ প্রভৃতি ছায়াছবির মত তাঁর চৈতন্যকে আশ্রয় করল। জীবনে তিনি বিবিধ গরলের বিচিত্র প্রকাশ প্রত্যক্ষ করেছেন। তাই অনাদিপ্রসাদ এ সবের স্পর্শ হতে ছেলেকে মুক্ত রাখার জন্যে স্থির সঙ্কল্প হচ্ছিলেন, এবং কামনা করছিলেন যে শুধু প্রকৃতির দাক্ষিণ্য, পৃথিবীর স্বাভাবিক ঋতুরঙ্গ শিশু অতু-র মানস-লোক প্রভাবিত করুক, চরিত্র গঠনের সহায়ক হোক। রাজনীতি-সমাজনীতির মোটা রেখাগুলোর স্থূলস্পর্শ হতে অতুকে দূরে রাখাই তিনি যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করছিলেন। নিষ্কলঙ্ক মানবিক চেতনার অবয়বে অতু বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হোক্—এটাই তিনি চাইছিলেন।

তাই স্ত্রী অমিতার আপত্তি সত্ত্বেও অতু-র অতি শৈশবেই কলকাতা হতে কুড়ি মাইল দূরে, ষ্টেশন হতেও মাইল খানেক ভেতরে এক গণ্ডগ্রামের বাধাহীন প্রকৃতির উন্মুক্ততার মাঝে জমি কিনে বাড়ী তৈরী করে অনাদিপ্রসাদ উঠে এসেছিলেন। একটা দ্বিধামুক্ত দৃঢ়তাসূচক মানসিকতা তাঁকে সঙ্কল্পে অবিচলিত রেখেছিল।

কিন্তু গ্রামে এসেও তিনি নিশ্চিন্ত বোধ করতে পারছিলেন না। বছর তিন আগের একটি সামান্য অথচ তাৎপর্যময় ঘটনা তাকে তীব্রভাবে নাড়া দিয়ে গিয়েছিল। তিনি বিশেষভাবে বোধ করছিলেন যে সমস্ত পৃথিবীব্যাপী, ওদেশে সেদেশে, এমন কি এ দেশের অভ্যন্তর ভাগে এমন কতগুলো ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া কাজ করছিল, এমন কতগুলো শক্তি বা অপশক্তি ছড়িয়ে পড়ছিল—যার প্রভাবে মানুষের চিন্তা বা মননের স্বাভাবিক গতি বিপথগামী হতে বাধ্য। ভাবতে বসে এ সমস্ত প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে তিনি বার বার চিন্তাগ্রস্থ হয়ে পড়ছিলেন। আসলে বোধ হয় বর্তমান সভ্যতার ভিত্তির মাঝে, সংস্কৃতির প্রসারের মাঝে কোথাও সঙ্কীর্ণ মানবতা ধ্বংসকারী বিদ্বেষের বীজ লুকিয়ে রয়েছে—একথাও তাঁর মনে হয়েছিল।

বুড়ো বটতলার মোড়ের কাছে সন্তোষ হালদারের মুদিখানা দোকানে রোজকার মতই কারবাইডের আলো জ্বলছিল। দোকানের দিকে একপলক তাকিয়ে মোড় ঘুরে অনাদিপ্রসাদ অভ্যাসবশে উত্তর পশ্চিমের অন্ধকার রাস্তাটা ধরে পা বাড়ালেন। তাঁর বার বার সেই বছর তিন আগের রববারের সকালটির কথা স্মরণ হচ্ছিল। এই চারদিকের নিপাট অন্ধকারের সাথে সেদিনের মানসিকতার কেমন এক যোগসূত্র তিনি এই ক্ষণে খুঁজে পাচ্ছেন।

অথচ সেদিন কার্তিকের শিশির ঝলমল করছিল বৃক্ষপত্রে, শ্যামল দূর্বাদলে। পাখির বিচিত্র কলকাকলী আকাশে ভাসছিল। জানলা দিয়ে প্রাক্-শীতের ঈষৎ

শীতল বাতাস শিউলি ফুলের সুবাস বয়ে নিয়ে আসছিল। প্রকৃতিতে কোথাও কোনও যন্ত্রণার চিহ্ন ছিল না। ছিল না ঝড়ের পূর্বাভাস। তরুণ তপণ অমল হাসিতে পৃথিবীর ওপর কিরণ ছড়াচ্ছিল।

অন্যান্য খবর পড়া শেষ করে অনাদিপ্রসাদ তখন কাগজের সাময়িকী অংশের পাতাগুলোতে মনোনিবেশ করেছিলেন। বস্তুত রবিবারের সকালটা এই পাতাগুলোর মাঝে ঘুরে ফিরে বিশ্বপরিক্রমার আনন্দ হতে সুরু করে সাহিত্যের রসাস্বাদনে মগ্ন হয়ে পড়াটা তাঁর একটা পরিশীলিত অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। সেদিন তিনি মহাকাশ যাত্রার প্রসঙ্গে আয়ানোস্ফিয়ার, স্ট্রেটোসফিয়ার, হেমস্ফিয়ার ইত্যাদি স্তরগুলো ও তার পরে মাধ্যাকর্ষণের টান সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ পাঠে নিরত ছিলেন।

এমনি সময় ছ' বছরের অতু বাবার উপস্থিতির প্রতি মনোযোগ না দিয়ে দরজা দিয়ে ঢুকে বেয়নেট চার্জ করার মত ক্রূর ভঙ্গিতে টিপে টিপে সতর্ক পা ফেলে ফেলে এগিয়ে এসে খাটের ওপর গোটান বিছানার মাঝে হাতের কাঠের বন্দুকটা অতর্কিতে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে সাথে সাথে উল্লাসে ফেটে পড়েছিল—দিলাম একটাকে খতম করে।

অনাদিপ্রসাদ ততক্ষণে মহাকাশযানের পক্ষে আলট্রাভায়োলেট রশ্মি, রঞ্জন রশ্মির সম্ভাব্য বিপদ সম্বন্ধে গভীরভাবে অভিনিবিষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। পুত্রের কণ্ঠের অমানুষিক চাপা আওয়াজে তাঁর তন্ময়তা ভাঙ্গল। তিনি মাথা ঘুরিয়ে তাকিয়ে দৃশ্যটি দেখলেন। ফুট তিনেক লম্বা কাঠের বন্দুকের নলটি বিছানার ভাঁজে প্রবিষ্ট, বন্দুকের গোড়ার দিকটা অতু-র দুহাতের মাঝে স্থাপিত। তার মুখচোখ কঠিন ও কঠোর। হিংসা ও ক্রোধে মাখামাখি বয়স্কসুলভ মুখখানা থমথম করছে। অনাদিপ্রসাদের সে দৃশ্য দেখতে কষ্ট হল। ফুটফুটে জোছনা বা উজ্জ্বল রোদের প্লাবন মুছে নিয়ে আকস্মিক দ্রুতগতিতে ভয়ানক বজ্রবিদ্যুৎ ঘনিয়ে এলেও বোধহয় তিনি এতটা বিচলিত হতেন না। অনাদি প্রসাদ এক মুহূর্তের জন্যে চোখ বুজে ফেললেন। পরক্ষণেই ছেলেকে তিনি কড়া স্বরে ধমক দিয়ে উঠলেন—কি হচ্ছে অতু?

অতু মাথা না ঘুরিয়েই নৃশংস ভঙ্গিতে লক্ষ্যবস্তুর ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে চাপা কণ্ঠে বলল—দিয়েছি বাবা জঙ্গলগড়ের একটা লোককে শেষ করে।

মানুষের প্রকৃতি বিজয়ের পরিকল্পনার চিন্তায় ক্ষান্ত দিয়ে অনাদিপ্রসাদ পৃথিবীর বাস্তব চেহারার ওপর চোখ রাখলেন। ছেলেকে গম্ভীর গলায় বললেন—এ সব কথা তোমায় কে শেখাল খোকা?

কণ্ঠস্বরের ঋজুতায় অতু বাবার দিকে ফিরে তাকাল। তার ব্যবহারে বাবা অসন্তুষ্ট হয়েছেন একথা অতু বুঝতে পেরেছিল। তবু সে না দমে বলল—কেন, মিনুর বাবা সেদিন বলছিলেন—জঙ্গলগড় সভ্যতাবিবর্জিত দেশ। ওদেশের প্রতিটি মানুষ হিংস্র ও লোভী। ওদের পৃথিবী থেকে খতম করতে পারলেই আমাদের পক্ষে এখানে নিরাপদে বসবাস করা সম্ভব।

ছেলের কথা শুনে অনাদিপ্রসাদ চিন্তিতমুখে গভীর ভাবে ভাবিত হলেন। তিনি দেখছিলেন ছেলের শিশু মনেই একটা গোটা জাতি, দেশ ও তার সংস্কৃতি সম্বন্ধে অশ্রদ্ধা জন্মাতে সুরু করেছে। তিনি বুঝতে পারছিলেন যে এই গণ্ডগ্রামেও আশেপাশের লোকজন অতু-র মাঝে সাধারণভাবে মানুষের বিরুদ্ধে ঘৃণা বিদ্বেষ হীনতা ইত্যাদি মনোভঙ্গি গড়ে তুলতে সাহায্য করছে। এ ধরণের হটকারী মন্তব্য তিনি মাঝে মাঝে আরও লক্ষ্য করেছেন। তিনি তাই সিদ্ধান্ত করছিলেন যে অতুও ক্রমে ক্রমে মানুষের ওপর বিশ্বাস, আস্থা ও শ্রদ্ধা হারাতে বসেছে। এর পরিণতি বয়স্ক অতুকে যে কোন্ নৈরাশ্যের উপান্তে পৌছে দেবে—ভেবে অনাদিপ্রসাদ আতংকিত বোধ করছিলেন।

তিনি চিন্তা করছিলেন বিদ্বেষের বীজ অতু-র মন থেকে এখনই সমূলে উৎপাটন করা প্রয়োজন। তাই তিনি অতুকে বলেছিলেন—ছিঃ বাবা, ওভাবে কথা বলতে নেই। আমাদের রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—মানুষের ওপর বিশ্বাস হারান পাপ। রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণান বলেছেন—জাতিতে জাতিতে সৌভ্রাত্র প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে বিশ্বরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প মানব জাতিকে গ্রহণ করতে হবে। বুঝলে অতু—একসাথে চলতে গেলে মতান্তর, মনান্তর, বাদবিসম্বাদ হওয়া বিচিত্র নয়—কিন্তু তাই বলে গোটা একটা মানব জাতিকে অসভ্য আখ্যাত করে বিনষ্ট করার আকাঙ্খা পোষণ করা মানব সমাজের স্বাস্থ্যের পক্ষেই ক্ষতিকর। যাঁরা এ সমস্ত কথা প্রচার করেন—তাঁরা প্রকৃত পক্ষে আমাদের দেশের কোন কল্যাণ-সাধন করেন না। বরং মানুষের মাঝে অনর্থক ঘৃণা বিদ্বেষ প্রতিহিংসা প্রভৃতি কতগুলো নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিকে প্রশ্রয় দেন।' অনাদিপ্রসাদ ছেলের মাথায় সস্নেহে হাত বুলোতে বুলোতে কথা শেষ করেছিলেন।

অতু চুপ করে শান্তভাবে কথা কটি শুনল। বাবার বক্তব্য তার পক্ষে পুরোপুরি বোঝা সম্ভব না হলেও - তার কণ্ঠস্বরের মন্ময়তা, বক্তব্যের ভঙ্গি—সব মিলিয়ে যেন নির্ভরযোগ্য বলে তার বোধ হল। হঠাৎ বন্ধনমুক্ত প্রপাতের মত অতু চঞ্চল, মুখর ও প্রবহমান হয়ে উঠল। প্রভাতী রোদের মত উজ্জল আনন্দে যেন সে ঝাঁপ দিল হলুদ ফসলের ওপরে। কল্পিত হিংস্র বাঘ

সিংহকে গুলি করার বিশেষ পদ্ধতিতে বন্দুকটা আস্ফালন করে অতু লাফাতে লাফাতে বেরিয়ে গিয়েছিল।

রাস্তার আলো নিভিয়ে দেওয়ার ফলে সমস্ত পথটা জুড়ে জটপাকান অন্ধকার। অন্যমনস্ক অনাদিপ্রসাদ সে অন্ধকারের স্রোতে ভেসে ভেসে কখন এসে তাঁর গৃহপ্রাঙ্গনে পৌছে গিয়েছিলেন—তিনি খেয়াল করেননি। কমল না কালু শেখ কাদের বাড়ীর দিক থেকে এক সময় তীক্ষ্ণ পেচকের চিৎকারে তাঁর তন্ময়তা ভাঙ্গল। অতু-র নাম ধরে বার দুয়েক ডাকতেই অমিতা হ্যারিকেন হাতে বাইরে এল। এবং পথ দেখাতে দেখাতে বলল—ছেলেটা সারাটা দিন বাগানে দুষ্টুমি করে এই মাত্র ঘুমিয়ে পড়ল।

অনাদিপ্রসাদ শুনে কেমন নিশ্চিন্ত বোধ করলেন। পুত্রের মুখোমুখি হবার হাত হতে আপাত অব্যাহতি তাঁকে স্বস্তি দিল। কিন্তু স্ত্রীর কাছ হতে ভাবনাটা তিনি গোপন রাখা সঙ্গত বোধ করলেন।

তারপর চা জলখাবার সেরে তিনি নিত্যকার মত খোলা বারান্দায় এসে বসলেন। সামনে বাগানের ঝুপসি গাছপালা আর ওপরে ঝুলে থাকা ম্লান জ্যোতির্ময় আকাশের মাঝে অসংখ্য তারার ক্লান্ত দীপাবলী।

সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে এক সময় তিনি অতুর চিন্তায় প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।

আসলে অনাদিপ্রসাদের চিন্তায় তাঁর ছেলের জীবন পরিক্রমা সম্বন্ধে একটা ছকের রেখা অনেক দিন ধরেই শোভা পাচ্ছিল। সেই রেখার বুকে দাগা বুলিয়ে বুলিয়ে তিনি তাঁর আকাঙ্খাকে গভীর করে তুলছিলেন। তিনি তাই স্বভাবতই কামনা করছিলেন যে অতু সেই চিন্তাধারার পথ বেয়ে তাকে প্রমূর্ত করে তুলুক। কিন্তু তিনি দেখছিলেন অতু যেন আরও অনেক মানুষের ছায়ায় অবগাহণ করে অশুভ এক অন্ধকার ছড়িয়ে ছিটিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ফলে বিষন্নতার হাত এড়ান তাঁর পক্ষে সহজ হচ্ছিল না।

অথচ অন্যান্য পিতার মত অতু ডাক্তার বা ইন্‌জিনিয়র হোক—এ ধরণের ইচ্ছা পোষণ করে বা দশজনকে সে বাসনার কথা জানিয়ে অনাদিপ্রসাদ আত্ম-প্রসাদ লাভ করতে কুণ্ঠিত হতেন। তার বোধে যেন কেমন একটা ধারণা প্রোজ্বল হয়েছিল যে মানুষ তার জৈবিক অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্যে যে বৃত্তি অবলম্বন করে, সেটা তার পৃথিবীতে টিকে থাকার প্রসঙ্গে মূল্যবান হলেও, মানুষ হিসেবে তার সামগ্রিক অস্তিত্বের পটভূমিকায় তা তুচ্ছতর। তার মাঝে কতটা

মানবিক বোধের স্ফুরণ ঘটেছে—সাহসে, তেজে, বিবেকে, বুদ্ধিতে, বিচক্ষণতায়, প্রীতিতে, ভালবাসায়, মমতায়, শ্রদ্ধায়, ঔদার্যে—সে কতখানি উন্নত ঋজু সেটাই লক্ষ্যণীয়, গণ্য হবার যোগ্য।

এ সমস্ত ভাবনা বা বোধ অনাদিপ্রসাদের একদিনে গড়ে ওঠেনি। পলে পলে, তিলে তিলে, নানা অভিজ্ঞতার মধ্য হতে তাঁর বোধি ধীরে ধীরে গাঢ়তা প্রাপ্ত হচ্ছিল। হয়ত পরবর্তীকালের দুর্গতি, হীন চাকরী জীবনের প্রায় নিস্তরঙ্গতায় দোল খেতে খেতে অতীতের চারিত্রিক দুর্বলতা সম্বন্ধে তাঁর সচেতনতা বা কৈশোরের স্বপ্ন অথবা যৌবনের আকাঙ্খারাশিকে প্রতিষ্ঠিত করার মত প্রত্যয়ের অভাব সম্বন্ধে অভিজ্ঞানই তাঁকে হয়ত বলে দিয়েছিল যে শৈশবে তাঁকে গড়ে তোলার ব্যাপারে তাঁর বাবার কোথাও ত্রুটি ছিল। কাদার তাল হেনে দ্রঢ়িষ্ঠ বলবান শক্তিতে রূপান্তর করার বিষয়ে তাঁর বাবার কোন সচেতন উৎসাহ দেখা যায় নি।

তাই বোধ হয় পরবর্তীকালে অনাদিপ্রসাদের জীবন জিজ্ঞাসার রূপ পালটাচ্ছিল। তখন বিদ্যাসাগর সম্বন্ধীয় রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি বিশেষ করে তাঁর জীবন ভাবনাকে প্রভাবিত করেছিল। তাঁর জীবনদর্শনের গাঙ্গেয় ধারার সাথে প্রশস্ত যমুনার নীলস্রোতের যেন মিলন সংঘটিত হয়েছিল। পাতনের ফলে তা যেন ধীরে ধীরে আরও পরিশ্রুত হয়ে উঠেছিল। সেই পংক্তিটি তাঁর এত ভাল লেগেছিল যে তিনি এককালে জপমালার মত নিষ্ঠা সহকারে অনুচ্ছেদটি বারংবার উচ্চারণ করতেন। কত স্মৃতির চুমকাম সত্ত্বেও কথা কটি তার মনের মণিকোঠায় এখনও জ্বল জ্বল করছে। গানের চরণ গুন গুন করার মত সময় পেলেই তিনি লাইন কটি আবৃত্তি করে থাকেন। এখন নক্ষত্রখচিত আকাশের দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু মন্ত্র উচ্চারণের মত ধীর কণ্ঠে অনাদিপ্রসাদের পংক্তিটি আউড়ে যেতে ইচ্ছে হচ্ছিল—"এই ক্ষীণতেজ দেশে রাখাল এবং তার জীবনীলেখক ঈশ্বরচন্দ্রের মত দুর্দান্ত ছেলের প্রাদুর্ভাব হইলে বাঙালিজাতির শীর্ণ চরিত্রের অপবাদ ঘুচিয়া যাইতে পারে'। সুবোধ ছেলেগুলি পাশ করিয়া ভাল চাকরি বাকরি ও বিবাহকালে প্রচুর পণ লাভ করে সন্দেহ নাই, কিন্তু দুষ্ট অশান্ত ছেলেগুলির কাছে স্বদেশের জন্য অনেক আশা করা যায়।"

আসল কথা, এ লাইন কটির কাছে তিনি সব সময় কি যেন এক প্রেরণা লাভ করে থাকেন। ছেলের সম্বন্ধে তার ভাবনার ছকটিতে কেমন এক গাঢ় রংয়ের প্রলেপ পড়ত। সেই বছর তিন আগের এক রববারের সকালে—যেদিনের কথা একটু আগে তিনি ষ্টেশন হতে আসতে আসতে ভাবছিলেন—সেদিন অতু

বন্দুক নিয়ে লাফাতে লাফাতে বেরিয়ে যেতে বিদ্যাসাগর সম্বন্ধীয় উক্ত পংক্তিটি তাঁর কেমন করে মনে উদয় হয়েছিল। কথা কটি উচ্চারণ করতে করতে অনাদিপ্রসাদ মুগ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। ছেলের প্রসঙ্গ ভুলে গিয়ে প্রায় বাহ্যজ্ঞান রহিত হয়ে তিনি এক সমুত্থিত আবেগের মাঝে সমাহিত হয়ে গিয়েছিলেন। গুটি কতক কথার যাদু দণ্ডের স্পর্শে তিনি যেন স্থানু পাষাণে রূপান্তরিত হয়েছিলেন।

এমনি সময়ে ওপাশের ঘর হতে সিক্ত চুল ঝাড়তে ঝাড়তে অমলা ঘরে ঢুকে জিজ্ঞেস করেছিল—তুমি অতুকে বকছিলে কেন?

অমলার কণ্ঠস্বরে অনাদিপ্রসাদের ধ্যানভঙ্গ হয়েছিল। তিনি তৎক্ষণাৎ ছেলের ভাবনায় প্রত্যাবর্তন করেছিলেন এবং এমনি সহজস্বরে কথা বলছিলেন যেন এতক্ষণ তিনি ছেলের চিন্তাতেই মগ্ন ছিলেন। ব্যাপারটা স্ত্রীর কাছ থেকে গোপন করেছিলেন অনাদিপ্রসাদ। ওটুকু আড়াল করবার প্রয়োজনটা তিনি মেনে নিয়েছিলেন। কারণ তিনি জানতেন অমিতা তার জীবনের শরিক হলেও ভাবনার ক্ষেত্রে সহধর্মিনী হয়ে উঠতে পারেনি। এবং সে চেষ্টাতেও তিনি সফলকাম হতে পারেননি।

স্ত্রীর কথায় তিনি তার দিকে ফিরে তাকিয়েছিলেন। সদ্য স্নান করে আসার ফলে তার চোখমুখ যেন খানিক ফোলাফোলা ও চেহারাটা অনেক পরিচ্ছন্ন শুচিতায় ঘেরা—যেন এক্ষুনি গৃহদেবতার সামনে নতজানু হয়ে কি এক প্রার্থনায় অমিতা রত হবে।

অনাদিপ্রসাদ সামনে ছড়ান কাগজগুলো গোছাতে গোছাতে বলছিল—এখানে বস। জান, তোমার ছেলে, মানুষ হত্যা করবার জন্যে ছটফট করে বেড়াচ্ছে?

—বল কি! অমিতা ধপ্ করে বসে পড়েছিল। তার চোখ দুটো বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়েছিল। আতঙ্কগ্রস্ত চোখের মণিগুলো চারদিকে ঘুরে এসেছিল।

তারপর আগাগোড়া ঘটনাটি শোনার পর অমিতা—ও, এই কথা—বলে রুদ্ধ দম-আটকান নিঃশ্বাস অত্যন্ত স্বাচ্ছন্দ্য সহকারে ছেড়ে দিয়ে হেসে উঠেছিল। তারপর বলেছিল—যাই, তোমার দ্বিতীয় দফা চা নিয়ে আসি।

অমিতার চিন্তাধারার সাথে পরিচিতি থাকা সত্ত্বেও, অনাদিপ্রসাদ সেদিন আহত হয়েছিলেন। অমিতার কণ্ঠে অতু-র বন্ধু মিন্টুর বাবার বক্তব্যই যেন খানিক ভিন্ন চেহারায় তিনি ধ্বনিত হতে দেখলেন। যেন জঙ্গলগড়ে কোন মনুষ্যপদবাচ্য জীবের অস্তিত্ব নেই—সবাই মনুষ্যেতর দুর্বৃত্ত। সুতরাং মশা মাছি বা ইঁদুরের

মত নিধনে বা হননের আকাঙ্খা প্রকাশ করার মধ্যে কোন অপরাধ বা অস্বাভাবিকতা নেই।

অথচ অনাদিপ্রসাদ সমস্ত জীবনের বুদ্ধি, বিবেচনা ও প্রজ্ঞার আলোয় জেনেছেন যে মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু হচ্ছে অশিক্ষা, অজ্ঞানতা, ভয় ও অভাব। অপরাধ লুকিয়ে রয়েছে বিজ্ঞান বিরোধীতা বা মানুষকে দেশ-জাতি-বর্ণে বিভক্ত করে চিন্তা করার পদ্ধতি বা রীতির মাঝে। তাই তিনি অতি শৈশব হতেই একে একে অতুকে শত্রুগুলো চিনিয়ে দিতে তৎপর হয়েছিলেন। আর শেখাচ্ছিলেন ভাবতে, প্রশ্ন করতে, তিনি চাইতেন অতু-র মাঝে আকাশের বুকে ঝুলে থাকা সপ্তর্ষির মত একটা জিজ্ঞাসা যেন অহর্নিশ জাগরুক থাকে।

•

গল্পের বইটা মুড়ে রেখে অমলা উঠে এল। বলল—চল রাত হয়েছে। খেতে চল। ছেলেটাকে ঘুমের চোখে খাওয়ান খুব মুস্কিল ব্যাপার। দেখ, কিছু যদি খাওয়াতে পার। ওকে নিয়ে এস।

অনাদিপ্রসাদ তখন গাছপালার আড়াল হতে সপ্তর্ষিকে খুঁজে চলছিলেন। প্রশ্ন আকৃতির সাতটি নক্ষত্রকে সে মুহূর্তে আকাশের বুক হতে খুঁজে বার না করতে পারায় তিনি অধৈর্য বোধ করছিলেন। কিন্তু অমলার তাড়ায় তিনি তার অনুভবকে গোপন রেখে উঠে দাঁড়ালেন, এবং অতুকে ডাকবার জন্যে ঘরের মাঝে পা রাখলেন।

মাঝরাতে হঠাৎ অনাদিপ্রসাদের ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল। প্রথমটাতে তিনি ব্যাপারটি অনুধাবন করে উঠতে পারেননি। তাঁর মনে হচ্ছিল সমস্ত পৃথিবীটাই যেন প্রবল যন্ত্রণায় তীক্ষ্ণ আর্তনাদ তুলছে। কাঁচা ঘুম ভেঙ্গে যাবার রেশটা কাটলে পর তিনি সাইরেনের আওয়াজটাকে চিনতে পেরেছিলেন।

সেই একটি রাতেই যেন এক শতাব্দীর বেদনার সাথে তার মোকাবিলা হল। বাইরে ভলকে ভলকে অগ্নিগোলা বুম বুম শব্দে উত্থিত হয়ে নিকষকালো আকাশের পটভূমিকায় মৃত্যুস্পর্শ আতশবাজীর খেলা ছড়াচ্ছিল। তার দিকে তাকিয়ে থেকে কামান মর্টারের থেমে থেমে একটানা আওয়াজ ও বোমা বিস্ফোরণের ভয়ানক শব্দ ছাপিয়ে কমল-কালু-শেখ-অনাদিদের বাড়ী হতে ভেসে আসা এক বিপন্ন আর্তনাদ তিনি শুনছিলেন। এদিকে ঘরে অমলার ফ্যাকাশে মুখে কানে আঙ্গুল গুঁজে বিছানায় পড়ে থাকা তিনি দেখছিলেন। আর অতু-র ছটফটানি ও কান্না, বিস্ময়বোধ ও অসহায়তা তিনি অত্যন্ত অবসন্নচিত্তে প্রত্যক্ষ

করছিলেন। অন্ধকারে ঘরের মাঝে চুপচাপ বসে ছিলেন অনাদিপ্রসাদ। বিভিন্ন প্রকারের অনুভূত চাপের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া তাঁকে প্রায় অসাড় ও অবশ করে তুলছিল।

তারপর এক সময় দ্বিতীয় দফায় নিরাপত্তাজ্ঞাপক সাইরেন বাজার শব্দে তাঁর চৈতন্য নাড়া খেয়েছিল। তিনি যেন আহত পশুর মত চাপা আর্তনাদে ক্লিষ্ট হয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে পড়লেন। পেছন হতে অমিতার ব্যাকুল কণ্ঠস্বরের পক্ষে তাঁর গতিরোধ করা সম্ভব হল না। তিনি যেন উদ্‌ভ্রান্তের মত ধ্বংস-শোক-দুঃখ-কান্না-মৃত্যুর দিকে ছুটছিলেন।

তারপর সমস্ত রাতভর ঘুরে ঘুরে অনাদিপ্রসাদ মৃতদেহের বীভৎসতা, আহতদের চিৎকার, শোকার্তদের হাহাকার শুনেছেন আর বোমা বিধ্বস্ত বাড়ীগুলোর ধ্বংসাবশেষ দেখেছেন। ছিন্নভিন্ন ছত্রাকার হয়ে পড়েছিল, অনেক চেষ্টায় গড়ে তোলা সংসারের কত প্রয়োজনীয় ব্যবহার্য দ্রব্যাদি, শিশুদের কত খেলনার সামগ্রী, একদা সুখের চিহ্ন ধারণ করে ছড়িয়ে থাকা কত আসবাবপত্র।

দেখতে দেখতে শুনতে শুনতে তিনি একসময় ধীরে ধীরে যেন পীড়া ও যন্ত্রণার পরপারে পৌছে যাচ্ছিলেন। অমিতার ভীতি ও অতু-র কান্না তার কাছে এক বিলীয়মান স্মৃতিতে পর্যবসিত হচ্ছিল।

বিংশ শতকের এই পৃথিবীতে অবস্থিতির যে সমস্ত চিহ্নগুলো এতদিন তাঁর অস্তিত্ব ঘোষণায় রত ছিল—অনাদিপ্রসাদের কাছে তা যেন ধীরে ধীরে অকিঞ্চিৎকর হয়ে যাচ্ছিল। সমুদ্রের বুকে দূরগামী জাহাজের মত অথবা শূন্যে উড়িয়ে দেওয়া গ্যাসবেলুনের মত তাঁর সমস্ত স্মৃতি-সত্তা-ভবিষ্যৎ, তাঁর সমস্ত পৃষ্ঠপট এক সময় চেতনা হতে বিলুপ্ত গিয়েছিল।

রাত্রিশেষের দিকে ম্লান আলোর পটভূমিকায় কোথা হতে যেন প্রচ্ছন্ন আলোয় কিরণরেখা জাগছিল।

অনাদিপ্রসাদ নামক দেবীপুরের পরিচিত মানুষটি এক সময় অলক্ষ্যে উঠে পড়ে ধীরে ধীরে তার গন্তব্যস্থল না জেনে হাঁটছিল।

মনে হতে পারে যেন নতুন কোন পৃথিবীর উদ্দেশ্যে নতুন পরিচিতি সংগ্রহের আকাঙ্ক্ষায় তিনি তীর্থযাত্রায় বেরিয়ে পড়েছেন।

বিষ্ণু দে * ভ্যালেরির জয়

সে কালে এরাই ছিল অর্ধ নারীশ্বরের প্রতিমা।
তারপরে দেখা গেল,
ভ্যালেরি! তোমার প্রজ্ঞা বুঝেছিল ঠিক,
ফরাসিস্ মনীষার জয়!
অভিন্নহৃদয় দেহ মননের দ্বন্দ্বে দেখি তোমারই প্রতীক!

নির্লজ্জ নির্দয় অহমের নেই কোনও সীমা
বাঘ বা কুমির যেন মনের সমস্ত দাঁত মেলে
থাবায় নখরে এদের দাম্পত্যে মাতে।
কিন্তু কোন্ জন্তু অবহেলে
এমন ঘৃণায় যুদ্ধ করে!

অথচ সন্দেহ নেই সিংহে ও সিংহীতে
সদা মগ্ন এবম্বিধ দ্বৈরথ সমরে।
বোধহয় এক মাত্র ভ্যালেরির খ্যাতনামা সভ্য অজগরে
উপমা মিলাতে পারে, আত্মভুক বিচ্ছিন্ন সংবিতে
উভমুখ একদেহ অদ্বৈতের ভোজ যদি সারে পরস্পরে॥

মনীন্দ্র রায় * পাণ্ডা

বড় পাশাপাশি আছো;
ভয়ঙ্কর ঘেষাঘেষি; তুমি
ঘুমেরও ভিতরে যেন দুঃস্বপ্নের মুখ।
পুরনো পাপের মতো
তোমার নামের শব্দে কেঁপে ওঠে বুক।

অথচ আছোই তুমি
লেগে আছো ; পায়ে পায়ে ছায়া।
কখনো রোগের মতো রক্তস্রোতে, কখনো চতুর
গুপ্তচর যেন, ভিড়ে গা-ঢেকে, বেহায়া।

তোমাকে বাসি না ভালো ;
ঘৃণা করি ; জানি অকৈশোর
বুকের দু-ইঞ্চি দূরে ছোরা তুমি অস্তিত্বে আমার।
ধরেছ কঠিন পাঞ্জা প্রতিদ্বন্দ্বী, ভয়ের সমান
মাথা তুলে আমি তবু নিজেকে বানাই ; আর তুমি
কাঁপানো প্রবাদ শুধু, লুপ্ত অন্তঃসার ॥

গোপাল ভৌমিক * দ্বন্দ্ব

কাল কবলিত মোহশীল মন নিয়ে
প্রতিদিন করি বিদায়ের কত ভাণ ;
এগোয় কিছু কি ফাটা ডিমে উম দিয়ে,
মূলে ভুল হলে মেলে কি কখনো প্রাণ ?

অথচ রঙীন চশমা দুচোখে পরে
পৃথিবীকে ভাবি আদপে যা নয় তাই ;
আমার মতন অনেকেই ভুল করে
যেপথে চলেছে সে পথেই পা বাড়াই।

গল্প কাহিনী ইতিহাস সব মিলে
মানস গঠন জটিল হয়েই ওঠে ;
মোহমুক্তির স্বপ্ন যে দেখে হালফিলে
চলে সে একাকী সঙ্গী যদি না জোটে।

বিচারক আর আসামীতে মিলে মিশে
আমাকেই মারে রোজ তিলে তিলে পিষে।

বাসুদেব দেব * স্বগতোক্তি থেকে

জানি জানি রাহাজানি হত্যাকাণ্ড—
তবু চাবি পাবি না সেই সিন্দুকের।
আমি বসে দেখছি রে তোর ক্রিয়াকাণ্ড,
ভয় করে না যৌবন ও নিন্দুকের!

মোহর করা কৌটাতে সে চাবি আছে—
খোদাই করা আছে তাতে রক্ত পদ্ম।
চৈত্র মাসে বুকের খুন গাছে গাছে—
জ্যোৎস্নারাতে ভালোবেসে কেমন জব্দ!

এখন ডাকাত সেই তো নিল পর্থিবতা—
হাওয়া নেবে মৃগনাভির সুরভিটুক।
জ্যোৎস্নারাতে চোখের জলে ক'টি কথা
বাঁচিয়ে রেখে ভরিয়ে দেব শূন্য বুক॥

বেণুদত্ত রায় * কৃষ্ণচূড়া

দর্পনে মুখ নেই।
মুখ কি কোথাও আছে?
বাজি রেখেছিল হয়তো বা কারু কাছে
দুপুরে নিঃস্ব গাছে
বন্ধকী ঋণ তামাদিতে গেছে ঢুকে'।

দর্পণে মুখ না-দেখার কোনো সুখে
অথবা অসুখে বুক চিরে ফালা-ফালা
ফেলে দিয়ে গেছে চিকণ হাড়ের জ্বালা—
জ্বলেছে আকাশ জ্বলছে প্রাণের মূল
ডাকাতের হাতে কৃষ্ণচূড়ার ফুল।

গোবিন্দ চক্রবর্তী * পেছনে এলেও এসেছি

চেখে চেখে সকালের কাগজ প'ড়ো
এবং প্রাতরাশও ক'রো
তারিয়ে, তারিয়ে।
বিকেলটা এলিয়ে দিয়ো ইজিচেয়ারে
কিছু কিছু লঘু ভাবনায়—
ঐ দক্ষিণের জানলাটা খুলে।

তবু, তবু জানলা থাকবে কি খোলা
শুধু মল্লিকা ফোটায় ও চাঁদ ওঠায়
নদীর নীলে এবং আকাশের নীলে
এবং শুধুই দু'চোখের আলস্য মেটাতে?
বেশ এসেছ যদি সাঁওতাল-পরগনায়—
থাক, এ ভাবেই যে ক' দিন যায়!

আহা, সাধের জানলাটা তবু খুলো
একবার দগ্ধ দুপুরেও:
যেদিকে সূর্যের কাছে কৃষক চ'ষে মাটি,
শ্রমিক গাঁইতির মুখে পাহাড় হটায়,
দিগন্তে কা'রা পাথর ভাঙে—
তোমার দেবতাকে আর কি ভাবে দেখতে চাও?

সদরে কেউ কড়া না নাড়ে—
তবু জানবে তোমার নামে
ডাকবাক্সে কোন না কোন চিঠি আছে।
বুকের বোতাম ক'টা খুলে একবার বেরিয়ে পড় ত'-
মিলবে. ঠিকানা মিলবেই।
তখন বলবে—হ্যাঁ, পেছনে এলেও এসেছি।

চিত্ত ঘোষ * কালো শ্লেটে লেখা

কালো শ্লেটে কালো পেন্সিলে লেখা চল্লিশ
একটি কিশোর সংখ্যার সাথে যুক্ত
গণিতের গায়ে উপলব্ধির মুদ্রা !

স্রোতের উল্টোদিক থেকে বেয়ে আসা
দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে দুপুর
যেন ঘনিষ্ট বাল্যের সেই বন্ধু ।

বেলুন ওড়ানো বাতাস, রঙিন ঘুড়ি
রোদ্দুরে পোড়ে আমার শীতল ছায়া
সমুখের মাঠে দীর্ঘ দুপুর কিশোর ক্রিকেট খেলা

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে দুপুর
রোদ্দুরে পোড়ে আমার শীতল ছায়া
গণিতের গায়ে উপলব্ধির মুদ্রা
কালো শ্লেটে কালো পেন্সিলে লেখা চল্লিশ ।

মৃণাল বসু চৌধুরী * ঘুম

মুখগুলি কাছে এলে ঘুম চলে যায়
হাত দুটি কাছে এলে ঘুম চলে যায়
ছায়াগুলি আর্তনাদে ভেঙে গেলে ঘুম
ক্রমশঃ বিষাদ চিহ্ন সঙ্গী হ'লে ঘুম
নির্ভীক পোশাক খুলে কেউ এলে ঘুম
চলে যায়···ঘুম
শব্দহীন কেউ এলে ঘুম যায় চলে ।

শুদ্ধসত্ত্ব বসু * আঁধি

হঠাৎ ঘরে ঢুকে কে তুমি সুট্ করে নেবালে আলোক,
কে তুমি উন্মত্ত হাতে ঘন কালো আঁধার ফোটালে ?
সহরে এখনো দেখছি বৈদ্যুতিক জলছে রোশনাই
কারেণ্ট এখনো দেখছি ফেল্ করেনিক' !
অন্ধকার কোনদিন ভুলেছে কি আলোক বাসনা ?
বরং সে মনে মনে স্বপ্ন বোনে—সূর্য শতদল,
অমল কমল যদি ফেটে আহা উষার পল্বলে !

হঠাৎ বিভ্রান্তি এনে কে তুমি এমন দস্যু
ভোলাবে স্মৃতিকে,
যাকে মনে রাখি. যে-পাখি আমার মনে
শিস দিয়ে বাজায় লালিত,
হঠাৎ সে উড়ে যাবে আচমকা আঁধারে ?
কি করে ভুলবো আমি তারে, কি করে, কেমনে ?
বরং যখন তুমি টুঁটি টেপ, তখনই যে
মনে পড়ে বেশী করে !

স্মৃতির দেরাজে জমে ধূলো,—
দমকা আঁধির কাঁধে ভর করে
জমায় জঞ্জাল কিছু,
তেমনি এ অন্ধকার বিস্মৃতির,
পারে না ভোলাতে তাকে, ঘাড় ধাক্কা দিলে
ফের ফুটে ওঠে আলোর কমল,
ধূলো মুছে নিলে যথা উজ্জ্বল আভাস।

সুনীল রায় * বৈরী

অত হাসিখুসি মুখ নিয়ে কাছে এস না অন্তত
পদে-পদে অবিরত কেন কর এমন বিব্রত।
বাহিরের শত্রু যারা তারা তবু মন্দ না নেহাত
তোমার ও তার সঙ্গে জানতাম এটুকু তফাত।

আসুক অনেক শত্রু, করুক এ নগর বেষ্টন
অহোরাত্র তার কথা ভেবে তিক্ত করি না এ-মন।
অথচ পুষ্পের মধ্যে যদি কীট ঢোকে
আঘ্রাণ করার সাধ চুকে যায় তখনি পলকে।

অনুরূপ আচরণ তোমাকে তো কখনো সাজে না-
অন্তরে তোমার জায়গা, অন্দরেও ছিল গতিবিধি ;
সকলেই জানে আমরা উভয়ের এতখানি চেনা,
আমাদের বন্ধুত্বের নেই কোনো ব্যাস বা পরিধি।

তুমি যদি বৈরি হবে, তৈরি তবে রয়েছি আমিও,
ফটকের ওই পারে গিয়ে তবে হাতে অস্ত্র নিয়ো॥

আনন্দ বাগচী * অর্থহীন

ক্রমশঃ রক্তের মধ্যে বেলা পড়ে আসে আলো মরে
অদৃশ্য ঘড়িতে ক্রমে ছায়া ঘন হয়, নীল শিখা
অন্ধকারে স্পর্শ করে স্পষ্ট দেখি মায়াবী অক্ষরে
ভয়ঙ্কর স্নায়ুজ্বরে যেন ভুগছি, যেন কোনো চোখের পলকে
ঘড়িতে অ্যালার্ম বাজবে, সহস্র আলপিন বিদ্ধ হবে
চকিত সংবিতে বুকে, রক্তে বেলা পড়ে আসে রোজ।

অভ্যাসে এখনও বসি লেখার টেবিলে চুপ ক'রে
মস্তিষ্কে রক্তের চাপ, স্তব্ধ হয়ে গেছে হৃদ্‌পিণ্ডের কবিতা
লেখার চেয়ে তো কিছু ক্লান্তি নেই, অর্থহীন মূর্খতা মৈথুনে
ভালোবাসা মানে শুধু সম্মোহন, শরীরের নির্লজ্জ ম্যাজিক ;
মৌনতার চেয়ে ভালো কাবতা কোথাও আজ নেই॥

জয়ন্তী সেন * বৃষ্টি এলো

জানি না তোমাকে পেতে
মন কেন এত শিহরিত—।
স্নিগ্ধতা আস্বাদে আমি কতকাল
তৃষ্ণার্ত্ত উন্মুখ।
রোদের প্রহরে জ্বলে পুড়ে পুড়ে ছাই হয়ে গেছি
বিচ্যুত পাতার মতো প্রাণহীন
বিবর্ণ হলুদ।
কত কাল অনাবৃষ্টি
কত কাল তুমি তো এলে না।
তোমার পায়ের শব্দ শব্দহীন নিঃসঙ্গ হৃদয়ে
কতবার সচকিত করে গেছে
নিদ্রিত সত্তাকে।
আসন্ন শ্রাবণ মেঘে মনে হয় স্নিগ্ধ সুরভিত
বৃষ্টির মুহূর্তে বুঝি তুমি এলে
একান্তে নির্জনে।
তোমার স্বপ্নের প্রান্তে বৃষ্টি এলো,
কত বৃষ্টি এলো।

সামসুল হক * অলৌকিক

রাজপথ যদি সামনে গিয়েছে খুলে
অবধারিতের মতন আবির্ভাব :
বোধের ভিতরে সাজানো রয়েছে ঋক,
জীবন মানেই আদৃত অলৌকিক।

ফুলের জন্য উদ্যান প্রয়োজন,
অথবা জীবন-সজ্জার কাজে প্রেম—
আগামী সন্ধ্যা ঘুরছে চতুর্দিক :
প্রেমের ভিতরে মৃত্যু অলৌকিক।

সুনীল বসু * নিদ্রা

এসো নিদ্রা,
নাও তুমি নিশ্ছিদ্র পাতালে
শোক দুঃখ প্রত্যহের প্রচণ্ড প্রহার ভুলি
স্বপ্নের অলীক ইন্দ্রজালে।

রাখো সম্মোহিত কিছুক্ষণ
বিষবাষ্প ব্যাধি ভস্ম ধূলি
স্বার্থ হিংসা শোনিত-ক্ষরণ
শতাব্দীর সর্বনাশ।

শর্বরীর নিখাদ সমুদ্র
করেনিক গ্রাস
এক ক্ষুদ্র
পাতাল প্রকোষ্ঠে নিবিড় নিদ্রায়
মগ্ন থাকি
মোহিনী মায়ায়
একাকী।

এসো নিদ্রা, তুমি হও দেবী
এক পূর্ণ বয়স্কা যুবতী,
হও বিস্মৃতির
অব্যর্থ নিয়তি
নিয়ে চলো নির্বাসিত নিরুদ্দেশে
সেইখানে ইহকাল-পরকাল
যশ অপমান খ্যাতি নিন্দা ঘৃণা সহসা বিশাল
জলস্রোতে কালস্রোতে মেশে।

তোমার নিবিড় বাহুডোরে
অন্ধকার রাত্রির প্রহরে
ভুলে থাকি কিছুক্ষণ
প্রত্যহের প্রতি মুহূর্তের নিষ্ঠুর মরণ ;
নিদ্রা, তোমার মরণ
অজ্ঞান করুক অবিচ্ছেদ্য অবসাদে,
চৈতন্যের মুণ্ডচ্ছেদ করুক
কামুক জল্লাদে।

সমস্ত পৃথিবী
শ্লথ নীবি
পড়ে আছে খুলে দিয়ে অন্তহীন কেশ পাশ
উড্ডীন উদাস মেঘে মেঘে, সুদীর্ঘ নিশ্বাস
বয়ে যায় বৃষ্টি শেষের বাতাসে,
নিদ্রা, এই লগ্ন, এই সেই প্রতীক্ষিত
মুহূর্তের লীলা
নিয়ে চলো তোমার রাজ্যের পরবাসে
একে একে ছিন্ন করো অজস্র স্নায়ুর ছিলা।

তুমি মূর্তিমতী মৃত্যুর একক
সহোদরা
তোমার আশ্লেষে রোজ
নিখোঁজ
ক্লান্তি, ব্যাধি, শোক—
অনিবার্য জরা॥

দুর্গাদাস সরকার * এখন স্ট্যাচুটা নেই

এখন স্ট্যাচুটা নেই। আছে তুলে ফেলা কিছু ইট!
ঘোড়ার উপরে সেই বীরত্বের দৃশ্য মনে পড়ে!
অবশেষে খসে গেল বিজয়ীর মাথার কিরীট,
ভাঙা ব্রোঞ্জে শ্যাকরারা অতঃপর অন্য বস্তু গড়ে।
ইতিহাসে নাম যদি লেখা থাকে, তবু সে বাঁচেনা
রক্তঝরা বুকে। ধীরে একদিন ভিন্ন দৃশ্যপটে
বিদ্রোহের পথ ধরে তারা মৃত্যুঞ্জয়ী মুক্তিসেনা;
তাদের কথাই শেখা হয় শেষে স্ট্যাচুরই নিকটে।

তখনো তো একজন বার বার আসে ফিরে যায়।
বীরত্বের সেই দৃশ্যে হতে গিয়ে মুগ্ধ মনোহর
ছ্যাখে, সে শিল্পের তীর্থে ছিল এক বিক্রীত কিঙ্কর।
একদিন দ্রষ্টার মতোই যেন দৃষ্টি ফিরে পায়।
ছ্যাখে: কতো রূপ ধরে পৃথিবীর সব লোকজন।
সে-হাতে তারাই নয়, হতে পারে সেও চিরন্তন॥

অচ্যুত চট্টোপাধ্যায় * পাখিরা আবার এলো

পাখিরা আবার এলো।
হলুদ বর্ণ দেহ। রক্তের মতো ঠোঁট
দিয়ে খুঁটে খুঁটে খেলো
আমার খেতের শস্য। তারপর জোট
বেঁধে উড়ে গ্যালো উত্তরের দিকে
অপরাহ্নে। পর্বতের মাথায়
তখন বরফ গলার পালা। ফিঁকে
রোদে ছ্যাখা যায়:
পাখিদের তীক্ষ্ণ ঠোঁটে বিক্ষত প্রান্তর
শুয়ে আছে। যুদ্ধক্ষেত্রে আহত সৈনিক
মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছে। কোনো আড়ম্বর
নেই। তবু সে নির্ভিক
যোদ্ধার জন্যে আমরা সমাধি রচনা করি।
লিখি: মৃত্যু যদি আসে, যেন এ ভাবেই মরি॥

ক্ষিতীশ দেব সিকদার * কাপুরুষ ও কালপুরুষ

সাহসী খণ্ডাংশটুকু ছাড়া বাকি সব সত্তার নির্বীর্য ভয়াতুর, অতএব
পৃষ্ঠপ্রদর্শনে একটি মুহূর্তও যেন বেশ বেশী, সাহস সঞ্চয়ে
একটি গোটা শতাব্দী কেটে যায়, অন্তেসমালোচনা করে
সকলে স্বীকার করে' অজন্মার বছর কেন আমি সবচেয়ে বেশী
কাপুরুষ ছিলাম'

সাহসী খণ্ডাংশ কিন্তু জ্বালাময় আগ্নেয় পাথর, অনেক বছর পর একদিন
ক্ষিদের সময় সত্তার নির্বীর্য অংশ গ্রাস করে—তখনকার ধ্বংসাবশেষ
ভস্মের ভিতর কেউ খুঁজে দেখলে পেতে পারে হৃদপিণ্ডে মৃত কাপুরুষ
পেতে পারে বানরের সত্যমুক্ত দুইখানি হাত, সূচীমুখ লাঙ্গল ফলায়
বেদখল কৃষিক্ষেত্র অকস্মাৎ পেয়ে যেতে পারে
এবং সমগ্র সত্তা কোলাহল করে ওঠে। সাহস সাহস আরো আকাশে উঠেছে
কালপুরুষ'।

শ্যামলকুমার ঘোষ * আরক্ত শৈশব

ক্রমে ক্রমে যতো আরক্ত শৈশব
চোরের মতো নেমে যায় মাটির ভিতর।
শান্তি আত্মারই সহোদর নাকি—
একক প্রকোষ্ঠে তাই বন্দী একাকী।
না জেনে, না শুনে কি পাপ করেছি
এখন ভয় হয় ক্রমাগত মাটির ভিতরে,
শৈশব দিগন্তবিস্তৃত
গর্বিতা বলাকার মতো আত্মরতিতে মগ্ন একাকী।
আদিগন্ত বার্ধক্যের ছড়ানো কশেরুকা একদা তো ছিল না জীবন্ত
আরক্ত শৈশব যতো ফেনিল বিলাসে
পুত্রশোক ভুলে গিয়ে ক্রমে ক্রমে
চোরের মতো যেতে চায় মাটির ভিতরে।
এখনো অবস্থা আছে; বিস্তৃত
অরণ্য জুড়ে। সূর্যালোক সেখানে করেনি প্রবেশ।
গুরুত্বপূর্ণ কিছু খাবার আসর গড়ে নরম মাটিতে
কশেরুকা—মেরুদণ্ড রাখি হে জীবিতা।

পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় * ত্রিকাল

নদীর ওপারে তার মৃত আর বিবর্ণ শরীর।
নারকেল সুপারীর শ্রেণী
দিগন্ত বিস্তৃত এক রেখার মতন—
নিষ্পত্র নিঃশেষ।
জলে যাওয়া দূর্বাদল শ্যামলিমাহীন।
ওখানে আগ্নেয়গিরি স্তব্ধীভূত হয়ে গেছে আজ,
ওপার—অতীত।

এপারে অজস্র আলো, অনেক মিছিল,
ওপারের শব নিয়ে কাড়াকাড়ি চলে—
নগ্ন নির্লজ্জতা।
কেবল নদীর ঢেউ উত্তাল অস্থির,
সেথা মৃত্ত অশান্ত কল্লোল।

তরল লাভার স্রোত বহুদিন আগে
নদী পার হয়ে এসেছিলো,
আজো তার অগ্নিগর্ভ রূপ।
ওপারের মানুষেরা স্তব্ধ আর মূক,
এপারেতে বর্তমান জ্বলে তুষানলে।

আকাশে নিবিড় নীল সূর্যতাপে দগ্ধ হয়ে যায়,
স্তব্ধ সেই আগ্নেয়গিরিতে
নেই প্রতিধ্বনি,
শুধু নদী বয়ে চলে অস্পষ্ট উল্লাসে,
অথবা আক্রোশ—
তরঙ্গের আবর্তনে কাঁপে ভবিষ্যত।

শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায় * ম্যান ইটারের ভূমিকা

সব অন্তর্ধান রহস্যের সাক্ষী হয়ে আছি।
অনেক কিছুই তবু মনেই পড়ে না। এই বিকেলবেলায়,
চিঠিতে বাক্যের অংশ হারায়, পালায় শব্দগুলি
ঠিকমত বলার আগেই। শুধু নষ্ট, বৃথা চেষ্টা,
জীবনধারণ মানে বৃথা চেষ্টা সমস্ত কিছুর,
বৃথা কোন খেলনা কিনতে রথের মেলায়
আনাগোনা। কেবল বয়স বাড়ছে কিছুতেই বুঝতে পারি নাকো-
যতক্ষণ দেখি না তোমাকে বড়-হয়ে-ওঠা গাছে ফুল।
আমার বুকের মধ্যে ঈর্ষার পাহাড়······
সবাই অবজ্ঞা করে নাকি······
কোন ভয়ঙ্কর শিক্ষকের মত বেত তুলে
আগত যৌবন কোন ছাত্রের পিঠের 'পরে বেত মেরে মেরে
ভীষণ জয়ীর হাসি হাসতে হয়। কেন ভাবি,
নিজে এসে বসবে কোলে যখন সময় ক্ষতে ঢাকে
সারাদেহ, চলচ্ছক্তিহীন কিংবা খঞ্জ কোন ম্যান্‌ইটারের ভূমিকায়
আমি পড়ে থাকি। চাই অতি অনায়াসে
দিনের আলোর সামনে ফুল কেড়ে নেব
রক্তপান যেমন ভীষণ সেই বাঘের অভ্যাস।

তবু অনেক কিছুই ভুলে যাই
বৃক্ষের মতন তুমি গলা ধরে দাঁড়ালে আমার
তোমার পরেও তুমি একাদশবার
যত বেড়ে ওঠো তত সবই ঈর্ষণীয়······
অস্তবেলা চলে যায়। বাজুক বাজুক ঘণ্টা,
অহঙ্কারী তোমার প্রচার।

শান্তনু দাস * জন্মলগ্ন

কারণ একাত্ম হলে কার নিঃশ্বাস ভেসে আসে
আমরা একাত্ম হতে পারিনা কখনো
কারণ বুকের পরে বুক নিয়ে এলে
কোন এক মায়ের ঘ্রান বারংবার মনে পড়ে যায় :

অন্ধকার গর্ভ থেকে প্রসন্ন আলোয়
জন্ম যদি নিয়ে এলে তুমি,
দুঃখ কেন মুড়ে দিলে আদিম শরীরে
ভগবান, জমাট মেঘের মতো আর্তনাদ প্রতিধ্বনি হয় :

জন্মলগ্ন আঁকড়ে ধরি তবু
দুশ্চরিত্র জ্যোতিষীর একই কথা সোচ্চারিত হলে
বুটের ডগায় পিষে অনায়াস চলে যেতে হয়
কানা গলিটার মোড়ে, মাতালের কাঁধে কাঁধ রেখে
অস্ফুট বলি……'কতদূর পথ মহাশয়
হেটে যেতে জাহান্নম ক' মিনিট লাগে'

তবুও কখন যেন দৃশ্যপটে কোন
সবুজ ঘাসের কথা মনে পড়ে যায়
নরম গভীর রোদ, পাটাতনে চিৎ হয়ে শুয়ে
মনে পড়ে যায়……
পালকের মত কোন স্মৃতি
নিবিড় আকাশ নীল কুয়াশার নদী :

অথচ একাত্ম হলে পদধ্বনি কানে ভেসে আসে
বুকে বুক দিলে কোন আদিম শরীরে
কোন এক মায়ের ঘ্রান বারংবার মনে পড়ে যায়।

বড়ো ক্লান্তিকর এই দিনাতিপাত।

কিন্তু ক্লান্তিহীন দিনগুলি কেমন
নিজের বৃত্তে ঘুরে চলে;

উদ্‌ভাসিত সূর্যালোক প্রতিদিন ঘরের দরোজায়
টেনে টেনে আনি।
কঠিন উত্তাপ পেলে সানগ্লাসে চোখ ঢাকি
অন্ধকার অতি বেশি নিদ্রাতুর
হাওয়ার অভাবে কলকাতা শহর ধুঁকছে
প্রতিদিন মিছিল মিছিল
প্রতিদিন
সংসদে কথার ফানুস
ইদানীং
লরীতে পটল আলু বিক্রি হচ্ছে সমস্যাহীন
গণতন্ত্রী স্নেহের প্রপাত!

প্রাচীন বাঙালী

হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

রবীন্দ্র-কাব্যের শেষ অধ্যায়

জীবনের শেষ অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথের আজন্ম সাধন ধন কবিতা লক্ষ্মীর এক প্রতিদ্বন্দ্বিনীর আভির্বাব ঘটেছিল। এই সময় তিনি হঠাৎ রেখার প্রেমে পড়ে গেলেন। এই নূতনার প্রতি কিছু পক্ষপাত থাকলেও তাঁর প্রথম প্রেমাস্পদ ঠিক অনাদরে পড়ে রইলেন না। চিত্রশিল্প চর্চার সঙ্গে সমানে কাব্য চর্চাও চলেছিল। জীবনের এই অধ্যায়ে তিনখানি উপন্যাস ছাড়া আর যা লিখেছেন সবই কাব্যগ্রন্থ। কাজেই চিত্র শিল্পের প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও দেখা যায় কাব্য লক্ষ্মীর উপর আকর্ষণ তাঁর শিথিল হয় নি।

অবশ্য এই যুগের কাব্যগুলির বিষয়বস্তু ও রচনারীতিতে পূর্বের রচনার সহিত পার্থক্য এসে পড়েছিল। এই পরিবর্তনটি তিনি নিজেই লক্ষ্য করে ছিলেন। পূর্বের রচনায় যে অলঙ্কার বাহুল্য ও ছন্দের মাধুর্ব বর্তমান ছিল তা ধীরে ধীরে অপসৃত হয়েছে। তার স্থান নিয়েছে ভূষণবর্জিত অলঙ্কারহীন ভাষা। বাহিরের এই নূতন রূপের সঙ্গে সামঞ্জস্য ভিতরের বস্তুরও পরিবর্তন এসেছে। আলোচ্য বস্তুতে অনুভূতির প্রাধাণ্য কমে গিয়ে ক্ষীণ হয়ে এসেছে এবং তার স্থান নিয়েছে মননশীল রচনা। রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছেন, তারা

বসন্তের ফুল নয়, প্রৌঢ় ঋতুর ফসল। সারা জীবনের বিভিন্ন বিচিত্র অভিজ্ঞতা তাঁর হৃদয়ে কত আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। তা সুন্দর ছন্দোবদ্ধ ভাষায় অভিব্যক্তি পেয়েছে তাঁর প্রথম জীবনের কবিতায়। তা যেন বসন্ত ঋতুর ফুল। তাদের প্রধান আকর্ষণ বাহিরের রূপে। তাঁর এই শেষ বয়সের রচনাগুলিতে সমস্ত জীবনের অভিজ্ঞতা মন্থন ক'রে যে প্রজ্ঞা উদ্ভূত হয়েছিল তাই বাণী পেয়েছে তাঁর শেষ বয়সের রচনায়। তিনি তাই বলেছেন,

"এরা বসন্তের ফুল নয়; এরা হয়ত প্রৌঢ় ঋতুর ফসল; বাইরে থেকে মন ভোলাবার দিকে ঔদাসীন্য। ভিতরের দিকে মননজাত অভিজ্ঞতা এদের পেয়ে বসেছে।" (নবজাতক-সূচনা)

এই যুগের রচনার ভাষার ভূষণ ত্যাগ করার আকুতি সময় সময় এত প্রবল হয়েছে যে রবীন্দ্রনাথ কবিতা রচনায় গদ্যছন্দ ব্যবহার করেছেন। গদ্যছন্দে রচনা করবার ইচ্ছা তাঁর মনে প্রথম আবিষ্কার হয় অনেক কাল আগে; ঠিক বলতে ১৯১২ খৃষ্টাব্দে যখন তিনি 'লিপিকা' রচনা করেন। লিপিকার? বিষয় ছিল সাংকেতিক অর্থ বহনকারী বিভিন্ন ছোট কাহিনী। তার পূর্বে পরোক্ষ ভাবে গদ্যে কাব্য রচনার অভিজ্ঞতা তাঁর লাভ হয়েছিল যখন তিনি ইংরাজী 'গীতাঞ্জলি' রচনা করেন। এই গ্রন্থে বাংলা 'গীতাঞ্জলি' 'খেয়া', 'শিশু' প্রভৃতি গ্রন্থ হতে নির্বাচিত কবিতার ইংরাজী অনুবাদ স্থান পেয়েছে। কিন্তু এই অনুবাদ ঠিক ভাবানুগ অনুবাদ নয়। যে ভাবে মূল কবিতার মর্মকথা ইংরাজি ভাষায় প্রকাশ দেওয়া যায় সেই ভাবেই সেগুলি রচিত। দ্বিতীয় কথা, পদ্যে নয় গদ্যে সেগুলি রচিত। এ অনুবাদগুলির প্রাণ পদ্যের, রূপ গদ্যের। সুতরাং এগুলি গদ্যছন্দে রচিত কবিতা হয়ে দাঁড়ায়। অবশ্য কবিতার আকারে এগুলি সাজান নয়।

এই অভিজ্ঞতা থেকেই তাঁর 'লিপিকার' রচনারীতি জন্মলাভ করে। এখানে এ বর্ণনীয় বিষয় কাব্যধর্মী, ভাষা গদ্যে এবং রচনা সাজান ইংরাজি 'গীতাঞ্জলির' রীতি অনুযায়ী গদ্যের আকারে। এগুলিকে অনায়াসে পদ্যের আকারে সাজান যেত। সুতরাং এটি তাঁর বাংলায় লেখা গদ্যছন্দের প্রথম উদাহরণ।

তারপর জীবনের শেষ অধ্যায়ে তিনি গদ্যছন্দে একাধিক কাব্য লেখেন। এই শ্রেণীর কাব্যের অন্তর্ভুক্ত হবে 'পুনশ্চ' (১৯৩২), 'শেষ সপ্তক' (১৯৩৫), 'শ্যামলী' (১৯৩৬)। এদের কবিতাগুলি গদ্যছন্দে লিখিত এবং পদ্যের আকারে সাজান।

শেষজবনে রচিত কবিতাগুলির মধ্যে বাল্যস্মৃতি একটি বড় অংশ অধিকারী

ক'রে বসেছে। এমনটি হওয়া স্বাভাবিক, কারণ বাল্যস্মৃতি মানুষের জীবনের মধুর স্মৃতি। কাজেই বার্ধক্যে তার মানসিক স্মৃতি কারণ একটি আকর্ষণীয় বিলাসী 'পুনশ্চের' কবিতায়, 'শেষ সপ্তকের' কবিতায়, 'শ্যামলী'র কবিতায় ও 'আকাশ প্রদীপের' কবিতায় তারা ছড়ান আছে। এই প্রসঙ্গে দু-একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। 'শ্যামলী'তে তেঁতুল ফুলের গল্প আছে; 'আকাশ-প্রদীপে' স্কুল পালানর অভিজ্ঞতার কথা আছে।

রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারার দুটি মুল স্বর উল্লেখযোগ্য। তিনি মানব জীবনকে ভারি ভালবেসেছিলেন, রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দের জগৎকে তিনি আনন্দ বলে অভিহিত করেছিলেন। উপনিষদের ঋষির সেই অবিস্মরণীয় বাণী 'আনন্দং রূপমমৃতং যদ্বিভাতি'; তারই প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় তাঁর রচনায়। জীবনের শেষ অধ্যায়ে দুঃখ সুখের নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গিয়েও তাঁর এই বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ ছিল। বার্ধক্যে রচিত তাঁর বিভিন্ন কবিতায় তার পুনরায় দৃপ্ত ঘোষণা আমরা পাই। দু একটি উদাহরণ এই প্রসংগে উদ্ধৃত করা যেতে পারে। 'বীথিকায়' আছে,

'অনেক তৃষা, অনেক ক্ষুধা,
তাহারি মাঝে পেয়েছি সুধা—
উদয়গিরি প্রণাম লহ মম।'

প্রায় জীবনের প্রান্তে এসে লেখা 'আরোগ্য'-এর অন্তর্ভুক্ত একটি কবিতায় পাই,

'শেষ স্পর্শ নিয়ে যাব যবে ধরণীর
বলে যাব, তোমার ধূলির
তিলক পরেছি ভালে,
দেখেছি নিত্যের জ্যোতি দুর্যোগের মায়ার আড়ালে।
সত্যের আনন্দরূপ এ ধূলিতে নিয়েছে মূরতি,
এই জেনে এ ধুলায় রাখিনু প্রণতি।'

রবীন্দ্রনাথের আর একটি মূল ভাবধারা হল জীবন ও মৃত্যুকে ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে সংযুক্ত ক'রে দেখা। জীবন ও মৃত্যুকে পরস্পর হতে বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখলে, মৃত্যুর সংহার রূপটাই চোখে পড়ে, কিন্তু তার যে একটি কল্যাণ রূপও আছে তা চোখে পড়ে না। তা হল জীবন প্রবাহকে জরা হতে মুক্তি দিয়ে নবীন রূপ দেওয়া। এই বাণীর মধ্যে উপনিষদের একটি বচনের প্রতিধ্বনি পাই। উপনিষদে বলে 'মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি॥ তত্র কঃ শোকঃ কো মোহ একত্বমনু পশ্যতঃ॥' মৃত্যুর শোকাবহ

মুক্তিকে সেই দেখে, যে তাকে জন্ম হতে বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখে। সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখলে মৃত্যুর আঘাতে শোক বা মোহ কোথায়? রবীন্দ্রনাথের নানা কাব্যে এবং সাংকেতিক নাটকে এই কথাটি বার বার উচ্চারিত হয়েছে। যে পরম শক্তি বিশ্ব নিয়ে লীলা করছেন তাঁকে তিনি নটরাজের রূপে কল্পিত করেছেন; তাঁর লীলা নৃত্যই সৃষ্টিপ্রবাহকে আবর্তিত করে। সেই নৃত্যের মধ্যে যে ছন্দ আছে তা হল জন্ম ও মৃত্যু। তাই তিনি বলেছেন তিনি নিজের চিত্তের মাঝে নিত্য তাঁর নৃত্য ধ্বনি শুনতে, তারই সঙ্গে মৃদঙ্গের তালের মত হাসি কান্না, ভালো মন্দ, জন্ম মৃত্যু নাচে তিনি বলেছেন প্রাণের প্রবাহকে মৃত্যুরূপী স্নান শুচিতা দান করে; তা না হলে তা আবর্জনায় বদ্ধ হয়ে যেত।

তাঁর জীবনের শেষ অধ্যায়ের কবিতায় এই বাণী বার বার নূতন ক'রে নূতন ভঙ্গিতে উচ্চারিত হয়েছে। তাতে বোঝা যায়, তাঁর মূল দার্শনিক চিন্তাখানি অপরিবর্তিত রয়ে গিয়েছে। এই প্রসঙ্গে দু একটি উদাহরণ উদ্ধৃত করা যেতে পারে। 'শেষ সপ্তকের' একটি কবিতায় তিনি বলেছেন,

"আমি মৃত্যু রাখাল
সৃষ্টিকে চরিয়ে চরিয়ে নিয়ে চলেছি
যুগ হতে যুগান্তরে
নব নব চারণ ক্ষেত্রে।"

একই কথা একটু স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গিতে 'সেঁজুতির' অন্য এক কবিতায় প্রতিধ্বনিত হয়েছে। বিশ্বে সবই চলমান, মৃত্যু জীবনের নিত্যসখী, তাকে প্রবাহিত রেখে সজীব রাখে। তাই তাঁর মতে বিশ্ব হল এমন জিনিষ যা নেই নেই ক'রে আছে:

অচঞ্চলের অমৃত বরিষে
চঞ্চলতার নাচে,
বিশ্বলীলা ত দেখি কেবলি সে
নেই নেই করে আছে।
ভিত ফেঁদে যারা তুলিছে দেয়াল,
তারা বিধাতার মানেনা খেয়াল;
তারা বুঝিল না, অনন্তকাল
অচির কালেরই মেলা।'

শেষ বয়সের লেখায় কিছু নূতন সুরও ছিল। তা প্রকাশ পেয়েছে দুই রূপে, তবে তারা পরস্পর ঘনিষ্ঠ। একটি রূপ হল ছড়ায় লেখা রচনা। এ হল বাংলা প্রাকৃত ভাষার কাব্যরূপ। তিনি সাধুভাষার সঙ্গে তার রচনারীতির তুলনা

ক'রে বলেছেন, "বাংলা সাধুভাষার রূপ ঢেউয়ের, বাংলা প্রাকৃত ভাষার রূপ কণাবৃষ্টির।" 'ছড়ায় ছবি' বইখানি এই ছড়ার ছন্দে রচিত।

অপর নূতন রীতি হল খামখেয়ালি কবিতা রচনা। ইংরাজিতে যাকে বলে 'ননসেন্স ভার্স' আর কি। পরস্পর সামঞ্জস্য বিহীন কথার যোজনার দ্বারাই এখানে রস সঞ্চার করা হয়। 'খাপছাড়া' কাব্য গ্রন্থে এই রসের ছড়াছড়ি। তবে এই রীতির রচনা যে সহজ নয় সে কথাটা ও এই কবিকুল চূড়ামণি আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন এই বলে,

"কঠিন লেখা নয় কো কঠিন মোটে
যা-তা লেখা তেমন সহজ নয় ত।'

জীবনের শেষপ্রান্তে বিশ্বের নানাস্থানে রাজনৈতিক অশান্তি, তাঁর মনকে বড় বিক্ষুব্ধ করেছিল। বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকের শেষভাগে কয়েকটি সাম্রাজ্য লিপ্সা বিশ্বের নানা স্থানে যুদ্ধ বিগ্রহ ও অশান্তি ছড়িয়ে দিয়েছিল। বিশ্বের এই ভয়াবহ পরিস্থিতি এবং ক্ষাত্র শক্তিতে সমৃদ্ধ বলবান জাতিদের বর্বর আচরণ তাঁর মনে গভীর বেদনা সঞ্চার করেছিল। ক্ষোভে এবং হতাশায় তিনি তাদের এই আচরণকে লক্ষ্য ক'রে কিছু কঠোর বাণী তাই না শুনিয়ে পারেন নি ও এই প্রসঙ্গে তার দু একটি উদাহরণ স্থাপন করা যেতে পারে। 'প্রান্তিকের' একটি কবিতায় তিনি বলেছেন,

"নাগিণীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস
শান্তির ললিত বাণী শোনাইতে ব্যর্থ পরিহাস
বিদায় নেবার আগে তাই,
ডাক দিযে যাই
দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে
প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে।"

এই কবিতার অনুরূপ সুরে আর একটি কবিতায় রচিত হয়েছিল অনেক পরে, উপরের কবিতাটির রচনাকাল ১৯৩৭। তখনো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাধেনি। পরের কবিতাটি রচিত হয়েছিল আরও পরে এবং 'আরোগ্য' কাব্যগ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে তিনি ক্ষোভ ক'রে বলেছিলেন, মানুষ আত্মহত্যা ক'রে সম্ভবত নিজ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে উদ্যত হয়েছে :

মানব আপন সত্তা ব্যর্থ করিয়াছে দলে দলে,
বিধাতার সংকল্পের নিত্যই করেছে বিপর্যয়
ইতিহাসময়!

সেই পাপে
আত্মহত্যা অভিশাপে
আপনার সাধিছে বিলয়।

ডাঃ নির্মল সরকার

সবুজ সাদা

বালিশ থেকে মাথাটা তুলে ভবেশবাবু ঘরের চারিদিকে ভাল করে একবার তাকিয়ে দেখে নিলেন। না, কেউ কোথাও নেই। এ সময় অবশ্য কেউ থাকেও না। খাট থেকে মেঝের উপর পা দুটো রাখলেন তিনি। প্রায় দুদিন তিনি একভাবে শুয়েছিলেন। একটুও নড়বার উপায় ছিল না। সকালের দিকে পরেশ ঘর পরিষ্কার করেছিল প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে। এত চাড় ওর কোনদিনই ছিল না। বাজার করা ছাড়া অন্য কাজে পরেশের এত নিষ্ঠা ভবেশবাবু এর আগে লক্ষ্য করেননি। প্রথমে ঘরের মেঝেটা ঝাঁটা দিয়ে ঝেঁটিয়ে দিল। তারপর চেয়ার টেবিল, ফুলদানি, এ্যাস ট্রে, টেবিল ল্যাম্প, কাবার্ড সব ঝাড়ন দিয়ে পরিপাটিভাবে মুছতে শুরু করল। এত নিখুঁতভাবে আর মনযোগ দিয়ে কাজ করতে ভবেশবাবু কলেজের কেমিষ্ট্রি ল্যাবরেটরীতে কঠিন এক্সপেরিমেণ্টরত কোন ছাত্রকেও দেখেননি! ভবেশবাবুর বিরক্তিতে তার কিছু এসে গেল না। বাবুর অসুখে পরেশ দেশেই যায়নি। মেদিনীপুরে বাড়ী যাদের তারা মাসে একবার দেশে যাবেই, তা সে কলকাতায় গেরস্ত বাড়ীর কাজই করুক আর অফিসের কাজেই থাকুক। ভবেশবাবু পরেশের এই ত্যাগ

স্বীকারও ভাল চক্ষে দেখেননি। উপরওয়ালার দৃষ্টি না থাকাতে ইদানীং বাজার করার স্পৃহাটা পরেশের অকস্মাৎ বেড়ে গিয়েছে, আর দেশে না যাওয়ার সেটাই প্রধান কারণ বলে ভবেশবাবু সাব্যস্ত করে নিয়েছেন। পরেশের প্রাণান্তকর ঘর পরিষ্কার করার পর তিনি ভেবেছিলেন, এবার হয়ত নিশ্চিন্ত হতে পারবেন; তা হ'ল না। কয়েক মিনিট পরেই গৃহিণী কনকলতা ঘরের মধ্যে এসে পড়লেন। আর একটু হ'লেই বিপদ ঘটে যেত; খুব সামলে নিয়েছেন ভবেশবাবু। ঘরের চারি পাশে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে আলমারী খুলে টাকা বার করলেন কনকলতা। তারপর অকস্মাৎ ধপাস করে আলমারীর ডালাটা বন্ধ করে চলে গেলেন ঘরের বাইরে, আর সেদিকে ফিরেও তাকালেন না। বারান্দায় বেরিয়ে চীৎকার করে ড্রাইভারকে গাড়ী বার করতে বললেন ভবেশবাবু বুঝলেন, কনকলতা এবার ভবানীপুরে মামার বাড়ী যাবেন। সকাল থেকে কয়েকবারই, তিনি যে বাইরে যাবেন সে কথা পরেশ আর ড্রাইভারকে জানিয়েছেন।

গাড়ীর আওয়াজটা মিলিয়ে যেতে ভবেশবাবু উঠলেন। এতক্ষণ পরে সুযোগ মিলল তার। ঠাণ্ডা মেঝের ছোঁয়ায় তাঁর মনে বল এল। উঠে দাঁড়ালেন তিনি। তারপর বেশ কয়েকবার পায়চারী করলেন ব্যায়ামবীরের ভঙ্গীতে। আর কয়েক ঘণ্টা ওভাবে নিশ্চল হয়ে শুয়ে থাকলে তাঁর দেহ সম্পূর্ণ অসাড় হতে দেরী হত না। ভবেশবাবু একবার বারান্দায় উঁকি দিলেন তারপর বার হয়ে এদিকে ওদিক তাকিয়ে দেখে নিলেন। না কেউ কোথাও নেই। পরেশ বাজারে গিয়েছে, ফিরতে প্রায় ঘণ্টাখানেক হবে অথচ তাঁর সঙ্গে যখন যেত তখন আধ ঘণ্টার বেশী লাগত না। সিঁড়ির পাশের ঘরটা সৌরেশের। দরজায় তালা ঝুলছে। সৌরেশ তাঁর ছেলে—পোর্ট কমিশনার্স-এ চাকরী করে। বৌমা রুচি পোষ্ট অফিসে। দুজনেই বেরিয়ে গিয়েছে। ভালই হ'ল। অতি সন্তর্পণে এগিয়ে গেলেন ভবেশবাবু ভাঁড়ার ঘরের দিকে। একদিন ভবেশবাবু স্রেফ জলীয় পদার্থ খেয়ে জীবন ধারণ করে আছেন। এ ছাড়া কোন উপায় ছিল না তাঁর। তাঁর নিজের প্ল্যানিংই এর জন্য দায়ী, অবশ্য ডাক্তারী মতটুকু খুব জোরালো ভাবে প্রযোজ্য হয়েছে সেই সঙ্গে।......

কিছুদিন থেকে ভবেশবাবু লক্ষ্য করছিলেন তাঁর সংসারে যেন একটা অস্বাভাবিক আবহাওয়ার গুমোট জমেছে। একটা অমঙ্গলের চাপা দীর্ঘশ্বাস যেন তিনি শুনতে পাচ্ছেন অহরহ। গত মাসের প্রথম দিকে ইনফ্লুয়েঞ্জার পর থেকে এই ধরণের চিন্তা প্রায়ই তাঁর মনকে ভারাক্রান্ত করেছে। কারণে

অকারণে তিনি যে বিরক্তিবোধ করছেন, ক্লান্তি আর অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ছেন, তাও তিনি অনুভব করেছেন অনেক সময়ে। ইদানীং কোন শব্দই যেন তিনি সহ্য করতে পারছেন না। একটু আওয়াজ হলেই মাথার মধ্যে একটা অস্বাভাবিক যন্ত্রণা অনুভব করেন। তিনি বাড়ীতে থাকলে জলের পাম্পটা পর্যন্ত বন্ধ রাখতে হয়। সেদিন ট্রামে এক সহযাত্রী তাঁর পাশে বসে একটা কাঠি দিয়ে দাঁত খুটছিলেন আর দাঁত আর জিভের সাহায্যে ক্রমাগত একটা অদ্ভুত চিক্ চিক্ করে শব্দ করে যাচ্ছিলেন। ভবেশবাবু এই সামান্য শব্দটাকে প্রতিরোধ করতে সমস্ত মনোবল প্রয়োগ করেছিলেন, কিন্তু তবুও পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছিল তাঁকে। শেষ পর্যন্ত ঘণ্টা দিয়ে ট্রাম থেকে নেমে পড়েছিলেন তিনি।

ডাক্তার তাঁকে কয়েকটা ভিটামিন জাতীয় ওষুধ এবং প্রচুর আশ্বাস দিয়েছেন বটে তবে তাতে বিশেষ কিছু তারতম্য লক্ষ্য করা যায় নি। ডাক্তার বন্ধুর কাছেও তিনি গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা প্রত্যেকেই সব জিনিষটা হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। তাঁদের মতে তিনি নাকি মানসিক দুর্বলতায় ভুগছেন, দৈহিক কোন ব্যাধিই নেই। একথাটা সকলেই জোর দিয়ে তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। তাঁদের রায়ে ভবেশবাবু চিন্তিত হন নি; তাঁর যদি মানসিক দুর্বলতা থেকেই এ ধরণের উপসর্গ আসে তাতে একজন শিক্ষিত লোকের পক্ষে যা করা উচিত তিনি তাই করেছিলেন।

সাইকোলজী সংক্রান্ত অনেক বই তিনি ইতিমধ্যে পড়ে নিয়েছেন, তাতে কিন্তু ফল ভাল হয়নি, অনর্থক আরও জট পাকিয়েছে।

সেদিন খাবার টেবিলে বসে হঠাৎ তাঁর মনে হ'ল দুধের রংটা স্বাভাবিক নয়, কনকলতাকে ডেকে বললেন 'দুধের রংটা দেখছ? নিরীক্ষণ করে দেখে কনকলতা উত্তর দিলেন, 'কেন ঠিকই ত রয়েছে।'

'কি আশ্চর্য কনক, তুমি বুঝতে পারছ না রংটা একটু সবুজ ধরণের লাগছে।'

'না আমার সবুজ মনে হচ্ছে না, যেমন দুধের রং হয় তেমনই রয়েছে।'

'তোমার চোখটা আবার পরীক্ষা করা দরকার; কলার-ব্লাইণ্ড হয়ে যাচ্ছ তুমি; স্পষ্ট সবুজ আভাটা দেখতে পাচ্ছ না! কপারে নাইট্রিক এ্যাসিড দিলে টেষ্ট টিউবে এই ধরণের রং দেখা যায়। কেন অতদূরে যাবার দরকার কি— কপার সালফেট দেখেছ?"

'হ্যাঁ, তুঁতের রং জানি বৈকি।'

'তা হ'লে আর হাঙ্গামা কি, এবার মনে মনে মিলিয়ে দেখ।'

'না, কোন সবুজ রংয়ের আভাস পর্যন্ত নেই',—দ্বিধা না করেই উত্তর দেন কনকলতা।

বিরক্ত হলেন ভবেশবাবু। এত স্পষ্ট পার্থক্যটা চোখে পড়ল না কনকলতার। কয়েক মুহূর্ত ভ্রূ কুঞ্চিত করে রইলেন তিনি তারপর বললেন, 'তোমার দ্বারা হবে না, বৌমাকে ডাক।'

রুচি অফিস যাবার তোড়জোড় করছিল শাশুড়ীর ডাক শুনে টেবিলের পাশে এসে দাঁড়াল। ভবেশবাবু একবার তাকালেন রুচির দিকে, তারপর বললেন,

'বৌমা, দুধের রংটা কি বেশ ন্যাচারাল ?'

রুচি প্রশ্নটা ঠিক বুঝতে না পেরে শুধু তাকিয়ে রইল।

কনকলতা কি বলতে যাচ্ছিলেন বাধা দিয়ে ভবেশবাবু, প্রফেসরের নিজস্ব ভঙ্গীতে বলে উঠলেন,

'না-না, নো লিডিং কোয়েশ্চন। বৌমা, দুধের রং কি ?'

'সাদা', সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয় রুচি।

'বেশ। এবার বল এই গ্লাসের দুধটা কি সাদা না অন্য কোন কলার মেশান ব'লে মনে হচ্ছে।'

'হ্যাঁ 'বাবা'। 'কয়েক সেকেণ্ড দেখে নিয়ে উত্তর দেয় রুচি—'মনে হচ্ছে দুধের ওপরে অন্য একটু রং যেন।'

'বাঃ বেশ বলেছ, রংটা কি ?' কনকলতার দিকে একবার ভ্রূকুটি করলেন ভবেশবাবু।

'খুব হাল্‌কা হলদে'—উত্তর দিল রুচি।

'না না, হলদে নয়। শীতকালে ক্রীমের জন্য ওরকম একটু হয়, অন্য কোন রং—'

এবার দুধের গ্লাসটা তুলে নিয়ে রুচি আলোর দিকে ভালো করে দেখল, তারপর বলল,

'না বাবা, অন্য কোন রং নেই, যেমন দুধের রং হয় তেমনই।'

ভবেশবাবু খুশী হ'লেন না, বললেন,

'ঠিক আছে, তুমি যাও, তোমার আবার অফিসের দেরী হয়ে যাবে।'

রুচি চলে যাবার পর ভবেশবাবু দুধটা বেসিনে ঢেলে দিলেন।

'ওকি হ'ল, অতখানি দুধ ফেলে দিলে ?'

'হ্যাঁ দিলুম, আর দেখ, এবার থেকে আমার খাবার তুমি নিজেই রাঁধবে।'

'কেন, বামুনঠাকুর কি দোষ করলে।'

'না দোষ কেউ করেনি এমনি বলছি।' বেশী কথা না বলে ভবেশবাবু দ্রুত এগিয়ে গেলেন তাঁর ঘরের দিকে।

অস্থিরভাবে কয়েকবার দ্রুত পায়চারী করলেন তিনি। আশ্চর্য, স্পষ্ট সবুজ রংটা ওদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেল।

পাওয়ার অব অবজারভেশন বলে কোন জিনিস নেই, কেবল শাড়ীর পাড় আর গয়নার ডিজাইনের কথাটাই স্মরণ থাকে ওদের। না, আর নয়। এর পর থেকে নিজেই সাবধানে চলবেন তিনি, অপরের উপর নির্ভর করা আর চলবে না। মনে মনে নানারকমের আত্মরক্ষার কথা ভেবে নিলেন তিনি।

রুচি অফিসে কাজের চাপে কথাটা ভাবতে পারেনি। কিন্তু বাড়ী এসে সৌরেশের কাছে কথাটা পাড়ল, বলল—'আচ্ছা বাবার কি হয়েছে, বলত।'

'কেন কি হ'ল আবার ?' সৌরেশের স্বরে উৎসাহের অভাব।

'আজ সকালে এক গ্লাস দুধ সবুজ রং বলে ফেলে দিলেন।'

'তুমি সবুজ রংএর দুধ পছন্দ কর বুঝি ?'

'তা নয়। দুধটা ত সবুজ রংএর ছিল না, দুধের যেমন রং হয় তেমনি, একেবারে স্বাভাবিক।'

'তা হ'লে বোধহয় বাবার খিদে ছিল না ; ল্যাবরেটরীর বদখৎ গন্ধে নাড়ী উল্টে যায়।'

'তাই বুঝি ও রাস্তা মাড়ালে না !'—বাঁকাভাবে রুচি কথাটা উচ্চারণ করল।

'হ্যাঁ, তা বলতে পার বৈকি, আমতা আমতা করল সৌরেশ, পোর্ট কমিশনার্সের চাকরীটাই বা মন্দ কি, সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল।'

'বাবাকে কিন্তু অসুখী বলে মনে হচ্ছে, আবার কি যেন মনে মনে চিন্তা করেন আজকাল। প্রায়ই অন্যমনস্ক হয়ে থাকেন আর অল্পেতেই রেগে ওঠেন যেন।'

'আমার মনে হয় কোন সেপটিক ফোকাস' ; কিংবা, লিভার কনজেসসানও হতে পারে।'

'থাক আর ডাক্তারি কর না। সারাদিন পোষ্ট অফিসের আলকাতরার গন্ধে আর ষ্ট্যাম্প করার আওয়াজে মাথা ধরে আছে। এর ওপর আর টরচার কর না। রুচি খাটের একপাশে শাড়ীর আঁচলটা গায়ে ভাল করে জড়িয়ে বসল। তারপর বলল,

'আমার মনে হচ্ছে, হি ইজ হেডিং ফর এ নার্ভাস ব্রেকডাউন।'

'হঠাৎ নার্ভাস ব্রেকডাউন হওয়ার কি কারণ ঘটল',—সৌরেশ আড়চোখে তাকায়।

'অনিশ্চয়তা বলতে পার'—হাল্কা ভাবে উত্তর দিল রুচি।

'মাথাধরায় দার্শনিক আলোচনা কি খুব আরামদায়ক হবে; তার চেয়ে বরঞ্চ দুকাপ চা করে ফেল, দারুণ শীত পড়েছে।'

তা মন্দ নয়, 'উঠে দাঁড়াল রুচি, 'বাবা কলেজ থেকে ফেরবার আগে চা খেয়ে নেয়া যাক, না হ'লে আবার বিরক্ত হতে পারেন।'

এগারোটা পঁচিশ থেকে প্র্যাকটিকাল ক্লাস শুরু। ভবেশবাবু তাঁর কিউবিকলের মধ্যে গিয়ে বসে বেল টিপলেন। বেয়ারা আসতে ডিমনস্ট্রেটর অনিলবাবুকে ডেকে পাঠালেন। অনিলবাবু যাবতীয় সাজসরঞ্জাম, রিএজেন্ট সম্বন্ধে তদারক করেন। রিএজেন্ট ব্যাপারে ভবেশবাবু কয়েকদিন থেকে চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। আজকালকার ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধে তাঁর ধারণা খুব ভাল নয়। কখন কার মনের অবস্থা কি হয় তা বলা যায়না, আর চতুর্দিকে ত কড়া এ্যাসিড থেকে আরম্ভ করে পটাসিয়াম সায়নাইড পর্যন্ত ছড়ান রয়েছে। তুলে একটু মুখে দেওয়ার ওয়াস্তা—তারপরেই তাকে ধরে টানাটানি। কথাটা ভাবতেই ভবেশবাবু অস্থির হয়ে পড়লেন। চঞ্চলতা বেড়ে গেল অকস্মাৎ। চেয়ার থেকে উঠে জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি। আজকাল প্রায়ই অকারণে চঞ্চল হয়ে পড়ছেন। মনে মনে অবিশ্বাস্য আর অসম্ভব কল্পনাগুলোকে নিয়ে নিজেকে পীড়ন করেন বারবার। ডাক্তারবাবুরা একে মানসিক ব্যাধি বলেন, তা তিনি জানেন। কিন্তু জেনে কিছু ফল হয়নি। জোর করে নিজের মনের এই দুশ্চিন্তাকে তিনি দূরে রাখতে পারছেন না।

'আমায় ডেকেছেন স্যার'—অনিলবাবু এসেছেন।

'হ্যাঁ, অনিল রিএজেন্টগুলো……

– 'সব চাবি দেওয়া বড় লোহার আলমারীতে রাখা হয়েছে।'

লজ্জিত হলেন ভবেশবাবু, একটু সম্বিত ফিরল যেন, বললেন

—'না, তা নয়, আমি বলছি, যে রিএজেন্টগুলো ইস্টার্ণ কেমিক্যাল্‌স্ থেকে আনার কথা ছিল',—কথাটা ঢাকতে চেষ্টা করলেন যেন।

—'অর্ডার পাঠান হয়েছে, আসতে প্রায় তিন সপ্তাহ লাগবে।

—'বড় দেরী করে ওরা, এর পর অন্য কাউকে দিতে হবে। আচ্ছা, তুমি ক্লাসে যাও।' অনিলবাবু চলে গেলেন। মেঝের দিকে অনেকক্ষণ একদৃষ্টিতে

তাকিয়ে রইলেন ভবেশবাবু। তাঁর মনের অবস্থাটা অনিল জানলে খুবই লজ্জার কথা হবে। অনিলবাবু এক সময় তাঁরই ছাত্র ছিল।

এবার লেকচার দেবার সময় হয়ে এসেছে। কথাটা চিন্তা করেই ভবেশবাবু বুকের মধ্যে একটা অস্বস্তি অনুভব করলেন। হৃৎপিণ্ডের গতিটা বেড়ে গেল অকস্মাৎ। মনে পড়ল সেকেণ্ড বেঞ্চে বসা সেই ছেলেটার কথা। এক দৃষ্টে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকে লেকচার দেবার সময়। লম্বা চওড়া চেহারা পরণে প্যাণ্ট আর টেরিলিনের সার্ট। লেকচার শুরু হওয়া থেকে ওঁর ক্লাসে একদিনও কামাই করেনি ছেলেটা। শুধু তাই ওর মধ্যে একটা ব্যক্তিত্বের ছাপ লক্ষ্য করেছেন তিনি। সেদিন সাধারণ একটা প্রশ্ন করেছিলেন ক্লাসে। বেশীর ভাগ ছাত্রই উত্তর দিতে পারেনি, কয়েকজন মামুলী উত্তর দিয়েছে আর তাঁকে অবাক করে দিয়েছিল এই ছেলেটা।

তাঁর প্রশ্নের সঙ্গে আরও কত প্রশ্ন জড়িয়ে আছে, বিভিন্ন অথারের মতামত এবং অত্যাধুনিক গবেষণার ফল অক্লেশে বিনা আয়াসে বলে গেল সে। ভবেশ বাবুর নিজেরও অতদূর পড়াশুনা করার মত সময় বা ধৈর্য ইদানীং ছিল না। এরপর থেকে ক্লাসে যাবার সময় তার আশঙ্কা হ'ত, ছেলেটা তাঁকে কোন জটিল প্রশ্ন করে ক্লাসে অপদস্থ করে না বসে। সে দুর্ঘটনা কিন্তু কোনদিন ঘটেনি, উপরন্তু ছেলেটি ক্লাসের পর তাঁর কাছে এসে কয়েকবারই তাঁর উপদেশ নিয়েছে। তা সত্ত্বেও ক্লাসে যাবার আগে তাঁর মানসিক অবস্থা জটিল হয়ে পড়ে, বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগতে সামলাতে।

কলেজে সেদিন স্টাফ মিটিং-এর পর ভবেশবাবু উঠে পড়লেন একটা ট্রামে। কয়েকটা প্রয়োজনীয় জিনিস কিনে ফিরতি পথে হাঁটতে সুরু করলেন। সারাদিন কাজ করে ক্লান্ত হয়েছিলেন তিনি। হঠাৎ নজরে পড়ল অপর ফুটের রেঁস্তোরার দিকে। একটা টেবিলে রুচি আর কলেজের সেই ছেলেটি বসে রয়েছে। থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন তিনি তারপর আড়াল থেকে লক্ষ্য করতে লাগলেন ওদের। কিছুক্ষণ পরেই বেরুল ওরা। ছেলেটি পকেট থেকে সিগারেট বার করে ধরাবার উপক্রম করতেই রুচি ওর মুখ থেকে সিগারেটটা ছিনিয়ে রাস্তায় ফেলে দিলে। হেসে উঠল দুজনেই। ভবেশবাবুর পা দুটো যেন কে স্ক্রু দিয়ে রাস্তার সঙ্গে আটকে রেখেছে। শীতকালেও ঘেমে উঠলেন তিনি; মাথার ভেতরটা ঝিমঝিম করে উঠল। আশ্চর্য, এই তাঁর পুত্রবধূ! কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন নির্বাক হয়ে। সম্বিত ফেরার পর ধীরে ধীরে এগিয়ে চললেন।

বাড়ীতে ফিরে কাপড়জামা ছেড়ে শুয়ে পড়লেন তিনি, খাবার আর প্রবৃত্তি হ'ল না। নানা চিন্তায় ছেঁকে ধরল তাঁকে। সৌরেশের বিয়েতে তাঁর মত ছিল না। তিনি লক্ষ্য করেছেন, এ ধরণের বিয়ে প্রায়ই নিষ্ফল হ'য়ে যায়। এ আশঙ্কা তাঁর বরাবরই ছিল, কিন্তু শেষ অবধি রাজী হতে হয়েছিল বাধ্য হয়ে।

বিছানায় শুয়ে তিনি নিজের অসহায় অবস্থাটা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করে আত্মরক্ষার একটা উপায় স্থির করে নিলেন। বাড়ীতে তাঁকে দেখবার কেউ নেই একথা তিনি অনেক আগেই জেনে নিয়েছেন। সকলেই তাঁর বিরুদ্ধে, চাকর বামুন থেকে শুরু করে কনকলতা পর্যন্ত। রুচির কথা মনে পড়তেই গাটা শিউরে উঠল তাঁর। সৌরেশের ওপরও ভরসা করা চলে না। স্ত্রীর কথা ছাড়া একপাও চলে না সে।

বিছানায় শুয়ে রইলেন তিনি। একটু পরে কনকলতা এসে লক্ষ্য করলেন, ভবেশবাবু স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছেন। ভয় পেয়ে কয়েকবার ডাকলেন, কিন্তু একটা অস্বাভাবিক শব্দ ছাড়া অন্য কোন আওয়াজ পাওয়া গেল না। ডাক্তার পরীক্ষা করে দেখলেন ব্লাডপ্রেসার বেশী, অবশ্য বরাবরই তাই ছিল। ভবেশবাবুর বাঁদিকটা পড়ে গিয়েছে বলে সন্দেহ হ'ল তাঁর।

ভবেশবাবু এইটাই চেয়েছিলেন। তিনি বাড়ীতে থেকে সব জিনিসটা বুঝতে চান। যারা তাঁর শত্রুতা করছে তাদের ওপর নজর রাখতে হ'লে এ ছাড়া অন্য কোন উপায় ছিল না। এত দিন তিনি সকলকে বিশ্বাস করে এসেছেন; সকলের ওপর নির্ভর করেছেন অকপট ভাবে—তার ফল ভাল হয় নি। না, আর তিনি ওদের সে সুযোগ দেবেন না। ঘরে বাইরে সকলে তাঁর বিরুদ্ধাচারণ করছে তা তিনি প্রত্যেক পদে পদে অনুভব করছেন। তাই শেষ পর্যন্ত তাঁকে এক শঠতার আশ্রয় নিতে হ'ল।

সমস্ত জিনিসটাকে সাজাতে তাঁকে বেশ কিছুটা শিক্ষা নিতে হয়েছিল। পক্ষাঘাতের বিভিন্ন লক্ষণ, তার চিকিৎসা, সবই তিনি আগে শিখে নিয়েছেন। তাঁর অসুখের প্রতিক্রিয়া তিনি বিভিন্ন লোকের ওপর প্রত্যক্ষ করতে চান। বিপদে সকলেই সুযোগ নেয় তা তিনি জানেন, তাঁর নিজের পক্ষে এই সুযোগের পরিমানটা জেনে নেওয়া দরকার।......

...ভাঁড়ার ঘরে যাবার মুখে সৌরেশের ঘরের তালাটা নজরে পড়ল। যেন মেস বাড়ীর একজন মেম্বর তালা দিয়ে বাইরে গিয়েছে। আশ্চর্য! আত্ম-বিশ্বাস বলে কোনো জিনিসের বালাই নেই ওদের। কবে যেন ওদের ঘর থেকে রেডিওটা চুরি গিয়েছিল, সেই থেকে এই তালা কুলুপের ব্যাপার চলছে।

তাছাড়া রুচির মনের সংবাদ তিনি পেয়ে গিয়েছেন। যার নিজের মনের মধ্যে বিকার জন্মেছে তার স্বাভাবিক দৃষ্টিভঙ্গী থাকা অসম্ভব। অসুখের প্রথম দিন কনকলতা একটু বিচলিত হয়েছিলেন তার পর থেকে একেবারে স্বাভাবিক। মামার বাড়ী এমন কি মনে হয় সিনেমায় যাওয়াও চলছে হয়ত। কোন দিক দিয়ে কোন ব্যতিক্রমই নেই। জীবনটা যেন অকস্মাৎ অর্থহীন আর অনাবশ্যক হয়ে গিয়েছে তাঁর কাছে। অবসাদ আর তিক্ততার বিষে তিনি জর্জরিত হয়েছেন তিল তিল করে।

গাড়ীর আওয়াজে বুঝলেন কনকলতা ফিরেছেন—বিছানায় আবার শুয়ে পড়লেন তিনি।......তাঁর এক মাত্র ছেলে সৌরেশ। কত যত্নে তাকে মানুষ করেছেন তিনি; কত বিনিদ্র রাত কেটেছে তার শুভ চিন্তায়। প্রতিদানে কি পেলেন তিনি? সৌরেশ ঘরে বাইরে চাকরী রাখতেই ব্যস্ত, তাঁর খোঁজ করার সময় কোথায়?

কনকলতা ঘরে ঢুকে খাটের কাছে এগিয়ে এলেন তারপর তাঁর বালিশের নীচে হাত দিয়ে কি যেন অনুভব করলেন বলে মনে হল ভবেশবাবুর। কনকলতা হয়ত ভেবেছিলেন তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন আর চাবিটা তাঁর বালিশের তলায় রাখা আছে তাই সেটার খোঁজে এসেছিলেন। মনে মনে হাসলেন ভবেশবাবু। এটা তিনি আশা করেছিলেন। অপারক হ'লে কি কি ঘটনা ঘটতে পারে তার একটা ছক ইতিমধ্যে ঠিক করে রেখেছিলেন। সুতরাং আশ্চর্য হলেন না তিনি।

না, কোন অবলম্বনই রইল না,—স্ত্রী নয়, একমাত্র সন্তান নয়, রুচিও নয়ই। কলেজের অবস্থাও তাই। সকলে একযোগে তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে তাকে পিষে মারবার জন্য। দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ভবেশবাবু। ঘরের পাশে কনকলতা আর রুচি কথা বলছে ফিস্‌ফিস্ করে—

'ঘুমুচ্ছেন বুঝি?'

'হ্যাঁ; তুমি কোথায় গিয়েছিলে?'

'ছুটির এ্যাপ্‌লিকেশনটা পোষ্ট করে দিলুম।'

'আর সৌরেশ?'

'তিনি ডাক্তারের কাছে গেছেন, এখুনি এসে পড়বেন।'

'আমি এসে দেখি উনি একলা শুয়ে আছেন; একজন কারোর কাছে থাকা উচিত ছিল,—কনকলতার স্বরটা গম্ভীর—'

'ফুটের ওপারেই ত পোষ্টবক্স—'

আমতা আমতা করল রুচি তারপর বলল—'মা, বিমল এসেছে বাবাকে দেখতে।'

'তোমার বড়দার ছেলে ত ;—ও কি করে শুনল ?'

'ওতো বাবারই ছাত্র, কলেজে যাচ্ছেন না দেখে বাবার খোঁজ নিতে এসেছে।'

'ডেকে দাও তা হ'লে, দেখে যাক্।'

'দিচ্ছি, তার আগে আপনি কিছু মুখে দিন মা। কাল থেকে উপোস করে রয়েছেন, আপনার পুজো ত হয়ে গেছে।'

'হ্যাঁ, এই তো পুজো দিয়ে এলাম, আগে সৌরেশ ফিরুক, ডাক্তারবাবু কি বলেন শুনি, তারপর দেখা যাবে।

ওদের পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেল।

কনকলতা তা হ'লে মামার বাড়ী যান নি। ক্লান্তি বোধ করছেন ভবেশবাবু।

একটু পরে রুচি আর বিমল ঘরে ঢুকল সন্তর্পনে। আড়চোখে একবার ওদের দেখে নিলেন ভবেশবাবু। হঠাৎ যেন হৃৎপিণ্ডটা স্তব্ধ, নিশ্চল হয়ে গেল। এতো কলেজের সেই ছেলেটি! রুচির সঙ্গে রেঁস্তোরায় যাকে দেখেছিলেন তিনি। এতবড় সাংঘাতিক সন্দেহ আর ভুল করলেন কি করে! ওরা বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। সৌরেশের গলার শব্দে সম্বিত ফিরল ভবেশবাবুর। মায়ের সঙ্গে কথা বলছে সৌরেশ—

'ডাক্তারবাবু বাইরে নিয়ে যেতে বলছেন, বেশ কিছুদিন বিশ্রামের দরকার।'

'বেশ তাই হবে।' কনকলতা এক মুহূর্তে সব যেন ঠিক করে নিলেন।

'আমি তা হ'লে কিছু টাকা তুলে নিয়ে আসব ব্যাংক থেকে।'

'না, তোমায় তুলতে হবে না।'

'তা, হ'লে'—সৌরেশের দ্বিধাগ্রস্ত কণ্ঠস্বর।

'আমিই ব্যবস্থা করব, তুমি বরঞ্চ খেয়ে অফিস চলে যাও।'

সৌরেশের পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেল। ভবেশবাবু বালিশের তলায় হাত দিয়ে অনুভব করলেন, তাঁর চাবিটা যথাস্থানে ঠিকই রয়েছে—পাশেই একটা নরম ঠাণ্ডা স্পর্শ পেলেন—বার করে দেখলেন—একটা ফুল।

কনকলতা ঘরে ঢুকে নিজের আলমারী খুলে গয়নার বাক্সটা বার করলেন।

'কনক—'

'কে ?' চমকে উঠেছেন কনকলতা, বাক্সটা ফেলে রেখে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলেন খাটের দিকে। বললেন—'তুমি কথা বলতে পারছ—।'

হ্যাঁ, আমি ভাল আছি।

কনকলতার হাতটা শক্ত করে ধরে রইলেন ভবেশবাবু।

সুধাংশু দাশগুপ্ত

অনুবাদ অনুসরণ নাটক

আজকাল প্রায়ই একটি অভিযোগ শোনা যায়—অনুবাদ, অনুসরণ নাটক ছাড়া কি আমাদের দেশে নাটক নেই? বিভিন্ন মঞ্চে প্রত্যহ অন্ততঃ এক ডজন নাটক অভিনীত হচ্ছে। তার অন্ততঃ অর্দ্ধেকের বেশী হয় অনুবাদ, না হয় অনুসরণ। বাকি অর্দ্ধেকের ময়না তদন্ত করলে দেখা যাবে যে তাদের মধ্যে বিদেশী নাটকের প্রভাব ষোল আনা না হলেও অন্ততঃ চৌদ্দ আনা রয়ে গেছে। যদিও এই অর্ধেকের নাম মৌলিক নাটক, তবু কার্যতঃ এরা মৌলিক নয়। সামান্য ঋণ স্বীকারের মত যদি কোথাও 'কুশের অঙ্কুরসম ক্ষুদ্র অগোচরে' লেখা থাকত। 'অমুক নাটকের ছায়া অনুসরণে' তাহলেই একের মৌলিকত্ব ঘুচে যেত। ব্যাপারটা ভেবে দেখার মত।

এক হিসাবে বাংলা রঙ্গালয়ের প্রথম নাটকও অনুবাদ নাটক। লেবেডেফের প্রথম অভিনীত নাটক (১৭৯৫ সাল-২৭শে নভেম্বর) ছিল একখানি ইংরাজী প্রহসনের অনুবাদ—'Disguise'। ঐ সঙ্গে আরও একখানা ইংরাজী প্রহসন 'Love is the Best Doctor'—এরও তিনি অনুবাদ করান। এরপর বাংলা রঙ্গালয়ে পর পর যে সব নাটক অভিনীত হয় তার মধ্যে মৌলিক নাটক

সামান্য কয়েকখানাই ছিল ('কলিরাজার নাটক', 'বিভাসুন্দর' প্রভৃতি)। অন্যান্য অধিকাংশ নাটকই ছিল অনুবাদ, যার মধ্যে 'ওথেলো' নাটকটিও ছিল।

(প্রথম অভিনয় সাঁ সুসি থিয়েটার)।

উনিশ শতকের প্রথমার্দ্ধ পর্যন্ত বাংলার নাট্য ইতিহাস ছিল অনুবাদ অনুসরণের ইতিহাস। মধুসূদনের পূর্ববর্তী হরচন্দ্র ঘোষের অধিকাংশ নাটকই ছিল অনুবাদ। এর ভাষা ছিল সংস্কৃত শব্দভারে আড়ষ্ট, রীতি প্রয়োগেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংস্কৃত নাটকের প্রভাব স্পষ্ট লক্ষ্য করা গেছে। এঁর প্রথম নাটক 'ভানুমতী চিত্তবিলাস', 'Merchanat of Venice' নাটকের অনুসরণে লিখিত। এর কিছু পরে লেখা অন্য একটি নাটক 'চারুমুখ চিত্তহরা' অনুবাদ— এখানা 'Romeo Juliet'-এর অনুবাদ হলেও কিছু রূপান্তর দেশজ কারণে তিনি ঘটিয়েছিলেন ; যেমন, সংযোগস্থল ভারতবর্ষের কোন একটি নগর, ভাষা কথ্য, কোন কোন মূল চরিত্র অপসৃত। 'Romeo Juliet' আরও যাঁরা অনুবাদ করেন তাঁদের মধ্যে রাধামাধব কর (১৮৭০), যোগেন্দ্রনাথ দাশ ঘোষ (১৮৭৮), হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় (১৮৯৫) অন্যতম।

এর পরেই উল্লেখ্য রামনারায়ণ তর্করত্ন। মধুসূদন-পূর্ব যুগের বাংলা মৌলিক নাটকের ইতিহাসে রামনারায়ণকে শ্রেষ্ঠ আসন দেওয়া হয়ে থাকে। তিনি বহু মৌলিক নাটক রচনা করেছিলেন (কুলীনকুল সর্বস্ব, নবনাটক, উভয় সঙ্কট, যেমন কর্ম তেমনি ফল প্রভৃতি।) ভাষা ও রীতিতে তিনি এমন সব উদাররীতির প্রস্তাবনা করেন যা সে যুগে সত্যিই যুগান্তকারী ছিল। কিন্তু তিনিও অনুবাদ-অনুসরণের লোভ ত্যাগ করতে পারেননি। তিনি বেণী-সংহার, রত্নাবলী, মালতীমাধব প্রভৃতি বহু সংস্কৃত নাটক অনুবাদ করেছিলেন। অনেকের মতে তাঁর 'যেমন কর্ম তেমনি ফল' কার্যতঃ তাঁর সমকালীন মধুসূদনের 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'র অনুসরণে লেখা। এর 'ভোলাদাদা'র শেষ পরিণতিটুকু পর্যন্ত 'ভক্ত প্রসাদের' অনুরূপ। রামনারায়ণ-এর সমকালীন নন্দকুমার রায় ও তারাচাঁদ শিকদার-এর দুইখানি সংস্কৃত নাটকের অনুবাদও ('অভিজ্ঞান-শকুন্তল' ও ভদ্রার্জুন') এ সময় সমাদর লাভ করে।

কালীপ্রসন্ন সিংহ হচ্ছে আর একটি নাম যা বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য স্থান নির্দিষ্ট করে রেখেছে। মন্মথনাথ ঘোষ কালীপ্রসন্ন প্রসঙ্গে বলেছেন—' যে নাটকের দ্বারা সহজে সাধারণ্যে লোকশিক্ষা বিস্তৃত করা যায়, যে নাটকের অভিনয় দ্বারা জাতিকে উন্নত করা যায়, সেই নাটকের দ্বারা বঙ্গভাষাকে পুষ্ট করিবার জন্য কালীপ্রসন্ন যে চেষ্টা পাইয়াছিলেন

তাহা সাহিত্যের ইতিহাসে স্বর্ণ অক্ষরে লিখিত হওয়া উচিত।' এ হেন কৃতবিদ্য পুরুষও অনুবাদের মায়াজালে জড়িত হন। তিনি সংস্কৃত 'বিক্রমোর্বশী' ও 'মালতিমাধব' নাটক অনুবাদ করেন।

এর পরের যুগকে মাইকেল-দীনবন্ধুর যুগ বলে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। মাইকেলকে আধুনিক বাংলা নাটকের জনক বলা যায়। যদিও তার কোন কোন নাটকে সংস্কৃত নাটকের সুস্পষ্ট প্রভাব লক্ষ্যণীয়, তবুও সেগুলিকে অনুবাদ বা অনুসরণ বলা যায় না। অনেকে অবশ্য তাঁর 'শর্মিষ্ঠা' নাটকে সংস্কৃত 'রত্নাবলী' (রামনারায়ণ যা অনুবাদ করেছিলেন) নাটকের প্রভাব লক্ষ্য করেছেন (ডঃ প্রভু গুহঠাকুরতা ও যোগীন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি)। কিন্তু এ মতবাদকে অনেকেই আবার মেনে নেননি (ডঃ অজিত ঘোষ প্রভৃতি)। এই ধরণের অনুসরণের অনুবাদ তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রহসন 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' সম্পর্কেও এককালে দেওয়া হ'ত। এটা নাকি মলিয়ারের 'তারতুফ' নাটকের অনুসরণে রচিত—অন্ততঃ কয়েকটি জায়গায় মিল পাওয়া যায়। একথা অবশ্য নিশ্চিত ভাবে কেউই বলতে পারেননি যে মাইকেল 'তারতুফের' সুস্পষ্ট অনুসরণে 'ভক্তপ্রসাদের' চরিত্র সৃষ্টি করেছিলেন। অপবাদটা অবশ্য তথ্যের খাতিরে বিচার্য।

দীনবন্ধু মিত্রকে বাংলা দেশের প্রথম বাস্তববাদী নাট্যকার ও গণনাট্যের গুরু বলা হয়। এঁর বহু নাটকে মাইকেলের প্রভাব থাকলেও কোনটাকেই অনুবাদ-অনুসরণ দোষে দুষ্ট বলা যায় না। কিন্তু তাঁর 'নবীন তপস্বিনীর' দ্বিতীয় কাহিনীটি যে নিশ্চিত ভাবে শেক্স্‌পীয়ারের 'Merry Wives of Windsor'-এর অনুসরণে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। অনুসরণ বললাম এই কারণে যে সামান্য কিছু কিছু রূপান্তর চরিত্র ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় ('জগদম্বা' চরিত্র প্রভৃতি) যার জন্যে দীনবন্ধুর নাটককে সামান্য রূপান্তরিত বলে মনে হয়। তাঁর 'জামাইবারিক' নাটকের একটী দৃশ্য (পদ্মলোচনের দুই স্ত্রী যে দৃশ্যে একটী চোরকে ধরে স্বামী ভ্রমে প্রহার করছে) হুবহু রামনারায়ণের 'নবনাটকের' তৃতীয় অঙ্কের অনুসরণে লেখা। এই প্রসঙ্গে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের একটি উক্তি প্রণিধানযোগ্য—'তাঁর বহু বিবাহ বিষয়ক অধিকাংশ নাটকই প্রধানতঃ রামনারায়ণের নাটকগুলির অনুসরণে লেখা।'

মাইকেল-দীনবন্ধুর পর যাঁর নাম উল্লেখ্য তিনি মনোমোহন বসু। তাঁকে 'বাঙ্গালনবিশ' নাট্যকার বলা হত। অর্থাৎ মাইকেল দীনবন্ধুর পরবর্তী যুগের হলেও তিনি তাঁর পুর্বসূরীদের পাশ্চাত্য রীতিতে নাটক লেখেন নি। তিনি

সম্পূর্ণ প্রাচ্য আদর্শ অনুসরণ করেন। তার গীত-নাটকগুলিতে পৌরাণিক চরিত্রের ছায়া ও সংস্কৃত নাটকের রীত্-প্রভাব পড়লেও কোন নির্দিষ্ট সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ তিনি করেননি। কিন্তু অনুসরণ করেছিলেন—সংস্কৃত 'চণ্ডকৌশিক' নাটক অনুসরণে তিনি 'হরিশ্চন্দ্র' নাটক রচনা করেন।

এর পরবর্তী যুগ উনিশ শতকের মধ্যভাগে সুরু হয়। ঐ সময়ে ইয়োরোপীয় আদর্শবাদের সঙ্গে স্বদেশীয়ানার মিলন ঘটে। সাহিত্যে, শিল্পে বয়ে আসে এক নতুনতর ধারা যা পূর্ববর্ত্তী ধারাগুলিতে নতুনতর প্রাণ সঞ্চারিত করে। প্রথমেই উল্লেখ্য উমেশচন্দ্র দত্তের 'বিধবা বিবাহ' নাটক। ১৮৫৬ সালে 'বিধবা বিবাহ আইন' পাশ হবার সঙ্গে সঙ্গে এ নাটকের সৃষ্টি। সমকালীন সামাজিক মূল্যে এ নাটক তাই অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ ও এক হিসাবে এটাকে প্রথম মৌলিক বিয়োগান্ত নাটক বলা যায়, কারণ এটাতেই প্রথম এক সম্পূর্ণ ভারতীয় সমস্যা এক বিয়োগান্ত চিত্র লাভ করে। কিন্তু এ নাটকেও অনুসরণ দোষ লক্ষ্য করা যায়। অনেকের মতে ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর কাব্য' ও রামনারায়ণের 'কুলীন কুল সর্বস্ব' নাটকের ছায়া এ নাটকে সুস্পষ্টভাবে রয়ে গেছে।

এ যুগের এক অবিস্মরণীয় নাম জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর প্রথম ঐতিহাসিক নাটক 'পুরুবিক্রম'। দ্বিতীয় নাটক "সরোজিনী'। এই নাটকটি ইউরিপিডিসের 'Iphigenia at Aulis' অনুসরণে রচিত ও ঘটনা সংযোগে অদ্ভুত মিলই এ অনুমানকে সত্য প্রমাণিত করে। তাঁর 'অশ্রুমতী' নাটকে 'Othello'র প্রভাব লক্ষ্য করা গেলেও, এটা যে 'Othello'র নিশ্চিত অনুসরণে লেখা এ কথা বলা যায় না। কিন্তু তাঁর প্রহসনগুলির মধ্যে কয়েকটি বিদেশী নাটকের সুস্পষ্ট অনুসরণ—এ কথা নিশ্চিত ভাবে বলা যায়। তাঁর 'হঠাৎ নবাব' মলিয়ারের 'The Cit turned Gentleman'-এর সুস্পষ্ট অনুসরণ। এমন কি পাত্রপাত্রীদের নামেও অদ্ভুত সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়; যথা—Jordan বাংলায় জুর্দন খাঁ, Cleontes বাংলায় খেলাৎ খাঁ, Dorimene বাংলায় ডেলমনিয়া প্রভৃতি। একই যুক্তিতে 'দায় প'ড়ে দারগ্রহ'কে মলিয়ারের 'Marriage Force'-এর অনুসরণ বলা যায়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বহু সংস্কৃত ও ইংরাজী নাটকেরও অনুবাদ করেছিলেন যার মধ্যে সেকস্পীয়ারের 'জুলিয়াস সীজার' অন্যতম। ১৮৭৯ সালে যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক ভদ্রলোক 'আমি তোমারই' নামে একখানি প্রহসন লেখেন। এটি পুরোপুরি দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী'র শেষ অংশের অনুসরণে লেখা। এ নাটকটি অখ্যাত হলেও প্রাসঙ্গিক বলে উল্লেখ করতে হল।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পর যে সব নাট্যকার বাংলাসাহিত্যে স্থায়ী স্বাক্ষর রেখে গেছেন তাঁদের মধ্যে গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও রসরাজ অমৃতলাল বসু অন্যতম। এদের অধিকাংশ নাটকই মৌলিক। তবু দু একটি ক্ষেত্রে এঁরাও অনুবাদ অনুসরণদোষে দুষ্ট হয়েছিলেন। গিরিশচন্দ্রের পারিবারিক সমস্যামূলক বিখ্যাত নাটক 'প্রফুল্ল' আপাতঃ মৌলিক হলেও তাঁর পূর্বসূরী তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়-এর 'স্বর্ণলতা' নাটকের সুস্পষ্ট ছায়া এতে রয়ে যায়। একে অনুসরণ বললে তাই অত্যুক্তি হবে না। তাঁর আর একখানা নাটক 'বলিদান'-এর বিয়োগান্ত ঘটনা পরিকল্পনায় তিনি 'নীলদর্পণ' নাটক (দীনবন্ধু মিত্রের বিখ্যাত নাটক) অনুসরণ করেছিলেন। অমৃতলালের বিষয় নির্বাচন ছিল স্বতন্ত্র ধরণের—তাঁর প্রহসনগুলিতে পাশ্চাত্য বিরাগ এত প্রকট ছিল যে তাঁকে সেকালেই ঘোরতর রক্ষণশীল বলা হত। কিন্তু এ হেন অমৃতলালও পাশ্চাত্য নাটকের অনুসরণে বহু নাটক রচনা করেন। তাঁর বিখ্যাত প্রহসন 'চোরের উপর বাটপাড়ি' মলিয়ারের The School of Wives' অনুসরণে রচিত। তাঁর 'চাটুজ্যে ও বাড়ুজ্যে' Sir F. Burnad-এর 'Cox and Box' ও J. M. Morton-এর 'Box and Cox' নামের দুখানি প্রহসনের হুবহু অনুসরণে রচিত। অনেকের মতে 'কৃপণের ধন' ও মলিয়ারের 'The Miser' নাটক অনুসৃত। সংস্কৃত নাটকের অনুসরণেও তিনি নাটক লেখেন। মনোমোহন বসুর মত তিনিও 'চণ্ডকৌশিক' অনুসরণে 'হরিশ্চন্দ্র' নামে একখানি নাটক রচনা করেন।

বিশ শতকের সুরুতে ক্লাসিক থিয়েটারের মালিক অমরেন্দ্রনাথ দত্ত স্টেজের প্রয়োজনে অনেকগুলি নাটক লেখেন—তার কিছু গীতিনাট্য ও কিছু রঙ্গনাট্য। একখানি প্রায় ঐতিহাসিক পূর্ণাঙ্গ নাটকও তিনি লিখেছিলেন—নাম 'হরিরাজ'। এটি সেকস্‌পীয়ারের 'Hamlet' অনুসরণে লেখা।

মোটকথা, মাইকেল-দীনবন্ধুত্তোর যুগেও, যখন বাংলা নাটকের মৌলিক বিকাশ ঘটে, তখনও অনুবাদ অনুসরণের অভ্যাস শেষ হয়নি। আর এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী যে বিদেশী নাট্যকারদের অনুসরণ করা হয়েছে তাঁরা সেকস্‌পীয়ার ও মলিয়ার। এই অনুসরণবৃত্তি উনিশশতকে ইংলণ্ডের নাট্যকাররাও সার্থকভাবে পালন করে গেছেন। দিনের পর দিন ফরাসীনাটক অনুসৃত ইংরাজী নাটক ইংলণ্ডের মঞ্চে অভিনীত হয়েছে। এই অনুসরণ প্রবণতা এতদূর বৃদ্ধি পায় যে ১৮৭৯ সালে ম্যাথু আর্ণল্ড সম্বন্ধে বলেছিলেন। The result of putting french wine into English bottles is to give to the attentive observer a Sense of incurable falsity in the piece

as adopted' ফরাসী ও ইংরাজ সমাজের মধ্যে প্রভেদ সামান্তই। তা সত্ত্বেও ম্যাথু আর্নল্ড যে কারণে ফরাসী নাটকের রূপান্তরকে বিসদৃশ বলেছিলেন তা ভেবে দেখার মত। যদি ইংরাজ নাটক সম্বন্ধে এ মন্তব্য প্রযোজ্য হয়, তবে ভারতবর্ষের মাটীতে ফরাসী বা ইংরাজী নাটকের রূপান্তর বা ভাষান্তরকে তো কোনমতেই সুলক্ষণ বলা যায় না। লক্ষণ যাই হোক, মূল বাংলানাটকের চরম অভাবই যে এই অনুবাদ-অনুসরণ প্রবণতার জন্তে দায়ী ছিল এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। ভাষান্তরিত বিদেশী নাটকের জনপ্রিয়তা প্রসঙ্গে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়-এর একটি মন্তব্য এখানে প্রণিধানযোগ্য। ১৯২৪ সালের Calcutta Review পত্রিকার কোন একটি সংখ্যায় তিনি লিখেছিলেন 'In the absence of original Bengali plays they proceeded, influenced as they were by the charm of the English purformances, to meet their want by enacting plays in English. But it hardly satisfied the 'dramatic appetite' of the General Public......They...... natarally looked Forword to being entertained by appropriate plays written in their own language! অর্থাৎ ইংরাজী ভাষায় নাট্যাভিনয়ে প্রলুব্ধ হওয়া দিয়ে সুরু, ও দর্শকের উপলব্ধির প্রয়োজনে সেই ইংরাজী নাটকের ভাষান্তরকরণ দিয়ে পরিণতি। ম্যাথু আর্নল্ড-এর ভাষায় দেশী বোতলে বিদেশী মদের রূপান্তর ঘটল। অর্থাৎ ইংলণ্ডের মত এদেশেও অনুবাদ-অনুসরণের ধারা একই ধারায় বয়ে চলতে লাগল।

এই ধারা মাইকেলের প্রথম নাটক 'শর্মিষ্ঠায়' নূতনতর প্রবাহ সৃষ্টি করে। যোগীন্দ্রনাথ বসু'র 'মাইকেল মধুসূদন জীবনচরিত' গ্রন্থে মাইকেল-এর একখানা চিঠির উল্লেখ পাওয়া যায়। এর অংশবিশেষে মাইকেল তাঁর বন্ধু গৌরদাস বসাককে লেখেন 'Besides, remember that I am writing for that portion of my countrymen, who think as I think, whose minds have been more or less imbued with western ideas and modes of thinking ; and that is my intention to throw off the fetters forged for us by a survile admiration of everything Sanskrit'। এই মনোভাবই মাইকেলকে নূতন ধারাপ্রয়োগে প্ররোচিত করে। অর্থাৎ বিদেশী অনুসরণের বদলে সংস্কৃতের অনুসরণ। কিন্তু অনুসরণ দোষ উভয় ক্ষেত্রেই রয়ে গেল। তবু সংস্কৃত নাটক অনুসরণ বাংলা নাট্য-সাহিত্যের জাতীয়ত্ব লাভের পথ সুগম করে ও নিজস্ব মৌলিক নাট্যরীতির জন্ম দেয়।

বিশশতকের গোড়া থেকে বাংলা নাটকে অনুবাদ অনুসরণের প্রভাব কমে আসতে থাকে আর এর জন্তে বহুলাংশে দায়ী দীনবন্ধু, গিরিশচন্দ্র ও পরবর্তীকালের ডি. এল. রায়, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত,

তুলসী লাহিড়ী, মন্মথ রায় ও গণনাট্য সঙ্ঘ প্রভৃতির মৌলিক নাট্যভাবনা। এ নাট্যভাবনায় পাশ্চাত্যপ্রভাব থাকা সত্ত্বেও অনুবাদ-অনুসরণের বাঁধা ছকের নিশ্চিত মুরুব্বিয়ানা এরা মেনে চলেন নি। রবীন্দ্রনাথের সাঙ্কেতিক নাট্য-রীতির উল্লেখ এখানে করলাম না এই কারণে যে মৌলিক সামাজিক-নাট্য ভাবনায় রবীন্দ্রনাটকের অবদান সামান্যই। তাঁর অধিকাংশ নাটকই সাঙ্কেতিক আর এ ব্যাপারে তাঁকে প্রভাবিত করে Materlinck, Yeats, Synge যাঁরা সাঙ্কেতিক নাট্যসাহিত্যের জনক।

একেবারে হাল আমলের নাট্যকারদের মধ্যে আবার উনিশশতকের মত অনুবাদ-অনুসরণ প্রবণতা বেড়ে গেছে। তবে এরা একটি ব্যাপারে অত্যন্ত সৎ— মূল নাট্যকারের ঋণ এঁরা প্রতিক্ষেত্রে স্বীকার করেন, আর নির্মমভাবে মূল কাহিনীর রূপান্তর ঘটান।এর ফলে শেষ পর্যন্ত যে নাটক দর্শকের সামনে দাঁড়ায় তাতে দেশী রান্নাঘরে বিদেশী খানার গন্ধ ভুরভুর করে। মূল পাচকের সন্ধান করলে শেষপর্যন্ত যিনি সামনে এসে কুর্ণীশ করেন তিনি মুন্সীয়ানার গর্বে বুক ফোলালেও তাঁকে দেখে বাঙ্গালী দর্শক মুচকি মুচকি হাসেন। কিন্তু মূল প্রশ্নটা প্রতিটি দর্শকের মনেই রয়ে যায়—কি সে কারণ যা আবার ৫০ বছর আগের মত আমাদের অনুবাদ অনুসরণ বিষে জর্জরিত কর্চ্ছে। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের মত বিদগ্ধ সমালোচক তখন খেদ প্রকাশ করে যথার্থই বলেন—'সাম্প্রতিক বাংলানাটকের ক্ষেত্রে আরও একটি প্রয়াস দেখা দিয়াছে, সে সম্পর্কে দুই একটি কথা বলা দরকার মনে করি। অনুবাদ ও স্বাঙ্গীকরণ দ্বারা চিরকালই বাংলা সাহিত্যের সকল শাখাই পুষ্টিলাভ করিয়াছে; একদিন সংস্কৃত ও ইংরাজী নাটক অনুবাদ করিয়া বাংলা নাটকের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল। তথাপি এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে অনুকরণ এবং অনুবাদই যদি নাট্যকারদিগের একমাত্র লক্ষ্য হইয়া পড়ে তবে সাহিত্যজাতীয় রসচৈতন্য হইতে বঞ্চিত হইয়া সহজেই জাতির সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত হইয়া পড়ে। আজ বাঙ্গালীর জীবনে নাটকীয় উপাদানের অভাব আছে বলিয়া কেহ স্বীকার করিবেন না,অথচ দেখা যায় যে অধিকাংশ নাট্যকার জাতীয়জীবনের উপাদানগুলিকে তাঁহাদের রচনায় গ্রহণ করিবার পরিবর্তে পাশ্চাত্য নাটকের বিষয়বস্তু অবলম্বন করিয়া নাটক রচনা করিয়া থাকেন। তাহার ফলে তাহাদের মধ্য দিয়া যে সমাজজীবনে পরিচয় আমাদের চোখের সামনে ফুটিয়া উঠে, তাহা আমাদের সামাজিক জীবনের আদর্শকে বিভ্রান্ত করে।" ['বাংলা সামাজিক নাটকের বিবর্তন' দ্রষ্টব্য]

কথাটায় যে গভীর খেদ আছে তা লক্ষ্য করার মত। আর এই খেদই বর্ত্তমান নাট্যপিপাসুদের খেদ।

দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

বন-তুলসী

"ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্॥"

দাওয়ায় দাঁড়িয়ে সূর্য প্রণাম শেষ করতেই সত্যকিংকরের দৃষ্টিটা পড়লো সদর দরজার দিকে। আহা, কি সুন্দর ঢলঢলে মুখখানি। সাধারণ কালোপাড় একটা শাড়ী পরে মেয়েটি দাঁড়িয়েছিল দরজার চৌকাঠের পাশে। স্মিত হাস্যে জিজ্ঞেস করলেন সত্যকিংকর—তুমি কোথা থেকে এসেছো মা? তোমাকে তো এ গাঁয়ে কখনো দেখিনি।

ঘাড়টা হেঁট করে' জবাব দিলে মেয়েটি—মাসীমার বাড়ী বেড়াতে এসেছি আমি। ভূধরবাবু আমার মেশোমশাই।

—ও, তা'ই নাকি! ভূধর তোমার মেশোমশাই?

তোমার নাম কি মা?—সত্যকিংকরের জিজ্ঞাসা।

ছোট্ট উত্তর মেয়েটির—তুলসী।

—বটে! বটে! বাঃ, ভারি সুন্দর নাম তো তোমার। -সত্যকিংকরের আনন্দোদ্ভাসিত মুখ।

আঁচলাটা ভাল করে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে মিহিকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো তুলসী—দু'টি তুলসীপাতা নোবো? আজ আমাদের বাড়ীতে সত্যনারায়ণ পুজো হ'বে। নারায়ণের মাথায় তুলসীও দেওয়া হ'বে।

—নিশ্চয়ই নেবে। তুলসীরই তো তুলসীপাতার অধিকার সকলের আগে। কে তোমাদের পুরুত আমি জানি না। আমি হ'লে নারায়ণের মাথায় দিতুম গাছ তুলসী, আর সঙ্গে সঙ্গে সঁপে দিতাম প্রাণ-তুলসী নারায়ণের গাঁটছড়ায়।—রসিকতার উচ্চহাস্যে ফেটে পড়লেন সত্যকিংকর।

তুলসীর তুলসীপাতা তোলা হ'ল, সঙ্গে কিছু ফুল। আঁচলের খুঁটে বেঁধে নিয়ে ঘাড়টি হেঁট করে সত্যকিংকরকে প্রণাম করলো তুলসী। তারপর আস্তে আস্তে দরজা পার হয়ে পথে পা বাড়ালো। কী আশীর্বাদ করলেন সত্যকিংকর শোনা গেল না। শুধু একটা চাপা দীর্ঘশ্বাসের ক্ষীণ শব্দ শোনা গেল।

সত্যকিংকর ভট্টাচার্য। পেশা পৌরোহিত্য। বংশপরম্পরায় পুরোহিতের কাজই করে এসেছেন ভট্টাচার্য বংশের সন্তানেরা। সত্যকিংকরের প্রপিতামহ ছিলেন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। শ্বশুরের সম্পত্তি পেয়ে এ গ্রামে বসবাস করতে আসেন। স্বভাবগুণে অল্পসময়ের মধ্যেই বেড়ে ওঠে যয্‌মান সংখ্যা। সত্যকিংকরের বাপ-ঠাকুরদাও যয্‌মানদের ওপর নির্ভর করেই সংসার প্রতিপালন করে এসেছেন। তিনিও তাই করছেন। ছেলে সুধামাধবের কিন্তু পেশা হিসেবে পৌরোহিত্য ভাল লাগলো না। মামারবাড়ী বরানগরে থেকে লেখাপড়া শেষ করে। এখন সে চাকরী করছে একটা সওদাগরী অপিসে।

একমাত্র ছেলে। কলকাতায় থাকে। বছরে দু'একবার দেশে এসে মা-বাপকে দেখে যাবার মত অবকাশ হয় না সুধামাধবের। কাজে ব্যস্ততাই নাকি না আসার একমাত্র কারণ। তিনি বুঝতে পারেন না কী এত কাজ যে এই ক' মাইল পথ আসা যায় না! ছেলের সাহায্যের প্রত্যাশা করেন না। ছেলেকে দেখতে পেলেই খুসী।

সত্যকিংকরের উদাস বিস্ফারিত দৃষ্টিটা আবদ্ধ তুলসীর চলার পথে। চমক ভাঙলো গৃহিণী পঙ্কজিনীর ডাকে—কি গো, আজ আর কি পুজো-আচ্চা হ'বে না? পথের পানে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেই নারায়ণের পেট ভরবে?

কুণ্ঠিতকণ্ঠে তিনি বল্‌লেন:—না না, এই যাই। গৃহিনী পঙ্কজিনী পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন কথার ফাঁকে। খোলা দরজার মধ্যে দিয়ে আঙুল দেখালেন সত্যকিংকর।—মেয়েটিকে দেখেছো? পঙ্কজিনী দৃষ্টি প্রসারিত করলেন। —হ্যাঁ, পথে ঘাটে দেখেছি, তবে চেনা নেই।

—বড় সুলক্ষণা মেয়ে। যেন সাক্ষাৎ শ্রীরাধিকা। তাঁর কণ্ঠে আবেগ-মিশ্রিত উচ্ছ্বাস।

—খুব গুণেরও মেয়েটি। শুনলাম নবীনের পরিবারের ছেলে হ'বার সময় সারা রাত জেগে সেবা করেছে। দু'হাতে করে সব মুক্ত করেছে। নবীন তো মা বোলতে অজ্ঞান। পঙ্কজিনীর চোখেও প্রসংসার দৃষ্টি।

অজ্ঞাতে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়লো সত্যকিংকরের বুক থেকে, মুখ থেকে বেরোলো একটা আক্ষেপের শব্দ। স্বামীর দিকে চেয়ে পঙ্কজিনী বলে উঠলেন —তোমার আবার কি হল ?

—না হয় নি কিছু। ভাবছি, এই রকম একটি বউ হ'লে বাড়ীটাও মানাতো, বুড়ো-বুড়িকে একটু সেবা যত্নও করতো। তা' তোমার গুণধর ছেলের তো ধনুকভাঙা পণ—বিয়ে করবেন না।—সত্যকিংকরের কণ্ঠে খেদ।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, কোরবে। গোড়ায় গোড়ায় সব ছেলেই ও কথা বলে থাকে। কথা শেষ করে পঙ্কজিনী রান্নাঘরে ঢুকলেন, সত্যকিংকর ঢুকলেন ঠাকুর ঘরে।

সত্যকিংকর সেদিন যেন তুলসীর অপেক্ষাতেই দাঁড়িয়েছিলেন দাওয়ার ওপর। সবেমাত্র ভোরের আলো ফুটেছে অল্প অল্প। সত্যকিংকরের স্নান শেষ। নামাবলী গায়ে জড়িয়ে আপন মনেই কৃষ্ণনাম করছিলেন অস্ফুটস্বরে, দৃষ্টি কিন্তু প্রসারিত পথের ওপর। তুলসী সদর দরজার কাছে আসতেই বলে উঠলেন—আজ কি পুজো আছে রাই তুলসী ?

সলজ্জভাবে ঘাটটা হেঁট করে জবাব দেয় তুলসী—আজ আর কিছু পুজো নেই।

—তবে সাজি হাতে ভোর বেলায় বেরিয়ে পড়েছ যে ?—তাঁর মুখে স্মিত হাসি।

ধরা পড়ে গিয়ে তুলসীর মুখটা লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠলো। বললে—না না, মানে বাড়ীর বারোমেসে পুজো…।

তুলসীর কথা শেষ না হতেই সত্যকিংকর হো হো করে হেসে উঠলেন। —বারোমেসে পুজো! ভূধরের বাড়ী! আগে তো কখনো শুনিনি। বলি, এত পুজো করে কে ? তুমি নিশ্চয়ই।

—না না, সে এমন কিছু নয়। আমার একটা নারায়ণের পট আছে, তা'তেই…। কথা শেষ করতে পারলে না তুলসী। লজ্জায় ঘাড় হেঁট করে মাটির দিকে তাকিয়ে রইল।

—ঠিক ধরেচি। বাঃ বাঃ, বড় ভাল লাগলো মা শুনে। আজ কিন্তু শুধু

নিজের পুজোর ফুল তুলে নিয়ে পালালে চলবে না। আমারও ফুল-তুলসীপাতা তুলে দিতে হ'বে।—সত্যকিংকরের মুখে সেই মিষ্টি হাসি।

তুলসী যেন চম্‌কে উঠলো। বললে—আমি তুলে দেব আপনার পুজোর ফুল-তুলসীপাতা ?

—হ্যাঁ, তুমিই তুলে দেবে। নারায়ণ আমাকে কানে কানে বলেছেন, তুলসী না তুলে দিলে সে ফুল-তুলসীপাতা আমার মাথায় চাপাস নি।

কথাটা শুনে পাথরের মত নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইল তুলসী। লোকমুখে শুনেছে মিথ্যে বলেন না সত্যকিংকর। তবে কি সত্যিই উনি নারায়ণের নির্দেশ পেয়েছেন ? কিন্তু কি করে সে ঐ নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের পুজোর ফুল-তুলসীপাতা তুলে দেবে! সে যে···।

চমক ভাঙলো সত্যকিংকরের ডাকে—কি গো, কি ভাবছো ? দেবে না আমার পুজোর যোগাড় করে ? যশোদা দুলাল······।

আবার চমকে উঠলো তুলসী। মুখ দিয়ে একটা অস্ফুট শব্দ বেরোলো—য-শো-দা-দু-লা-ল !

—হ্যাঁ গো, যশোদা-দুলাল। ননীচোর।—বলে উঠলেন সত্যকিংকর।

তুলসী তখনো নির্বাক বিস্ময়ে চেয়ে আছে সত্যকিংকরের পানে। চেষ্টা করছে দেখবার নিজের ভেতরটা। রোমন্থন করছে অতীতের ফেলে আসা দুঃস্বপ্নের মত দিনগুলো। যশোদাদুলাল—

—তবে থাক উপোসী হয়ে ননীচোর যশোদাদুলাল। চিন্তার জাল ছিঁড়ে গেল তুলসীর। দেখলে মিটিমিটি হাসছেন সত্যকিংকর !

—চুরি করে অনেক ননী খেয়েছে। পেট একেবারে ভর্তি। থাক উপোসী হয়ে একটা দিন।—হাসলেন সত্যকিংকর।---যশোদাদুলাল কিন্তু ভয়ানক অভিমানী। বাঁশি বাজিয়ে আর ডাকবেনা শ্রীরাধিকাকে যমুনার কুলে।

তুলসীর দেহে যেন ইলেকট্রিকের শক্ লাগলো। চমকে উঠলো। যশোদাদুলাল তাকে বাঁশি বাজিয়ে ডাকেনি। কিন্তু মিষ্টি কথার অনেক বাঁশি তো সে বাজিয়েছিল। যমুনার কুলে ডাকেনি, নিয়ে গিস্‌লো গঙ্গার কুলে। মায়ের মন্দির স্পর্শ করে···।

ছিঁড়ে গেল তুলসীর চিন্তার জাল।—যশোদাদুলাল তাহলে উপোসই থাক, কি বল ? সত্যকিংকরের রহস্যভরা জিজ্ঞাসা।

আর কথা বাড়াবার সাহস হ'ল না তুলসীর। তাড়াতাড়ি বলে উঠলো—না না, আমি ফুল-তুলসীপাতা তুলে দিচ্ছি।

বাগানের দিকে এগিয়ে গেল তুলসী ধীরপদক্ষেপে। তা'র গমনপথের দিকে চেয়ে সত্যকিংকর অনাবিল আনন্দের হাসি হাসলেন। তারপর ধীরে ধীরে ঢুকলেন ঠাকুর ঘরে।

সাজি ভর্তি করে ফুল-তুলসীপাতা তুলে নিয়ে এসে তুলসী দাঁড়ালো ঠাকুর ঘরের দরজার সামনে। সত্যকিংকর নিবিষ্টমনে চোখ বুজে বসে আছেন আসনে। দেখলে মনে হ'বে ধ্যানে মগ্ন। ধ্যান ভাঙানো উচিত হ'বে না বিবেচনা করে তুলসী সাজি হাতে দাঁড়িয়ে রইল চুপটি করে। মানুষের নিঃশ্বাসেরও শব্দ আছে, এক শ্রেণীর মানুষ শুনতে পান সেটা।

সত্যকিংকর চোখ খুলেই সামনে দেখলেন তুলসীকে। মনে হ'ল তাঁর ধ্যানের শ্রীরাধিকা দেহ ধরে তাঁরই দরজায় দাঁড়িয়ে। হেসে বললেন—এনেছো? ঐ থালাটার ওপর রাখ।

একটু ইতস্তত করে তুলসী ধীরে ধীরে ঢুকলো ঠাকুর ঘরে। রাখলো ফুল-তুলসীপাতা থালার ওপর সত্যকিংকরের নির্দেশমতো চলে আসার জন্যে পা বাড়াতেই সত্যকিংকরের ডাকে থমকে দাঁড়ালো।—দেখ মা, চন্দনটা ব্রাহ্মণী, মানে তোমার জেঠিমা রোজই ঘসে দেন। কাল রাত থেকে তিনি জ্বরে বেহুস হয়ে পড়ে আছেন। চন্দনটাও তোমাকে আজ ঘসে দিয়ে যেতে হ'বে।

তুলসীর মুখটা তুলসীপাতার মত কালো হয়ে গেল। অস্ফুটে শুধু উচ্চারণ করলে—আ-মা-কে!

—হ্যাঁ, তোমাকে। চন্দন না হ'লে নারায়ণের মাথায় তুলসী চাপাবো কি দিয়ে? সত্যকিংকরের অসহায়ের মত মুখভাব লক্ষ করলো তুলসী। তখুনি বলে উঠলো—কিন্তু আমি তো চন্দন ঘসতে জানি না।

সত্যকিংকরের প্রাণ-খোলা উচ্চহাস্যে বিব্রত হয়ে তুলসী ঘাড়টা নিচু করলো। হাসতে হাসতেই বললেন সত্যকিংকর—চন্দন ঘসতে আবার জানা অজানার কি আছে মা? পাথরের ওপর গঙ্গাজল দিয়ে চন্দন কাঠটা ঘস, দেখবে একটু পরেই জলটা চন্দন হয়ে যাবে। নাও, চট্‌পট্‌ ঘসে ফেল। আমি চট্‌ করে দেখে আসি ব্রাহ্মণীর ঘুম ভাঙলো কি না।

উঠতে যাচ্ছিলেন সত্যকিংকর। তুলসীর কথা শুনে আবার বসে পড়লেন। ঘাড়টা নিচু করে একটু রুক্ষস্বরেই জবাব দিলে তুলসী—চন্দন ঘসতে আমি পারবো না।

সত্যকিংকরের বিস্মিত কণ্ঠের জিজ্ঞাসা—পারবে না? কেন পারবে না মা?

আমতা আমতা করে জবাব দিলে তুলসী, আমার এখনো স্নান হয় নি। চন্দন পিঁড়ি ছোঁব কি করে?

সত্যকিংকরের আবার সেই উচ্চহাস্য—এই কথা। গঙ্গাজলে সব শুদ্ধ,—বলে কমণ্ডলু থেকে গঙ্গাজল নিয়ে তুলসীর গায়ে মাথায় ছিটিয়ে দিয়ে ঠাকুর ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

পাথরের মত দাঁড়িয়ে থেকে কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করলো তুলসী। না না, যে চন্দন নারায়ণের মাথায় উঠবে তা'তে সে হাত দিতে পারবে না। অনেক পাপ তার জীবনে জমা হয়েছে, আর বাড়াতে চায় না সে। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের পুজোর উপকরণে সে তা'র কলুষিত হাত দুটোকে লাগাতে পারবে না।

চলে আসার জন্যে সাজিটা হাতে তুলে নিতেই সত্যকিংকরের খড়মের খট্ খট্ শব্দ কানে এল। তুলসীর মনে হ'ল কে যেন তার পিঠে খড়মের ঘা মেরে বোলছে—এখনো দাঁড়িয়ে রইলি! যা, শিগগির চন্দন পিঁড়ি নিয়ে বোস্। পুজো না হ'লে ঐ বুড়ো বামুনটা জলস্পর্শ করবে না, তা' জানিস্। সমস্ত চিন্তা জলাঞ্জলি দিয়ে তুলসী ত্বরিতপদে ঘরে ঢুকে চন্দন ঘস্তে বোসলো।

তুলসী ঠাকুরের থেকে বেরিয়ে আস্তে আস্তে গিয়ে দাঁড়ালো গৃহিণী পঙ্কজিনীর ঘরের দরজার সামনে। পঙ্কজিনী দেবী কাঁথা মুড়ি দিয়ে দরজার পানে চেয়েই শুয়েছিলেন। তুলসীকে দেখেই আনন্দে বলে উঠলেন—এসেছিস, আয় মা। তুলসী জড়িতপদে ঘরে ঢুকে পঙ্কজিনী দেবীর বিছানার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো।

তুলসীর পানে এক পলক চেয়ে দেখে অল্প হেসে বললেন পঙ্কজিনী দেবী—কর্তার পুজোর যোগাড় করে দিয়ে এলি? তুলসী নীরব। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আবার শুরু করলেন পঙ্কজিনী—তুই বোধ হয় আর জন্মে আমাদের কেউ ছিলি। নইলে, পরের এত করতে পারে না।

সাজিটা মেঝেতে নামিয়ে রেখে বিছানায় বসলো তুলসী। পঙ্কজিনী তুলসীর ডান হাতটা তুলে নিয়ে নিজের জ্বরতপ্ত কপালে চেপে ধরলেন। তুলসীর মুখে কথা নেই, কিন্তু হাতটা কাজ করে চলেছে। পঙ্কজিনীর মাথায় কপালে তার নিটোল হাতটা খেলা করে বেড়াতে লাগলো।

নিজের মনেই একবার বলে উঠলেন পঙ্কজিনী—আঃ, সব যন্ত্রণা যেন নিমিষে কোথায় চলে গেল! তুলসীর মুখের পানে চেয়ে অল্প হেসে বললেন—তোর হাতে কি আছে বল্তো? মাথাটা যন্ত্রণায় ছিঁড়ে যাচ্ছিল, এখন কিন্তু আর কিছু নেই! আবার একটা দীর্ঘশ্বাস পড়লো।—না, তোকে আর কতক্ষণ

আটকে রাখবো। তোরও তো অনেক কাজ পড়ে আছে। তুলসী আস্তে আস্তে সাজিটা নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। চলে আসার সময় শুধু পঙ্কজিনীর আর একটা চাপা দীর্ঘ নিঃশ্বাসের শব্দ তার কানে এল।

পথ চলতে চলতে একটা চিন্তাই শুধু তুলসীর মাথায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল। কেন সে এ কাজ করতে গেল? সে তো সত্যকিংকরকে বললেই পারতো চন্দন ঘসতে পারবে না। হাত দুটোর দিকে চেয়ে দেখল একবার। ছিঃ ছিঃ, এ দুটো হাতে সে যশোদাদুলালকে আলিঙ্গন করেছে, আর এই হাতের ঘসা চন্দন কিনা নারায়ণের মাথায় চাপালেন সত্যকিংকর! চিন্তার জালে যখন প্রায় জট পাকিয়ে এসেছে, চোখ তুলে একবার তাকালো তুলসী। ওমা, এ যে বাড়ীর কাছে এসে গেছে সে।

দেখতে দেখতে অনেকদিন হয়ে গেল, যাই যাই করে যাওয়া হয়ে ওঠেনি। যাওয়া আসার ফলে সত্যকিংকরের সংসারের সঙ্গে অনেকটা জড়িয়ে পড়েছে তুলসী। অনেকবাল ভেবেছে আর যাবে না ও বাড়ীতে, কিন্তু কিসের অদৃশ্য আকর্ষণ যেন ওকে টেনে নিয়ে গেছে। কতবার ভেবেছে খোলাখুলি বলে দেবে সত্যকিংকরকে, পুজোর কোন কাজ সে করতে পারবে না। কিন্তু পারেনি বলতে। সত্যকিংকরের নিষ্ঠাবান চেহারা, ধ্যানগম্ভীর মুখমণ্ডল তাকে বলতে বাধা দিয়েছে। কিছু বলতে গেলেই সত্যকিংকর এমন করে হেসে ওঠেন, তুলসীর বলার কথা কোথায় তলিয়ে যায়। তাড়াতাড়ি লেগে পড়ে কাজে।

সত্যকিংকরও যেন কেমন পরমুখাপেক্ষী হয়ে পড়েছেন তুলসীকে পেয়ে। তুলসী না আসা পর্যন্ত নামাবলী গায়ে জড়িয়ে পায়চারী করেন দাওয়ায়। ক্ষণে ক্ষণে চেয়ে দেখেন পথের পানে। দূর থেকে তুলসীর কাপড়ের চিরপরিচিত পাড়টি দেখতে পেলেই আনন্দে ভরে ওঠে মুখটা। তুলসী ফুল তুলে না দিলে পুজো করে আনন্দ পান না, তৃপ্তি পান না নারায়ণের মাথায় তুলসী চাপিয়ে যদি না চন্দন ঘসে দেয় তুলসী। আর একটা আশা তিনি মনের গোপন কোণে সযত্নে সাজিয়ে রেখেছেন তুলসীকে একান্ত আপনার করে পাওয়া। কথাচ্ছলে জানতে পেরেছেন তুলসী ওঁদেরই পাল্টি ঘর। এখন তাঁর গুণধর ছেলে রাজী হলে হয়। গৃহিণী পঙ্কজিনী বলেন—তুমি থাম দিকি। তুলসীকে দেখলেই ছোঁড়ার মাথাটা বোঁ করে ঘুরে যাবে। তখন আর দেশ ছেড়ে যেতে চাইবে না। চাই কি এখান থেকেই ডেলি প্যাসেঞ্জারি করবে। সত্যকিংকর মৃদু মৃদু হাসেন, মনে মনে ঠাকুরকে জানান—হে ঠাকুর, গৃহিণীর কথাই যেন সত্য হয়।

ক'দিন হ'ল তুলসী আর আসছে না। যথানিয়মে সত্যকিংকর সকালে

স্নান সেরে নামাবলী গায়ে জড়িয়ে দাওয়ায় এসে দাঁড়ান,—কতক্ষণে সেই পরিচিত শাড়ীর পাড়টি দেখতে পাবেন। দেখতে দেখতে রোদ উঠে যায়, বেলা বাড়ে। বিষণ্ণ মনে সত্যকিংকর ঢোকেন পুজোর ঘরে। যথারীতি পুজো করেন, কিন্তু মনের কোথায় যেন খালি থাকে। একটা কাঁটা যেন সারাদিন খট্‌খট্‌ করে বিঁধতে থাকে। রোজই মনে করেন কাল নিশ্চয়ই আসবে, তা'ই আর কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করেন না।

সেদিন আর থাকতে না পেরে গৃহিণীকে জিজ্ঞেস করলেন সত্যকিংকর—হ্যাঁ গা, আমার মা লক্ষ্মীর কি হ'ল বল তো? ক'দিন আসছে না কেন?

পঙ্কজিনীর বিস্মিত কণ্ঠের উত্তর—কেন, তুমি কিছু জান না?

সরলভাবেই জবাব দেন সত্যকিংকর—না তো।

—হা আমার পোড়া কপাল! এ যে গ্রাম শুদ্ধ্ সকলে জানে গো!—গৃহিণীর সখেদ উক্তি।

সত্যকিংকর বোবার মত চেয়ে থাকেন গৃহিণীর মুখের পানে।

—হারু কৈবর্তর বাড়ী শুদ্ধ্ সকলের কলেরা হয়েছে। কে কার মুখে জল দেয় এমন অবস্থা। হারুকে তো জানই। সারাটা জীবন খালি মারদাঙ্গা করে এসেছে। তাই বিপদের সময় উঁকিটি দিলে না কেউ। তখন ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো আমার তুলসী মা ছুটলেন। যে মুহূর্তে কানে এসেছে, কেউ আর ধরে রাখতে পারলে না গা। শুনলুম কী সেবা যত্নই না করেছে হারুদের। বলে পেটের মেয়েতে অমন করতে পারবে না।—বলতে বলতে পঙ্কজিনী দেবীর দু'চোখ ছল্‌ছল্‌ করে উঠলো।

সত্যকিংকর কথাগুলো শুনছিলেন, কিন্তু দেখলে মনে হ'বে যেন প্রতিটি শব্দ গিলছেন। গৃহিণীর মুখের ওপর স্থির দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দাঁড়িয়ে আছেন, শুধু চোখের কোন দুটো অল্প চিক্ চিক্ করছে।

পঙ্কজিনী দেবী আবার নিজের মনেই শুরু করলেন—হারু নাকি পা দুটো জড়িয়ে ধরে বলেছিল—"তুমি আর জন্মে আমার মা ছিলে। বলে দাও কি পাপে আমার এই শাস্তি।" সত্যকিংকরের মুখের ওপর দৃষ্টিটা নিবদ্ধ করে জিজ্ঞেস করলেন পঙ্কজিনী—তুলসী কি বললে জান?

সত্যকিংকরের চোখ মুখের গভীর ঔৎসুক্য!

—বললে, "এর জবাব তো আমি দিতে পারবো না হারু। তুমি ঠাকুরমশায়ের কাছে যাও, তিনি বলতে পারবেন। তিনি সদাচারী, সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ, তিনি নিশ্চয়ই বলতে পারবেন।

সত্যকিংকরের চোখের কোণ ছু'টো জলে টল্‌টল্‌ করছে। কণ্ঠও বুজে এসেছে তাই পারছেন না কোন জবাব দিতে।

পঙ্কজিনীই শেষ করলেন—ঠাকুরমশাই কে জান তো ?

সত্যকিংকরের অবস্থা একই রকম।

—তুমি গো তুমি। পঙ্কজিনী আর দাঁড়াতে পারলেন না। ত্বরিতপদে ঢুকলেন রান্নাঘরে। সত্যকিংকরের চোখের কোনে জমা জল গাল বেয়ে ঝরে পড়ল ঝর্‌ঝর্‌ করে।

সেবারে বর্ষার মাঝামাঝিই ম্যালেরিয়া বসলো আসর জাঁকিয়ে। সত্যকিংকর পঙ্কজিনী ছু'জনেই একসঙ্গে সেই আসরের রসিক শ্রোতা রূপে যোগ দিলেন। সকালের দিকে জরটা কম থাকে। সত্যকিংকর কোনরকমে পুজো সাঙ্গ করেন তুলসীর সাহায্যে, পঙ্কজিনী ধুঁকতে ধুঁকতে এসে কোন রকমে রেঁধে দেন নারায়ণের ভোগটা। তুলসী সেবা যত্ন সবই করে, শুধু রান্না করতে তা'র বড় আপত্তি ! বলে—ও সব আমি পারি না। পঙ্কজিনী জরে কাঁপতে কাঁপতে বলেন—সাগু বার্লি আর রান্নার কি আছে ! যা পারিস তা'ই করে দে। যদি না পারিস তো থাক। কাল এসে দেখবি বুড়ো-বুড়ি মরে পড়ে আছে। অগত্যা রান্নাঘরে ঢুকতে হয় তুলসীকে।

তুলসীকে চরম পরীক্ষার মুখোমুখি দাঁড়াতে হ'ল সেদিন। কি একটা বিশেষ তিথি। সকালে আসতেই সত্যকিংকর বললেন—আজ তো ঠাকুরকে শুধু বাতাসা ভোগ দেওয়া চলবে না। আজ অন্নভোগ দিতেই হ'বে।

চোখ কপালে তুলে বলে উঠলো তুলসী—কিন্তু জেঠিমা তো উঠতে পারবেন না। একে জর, তায় কাল পড়ে গিয়ে ডান হাঁটুটা ফুলে উঠেছে।

সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠেন সত্যকিংকর—না না, ওঁর দ্বারা হ'বে না। স্নান না করে ঠাকুরের ভোগ রাঁধা চলে না। তুলসীর মুখের পানে চেয়ে বলেন—তুমি মা ভোগটি আজ রেঁধে দাও।

সভয়ে ছু'পা পিছিয়ে আসে তুলসী। মুখ দিয়ে বেরোলো শুধু একটি কথা—আ-মি !

—হ্যাঁ তুমি। এ ছাড়া আর কোন উপায় দেখছি না।—সত্যকিংকরের কাতর কণ্ঠ।

আরো ছু'এক পা পিছিয়ে গিয়ে বলে উঠলো তুলসী—না না, ভোগটোগ আমি রাঁধতে পারবো না।

সত্যকিংকরের কাতর জিজ্ঞাসা—কেন পারবে না?

রুদ্ধকণ্ঠে জবাব দেয় তুলসী—ভোগ আমাকে রাঁধতে নেই। আমার হাতের রান্না নারায়ণকে দেওয়া যায় না।

সত্যকিংকর তখন মিটিমিটি হাসছেন।—আমাকে শাস্তর শেখাচ্ছিস! রাঁধতে নেই? মন্ত্র হয় নি বলে? ওরে পাগলি কুমারী মেয়ের ওসবে দোষ নেই। দেখিস্ না, লোকে কুমারী পুজো করে। মনের শুচিতাই হচ্ছে আসল শুদ্ধাচার। সেদিক থেকে তোর চেয়ে শুদ্ধা মেয়ে আমার জানা নেই।

তুলসী কেঁদে ফেলে এবার। বলে—না না, শুধু তাই নয়। আরো কারণ আছে। আগে শুনুন আপনি…।

এবার সত্যকিংকরের ব্রাহ্মণের তেজোদীপ্ত কণ্ঠ। তুলসীর কথা শেষ না হতেই বলে ওঠেন—কোন কারণ আমি শুনতে চাই না। আদেশের ভংগিতেই বলেন—যাও, স্নান করে এসে পট্টবস্ত্র পরে রান্নায় লেগে যাও। আমি ঠাকুর ঘরে ঢুকছি। অন্নভোগ আজ দোবোই, নইলে শালগ্রাম শিলা আমি নদীতে ভাসিয়ে দিয়ে আসবো।

সত্যকিংকর ঢোকেন ঠাকুর ঘরে।

পাথরের মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে তুলসী কয়েক মুহূর্ত। মাথাটা কি রকম যেন বোঁ বোঁ করে ঘুরছে। চিন্তা করার শক্তিটুকুও যেন হারিয়ে বসে আছে সে। এ কি পরীক্ষা তা'র সামনে। সে তো সব খুলে বলতেই চেয়েছিল, শুনলেন না সত্যকিংকর। জেনে শুনে সে কি করে রাঁধে ঠাকুরের ভোগ। শালগ্রাম শিলা যে তাহলে অপবিত্র হ'বে। কিন্তু তা না হলে তার স্থান নদীবক্ষে। না, সে রাঁধবে ভোগ। সর্বপাপহারী যদি না তা'র পাপের ভার লাঘব করেন তো কে করবে?

ত্বরিতপদে পুকুরঘাটে চলে গেল তুলসী। স্নানান্তে শুদ্ধ মনে ঠাকুরের ভোগ রাঁধার জন্যে ঢুকলো রান্নাঘরে।

ঠাকুরঘরে ভোগ দিচ্ছেন সত্যকিংকর। তুলসী দাওয়ায় খুঁটি ঠেস দিয়ে বসে আছে। উপবাসক্লিষ্ট মুখটা তার আজ এক অদ্ভুত জ্যোতিতে ঝল্‌মল্ করছে।

ভোগ দেওয়া শেষ হ'লে থালা হাতে সত্যকিংকর হাসতে হাসতে বেরোলেন ঠাকুরঘর থেকে। সামনে তুলসীকে দেখতে পেয়ে বলে উঠলেন—জানিস্ মা, দীর্ঘদিন ধরে আমি ঠাকুরের ভোগ দিচ্ছি। আজকের মত তৃপ্তি করে এর আগে আর কোনদিন ঠাকুর ভোগ খায় নি। আমার মনে হ'ল ঠাকুর হাসতে

হাসতে এসে তোদের থালাটা চেনে নিয়ে সবার ছাত্তর সঙ্গে যাচ্ছেন। তুলসীর বড় বড় চোখ দুটোর দৃষ্টি সত্যকিংকরের মুখের ওপর গিয়ে পড়লো। কোন কথা বেরোলো না মুখ দিয়ে, চোখ থেকে নেমে এল অশ্রুধারা।

পঙ্কজিনী দেবী সুস্থ হয়ে উঠেছেন। যথানিয়মে চলছে সংসার, চলছে সত্যকিংকরের পুজো। সেদিন সকালে সদর দরজা পেরোতেই তুলসী দেখলো একটি যুবক গেঞ্জি গায়ে দিয়ে দাওয়ায় বসে আছে। অনুমানে বুঝলো এই সুধামাধব, সত্যকিংকরের একমাত্র সন্তান। সুধামাধবকে সে আগে দেখেনি, কিন্তু এত গল্প শুনেছে পঙ্কজিনী দেবীর কাছে যে সুধামাধবকে চিনতে তা'র একটুও কষ্ট হ'ল না।

সত্যকিংকরকে আসেপাশে দেখতে না পেয়ে বাগানের দিকে পা বাড়ালো তুলসী। দু'এক পা গিয়েই কিন্তু থামতে হ'ল। কানে এল পঙ্কজিনী দেবীর ডাক—ওরে ও তুলসী, কাল রাতে যে সুধা এসেছে। চলে যাচ্ছিস কোথায়, আলাপ কর। একবার আড় চোখে দেখে নিয়ে বাগানে ঢুকে পড়লো তুলসী।

সেদিন সমস্ত দিনের মধ্যে তুলসী আর একবারও যায় নি সত্যকিংকরের বাড়ী। আসার সময় শুনে এসেছিল সুধামাধব সেদিন বিকেলের ট্রেনেই কলকাতায় ফিরে যাবে। তুলসী চায় না সুধামাধবের সঙ্গে আলাপ করতে। তাই আর ও মুখো হয় নি সেদিন। নিজের জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা দিয়ে এইটুকু সে বুঝেছে ওরা আলাদা জাতের। ওদেরকে এড়িয়ে চলাই ভাল।

পরদিন সকালে দাওয়াটা খালি দেখে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো তুলসী। যাক্, সুধামাধব তাহ'লে চলে গেছে কলকাতায়! সাজিটা হাতে নিয়ে আপন মনে পদাবলীর একটা কলি গুন্‌গুন্ করতে করতে ঢুকলো বাগানে।

ফুল তুললো সাজি ভর্তি করে। তবুও স্থলপদ্মটা দেখে লোভ হচ্ছে বড়। অথচ নাগাল পাচ্ছে না। সাজিটা মাটিতে নামিয়ে রেখে আঁচলের প্রান্ত দিয়ে চেষ্টা করলো ডালটাকে নুয়োবার। না, হচ্ছে না। খানিকটা নুয়ে এসে আবার ডালটা চলে যায় সড়াৎ করে।

হঠাৎ মানুষের গলার শব্দ শুনতে পেল তুলসী।—আমি পেড়ে দেব? তাড়াতাড়ি স্খলিত আঁচলটা ভাল করে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে দেখলো ঘাড় ফিরিয়ে। সুধামাধব দাঁড়িয়ে তুলসীর পেছনে। মুখে যেন একটা হাসি হাসি ভাব।

প্রথমটা লজ্জায় স্বর বেরোলো না তুলসীর গলা দিয়ে। কিন্তু যখন দেখলো সুধামাধব পাড়তে যাচ্ছে ফুলটা, তাড়াতাড়ি বলে উঠলো—আড়া কাপড়ে

৯

ছোবেন না যেন। আপনি বরং ডালটা ছুইয়ে ধরুন, আমি পেড়ে নিচ্ছি
যথা আদেশ। সুধামাধব ছুইয়েই ধরলো ডালটা।

বিকেলের ট্রেনে কলকাতায় চলে গেল সুধামাধব। স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো তুলসী। পঙ্কজিনী দেবী সকালের দিকে অনেকটা খুসী খুসী ভাবে ছিলেন। বিকেলে সুধামাধব চলে যাওয়ায় আবার যেন মুষড়ে পড়লেন। তাহ'লে কি তুলসীকে পছন্দ হয় নি সুধার?

একগাল হেসে অভ্যর্থনা জানালেন পঙ্কজিনী দেবী—এসেছিস বাবা। আয় আয়। পরের শনিবার আবার এল সুধামাধব। আশ্বস্ত হলেন পঙ্কজিনী। সত্যকিংকর ভাবলেন মনে মনে—ওষুধ ধরেছে তাহ'লে। যে ছেলে বছরে একবার দেশে আসার সময় পেত না সে কিনা পর পর দু' শনিবার দেশে এল! নাঃ, ঠিকই বলেছিল গৃহিণী।

রবিবার সকালে সুধামাধবকে গেঞ্জি গায়ে দাওয়ায় বসে থাকতে দেখে অবাক হয়ে গেল তুলসী! মুখটা অকারণেই গেল ম্লান হয়ে, মনটা হ'ল বিষণ্ণ। সুধামাধবের ঘন ঘন আসাটা ভাল লাগলোনা তুলসীর।

এসে যখন পড়েছে, ফিরে যাওয়া চলে না। ঘাড়টা নিচু করে আস্তে আস্তে বাগানের দিকে এগোলো তুলসী। পেছন থেকে কানে এল সুধামাধবের কণ্ঠ—বাবার শরীরটা ভাল নেই, পুজোটা আজ আমিই করবো। আমার কিন্তু কম ফুলে পুজো হয় না। কেউই বুঝলো না এটা পঙ্কজিনীর কারসাজি।

ফুল তুলে এনে থালাতে রেখে দিয়ে চলে যাচ্ছিল তুলসী। সুধামাধব বলে উঠলো।—চন্দন ঘসে না দিলে নারায়ণের মাথায় তুলসী দেব কি করে? তুলসী গিয়ে ঢুকলো ঠাকুরঘরে।

চন্দন ঘসা শেষ করে ঠাকুরঘর থেকে বেরিয়ে এল তুলসী। সুধামাধব অল্প হেসে বললে—বাবা বলছিলেন, তুলসীর তোলা তুলসী পাতায় নারায়ণ নাকি খুব খুসী হন্। এ কথার কোন জবাব না দিয়ে তুলসী সদর পেরিয়ে রাস্তায় পা বাড়াল।

দুপুরে এক ফাঁকে সুধামাধবকে জিজ্ঞেস করলেন পঙ্কজিনী দেবী—হ্যাঁরে, তুলসী মেয়েটিকে তোর কেমন লাগলো? প্রশ্নটা আকস্মিক, তাই প্রথমটা সুধামাধব একটু বিব্রত হয়ে পড়লো। সেটা সামলে নিয়ে বলে উঠলো—তা' ভালই তো।

পঙ্কজিনী দেবীর জিজ্ঞাসা—তোর পছন্দ হয়?

—মানে? বোকার মত জিজ্ঞেস করে বসে সুধামাধব।

—মানে, ওকে বাদ আমি ছেলের বউ করে ঘরে আনি।—পঙ্কজিনীর মুখে রহস্যভরা হাসি।

তোমার এক কথা মা। পছন্দটা কি একতরফা হয় নাকি?—সুধামাধবের কণ্ঠে যেন কেমন হতাশার সুর।

রাত্রে সত্যকিংকরের সঙ্গে পরামর্শ করলেন পঙ্কজিনী। ঠিক হ'ল, পঙ্কজিনীর ভাই কৃপাসিন্ধু এসে তুলসীর মেশোমশাই ভূধরবাবুর সঙ্গে পাকা কথা বলবেন। বিয়ে থার ব্যাপারে সত্যকিংকরকে এতটুকু বিশ্বাস নেই পঙ্কজিনীর।

এলেন কৃপাসিন্ধু কৃপা করে। গেলেন ভূধরবাবুর বাড়ী পাকা কথা কইতে।

সকাল আটটা বেজে গেছে। সত্যকিংকর নারায়ণের মাথায় তুলসী চাপাচ্ছেন, পঙ্কজিনী রান্নাঘরে ব্যস্ত।

বাইরের উঠোনে কৃপাসিন্ধুর হাঁকডাক শোনা গেল—ওরে ও পঙ্কি, কোথায় গেলিরে? কার সঙ্গে তুই সুধার বে'র ঠিক করতে আমায় পাঠিয়েছিলি!

পঙ্কজিনী খুন্তি হাতেই তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলেন রান্নাঘর থেকে—কেন গো, কি হয়েছে?

—হয়েছে আমার মাথা আর মুণ্ডু। তোদের যেমন কাণ্ড। খুব বাঁচিয়েছেন নারায়ণ। খুলে কিছু ভাঙলেন না কৃপাসিন্ধু।

—খুলে না বললে কি করে বুঝবো দাদা? অধীর জিজ্ঞাসা পঙ্কজিনীর চোখে মুখে।

—খুলে আর বলবো কি! ও যে একটা নষ্ট মেয়ে রে।—বাহাদুরী ফুটে ওঠে কৃপাসিন্ধুর ভাবভংগিমায়।

—কি যা' তা' বোলছো দাদা! পঙ্কজিনীর মুখে অবিশ্বাস এবং বিরক্তির চিহ্ন ফুটে ওঠে একই সঙ্গে।

কৃপাসিন্ধুর মুখে স্মিত হাসি।—মিছে কথা বোলছি? আরে ওরা যে আমাদের পাড়ার পাশের বস্তিটাতেই থাকতো। বস্তির মালিকের ছেলে যশোদাদুলাল বাঁড়ুজ্জে……।

বস্তি দেখতে এসে ষোল বছরের মেয়ে তুলসীকে চোখে পড়ে যশোদাদুলালের। বস্তির ভেতর এত রূপ! এত লাবণ্য! আবার কলেজে পড়ে!

ছ'বছরের মেয়ে তুলসীকে নিয়ে বিধবা হন, মনোরমা দেবী। শ্বশুর বাড়ীতে ভাশুর দেওরের হাঁড়িতে ভাতের সংকুলান হ'ল না ভায়ের স্ত্রীর জন্যে। পিতৃকুলে একমাত্র বৈমাত্রেয় বোন সরলার স্বামী ভূধরবাবুর নিজের সংসারই চলা ভার। তায় আবার সৎমার মেয়ে আবার তা'র মেয়ে!

বেরিয়ে পড়লেন মেয়ের হাত ধরে। রাঁধুনীর চাকরী জুটলো বস্তির মালিকের সরকার হৃদয়বাবুর বাড়ী, আশ্রয় জুটলো বস্তির একটা ঘরে।

ভাড়া আদায় করতে এসে দেখলেন হৃদয়বাবু তুলসী কবিতা পড়ছে। জিজ্ঞেস করলেন—কি পড়ছিস্?

গম্ভীর উত্তর—কবিতা।

—কার কবিতা?

—রবীন্দ্রনাথের।

—বটে বটে! অবাক হলেন হৃদয় বাবু।

হৃদয়বান হৃদয়বাবু তুলসীর পড়ার ভার তুলে নিলেন নিজের কাঁধে। যখন বিদায় নিলেন পৃথিবী থেকে তুলসী তখন বিনা মাইনেয় কলেজে পড়ে।

যশোদাদুলাল এল, দেখলো, মুগ্ধ হ'ল। যশোদাদুলালকে দেখলেন মনোরমা দেবী, মনে রঙিন আশার ফানুস ওড়ালেন। আশা হয়ে উঠলো আকাশচুম্বী।

পরিচয় থেকে মেলামেশা, তারপর ঘনিষ্ঠতা। শেষে মন দেওয়া নেওয়া।

তুলসী বলে—তুমি মিথ্যে আশা দিচ্ছ আমাকে। তোমার বাবা বেঁচে থাকতে কিছুতেই তুমি তাঁর অমতে বিয়ে করতে পারবেনা।

—আহা-হা, বাবা অমত করবেন, এটাই বা তুমি ভেবে নিচ্ছ কেন?—যশোদাদুলালের অভয়বাণী।

—যা' শুনেছি, তোমার বাবা তোমার বিয়েতে অনেক টাকা বরপণ চাইবেন। আর তা'ছাড়া, আমার মত একটা হা-ঘরের মেয়েকে তিনি পুত্রবধূ বলে ঘরে তুলবেন কেন?—স্বাভাবিক বিশ্লেষণ তুলসীর।

—না মত দেন, আমি ওঁর বিষয় চাইবো না। কিন্তু তোমাকে আমি হারাতে পারবোনা কিছুতেই।—যশোদাদুলালের মুখে চিরকালীন প্রেমিকের উত্তর।

কাটে কিছুদিন। তুলসীর মনে একটা বিশ্বাস জন্মে গেছে। বিশেষ করে যখন কালীমন্দির স্পর্শ করে' প্রতিজ্ঞা করে যশোদাদুলাল। সিঁদুরের টিপ কপালে পরিয়ে দিয়ে বলে—তোমাকে ছাড়া আর কাউকে বধূরূপে বরণ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

দু'হাত দিয়ে যশোদাদুলালের গলাটা জড়িয়ে ধরে, আবদারের সুরে বলে ওঠে তুলসী—সিঁথিতে যে সিঁদুর দিতে হয়। মার অনুমতি আমি নিয়েছি।

—দোবো। আজ নয়, ফাল্গুন মাসে। ততদিনে যা' হোক একটা ব্যবস্থা হ'বেই। আর সিঁদুরের স্পর্শই তো স্বীকৃতি তুলসী।

তুলসীর মাথাটা যশোদাদুলালের বুকের ওপর লুটিয়ে পড়ে। যশোদাদুলালের ঠোঁট-দু'টো নেমে এসে তুলসীর ওষ্ঠ স্পর্শ করে।

বর্ষার গঙ্গা দু'কুল ছাপিয়ে কুলকুল করে বয়ে যাচ্ছে। নীরব নিস্তব্ধ রাতে মাথার ওপর একফালি চাঁদ, আর তীরে এই দু'টি প্রাণী। তাদের নীরব মিলনের সাক্ষী হয়ে রইল আকাশের কলঙ্কী চাঁদ আর ধরণীর পুণ্য সলিলা ভাগীরথী।

ফাগুনের এক শুভ লগ্নে সিঁথিতে সিঁদুরের রেখা টেনে দিয়েছিল যশোদাদুলাল। তুলসীর নয়, অন্য একটি ধনীর দুলালীর।

কড়া মেজাজের মানুষ যশোদাদুলালের বাবা। স্পষ্ট করে বলেন—সম্পত্তি যদি চাও, আমার কথামত বিয়ে করতে হ'বে।

সম্পত্তির আশা ত্যাগ করতে পারেনি যশোদাদুলাল। মাথায় টোপর পরে' বাপের পপছন্দমত মেয়ের মাথাতেই দিয়েছিল টেনে সিঁদুরের রেখা।

সব শুনলো তুলসী, মন্তব্য করলোনা কিছুই। মনোরমা দেবী ভেঙে পড়লেন, বললেন,—যা' যশোদাদুলালের কাছে। নয় তো চ', আদালতে যাই। তুলসী শুধু একটি ছোট্ট উত্তরই দিয়েছিল—ছিঃ। চটে উঠেছিলেন মনোরমা দেবী। আজ না হয় ছিঃ বলছিস, কিন্তু ক'মাস পরেই তো সব জানাজানি হবে। তখন কি করবি? চুপ করেছিল তুলসী, কি জবাব দেবে ভেবে পায় নি।

নিদারুণ এই আঘাতটা সহ্য করতে পারলেন না মনোরমা দেবী। শয্যা নিলেন। দু'মাস না যেতেই পাড়ি জমালেন ওপারে।

এ সংসারে তুলসী একা। কোন সম্বল নেই, সহায় নেই। আছে শুধু অঙ্গভরা রূপ আর কিছুটা বিদ্যে। দেহে বয়ে বেড়াচ্ছে তা'র ভুলের ফসল।

দিনের বেলা লজ্জায় রাস্তায় বেরোতে পারেনা। রাতের আঁধারে চুপিচুপি বেরোয়। লজ্জাও পেটকে ভয় করে, না বেরিয়ে উপায় নেই।

ক'মাস পরে সন্ধ্যের দিকে তুলসীর ঘরে বস্তির কিছু কিছু স্ত্রীলোক এসে জড় হ'ল। অধিকাংশই মজা দেখতে।

মদন কামারের বউ সত্যিই ভালবাসতো তুলসীকে নিজের মেয়ের মত। তুলসীর দুর্ভাগ্যে সে মর্মাহত। সারারাত রইল তুলসীকে আগলে। ভোরের কিছু আগে মরা মেয়েটাকে ন্যাকড়া জড়িয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

পরদিন রাতে সামান্য একটা পুঁটলি সম্বল করে অভিশপ্ত বস্তির মায়া কাটিয়ে পথে পা বাড়ালো তুলসী। কালীঘাটের কাছে একটা মেয়ে স্কুলে জুটলো একটা চাকরী নামমাত্র মাইনের। এই কালীঘাটেই তুলসীর দেখা হয়েছিল ভূধরবাবুর সঙ্গে। অসুস্থ ভূধরবাবুকে নিয়ে এসেছিল ওঁদের গ্রামে।

…শুন্‌লি তো সব। এখন বল্‌ দেখি কি কেলেঙ্কারীটা করতে যাচ্ছিলি। ভারিক্কি চালে খানিকটা টেনে টেনে হাসলেন কৃপাসিন্ধু। হঠাৎ মনে পড়ল সত্যকিংকরের কথা। চেঁচিয়ে ডাকলেন—সত্য কি এখনো নারায়ণের মাথায় তুলসী চাপাচ্ছো নাকি?

কৃপাসিন্ধুর হাঁক-ডাক শুনেই সত্যকিংকর ঠাকুর ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। দাওয়ায় দাঁড়িয়ে শুনেছেনও সব। নতুন করে জিজ্ঞেস করবার আর কিছু নেই। দাওয়ার খুঁটিতে মাথাটা ঠেকিয়ে পঙ্কজিনী দেবী বজ্রাহতের মত দাঁড়িয়েছিলেন, চোখে এক অদ্ভুত ভাষাহীন দৃষ্টি। সত্যকিংকর সেইদিকেই চেয়েছিলেন

ঘাড়টা ফিরিয়েই কৃপাসিন্ধু দেখতে পেলেন সত্যকিংকরকে বিজ্ঞের হাসি হেসে জিজ্ঞেস করলেন—নারায়ণের মাথায় তুলসী চাপানো হয়ে গেছে?

একবার পঙ্কজিনী দেবী আর একবার কৃপাসিন্ধুর পানে চেয়ে বললেন সত্যকিংকর—হ্যাঁ চাপিয়েছি, তবে বন-তুলসী।

তুলসীকে গ্রামে আর কেউ কখনো দেখেনি। কতই তো আসছে আবার চলে' যাচ্ছে, কে কাকে মনে রাখে! সত্যকিংকর সকালে দাওয়ায় এসে বসেন, অভ্যাসবশে চেয়ে থাকেন খোলা দরজাটার দিকে। মাঝে মাঝে মনের কোণে উঁকি মারে সেই ঢলঢলে মুখখানা। চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেই চিরপরিচিত শাড়ীর পাড়টা।

প্রাচীন বাঙালী

স্বপনবুড়ো

হাসিখুসীর যোগীন্দ্রনাথ

খুব ছোটবেলার কথা মনে পড়ে।

সবে অক্ষর পরিচয় হয়েছে।

কেঁদে-কঁকিয়ে তবু পড়তে ছাড়ি না। ছাপা কিছু পেলেই হাতের কাছে টেনে নিই। গ্রামের পাঠশালায় ভর্তি হয়েছি। মামা বই আন্‌তে দিলেন হাটে। তখনকার দিনে হাটে বই বিক্রী হত। অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাক্‌লাম—কখন বই আস্‌বে—, কখন উল্টে পাল্টে দেখ্‌বো, ছবিগুলোতে চোখ বুলিয়ে যাবো। কিন্তু রাত বেশী হওয়ায় ঘুমিয়ে পড়লাম।

সকাল বেলা শিয়রের দিকে তাকিয়ে দেখি—একেবারে অবাক কাণ্ড।

পাঠশালার পাঠ্য বইয়ের সঙ্গে এটা আবার রঙচঙে কি বই ?

আকুল আগ্রহে হাতে টেনে নিলাম—'হাসিখুসী।' পাতায় পাতায় ছবি আর ছড়া।

"অজগর আস্‌ছে তেড়ে—আমটি আমি খাবো পেড়ে।" সেই যে যোগীন সরকারের মিষ্টি মধুর হাতটি চেপে ধরলাম, আজ এই বুড়ো বয়সেও ছাড়িনি।

তারপর ধীরে ধীরে যোগীন্দ্রনাথের সব বই পড়েছি। মনে কেমন যেন

দোলা দিয়েছে। এমন করে ছোটদের জন্যে কেউ ত' ছড়া, গল্প, কাহিনী, রূপকথা, জন্তু-জানোয়ারের বিবরণ লিখতে পারে না।

যোগীন্দ্রনাথ শিশু-মনকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছেন। এ যেন একটা আলাদা শিশু জগৎ—পর্দা ঢাকা ছিল। যোগীন্দ্রনাথ এসে যবনিকা সরিয়ে দিলেন যাদুকরের মতো; আর এক মুহূর্তে শিশুরাজ্য রামধনু রঙে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

বাঙ্‌লা দেশের ঘরে ঘরে যেন মঙ্গল শঙ্খ বেজে উঠল, ছোটর দল দুলে দুলে পড়তে লগ্‌লো—

"ঘুমিয়ে যখন থাকি
মায়ের চুমা ফুটিয়ে তোলে
আমার দুটি আঁখি।
হাস্‌লে আবার চুমা—
থাক্‌লে জেগে চুমা দিয়ে
বলেন "খুকু ঘুমা।"

ছোটর দল ছড়া মুখস্ত করে—

ধন-ধন-ধন-ধন।
বাড়ীতে ফুলেরই বন।
এ ধন যার ঘরে নেই তার কিসের জীবন?
তারা কিসের গরব করে?
তারা আগুনে পুড়ে কেন না মরে?"

ছেলেমেয়েরা নাওয়া-খাওয়া ভুলে গেল।

ঠাকুমা-পিশিমার দল বাটি ভরা পরমান্ন নিয়ে সেধে গেল। কিন্তু তাদের হাতে তখন নতুন স্বাদের মিষ্টি। তারা সুর করে বল্‌তে লাগ্‌লো—

"আমরা তিনটি বোন,
আমি মেজো, দিদি বড়,
ছোটটি নোটন।
আমার একটি ভেড়া আছে
হরিণ থাকে দিদির কাছে
বাছুর নিয়ে খেলে সুখে
আমাদের নোটন—
আমরা তিনটি বোন।"

ছোটর দল বনের পাখীকে ডেকে বলে—

"বনের পাখী, ডাকাডাকি
করছ কেন বনে?
সোনার খাঁচায় এসো তুমি
রাখব সযতনে।

পাকা পাকা মিষ্টি ফল
তোমায় দেবো খেতে
সন্ধ্যাবেলা ঘরে তুলে
বিছানা দেবো পেতে।
কচি কচি কোমল গায়ে
বুলিয়ে দেবো হাত,
আদর করে সাথে সাথে
রাখ্‌ব দিন রাত॥"

আবার বড়র দলেও হাসির হুল্লোড় ওঠে—যখন ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে সুন্দর আবৃত্তি করে—'পাঠশালা'—

"চ্যাপ্‌টা নাকে চশমা আঁটা
গুরু মহাশয়;
কানে কলম হাতে ছড়ি
দেখেই লাগে ভয়।
কানটি মলা খেয়ে ম'ল
গোয়ালাদের গুপী
টেবির পড়া হয় নি বলে
মাথায় গাধার টুপি।
আর সকলে ভয়ে ভয়ে
মিটির মিটির চায়
কার কপালে কি যে আছে
বলা নাহি যায়।"

এই সদা আনন্দময় মানুষটির কাছ থেকে নিজেদের মনের কথা জোগাড় করে ছোটরা একে অন্যকে জিজ্ঞেস করে—

"কোথা থেকে আস্‌ছ তুমি, ছোট্ট মানুষটি?
গল্প যদি বল্‌তে পার,—বল ত একটি।"

পথিক বালকটি উত্তর দিচ্ছে—

"আসছি আমি সুদূর হতে—তীব্র রবির করে,
মনের সুখে কাফ্রি যেথা ঘরকন্না করে—।
কষ্টে অতি খনির সোনা তুল্‌ছে নর-নারী,
মরুর পরে থপ থপ্‌ থপ যাচ্ছে উটের সারি।"

আবার ছেলের দল কেউ সাজ্‌ছে বেড়াল, আর কেউ সাজছে ইঁদুর। বিড়াল গুড়িমেরে এসে জিজ্ঞেস করছে—

"ইঁদুর ভায়া, ইঁদুর ভায়া, ঘরে আছ হে?"

তার উত্তরে ইঁদুর মুচ্‌কি হেসে উত্তর দিচ্ছে—"রাত্তিরেতে ডাকাডাকি করছ তুমি কে?"

বিড়াল বল্‌ছে,

"ভালবাসার বন্ধু আমি, তোমার আপন জন,
প্রাণের টানে শুধু আমার হেথায় আগমন।"

ইঁদুর জবাব দিচ্ছে,

"ওহো হো, বন্ধু বটে, সাম্‌নে আছিস্‌ কে?
ঘাড় ভাঙতে যম এসেছে, দরজা এঁটে দে!"

কেমন? মজা নয়?

সেই যে বিপিন,—তার যে দুষ্টুমী সেটাই বা মন্দ কি? ছড়াটা আমাদের ছেলেবেলায় সব সময় মুখে মুখে ফিরত—

"সোমবারে মাথা ধরা, মঙ্গলে পেট ব্যথা করা—
বুধবারে চোখ জ্বালা, বেস্পতিতে জ্বরের পালা—
শুক্কুর বারে গা কেমন, শনিবারে পলায়ন।
সেই দিনটি রবিবার,—পড়তে যেতে হয় না তার!"

এই জাতীয় ছেলে প্রত্যেক পাঠশালা আর ইস্কুলে থাকে। তাদের নিয়ে মজাটা কি কম জমত?

অবশ্য তার সঙ্গে সঙ্গে ভালো ছেলে, আর মন্দ ছেলের ছড়াও কম উপভোগ্য ছিল না—

"ভাল ছেলে পাঠশালে
সোজা চলে যায়—
দাঁড়ায়ে না কথা কয়
পথে না খেলায়।

মন্দ ছেলে পথে দেরী
করে খেলা নিয়ে
পুকুরে ভাসায় জুতো
পাল তুলে দিয়ে।"

কাণ্ডটা একবার কল্পনা করার মত।

তারপর সেই পাখীকে জিজ্ঞেস করা—

"ছোট পাখী, ছোট পাখী, বল গো আমায়
এত মিষ্ট গান তুমি শিখিলে কোথায়?"

তার জবাবে ছোট পাখী বল্‌ছে—

"যাঁহার কৃপাতে ভাই লভিয়াছি প্রাণ,
ক্ষুদ্র এই কণ্ঠে তিনি দিয়াছেন গান।"

সেই ফটিকচাঁদ পালোয়ানের মজাদার ব্যাপারটাও কিন্তু কোনোমতে ভোলবার নয়—

"ফটিক চাঁদ বাবু—
শীতে খান সাবু
গরমেতে ঘোল—
বছর ভরে রোজ দু' বেলা
পাঁদালের ঝোল।
এই বড় জোয়ান
বেজায় পালোয়ান
কাঠের মত শক্ত—
ঘুঁসির চোটে ঠিকরে ওঠে
ছারপোকার রক্ত।"

তারপর সেই কাকাতুয়ার কথাটা—সারা জীবন ধরে মনে রাখতে হবে—

"কাকাতুয়া, কাকাতুয়া, আমার যাদুমণি,
সোনার ঘড়ি কি বলিছে, বল দেখি শুনি?"
"বলিছে সোনার ঘড়ি—টিক্-টিক্-টিক্
যা কিছু করিতে আছে, করে ফেল ঠিক!"

আর রয়েছে সেই মজার মুল্লুক। সেখানে একবার ঢুকতে পারলে হাস্তে হাস্তে পেটে খিল্ ধরে যাবে শোনো তবে মজাটা—

"এক যে আছে মজার দেশ
সব রকমে ভালো
রাত্তিরেতে বেজায় রোদ
দিনে চাঁদের আলো।
আকাশ সেথা সবুজ বরণ
গাছের পাতা নীল,
ডাঙায় চরে রুই-কাত্লা
জলের মাঝে চিল!"

সেই সখের সেনার দল ব্যাণ্ড বাজিয়ে এগিয়ে আস্ছে আর বল্ছে—

"আমরা সখের সেনা, চল সবে ভাই
স্বদেশের তরে আজ রণস্থলে যাই
মোরা রণস্থলে যাই।"

এই আনন্দের মণি-খনি যিনি দু'হাতে ছোটদের বিলিয়ে দিয়ে নিজে দেউলে হয়ে গিয়েছিলেন,—সেই যোগীন সরকার মশাই মানুষটি কেমন ছিলেন জান্তে ইচ্ছে হয় না কার?

ছোটদের সত্যিকারের বন্ধু ছিলেন তিনি। তাঁকে মাঝখানে বসিয়ে শিশুদের নিত্য-মহোৎসব। এই বুড়ো মানুষটি ছিলেন—ছোট বড়ো সবাইকার বন্ধু। কথায় কথায় ছড়া,

মুখে মুখে ধাঁধা আর মজাদার গল্প। কখনো কাউকে বকতে জানতেন না তিনি। ভালোবাসা দিয়ে সকলকে আপন করে নিয়েছিলেন।

তাঁর জন্মের এক'শ বছর পুর্ণ হল,—তাই বাঙলা দেশের ঘরে ঘরে শিশু উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে।

গল্পই কি তিনি আমাদের কম শুনিয়েছেন? সেই "ছোট চোর আর বড় চোরের গল্প" পড়তে বসলে হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যায়।

তাঁর "আষাঢ়ে স্বপ্নের" তুলনা নেই। যেমন গল্প তেমনি ছড়া। এ বলে আমায় দেখ, ও বলে,—আমায় দেখ। "পান্তা বুড়ীর" গল্পটাই বা কী মজার। একটা চোর রোজ বুড়ীর পান্তা চুরি করে খেয়ে যেত। তারপর শিং মাছ, বেল, ছুঁচ, ছুরি, কুমীর সবাইকার সাহায্য নিয়ে কি ভাবে চোর ধরা হল সেটা ভারী রগড়ের ব্যাপার। আর রামধনের গল্প?

"বুদ্ধিমান রামধন, সাবধানে থেকো—
নাকে-মুখে ছিপি এঁটে বুদ্ধি ধরে রেখো।"

এ ছাড়া তিনি "বনে জঙ্গলে" আর "পশু পক্ষীর" গল্প শুনিয়েছেন অজস্র। তারপর "ছোটদের রামায়ণ" আর "ছোটদের মহাভারত" মধুর মতো মিষ্টি ভাষায় লেখা।

একটি খুব ভালো কিশোর উপন্যাস লিখেছেন তিনি। তার নাম "জয় পরাজয়"। সেই আমলে লেখা, কিন্তু কত জোরালো কাহিনী।

সব চাইতে উল্লেখ করবার মতো কথা হচ্ছে এই যে, যোগীন সরকার সারা জীবন ধরে ছোটদের জন্যে যা পরিবেশন করে গিয়েছেন, সেগুলি এই একশ' বছর পরেও পুরোণো হয় নি। তাঁর লেখা বইগুলির নামও কি শুনতে মিঠে। "ছড়া ও ছবি", "ছবির বই", "নতুন ছবি", "হাসিখুশী", "আষাঢ়ে স্বপ্ন", "খেলার সাথী", "হিজিবিজি", "ছড়া ও পড়া", "মোহনলাল", "মজার গল্প", "রাঙা ছবি", "হাসি ও খেলা", "হাসির গল্প", "হাসি রাশি", "খুকুমণির ছড়া", "খেলার গান", "ছবি ও গল্প", "ছোটদের চিড়িয়াখানা", "জানোয়ারের কাণ্ড", "বনে জঙ্গলে", "বন্দেমাতরম্", "ছোটদের রামায়ণ ও মহাভারত", "পশুপক্ষী" আরো অজস্র সঙ্কলন। আমরা বুড়োর দল যেন যোগীন সরকারের এই সোণালী ফসল ছোটদের মধ্যে হরির লুটের মতো বিলিয়ে দিতে পারি।

এই যে রসের মণি-খনি মানুষটি যিনি সারা জীবন ফুল ফুটিয়ে আর ফল ধরিয়ে গেছেন, আসলে বাস্তব-জীবনে তিনি কেমন ছিলেন, একথা জানতে মানুষের কৌতুহলের অন্ত নেই।

২৪ পরগণার অন্তর্গত জয়নগর গ্রামে তাঁর দাদামশায়ের ঘরে বিগত ১২৭৩

সালের ১২ই কার্তিক, রবিবার, রাত্রি সাড়ে বারোটার সময় তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর কোষ্ঠিতে সিংহ লগ্নে রাজযোগে জন্ম বলে লিখিত আছে। যোগীন্দ্রনাথের পিতা স্বর্গীয় নন্দলাল দেব সরকার ধনী না হলেও গ্রামের মধ্যে সর্বজনমান্য মানুষ ছিলেন। যোগীন্দ্রনাথ মাতা থাকমণির অষ্টম গর্ভের সন্তান ছিলেন। সেইজন্যে প্রাচীন সংস্কার অনুসারে তিনি ভাবী কালে একজন মহৎ মানুষ হবেন—এই বিশ্বাসে ও আশায় বহুদিন পর্যন্ত তাঁকে নিরামিষ আহার্য দেয়া হত।

ছেলেবেলায় তিনি নিজ গ্রামের বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন। সেখান থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি কলকাতার সিটি কলেজে যোগদান করেন। তিনি লাটিন ভাষা গ্রহণ করেন। সেই সময় এই ভাষা খুব কম লোকেই পড়ত। মনে হয় সেইজন্যে তিনি এফ-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেন নি। এইজন্যে শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে তাঁকে অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। ক্রমাগত দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে তাঁকে লেখাপড়া শিখতে হয়েছিল। অবশেষে জীবনধারণের জন্য ও একান্নবর্তী পরিবারের প্রয়োজনে সেই সিটি কলেজিয়েট স্কুলেই তাঁকে শিক্ষকের কাজ গ্রহণ করতে হয়েছিল। অল্প দিনের মধ্যেই তিনি সারা বিদ্যালয়ে ছোট-বড় সবাইকার প্রীতির পাত্র হয়ে উঠেছিলেন। সেই সময়ের প্রধান শিক্ষক কৃষ্ণকুমার মিত্র যোগীন্দ্রনাথকে বিশেষ স্নেহের চক্ষে দেখতেন।

এই সময় থেকেই তিনি মনের আনন্দে ছোটদের জন্যে লিখতে সুরু করেন এবং "সিটি বুক সোসাইটির" প্রবর্তন করে সেই শিশু পাঠ্য পুস্তকগুলি প্রকাশে আত্মনিয়োগ করেন। সেই সময়ে বাঙলাদেশে ছোটদের মনোরঞ্জনের জন্যে ভালো ভালো শিক্ষামূলক ও আনন্দদায়ক বই এক রকম ছিল না বল্লেই চলে। যোগীন্দ্রনাথ ছোটদের মুখে হাসি ফুটিয়ে তোলবার মহান ব্রত গ্রহণ করলেন।

আমাদের সৌভাগ্য যে, একই সময় রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে প্রেরণা লাভ করে যোগীন্দ্রনাথ, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ও অবনীন্দ্রনাথ শিশু-সাহিত্য রচনায় ব্রতী হন। তাঁরা সারাজীবন ধরে যে সোণার ফসল ফলিয়ে ছিলেন শুধু বাঙলাদেশ নয়, সারা ভারতবর্ষ তাতে উপকৃত হয়েছিল। অবশ্য বর্তমান প্রবন্ধে আমাদের আলোচনার বিষয় শুধু যোগীন্দ্রনাথ। যোগীন্দ্রনাথের পারিবারিক জীবন বড় মধুময় ছিল। সবাইকে কাছে ডেকে তিনি আনন্দের আসর বসাতেন। মুখে মুখে ছড়া আর ধাঁধা রচনা করতেন। গল্পে গানে সকলকে মাতিয়ে তুলতেন। সারা জীবনে তিনি কাউকে কোনো

শক্ত কথা বলতে পারতেন না। চিরকালের এক সদানন্দ পুরুষ ছিলেন—যোগীন্দ্রনাথ। তাঁর বাড়ীর ছেলেমেয়েরা তাঁকে অন্তরঙ্গ বন্ধু ও খেলার সাথী রূপে পেয়েছিল। তিনি যখন কঠিন অসুখে একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছিলেন—তখন বাড়ীর কেউ গোলমাল করার জন্য ছোটদের বকলে তিনি মনে-মনে ভারি ব্যথা পেতেন। বলতেন, "ওদের তোমরা কেউ বোকো না। ওদের ছাড়া আমি থাকতে পারি না। ওদের গোলমাল আমার ভালো লাগে।"

আবার বাড়ীর ছেলেমেয়েরা যখন অসুস্থ হয়ে পড়ত তিনি নীরবে দীর্ঘ কাল ধরে রাত জেগে তাদের সেবা করতেন। "সিটি বুক সোসাইটির" কর্মচারীগণ ও বাড়ীর ভৃত্যদের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার ছিল একেবারে বড় ভাইয়ের মতো। তিনি নিজে ছেলেবেলায় গরীব ছিলেন বলে গরীবের ব্যথা বুঝতে পারতেন এবং কাউকে কিছু না জানিয়ে কত দুঃস্থকে সাহায্য করতেন।

কলিকাতা তাঁর কর্মস্থল ও ব্যবসাস্থল হলেও তিনি নিরিবিলি পছন্দ করতেন। এই জন্যে গিরিডি অঞ্চলে বহু জমি নিয়ে বাড়ী তৈরী করেছিলেন, পুকুর কাটিয়েছিলেন, বিরাট বাগান করে এক আনন্দপুরীর সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি নিজে সেই বাগানে কাজ করতে ভালো বাসতেন। তারপর যখন ফুল ফুটত কিম্বা ফল ধরত—তিনি সবাইকে বিলিয়ে দিয়ে আনন্দ লাভ করতেন। পাঁচ থেকে পঁচাত্তর বয়সের মানুষের সঙ্গে তাঁর ভাব ছিল। স্ত্রী-শিক্ষার দিকে তাঁর বিশেষ দৃষ্টি ছিল। গিরিডির উচ্চ-ইংরাজী বালিকা বিদ্যালয় প্রধানতঃ তাঁর যত্ন আর চেষ্টাতেই সেকালে গড়ে উঠেছিল। ১৯২৩ সালে তাঁর শরীরে পক্ষাঘাতের লক্ষণ প্রকাশ পায়। তখন তিনি মুখে মুখে ছড়া-কবিতা বলে যেতেন আর বাড়ীর লোকেরা তাই লিখে নিত। ১৩৪৪ সনের ১২ই আষাঢ় মর দেহ ত্যাগ করে তিনি আনন্দলোকে চলে যান।

যোগীন্দ্রনাথের জীবনের কৌতুক জনক ঘটনা এবং কি প্রণালীতে তিনি শিশু-সাহিত্য রচনা করতেন সেই সব কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে আলোচনা করা প্রয়োজন।

আমরা জানি, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার তাঁর ঠাকুরমার ঝুলি ও ঠাকুরদার ঝুলির ছবিগুলি নিজে হাতে এঁকেছেন। একথা তিনি এক সময় গল্পচ্ছলে আমায় বলেছিলেন। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীও তাঁর নিজের রচনার সঙ্গে নিজেই ছবি আঁকতে ভালোবাসতেন। প্রথম যুগের 'সন্দেশে' উপেন্দ্রকিশোরের হাতে আঁকা ছবি প্রচুর পরিমাণে দেখতে পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে সুকুমার রায় পিতার এই গুণটি নিজে আয়ত্ত করেছিলেন। "আবোল-তাবোল" প্রভৃতি

[illegible] ছবি প্রথমে সন্দেশে তার পর পুস্তকের আকারে প্রকাশিত হয়। অবনীন্দ্রনাথ নিজে একজন দিকপাল শিল্পী হলেও নিজের রচনায় ছবি তিনি খুব কমই এঁকেছেন। পরবর্তীকালে বহু শিল্পী অবনীন্দ্রনাথের রচনাকে সচিত্র করে তোলেন।

যোগীন্দ্রনাথ যদিও নিজের হাতে ছবি আঁকতেন না, তবু এই কথা জানা গেছে যে, তাঁরই নির্দেশে বিভিন্ন শিল্পীরা তাঁর মন ভোলানো ছড়া ও গল্পগুলি চিত্রিত করেন। কাজেই চিত্র পরিকল্পনার কৃতিত্ব তাঁর নিজের।

যোগীন্দ্রনাথের জীবনের ছোট ছোট ঘটনা থেকে তাঁর সহজ, সরল, উদার হৃদয়টির সন্ধান পাওয়া যায়।

তিনি যেমন ছোটদের ভালোবাসতেন, তেমনি প্রকৃতির মাঝখানে বাস করতে চাইতেন। তাই কল্‌কাতার কোলাহল থেকে দূরে গিরিডিতে 'গোলকুঠি' নির্মাণ করে সেইখানেই শেষ জীবনের অধিকাংশ সময় থাক্‌তে চাইতেন। প্রচুর ছড়া, গান, গল্প, জীবজন্তুর কাহিনী রচনা করে তিনি যেমন দেশের ছেলেমেয়েদের হাতে দু'হাতে বিলিয়ে দিয়েছিলেন, তেমনি নিজের বাড়ীর বাগানে ফুল ফুটিয়ে আর ফল ধরিয়ে শুধু পরিবারের ছেলেমেয়েদের বিতরণ করতেন না, নিজের বাগানের রসালো আম আর অন্যান্য ফল দূর দূর অঞ্চলে প্যাক করে পাঠিয়ে প্রিয়জনদের মধ্যে আনন্দ বিতরণ করতেন।

ছেলেবেলায় তিনি খুব দুরন্ত ছিলেন। বন্ধুবান্ধবদের জুটিয়ে নিয়ে এর বাড়ীর আম, ওর বাড়ীর কাঁঠাল না বলে গ্রহণ করে দিব্যি বাল্যভোজ লাগাতেন। এটি যে একটি অপরাধের কাজ দিল্‌দরিয়া যোগীন্দ্রনাথের তা আদৌ মনে হত না।

তিনি নিজে যেমন খেতে পারতেন, তেমনি অপরকে খাইয়ে আনন্দ পেতেন।

দুঃখকে সাথী করে জীবনে বড় হয়েছিলেন বলে দুঃখীর দুঃখ দূর করার জন্য সব সময় উৎসুক থাক্‌তেন যোগীন্দ্রনাথ। কারো কিছু উপকার করতে পারলে মনে প্রকৃত আনন্দ লাভ করতেন।

যোগীন্দ্রনাথ একদিকে যেমন কোমল প্রকৃতির আর একদিকে তেমনি কঠোর ছিলেন। তাঁর মনের বল ছিল অসাধারণ। একবার তাঁর দেহে একই সময়ে সাতটি 'কার্বাঙ্কল' হয়। যন্ত্রণায় তিনি ঘুমুতে পারতেন না। তাঁকে মর্ফিয়া দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হত। একদিন তাঁর এক ভাগনে ডাক্তার বল্লে, ছোটমামা, তুমি যে রোজ মর্ফিয়া নিচ্ছ, এর ফল বড় খারাপ। পরে

ছেড়ে দিলেন। যন্ত্রণায় ছটফট করতেন, সারারাত্র অনিদ্রায় কাটাতেন, তবু আর মর্ফিয়া ব্যবহার করেন নি। যোগীন্দ্রনাথের অনেক গোপন দান ছিল। ছেলেরা পরীক্ষার ফীর জন্যে তাঁর দ্বারস্থ হলে আর ফিরে যেতে হত না। মানুষের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক বজায় রাখাকে তিনি খুব মূল্যবান বলে মনে করতেন। এ জন্যে নিজের ক্ষতি স্বীকার করে ও তিনি লোকের সঙ্গে সদ্ভাব রক্ষা করতেন। গিরিডিতে যে 'পূর্ণিমা সম্মেলন' হত, তাঁর প্রবর্তন করেছিলেন যোগীন্দ্রনাথ। পরবর্তীকালে বহু সাহিত্যিক এই পূর্ণিমা সম্মেলনে যোগদান করেছেন।

দৈনন্দিন জীবনে তিনি অতি রসিক মানুষ ছিলেন। নাতি-নাতনিদের নিয়ে বসে মুখে মুখে ছড়া, ধাঁধা রচনা করা, গল্প বলা, জীবজন্তুর কাহিনী শোনানো তাঁর ছিল প্রকৃত আমোদ।

যোগীন্দ্রনাথের "জন্ম-শত-বার্ষিকী উৎসবে দেশের সর্বত্র ছেলেমেয়েরা আনন্দে মেতে উঠুক এবং "হাসি-খুশীর" স্রষ্টাকে আবার ধূলির ধরণীতে ক্ষণকালের জন্যেও নামিয়ে নিয়ে আসুক আজকের দিনে স্বপনবুড়োর তাই আন্তরিক কামনা।

একদা রবীন্দ্রনাথ যোগীন্দ্রনাথের লেখা সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছিলেন—সেই কয়েকটি মূল্যবান কথার উল্লেখ করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি—

"ছেলেদের যেমন চাই দুধ ভাত, তেমনি চাই গল্প। যে মা মাসিরা তাদের খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করেছে, এতকাল তারাই তাদের মিষ্টি গলায় গল্প জুগিয়ে এসেছে।

ছেলেদের সেই সত্য যুগ আজ এসে ঠেকেছে কলি যুগে—আমাদের দিনের মা মাসিরা গেছেন গল্প ভুলে—কিন্তু ছেলেরা তাদের ফরমাস্ ভোলে নি। ছেলেরা আজো বলচে, গল্প বলো—। কিন্তু তাদের ঘরের মধ্যে গপ্‌প নেই। এই গল্পের দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্যে যাঁরা কোমর বেঁধেছেন তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য যোগীন্দ্রনাথ। তিনি নিজের সম্বল থেকেও কিছু দিয়েছেন, ভিক্ষে করেও কিছু সংগ্রহ করেছেন। ছেলেরা ত' আশীর্বাদ করতে জানে না, সেই আশীর্বাদ করবার ভার নিলেন—তাদের বন্ধু রবীন্দ্রনাথ।

১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৬ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সকল সময় মানুষের মনে নির্মল আনন্দ বিতরণ করাই তাঁর ব্রত ছিল।

প্রবন্ধ

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

ডিফো

ষাট বছর বয়সে প্রথম একটি কাহিনী রচনা করেই বিশ্বসাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করবার দৃষ্টান্ত কেবল একটিই আছে। সেই দৃষ্টান্ত ড্যানিয়েল ডিফোর। ডিফো এর আগে লিখেছেন অনেক। কিন্তু সে সব রাজনৈতিক কিংবা ধর্মবিষয়ক পাম্‌ফ্‌লেট। সমসাময়িক ইতিহাসে এদের প্রভাব ছিল যথেষ্ট। প্রকৃতপক্ষে তাঁর জীবনে কোনো কোনো পর্বে এই পাম্‌ফ্‌লেট রচনাই ছিল জীবিকার প্রধান উপায়। ১৭১৯ খ্রীষ্টাব্দে 'রবিনসন ক্রুসো' যখন প্রথম বের হল তখন ডিফোর বন্ধু, অনুরাগী এবং শুভানুধ্যায়ীরা সবাই তাঁকে একটু অবজ্ঞার চোখে দেখতে আরম্ভ করল। এত ভালো ভালো বিষয় ছেড়ে শেষ পর্যন্ত ডিফো কিনা গল্প লিখতে বসলেন?

তখন অবশ্য ডিফো নিজেও জানতেন না "রবিনসন ক্রুসো" হবে আধুনিক য়ুরোপীয় সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস। তাঁর পাঠকরাও এ বইয়ের ঐতিহাসিক গুরুত্ব বুঝতে পারেননি।

ডিফোর জন্মের সঠিক তারিখ জানা যায় না। তবে আধুনিক জীবনীকারদের ধারণা তাঁর জন্ম হয়েছিল ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে। চসার ও শেক্সপীয়রের

[illegible] ডিফোর জন্মের ছ বছর পরে, অর্থাৎ ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে, এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে লণ্ডনের প্রাচীন কীর্তি ভস্মীভূত হয়ে যায়। এর ফলে শুরু হয় আধুনিক লণ্ডনের গোড়াপত্তন। ডিফোর বাড়ীর নিকটেই কবি মিলটন থাকতেন। বালক ডিফো যেতে আসতে অন্ধ কবিকে রোদ পোহাতে দেখেছেন বাড়ীর সামনে রাস্তার উপরে।

বাবা জেম্‌স্‌ ফো ছিলেন চর্বি দিয়ে তৈরি মোমবাতির ব্যবসায়ী। অবস্থা মোটামুটি সচ্ছল। ড্যানিয়েল ডিফোর ছেলেবেলার অধিকাংশ সময় কেটেছে লণ্ডনের অলিতে গলিতে ঘুরে ঘুরে। ডঃ জনসন, ডিকেন্স এবং চার্লস ল্যাম্‌ লণ্ডনকে ভালোবাসতেন, তাঁদের রচনায় লণ্ডনের জীবনকে অমর করে রেখেছেন। কিন্তু ডিফোর মতো লণ্ডনের সঙ্গে তাঁদের এমন অন্তরঙ্গ পরিচয় ছিল না। ডিফো পরিচিত ছিলেন বস্তি জীবনের পঙ্কিলতার সঙ্গে, জানতেন কোথায় পতিতা নারীদের আস্তানা, কোথায় গুণ্ডাদের আড্ডা। শুধু লণ্ডনকে নয়, লণ্ডনের অধিবাসীদের সঙ্গে ছিল তাঁর নিবিড় পরিচয়। ছেলেবেলার এই অভিজ্ঞতা লেখক জীবনে কাজে লেগেছিল। মানব চরিত্রের অভিজ্ঞ জহুরী ছিলেন ডিফো। আর তাঁর অদম্য ভ্রমণলিপ্সারও সূত্রপাত হয়েছিল লণ্ডনের পথে পথে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ানোর মধ্যে।

লণ্ডনের এই পথ-বিলাসী ছেলেটিকে সবাই জানত ড্যানিয়েল ফো (Foe) নামে। বড় হয়ে স্কুলে পড়বার সময় তিনি স্বাক্ষর করতেন D. Foe. বয়স যখন বছর চল্লিশ তখন বংশমর্যাদার প্রশ্ন দেখা দিল। নিজেই তৈরি করে নিলেন ভুয়ো বংশতালিকা, আর সেই সঙ্গে বদ্‌লে নিলেন পদবী। এবার থেকে তাঁর নাম হল ড্যানিয়েল ডিফো—Daniel Defoe. বাবার নির্দেশ ছিল, পাদ্রি হও বা ব্যবসায়ী হও সেটা বড় কথা নয় ; সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত ভদ্রলোক হতে হবে। ড্যানিয়েল বাবার কথা রাখতে চেষ্টা করেছিলেন।

সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য ভালো শিক্ষা অত্যাবশ্যক। জেম্‌স্‌ ফো ছেলের শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন ভালো করেই। কিন্তু ব্যবস্থা করা সহজ ছিল না। জেম্‌স্‌ ধর্মবিশ্বাসে ছিলেন ডিসেণ্টার, অর্থাৎ চার্চ অব ইংলণ্ডের বিরুদ্ধবাদী। এর ফলে লণ্ডনের কোনো ভালো স্কুলে অথবা অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ড্যানিয়েলের পক্ষে ভর্তি হওয়া সম্ভব ছিল না। কারণ, চার্চ অব ইংলণ্ডই তখন দেশের শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান নিয়ামক ; ডিসেণ্টারদের শিক্ষার সুযোগ দিতে রাজকীয় চার্চের মোটেই আগ্রহ ছিল না। ইংলণ্ডে ডিসেণ্টারদের সবচেয়ে নামকরা বিদ্যালয় মর্টন্‌স্‌ অ্যাকাডেমিতে ড্যানিয়েলকে ভর্তি করে

দেওয়া হল। জায়গাটা স্বাস্থ্যকর, লণ্ডন থেকে বেশ দূরে নয়। [illegible]
আগে ড্যানিয়েলের মা'র মৃত্যু হয়েছে। স্বাস্থ্য কিছুতেই ভালো যাচ্ছে না। চিকিৎসায় কোনো ফল হয়নি। স্থান পরিবর্তনে হতে পারে। এই সব দিক ভেবে বাবা ড্যানিয়েলকে মর্টন অ্যাকাডেমিতে পাঠালেন। ১৬৭৪ থেকে ১৬৭৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই বিদ্যালয়ে পড়েছেন ড্যানিয়েল। রেভারেণ্ড চার্লস্ মর্টনের তত্ত্বাবধানে এখানে পড়াশুনা সত্যি ভালো হত এবং ড্যানিয়েলের জীবনে গভীর প্রভাব পড়েছে এই প্রতিষ্ঠানের।

প্রোটেস্টাণ্ট পাদ্রি হওয়ার জন্য যে সব শিক্ষা প্রয়োজন, ড্যানিয়েল তা সবই পেয়েছিলেন। কিন্তু পরে তাঁর মনে হল এ পথ তাঁর নয়। একুশ বছর বয়সেই তিনি স্থির করলেন, পাদ্রি হবেন না, ব্যবসা করবেন।

মাত্র বছর দু'য়েকের মধ্যেই ব্যবসায়ে সাফল্য লাভ করলেন ড্যানিয়েল। লণ্ডনের খুব বেশী ভাড়ার অঞ্চলে আপিস খুলেছেন। ব্যবসা ছাড়া তাঁর প্রথম রাজনৈতিক পাম্‌ফলেট এর মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। এই সময়ই তিনি বিয়ে করলেন। যদিও তাঁর শত্রুরা ইঙ্গিত করত যে ক'নের সম্পত্তিই তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল, তবু একথা নিঃসন্দেহ যে মেরিকে ভালোবেসেই বিয়ে করেছিলেন তিনি। তাঁদের উনপঞ্চাশ বছরের দাম্পত্য জীবনের ইতিহাসই এর সাক্ষ্য দেবে।

বিয়ের অল্প কিছুকাল পর থেকেই আরম্ভ হল ডিফোর বিচিত্র জীবনধারা। ব্যবসায়ে, রাজনীতিতে এবং লেখায় এমন উত্থান পতন কদাচিৎ দেখা যায়। প্রথমেই তিনি ডিউক অব মনমাউথের পক্ষ অবলম্বন করে বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিলেন। ডিউক অব মনমাউথের দাবী অগ্রাহ্য করে দ্বিতীয় জেম্‌স্‌কে সিংহাসনে বসানো হয়েছে। তারই প্রতিবাদে মনমাউথের সশস্ত্র বিদ্রোহ। আর সেই বিদ্রোহী দলে যোগ দিলেন ডিফো। স্বেচ্ছায় এরূপ বিপদ বরণ করবার কারণ তাঁর অ্যাড্‌ভেনচার প্রিয়তা, ন্যায়ের পক্ষে সংগ্রামের আগ্রহ এবং ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত অত্যাচারী সরকারকে অপসারণের অভিপ্রায়। আরও অনেকে যোগ দিয়েছিল মনমাউথের পক্ষে। কিন্তু তাদের শোচনীয় হার হল। গ্রেফ্‌তার এড়াবার জন্য ডিফো আরও অনেকের মত দেশ ছেড়ে চলে গেলেন য়ুরোপে। বছর তিনেক কাটলো পালিয়ে পালিয়ে।

তারপরে দেশে ফিরে আবার আরম্ভ করলেন ব্যবসা। নানা রকমের। জমির, গেঞ্জির, কাপড়ের, ইঁট ও টালির, আরও কত জিনিসের। কিন্তু রাজনীতি ত্যাগ করে কোন ব্যবসাতেই সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করতে

[illegible] তার ফলে এবং [illegible] জন্য কয়েক বছরের মধ্যে ডিফোকে আদালত থেকে দেউলিয়া বলে ঘোষণা করা হল। তাঁর ঋণের পরিমাণ ছিল সতেরো হাজার পাউণ্ড, আজকের বিনিময় হারে ভারতীয় মুদ্রায় তিন লক্ষ সাতাশ হাজার টাকা। তখন আইন ছিল অন্য রকম। দেউলিয়া হলেই ঋণ শোধের দায় থেকে মুক্ত হওয়া যেত না। ডিফো বারো হাজার পাউণ্ড ঋণ শোধ করেছিলেন, আর মাত্র পাঁচ হাজার পাউণ্ড বাকী। তাও হয়ত শোধ হয়ে যেত যদি না তাঁকে গ্রেফতার করা হত "দি সরটেষ্ট ওয়ে উইদ দি ডিসেণ্টারস্" লেখার অভিযোগে।

'দি সরটেষ্ট ওয়ে'-তে ডিফো প্রস্তাব দিয়েছেন যে ডিসেণ্টাররা যদি চার্চ অব ইংলণ্ডকে স্বীকার করে না নেয় তা হলে তাদের ফাঁসি দেওয়া হোক্। সমস্যা সমাধানের এটাই সবচেয়ে সহজ পথ। এমন পথের কথা শুনে ডিসেণ্টাররা তো আঁৎকে উঠল। চার্চ অব ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষ প্রথম খুব খুশি হল। কিন্তু পরে যখন অন্তর্নিহিত বিদ্রূপটা স্পষ্ট হয়ে গেল তখন তাঁদের ক্রোধ ধৈর্যের সীমা ভাঙল। চার্চ অব ইংলণ্ড এবং সরকারের বিরুদ্ধে এই ব্যঙ্গ আক্রমণ নীরবে সহ্য করা যায় না। লেখককে গ্রেপ্তার করা হল।

১৭০৩ খ্রীষ্টাব্দের দোসরা জানুয়ারী ডিফোর বিরুদ্ধে 'দি সরটেষ্ট ওয়ে' লেখার জন্য অভিযোগ উত্থাপন করা হল। পরদিনই ওয়ারেণ্ট বের হল তাঁর নামে। ডিফো আগে থেকে খবর পেয়ে গা ঢাকা দিলেন। এখন তাঁর ইঁট টালি তৈরির কারখানা খুব ভাল চলছে। এমনি চললে দেনা সম্পূর্ণ শোধ করিতে দেরী হবে না। ঋণশোধ ছাড়াও আছে সংসারের খরচ চালাবার প্রশ্ন। সুতরাং তিনি তাঁর পুর্বপরিচিত ক্ষমতাপন্ন লোকেদের কাছে চিঠি লিখতে লাগলেন ঠিকানা না জানিয়ে। কয়েকটি পাম্ফলেটও ছাপালেন আত্মপক্ষ সমর্থন করে। কিন্তু কেউ তাকে রক্ষা করবার জন্য এগিয়ে এলো না। এদিকে ধরে দিতে পারলে পুরস্কার দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করা হল গেজেটে।

ভাগ্যের এমনই পরিহাস যে মাত্র কিছুকাল আগে ডিফো ছিলেন রাজা তৃতীয় উইলিয়মের পরামদর্শদাতা। রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক এবং প্রশাসনিক ব্যাপারে তাঁর উপদেশ নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হত। রাজকীয় শোভাযাত্রায় কতবার অংশ গ্রহণ করেছেন ডিফো। রাজা তৃতীয় উইলিয়ম তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন 'দি ট্রু বর্ণ ইংলিশম্যান' (১৭০১) কবিতাটি পড়ে। ডিফো এই কবিতায় ইংরেজ জাতির অন্য জাতিকে ছোট করে দেখা এবং তাদের শ্রেষ্ঠত্বাভিমানকে বিদ্রূপ করেছেন। উইলিয়ম নিজে ইংরেজ ছিলেন না বলে এই

কবিতাটি তাঁর খুব ভালো লেগেছিল। এক বছর আগে উইলিয়মের মৃত্যু হয়েছে; সুতরাং এখন ডিফোর আবেদনে সাড়া দেবার মত কেউ নাই। রাজার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা এতদিন যারা ঈর্ষার চোখে দেখেছে, আজ তারা ডিফোকে শায়েস্তা করবার সুযোগ পেয়েছে।

প্রায় সাড়ে চার মাস আত্মগোপন করে রইলেন ডিফো। তারপর ধরা পড়লেন, বিচার হল; টাকার অভাবের জন্য কোনো ভালো আইনজ্ঞকে পক্ষ সমর্থনের জন্য নিযুক্ত করতে পারেননি। বিচারে ডিফোর জরিমানা হলো, তিন দিন পিলরিতে দাঁড়াবার নির্দেশ দেওয়া হলো এবং সাত বছর সৎভাবে জীবন যাপন করবার জামিন দেবার আদেশ দেওয়া হলো। অপরাধের তুলনায় শাস্তি খুবই বেশী।

এর মধ্যে পিলরিতে দাঁড় করানোটাই সবচেয়ে কঠোর সাজা। খোলা জায়গায় কাষ্ঠস্তম্ভে হাত পা এবং গলা এমনভাবে আটকে দেওয়া হয় যে নাড়াচড়া যায় না। অনেকটা ক্রুশের মতো, তবে হাত পা পেরেক দিয়ে আটকানো হয় না। ফাঁকের মধ্যে হাত পা গলা ঢুকিয়ে আটকে রাখার বন্দোবস্ত আছে। মাথার উপর লিখে দেওয়া হয় অপরাধের বিবরণ। কৌতূহলী দর্শকের ভিড় জমে যায় তামাসা দেখবার জন্য। তারপর মজা দেখবার জন্য জনতা ঢিল ছুঁড়তে থাকে পিলরিতে আবদ্ধ বন্দীকে লক্ষ্য করে। রক্ষীরা বাধা দেয় না, এটা জনতার বহুদিনের অলিখিত অধিকার। কত বন্দী প্রাণ দিয়েছে ঢিলের আঘাতে, কত বন্দী জন্মের মতো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হারিয়েছে। ডিফোর ভয় এই পিলিরিকে। একদিন নয়। তিন দিন দাঁড়াতে হবে।

নিজেকে ভাগ্যের হাতে সমর্পণ করলেন ডিফো। ভয়ে অন্য ডিসেণ্টাররা তাঁকে ত্যাগ করেছে; আইনজ্ঞরা টাকা দিতে পারেননি বলে সাহায্য করতে এলো না; বন্ধুরা মুখ ফিরিয়েছে; যে লুইগ দলের নেতাদের জন্য এত করেছেন তারাও তাঁর আবেদনে বিন্দুমাত্র সাড়া দিল না। সুতরাং নির্বিকারচিত্তে শাস্তি গ্রহণ করা ছাড়া উপায় কি?

কিন্তু আশ্চর্য, জনতা ত্যাগ করেনি তাঁকে। ভিড় কম হয়নি, দলে দলে নর-নারী এসে খোলা জায়গা ভরে ফেলেছে। পিলরিতে দাঁড়িয়ে ডিফোর সমস্ত শরীর অবশ হয়ে আসছে। দূর থেকে সব ভালো করে দেখতে পাচ্ছেন না। তবু দেখতে পেলেন হাজার হাজার কপি 'দি সরটেস্ট ওয়ে' বিক্রি হচ্ছে। ক'মাস আগে সরকারের আদেশে এ বই প্রকাশ্যে পোড়ানো হয়েছিল। এখন নতুন করে ছাপানো হয়েছে, দর্শকরা সাগ্রহে কিনছে। এ ছাড়া জেলে বসে

যে ক'টি কবিতা লিখেছিলেন তা-ও এক রাত্রির মধ্যে তাড়াতাড়ি ছাপিয়ে এনেছে ভালো বিক্রি হবে এই আশায়। একটি কবিতা "এ হিম টুদি পিলরি' থেকে কতকগুলি লাইন আবৃত্তি করছে অনেকে :

Hail hieroglyphic state machine
Contrived to punish fancy in :
Men that are men, in thee can feel no pain.

অন্য সকলে ত্যাগ করলেও জনতা তাঁকে ত্যাগ করেনি। তাঁকে লক্ষ্য করে একটি ঢিলও ছুঁড়লো না কেউ। বরং সম্মান দেখিয়েছে তাঁরই বই পড়ে পিলরির চার পাশে।

মুক্তি লাভের পর ডিফোর জীবনে একটা পরিবর্তন এলো। ব্যবসা করবার চেষ্টা আর করলেন না। ব্যবসা করতে গেলে মুস্কিলও আছে। একটু উন্নতির দিকে যাচ্ছে দেখলেই পাওনাদাররা এসে চড়াও হয়। তাই স্থির করলেন লেখাকেই করবেন পেশা। প্রধান কাজ হলো রিপোর্টার। টাকা নিয়ে রাজনৈতিক দলের পক্ষে ইংলণ্ডের বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে গোয়েন্দাগিরি করেছেন এবং রিপোর্ট পাঠিয়েছেন। নিজে একটি পত্রিকা 'দি রিভিয়্যু' সম্পাদনা করেছেন ১৭০৪ থেকে ১৭১৩ পর্যন্ত। এর একটি নিয়মিত বিভাগ 'অ্যাডভাইস ফ্রম দি স্ক্যাণ্ডেলাস ক্লাব' আধুনিক রম্য রচনার সূত্রপাত করেছে বলে কেউ কেউ মনে করেন। ষ্টীল তাঁর 'ট্যাট্‌লার' কাগজে অনেক বিষয়ে ডিফোর অনুসরণ করেছেন।

সাংবাদিকতা ছাড়া ডিফোর প্রধান অবলম্বন হল পাম্‌ফলেট লেখা নানা বিষয়ে লিখেছেন। রাজনীতি, অর্থনীতি, ভ্রমণ, জীবনী, ইতিহাস ইত্যাদি বিচিত্র বিষয়ের উপরে লিখেছেন তিনি। এই সব লেখায় চিন্তার নবত্ব, গভীরতা এবং বলিষ্ঠতা সহজেই পাঠকের মন আকৃষ্ট করে। অষ্টাদশ শতকেও যে তিনি রাষ্ট্রসঙ্ঘের পরিকল্পনা করেছিলেন তা দেখে চমক লাগে। চতুর্দশ লুইকে ব্রিটিশ সেনা বাহিনীর হাতে খুব নাকাল হতে হল। ব্রিটিশের এই জয়কে ডিফো পৃথিবীর কাজে লাগাতে চাইলেন। তিনি প্রস্তাব করলেন, ইংলণ্ড ও তার মিত্রশক্তিরা মিলে এমন একটি সংঘ স্থাপন করুক যেখানে যা সকল বিরোধের নিষ্পত্তি করবে। এর ফলে শক্তিশালী রাষ্ট্রের আক্রমনাত্মক অভিযান সংযত হবে এবং দুর্বল রাষ্ট্রগুলি নিরাপত্তা অনুভব করবে।

জীবিকার্জনের জন্য ডিফো এমন অনেক কাজ করেছেন যা এখন সমর্থন করা যায় না। হয়তো একই সঙ্গে তিনি হুইগ এবং টোরি দলের পক্ষে

লিখেছেন। করেছেন রাজনৈতিক গোয়েন্দাগিরি। কিন্তু তথাপি তাঁর নানা রচনায় ছড়িয়ে আছে একটি বৃহত্তর আদর্শের প্রতি অনুগত্য। দুই বিরুদ্ধবাদী রাজনৈতিক দলের সেবা করলেও তাঁর নিজস্ব রাজনৈতিক আদর্শের মধ্যে কোনো সঙ্কীর্ণতা ছিল না। তিনি বলতেন সকল নাগরিকের মঙ্গল সাধনই গভর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য দরকার হলে গভর্ণমেণ্টকে নীতি বদলাতে হবে।

ডিফো বই লিখেছেন আড়াইশ'র বেশী। কিন্তু আজ লোকে মনে রেখেছে মাত্র এই কটি: The Life and Strange Surprising Adventures of Robinson Crusoe (1719) ; The Fortunes and Misfortunes of the Famous Moll Flanders (1722) ; A Journal of the Plague Year (1722). ষাট বছর বয়সে ডিফো আবিষ্কার করলেন তাঁর সত্যিকার প্রতিভা কথাসাহিত্যেকের, ব্যবসায়ীর বা রাজনৈতিক পুস্তিকা লেখকের নয়। জীবনের শেষ ক'বছর তাই তিনি শুধু উপন্যাসই লিখেছেন। আর এমন দ্রুত লিখেছেন যে সবাই বিস্মিত হয়ে যেত। তাঁর এই শেষ বয়সের উপন্যাসের মধ্যে 'দি কিং অব পাইরেট্‌স', 'দি অ্যাডভেঞ্চারস্ অব ডানকান ক্যামবেল', 'মেমোয়রস্ অব এ ক্যাভেলিয়ার', 'ক্যাপটেন সিঙ্গলটন,' 'কর্ণেল জ্যাক,' 'রোক্সনা' প্রভৃতিও উল্লেখযোগ্য।

১৭১৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে এপ্রিল তারিখটি ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থকেবে। ঐ দিন প্রকাশিত হল 'রবিনসন ক্রুসো'। দীর্ঘ নামটি লোকে এখন ভুলে গেছে, সংক্ষিপ্ত নাম রবিনসন ক্রুসো'ই মনে রেখেছে। বাইবেল ছাড়া এর আগে অন্য কোন বই এমন জনপ্রিয় হয়নি গ্রেট ব্রিটেনে। এটি ইংরেজী সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস। বানিয়ানের 'দি পিলগ্রিম্স্ প্রগ্রেসে' উপন্যাসের কিছু কিছু লক্ষণ থাকলেও আসলে উপন্যাস নয়। প্রথম উপন্যাসের এরকম সাফল্য অভূতপুর্ব।

সন্দেহ নেই, ডিফো তাঁর কাহিনী রচনা করেছিলেন আলেকজাণ্ডার সেলকার্কের অ্যাডভেঞ্চারের উপর ভিত্তি করে। সেলকার্ক চিলির কাছে একটি জনমানবহীন দ্বীপে স্বেচ্ছায় চার বছর চার মাস (১৭০৪-১৭০৯) কাটিয়েছিলেন। সেলকার্কের কথা লোকের মুখে মুখে ইংলণ্ডের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। এই কাঠামোটিকে নিয়ে ডিফো আশ্চর্য শিল্প সৃষ্টি করেছেন।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত 'রবিনসন ক্রুসোর' সাতশ সংস্করণ, অনুবাদ ও রূপান্তর হয়েছে। শিশু, কিশোর, স্বল্প শিক্ষিত বয়স্ক ব্যক্তি

ইত্যাদি বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠকের উপযোগী করে রবিনসন ক্রুসোর পরিবর্তন করেছেন সম্পাদকরা। তবু এর আকর্ষণ কমেনি। পৃথিবীর সকল দেশের সকল শ্রেণীর পাঠকের জন্ম আছে 'রবিনসন ক্রুসো।' এই সর্বজনীন আবেদনের রহস্তটি কি?

এই রহস্তটি সংক্ষেপে সুন্দর করে বলেছেন ওয়াল্টার ডি লা মেয়ার: "It taxes no ordinary intelligence. There is nothing delicate, abtrnse, subtle to master. It can be opened and read with ease and delight at any moment, and anywhere. Its thought is little but an emanation of Crusoe's seven senses and his five wits. Its sentiments are universal."

ডিকেন্স অভিযোগ করেছেন, 'রবিসন ক্রুসোতে' এমন কিছু নেই যা পাঠককে হাসাতে অথবা কাঁদাতে পারে। নাই বা থাকল। হাসি কান্নার বাইরে যে জীবন, সে জীবন আছে এই কাহিনীতে। গোর্কির মতে 'রবিনসন ক্রুসো' হলো "the Bible of the Unconquerable." রবিনসন ক্রুসো আদর্শ ইংরেজের প্রতিনিধি। তার দুঃসাহসিক অভিযানপ্রিয়তা, সমুদ্রের প্রতি গভীর আকর্ষণ, কর্মক্ষমতা এবং ধর্মবোধ স্বভাবতঃই ইংরেজ পাঠককে আকৃষ্ট করেছিল। তাছাড়া সকল মানুষের নিকটই রবিনসন ক্রুসোর কাহিনী তার নিজেরই ইতিহাস। আমাদের পূর্বপুরুষরা কেমন করে একে একে সভ্যতার প্রাথমিক স্তরগুলি অতিক্রম করে এসেছে, তারই ইতিহাস পাওয়া যায় এখানে।

ডিফোর নিজের জীবনের প্রসার ঘটেছে এই কাহিনীতে, তাই এত প্রাণবন্ত। যাট বছর বয়সে ডিফো দেখলেন তাঁর জীবনের সকল অভিলাষ ব্যর্থ হয়েছে; তিনি নিঃসঙ্গ; বড় ছেলে তাঁকে পথে বসিয়েছে, পাওনাদারদের এড়াবার জন্ম পরিবার থেকে দূরে একা থাকতে হয়। সুতরাং পরিচিত জগৎ ও পরিবেশ থেকে বহু দূরে কল্পনায় নিজের এক পৃথিবী গড়ে তুললেন, সেখানে তিনি সার্থক হয়েছেন, বাস্তব জীবনের বিফলতার মধ্যে এইটুকু তাঁর সান্ত্বনা। সেই নির্জন দ্বীপে হুইগ বা টোরি নেই, পাওনাদার নেই, আছে গভীর প্রশান্তি। কল্পনায় নিজেকে সেই জগতের সঙ্গে একাত্ম করতে না পারলে লেখক এমন আশ্চর্য ব্যক্তিগত স্টাইল প্রয়োগ করতে পারতেন না। পড়তে পড়তে কোথাও মনে হয় না কাল্পনিক কাহিনী; যেন নায়ক নিজেই তার কথা বলছে। সরল বেগবান ভাষা সরাসরি পাঠককে স্পর্শ করে। সাহিত্যের ভাষাকে

গণতন্ত্রীকরণের এই প্রথম সার্থক প্রচেষ্টা। আর 'রবিনসন ক্রুসোই' প্রথম উপন্যাস যা এক বৃহৎ পাঠকগোষ্ঠী গড়ে তুলতে পেরেছিল।

রবিনসন ক্রুসো উপন্যাসটি নিঃসঙ্গ দ্বীপে এক পুরুষের বাঁচবার জন্য সংগ্রামের কাহিনী; 'মল ফ্ল্যাণ্ডার্স' জনাকীর্ণ সংসারে এক নারীর বেঁচে থাকবার প্রাণান্তকর প্রয়াসের কাহিনী। অপরূপ সুন্দরী নায়িকা বারো বছর বেশ্যাবৃত্তি করেছে; পাঁচ বছর ছিল গৃহিণী; বারো বছর করেছে চৌর্যবৃত্তি; তারপর নির্বাসন দণ্ড ভোগ করেছে আট বছর ভার্জিনিয়ায়। কিন্তু শেষ বয়সে সৎ জীবনযাপন করেছে সচ্ছল অবস্থায়।

পরিচিত পরিবেশের পটভূমিকায় এমন বিচিত্র অ্যাডভেঞ্চার এর পূর্বে ইংরেজ পাঠক পায় নি। কাহিনীর অন্তর্গত বিভিন্ন ঘটনাগুলি দৃঢ় সংবদ্ধ নয়, সেদিক থেকে উপন্যাস হিসাবে ত্রুটি আছে। কিন্তু লেখকের হাতে ছোট-বড় চরিত্রগুলি জীবন্ত হয়ে উঠেছে। 'রবিনসন ক্রুসোর' তুলনার এখানে উপন্যাসের লক্ষণগুলি অনেক বেশী পরিস্ফুট।

'এ জার্নাল অব দি প্লেগ ইয়ার'-এ ডিফোর রচনাশৈলীর শ্রেষ্ঠ নিদর্শন পাওয়া যায়। ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে প্লেগ মহামারী দেখা দিয়েছিল। ডিফোর বয়স তখন মাত্র পাঁচ বছর। যে আতঙ্কে সমগ্র লণ্ডন উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল, ডিফোর তা উপলব্ধি করবার বয়স হয়নি। কিন্তু ডিফো এমন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মহামারীর বিবরণ দিয়েছেন, মৃত্যুর এবং অন্যান্য বিষয়ের এমন সংখ্যাতত্ত্ব উদ্ধৃত করেছেন যে পাঠকের নিশ্চিত বিশ্বাস হবে যে, লেখক নিজে লণ্ডনের বাড়ী বাড়ী ঘুরে বুঝি সব দেখেছেন। বইয়ে লেখকের নাম না থাকায় একে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ হিসাবে গ্রহণ করতে কারো দ্বিধা হয়নি। ডিফোর বই প্রকাশিত হবার পর সরকারী দপ্তরের কর্তারাও পরিবেশিত তথ্য ঐতিহাসিক এবং নির্ভরযোগ্য বলে স্বীকার করেছেন। আলবেয়ার কামু তাঁর উপন্যাসে প্লেগের পরিবেশ সৃষ্টি করতে এ বইয়ের সহায়তা নিয়েছেন।

সাহিত্যের ইতিহাসে এ বইটি একটি ধাপ্পার দৃষ্টান্ত। অবশ্য ধাপ্পা প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে লেখকের দাবীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বিবরণ সবই তথ্যভিত্তিক। তথ্য সংগ্রহ এবং বিন্যাসে ডিফো অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। প্লেগ মহামারী প্রত্যক্ষ করেছিলেন স্যামুয়েল পেপিস। তিনি তাঁর ডায়েরিতে প্লেগ আক্রান্ত মুমূর্ষু লণ্ডনের যে ছবি দিয়েছেন তার তুলনায় ডিফোর বর্ণনা অনেক বাস্তব মনে হয়।

'রবিনসন ক্রুসো' এবং অন্যান্য বই ডিফোর জীবিতকালেই জনপ্রিয়

হয়েছিল। কিন্তু বই বিক্রির টাকা ডিফো পাননি। পাওনাদাররা নিয়ে যেত। পরিবার থেকে দূরে দূরে পালিয়ে বেড়াতে হত তাঁকে আত্মগোপন করে। সেই অবস্থাতেই লিখতেন। লিখেছেন প্রায় জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। কিন্তু শান্তি ছিল না। সুখও ছিল না।

ডিফোর জীবনের ধারাবাহিক ইতিহাস জানা যায় না। তবু শেষ বয়সের বেদনার কথা তাঁর নিজের দু'একটি চিঠিপত্র থেকে জানা যায়। নিজের ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত তাঁর দুঃখের কারণ হয়েছিল। পাওনাদারদের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য যা-কিছু অর্থ ও সম্পত্তি ছিল সব রেখেছিলেন বড় ছেলে বেঞ্জামিনের নামে। এই ছেলে মা বাবা এবং ভাইবোনদের বঞ্চিত করে নিজে সব আত্মসাৎ করল। এক চিঠিতে ডিফো এই সম্বন্ধে দুঃখ করে বলেছেন: "It has been the injustice, unkindness, and I must say, inhuman dealings of my own son which has both ruined my family, and, in a word, broken my heart ;···I depended upon him, I trusted him, I gave up my two dear unprovided daughters into his hands ; but he has no companion, and suffers them and their poor dying mother to beg their bread at his door···"

শুধু তাই নয়। বেঞ্জামিন পিতার বিরুদ্ধে কাগজেও লিখত।

এক হোটেলে ডিফো শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। সেদিন ২৪শে এপ্রিল, ১৭৩১। আত্মীয়স্বজন কেউ নিকটে ছিল না। হোটেলের কেউ জানতো না তাঁর পরিচয়। ডিফো নয়, সেখানে তাঁর নামে ছিল ডুবো। কয়েক বছর আগে দেনার দায়ে যখন তাঁর নামে মামলা করা হয়েছিল তখন বিচারক তাঁকে চিহ্নিত করেছিলেন সুইণ্ডলার হিসাবে। প্রতারক। 'প্রতারক' ডিফো তারপর থেকে অসুস্থ দেহে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছেন। বাড়ীতে স্ত্রী অসুস্থ ; তাঁকে দেখবার উপায় ছিল না। নিজের ঠিকানা দিয়ে একখানি চিঠি লেখা সম্ভব ছিল না।

শুধু স্বপ্ন দেখতেন এমন এক দ্বীপের, যেখানে পাওনাদার নেই, যেখানে নিজের খুশিমত কাজ করবার অবাধ স্বাধীনতা, যেখানে নেই সভ্যতার মুখোশপরা মানুষের হানাহানি।

ডিফো আর নেই ; কিন্তু সে স্বপ্ন তিনি রেখে গেছেন 'রবিনসন ক্রুসো'র লক্ষ লক্ষ পাঠকের মনে।

ভবানী মুখোপাধ্যায়

মল ফ্ল্যানডার্স

ড্যানিয়েল ডিফো কথা-সাহিত্যের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় নাম। তাঁর বিখ্যাত একটি উপন্যাসের নাম "মল ফ্ল্যানডার্স"। এই মল ফ্ল্যানডার্সের ইতিবৃত্ত প্রকাশকালে ডিফো যে ভূমিকা লিখেছিলেন, তাতে তিনি সংশয় প্রকাশ করেছিলেন, গ্রন্থটির হয়ত পাঠকমহলে তেমন সমাদর হবে না। কারণ, প্রতিদিন মুদ্রাযন্ত্র মারফৎ অজস্র নভেল, নাটক ও স্মৃতিকথা প্রকাশিত হচ্ছে। তাই কম সংখ্যক পাঠকের মনোরঞ্জন করবে "মল ফ্ল্যানডার্স"। কারণ, এই কাহিনী একটি কুখ্যাত রমণীর জীবনের বিচিত্র ইতিহাস আত্মকথার ভংগীতে লিখিত। ডিফো বলেছিলেন যে-নারীর আত্মকথা তিনি লিখেছেন, সে সম্প্রতি নিউগেট বন্দীশালায় আটক আছে। লণ্ডনের গরীবপাড়ার কুখ্যাত চরিত্রগুলি সম্পর্কে যাঁরা অবহিত তাঁরা সহজেই অনুমান করতে পারবেন কোন বিশেষ চরিত্রকে অবলম্বন করে লেখক এই কাহিনী রচনা করেছেন। নায়িকার প্রকৃত নাম পাঠকদের কাছে গোপন রাখা হয়েছে, তাদের পক্ষে এই ইঙ্গিতটুকু যথেষ্ট যে, পকেটমার পর্বে এই রমণী মিসেস ফ্ল্যানডার্স নামে সকলের কাছে পরিচিত ছিলেন।

দোকান থেকে মাল চুরি, কিংবা দোকান থেকে একটি পণ্যদ্রব্য অপহরণ প্রচেষ্টায় 'সপ্-লিফ্‌টিং'-এর দায়ে তাকে কারাগারে যেতে হয়; মল জিনিসটি

চুরি করে যখন পালিয়ে আসছিল, তখন দরজা খোলা এবং পিছন থেকে এক ব্যক্তির আগমনে সে বিস্মিত হয়ে ওঠে, তাই সে আর চোরাই মালটা নিয়ে পালাতে পারে না। দুজন সাক্ষী জুটে গেল, তারা বলল যে, মল ফ্ল্যানডার্স দোকানের দরজা ভেঙে ঢুকে জিনিস নিয়ে পালাচ্ছিল, তার হাতে তখনও চোরাইমাল ছিল। তখন যেসব অপরাধ সে করেনি, এমন কয়েকটি অপরাধের দায়ে তার শাস্তি হল ; এই ঘটনার পিছনে মৃদু শ্লেষ আছে ; সেইকাল হল সপ্তদশ শতাব্দীর ইংলণ্ড, তাই মল ফ্ল্যানডার্সের শাস্তি হল ফাঁসিকাঠে ঝোলা, যতক্ষণ না মৃত্যু ঘটে।

মল ফ্ল্যানডার্স কিন্তু শেষপর্যন্ত বেঁচে গেল, তখনকার কালে দরিদ্র ইংলণ্ডবাসীর পক্ষে এভাবে বাঁচাটাও একটা সাধারণ ব্যাপার। মল ফ্ল্যানডার্স কারাগারের ধর্মযাজকের কাছে অনুতাপ করলো, সেই অনুতাপ এমনই গভীর যে, ধর্মযাজক বিশ্বাস করলেন যে, যদিও সে দুর্বৃত্তশ্রেণীর মধ্যে মানুষ হয়েছে, সে কিন্তু মনে মনে আর এতটুকু দুষ্কৃতির ভাব পোষণ করে না, তাছাড়া সে যথাযোগ্য স্থানে পয়সাকড়ি দিয়ে যাঁরা সাধুদের পরিত্রাণ করেন এবং দুষ্কৃতদের দণ্ডদান করে বিনাশ করেন, তাঁদের বুঝিয়ে দিল যে, সে মোটেই দরিদ্র নয়। সে যখন দরিদ্র নয়, তখন আর ফাঁসী দেওয়ার মানে হয় না। তার শাস্তি তখন নির্বাসন। মল ফ্ল্যানডার্সকে জাহাজযোগে আমেরিকায় পাঠিয়ে দেওয়া হল। সেই জাহাজে তার অগণিত স্বামীদের অন্যতম একজন ডাকাত ছিল সহযাত্রী।

মল ফ্ল্যানডার্সের অনুতাপের মধ্যে আন্তরিকতা ছিল কিনা সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ নয়, তবে এ-কথা বিশ্বাস করা কঠিন নয় যে, চোর হিসাবে বেশ কুশলী না হলে এবং দূরদৃষ্টি না থাকলে সে ফাঁসুড়ের হাত থেকে কিছুতেই নিষ্কৃতিলাভ করত না। তাকে ফাঁসীর মঞ্চের কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং ফাঁসুড়ের দড়ি যখন গলায় পড়ার উপক্রম সেই সময় সে অনুতাপ করেছে, তার আগে নয়! ডিফো পাঠকদের বুঝিয়েছেন যে, মল ফ্ল্যানডার্সের অনুশোচনা ছিল নিরন্তর এবং তার জীবনের শেষ কয়েক বছর পাঠকের পক্ষে লাভজনক।

> "Twelve years a whore, five times a wife (whereof once to her own brother), twelve years a thief, eight years a transported felon in Virginia—"

এর চেয়ে আর চমকপ্রদ জীবন কি হতে পারে? তাই প্রতিদিন মুদ্রাযন্ত্র মারফৎ যে-সব উপন্যাস এবং স্মৃতিকথা প্রকাশিত হচ্ছে, তার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমেছে মল ফ্ল্যানডার্স এবং তার আত্মকথন। ডিফো অনেক ক্লেশসহকারে ভূমিকায় বলেছেন যে, তাঁর গ্রন্থ যতই কেন দুর্নীতিমূলক মনে হোক, পাঠককে

নীর থেকে ক্ষীর গ্রহণ করতে হবে। সুবিধার পথ করে নিয়েছেন। উপন্যাসেও শেষজীবনের মল ফ্ল্যানডার্স তার সততাপূর্ণ জীবনযাপনের ফলে প্রচুর পরিমাণে লাভবান হয়েছে। তার ক্ষেত-খামার সমৃদ্ধিশালী হয়েছে। মলের স্বামী একদা ডাকাতি করলেও, সে আসলে ভদ্রব্যক্তি। আমেরিকায় এই স্বামী বেচারী মলের বিশেষ প্রয়োজনে না লাগলেও সম্ভ্রমসৃষ্টির পক্ষে যথেষ্ট। মল শেষপর্যন্ত প্রচুর ধনসম্পদ উত্তরাধিকার হিসাবেও লাভ করল এবং একদিন অনুতপ্তচিত্তে পরিণত বয়সে তার স্বদেশে ফিরে এল। নিজের চেষ্টায় এবং কিছু পরিমাণে ব্যক্তিগত সৌভাগ্যবশতঃ সে সবরকমের সুখের অধিকারিণী হয়েছে। তার অখ্যাতি বিস্মৃত, কিন্তু তার মন অবশ্য প্রাক্তণ অপরাধসম্পর্কিত স্মৃতিমন্থনে অতিশয় সজীব।

মলের প্রয়োজন ছিল একটা সুযোগের। কিন্তু তাঁর সৃষ্টিকর্তা তাকে ষাট বছর বয়স হওয়ার আগে সেই সুযোগ দেননি। কিন্তু তখনও খুব দেরী হয়নি, একেবারে সর্বোচ্চ আসন না পেলেও, সম্ভ্রমের মাঝের সারিতে সে আসন করে নিয়েছে।

ড্যানিয়েল ডিফো যেমন তাঁর ভূমিকায়, মল ফ্ল্যানডার্স তেমনই তার জীবন ইতিহাসে পাঠকের মনে এই ধারণা সৃষ্টি করায় যে উভয়ে একাধারে সৎ এবং ভণ্ড। তথাপি শেষ পর্যন্ত লেখক এবং তাঁর সৃষ্ট চরিত্র পাঠকচিত্ত জয় করে নেয়। ইংরাজী ঐতিহ্যানুসারে ডিফো একজন মহৎ কাহিনীকার। যে কাহিনী তিনি নিজে মিথ্যা বলে জানেন সেই কাহিনীকে বার বার সত্য ঘটনা বলে তিনি পাঠককে বিভ্রান্ত করেছেন, তিনি বার বার প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে সেই সব ঘটনার বর্ণনা করেছেন যা তিনি নিজে কখনও চোখে দেখেননি, অন্য কারো পক্ষে দেখা সম্ভব হয়নি। তিনি আফ্রিকা যাত্রার এমন এক চিত্তাকর্ষক বর্ণনা দিয়েছেন যে পাঠকের মনে হবে লেখক স্বয়ং সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশ পরিক্রমা করেছেন। কিন্তু এখন যে সব প্রমাণ পাওয়া যায় তাতে জানা যায় তাঁর সব কথাই মিথ্যা, শুধু তিনি কেন, তাঁর ক্যাপ্টেন সিঙ্গলটন এমন কি কেউই সে সব তখনো চোখে দেখেনি। মল ফ্ল্যানডার্স একজন পেশাদার চোর সে মোটেই কোনো রকমের মাপকাঠিতে সাধু নয়, তথাপি সে তার সাধুতার দ্বারা পাঠককে অভিভূত করে। সে আত্মপ্রবঞ্চনা করে না, কিন্তু আমাদের যে প্রবঞ্চিত করে, অন্ততঃ যতদূর এবং যতটুকু প্রবঞ্চিত হতে আমরা চাই।

সমকালীন কোন সব উপন্যাস এবং স্মৃতিকথা পাঠকচিত্ত জয় করে ড্যানিয়েল ডিফোর রচনাকে অবহেলা করতে পারে ভেবে মল ফ্ল্যানডার্সের ভূমিকায়

আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন কে জানে, সেইসব গ্রন্থাবলী আজ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, তাদের সাহিত্যিক মূল্য সম্পর্কেও আমাদের কোনো ধারণা নেই, কিন্তু নিউগেট কারাগারের দুঃশীলা রমণী মল ফ্ল্যানডার্স আজো কালজয়ী হয়ে আছে। সাধারণ পাঠকের কাছে ডিফোর আগের কালের কোনো ইংরেজ উপন্যাসলেখক আজ আর সজীব নেই।

সাহিত্যগবেষক হয়ত খুঁজেপেতে কিছু বার করতে পাবেন, তবে তার মলাট ছাড়া আর কিছুই পড়ার যোগ্য বিবেচিত হবে না। ড্রাইডেনের "In congnita" সম্ভবতঃ তাঁর যৌবনের দিনগুলির আত্মস্মৃতি। সেকস্‌পীয়ার রচিত প্রথমদিককার কমেডিগুলির কথা মনে পড়বে এই কাহিনী পাঠ করে। কিছুকাল আগে এই গ্রন্থটি একজন ইংরাজ প্রকাশক নতুন করে ছাপিয়ে প্রচ্ছদপটে লিখে দিয়েছিলেন 'প্রথম ইংরাজী উপন্যাস'। ড্রাইডেনের এই কাহিনীর মাধুর্য আছে সন্দেহ নেই, তবে তাকে কোনো সংজ্ঞানুসারেই উপন্যাস বলা যায় না।

ড্যানিয়েল ডিফোর রচনায় সেই প্রশ্ন নেই। যতই কঠোর মাপকাঠিতে বিচার হোক " ফ্ল্যানডার্সের" কাহিনীকে উপন্যাস হিসাবে গ্রহণ করিতেই হবে। 'মল ফ্ল্যানডার্স' একটি সার্থক উপন্যাস, ব্যাকরণ এবং সংজ্ঞার সব ধারা এবং উপধারা মতে এটি উপন্যাস। আঙ্গিক ও উৎকর্ষতায় উপন্যাসটি বিস্ময়কর। অভিজ্ঞতার পরিবেশন বাস্তবভিত্তিক। তাই শুধু 'মল ফ্ল্যানডার্স' যে কালজয়ী হয়েছে তা নয়, ডিফোর বর্ণনাভঙ্গীটুকুও কালজয়ী হয়েছে। সাধারণ পাঠক সে যে দেশেরই হোক, এই উপন্যাসের আঙ্গিকে আকৃষ্ট হবে, সৃজনশীল সাহিত্যের আর কোনো ভঙ্গী এর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে পারে না।

আমাদের যদি কোনো একটা কাহিনী বলার থাকে, সেই কাহিনীর পটভূমি যদি দীর্ঘকাল বিস্তৃত হয় এবং তার পরিসমাপ্তি সেই কালের অবসানে ঘটে তাহলে তা উপন্যাসের আকৃতি লাভ করে।

নভেল তাই সেই জাতীয় সাহিত্যিক অভিব্যক্তি যা মধ্যবিত্ত সমাজের সম্পত্তি। এই একটিমাত্র বস্তু মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সৃষ্টি। মধ্যবিত্ত সমাজের প্রাধাণ্য যতদিন না বৃদ্ধি পেয়ে বেশ স্থায়ী হয়েছে, এবং মধ্যবিত্তের কল্পনা ও ধারণামাফিক নীতি পড়ে উঠেছে ততদিন উপন্যাসের অস্তিত্ব গড়ে ওঠেনি।

মানুষ চিরদিন গল্প বলতে, শোনাতে এবং শুনতে ভালোবাসে। যেসব কথা ও কাহিনী সংরক্ষণ করা উচিত মনে হয়েছে সেইসব লিখে রাখা হয়েছে। যতদিন পর্যন্ত রাজদরবার সমাজের চিন্তাজগতের ওপর আধিপত্য বিস্তার করেছে

ততদিন পর্যন্ত রোমান্স এবং পল্লীগাথা পড়া হয়েছে তার মধ্যে ছয় হাজার পৃষ্ঠাব্যাপী কেতাবও আছে। ভাবতে বিস্ময়বোধ হয় যে চোখের দৃষ্টি নষ্ট করে বাতির আলোয় সে সব গ্রন্থ লিখিত এবং পঠিত হয়েছে। 'মাদাম্যাজেল দা স্কুদেরি'র অসংখ্য খণ্ড পাঠক পড়েছে একথা ভাবা যায় না। এইসব কাহিনীর প্রেমিকারা অথবা, প্রেমিকদের ভাবাবেগ অতিশয় উচ্ছ্বাসপূর্ণ আর ঘটনাবলী বিস্ময়কর এবং অবিশ্বাস্য। প্রাণহীন, জোলো, এবং উত্তেজনাহীন। যা বাস্তব তার মত চমকপ্রদ আর কিছু নেই। এত সহজে আর কোনো কিছুই হৃদয় স্পর্শ করে না, যা কল্পলোকের তা ক্লান্তিকর।

ফরাসীরা বলেন 'Princess de Cleaves' তাঁদের প্রথম উপন্যাস। একথা বলার কারণ হল যে এই সর্বপ্রথম প্রকৃত প্রেমিক-প্রেমিকারা ছাপার পৃষ্ঠা থেকে বলেছে কিন্তু মাদাম দ্য লাফায়েত্তির এই উপন্যাসও প্রচ্ছন্ন এবং সংক্ষেপিত স্মৃতিচারণ মাত্র। তিনি বলেছিলেন—'Ce nest pas un roman.' রাজদরবারের কালে এই স্মৃতিচারণের মাধ্যমেই কিছু পরিমাণে বাস্তবতা পরিবেশিত হয়েছে। সেণ্ট সাইমনের স্মৃতিচারণ ১৬৯১ খ্রীষ্টাব্দে লেখকের ষোলো বছর বয়সে শুরু হয়েছিল। এই গ্রন্থটি চতুর্দশ লুই-এর আমলের বিশিষ্ট নরনারীর কাহিনী। একজন সভ্যসদের প্রত্যক্ষ দর্শনের তথ্যমূলক বিবরণ। লেখক শক্তিমান, অহঙ্কারী, সংস্কারমুক্ত, এবং নিজের পদমর্যাদা সম্পর্কে সচেতন।

সেণ্ট সাইমনের যদি মহৎ শিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গী থাকে তাহলে বলতে হবে পোশাকআঁটা দেহের ভিতর থেকে তিনি সব কিছু স্পষ্ট দেখেছেন। জীবনটাকে একেবারে কাছ থেকে দেখেছেন এবং বর্ণনা করেছেন।

কিন্তু ক্যাসানোভার স্মৃতিকথা পাঠ করার সময় একথা মনে হবে না। ক্যাসানোভার স্মৃতিকথায় অনেক নামধাম আছে যা বাস্তবিক ছিল। তথাপি ক্যাসানোভার স্মৃতিকথায় অনেক নামধাম আছে যা বাস্তবিক ছিল। তথাপি ক্যাসানোভার অভিযানকাহিনী পাঠ করলে কল্পনাবিলাসীর রচিত রূপকথা না প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ—কোনটা সত্য এই সংশয় মনে জাগে।

মধ্যবিত্ত সমাজ অনেকদিন ধরে রাজনীতির ক্ষেত্রে তাঁদের প্রভাব এবং শক্তি বিস্তার করেছেন। কিন্তু বুর্জোয়া সমাজের জীবনাদর্শ এবং অনুভূতি যতক্ষণ না ফ্রান্সের জন-জীবনকে প্রভাবিত করেছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা ক্ষীণাকার অথচ খাঁটি উপন্যাস পাইনি। এ্যাবে প্রেভোস্ট এবং ড্যানিয়েল ডিফোর মধ্যে যেটুকু ব্যক্তিগত এবং জাতিগত প্রভেদ আছে তা বিবেচনা

করলেও উভয়ের মধ্যে আমরা অনেক মিল খুঁজে পাই। দুজনেই সেই বস্তুটির অংশীদার—যার নাম মধ্যবিত্তের জীবনধারণা বলা চলে।

মল ফ্ল্যানডার্স গরীব ঘরের মেয়ে অত্যাচরিত দরিদ্রশ্রেণীর বটে, তথাপি এই মল ফ্ল্যানডার্স এমন অনেক কিছু কাণ্ড করেছে যা 'প্রলেটারিয়ান নভেলে'র আওতায় পড়ে। মলের জন্ম কারাগারে, তার জননী চুরির অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত, সে কোনোরকমে ফাঁসী এড়িয়ে যায়, পেটে সন্তান আছে এই অছিল তাকে বাঁচার সুযোগ দেয়। মল বিত্তবান সম্প্রদায়ের মানুষ নয়। সেইভাবে এবং সেই ধারণায় সে মানুষ হয়েছে তার ফলে অনেক বাঁধাধরা ধারণা তার মনে ছিল। তার জীবনের শেষ দশকেও তার সমস্ত সম্পত্তি চুরি এবং চাতুরী দ্বারা আহরিত। সবরকমের অপরাধ সে করেছে, কিন্তু তার একমাত্র অপরাধ সে দরিদ্র। সে এক হিসাবে বংশানুক্রম এবং পরিবেশের দাস। সে ফাঁসীর মঞ্চের কাছ ঘেঁষে বেঁচে এসেছে, তার নিজের অপরাধ নয়, সমাজের পাপস্খালনের প্রয়োজনে। মর্যাদাহীন অবস্থায় জন্মগ্রহণ করাটাই তার অপরাধ, তার কোনো সুবিধা নেই, সম্মান নেই; সুযোগ নেই। সে একেবারে নীচের তলার মানুষ। দণ্ডিত জননীর গর্ভে জন্ম, পিতা একজন দৈবাৎ পাওয়া পুরুষ মাত্র, জন্ম কারাগারে। বড় ঘরের এক দুলালের দ্বারা চরিত্র দূষিত এই বাড়িতেই দাতব্যব্যবস্থায় তার আশ্রয় মিলেছিল। তারপর সেই আকস্মিকতাই তাকে অমর্যাদার পঙ্কপল্বলে ডুবিয়ে দিয়েছে। তার নিজের আর কি করার ছিল, কি সুযোগ ছিল, যে সুযোগ ছিল তার সামনে, তা কিছুই নয়! যে সমাজ তাকে জোর করে অত্যাচারিত সম্প্রদায়ভুক্ত করেছে তারই সমস্ত অপরাধ। মল ফ্ল্যানডার্সের যা কিছু অপরাধ তার জন্য মূলতঃ এবং মুখ্যত দায়ী সমাজিক পরিবেশ এবং সমাজ স্বয়ং। মল নিজে সৎ এবং মহৎ, সকল মানুষের মত ভিত্তিগতভাবে সে মহৎ। আপনাকে স্বচ্ছন্দে এবং শোভনভাবে রাখার জন্য তার অর্থের প্রয়োজন ছিল, সেই অর্থ সে অবশ্য অসৎ পন্থায় সংগ্রহ করেছে।

ডিফো ঠিক এই ধরণের লেখননি। এই তাঁর বিষয়বস্তু। একথা স্মরণ রাখতে হবে যে তিনি সপ্তদশ শতাব্দীর লেখক। ভূমিকা অংশে গ্রন্থের 'মর্যাল' বা নীতিবাক্যের ইঙ্গিত আছে। তথাপি ইংলণ্ডের মধ্যবিত্ত সমাজের মৌল চরিত্র ডিফোর এই উপন্যাসে রূপায়িত। ডিফো মধ্যবিত্তের মনোভঙ্গীর অংশীদার হয়েও তা অতিক্রম করেছেন। তিনি মধ্যবিত্তের জুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন, শিল্পী যেভাবে তার প্রতিবাদ জানাতে পারে সেই পদ্ধতিতে। শিল্পসঙ্গত এবং শিল্পসম্মত প্রতিবাদ।

স্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

বেকারত্ব ও স্বাধীনতার জন্য

জানলার গরাদের ভিতর দিয়ে বিস্তৃত ধানক্ষেত দেখা যায়। ধানক্ষেতের সবুজ ম্যাটমেটে আলোয় সকালবেলা শুয়ে রয়েছে। সকালবেলার ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে ঘরে। নিস্তব্ধ নির্জন পাড়াগাঁ। অথচ ঠিক এ-বাড়ির আশে-পাশেই কয়েকটি পুরনো বাড়ির অন্ধকার দেয়াল, বাড়ির ধ্বংসস্তূপ কোন রকমে দাঁড়িয়ে রয়েছে। অশ্বত্থগাছ, যজ্ঞডুমুর ও বুনো লতাগুল্মের শাখা প্রশাখায় পুরনো ছায়া রাত্রির মত ঘুমন্ত পড়ে রয়েছে। আরো কিছু কিছু জায়গায় নির্জন অবসিত ছায়া—বাসি ছায়া স্বপ্নের মত বিজয়ের কাছে শব্দহীন মনে হয়। মেঘলা ভোরের জন্যেই এ-আলো পাতলা ক্ষীণ তন্দ্রাচ্ছন্ন মিহি রঙের মাত্র গুঁড়োগুঁড়ো ছড়িয়ে আছে। শুধু দেয়ালের ছায়ায় ঘনত্ব বেশী, যেন বাসি ছায়ারা ছড়িয়ে আছে। প্রাচীন ছায়ারা পড়ে আছে।

ভোরের দিকে অনেকের ঘুম ভাঙে না। ভাঙে না বলেই পাখির শব্দ পাওয়া যায়। বিজয়ের ভাল লাগে এই শব্দ, এই ভয়ানক নির্জনতা—যা তাকে সর্বাংশে ক্লান্ত করে দ্যায়। বিজয় বিছানায় অর্ধচেতনায় শায়িত হয়ে বালিশের ঝালরে হাত মুখ রাখে। পরিষ্কার বিছানা ও বালিশ থেকে

মুখটা জানলার দিকে গড়িয়ে কুঁকড়ি হয়ে শুয়ে থাকে। ভোরের দিকে ঠাণ্ডা পাওয়ায় বিজয় গুটিয়ে শুয়ে থাকে। বিজয় শুয়ে শুয়ে ঘরের জিনিসপত্রে বাতাসের যাতায়াত করা বুঝতে পারে। জানলার ভিতর ধানক্ষেতের হাওয়া ভোরের দিকে কলকাতার কলের জলের মত একমাত্র শব্দে হাজির হয়। বিজয় শুয়ে শুয়ে ভাবে, কলকাতায় মেসবাড়িটায় বাবার সঙ্গে তার বেকারত্বের সে এক জীবন, আর সেই বেকারত্ব নিয়েই বিজয়ের বাড়িতে পাড়াগাঁয়ে এ এক জীবন। ক্রমাগত দশ এগারো বছরের বেকারত্বের ফলে বিজয় নির্জীব প্রাণীর মত শুয়ে থাকে, তার চলা বসা কথাবার্তা বলার মধ্যে নিস্তেজ বাংলাদেশের মাঠ ঘাট পুকুর ও উদাস বনের ছবি ফুটে ওঠে। বিজয় বাড়িতে দিন তিনেক হল এসেছে। বাবা নেই। কলকাতায় বাবা আছে বলেই গ্রামের নিস্তব্ধ জীবন, বাড়ি ঘর তাকে সর্বদা যেন নিস্তব্ধতার দেয়াল দিয়ে রাখছে। বিজয়ের এখানে এসে সেই বেকার জীবনের কথা পুনঃ পুনঃ মনে হয় না ; কেউ মনে করায় না। বাবার সেই চাকরি-চেষ্টার উপর্যুপরি আঘাত নেই। বিজয় এ-বাড়িতে আসার পর দেয়াল-ঘড়িটাকে বন্ধ করে দিয়েছে। যখন তখন যা-তা বাজছিল ঘড়িটা। ঘড়িটাকে বিজয়ের অভিভাবকের মত মনে হয়। সুতরাং ঘড়ির শব্দ নেই। নিস্তব্ধ পাড়াগাঁর মেঘলা ভোরে প্রাচীন ছায়া ও ধানক্ষেতের মলিন আলো ও বাতাসের ভিতর দিয়ে হাজার বছর আগেকার জীবনানন্দ দাশের পাখিরা গান গেয়ে চলেছে। আহা! 'সুপারী' এই শব্দটা স্পষ্ট উচ্চারণ করে কি এক অদ্ভুত পাখি ছেলেবেলা থেকে আজও উড়ে যাচ্ছে। সত্যি, এ বাড়িতে আর কোন ভাড়া লাগে না। বিজয় ভাবল, এখানে এভাবে থাকায় কোন রকম মিটার ওঠে না ত!

বিজয়কে তার বাবা এই মিটার ওঠার প্রথম আঘাতটা করেছিল। বিজয় তখনকার মত এখনও বেকার জীবনে অবস্থিত একজন অবহেলিত বাংলাদেশের যুবক। সাধারণভাবে বি. এ. পাশ-এর পর চাকরি জীবনের ব্যর্থতা ভোগ করছে। তার ফলে কিছু কিছু নেশা জুটিয়েছে। আলস্য, স্মৃতিশক্তি বিলুপ্তি এসব দৈনন্দিন ত ঘটছেই। অহরহ। উপরন্তু চাকরি-না-থাকায় মেস-বাড়িতে বাবার কাছে যন্ত্রণা পাওয়া। কি একটি জরুরী কাজে বিজয় ভুল করেছিল। ভুল করেছিল বলে বাবা দেবেন্দ্র বলেছিল—"কলকাতায় থাকায় সব সময় একটা মিটার উঠছে, বুঝলে ছোকরা। তোমার আমার সকলেরই সব সময় মিটার উঠছে। দাম দেবে কে? কিছুই ত করতে পারছ না।"

বিজয় শুয়ে শুয়ে শুধু ভ্রমরের শব্দ শোনে। কখনও একটু বেশী ঘুমের দিকে চলে পড়ে বিজয়। আবার ঘুম পাতলা হয়ে যেতে যেতে বিজয় পাখির শব্দ শোনে, ভ্রমরের একটানা শব্দ, মায়ের সেই কোন রাত থেকে উঠে এখনও পর্যন্ত ধানসিদ্ধ করার শব্দ। ধানের গন্ধ আসছে। বুড়ির গলা শোনা যায়। কিংবা হয়ত বাড়ির পাশ দিয়ে অন্ধকার দেয়ালের কাছ থেকে ধানক্ষেতের দিকে মুখ করে ছাগল ভেড়াগুলো মাঠে বেরিয়ে পড়ল এ সবের শব্দ সে পাচ্ছিল মাঝে মাঝে।

বিজয় একবার উঠবে ভেবে যে মুহূর্তে সচেষ্ট হল ঠিক তখনই সে দেখল আজকের আকাশ মেঘলা হয়ে আছে। বিজয় ভাবল মেঘলা বলেই ভোরটা কি বড় হয়ে যাচ্ছে। বা বলা যেতে পারে এই অন্ধকারটা রাতের ক্লান্তিটা কি বড় প্রশস্ত হয়ে বিজয়ের চোখের ওপর পড়ে আছে। যেন একটি কচ্ছপের পিঠের ওপর বিজয় রুদ্ধ সময় নিয়ে শুয়ে রয়েছে।

বিজয় একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল, আবার বুড়ির ডাকে চোখ মেলল। তার মৃদু ও বেকার চোখের সামনে পুরনো লালচে খবরের কাগজে একটি সার্ভিস কমিশনের এমপ্লয়মেণ্ট নোটিশ বিরাট ঠাট্টার মত ঝোলে। দুর্গাপুরের ষ্টীল প্ল্যাণ্টের ছবি, বাঙালী খেদানোর যজ্ঞ। দুর্গাপুরে সার কারখানায় বাঙালী অপসারণের ভিত্তিতে ষ্টাফ রিপোর্টারের চটুল বিবৃতি। বিজয় ভাবল, এই গোটা ব্যাপারে সোনার বাংলাদেশ—বাঙালী ও স্বয়ং মুখ্য অমাত্য সকলেই যেন বিরাট বেকারত্বের ভূমিকা নিয়েছে। বিজয় বাংলাদেশের বুকের ওপর সাদা বালিস বিছানা ও চাদরের উপর একটি অপাংক্তেয় জীবের মত নিঃশব্দে শুয়ে থাকে।

বিজয় তার বাবার কথা ভাবে না। ছেলেদের চাকরী না হলে বাবার মনটা ছেলেদের প্রতি যেন কি হয়ে যায়। ঘুম থেকে একটু চোখ তুলে এই এক রকম হয়ে থাকা আকাশ, পৃথিবী ও দেয়াল ঘড়ির দিকে চেয়ে বিজয় ভাবল—মায়েরাই অবশ্য এইসব বেকার ছেলেদের প্রতি একটু সদয় হন। সদয় হন বলেই তবু মাঝে মাঝে বাড়িতে এসে প্রাণটা জুড়ায়। তাও খুব বেশী দিন নয়। বেশী দিন থাকলেই ত আবার পুরনো হয়ে যাবে।

কলকাতায় এই বেকারত্বের জীবনটা বড় প্রকট মনে হয়। এই দুঃস্বপ্নের কলকাতায় ভূগর্ভ রেল কিংবা সারকুলার রেলওয়ে হবে কি হবে না, ভাবতে ভাবতে কয়েক লক্ষ টাকা খরচ এবং হিন্দী প্রচার, কলকাতা পরিকল্পনার টাকা

পাবে কি পাবে না ভাবতে ভাবতে হিন্দী প্রচারে বিপুল খরচ হয়ে যাওয়া এবং গত যুদ্ধের অন্ধকারের মহড়ার ভিতর জনসাধারণ যখন অর্থ, সোনা ও রক্ত এবং স্বাধীনতার থেকে দামী পুত্রকে দিয়ে দিচ্ছে; এবং দেবার পর যুদ্ধের শেষে স্পষ্ট আলোয় যখন ছাখে—চারিদিকের স্টেশনের নাম বোর্ডএ পুরুষ্টু হিন্দী হরফ লেখা হয়েছে তখন বিজয়ের মনে হয় স্বাধীনতা জিনিসটিতে বাংলাদেশের যেন কোন ভূমিকা ছিল না, এই বাংলাদেশ স্বাধীনতা পায়নি।

পায়নি বলেই সংযুক্তরাষ্ট্রে কয়েক হাজার মন্ত্রী, উপমন্ত্রী ও কয়েক লক্ষ এম. পি. এম. এল. এ, ইত্যাদি মিলিয়ে এবং তৎসহ গিদ্ধোড় হিন্দী ছবির বেমক্কা নায়ক ও নগ্ন নায়িকারা ব্ল্যাক-মানির মত করে স্বাধীনতা হরণ করে নিয়েছে বলেই বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের জনসাধারণ এখনও সেই পরাধীন ও বেকার।

দুর শালা, দশ এগারো বছর চাকরি চেয়ে চেয়ে—বেকার, আর টুইশেনী করা, জীবনানন্দ দাশের অনুযায়ী কবিতা লেখার চেষ্টা আর কলকাতার কোন এক পাড়ার মাস্তান, 'বিজুদা', খেলার মাঠ, রেষ্টুরেণ্ট, একটি পড়ো পড়ো বাড়ির ছেলেকে টুইশনী করতে গিয়ে তার রোগা দিদির সঙ্গে তিন মাসের প্রণয়—ছেঁড়া চটি, ছেঁড়া গেঞ্জি ইত্যাদি।

আবার একটু পাশ ফিরে লাল শালুর ঝালর দেওয়া তালপাখায় হাত রেখে আচ্ছন্ন অবস্থায় বিজয় ভাবল—বাড়িতে এইত দু-তিনদিন আছি। এবার পুরনো হয়ে যাব। যাহোক এখানে বাবা নেই তাই রক্ষে। মা কিন্তু ওঠার জন্তে চেঁচাচ্ছে না। বুড়িটা চেঁচাচ্ছে। বুড়ি মানে—পিসিমার শাশুড়ি। সে এ বাড়িতে থাকে। কেউ নেই তার। বিজয় তাকে 'শাশুড়িমা' বলে। বুড়িটা—ওঠ, ওঠ বলে চেঁচাচ্ছে। তার কারণ বুড়িটা মানুষ চায়। কথাবার্তা বলতে, দুঃখের কথা শোনাতেই বুড়িটা আমাকে উঠিয়ে দিতে চায়। দুর, এই বুড়ি জাতটার দুঃখ শুনে আমার কি হবে। আমিই ত বুড়ো হয়ে গেলাম। অনেকদিন পর বাড়ি ঢুকলে মা বুড়িরা সকলেই কেমন নতুন নতুন ব্যবহার করে। দিনকতক থাকলেই আবার সব পুরনো ভোঁতা হয়ে যায়। আর ঠিক তখনই আমার নিজেকে একেবারে বেকার—চিরকালের একটি অসুস্থ বলে মনে হয়।

বুড়ি বিজয়ের মাকে 'শৈলী'—'ও শৈলী' বোমা বলে ডাকে। বিজয় ভ্রমরের শব্দ শোনে। ঘরের কুলুঙ্গি, ছবিতে, আয়নায়, আলনায়,

ভেন্টিলেটারে, তালপাখায়, ভ্রমর ঠোকর মারে।

ভোরের মেখলা প্রশস্ত দিনের ওপর বিজয় শুয়ে থাকে।

বুড়ি কাঁসার বাসনের মত গলায় শব্দ করে ডাকে—"ও বিজয়—বিজুরে—উঠে পড় না ভাই!" তারপর আবার বলে—"সোমত্ত মিনসে একটা এত বেলায় কি ঘুমোয়। শরীর খারাপ হবে যে—!"

বুড়ি একটু থামে। তারপর ডাকে "শৈলী! ও বৌমা—তোর বেটা আমার জন্যে ভেলি গুড় এনেছে? আমায় বলছেলো যে শাশুড়িমা তুমি গুড় খেও। তা বেঁচে থাক ভাই—! তুমি চাকরি পাও তাড়াতাড়ি। ধুলো মুঠি ধরতে কড়ি মুঠো ধরো!" বুড়ি গলা ঘড়ঘড় করে বলে—"দেশের মুখে ঝাড়ু মারি—আহা, অমন ছেলের চাকরি হয়নে রে একটা। এর থেকে ইংরেজ রাজত্ব অনেক ভাল ছেলো। ঘন্টি নেড়ে নেড়ে লোক ঢোকাত। কত মুখ্যু লোকে চাকরি করেছে ত্যাখনকার দিনে।"

শৈলী ধানসেদ্ধ করতে করতে বুড়ির কথা শুনছে বা শুনছে না। কোন রাতে উঠেছে। তখন আকাশে কুমড়ো ফালির মত সপ্তমীর চাঁদ তেঁতুলগাছের তলায় টুপ করে ডুবে গেল।

শৈলী বলল, "জানেন মা, বিজু বলেছিল নাকি—পাড়াগাঁর শেষরাতের চাঁদ দ্যাখেনি। তা আমায় বলেছিল মা তুমি দেখ ত চাঁদ দেখবো।" শৈলী হাসে। "ও, যা ছেলে, আর যা ঘুম। চাঁদ দেখবে কে বলুন।"

শৈলী কথা বলতে বলতে থেমে যায়। বুড়ির উত্তর নেই। শৈলী ঘাড় ফিরিয়ে দেখে নেয়। হাসে। শৈলী ছেলের দিকে তাকিয়ে ঘাড় ফেরায়। বুড়ির চোখ ঘোলাটে। সামনের দিকে হাত বাড়িয়ে বুড়ি কম্বল খামচাচ্ছে। কম্বলের ভিতর বিজয়। বিজয় কম্বল জড়িয়ে বুড়ির সামনে জুজুর ভয় দ্যাখানর মত বসে আছে। বুড়ির চিৎকারে আর শুয়ে থাকতে পারল না বিজয়। বুড়ি কম্বলটা শক্ত হয়ে আছে কেন—ঠিক বুঝতে না পারায় সামনে ঘোলাটে চোখ নিয়ে হাত বাড়াতে বাড়াতে এগিয়ে আসছে। শৈলী আগুনের সামনে দাঁড়িয়ে হাসে।

বুড়ি শুকনো হাত লম্বা করে ভয়ে ভয়ে সরে-যাওয়া কম্বলটা ধরতে যায়। উবু হয়ে মেঝেয় এগিয়ে যাচ্ছে। ভয়ে ভয়ে হতভম্বের গলায় ডাকে—

শৈলী—অ শৈলী—!" বুড়ির চেহারা কেমন ভয় পাওয়া শক্ত প্রাচীন দেওয়ালের মত ছম ছম করে।

শৈলী জোরে হেসে ফ্যালে—!

মেঘলা আলোয় বনের ভিতরের রাস্তাটা কেমন যেন কালো হয়ে গেছে। পথটা বাগানের ভিতর দিয়ে চলে গেছে কতকগুলি ঘরবাড়ির কাছে। মাঠের ধার থেকে উপিন আসে। উপিনের হাতে গাড়ু। কানে পৈতে ঝোলা। সুন্দর প্রৌঢ় চেহারা, চুল সাদা, শ্মশ্রুধারী। ধুতির কোঁচার খুঁট গায়ে সামান্য পড়ে আছে। গম্ভীর, চাকরির অবসর গ্রহণের পর আরো স্থির শান্ত হয়ে গেছে উপেন!

বাগানের ভিতর দিয়ে চলতে চলতে উপিন বিজয়কে দেখে দাঁড়ায়। একটি পড়ে যাওয়া অর্জুনগাছের ডালপালার ভিতর দিয়ে উপিনকে দেখা যায়।

"কবে বাড়ি এসেছো।" উপিন গম্ভীরভাবে বিজয়কে জিজ্ঞেস করে।

"দিন তিনেক হল এসেছি জ্যাঠামশাই।"

"তোমার বাবার খবর কি!"

"ভাল।"

"তুমি চাকরি পেলে?"

"না, এই সেদিনও দুটো ইণ্টারভিউ দিয়ে এসেছি। এখনও কোনো খবর পাইনি।"

"ইণ্টারভিউ, কোথায়?"

"একটা গভর্ণমেণ্ট কনসার্ন, আর একটা প্রাইভেট ফার্ম।"

উপিন কিছুক্ষণ এমনি দাঁড়িয়ে থাকে। গাছের পাতার শব্দ হয়। উপিন গলায় শব্দ করে আবার বলে, "দেবেন তার অফিসে একটা লাগিয়ে দিতে পারছে না। অফিসারের সঙ্গে শুনেছি ত খুব দহরম মহরম। একটু এপ্রোচ করতে দোষ কি।"

বিজয় কলকাতার যন্ত্রণার মত হাসে।

উপিন কথা টানে আবার। "তখন কত সব য়ুরোপিয়ান ফার্ম ছিল। কাজ ছিল, সম্মান ছিল, বেনিফিট ছিল যথেষ্ট। সেসব দিন কোথায় যে চলে গেল!

কিছু লোকের চাকরি ত করে দিয়েছি।" উপিন আফশোষ করতে থাকে। তারপর বিজয়ের হাসিতে উপিন ওর দিকে শাদা চোখে তাকায়।

বিজয় বলে, "এখন আর সে য়ুরোপিয়ান সাহেব ত নেই। যে সব সাহেব আছে তাদের ঘরেই দু দশটা নন-ম্যাট্রিক ছেলে বসে আছে। তারা কি করে আমার চাকরি করে দেবে বলুন!"

উপিন বর্তমানের কথায় হাসতে গিয়ে আবার গম্ভীর হয়। "বুঝেছি সবই, গণ্ডগোল সব জায়গায়। আমাদের সময় একরকম কেটেছে আর তোমরা—"। উপিন কথা থামায়। আগের প্রসঙ্গ ধরে। চাকরি পেলে গভর্ণমেণ্ট সার্ভিস করবে না প্রাইভেট?"

"প্রাইভেট। বোনাস-টোনাস পাওয়া যাবে। আমার গভর্ণমেণ্ট সার্ভিসে ঘেন্না ধরে গেছে বাবাকে দেখে।"

উপিন বলে, "না, না, ওসব ত অস্থায়ী চাকরী। গভর্ণমেণ্ট সার্ভিসের তবু একটা স্থায়িত্ব ত রয়েছে। ওসবে মাথা খারাপ কোরো না।"

বিজয় ভাবে, কোনটি স্থায়ী, এই বেকারত্ব, না, গভর্ণমেণ্ট সার্ভিস, না প্রাইভেট ফার্ম। ভাবতে ভাবতে বনের ভিতর উপিনকে বিদায় দিয়ে নিজে গাছপাতার ভিতর অন্যদিকে শব্দ করে চলে যায়।

বাড়িতে বিজয়ের মা শৈলী ও বুড়ি কথাবার্তা বলে। বিজয়ের একটা সম্বন্ধ এসেছিল কিছুদিন আগে। কিন্তু পাত্র চাকরি করে না বলেই রাজী হয়নি কেউ। আগেকার দিনে এসব চলত। বর্তমানে অর্থনৈতিক দিকটা ত ভাবতেই হবে। বিজয়ের তিন দিদির বিয়ে অনেকদিন আগে হয়ে গেছে। আজকালকার দিন হলে কে আর তাদের বিয়ে দিত। বিয়ে দেবার সামর্থ কই। লেখাপড়া শিখিয়ে চাকরিতে ঢুকিয়ে দেয়া। ব্যাস।

মেয়েদের চাকরিতে এতখানি বাধা নেই। শৈলী বুড়িকে বলে, "জানেন মা, আমার কি ছেলের বৌ আনতে সখ যায় না। কিন্তু কি করব, চাকরি ছাড়া একটা মেয়ে গলায় ঝুলিয়ে দি কি করে। শৈলী গলা পাল্টে, থেমে বলল, "জানেন মা, আমার মাঝে মাঝে মনে হয় বিজয়টা আমার আর একটি মেয়ে হয়েই রইল। যেন সেই আইবুড়ো সোমত্ত মেয়ে, গলার কাঁটা।"

গাছপালার ভিতর দিয়ে বিজয় মেঘলা আলোয় হাঁটতে থাকে। পথ চলতে চলতে বিজয় ভাবল—বাড়িতে দু-তিনদিন হল আছি। কোনদিন ত অত্যন্ত ছেলেমানুষের মত হয়ে পড়িনি। তবে আজকেই বা কেন বুড়ির কাছে কম্বল জড়িয়ে অমন ব্যাপারটা করতে গেলাম। আমি এতখানি নিকট ও ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গ হয়ে পড়তে চাই না। ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ কেনা হতে পারে। পরের বাড়ি কি নিজের বাড়িতে কে না এমনি ছেলেমানুষী ঢং দেখায়। কিন্তু সবটুকু করা গেলেও কতটুকু করা উচিত কতটুকু উচিত নয় সেটাই ভাবা দরকার। এতে আমি বাড়ি ও বাড়ির লোকের কাছ থেকে যে শক্ত ও বয়েসের চরিত্রটিকে হারালাম, ছেলেমানুষ করে দিলাম—এটুকুন কি আর কোনদিন ফিরে আসবে। বিজয় ভাবছিল, আমার পুরনো হয়ে যেতে ভীষণ ভয় লাগে। এমনিতেই যখন আমি একটি একঘেয়ে বেকারত্বের পুরনো জীবনের গ্লানি বহন করে নিয়ে যাচ্ছি এরপরেও নতুন করে মানুষের কাছে পুরনো হয়ে যেতে চাই না। বিজয় পথে দুঃখ করতে করতে গম্ভীর হয়। নির্মলদের বাড়ির ভিতর ঢুকে পড়ে বিজয়।

নির্মলদা এখুনি কোথাও বেরিয়ে গেছে। বিজয় নির্মলদাকে খুঁজতে গিয়ে একেবারে বৌদির মুখোমুখি হয়। লতিকা হাসে, "ঠাকুরপো, কবে বাড়ি এসেছো আজকে দেখা করার সুবিধে হল যে!"

বিজয় বলে, "এসেছি দু-তিনদিন, আজকেই মাত্র বেরিয়েছি বৌদি, বিশ্বাস করুন।"

বৌদি মুখ ভেংচে চলে যাবার আগে আস্তে বলে, "কি করে সন্ধান পেলে যে তোমার নায়িকাটি এসেছে!"

বিজয় আশ্চর্য হয় "নায়িকা এসেছে?"

"হ্যাঁ," বৌদি হাসে। "ধীরা এসেছে বাপের বাড়ি। এর, আগের মাসেই এসে পড়ত। ওর শ্বশুরবাড়ির লোকরা পাঠাল না। এক সপ্তাহ হল এসেছে। বৌদি কথা বলেই ঘুরে পড়ে বলল, দাঁড়াও ঠাকুরপো, আমি চট করে আসছি।" লতিকা দরজার বাইরে চলে যায়।

বিজয় তক্তোপোষে বসে পড়ে। ধীরা এসেছে এ বাড়িতে, ধীরা লতিকার ননদ। লতিকা জানে একমাত্র এ ঘটনাটা। ছাত্রজীবনে ধীরার সঙ্গে বিজয়ের যে গভীর প্রণয় চলছিল, পাড়াগাঁর শান্ত আবহাওয়ার মধ্যে লতিকা এ-বাড়িতে আসার সঙ্গে সঙ্গে সে ঘটনাটি দু'জনের কাছ থেকে সে জেনে নিয়েছিল। জেনে নিয়েছিল তাই দুজনের মাঝখানে বসে লতিকা এই

ঘটনাকে সুন্দরভাবে গ্রহণ করত। ধীরা অপূর্ব রূপসী মেয়ে। স্বাস্থ্যবতী, সুন্দরী। চোখ নাক মুখের একটা ঠাস-বুনোন ছিল। বিবাহের পর বিজয় একবার দেখেছিল ধীরাকে। তখন শরীর খারাপ। শ্বশুরবাড়ি- বেলায় খাওয়া। বড় সংসার। সংসারে মনোমালিন্য, স্বামীর উত্তেজনার ভিতর বসে একটি সন্তান প্রসবের পর বিজয় দেখেছিল ধীরা অনেকখানি নষ্ট ক্ষয়িষ্ণু হয়ে গেছে।

লতিকা নারকেল নাড়ু মুড়ি নিয়ে আসে। বিজয় গোগ্রাসে খায়। লতিকা কথা বলে। এমন সময় দরজা গোড়ায় ধীরাকে ছাখে বিজয়। ধীরাকে যেন চেনা যায় না।

বৌদি বলে, "বিজয় ঠাকুরপো, কি দেখছো—"।

"কাকে" ?

"ধীরাকে।"

ধীরা শান্ত শুকনো মানুষের মত ঘরে এসে পুতুলের মত বসে পড়ে বাচ্চাকে ঘুম পাড়ায়। একটাকে কাপড়ের ভিতর থেকেই স্তন দেয়।

বিজয় আড়ষ্ট হয়ে যায় ধীরাকে দেখে। ধীরার তিনটি ছেলে-পুলে হয়ে গেছে। আবার অন্তঃসত্ত্বা। বিজয়ের গা রি রি করে ওঠে ধীরাকে দেখে।

বৌদির গলায় শব্দ ওঠে—"ঠাকুরপো, শুনছো!"

"কি।"

ধীরা যেন দুর্বলতায় তাকাতে পারে না। মেঝেয় বসে।

বৌদি বলে, "ঠাকুরঝিকে একেবারে আখের ছিবড়ে বানিয়ে শেষ করে দিয়েছে আমাদের জামাই।"

বিজয় ধীরার দিকে কষ্টে তাকায়—"ধীরা, তুমি যে নিজেকে নিঃশেষ করে ফেলেছো।"

"বিজয়দা," ধীরা নিঃশ্বাস নিতে নিতে বলে—"ওদের বাড়ি বেলায় খাওয়া বিরাট গুষ্টি, অম্বল হচ্ছে বেলায় খেয়ে খেয়ে। ওকে বলি, ও শুনতে চায় না। ছেলে-পুলে আর ভাল লাগে না। যেন মরে যাচ্ছি।"

বিজয় কিছুক্ষণ বসে থেকে যেন ধীরার দিকে ঘাড় তুলতে পারে না। যেন তার অতীত দংশন করছে, বর্তমান সামনে হাঁপাচ্ছে। বিজয় ধীরার ভিতর থেকে অনেকদিন আগেকার অতীতের লাবণ্যময়ীকে আর হাজির করতে পারে না।

সমীরণের সাইকেলের সামনে বসে কিছুক্ষণ বেড়িয়ে আসে বিজয়। মেঠো পথে চলতে চলতে কথাবার্তা হয় সমীরণের সঙ্গে। সমীরণ লেখাপড়া মাঝপথে থামিয়ে ব্যবসা ধরেছে। সমীরণকে দেখে বিজয় বন্ধু-বান্ধবদের খবর নিতে চায়।

সাইকেলে দুজনে চলতে চলতে কথাবার্তা বলে।

বিজয়—অসীম এখন কি করছে।

সমীরণ—সি, এ, পাশ করে গত বছর বিলেত গেছে। ওখানেই বিয়ে করেছে। অসীম ওখানেই থেকে গেল।

সমীরণ বিজয় চলতে থাকে।

—আর বীরেন কি করছে এখন। ও তো টেকনিক্যাল পড়েছিল—

—হ্যাঁ, ও তো প্রায়ই একটা ফার্ম ধরছে, একটা ছাড়ছে। রিসেণ্টলি শুনলাম একটা ফার্মে একটা জানোয়ার তেলেগু অফিসারকে কি কারণে জুতোপেটা করেছে।

—আঁা, জুতো পেটা করেছে। বিজয় গোঁয়ারের মত চেঁচায়। চমৎকার। এটুকুই শুনতে চেয়েছিলুম। বিজয় উৎফুল্ল হয়। বলে, জানিস, বীরেনটা ছাত্রজীবনে অমনি গোঁয়ার-ই ছিল। বীরেনটার সঙ্গে দেখা করার দরকার আমার। খুব উপযুক্ত কাজ করেছে সে।

দুজনে হাসতে হাসতে সিগারেট ফেলে দেয়। সাইকেল মেঠো রাস্তায় ওঠা-নামা করতে করতে বেয়ে চলে। মেঘলা দিনটা যেন বিজয়কে অপরিচিত করে রাখে। বিজয় আস্তে গলায় শব্দ করে—"সমীর, থাম, আমি এখানে নামব।"

"কোথায় যাবি।" সমীরণ সিগারেট বার করে।

"চিত্রাদের বাড়ি।" অনেকদিন যাইনি। বিজয় দেশলাই জেলে দেয়।

দুজনে সিগারেট ধরানোর পর সমীরণ হাসে, জিজ্ঞেস করে—"কেন রে চিত্রাদের বাড়ি কেন?"

"এমনি, একটা কবিতা লিখেছি। ওদের বাড়ির সবাই আমার কবিতা শোনে।"

"ধোৎ কবিতা শোনে, কবিতার জহুরী সবাই, আসলে কি ব্যাপার বল না।" সমীরণ উৎসুক হয়।

"আসলে কিছুই নয়," বলে বিজয়ও উদ্দেশ্যটা বলার জন্য থামে। জানিস সমীর, তুই অন্ততঃ আমার এই চাকরি না থাকার দুঃখটা বুঝবি। চাকরি না থাকার ফলে আমি মনে প্রাণে যে কতখানি হেরে যাচ্ছি প্রতি মুহূর্তে। প্রতিটি সময় আমাকে এই পরিবেশ অশান্ত করে তুলছে। একজন যুবক ছেলে দিনের পর দিন শুধু কলকাতায় বাপের ঘাড়ে বসে থাকা, টুইসেনী করা—এসব করতে গিয়ে যে কত হেরে যাচ্ছি। মনের মধ্যে নানান বিকার উদয় হচ্ছে। তাই লক্ষ্য করবি আমি যে বাড়িতে যাই---তারা কেউ অন্ততঃ চাকরি করে না। যারা চাকরি করে না, যাদের বাড়ি কেউ ওসব কথা ভাবে না সেখানে দাঁড়িয়ে বসে আমি বরং এই দুঃখ, নিজের চিন্তাকে ভুলতে পারি।"

সমীরণ হয়ত কিছু বিশ্বাস করল, কিম্বা করল না। আর কোন কথা না বলে সমীরণ বলল, "যাক এখন ক'দিন বাড়িতেই আছিস!"

বিজয় বলল, "তার কোন ঠিক নেই। আজও চলে যেতে পারি। কিম্বা থেকেও যেতে পারি।"

সমীরণ চলে যায়।

কোনদিন জ্যোৎস্নার ভিতর এমনি ভিজে যাব
আর কিছুতেই ফিরিব না—
তোমার মনের কোরকের সব ভালবাসা—দূরে থাক।
অন্ধ হব না, আমি বরং আঁধারে থেকে যাব।

এখন হিসেবী আমি অন্ধকারে প্রণয়ের মৃতদেহ নিয়ে
কোনদিন কোন শেফালীর সঙ্গে আর—
কিম্বা খেলার ছলে বিশ্বস্ত সুযোগ ; ভুলেও দেব না আমি।
উৎসুক হব না কোন অপর্যাপ্ত রমণীর দেহে।

আমার প্রেমের কথা ফেলে দাও সমুদ্র তীরের বালিয়াড়িতেই
বরং সেখানে মৃত্তিকায় পড়ে রব
শুধু শঙ্কা বা ভয়—
কোনদিন জীর্ণ হয়ে বৃদ্ধ হয়ে যাব।

কবিতা পড়া শেষ করে বিজয় চিত্রার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করল—"কি হল চিত্রা কেমন লাগল ?"

চিত্রা হারমোনিয়ামের কাছে বসে চুল বিনুনি করে। চিত্রা বলল, ভাল, আপনার এ কবিতাটা বেশ পরিষ্কার বুঝতে পারলাম। "কথা বলার পর চিত্রা বিনুনি করা ছেড়ে গ্যায়। ওর পিছনে জানালার আলো। ফলে চিত্রার সম্মুখ ভাগ অন্ধকার দেখায়। চিত্রা বলল, "বিজয়দা আপনি দিনরাত বসে কবিতা লেখেন না কেন !"

বিজয় বলল, "এ কথাটাই চিত্রা তুমি বড় ছেলেমানুষের মত বললে !"

চিত্রা থেমে যায়। চুল বিনুনি করে।

বাড়ির ভিতর চিত্রার দুজন বৌদি ঠাকুমা পিসিমা চিত্রার মা সকলের কথা শোনা যায়। বৌদি ইতিমধ্যে চা দিয়ে যায়। বিজয় আর চিত্রা এ-ঘরে বসে গল্প করে। ঘরের দরজা খোলা থাকে। সব দেখা যায়। বাড়ির শব্দ ভেসে আসে।

বিজয় বলল "আচ্ছা চিত্রা, তোমার বাড়িতে হারমোনিয়াম আছে ত ?"

চিত্রা বলল, "হ্যাঁ, তা আছে।"

"তুমি গানও জান।"

"জানি !" চিত্রা মুখের দিকে তাকায়। চুল বিনুনি বন্ধ রাখে।

বিজয় বলল, "তাহলে তুমি দিনরাত গান কর না কেন।"

চিত্রা থেমে যায় ! চুল বিনুনি করে।

বিজয় বলে, "ঠিক একই কারণে আমি সব সময় কবিতা লিখতে পারি না।"

চিত্রার দু বোন, ভাই ও বৌদি এসে ঘরে ছায়া ফেলে। বৌদি বলে "বিজয় ঠাকুরপো পান চলবে ?"

"সাজছেন নাকি।"

"হ্যাঁ।"

"তবে দিন।" বলেই বিজয় চিত্রাকে গান গাইতে বলে।

বৌদি বিজয়কে পান দেয়।

বিজয় বলে, "জর্দা আছে।"

বৌদি হেসে ওঠে, "একি ঠাকুরপো, তুমি দেখছি কোন নেশা বাদ দাওনি।"

বৌদি হাসে। আর ঠিক সে সময় চিত্রা উঠে পড়তে যায় হারমোনিয়ামের কাছ থেকে।

বিজয় বৌদির সামনেই চিত্রাকে জড়িয়ে ধরে—"কি, পালিয়ে যাচ্ছ—কোথাকার বদমায়েস একটা। না তোমাকে গান গাইতেই হবে।"

চিত্রা হাত ছাড়িয়ে নিতে চায়।

বৌদি চিত্রা ও বিজয় দুজনকে দু রকমের ইসারা করে।

দরজার আরো কিছু ছায়া পড়ে। হারমোনিয়ামে কে রিড টেপে এ সময়।

ঘরের অবস্থাটা অন্য রকমের হয়ে যায়। চিত্রা শাড়ি ঠিক করে নিয়ে দাঁড়ায়। ঘরের মধ্যে অন্যান্য বয়েসের লোকজনে ঘরের আবহাওয়া পাল্টে যায়।

বিজয় বলল, "বৌদি, আমার চাকরির অভিজ্ঞতা একটু শুনবেন।

বৌদি বলল—"অভিজ্ঞতা বলতে"—

"হ্যাঁ, একটা ঘটনা বলছি শুনুন! খুব ভাল লাগবে।"

ঘরের সকলেই বিজয়ের গল্প শুনতে ভীড় করে ধরে।

বিজয় বলতে শুরু করে।

"সেদিন খিদিরপুর এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে নাম রেজিষ্ট্রেশনের পর খবর নিয়ে একটি যুবক ট্রাম লাইনের ধারে ট্রামের অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছে। সুদূর গ্রাম থেকে এসেছে। প্রায় দু' বছর হ'ল আই. টি. আই থেকে পাশ করার পর যুবকটি এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ যাতায়াত করছে। চাকরির আর পাত্তা নেই। সেদিন যুবকটির মন খারাপ। কারণ ইতিমধ্যে বিয়ে করেছে। একটি বাচ্চা মেয়েও হয়েছে। সাংসারিক ব্যাপারে মন অতিষ্ঠ হয়েছিল। এমন সময় দুজন ভদ্রলোক যুবকটির পাশে এসে দাঁড়াল।

গল্পের মাঝখানে বৌদি ও চিত্রা একসঙ্গে জিজ্ঞেস করল, "দুজন ভদ্রলোক কে!"

বিজয় বলল, "আঃ, দাঁড়াও না বলছি। দুজন ভদ্রলোক পরিচয় দিল—যে তারা উত্তর-দক্ষিণ রেলওয়ের কোন এক ডিপার্টমেণ্টের অফিস সুপারিনটেনডেণ্ট। যুবকটিকে তারা জিজ্ঞেস করল—কি আজও চাকরি হল না আপনার? যুবকটি বলল, না, কতদিন যে ঘুরছি, হল না। তা কোথায় যাবেন এখন—বলেই ভদ্রলোক দু'জন যুবকের দিকে আকৃষ্ট হল। যুবকটাকে বলল, আমরা আপনাকে একটা চাকরি দিতে পারি। কিন্তু কিছু খরচ করতে হবে। কত টাকা? যুবক জিজ্ঞেস করতেই ভদ্রলোক দুজন বলল, গোটা তিরিশ হলেই হবে। সেটা অবশ্য চাকরির পরে দিলেও ক্ষতি নেই।

যুবকটি রাজী হয়ে গেল। তাহলে চলুন, আজকেই মেডিকেল হবে। উত্তর-দক্ষিণ রেলওয়ে হেড অফিস ফুলতলায় চলুন। যুবকটি ভদ্রলোকের সঙ্গে বাস থেকে নামতেই গেটের ধারে দাঁড়িয়ে পড়ে একজন। একজন ভদ্রলোক রেলওয়ে ডাক্তারখানার দিকে এগিয়ে গেল। একজন ভদ্রলোক বলল, আপনার ত মেডিকেল হবে। তা সেখানে ত সবই খুলতে হবে। তার চেয়ে এখানে জিনিসগুলো খুলে রুমালে বেঁধে ওটা আমাকে দিন। ঘড়ি আংটি বোতাম টাকা। আর আপনি চলে যান ওই ভদ্রলোকের সঙ্গে। ওই ভদ্রলোক আজই মেডিকেল করিয়ে দিতে পারবেন। আমি দাঁড়িয়ে আছি। কিছু ভয় নেই আপনার, যান, মেডিকেল করে আসুন। বলেই যুবকটি সন্দেহ করতে করতে বিশ্বাস আনতে আনতে যেই ডাক্তারখানায় ঢুকেছে—"

গল্পের শেষে বৌদি, চিত্রা চিত্রার এক কোন চেঁচিয়ে উঠল, "ওই যা"—"কি বোকা রে বাবা,"—"জোচ্চোর লোক দুজন।" "নিশ্চয় পালিয়েছিল।" "তারপর কি হল।" চিত্রা বলল, "এমন বোকা লোকও থাকে!"

গল্প আর শেষ করতে হল না বিজয়কে। চিত্রা ও বৌদি নষ্ট করে দিল গল্পটা। বিজয় জল চাইল বৌদিকে। "এক গ্লাস জল।"

ঘর ফাঁকা। কেউ নেই। ঘরের ভিতর আলোয় নিস্তব্ধ হয়ে বিজয় একটি পুরনো খবরের কাগজে পাত্র-পাত্রীর বিজ্ঞাপন দেখছিল। পাত্রীর বিবাহের বিজ্ঞাপন বাতাসে ঝুলছে। বিজয় সেই গল্পের যুবকটি শেষ অবস্থার মত যেন বসে থাকে।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে বিজয় মাঠের ওপর দিয়ে হাঁটতে থাকে। বাড়িতে মায়ের ওপর সে রাগ করে চেঁচিয়ে এসেছে। মা কি একটা কবচ ধারণ করতে বলেছিল—মন-মেজাজ ভাল থাকবে, চাকরি হবে ইত্যাদি। বিজয়ের সে কবচের ওপর বিশ্বাস নেই। বিজয় মনে মনে অনুযোগ করতে করতে মাঠের ওপর চলতে থাকে।

কিছুক্ষণ চলতে চলতে সে অম্বি-কে যেন দেখতে পায় না। অম্বিও মাঠে বেরিয়ে এসেছে। কিছুক্ষণ পর বিজয় অম্বির সঙ্গে কথা বলে। "অম্বি, তুই আর জগন্নাথের বাড়ি ফিরে যাবি না?"

"না," বলে অম্বি বাছুর খুঁজতে থাকে। সে বাছুর খুঁজতেই পড়ন্ত বেলায় বেরিয়েছে। বাছুরটাকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। অম্বি বাছুর খুঁজতে খুঁজতে অনেকদূর নির্জন মাঠে এসে পড়েছে। ঠিক ছেলেবেলার মত। অম্বালিকা বিজয়কে দেখে নেয় একবার।

বিজয় অম্বালিকার পাশাপাশি চলতে চলতে অম্বির বিবাহিত জীবন সম্পর্কে কথাবার্তা বলতে চায়। "অম্বি, জগন্নাথ তোকে কি বলল?"

অম্বি বিজয়ের কথার উত্তর দেবার আগে মাঠের চারপাশ তাকিয়ে বারকয় "বুধি বুধিরে—এ-এ—এ" বলে ডেকে নেয়। তারপর বাবলার বন, ও তালগাছ, বাঁশগাছের ঘন সংসার দেখে নেয়। দুপাশে ছোট ছোট তালগাছ, বাবলার কাঁটা ও হলুদ ফুল জোনাকির মত থুকথুকে হয়ে আছে। অম্বি এক মুহূর্তে সবকিছুতে চোখ বুলিয়ে বিজয়ের দিকে গলা তুলে কথা বলে।

"কি বললে বিজুদা, কি বলছিলে যেন শ্বশুরবাড়ির কথা!"

"তুই শ্বশুর বাড়ি আর গেলি না!" বিজয় ওর পিছন পিছন চলে।

"না, যাব কি, যাওয়া শেষ করে এসেছি।"

"সব শেষ। মানে, জগন্নাথ তোকে কি বলল।"

"ডাইভোর্স না কি বলে—তাই করে এলাম। আমার আর দোষ কি। পুরুষ মানুষ হয়ে বিবাহিত জীবনে যা খুশী করবে। বাইরে অন্য একটা খারাপ মেয়েকে নিয়ে ফুর্তি করবে। আমি আর সহ্য করতে পারলাম না। চলে এলাম।"

বিজয় ওর শরীরের দিকে তাকায়। অম্বি এ পর্যন্ত বলেই মাঠের দিকে কাঁটা বন গাছপালার ভিতর দিয়ে ছুটে বাছুর ধরতে চলে যায়। ওর নরম পায়ের পেটির ওপর শাড়ি তোলা। যেন যুগ্ম ডাবের মত ওর পাছা ভারী দেখায়। বিজয় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওর বর্তমানের চেহারায় অহঙ্কার দেখতে পায়। ওর শরীর মেঘলা আলো ঝাপটা মারে।

বনের ভিতর জড়িয়ে যাওয়া বাছুরটাকে ধরে অম্বি একবার বিজয়কে দেখে নেয় এক ফাঁকে। ও তখন গাছের গুঁড়ির দিকে নিবিষ্ট হয়ে গুঁড়িতে নখ দিয়ে খুঁটছে। অম্বি তখন মেঘলা পড়ন্ত বেলায় বাছুরটাকে খুঁজে পেয়ে গাছের আড়ালে বেঁধে রেখে খালি হাতে এসে দাঁড়াল। বনের ভিতর থেকেই বিজয়ের গলা শুনতে পেয়েছিল। "কাজটা ভাল করলি না অম্বি। এখন তোর বাবা নেই। সারা জীবনটা তোর পড়ে আছে। বিধবা মা মারা গেলে কে তোকে দেখবে?"

"কেন তোমরা ত আছ!" খিল খিল করে বাবলা গাছের ভিতর থেকে হেসে লুটিয়ে পড়ে অম্বি।

"ওসব বাজে কথা রাখ। তুই কেন নিজে এ কাজ করে ফেললি?" গাছপালার ভিতর দিয়ে হাঁ-করা তালপাতার কুঁড়ে ঘরটার দিকে এগোয় আস্তে আস্তে।

"আমি নিজের ইচ্ছায় ত করিনি! পাড়াগাঁর মেয়ে বলে, বোকা ভেবে দু বছর যা খুশী করেছে। আমি প্রথম প্রথম সন্দেহ করে বারণ করলাম। শুধরাবার সময় দিলাম, ও শুনল না। আমাকে মার শুরু করল। তাও সহ্য করলাম। শেষে আমি আমি অতিষ্ঠ হয়ে জিজ্ঞেস করলাম তুমি কি করতে চাও। তখন ও নিজেই আমাকে ছেড়ে দিতে চাইল। বলল খরচ দেব। তুমি চলে যাও। চলে এলাম! এখন মাসহারা পাচ্ছি। বেশ চলে যাচ্ছে। কষ্ট কিসের। কিসের সংসার আর।"

কথা বলতে বলতে ওরা কুঁড়েঘরের কাছে হাজির হয়। বিজয় দেখে অম্বির শাড়িতে চোরকাঁটা ছেয়ে গেছে অজস্র। হাঁ করা শূন্য কুঁড়ের বাইরে দাঁড়িয়ে বিজয় জিজ্ঞেস করতে যায় "এখানে কেন—কি হবে এখানে অম্বি।" কথা বলার সময়টুকুতে অম্বি ছোট্ট কুঁড়ের মাচায় বসে পড়ে। মেঘলা আলোয় বিষণ্ণ মুখও শাড়ির নৈকট্যে সমস্ত অপাংক্তেয় চেহারা বিজয়ের ছুঁয়ে দিতে ইচ্ছে হয়। যেন কোনদিন জয় করার আনন্দ ছিল না জীবনে। চারদিক থেকে কে তাকে হারিয়ে দিচ্ছিল বার বার। এখন যেন অম্বি একবার তাকে জিতিয়ে দেবার জন্যে মাচায় শব্দ করল। বিজয় প্রথমটা আড়ষ্টের মত উচ্চারণ করল—"তোমার শাড়িতে কী চোরকাঁটা।" বলতে বলতে বিজয় চোরকাঁটা বাছে। অম্বি অন্যমনস্ক হয়ে যায়। বিজয়ের বার বার ওর ফর্সা পায়ের পেটীতে হাত লেগে যায়। বিদায় কথা বলতে চায়—পারে না। বিজয় একবার ওর বাছুরটির কথা চিন্তা করতে চায়—ভাবতে পারে না। হয়ত বাছুর হারিয়ে যাওয়াটা কিছুই নয়। কিম্বা বাছুরের জন্য কষ্ট করতে আর ও চায় না। বাছুর খুঁজে পাওয়ার আনন্দ নেই ওর দুচোখে। বিজয় অম্বিকে নিয়ে মাচায় শুয়ে থাকে। বুকের হাড়ের ওপর শব্দ করে তুলে ধরে, চোখের দিকে সজাগ চোখে তাকায়। অম্বির কালো ঘন চোখে ভ্রূতে কেমন শব্দের যন্ত্রণার সূচনা রয়েছে। কাজটা তুই ভাল করলি না অম্বি, বলতে বলতে সেই অবহেলিত শেষ রাতের চাঁদের মত মুখে চুমু খায়। মুখের লাবণ্যে চাঁদের মত প্রহার করে। বিজয় মাচার

মচমচে শব্দে কান রেখে অনুভবে স্মৃতিতে স্বপ্নের মত কথা বলে, "এ ঘরে একটা লোক থাকত বাউণ্ডুলে জানিস।" "জানি।" "লোকটা যে ঘর সংসার ত্যাগ করে এসেছিল—কুঁড়েটা বানিয়েছিল মারা গিয়েছিল ওই বাঁশবনের ভিতর সে কথা জানিস।" অম্বি বলে "জানি সব জানি। আমরাও ত এখন বাউণ্ডুলে হয়ে গেছি।" অম্বি দেহে যন্ত্রণা পায়। দাঁত দিয়ে সেই যন্ত্রণাকে সহ্য করে মাচায় উবুড় হয়ে শুয়ে পড়ে কিছুক্ষণ নিজেকে দমন করতে চায়। বিজয় অন্ধকারের ভিতর এলোমেলো করে ওকে ছেড়ে দেয়। তারপর পাখির মত হাঁপাতে হাঁপাতে দুজনে পথ চলে।

বিজয়ের এতক্ষণের চাকরি না-পাওয়া শক্ত কঠোর মুখখানা যেন নিষ্ঠুরতায় আঘাত করে অনুশোচনা ভোগ করে। বিজয় ফেরার পথে অন্ধকারে যেন আর অম্বির শরীরের দিকে তাকাতে সাহস পায় না। ঘাড় নিচু হয়ে যায়। এ যেন অনেকখানি হেরে গিয়ে সেই গ্লানি কলঙ্ক নিয়ে বাড়ি ফিরে আসছে বিজয়। বিজয় এক মুহূর্ত আড়ষ্ট হয়ে গিয়ে বলে ওঠে, "অম্বি—চাকরি পেলে তোকে বিয়ে করব। তুই রাজী হবি।"

ফণীমনসার জঙ্গল, সাদা শক্ত ফুলের ভিতর দিয়ে অন্ধকারে অম্বি হাঁটতে থাকে উচ্ছলতায়। অন্ধকারে অম্বির চঞ্চলতা দেখা যায়। অম্বি বলে, "কোন জিনিসকে খুব বেশি ভালবাসতে নেই বিজু। বেশী ভালবাসলে সে জিনিস মনে বড় আঘাত দেয়। অতি বড় ঘরণী না পায় ঘর। আমিও কম সাধ নিয়ে সংসার করতে যাইনি।" অম্বি কথা থামিয়ে বলল—"ওসব বাজে কথা বোলো না।"

একটু বলেই অম্বি অন্ধকারে গাছপাতার ভিতর শব্দ করে চলে যায়। আবার একটু পরে অম্বি ফিরে আসে। তার কোলের ওপর বাছুর। বিজয় আশ্চর্য হয়। অম্বি বাছুরটার খবর জানত। বেঁধে রেখেছিল। বিজয় ওর পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে যেন লজ্জায় ভেঙে পড়ে। ছিঃ ছিঃ এতখানি উচ্ছ্বাসের সঙ্গে অম্বালিকার সঙ্গে না মিশলে হয়ত ভাল করতাম। এতটা পুরনো হয়ে যাবার পর আবার নতুন হব কি করে। কতদিনে! কতদিনে। আর যে পুরনো হবার শঙ্কা ও ভয়ে আচ্ছন্ন হতে পারি না।

অম্বির পথ চলার শব্দ হয়। অন্ধকারে চলে যায়। বিজয় কোন কথা

বলে না। নিঃশব্দে টুকুরো টুকরো বিষাদ ছড়ানো অন্ধকার মাঠে বসে পড়ে।

মাঠে অন্ধকার, ঝিঁ ঝিঁ-র শব্দ হয়। বাবলার হলুদ ফুল ফুটে রয়েছে। ফণীমনসার গাছ, পিছনে ঠাস শক্ত বনের দেওয়াল দাঁড়িয়ে আছে।

বুড়িটা প্রাকৃতির নিয়মে পুরনো হয়ে পড়ছে, তবুও নিজেকে জাগিয়ে রাখার তার প্রাণপণ চেষ্টা।

সকালবেলা কেন বিজয় নিজেকে ছেলেমানুষ অন্তরঙ্গ করে তুলল।

ধীরাটা কী বোকা। নিজেকে এতটা হাল্‌কা করে দিল!

অস্থি কি করবে, কেমন ভাসছে বাংলাদেশের মাটিতে।

বাংলাদেশটা কেমন মেঘলা ও রুক্ষ হয়ে উপবাস করছে। ঠিক তার বাবার মত।

মায়ের কবচ ধারণ না করায় কথায় মা রেগে আছে। ঈশ্বর কোথায়! কবচের মধ্যে।

ঝিঁ ঝিঁর শব্দ আবহ সঙ্গীতের মত কানে বাজে।

বিজয় মনে মনে খুঁজতে লাগল, কিছু অন্ধকার উল্টেপাল্টে দিয়ে বনের অজস্র গন্ধের ভিতর ঝুরঝুরে অসম্ভব রক্তশূন্য ফুল ফুটে থাকা দেখে বিজয় সেই তাচ্ছিল্যভরা কণ্ঠে যেন বলে ছিঃ, এত বেশী করে ফুটে যেতে আছে। হাওয়ায় ঝরে যাবে যে! রক্তশূন্য ফুল হাঁপায়, বিজয় বিষাদে হাঁপায়। খোঁজার চেষ্টায় হাঁপায়। যেন সেই কষ্ট বুকের কাঁপুনি অস্থির বুকের কাছ থেকে পেয়ে তারপর খুঁজতে গিয়ে হাঁপিয়ে পড়ে। বিজয় অন্ধকারে কি খোঁজে তা নিজেকেই প্রশ্ন করে। বাংলাদেশের সন্ধ্যার শাঁখ ঘণ্টাকে এমনভাবে উপেক্ষা করে। যেন ওসবে কিছু হবে না।

কিছু নতুন খুঁজছে, খুঁজতে গিয়ে সেই পয়লা যুগের প্রধানমন্ত্রীর আমলের কিছু পুরনো লালচে সংবাদপত্রের পাতা ঘাঁটতে ঘাঁটতে বিজয়ের হাত বাংলাদেশ সম্পর্কে নানান দুর্ঘটনার চিত্র ঘাঁটতে থাকে।

বিজয় যাবতীয় পুরনো সংবাদপত্র পুড়িয়ে দুর্ঘটনা তৈরী করার পর কিছু সংবাদপত্র মাড়িয়ে চলে গিয়ে কয়েকটি নতুন সংবাদপত্র পেয়ে চিৎকার করে উঠল। বিজয় সেই নতুন সংবাদপত্রে হাত দিয়ে স্পর্শ করে বাংলাদেশের গন্ধ নিল। সংবাদপত্রের প্রথম পাতায় লেখা দেখল—সম্প্রতি মহাভারত ফাঁকিস্থানের

সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে থাকায় চতুর্থ পরিকল্পনায় সংক্ষিপ্ততা, ব্যয় সংকোচ; ফলে বেকার চাকরির বরখাস্ত, পদাবনতি, বদলী প্রভৃতির নির্দেশে জনসমষ্টি এই দুর্মূল্যতার যুগে কাতর দুর্দশাগ্রস্ত! এবং এই বদলী ছাটাই ও পদাবনতি প্রভৃতির পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্গের প্রাধান্য সর্বাগ্রে। বঙ্গে এই নির্দেশ কার্যকরী করার চেষ্টা প্রবল।

বিজয় দুর্ভাগা বঙ্গের জনসাধারণের প্রতি কেন্দ্রের এই কৃপাদৃষ্টিতে আনন্দ লাভ করল।

সংবাদপত্রের তৃতীয় পাতার পঞ্চম কলমে—বৈদেশিক ঋণের বোঝা উল্লেখ করে বঙ্গের ওপর এই ঋণের বোঝা চাপানর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বিজয় ভাবল—সারা দেশের এই বৈদেশিক ঋণের বোঝা কি রঙ্গ ভরা বঙ্গের সরকার নিতে রাজী হবে। সংবাদপত্রটি আমাদের স্বাধীনতার ব্যাখ্যা বোঝাতে চায় গোটা দেশের স্বাধীনতার সঙ্গে আঞ্চলিক স্বাধীনতার ব্যাপারে আমরা সন্দেহমুক্ত নই।

অন্য একটি পাতায় কার্টুন—ভূগর্ভ রেলওয়ের বরাদ্দ অর্থ নিশ্চয়ই লুপ-এর বিজ্ঞাপনে খরচ হয়ে গেছে। এবং এই লুপ প্রথা গ্রহণে দেশের কয়েক হাজার রমণীর কাতর আবেদন।

সংবাদপত্রটির প্রথম পাতার বড় বড় হেডিং—বিপন্ন বাংলাদেশের শোচনীয় দুর্দশার কথা জানিয়ে বঙ্গকে বিমাতৃসুলভ ব্যবহারের কথা উল্লেখ করে বঙ্গেশ্বরের মুখ্য অমাত্য দিল্লীর দরবারে বিপন্ন বঙ্গের হারিয়ে যাওয়া স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্য আবেদন জানিয়েছে।

প্রাচীন বাঙালী

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য

রবীন্দ্র-নাটকে ভাষার ক্রমবিবর্তন

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার নাটক রচনায় ভিতর দিয়া গীতি, কাব্য ও গদ্য এই বিভিন্নধর্মী সংলাপ ব্যবহার করিয়াছেন। এই বিভিন্নধর্মী সংলাপই বিভিন্ন নাটকের মধ্য দিয়া একটি ক্রমবিকাশের ধারা অনুসরণ করিয়া শেষ পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে, কোনখানে আসিয়াই স্থির হইয়া পড়িয়া কোন অবিচল আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে নাই।

রবীন্দ্রনাথের নাটক রচনায় প্রথম যুগ গীতিনাট্য রচনার যুগ। এই যুগে নাটকের মধ্যে যে তিনি সংলাপ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা গীতিকবিতা, গদ্যও নহে কিংবা কাব্যও নহে। রবীন্দ্রনাথ এই যুগে রচিত তাঁহার 'ভগ্নহৃদয়' নাটককে গীতি-কাব্য (lyric poem) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। গীতিকবিতা বলিলেই ইহার পরিচয় আরও স্পষ্ট হইতে পারিত। পরবর্তী নাট্যকাব্য রচনার যুগে তিনি যে ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন, ইহা সেই ভাষা নহে। ইহা গীতি-কবিতারই ভাষা। কবিতার অনুযায়ীই ইহাতে মিত্রাক্ষর ব্যবহার করা হইয়াছে—

চপলা। সখি, তুই হলি কি আপন হারা ?
এ' ভীষণ বনে পশি একেলা আছিস বসি
খুঁজে খুঁজে হয়েছি যে সারা।

এখন আঁধার ঠাঁই জনপ্রাণী কেহ নাই,
জটিল মস্তক বট চারিদিকে ঝুঁকি
দু' একটি রবিকর সাহসে করিয়া ভর
অতি সন্তর্পণে যেন মারিতেছে উঁকি।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, ইহা কবিতা, নাটকীয় সংলাপের উপযোগী ভাষা নহে; সেইজন্যই রবীন্দ্রনাথ ইহাকে নাটক বলিতে সঙ্কোচবোধ করিয়াছেন। তিনি 'রুদ্রচণ্ড' সম্পর্কে বলিয়াছেন, "এই কাব্যটিকে যেন কেহ নাটক মনে না করেন। নাটক ফুলের গাছ। তাহাতে ফুল ফুটে বটে; কিন্তু সেই সঙ্গে মূল, কাণ্ড, শাখা, পত্র এমন কি কাঁটাটি পর্যন্ত থাকা চাই। বর্তমান কাব্যটি ফুলের মালা, ইহাতে কেবল ফুলগুলি মাত্র সংগ্রহ করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে, দৃষ্টান্ত স্বরূপেই ফুলের উল্লেখ করা হইল। (ভূমিকা) এই উক্তি এই যুগের সকল গীতি-নাট্যের পক্ষেই সত্য। নাটকের কাহিনীতে যেমন দৃঢ়তা এবং প্রত্যক্ষতার গুণ থাকা আবশ্যক, গান কিংবা কাব্যের ভাষায় তাহা থাকিতে পারে না। গানকেই এখানে ফুল বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য মাত্রই শিথিল বন্ধ ভাষায় গীতি-সুরে রচিত গানের মালিকা। ইহাদের নাট্যভাবের অস্পষ্টতার সঙ্গে এই শিথিল বন্ধ গীতিভাষার সহজ সংযোগ সাধিত হইলেও তাহা দ্বারা নাটকের কোন গুণ আয়ত্ত করা সম্ভব হয় নাই।

সমসাময়িক যুগে রবীন্দ্রনাথ 'কাব্যোপন্যাস' নামক কবিতায় যে কয়েকটি কাহিনী রচনা করিয়াছেন, এই যুগের গীতিনাট্যের ভাষা তাহারই অনুরূপ। কাব্যোপন্যাস 'বনফুল' ও 'কবি কাহিনীর' সঙ্গে এই যুগের গীতিনাট্যের ভাষার কোন পার্থক্য নাই।

ইহার পর রবীন্দ্রনাথের 'বাল্মীকি-প্রতিভা' আদ্যোপান্ত সঙ্গীতে রচিত হইলেও ইহার গীতি-ভাষার মধ্যে সর্বপ্রথম গীতিনাট্যের ভাষার কিছু ব্যতিক্রম দেখা গেল। অন্যান্য গীতিনাট্যের ভাষার মধ্যে সুরের কোন বৈচিত্র্য ছিল না। তাহার ফলে ঘটনাবহুল কাহিনীও সুরের দিক দিয়া একঘেয়ে হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র মধ্যে গানের ভাষা ব্যবহৃত হইলেও তাহার সুরে বৈচিত্র্য দেখা দিল। সুরে বৈচিত্র্য দেখা দিল বলিয়াই ভাষাও বৈচিত্র্যপূর্ণ না হইয়া পারিল না। বিশেষতঃ অন্যান্য গীতিনাট্যগুলি ছিল সুর-প্রধান; কিন্তু 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র অধিকাংশ সঙ্গীতই ছিল তাল-প্রধান। তাল-প্রধান এবং সুর-প্রধান সঙ্গীতের ভাষার

যতটুকু পার্থক্য সৃষ্টি হইবার কথা, 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সে যুগের অন্যান্য গীতিনাট্যের সেইটুকুই পার্থক্য সৃষ্টি হইয়াছিল।

কিন্তু এখানে একটি কথা স্বীকার করিতে হয় যে, রবীন্দ্রনাথ 'ভগ্নহৃদয়' গীতিনাট্য রচনার পরই যে 'রুদ্রচণ্ড' নাটক রচনা করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যেই গীতি সংলাপেও মিত্রাক্ষরের বেড়ী প্রথম ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন; নাটকীয় সংলাপের প্রয়োজনে ইহাতেই তিনি প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দ বা অমিত্র পয়ার ছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন। নাটকীয় সংলাপে সঙ্গীতের বন্ধন হইতে মুক্তির ইহাই প্রথম প্রয়াস। সেইজন্যই বোধহয় রবীন্দ্রনাথ 'ভগ্নহৃদয়কে' 'গীতিকাব্য' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার মধ্যেই সর্বপ্রথম নাটকের অনুযায়ী দৃশ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে একথা সত্য, 'রুদ্রচণ্ডের' অমিত্রাক্ষর ছন্দে যতিবিন্যাস বৈচিত্র্য না থাকায়, ইহার মধ্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের সাধারণ ধর্ম বিকাশ লাভ করিয়া সংলাপের ভাষায় দৃঢ়তার সৃষ্টি করিতে পারে নাই। ইহার মধ্যে গীতি-সুর থাকিলেও গতির প্রবাহ নাই। সেইজন্য ইহা দ্বারা নাটকীয় সংলাপ রচনাও কোন দিক দিয়াই সার্থকতা লাভ করিতে পারে নাই। একটি দৃষ্টান্ত দিলেই তাহা বুঝিতে পারা যাইবে—

অমিয়া। তাই যদি হত, পিতা, বড় ভাল হত।
কে জানে মনের মধ্যে কি হয়েছে মোর,
বরষার মেঘ যদি হইতাম আমি
বর্ষিয়া সহস্রধারে অশ্রুজলরাশি
বজ্রনাদে করিতাম আকুল বিলাপ!

ইহা যেমন প্রচলিত পয়ার ছন্দও নহে, তেমনি প্রকৃত অমিত্রাক্ষর নহে; কারণ, ইহার মধ্যে যতিবিন্যাসে বৈচিত্র্য নাই। ইহা গীতিও নহে, কবিতাও নহে। তবে ইহার মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী নাট্যকাব্য যুগের সংলাপের কাব্য-ভাষা এবং কাব্য রচনার প্রবহমান পয়ার ছন্দের সূচনা হইয়াছিল।

'রুদ্রচণ্ডে'র পরই উল্লেখযোগ্য নাট্য রচনা 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'। ইহার মধ্যেও 'রুদ্রচণ্ডে'র কাব্য সংলাপই ব্যবহৃত হইয়াছে; কিন্তু তথাপি ইহার ভাষা যে একটু দৃঢ়তা লাভ করিয়াছে, তাহা সহজেই অনুভব করা যায়। রবীন্দ্রনাথের নাট্যকাব্যের সংলাপের ভাষা ইহাতে স্পষ্টতর হইয়াছে, কিন্তু পূর্ণতা লাভ করিবার এখনও অনেক দেরী—সন্ন্যাসী! এ কী ক্ষুদ্র ধরা! এ কী রঙ্গ চারিদিকে!

কাছাকাছি ঘেঁষাঘেঁষি গাছপালা গৃহ
চারিদিক হতে যেন আসিছে ঘেরিয়া,
গায়ের উপরে যেন চাপিয়া পড়িবে।
চরণ কেলিতে যেন হতেছে সংকোচ,
মনে হয়, পদে পদে রহিয়াছে বাধা।—২ দৃশ্য

আরও একটি বিষয় 'প্রকৃতির প্রতিশোধে' লক্ষ্য করিবার আছে, তাহা এই যে, ইহাতেই রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম তাঁহার নাটকে গদ্য সংলাপ ব্যবহার করিয়াছেন। সংলাপে গদ্য ভাষার স্বাচ্ছন্দ্য বিশেষভাবে লক্ষণীয় হইয়া প্রথমেই দেখা দিয়াছে; গদ্য ভাষাকে চরিত্রানুযায়ী বাস্তবধর্মী করিয়া তুলিতেও প্রথম হইতেই রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ দেখা যাইতেছে—

স্ত্রীলোক। (ব্রাহ্মণ পথিকের প্রতি) হ্যাঁগা দাদাঠাকুর, এত ব্যস্ত হয়ে কম্‌নে চলেছ?

ব্রাহ্মণ। আজ শিষ্য বাড়ী চলেছি, নাতনি। অনেকগুলি ঘর আজকের মধ্যে সেরে আসতে হবে, তাই সকাল সকাল বেরিয়েছি। তুমি কোথায় যাচ্ছ গা?

স্ত্রীলোক। আমি ঠাকুরের পূজো দিতে যাব। ঘরকন্নার কাজ ফেলে এসেছি, মিনষে আবার রাগ করবে। পথে দু' দণ্ড দাঁড়িয়ে যে জিজ্ঞেস পড়া করব তার জো নেই। বলি দাদাঠাকুর, আমাদের ওদিকে যে একবার পায়ের ধুলো পড়ে না।— ২য় দৃশ্য

রবীন্দ্রনাথের পদ্য সংলাপের যে বুদ্ধিদীপ্ত বাগবৈদগ্ধ তাঁহার শেষ জীবনের গদ্য নাটকগুলিকে একটি বিশেষত্ব দান করিয়াছিল, সেই গদ্য ভাষার তখনও তাঁহার মধ্যে জন্ম হয় নাই। তবে একথা সত্য, রবীন্দ্রনাথের গদ্যনাটকের ভাষার এখানেই প্রথম উদ্ভব হইয়াছে।

'প্রকৃতির প্রতিশোধে'র সংলাপের ভাষা তখন পর্যন্ত গদ্যই হউক কিংবা পদ্যই হোক, পরিণত রূপ লাভ না করিলেও ইহা হইতেই রবীন্দ্রনাথের নাট্যকাব্য রচনার যুগের সূচনা হয়। প্রকৃতির 'প্রতিশোধ' হইতে 'মালিনী' পর্যন্ত এই যুগ প্রসারিত। ইহাতেই রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রাণী', 'বিসর্জন', 'চিত্রাঙ্গদা', প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ নাট্যকাব্য রচিত হয়। এই যুগের নাটকগুলির সংলাপে যে কাব্যধর্মী ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা রবীন্দ্রনাথের সমৃদ্ধতম কাব্যভাষা। সমৃদ্ধি ইহার রসে, ব্যঞ্জনায় এবং অলঙ্করণে। সুতরাং ইহা

কাব্যেরই সম্পূর্ণ উপযোগী। ইহার ভাষার সমৃদ্ধি নাটকীয় গুণে নহে, বরং কাব্যগুণে; এই যুগের রচনা 'রাজা ও রাণী' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যাহা বলিয়াছেন, তাহা তাঁহার সমগ্র নাট্যকাব্য সম্পর্কেই প্রযোজ্য। তিনি লিখিয়াছেন, 'এর নাট্যভূমিতে রয়েছে লিরিকের প্লাবন, তাতে নাটককে করেছে দুর্বল। এ হয়েছে কাব্যের জলাভূমি' (সূচনা)।

নাটকীয় সংলাপের প্রত্যক্ষতার গুণ ইহা দ্বারা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে সত্য, কিন্তু ইহা দ্বারা কাব্যরস পিপাসা যে পরিমাণে চরিতার্থ হয়, রবীন্দ্র-সাহিত্যের আর কোন রচনা দিয়াই তাহা তেমন হয় কিনা সন্দেহ।

'রাজা ও রাণী' নাটকের মধ্যে এই গুণ সর্বাধিক প্রকাশ পাইয়াছে, ইহার কারণ প্রেমের কাহিনী ইহার অবলম্বন। প্রেমের বিষয়ই রচনাকে মধুরতম করিয়া তুলিয়াছে। এই গুণ অন্যান্য নাট্যকাব্যে যে প্রকাশ পায় নাই, তাহা নহে, কারণ এই যুগের প্রত্যেক নাট্যকাব্যে গৌণভাবে হইলেও প্রেমের বিষয়ই অবলম্বন করা হইয়াছে।

'প্রকৃতির প্রতিশোধে'র মধ্যে কাব্য সংলাপের সঙ্গে সঙ্গে যে গদ্য-সংলাপ ব্যবহারের রীতি দেখা দিয়াছিল, এই যুগের সকল নাটকের মধ্য দিয়াই তাহার ধারাও অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। কিন্তু গদ্য সংলাপও ক্রমে গীতিরসে ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়া কাব্যধর্মী হইয়া উঠিয়াছে। বরং 'প্রকৃতির প্রতিশোধে' গদ্য-সংলাপে যতটুকু প্রত্যক্ষতার গুণ ছিল, তাহা ক্রমে পরবর্তী নাট্যকাব্যগুলির মধ্য হইতে হ্রাস পাইয়া যাইতে লাগিল। ক্রমে গদ্য-সংলাপের পরিমাণও হ্রাস পাইতে লাগিল। 'রাজা ও রাণী'তে যে পরিমাণ গদ্য-সংলাপ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার পরবর্তী নাটক 'বিসর্জনে' তাহার পরিমাণ সেই তুলনায় আরও অনেক হ্রাস পাইল। ক্রমে 'চিত্রাঙ্গদা' এবং 'মালিনী'তে গদ্য-সংলাপ একেবারেই লোপ পাইয়া গেল—আনুপূর্বিক কাব্য সংলাপেই এই দুইখানি নাট্যকাব্য রচিত হইল। এই যুগের নাটকীয় সংলাপের কাব্যভাষায় তিনি সর্বত্রই অমিত্রাক্ষর ছন্দ বা blank verse ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত অমিত্রাক্ষর ছন্দের মধ্যে যতির বৈচিত্র্য থাকিলেও মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দের দৃঢ়-সংবদ্ধতা ছিল না। গীতিপথে ইহার গতি শিথিল হইয়াছিল, সেইজন্য মধুসূদন একই ছন্দে নয় সর্গ কাব্য রচনা করিয়াও যে সুরগত বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথ সংক্ষিপ্ততর রচনার মধ্য দিয়াও তাহা পারেন নাই। সেক্সপীয়ারের নাটকের অমিত্রাক্ষর ছন্দের আদর্শে রবীন্দ্রনাথ এই যুগের নাটকে অমিত্রাক্ষর

ব্যবহার করিয়াছেন মধুসূদনের আদর্শে ঃ কিন্তু সেক্সপীয়রের মধ্যেও কাব্য সংলাপে ভাষার যে দৃঢ়তা এং নাটকীয়তা প্রকাশ পাইয়াছিল, রবীন্দ্রনাথের সংলাপে তাহা পাইতে পারে নাই। কারণ, রবীন্দ্রনাথের একান্ত গীতি-প্রবণতা তাহার রচিত নাট্য সংলাপ নাটকীয় দৃঢ়তা সৃষ্টির অন্তরায় হইয়াছিল। সুতরাং কাব্যপাঠ হিসাবে রবীন্দ্রনাথের এই যুগের নাটকীয় সংলাপগুলি যে তৃপ্তি দেয়, অভিনয় দর্শনে সেই তৃপ্তি পারে না। কারণ, অভিনয়ের দাবী ইহা অপেক্ষা আরো বেশি কিছু।

নাট্যকাব্যের সংলাপগুলি যেন এক একটি বিচ্ছিন্ন গীতিকবিতা, ইহাদের মিল বা মিত্রাক্ষর নাই সত্য, তথাপি শব্দচয়ণ নৈপুণ্য দ্বারা এমন গীতিসুর প্রকাশ পাইয়াছে, যাহাতেই বিষয় এবং প্রসঙ্গ নিরপেক্ষ এক একটি সংলাপ শ্রেষ্ঠ গীতি-কবিতা রূপে সহজেই পাঠকের তৃপ্তিকর হইয়া উঠিয়াছে।

একটি দৃষ্টান্ত দেই—

বিক্রমদেব। মৌন মূক সন্ধ্যা ওই মন্দ মন্দ আসে
কুঞ্জবন মাঝে, প্রিয়তমে, সজ্জা মগ্ন
নববধূ সম-সম্মুখে গম্ভীর নিশা
বিস্তার করিয়া অন্তহীন অন্ধকার
এ কনক-কান্তিটুকু চাহে গ্রাসিবারে।
তেমনি দাঁড়ায়ে আছি হৃদয় প্রসারি—
ওই হাসি, ওই রূপ, ওই তব জ্যোতি
পান করিবারে-দিব্যালোকে তট হতে
এস, নেমে এস, কনক চরণ দিয়ে
এ অগাধ হৃদয়ের নিশীথ সাগরে।— ১৩

নাট্যকাব্য রচনার যুগের পর রবীন্দ্রনাথের কয়েকখানি গদ্য নাটক রচিত হয়। ইহারা যথাক্রমে 'গোড়ায় গলদ', 'বৈকুণ্ঠের খাতা', 'হাস্য কৌতুক', 'ব্যঙ্গ কৌতুক'। প্রকৃত পক্ষে ইহার পরই রবীন্দ্রনাথের নাট্য রচনার আর একটি উল্লেখযোগ্য যুগ অর্থাৎ রূপক ও সাংকেতিক নাট্য রচনার যুগের সূচনা হয়। প্রহসনগুলির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ গদ্যসংলাপ ব্যবহার করেন। কাহিনীগুলি নাগরিক জীবন হইতে গৃহীত বলিয়া নাগরিক জীবনের শিষ্ট কথ্যভাষাই ইহাদের মধ্যে ব্যবহৃত হয়। যে বাগবৈদগ্ধ্য তাঁহার শেষ জীবনের নাটকীয় সংলাপে ব্যবহৃত হইয়াছে, ইহাদের মধ্যে তখন পর্যন্ত তাহা বিকাশ লাভ করিতে পারে নাই। 'গোড়ায় গলদের সংলাপনার ভাষায় পূর্ববর্তী কোন

কোন বাংলা প্রহসন রচয়িতার ভাষার অনুকরণ পর্যন্ত দেখা যায়। সুতরাং ইহাদের ভাষা বিশেষত্বহীন। তবে হাস্যরসের স্নিগ্ধধারায় তাহা অভিষিক্ত বলিয়া তাহা দ্বারা মন সহজেই স্বাভাবিক ভাবে প্রসন্ন হইয়া যায়। তবে তাহা জীবনের মধ্যে গভীর দাগ কাটিতে পারে না। সংলাপের ভাষাতেও সেই গুণের অভাব দেখা যায়।

'গোড়ায় গলদের' এই সকল ত্রুটি কিছু কিছু সংশোধন করিয়া পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথ ইহার একটি 'অভিনয় যোগ্য' সংস্করণ প্রকাশিত করেন, ইহার নাম 'শেষরক্ষা'। ইহা ১৮২৮ সনে প্রকাশিত হয় এবং ইহাতে রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক গদ্য ভাষার স্পর্শ কতকটা অনুভূত হয়।

প্রহসনে গদ্যসংলাপ ব্যবহার করিবার পর হইতে রবীন্দ্রনাথ নাটকীয় সংলাপে কাব্য ভাষা ব্যবহারের রীতি পরিত্যাগ করিয়া গদ্য ব্যবহারের রীতি গ্রহণ করেন। কিন্তু এই গদ্য-সংলাপের প্রকৃতি ক্রমে ক্রমে পরিবর্তিত হইতে থাকে। এখান হইতে ইহা ক্রমবিকাশের একটি ধারা অনুসরণ করিয়া পূর্ণতর রূপের মধ্যে একটি শেষ পরিণতি লাভ করে।

'শারদোৎসব' নাটককেই এই যুগের প্রথম নাটক বলিয়া নির্দেশ করিতে হয়। ইহার গদ্য সংলাপ স্বচ্ছ ও সাবলীল, শরৎকালের মেঘের মতই স্বচ্ছন্দ গতি। কিন্তু যে কাব্য ধর্মিতা রবীন্দ্রনাথের সকল রচনারই বৈশিষ্ট্য, তাহা হইতে ইহা মুক্ত নহে। প্রহসন রচনার যুগের গদ্য সংলাপে অলঙ্কার-বাহুল্য ছিল না ; কারণ, ইহার জীবন ছিল বাস্তব এবং প্রত্যক্ষ। কিন্তু 'শারদোৎসব' হইতে রবীন্দ্রনাট্যে যে নূতন যুগের সূচনা দেখা দিল, তাহা জীবন রোমান্টিক। সেই অনুযায়ী তাহার গদ্য-সংলাপও কাব্যধর্মী হইয়া উঠিয়াছে। 'শারদোৎসবের মধ্যেই সর্বপ্রথম সন্ন্যাসরূপী বাউল এবং ঠাকুরদা চরিত্রের আবির্ভাব দেখা যায়। এই যুগের সকল নাটক জুড়িয়াই তাহাদের পদধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাদের আচরণ এবং সংলাপে সর্বত্র অভিন্নতা লক্ষিত হয়। অভিন্ন চরিত্রের অভিন্ন প্রকৃতির সংলাপের মধ্য দিয়া ক্রমে এই যুগের নাটকের মধ্যে সংলাপের দিক দিয়া বৈচিত্র্যহীনতা দেখা দিল!

'শারদোৎসবের' পর ঐতিহাসিক ক্ষুদ্র নাটক 'মুকুট' আদ্যোপান্ত এই যুগের অন্যান্য নাটকের মত গদ্য সংলাপেই রচিত। ইহার ভাষার কাব্যধর্মীতার অনেকখানি অভাব থাকিলেও ইহাকে আদর্শ নাটকীয় গদ্য সংলাপরূপেও গ্রহণ করা যায় না। ভাষার শৈথিল্যে ইতিহাসের সুনিবিড় পরিবেশ অনেক ক্ষেত্রেই রক্ষা পাইতে পারে নাই।

তারপর 'প্রায়শ্চিত্ত' রচিত হয়। এই নাটকখানিই রবীন্দ্রনাথের রূপক সাঙ্কেতিক যুগের নাটকের সঙ্গে ইহার পূর্ববর্তী নাট্য রচনার যুগের সেতু বন্ধন করিয়াছে। ভাষার দিক দিয়া ইহাতে পরবর্তী যুগের পূর্বাভাস সূচিত হইয়াছে। ইহাতে রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালীর গার্হস্থ্য জীবনের পরিবেশের মধ্যে বাঙ্গালীর রাজনৈতিক জীবনের অতীত ইতিহাসের একটি কাহিনী আনিয়া যুক্ত করিয়াছেন। গদ্য-সংলাপের ভাষায় ইহার এই বিষয়গত মর্যাদা রক্ষা পাইয়াছে।

ইহার পরই রবীন্দ্রনাথের পূর্ণাঙ্গ সাঙ্কেতিক নাটক 'রাজা' ও 'ডাকঘর' রচিত হয় এবং এই যুগই রবীন্দ্রনাথের রূপক সাঙ্কেতিক নাটকগুলিও রচনার যুগ। মিতভাষণ এই যুগের গদ্যসংলাপের একটি প্রধান গুণ। রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক গদ্য ভাষার সূক্ষ্মতম বুদ্ধিদীপ্ত বাগবৈদগ্ধ্য এই যুগের নাটকীয় সংলাপের মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে। এই যুগের সংলাপের প্রতিটি বাক্য সুগভীর তাৎপর্য ও ব্যঞ্জনাময়, কেবলমাত্র কানে শুনিলেই ইহাদের দায়িত্ব শেষ হয় না, অন্তরের মধ্যে সুগভীর উপলব্ধি ব্যতীত ইহাদের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারা যায় না।

রোমান্টিক জীবনাশ্রয়ী রচনা বলিয়া 'রাজা' নাটকের সংলাপে যে কাব্যধর্মিতা প্রকাশ পাইয়াছে, বাস্তব জীবনাশ্রয়ী রচনা বলিয়া 'ডাকঘরে' তাহা প্রকাশ পাইতে পারে নাই। কিন্তু সহজ স্বচ্ছন্দ সাধারণ জীবন-চিত্রের মধ্যেও ইহাতে যে রস ও ব্যঞ্জনা প্রকাশ পাইয়াছে, রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক আর কোন নাটকের মধ্যে তাহা পায় নাই। ইহার সংলাপের ভাষায় পাণ্ডিত্য নাই, ব্যঞ্জনা আছে, কল্পনা নাই, ইঙ্গিত আছে, বাহুল্য নাই, পরিমিতি আছে। রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের নাটকীয় সংলাপের অতিভাষণ এই যুগে আসিয়া এই মিতভাষণে পরিণতি লাভ করিয়াছে। ভাব এখানে গভীর বলিয়াই ভাষা এখানে সংযত হইয়াছে।

ইহার পর 'মুক্তধারা' এবং তারপর রবীন্দ্রনাথের এই যুগের শেষ নাটক 'রক্তকরবী' রচিত হয়, ইহার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক গদ্য ভাষার বাগবৈদগ্ধ্য পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ পাইয়াছে। তবে অনেক ক্ষেত্রেই কাব্যধর্মীতা ইহাকে আচ্ছন্ন করিয়া দিবার প্রয়াস পাইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের ব্যঙ্গাত্মক সংলাপের ভাষা ইহার মধ্যে তীব্রতম জ্বালাময় হইয়া উঠিয়াছে। কারণ, 'রক্তকরবী' নাটকে জীবনে সৌন্দর্য-সন্ধানের মধ্য দিয়াও রবীন্দ্রনাথ মানুষের প্রতি অবিশ্বাসী একটি ব্যঙ্গাত্মক মনোভাবকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছিলেন। সেই জন্য ইহার সংলাপের ভাষা হইতে জ্বালা দূর হইতে পারে নাই।

রবীন্দ্র নাটকের গদ্য সংলাপের পরিণততম রূপ তাঁহার রচিত 'বাঁশরী' নাটকের মধ্য দিয়াই প্রকাশ পাইয়াছে। 'বাঁশরী' রবীন্দ্রনাথের উল্লেখযোগ্য সর্বশেষ নাট্যরচনা। ইহার সংলাপের ভাষা ক্ষুরধার, বুদ্ধিদীপ্ত, শাণিত তরবারির মত তীক্ষ্ণ। এই ভাষা রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতার' যুগের ভাষা; রবীন্দ্র গদ্য ভাষার পরিণততম রূপের সর্বশেষ নিদর্শন।

রবীন্দ্রনাথ চরিত্রানুযায়ী সংলাপের ভাষা সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। প্রথম যুগের 'প্রকৃতির প্রতিশোধে' সেই প্রয়াস দেখা দিয়াছিল মাত্র; কিন্তু তাহার ধারা আর অগ্রসর হইতে পারে নাই। সকল চরিত্রের মূলেই রবীন্দ্রনাথ প্রায় নিজেরই সমসাময়িক কাব্য কিংবা গদ্যভাষা আরোপ করিয়াছেন। তার ফলে চরিত্রগুলির বাস্তবধর্ম বিনষ্ট হইলেও রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব বক্তব্য প্রকাশ পাইতে কোন বাধা হয় নাই।

বিশ্বনাথ কয়াল * সাতাশে

দীঘিতে স্নান সেরে যেতে যেতে শৈবলিনী থেমে যায়
জলে বুনো শালুক ঝাঁঝের টুকরো গায়ে লেগে থাকে
যেন রাধিকা কলঙ্ক মেখে আনমনে কোথায় তাকায়।

কালো দীঘির পাড়ে সাপের শিষে ঢেউ ভাঙ্গে
কোণে কোণে জল শুষে নেয় বুনো ঝোপ
অযোধ্যা সিন্ধুতট ধুয়ে ধুয়ে মজে গেলে
এখনও ঝাঁঝের দামে পা ঠেলে
রাজহংসী গলা তুলে পথ করে নেয়।

আমার কদম্বগন্ধ ম্লানতর
সাতাশে বাহার যদি বিবর্ণ হয়ে যায়
নিতান্ত সুবাসটুক জড়ো করে
এখনও আঙুল রঙীন করে
সন্ধ্যে হলে সুতপা এ্যাসপ্ল্যানেড চত্বরে দাঁড়ায়

নিখিল সরকার

বনবাস

ধীরে ধীরে প্রেসিডেন্সী কলেজের লাগোয়া ফুটপাথে গাছটার তলায় এসে দাঁড়াল অমল। আর ক'পা হাঁটলেই কফি হাউস। রেলিংয়ের গায়ে গায়ে পুরনো বইয়ের তাক। তার একটা বহুদিনের পরিচিত গন্ধ এসে নাকে লাগল অমলের। বইগুলোর ওপর দিয়ে অভ্যস্ত অভ্যাস চোখে দৃষ্টি ঘুরিয়ে আনল একবার। তাও নির্লিপ্তভাবে। সামনের বিরাট স্কুল বাড়িটার গায় এখন পড়ন্ত বিকেলের মলিন ক্লান্ত আলো এসে পড়েছে। কফি হাউসের ঠিক উল্টো দিকের ফুটপাথে গাছের ওপরও তার দীন জীর্ণ ছায়া ঝুলছে। সেদিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে অমল একটা নিঃশ্বাস ছড়িয়ে দিল আস্তে আস্তে। সবকিছুই যেন তার কাছে আজ নতুন অচেনা বলে মনে হচ্ছে। এ সবের সঙ্গে কোনকালে অমলের সম্পর্ক ছিল না। আজো নেই। অথচ একদা হৃদয়ের গভীর আবেগ মমতা বেদনা আনন্দ এর প্রতিটি ধুলোকণায় মিশিয়ে দিয়েছিল। আজ আর তার কোন চিহ্ন নেই এখানে। আশপাশ দিয়ে যারা চলে যাচ্ছে, অমল ভালো করে সন্ধানী চোখে একবার দেখল তাদের। তার পরিচিত কেউ পড়ে কিনা। এই ক' বছরে এমনভাবে যে

অপরিচিত অবাঞ্ছিত হয়ে পড়বে, তা ভাবেনি অমল। অথচ এ জায়গার সঙ্গে তাদের যে হৃদ্যতা অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠেছিল এক সময়, দীর্ঘদিনের বিচ্ছেদে অনাদৃত পরিত্যক্ত সময়ের তলায় তা যেন অলক্ষ্যে আত্মগোপন করেছে। এই ক' বছরে সবকিছু কেমন থিতিয়ে এসেছে। আজ এই মুহূর্তে অনাহূত স্পর্শে তা আবার সজীব হয়ে উঠছিল যেন। এই প্রথম অমলের মনে হলো, এই ভিড়ের মধ্যে কেউ তার চেনা নয়, এখানে সে একা, নিঃসঙ্গ। কলকাতায় পা দেওয়ার পর এক গাঢ় উষ্ণ আবেগ অনুভব করেছিল। বহুদিন পর চেনা বন্ধুদের অবাক করে দেবে। কিন্তু এখন দেখল, না এলেই ভাল করত। অনেকগুলো মুখ এক ঝলকে একসঙ্গে যেন মনের ওপর ভেসে উঠল। অমল ভাল করে দেখার আগেই তারা অদৃশ্য হয়েছে।

কতগুলো মানুষের চিৎকারে একটা ট্রাম এসে থামল ওর সামনে। আগের স্টপেজে স্বামী নেমে গেছে। এ স্টপেজে বউ এবং একটি ছেলে নামল ভিড় ভেদ করে। অন্য লোকেরা তখনও বিবাদে মত্ত। অমলের অন্যমনস্কতা ভাঙল। ধীরে সন্তর্পণে রাস্তার এপারে এলো। টুকিটাকী আরও কটা কাজ সারতে হবে। ট্রেন সেই রাতে। গতকাল বিকেলে এসেছে। হাতে এখনও সময় রয়েছে অনেকটা। একবার ভেবেছিল, সিনেমায় যায়। একজন নামকরা পরিচালকের ছবি চলছে এখন। হোটেলের লোকগুলো ছবির ভালমন্দ নিয়ে তখন তুমুল বাদানুবাদ করছিল। অমল তাতে যোগ দিতে পারেনি। একজন ওকে সাক্ষ্য মেনেছিল। অমলের নীরবতা দেখে ওদের মধ্যে একজন বলেছিল, 'ও বেচারীকে আবার জিজ্ঞেস করা কেন, কাল তো সবে গাঁ থেকে এসেছে।' বলে হেসে উঠেছিল লোকটি। অমলের মনে হয়েছিল লোকটার কথা বলায় যেন সামান্য ঠাট্টা ও উপহাস ছিল। অমল চলে আসার মুখে বলল, 'ঠিকই বলেছেন আপনি, এরপরও জিজ্ঞেস করেছেন তাতে কিন্তু আপনাদের বিচক্ষণতার অভাবই প্রমাণ করে।' যতদূর সম্ভব শান্ত অনুত্তেজিত স্বাভাবিক গলায় বলেছিল কথাটা। আর দাঁড়ায়নি সে ওখানে। ভেতরে ভেতরে অমল ক্ষুব্ধ ও ক্ষুণ্ণ হয়েছে। বাইরে এসে মনে হয়েছে, এক বছরে কোন বই-ই সে দেখেনি। আগে সেও ছবি নিয়ে অন্য বন্ধুদের সঙ্গে কথার মাতামাতি করেছে। ভেবেছে। বিশ্বের সেরা বইয়ের উদাহরণ তুলে আলোচনা করেছে সতীর্থদের সঙ্গে। এখন বুঝতে পারছিল অমল, যত্নে পালিত দিনগুলোকে অগোচরে কারা যেন সরিয়ে নিয়ে গেছে। ঘর থেকে বেরুবার সময় এই গোপন

ইচ্ছে নিয়েই বেরিয়েছিল। ছবিটা দেখে যাবে। কিন্তু পথে নেমে এদিকে আসতে আসতে অন্য কথা মনে হচ্ছিল। নিশির ডাকের মতন এদিকটায় চলে এলো অমল। এখানে পা দেওয়ার পর মুহূর্তেই বহুদিনের পরিচিত বিকেলের এক ঘ্রাণ পেলো। জীবন থেকে খসে পড়া কটি বছর যেন দেখতে পেলো মুখ বাড়িয়ে। এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অমল দেখল, সামান্য দূরে একটি সুদর্শনা যুবতীকে দুটি দামাল যুবক বাসে তুলে দিচ্ছে। কোন দৃষ্টিশর তাদের বিদ্ধ করতে পারছে না। তাদের উচ্ছ্বসিত ভরাট হাসিতে অনেকেই সচকিত হয়ে মুখ ফেরাচ্ছে, কিন্তু কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। এই মুহূর্তে পৃথিবীর আর কিছুতে যেন তাদের আগ্রহ আকাঙ্ক্ষা নেই। বরং অনাদর উপেক্ষা রয়েছে।

কটি অপ্রয়োজনীয় রিক্ত পাতা এ সময় উড়তে উড়তে গায়ে এসে পড়ল অমলের। মন্থর বিষণ্ণ এক মুঠো বাতাস অমলের গা ছুঁয়ে ট্রাম লাইন ডিঙিয়ে বাড়িগুলো টপকে আরো উত্তরে চলে গেল। অমল হাসল সামান্য। কটা কাজ সারতে তার এখনও বাকী। কফি হাউসের ভেতরে যে কোলাহলটা এতক্ষণ ধরে নেশাতুর হয়েছে, এখন স্খলিত পায়ে তা যেন রাস্তায় নেমে পড়লো। ওর সামনে দিয়ে মশলা চিবোতে চিবোতে আরো দুটি যুবক-যুবতী চলে গেল। অমল চেয়ে পরক্ষণই চোখ সরিয়ে এনেছে। অনেক তীব্র ধারালো আলোর ফলা যেন এসে পড়ল আচমকা চোখের ওপর। ওরা হাসছিল। প্রাণখোলা মধুর হাসি। এ রকম হাসি আরো কোথায় যেন শুনেছিল অমল। আশ্চর্য মিল রয়েছে এর সঙ্গে। ভাববার চেষ্টা করল একবার। এমন সময় টের পেলো ও, কে যেন পেছন থেকে ওর কাঁধে হাত রেখেছে। মুখ ঘুরাতেই আগন্তুক হাসল। সুধালো, চিনতে পারিস?

সহসা কিছু বলল না অমল। সামান্য অপ্রস্তুত হয়েছে যেন। বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে এবার হেসে ফেলল ও। বলল, 'সুব্রত না?'

'তবু যে চিনতে পেরেছিস।' সুব্রত হাত তুলে নিল ওর কাঁধ থেকে।

'আমার দোষ কি বল, আমি কি করে জানবো, ও ক' বছরে দেহে প্রচুর মেদ জমিয়েছিস তুই।'

'একেবারেই চেনা যায় না?' সুব্রত তাকাল মৃদু হেসে।

'প্রথমটায় তো চিনতেই পারিনিরে।' অমলও হেসে দিল।

'আমি কিন্তু ঠিক চিনেছি।'

'তাহলেই দেখ, আমার কোন কিছুই বদলায় নি।'

'হুঁ বদলেছে, অনেক।' বলে হাসল সুব্রত। এবং অমলও। একটু থেমে বলল, 'বহুদিন পর দেখা হলো তোর সঙ্গে।'

'হ্যাঁ, অনেকদিন তো আসিনি এদিকে।'

'সেই রেজাল্ট বেরুলো যেবার, তখনই দেখেছিলাম তোকে।'

'এরপরও দুবার এসেছিলাম, দেখা হয়নি কারো সঙ্গে।' অমল সামনের বাড়িগুলোর ওপর দিয়ে অলস দৃষ্টি ঘুরিয়ে আনছিল।

'দেবুর কাছে তোর ঠিকানা চেয়েছিলাম কত, ও-ও দিতে পারল না।' একটু থেমে সুব্রত অমলকে দেখল সামান্যক্ষণ। একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল, 'শেষকালে এভাবে যে ডুব দিবি, ভাবিনি আমরা।'

'থাক আর বলিস না।' অমল দৃষ্টিটা ওর মুখের ওপর রাখল। বলল, 'প্রথমে আমি অনেককেই চিঠি দিতাম, দুয়েকজনের কাছ থেকে মাত্র উত্তর পেয়েছি। পরে আর তাও পাই না। এভাবেই একদিন আমাদের সব উৎসাহ ও উত্তেজনা মরে গেল দেখলাম। প্রথম প্রথম খুব খারাপ লাগতো এখন আর লাগে না। অমল দৃষ্টি সরিয়ে আনল। 'একমাত্র দিলিপের সঙ্গেই এখনও যা সামান্য সম্পর্ক আছে। তাও আমার ওখানে দুবার গিয়েছিল ও।' অমল ধীরে ধীরে বলল।

'ওর বাবা তো মারা গেছেন কিছুদিন আগে।'

'হুঁ।' অমল যেন আরো কি ভাবছিল।'

'আমার সঙ্গেও কচিৎ দেখা হয়।'

'ওসব ঘেঁটে আর কি লাভ বল।' সুব্রতর চোখে চোখ চেয়ে বলল, 'তারপর ঠিকানা খুঁজছিলি কি ব্যাপার।'

এমনি বহুদিন যোগাযোগ নেই। মুখ টিপে হাসছিল সুব্রত। ওর হাসির আড়ালে কি যেন একটা লুকানো।

'উহুঁ, কিছু একটা চেপে যাচ্ছিস মনে হচ্ছে।' একটু থেমে আবার বলল, 'কোন লাভ নেই, তোদের অনেক খবরই আমি রাখি।' সামান্য হেসে বলল কথাটা।

তবে তো বুঝতেই পারছিস। সুব্রতর ঠোঁটে তখনও হেঁয়ালি রহস্য-জড়ানো হাসি।

এবার স্পষ্ট চোখে তাকাল অমল। সামান্য সময় নির্নিমেষে চেয়ে থেকে বলল, 'এখন কি মনে হচ্ছে জানিস?'

'না।' সুব্রত মাথা নাড়ল আস্তে।

চেহারাতেই শুধু বদলাস নি, মনের দিক থেকেও পাল্টে গেছিস। আগেতো এরকম ছিলি না রে। অমল চেয়ে থাকল ওর দিকে।

বললি না তো, কি খবর রাখিস আমার সম্বন্ধে?

বিয়ে করেছিস এই তো? অমল এবার হাসল মৃদুভাবে।

ঠিক তাই। সুব্রত আরও একটু ওর ঘন হয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। একটু নীরব থেকে বলল, তুই এলে খুব ভাল লাগতো। অনেকেই এসেছিল, তোর খোঁজ-খবর করেছে। শীলাও এসেছিল। অবশ্য একা। দেখলে তোর কষ্ট হতো। ওর শরীর খুব ভেঙে গেছে তখন। কি একটা যেন গোপন করল সুব্রত। অমল একবার ওর মুখের দিকে চেয়ে চোখ অন্যদিকে সরিয়ে নিল। কোলাহলটা যেন আরো বাড়ছে বলে মনে হলো অমলের। মাঝে তার ঢেউ এসে কিনারে পড়ে রেণু রেণু হয়ে ভেঙে পড়ছে। দেখতে দেখতে অমলদের সামনে বিকেল কখন সরে গেল ট্রাম লাইনে চাপা পড়ে। সেদিকে চেয়ে চেয়ে বলল, কোথায় যাচ্ছিলি? ভেতরে ভেতরে সংবাদটা তাকে চঞ্চল ও কাতর করছিল। প্রসঙ্গান্তরে যাওয়ার জন্যে একটু জোরেই কথাটা বলেছে অমল।

এদিকে এসেছিলাম একটু কাজে, হঠাৎ দেখি তুই। খুবই আন-এক্সপেক্‌টেড। বলে হেসে ফেলল সুব্রত।

'চল ভেতরে গিয়ে বসি।'

ওই হট্টগোল ভাল লাগবে তোর? আমি তো একেবারেই সইতে পারি না।

জানি না, বহুদিন পর এলাম এইদিকে, চল তো যাই একবার। সামান্য কফি অন্তত খেয়ে যাই। অমল চাইল ওর মুখের দিকে।

চল তবে। গলার যেন কোন উৎসাহ আবেগ ছিল না সুব্রতর।

ওঠার মুখে এক প্যাকেট গোল্ডফ্লেক কিনল সুব্রত। মৃদু হেসে অমল শুধোলো, আজকাল বুঝি এ ছাড়া আর খাস না?

'আরে বাবা না, রেগুলার এ খেতে হলে ট্যাঁকে কিছু থাকা চাই।' একটু থেমে বলল, তোর অনারে কিনে ফেললাম। জোরে হেসে সুব্রত ওর চোখে চোখে তাকাল। আমি তো বরাবরই চারমিনারে অভ্যস্ত।

'বড্ড কড়া, বলিস তো পাল্টে চারমিনারই নিই।'

'ছেড়ে দে, বহুদিন ভাল সিগ্রেটও খাইনি। আমার ওখানে পাসিং শোর ওপরে বড় জোর কাঁচি মিলবে।'

'তবে তো খুব ভাল জায়গায়ই আছিস দেখছি।' সুব্রত হাসল সামান্য।

'দেখে বুঝছিস না।' দুজনই এবার শব্দ করে হাসল।

ওরা একটা নিরালা টেবিল বেছে নিল। অমল দেখল, এখানেও অনেক পরিবর্তন হয়েছে এর মধ্যে। ওপরে পশ্চিম দিকটায় তখন বসার কোন আয়োজন ছিল না। প্রতিটি টেবিলেই ব্যস্ততা, মিলিত কণ্ঠস্বর। এক টেবিল থেকে অন্য টেবিল টপকে টপকে অমলের দৃষ্টিটা একেবারে শেষতম অংশ পর্যন্ত গিয়ে আবার ফিরে এলো নিজের টেবিলে। পরিচিত কাউকে দেখল না সে। অন্যরা এসে তাদের জায়গাগুলো অধিকার করেছে। এই মুহূর্তে ওর মনে হচ্ছিল, এখানে ওরা অনাহুত, অনধিকার প্রবেশ করেছে।

'কিছু বলছিস না যে।' সুব্রত তাকাল।

'দেখছিলাম কাউকে চিনি কিনা, দেখলাম পরিচিতেরা কোথায় সরে পড়েছে ভিড়ে।' অমল একটা নিঃশ্বাস ছাড়ল ধীরে ধীরে।

'ভাল লাগছে তোর।' সুব্রত সিগারেট ধরালো।

'খুব খারাপ লাগছে, মনে হচ্ছে সময়টা যেন কখন আমাদের জোরে ঠেলে দিয়ে পালিয়ে গেছে, আমরা টেরও পাইনি।' অমল সিগারেট ধরিয়ে সুব্রতর দিকে তাকাল একবার।

একটি ছেলে এসে দাঁড়াল তাদের কাছে। পরনে সাদা পোষাক, মাথায় টুপি। মুখে অল্পচোরা হাসি। বয়স কম। সুব্রত জিজ্ঞেস করল অমলকে, 'কি খাবি বল।'

'স্রেফ কফি বলে দে।'

'ঠিক আছে, তোর আর বলতে হবে না কিছু।' সুব্রত এবার ছেলেটির দিকে চেয়ে বলল, 'দু প্লেট চিকেন স্যাণ্ডুইচ, কফি দুটো। ছেলেটি চলে গেল।

'এটা কি বিয়ের খাওয়া?' সিগারেটের ছাই ফেলতে ফেলতে অমল দেখল একবার সুব্রতকে।

'এখনও—দুটো ছেলে হওয়ার পর বিয়ের খাওয়া, বলিস কিরে?' সুব্রত বড় বড় চোখে তাকাল ওর মুখের দিকে।

বেশ তাহলে উইথড্র করছি আমার কথা।

'তার দরকার নেই, বরং কাল সকালে চলে আয় আমার ওখানে। ওকে তো দেখিসনি তুই।'

এবার আর হলো না তবে। আজ রাতেই চলে যাচ্ছি।'

'সেকি, কবে এসছিস ?'

'গতকাল বিকেলে।'

'থাকবি না ক'দিন ?' ওর গলায় বিস্ময় ও আন্তরিকতা ফুটে উঠল।

'নারে, এ যাত্রায় আর হবে না ; তবু তো তোর সঙ্গে দেখা হলো, না হয় খুব খারাপ লাগতো।' থেমে থেমে কথাগুলো বলল অমল।

'একদিনে তোর এমন কিছু ক্ষতি হবে না।'

'নারে, এবার পারবো না। বলছি তো, এরপর এলে তোর ওখানেই আগে যাবো।'

একটু নীরব থাকল দুজনে। সুব্রত অমলকে দেখল সামান্য সময়। তারপর অল্প হাসল। 'তোর চেহারাটা আগের চেয়ে ভেঙে গেছে।'

'চেহারার কথা থাক সুব্রত, সময়ের তালে তালে ওরও জোয়ার ভাঁটা খেলে।' কি যেন ভাবল এক মুহূর্ত। নীরবে ধোঁয়া ছাড়ল। তারপর সুব্রতর চোখে চোখে চেয়ে শুধলো, কি করছিস এখন ?

'একটা দেশী কনসার্ন-এ আছি এখন। তবে শীগ্‌গীরই ওটা ছেড়ে দিচ্ছি। ক'দিন আগে একটা বিলিতী কোম্পানীতে ইণ্টারভিউ দিয়ে এলাম। ওখানেই হয়ত হয়ে যাবে।'

'তুই সি. এ. পড়ছিলি না ?'

'পাশও করে গেছি অনেকদিন।' সুব্রত আর একটা সিগারেট ধরালো।

'ওখানে লাভ কি ?'

'প্রথমত টাকা বেশী, দ্বিতীয়ত কোম্পানীর পয়সায় বাইরে ঘুরে আসার সম্ভাবনা।'

'এখন দেখছি এম. কম. না পড়ে ভালই করেছিস।' অমল নম্রভাবে হাসল।

'চান্স না পেলে অবশ্য চালিয়ে যেতাম।' যাক গে ওসব কথা, তুই কি করছিস বল।

'আগে যা করতাম এখনও তাই করছি, স্কুল-মাস্টারী। তাও এক অখ্যাত গাঁয়ে।' অমল সিগারেটের শেষাংশ অ্যাসট্রের গায়ে ঘষে নিবিয়ে দিল। একটু থেমে আবার বলল, 'প্রথমে ভেবেছিলাম, কিছুদিন কাজ করবো, রেজাল্ট বেরোলে ভাল দেখে কোথাও ঢুকবো। কিন্তু এখন দেখছি ওখানেই আমার জীবন এক রকম নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। আস্তে আস্তে

একটা নিঃশ্বাস ছাড়ল অমল। ভারী বাতাসে বুকটা যেন আটকে আসছিল। ওপরের করচের খড়খড়ি দিয়ে তখন ম্লান ফিকে একটি কালো রেখা এসে পড়েছে তাদের টেবিলে। সিগারেটের ধোঁয়ায় ওদের চোখ জ্বালা করছিল।

খাবারের প্লেট ও কফির সরঞ্জাম নিয়ে এসেছে বয়টি। টেবিলের ওপর তা রেখে আবার অন্য লোকের কাছে গেল। মরিচ এবং নুন ছড়িয়ে দিয়ে প্লেট এগিয়ে দিয়ে সুব্রত বলল, 'নে।'

অমল কফিতে দুধ ঢেলে সুব্রতর দিকে এগিয়ে দিল একটা।

খাবার শেষ করে সুব্রত জল খেয়ে মুখ মুছল। আর একটা সিগারেট ধরিয়ে কফিতে চুমুক দিয়ে অমলের মুখের দিকে চেয়ে বলল, 'একটু চেষ্টা করলে কলেজে হয়ে যেতো তোর।'

'হলো আর কোথায় বল, প্রথম প্রথম খারাপ লাগতো, এখন সয়ে গেছে।' নম্রতার শান্ত গলায় বলল অমল।

'ও জায়গা যেভাবেই হোক ছেড়ে দে তুই অমল।' আন্তরিক ও অন্তরঙ্গ শোনালো ওর গলা।

'এখন আর তা হয় না সুব্রত, কলকাতার পাট একেবারেই তুলে দিয়েছি বাবা মারা যাবার পর।' কেমন বিষণ্ণ ও ক্লান্ত শোনাচ্ছিল ওর কণ্ঠস্বর।

সুব্রত নীরবে ক'দণ্ড দেখল অমলকে। তারপর ধীর গলায় শুধোয়, 'বিয়ে করেছিস?'

'কি মনে হয় তোর?' সিগারেটে টান দিল অমল।

'কি করে বলবো!' সুব্রত হেসে দিল।

'একটা খবর অন্তত পাবি।' অমল হাসল কথাটা বলে।

কিছুক্ষণ কোন কথা বলল না দু'জনে। কি ভাবল যেন উভয়ে। একটু পরে সুব্রত মুখ তুলে তাকাল। স্বল্পক্ষণ অপলক চোখে দেখতে দেখতে ধীর গলায় বলল, 'একটা কথা তোকে জিজ্ঞেস করবো?' বলে সুব্রত চুপ করে থাকল ক' মুহূর্ত। অমলও চোখ তুলেছে। ওকে নীরব দেখে আবার বলল, শীলার ব্যাপারটা কি এখনও তুই ভুলিস নি?

চোখের দৃষ্টিতে বিদ্যুৎ স্পর্শ ছড়িয়ে পড়েছিল মুহূর্তে। সুব্রত যেন অকস্মাৎ ওর গোপন স্থানটির ওপর সযত্নে রক্ষিত আবরণটি টেনে নিল। মুহূর্তে একটা উদ্বেগ অসহায় যন্ত্রণা ফুটে উঠেছিল চোখে-মুখে। কিন্তু তা নিতান্তই ক্ষণিকের। পরমুহূর্তেই ও সামলে নিয়েছে নিজেকে। এবার স্বাভাবিক

চোখে সুব্রতর দিকে তাকিয়ে বলল, 'ভুলতে চাইলেই কি সব ভোলা যায়?' বলে হেসে দিল।

তারপর কি বলবে বুঝতে পারছিল না সুব্রত। একটু চুপ থেকে অমলই বলল, 'প্রথমে চেষ্টা করেছিলাম, পারিনি, তবে এখন আর কোন কষ্ট হয় না।' বেশ গম্ভীর ও ভারী শোনালো গলাটা।

'ওর রিসেন্ট কোন খবর রাখিস?' সুব্রত চোখ তুলল।

'না, কি হয়েছে ওর?' অমল একদৃষ্টে চেয়ে থাকল।

'হিস্ট্রী ডিপার্টমেন্টের শীতাংশুকে মনে আছে তোর?'

'আমাদের দলে মাঝে মাঝে আসতো, শীলাই নিয়ে এসেছিল ওকে।'

'শীলার সঙ্গে যে ওর বিয়ে হয়েছিল জানতিস?'

'কই জানায় নি আমায়, তবে শুনেছিলাম, আমি তখন কলকাতায়।' অমল কফির শেষটুকু এক চুমুকে নিঃশেষ করল।

'শীতাংশুর রক্তে দোষ ছিল। শীলার সঙ্গে ওর বনেনি শেষ পর্যন্ত। ও একদিন তোর কথা তুলেছিল।' দু' মুহূর্ত নীরব থেকে ভেবে নিল সুব্রত পরবর্তী কথাটা কিভাবে বলবে। ও ভুল করেছিল হিসেবে, বড় জায়গায় হাত দিয়ে। পরে অবশ্য টের পেয়েছে। আমরা তো জানি তুমি কোন ঘরের মেয়ে, কোন পরিবেশে মানুষ হয়েছো। শীতাংশুর লোভে ও পা দিয়েছিল। এ পর্যন্ত বলে আবার থামল সুব্রত। গাঢ় অলস চোখে অমলকে একবার দেখল। অমলও তার দিকে অনিঃশেষ উৎকণ্ঠায় চেয়ে আছে শেষ কথাটা শোনার জন্যে। সুব্রত এবার ধীরে ধীরে বলল, 'দিন পনেরো হলো শীলা মারা গেছে। আসলে আমাদের বিশ্বাস শীতাংশু মেরে ফেলেছে শীলাকে।' সুব্রত চুপ করল। অমল মুহূর্তে স্তম্ভিত ও বিমূঢ় হয়ে গেল যেন। কোন কথা বলতে পারছিল না। সমস্ত শক্তি তেজ তার কে যেন হরণ করে নিয়েছে এক নিমেষে। সুব্রত সিগারেট ধরালো আবার। মারা যাবার আগে আমি গিয়েছিলাম একদিন ওর ওখানে। খবর দিয়েছিল। তখন বিছানা নিয়েছে ও। আমায় দেখে খুব খুসি হয়েছিল। সারাক্ষণ সেদিন শুধু তোর কথাই বলে গেল। আমি ওকে তোর কোন খবর দিতে পারিনি। আসবার সময় ওর চোখে জল দেখেছিলাম।' ধীরে ধীরে কথাগুলো বলে গেল সুব্রত। তাকেও এখন বিচলিত ও করুণ দেখাচ্ছিল।

অমল সজাগ আহতকানে শুনে গেল সব। শীলার সম্পর্কে এরকম একটা দুঃসংবাদ শুনবে, ঘুনাক্ষরেও ভাবেনি সে। ওর ব্যবহারে আচরণে অমল

কোন কোন মুহূর্তে ক্ষুব্ধ পীড়িত ও বিচলিত হয়েছে। শীতাংশুর প্রাচুর্যের মধ্যে, ঐশ্বর্যের মধ্যে, যে একটু একটু করে ও ডুবে যাচ্ছিল, অমল তা টের পেয়েছে। ওকে বারণ করেছিল ও। তার জবাবে শীলা ওকে যা বলেছিল, তাতে নিজেকে বড় দীন ক্ষুদ্র অপমানিত মনে হয়েছিল অমলের। অন্যান্য মেয়ের মতন ও হয়তো একটি ধনী সংসারের স্বপ্ন দেখতো। অমল জানত, এই সুদর্শন বিত্তবান যুবকটির সঙ্গে কোনদিক থেকেই তার তুলনা চলে না। প্রায় রমণীই অধিকাংশ ক্ষেত্রে এরকম আকর্ষণকে উপেক্ষা করে না। তার ওপর শীতাংশু নিজে যখন এগিয়ে এসেছে। কিন্তু তার পরিণতি যে এভাবে ঘটবে তা কোনদিন ভাবেনি অমল। সংসারের আর পাঁচটা মানুষের মতনই শীলা গুছিয়ে নিতে চেয়েছিল। অনেকক্ষণ পর চোখ তুলল অমল। চোখ দুটো তার ভারী, বিষাদে যেন মগ্ন। সুব্রতর দিকে চেয়ে ধীর অনুচ্চকণ্ঠে বলল, 'শীলা তো ভাল করেই চিনতো শীতাংশুকে। প্রথমটায় আমাকেও তার কিছু কিছু বলেছে, তবু যে শেষ পর্যন্ত ও এ কাজ করেছে, সেটা ওর অপরিমিত লোভ। এত সুখ ওর কপালে তাই সইলো না। ধীরে ধীরে কথাগুলো শেষ করল অমল। গলাটা তার কেমন বিষণ্ণ ও বেদনার্ত হয়ে উঠেছে। আরো খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে একটা নিঃশ্বাস টানলো জোরে।

শীলার সঙ্গে শেষ দেখা অমলের; পরীক্ষা দেওয়ার কিছুদিন পর। অমলের সঙ্গে তখন ওর মৌন এক বিবাদ শুরু হয়েছে। শীলা তাল এড়িয়ে চলছে। অমল এক দুপুরে একদিন ওর বাড়ি গেল। শীলা তখন বেরুবার জন্যে তৈরী হচ্ছিল। অমলকে এ সময়ে দেখবে আশা করেনি ও। সামান্য অপ্রস্তুত ও ক্ষুণ্ণ হয়েছে যেন।

'আমি কাল চলে যাচ্ছি শীলা, তাই দুটো কথা বলতে এলাম তোমায়।' কোন ভূমিকা না করেই বলল অমল।

'বলো।' না চেয়ে নিস্পৃহ ঠাণ্ডা গলায় জবাব দিল শীলা।

'তোমার কি সময় হবে শোনার?'

'বেশী কথা থাকলে আজ থাক, আমি এক্ষুনি বেরোবো।' নরম মৃদু চোখে দেখল একবার।

'তুমি নাকি শীতাংশুকে বিয়ে করছো?'

'ঠিক করিনি এখনও, ভাবছি।' শীলা ঘড়ি দেখল। ঠোঁট কামড়ে হাসছিল সে। তারপর ওর চোখের দিকে চেয়ে বলল, 'তুমি বরং পরে এসো

একবার, খুব দেরী হয়ে গেছে আমার। চা না খেয়ে যেও না কিন্তু, মা তাহলে ভীষণ রাগ করবে। শীলা আর দাঁড়াল না। শীলার এরকম দুর্বিনীত গর্বিত আচরণ তার কাছে অপ্রত্যাশিত ও বেদনার। বিষণ্ণ ক্ষুব্ধ ব্যথিত মনে অমল চলে এসেছিল ওখান থেকে।

'কি ভাবছিস অমল?' সুব্রত একটা হাত রাখল ওর হাতের ওপর।

'কিছু না।' সামান্য সময় চুপ থেকে বলল, 'লোভ মানুষকে কোথায় নিয়ে যায়, তাই না সুব্রত?' অমল তাকিয়ে থাকল।

সোজাসুজি অমলের মুখের দিকে চেয়ে থেকে ও বলল, যদি লোভের কথাই বলিস, তবে একা শীলাকে দোষ দিয়ে লাভ কি? কেমন মন্থর ভারী হয়ে উঠেছে টেবিলটা। সুব্রতর খারাপ লাগছিল।

'ভুল করছিস, কাউকে আমি দোষ দিচ্ছি না। শীলাকেও না, শীতাংশুকেও না। সাধারণভাবেই বলেছি কথাটা; একথা তো আমাদের সকলের। অমল দেশলাইয়ের একটা কাঠি নিয়ে বৃত্ত আঁকছিল কাঁচের ওপর।

'সংসারে বাঁচতে গেলে এগুলোকে ছেড়ে বাঁচাও তো যায় না।'

'আমি তা অস্বীকার করি না, তবু নিজের গণ্ডী সম্পর্কে আমাদের প্রত্যেকে একটা স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার।' অমল তাকাল সামনের টেবিলের দিকে।

'তোর কথা শুনে আমার সুদীপ্তর কথা মনে পড়ছে, ওকে তো জানিস তুই। একটা সময় কী রকম পলিটিক্সের নেশায় মেতে ছিল ও। ছাত্রদের মুখে মুখে ওর নাম, বিভিন্ন ছাত্র আন্দোলনের একজন নেতা। অথচ আজ যদি দেখিস, ওকে চিনতে তোরও কষ্ট হবে এখন। একদা ছাত্র জীবনে যাদের বিরুদ্ধে ও কথা বলতো, আজ তাদের স্বপক্ষেই ওর কণ্ঠস্বর সবচেয়ে মুখর, ভাবতে পারিস? আজ আর একে ও অন্যায় মনে করে না। কেননা সামাজিক জীবনেও আজ সুপ্রতিষ্ঠ। ক্যারীয়ার তৈরী হয়ে গেছে, আবার কি।' দু'দণ্ড চুপ করে থেকে সুব্রত আবার বলল, 'আসলে কি জানিস, আমরা সকলই অল্পবিস্তর ক্যারীয়ারিষ্ট, যতক্ষণ না তা তৈরী করতে পারি ততক্ষণ অনেক বড় বড় কথা বলি। সব কিছুর জন্যে স্যাক্রিফাইস থাকা দরকার, সাফারিংস যদি না থাকে তবে আদর্শের কথাগুলো অনেকখানি জলো হয়ে যায়, তা তো জানিস তুই?'

'তোর সব কথাই হয়তো ঠিক, তবু আমি বলবো, আমাদের প্রত্যেকের চাওয়ার আকাঙ্ক্ষার একটা সীমা থাকা দরকার। বাসনাগুলো যদি সেই

সীমারেখা অতিক্রম করে যায়, তবেই কষ্টটা আমাদের বেশী। তাছাড়া এ কথা আমি স্বীকারও করি না, সুদীপ্তর মতন সকলই আমরা ক্যারীয়ারিষ্ট।' অমল রুমাল বের করে মুখটা মুছল।

'দেখছি তো সংসারে অধিকাংশেরই চরিত্র এই। জীবনে প্রার্থিত সুযোগ সুবিধাগুলো এলেই বুঝা যায় এর শক্তি। আমিও তো এক সময় অনেক বড় বড় কথা বলেছি, আজ বুঝি, নিজেরটা আগে গুছিয়ে না নিলে অনেক কষ্ট সইতে হয়। আদর্শের মর্যাদা অত সহজে কেউ দেয় না রে, দেয় না। তোর নিজের দিকেই চেয়ে দেখ না অমল, আমাদের চেয়ে তো তোর ক্যালিবার বেশী ছাড়া কম নয়, তবু কি পাচ্ছিস তুই সংসারে! আমিও তো কোনদিন যা বিশ্বাস করি না, চাকরীর জন্যে, ক্যারীয়ারের জন্যে আজ তাও বলি, সংসারে এরই কদর বেশী, বুঝলি অমল। অনেক মূল্য দিয়ে এগুলো শিখতে হয়েছে আমায়।' সুব্রতর গলার স্বর শেষের দিকে কেমন কাতর ও কোমল হয়ে এলো। মনে হচ্ছিল, এর বাইরের মুখের চেহারার তলায় যেন একটি গভীর ক্ষত ও দুঃখকে লুকিয়ে রেখেছি। এখন অসতর্ক মুহূর্তে তা বেরিয়ে পড়ল যেন।

অমল কিছু বলল না। নিজের কথাই ভাবছিল অন্যমনস্ক হয়ে। ছেলেবেলা থেকে নিজেকে নিয়ে খেয়াল খুসী মতন খেলেছে। বন্ধু-বান্ধব পরিচিত সকলই যখন মোটামুটি গুছিয়ে নিল, ও আজও এক অখ্যাত পল্লীতে পড়ে আছে। কোন বিশ্বাসেও তা জানে না। কিন্তু এখানে এলেই ব্যর্থতাগুলো যেন তাকে বেশী করে যন্ত্রণা দেয়। নিজেকে সুব্রতর সামনে এখন কেমন দীন সঙ্কুচিত মনে হতে লাগল। সে পাওনাগুলো, প্রথম থেকে সচেষ্ট হলে এক সময় অল্প আয়াসে হাতের মধ্যে আসতো, আজ আর সে সব ব্যর্থতার কথা ভেবে দুঃখ বাড়াতে চায় না অমল। তবু সময় মাঝে মাঝে তা স্মরণ করিয়ে দেয়।

সাদা পোষাক পরা ছেলেটি বিল নিয়ে এলো। সুব্রত পয়সা মিটিয়ে আরো কিছু বেশী দিল। ভিড়টা ক্রমশই বাড়ছিল। শব্দের ধ্বনি আরো উঁচুতে। 'একটা গভীর নিঃশ্বাস উঠে এলো বুকের তল থেকে। সমস্ত পরিবেশটা অমলের কাছে অকস্মাৎ বড় অপরিচিত অনাত্মীয় মনে হতে লাগল। নিজের ওপর তার অসন্তোষ ও বিরক্তি বাড়ছিল ক্রমশঃ। সামান্য উত্তেজনাও অনুভব করছে। মনে হচ্ছিল এখন, গভীর নেশা করেছিল যেন কখন, আচ্ছন্নতা কেটে গেলে দেখল, কে যেন একপাশে তাকে ঠেলে দিয়ে চলে গেছে। আর তাকে কোনদিনও ধরতে পারবে না অমল। এই মুহূর্তে

গভীর এক কষ্ট অনুভব করল ও। কালো ছায়াটা তাদের টেবিল থেকে তখন অন্য টেবিল স্পর্শ করেছে। একবার সুব্রতর দিকে নির্লিপ্ত নিরাসক্ত 'ভঙ্গিতে তাকালো ও। গুঞ্জনটা তখন শীর্ষ সীমা ছুয়ে ক্রমশ নামছিল। এবার উঠবো।' অন্য একটা টেবিলে অলস নজর রাখতে রাখতে চলল অমল।

সুব্রতও উঠে দাঁড়িয়েছে। অমল এগিয়ে গেল ক'পা। সব কিছুই তখন তার কাছে অসহ্য বিবর্ণ লাগছে। সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে অমলের মনে হলো, একটা ছবি এতকাল তার আড়ালে ছিল! নিজেও জানত না তার কথা। আজ যেন সুব্রত এসে তার ওপর থেকে আবরণটি সরিয়ে নিয়েছে নিপুণ হাতে। সেই নিরাবরণ নগ্ন প্রতিকৃতিটি ভেতরে ভেতরে তাকে এখন দুর্বল অসহিষ্ণু উত্যক্ত করছিল। কোত্থেকে আগুনের হল্কা এসে লাগছিল তার গায়। ছবিটা আর কখনও আড়াল করা সম্ভব নয় তার পক্ষে।

প্রাচীনা বাঙালী

খগেন্দ্র দত্ত

মুহূর্তের কান্না

যাক্ শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল চাল। এতক্ষণ আশা এবং নিরাশার যে ছায়াটা অজয়ের মনকে ভারাক্রান্ত করে রেখেছিল সে ছায়াটা মিলিয়ে গেল। মাঝারি গোছের থলেটার মধ্যে চালগুলো ঢেলে নিয়ে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস নিল অজয়। চোখে মুখে ভেসে উঠল একটা চাপা হাসির আভাস।

এ বাড়িতে ঢুকবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত মনে মনে সংশয় ছিল। সারা পথ ধরে ভেবেছে চাল পাওয়া যাবে কি যাবে না। বিজনদা বাড়ি না-ও থাকতে পারতেন। কিছুই করার ছিল না। পরের ট্রেনে বাড়ি ফিরে যাওয়া ছাড়া। কিছু বলারও ছিল না। মার কাছে আশ্বাস দিয়ে এসেছিল বলে ঘরে বসতে হবে এমন কি কথা আছে।

সেদিন হঠাৎ বেড়াতে গিয়েছিলেন বিজনদা। রোদের উত্তাপ তখন কমে আসছিল। ধূপছায়া রং-এর অন্ধকার ঘনিয়ে আসছিল। ঠিক সে সময় গিয়ে হাজির হয়েছিলেন। নানা কথাবার্তা হতে হতে চাল-ডালের প্রসঙ্গটাও উঠেছিল।

মা বলেছিলেন: তোমরা তো তবু একবেলার মত পাচ্ছ। অথচ আমরা?

তা অবশ্যি ঠিক। বিজনদা ধীরকণ্ঠে বলেছিলেন: রেশনিং এলাকায় থাকলে ঐটুকুন গ্যারাণ্টি অন্তত আছে।

আর আমাদের অবস্থা কি জান…মা আক্ষেপের সুরে বলেছিলেন: আড়াই টাকা তিন টাকা করে এক কেজি চাল আমরা কিনে পাচ্ছি। টাকার জোর যাদের আছে তাদের চলে, কিন্তু আমাদের?

তাই নাকি! বিজনদা অবাক হয়েছিলেন: এক কেজি চাল তিন টাকা, তাও সব সময় পাওয়া যায় না বাবা।

পেলেও ক'জনের কেনার ক্ষমতা আছে মাসিমা, যারা ভাল আয় করে তারা না হয় কিনে খেল কিন্তু যাদের আয় কম তারা?

তাইতো বলছিলাম বাবা…আমরা তো হেরে যাচ্ছি এখানে। দৈনিক এক কেজি চাল লাগে আমাদের ছোট্ট সংসারে। অর্থাৎ ত্রিশ দিনে ত্রিশ কেজি। আজকের দর চালু থাকলেও মাসে নব্বই টাকার চাল কিনতে হবে। অথচ বড় ছেলে আয় করে মাসে একশো টাকা। এখন বল তো বাবা, কি দিয়ে চাল কিনি আর কি দিয়ে বাজার-হাটের খরচা চালায় বলতে পার?

বিজনদা মার মুখের দিকে তাকাতে পারেননি। সংসারের এ বিপর্যয়ের জন্যে যেন তিনিই দায়ী এমনভাব করে বসে থেকেছিলেন চুপচাপ বসে থেকেছিলেন অপরাধীর মত।

সে কারণেই হয়তো মা তাঁর কথা বাড়াননি। তুলে ধরেননি এ অসচ্ছল সংসারের নগ্ন ছবি। আসলে তাঁর ছোট সংসারে দু'বেলা উনুনে আঁচ পড়ে না। দু'বেলা খাওয়া বন্ধ। দুপুরে ভাত রাতে মুড়ি অথবা পাউরুটি চলছে নিয়মিত। দুপুরের ভাতটাও ভরপেট নয়। ভরপেট করে খেতে অজয়ও ভুলে গেছে। দু'বেলা খাওয়া তো ওর কাছে এখন স্বপ্নমাত্র। কবে খেয়েছে তা মনে নেই। এখন সে ভাবনা এখন স্মৃতি মাত্র। অস্পষ্ট ধোঁয়াটে হয়ে আসা একটি স্বপ্ন।

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বিজনদা বলেছিলেন: এক কাজ করতে পারেন মাসিমা।

মা চোখ তুলেছিলেন। আশার আলোকবিন্দু চিকচিক করে উঠেছিল তাঁর দুটো চোখের তারায়, কী একটা স্বপ্ন যেন কেঁপেছিল তাঁর দৃষ্টির সামনে কি কাজ বাবা?

আগামী সপ্তাহে আপনাদের মেয়ে চন্দননগর যাচ্ছে। দিন সাত আট

ওখানে থাকবে। আর সে কটা দিন আমি হোটেলে খাব। কাজেই… মুহূর্তের মত চুপ করে থেকে আবার বলতে আরম্ভ করেছিলেন: সে সময় যদি অজয়কে পাঠিয়ে দিতে পারেন একটা থলে নিয়ে আমাদের চালটা নিয়ে আসতে পারেন মা যেন উল্লসিত হয়ে উঠেছিলেন। বলেছিলেন: তাই পাঠাব বাবা কিন্তু…

পরমুহূর্তে বিমর্ষ দেখিয়েছিল মাকে, মুখের রেখায় রেখায় একটা আশঙ্কার ছাপ যেন স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। জিভ দিয়ে দুটো ঠোঁট চেটে নিয়ে অপেক্ষাকৃত নীচু গলায় বলেছিলেন: ঐটুকুন তো ছেলে, পুলিশ ধরবে না তো?

না—আশ্বাস দিতে গিয়ে বিজনদা বলেছিলেন: মাত্র দু' কেজি চালতো! তার উপর ছোট ছেলে পুলিশ কিছু বলবে না।

না বাবা, পুলিশের কাছে ছোট বড় ভেদাভেদ নেই। সেদিন ওপাড়ার দুটো ছেলে বারাসত থেকে পাঁচ কেজি করে চাল নিয়ে আসবার মুখে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। ওদের ছাড়িয়ে আনতে নাকি চালতো গিয়েছেই পকেট থেকে আরও পনের টাকা গর্চা।

এটা ক'দ্দিন আগের ঘটনা?

এই তো সেদিন, বড় জোর মাসখানেক হবে।

তাহলে এরা জানে না। ইতিমধ্যে এক ম্যাজিস্ট্রেট বলেছেন দু' এক কেজি চাল বহন করা অপরাধ নয়।

তুমি যদি ভরসা দাও তাহলে পাঠাতে পারি অজয়কে।

পাঠাবেন আপনি। বিজনদার গলার স্বরে বেশ জোর ছিল। সেই জোরই আশ্বস্ত করেছিল মাকে।

তাতে আশান্বিত হয়েই মা পাঠিয়েছিলেন আজ। ভাগ্যি ভালো বিজনদা বাসাতেই আছেন। কোথাও বেরোন নি।

চালটা থলের মধ্যে ঢেলে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে রাস্তায় নামলেন। স্টেশনারী দোকান থেকে কিনে দিলেন চারখানা ব্রিটেনিয়া বিস্কুট। বললেন: স্টেশনে গিয়ে এদিক ওদিক তাকাবি না। টিকিট কেটে সোজা গিয়ে ট্রেনে উঠে পড়বি।

মাথা নাড়ল অজয়। তারপর চলতে লাগল। হাতের বিস্কুট মুখে পুরল একখানা।

মিনিট পাঁচ পথ চলতেই স্টেশন। টিকেট ঘরের সামনে বিরাট লাইন। সে লাইনে গিয়ে দাঁড়াল অজয়। টিকেট কাটল। চারআনা ভাড়া দিল।

প্রাটফরমের দিকে এগুল তারপর। সবে মাত্র একখানা লোকাল ট্রেন এল। ইঞ্জিনটা হাঁস ফাঁস করছে। কামরাগুলো থেকে অসংখ্য যাত্রী বেরিয়ে রাজপথের দিকে ছুটছে। কারও গতি দ্রুত কারও গতি মন্থর।

স্রোতের বিরুদ্ধে পা চালাল অজয়। বাঁ হাতে থলে। একেবারে তলার দিকে ভার ভার। দশ পা এগুতে গিয়ে তিন চারটে ধাক্কা পেল। দশ বছরের ছেলে অজয়, আধপেটা খাওয়া দেহ ওতেই কাহিল হয়ে এল। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘামের রেখা ফুটল।

আর একটু হলে গেটটা পার হতে পারতো। কিন্তু বিধি বাম। যমদূতের মতো দুজন কনেষ্টবল একধার থেকে এগিয়ে এসে চেপে ধরলো ওর হাত। সঙ্গে সঙ্গে থলেটাও ধরে ফেলল। অন্যজন। ধরেই ক্ষান্ত হল না। একটানে থলেটা কেড়ে নিল। সেই মুহূর্তেই বাজখাই গলা বেজে উঠলো: কি আছে?

ঘাবড়ে গেল অজয়। ঘাবড়ে গিয়ে কেঁদে ফেললো। বললো: দু'কেজি চাল।

কি ব্যাপার? কি পাচার করছিল? প্রশ্ন দুটো চঞ্চল করলো স্টেশনের যাত্রীদের। ব্যস্ত সমস্ত জনস্রোত থমকে দাঁড়ালো।

কি আছে ওতে?

একজন যাত্রী প্রশ্ন করলো।

আর কি থাকবে মশাই? আজকের দিনের সবচেয়ে যা দুষ্প্রাপ্য বস্তু।

সেটা কি?

মাত্র দু'কেজি চাল···অজয় কান্না ভাঙ্গা গলায় জবাব দিল প্রশ্নকর্তার সামনে।

মাত্র দু'কেজি চালের জন্য ওৎ পেতে আছেন আপনারা? আমি তো ভাবলাম কিনা সাংঘাতিক ব্যাপার।

ভদ্রলোক ভাবগম্ভীর থমথমে পরিবেশটাকে হালকা করে দেবার সুরে বললেন।

দু'কেজি আর দু'কুইণ্টালে কোন তফাৎ নেই আমাদের কাছে?

পুলিশ দু'জনের একজন উত্তর দিল।

দু'কেজি চাল এমন একটা ভয়ানক কিছু নয়। যাত্রীদের ভিড় থেকে

আর একজন বললো, সঙ্গে সঙ্গে গুঞ্জন উঠলো। পুলিশ দুজনকে ঘিরে ধরা জনস্রোত নড়ে চড়ে উঠলো। নানারকম হালকা মন্তব্য ছুঁড়ে মারতে শুরু করলো।

ছেড়ে দিন মশাই। খাবার চাল ধরে কোন লাভ নেই। যারা ব্যবসা করছে তাদের ধরবার চেষ্টা করুন? সে সব রাঘববোয়ালগুলোকে খুঁজুন।

আইনের চোখে রাঘববোয়াল আর চুনোপুঁটির কোন তফাৎ নেই মশাই। আইন সকলের জন্য।

পুলিশ নিজের কাজের সাফাই গাইতে গিয়ে বললো।

তাহলেও দু'কেজি চাল এমন কিছু একটা নয়। ছেড়ে দিন। বাচ্চা ছেলে, দেখে মনে হচ্ছে গরীব ঘরের। ছেড়ে দিন।

আপনারা বললেই তো ছেড়ে দিতে পারি না। আমাদেরও চাকুরী বাঁচাতে হবে।

দু'কেজি চাল ধরে চাকুরী বাঁচাচ্ছেন? বেশ, বেশ···বলতে বলতে এক ভদ্রলোক সরে গেলেন। তার দেখাদেখি আরও কয়েকজন। আবার ভীড় দেখে নতুন যাত্রী দু' একজন উঁকি মারলো।

অজয় হাত জোড় করে বললো: আমাদের ওদিকে একদম চাল পাওয়া যাচ্ছে না। তাই আমার দাদার বাসা থেকে দু'কেজি চাল নিয়ে যাচ্ছি স্যার। দয়া করে ছেড়ে দিন। আর কোনদিন আসব না।

না, না—ছাড়া হবে না।

আবার সেই বাজখাই গলা বেজে উঠলো।

ছাড়া হবে না কেন মশাই? দু'কেজি চাল ছাড়লে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে?

আর একজন পথচারী বলে উঠলো।

দেখুন, আমাদের কর্তব্য কাজে বাধা দেবেন না। দু'কেজি ধরব না দু'শো কেজি ধরব তা আমরা বুঝব।

পুলিশের লোকগুলো এবার যেন শক্ত হয়ে দাঁড়াল।

দু'শো কেজি ধরছেন কোথায়? ধরলে কি রেশন এলাকার ভেতরে অত অত চাল পাওয়া যায় চড়া দামে?

চাল কোথায় পাওয়া যাচ্ছে না যাচ্ছে তা আমরা বুঝব না। আমাদের এখান দিয়ে আমরা একমুঠো চালও যেতে আসতে দেব না। দয়া করে আপনাদের কাজে আপনারা যান।

তাও যাবো। আর আপনারা দেখুন ঐ দু'কেজি চালের জন্য পাঁচ দশ টাকা আদায় করতে পারেন কিনা। তাও পারবে বলে মনে হচ্ছে না। ঐ টুকুন তো ছেলে। দেখেই তো আর্থিক অবস্থার কথা কল্পনা করা যায়। পাঁচ টাকা দূরে থাক টিকেটের দাম বাদ দিয়ে পাঁচ পয়সাও আছে কিনা সন্দেহ আছে।

কথাগুলো বলতে বলতে সরে গেল আরও কয়েকজন। কাজের তাগাদা আছে নিশ্চয়। তাছাড়া পুলিশের লোকের সঙ্গে ঝগড়া করে পেরে উঠবে কেন? ভিড় আরও কমতে লাগলো। কিন্তু কথা কমল না। কেউ বললো: চার ছয় আনা পয়সা বাঁ হাতে গুঁজে দিলে ছাড়া পেয়ে যেত। কেউ বললে: চারটে পয়সাও দেওয়া উচিত নয়, সেদিন কোন এক ম্যাজিস্ট্রেট রায় দিয়েছেন, দু'এক কেজি চাল বহন করা আইনের চোখে অপরাধ নয়।

অজয় তখনও কাঁদছে। অঝোরে চোখের জল ঝরাচ্ছে। একবার এদিকে ওদিকে। ওদের ঘিরে থাকা লোকজনদের চোখে মুখে অসহায়ভাবে তাকাচ্ছে। যে যখন কথা বলছে তখনই তার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকছে। কিন্তু পুলিশের লোক দু'জন পথের পাশের লাইট পোষ্টের মত অনড়, অটল। এত লোকের এত অনুরোধ, এত উপরোধ, অসংখ্য ব্যঙ্গ, অজস্র বিদ্রূপ ওদের অনড় স্লেটের কংক্রিটে ঘা খেয়ে ফিরে গেল।

একজন বললো: ভিড় কমান, ভিড় কমান। আপনারা যতই বলুন আমরা ছাড়তে পারবো না একে। তাহলে ওপরওয়ালার কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হবে, আমাদের ওপরেও কর্তারা আছেন একথাটা ভুলে যাবেন না।

অজয় মনে করেছিল ঐ ভিড়ের অনুরোধে, ব্যঙ্গ বিদ্রূপে, সর্বোপরি ওর চোখের জলের ধারা দেখে ওদের জবরদস্ত পোষাকের আড়ালে হৃদয় নামক বস্তুটি বুঝি বা মুহূর্তের মত চঞ্চল হয়ে উঠবে, একটু কাঁপন জাগবে ওদের বিবেকে। মুখের কঠিন রেখা মুছে গিয়ে সেখানে কমনীয়তা দেখা দেবে, ভেসে উঠবে সহানুভূতির কোমল প্রলেপ, কিন্তু সব ব্যর্থ হয়ে গেল। কোন পরিবর্তন সূচিত হল না ওদের সিদ্ধান্তে। চোখ মুখের দৃঢ়তায় বিন্দুমাত্র শিথিলতাও দেখল না।

ওকে ততক্ষণে টানতে শুরু করেছে। নিয়ে চলেছে নিজেদের আস্তানায়। চীৎকার ছেড়ে কেঁদে উঠলো অজয়।

থমকে দাঁড়ালো ভিড়টা সচল হল। ইতস্ততঃ ছড়িয়ে পড়লো যাত্রীরা।

কেউ ভেতর দিকে পা বাড়ালো কেউ বাইরের রাজপথ লক্ষ্য করে পা চালিয়ে দিল। অল্পক্ষণের মধ্যে জমাট বাঁধা ভিড়টা ছড়িয়ে ছিটিয়ে গতি ফাঁকা হয়ে গেল জায়গাটা। নাটক দেখতে যাওয়া দর্শকের মতো নাটক শেষে যে যার পথে চলে গেল। নতুন যাত্রীর আনাগোনা সমানে চলল।

শুধু প্ল্যাটফরম জুড়ে একটা চাপা কান্নার রেশ ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। অন্য সমস্ত শ্রোতা কিন্তু দর্শকহীন মঞ্চে একটা চাপা কান্নার গোঙানী।

এতক্ষণ যেখানে দাঁড়িয়েছিল অজয় শুধু সেই জায়গাটা ভিজে ভিজে থাকলো। প্রায় পাঁচ মিনিট বাক্ বিতণ্ডার অবকাশে সেখানে ঝরে ঝরে পড়েছে অজয়ের অসহায় কান্নার ফোঁটা। বিন্দু বিন্দু ঝরেছে কিন্তু সিন্ধুর ছায়ায় রূপ নিয়েছে।

আপডাউন যাত্রীর আসা যাওয়ার পদচিহ্নে একটু পরেই নিশ্চিহ্ন হয়ে হয়ে যাবে সেই অশ্রুচিহ্ন, হারিয়ে যাবে ভিজে ভিজে ছাপ। চাপা কান্নার রেশএ মিলিয়ে যাবে দূর থেকে দূরান্তে।

কিন্তু অজয়ের মা কি জানতে পারবে চাল হাতে ট্রেনে উঠতে যাবার মুখে আইনের কড়া দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে তার আদরের ছেলে? তিনি তো আশা করে আছেন অজয় চাল নিয়ে আসবে। সে আশাতেই তো উনুনের গণগণে আঁচে ভাতের হাড়িতে জল চাপিয়ে গালে হাত দিয়ে বসে আছেন মা। দুটো কান সজাগ, দুটো চোখ দরজার দিকে স্থির নিবদ্ধ। এক্ষুনি হয়তো দেখা যাবে একখানা কচি হাসি ভরা মুখ। হাতে থলে, থলের নীচের অংশটা ভারী ভারী। কিন্তু নেই ছেলে, নেই চালের থলে, ওরা কতদূরে কে জানে।
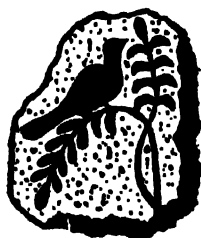
সঞ্জীবকুমার বসু

বিস্মৃত কবি রামচন্দ্র

কবি রামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন অরিয়াদহ গ্রামে ১৮৫৮ সালের আগষ্ট মাসে। পিতা ৺দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। খুব ছেলেবেলা থেকেই রামচন্দ্রের কবিত্বশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। কিশোর বয়সেই পাঁচালি, কবির গান, তর্জ্জা প্রভৃতি শুনে তিনি মুখে মুখে গান রচনা করতেন। রামচন্দ্র যখন সাধারণের কাছে অবহেলিত, তখন রবীন্দ্রনাথ অনেকের মত সেই নূতনের অবির্ভাবকে অবহেলা করেন নি। রামচন্দ্রের নিজস্ব সৃষ্টির মধ্যে প্রাচীন সুর বাজলেও পুরাতনকে আঁকড়ে ধরা স্বভাব তাঁর ছিল না। তিনি চাইতেন এগিয়ে চলতে, নূতনকে বরণ করে নেবার মত শক্তি ও উদারতা তাঁর ছিল।

রবীন্দ্রনাথের প্রভাত সঙ্গীত পড়ে মুগ্ধ হয়ে তিনি লিখেছিলেন :—

রবির সে করে হয় উদয় বিভাস।
প্রভাত সঙ্গীতে হেরি তাহারি প্রকাশ ॥
রবির আলোকে সারা দেশ হবে আলো ॥
মধুর অমৃতে মধু করিয়াছি পান।
এবে রবি নবালোকে মাতাইবে প্রাণ ॥

তাঁর এগিয়ে চলা মনের আরও পরিচয় পাই স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক একটি কবিতা থেকে। তখন দেশে মেয়েদের শিক্ষা দেওয়ার সমস্যা প্রকটভাবে

দেখা দিয়েছে, অধিকাংশ লোকই স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রী স্বাধীনতার বিরোধী। তাই যাঁরা এই ঢেউ তুলেছিলেন—

আঁধারে ছিলাম ভালো, না চাই এ আলো।
অশিক্ষা কুশিক্ষা হ'তে লক্ষগুণে ভালো ॥'

তিনি তার জবাবে লিখেছিলেন—

"অশিক্ষা কুশিক্ষা হ'তে ভাল বটে নানা মতে
মানিলাম কুশিক্ষার দোষ ;
তাই বলে কুশিক্ষায় কি দোষে ঠেলিলে পায়,
কুশিক্ষায় কেন মিছে রোষ !"

কবিতাটিতে স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতার বহু যুক্তির অবতারণা করে প্রতিক্রিয়াশীল সনাতন পন্থীদের সমস্ত যুক্তিই তিনি খণ্ডন করেছেন অতি সাবলীল ভঙ্গীতে।

ছাত্রাবস্থায় রামচন্দ্র ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী ও বুদ্ধিমান। ইংরাজী ২৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে স্থানীয় বাংলা স্কুল থেকে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় ও ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে উত্তরপাড়া গভর্ণমেণ্ট ইংরাজী স্কুল থেকে এণ্ট্রেন্স পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে বৃত্তি লাভ করেন। তারপর দুই বছর কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র ছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এফ, এ পরীক্ষার পূর্বেই তাঁকে নানা কারণে কলেজ ত্যাগ করে গভর্ণমেণ্ট ক্লার্কশিপ পরীক্ষা দিয়ে কলিকাতা টেলিগ্রাফ বিভাগে ডাইরেক্টর জেনারেলের অফিসে একটি ৫০ বেতনের কেরাণীগিরিতে প্রবৃত্ত হতে হয়। এই কেরাণীগিরি কবিত্ব প্রকাশের পথে যথেষ্ট অন্তরায় হলেও তাঁর কবি মনটিকে বিকৃত করতে পারেনি। কবি রামচন্দ্রের জ্ঞান-পিপাসা ছিল অসাধারণ, প্রাণ ছিল উদার। আজীবন দৈন্যের মুখোমুখী দাঁড়িয়ে জীবন কাটিয়েছেন কিন্তু গরীব দুঃখীদের উপর দরদ, বন্ধু-বান্ধবদের প্রতি ভালবাসা, প্রাণখোলা হাসি তামাসা, আনন্দে উজ্জ্বল প্রাণটিকে শত দৈন্যের কশাঘাতেও খর্ব করতে পারেনি। লোকের দুঃখে নিজের দুঃখের কথা ভুলে গিয়ে দান করতেন মুক্তহস্তে। তিনি ছিলেন সত্যিই আত্মভোলা উদারচেতা স্বভাব কবি।

জীবনে তিনি বহু সঙ্গীত ও কবিতা রচনা করে বাংলা সাহিত্যকে পুষ্ট করে তুলেছেন, কিন্তু তাঁর জীবিতাবস্থায় কোন পুস্তকাদি ছাপার অক্ষরে মুদ্রিত হয়নি। মৃত্যুর পর কবির বন্ধু আড়িয়াদহ নিবাসী নারায়ণ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় 'রাম পদাবলী' নাম দিয়ে তার কতকগুলি গান ও কবিতা সংগ্রহ করে প্রকাশিত করেন।

রাম পদাবলীর মধ্যে তাঁর নানা বয়সের বিভিন্ন ভাবধারার সমাবেশ দেখতে পাওয়া যায়। প্রকৃতিকে তাঁর অধিকাংশ কবিতা থেকেই বাদ দিতে পারেন নি। কবি হৃদয়ের সূক্ষ্ম রসানুভূতি ভাবসম্পদ ও প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের সমন্বয়ে তাঁর গান ও অনেক কবিতা সার্থক সৃষ্টিতে পরিণত হয়েছে। আর তাঁর সহজ প্রকাশভঙ্গী ও ভাষার স্বচ্ছতায় গান ও কবিতাগুলি হয়ে উঠেছে যেমন মধুর তেমনি হৃদয়গ্রাহী—

"লাজে কলি কাঁপিল, অলি বুঝি এলো।
আদরে অধরে ধরে মধুরে চুমিল॥
নব প্রেম রাগে, মধুর সোহাগে টুটিল গরম,
ধনি আঁখি মেলিল—
ঢল ঢল পরিমল, হেরি আঁখি ছল ছল,
অধীর ভ্রমর বুঝি পাগল হোল।"

রামচন্দ্রের কবিতা ও গানে প্রকৃতির নানা সৌন্দর্য ধরা দিয়েছে এমনিতর জীবন্ত ভাবে। প্রকৃতির সব কিছুরই জীবন আছে, মানুষের মত সব কিছুরই যেন অনুভূতি আছে, সুখ আছে, দুঃখ আছে, আনন্দ-বিষাদ আছে। আজীবন পল্লীর বুকে বাস করে পল্লীর প্রকৃতির রূপও লীলাবৈচিত্র্যকে জীবনলীলার সঙ্গে একীভূত করে নিয়েছিলেন তিনি। প্রকৃতির মধ্যে তিনি দেখতে পেতেন মানুষের জীবন লীলার ইঙ্গিত।

'সংসার দর্পণ' পত্রিকায় প্রকাশিত "জীবন স্রোত" কবিতাটিতে ক্রম পরিবর্তমান জীবনের একটি সুন্দর চিত্র তিনি এঁকেছেন। এ কবিতাটিতে তাঁর জীবনের দর্শন ভঙ্গী অতি সুন্দর ভাবে ফুটেছে। এক্ষেত্রেও প্রাকৃতিক বহু জিনিষের সঙ্গে তুলনা করে তিনি মানুষের পরিবর্তনশীল জীবনকে দেখিয়েছেন :—

"কৈশোরে সরল হাসি ফুল্ল শেফালিকার দল
ভূমে পড়ি কাঁদে লুটাইয়ে
কৈশোরে কোমল হাসি প্রভাতের শেষ তারা
ভানুকরে গেল মিলাইয়ে।
অতৃপ্ত বাসনা বক্ষে যৌবন চমকি চায়
জরার ভীষণ বেশ হেরি
আঁখি পালটিয়ে দেখে শৈশব অনেক দূরে
কাছে জরা মৃত্যু সহচরী।" ইত্যাদি'

৺ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (দামোদর শর্মা) কবি রামচন্দ্রকে সাধক বলে অভিহিত করেছেন। সত্যই ধর্মপ্রাণ কবির আধ্যাত্মিক তত্ত্ব জিজ্ঞাসু কবিতা ও গানগুলি পড়লে তাঁকে তত্ত্বদর্শী সাধক ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না। বাহ্যিক ভাবোচ্ছ্বাস নয়, কবির তত্ত্বজ্ঞানী মন মহাশক্তির সন্ধান চায়; তারি তরে তাঁর ব্যাকুলতা। আধ্যাত্মিক ভাব সম্পদে সমৃদ্ধ কবিতা ও গানগুলির মধ্যে সেই ব্যাকুলতা। সুর প্রকাশ পেয়েছে অতি সহজ ভাবে।

"শ্মশান ভালবাসিস বলে শ্মশান করেছি হৃদি।
শ্মশান বাসিনী শ্যামা, নাচবি বলে নিরবধি।
আর কিছু নাহি মা চিতে, দিবানিশি জ্বলছে চিতে
চিতাভস্ম চারি ভিতে রেখেছি মা আসিস যদি॥
মৃত্যুঞ্জয় মহাকালে ফেলিয়ে চরণ তলে,
আয় মা নেচে তালে তালে হেরি তোরে নয়ন॥

১৯৪২ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত অমরেন্দ্র নাথ রায় সম্পাদিত 'শাক্ত পদাবলী' পুস্তকে রামচন্দ্রের এই গানটি রামলাল দাস দত্তের নামে ছাপা হয়ে গেছে। 'ভারতবর্ষ' সম্পাদক শ্রদ্ধেয় ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এই ভুলের সংশোধন ও সাধারণের অবগতির জন্যে ১৩৫০ সাল শ্রাবণ সংখ্যা ভারতবর্ষে তার প্রতিবাদ জানিয়েছেন। গানটিতে কল্পিত দৃশ্যমান রূপের সঙ্গে মহাশক্তির ভাবময় রূপটিও যে সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে তার তুলনা নেই। কবি যখন শক্তি মনোভাব নিয়ে গান রচনা করেছেন সেই গানগুলির মধ্যে শক্তি ভাবধারা শক্তি সংস্কৃতি দর্শন প্রভৃতি অতি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে! আবার যখন বৈষ্ণব মনোভাব নিয়ে পদ রচনা করেছেন তখন সেগুলি হয়ে উঠেছে পুরোপুরি বৈষ্ণব কবিতা। শ্রীরাধিকা ও শ্রীকৃষ্ণের যুগল মিলনের একটি সম্পূর্ণ চিত্রে কবি তাঁর যে সৃষ্টি নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন তাতে তাঁকে সেই যুগের শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব কবিদের অন্যতম বলে ধরে নিলে বাহুল্য হবে না। পদটি অনেক বড়, এখানে সবটুকু তুলে দেওয়া সম্ভব নয়, তাই শ্রীরাধিকা যখন বাঁশীর রব শুনে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলনের আশায় যাত্রা করেছেন শুধু সেই অংশটুকু তুলে দিচ্ছি,—

"কি বা শ্রীমুখমণ্ডল, শ্রুতিমূলে কুণ্ডল,
দিল মৃগমদ তিলক ভালে,
তাহে খঞ্জন-গঞ্জন নয়ন রঞ্জন দিল অঞ্জন নয়ন কোণে।

তখন ধাও ধনি, চন্দ্র বদনি, মঞ্জু কুঞ্জকাননে,
অঞ্চল চির চঞ্চল, চীর মন্দ মলয় পবনে।
সঙ্গেতে সঙ্গিনী নবরস রঙ্গিনী ভেটিতে চলিল ত্রিভঙ্গে,
ঘুন্তুরু রুণু রুণু কটি তটে কিঙ্কিনী রুণু রুণু বাজিল সুরঙ্গে,
কিবা গঞ্জিত গতি, মন্থর অতি, কুঞ্জর বর গামিনী,
পদ পঙ্কজে মণি মঞ্জির তাহে মত্ত মধুপ গুঞ্জিনী।
তখন চলিল ধনি বাঁশী রব ধরি।"

পদটির মধ্যে শ্রীরাধার ভাববিহ্বলতা এমন সুন্দর ভাবে প্রকাশ পেয়েছে যা পড়লে মুগ্ধ হতে হয়।—

"বাঁশী না শুনিতে পায়, নূপুর খুলিল পায়
কটি হতে খুলিল কিঙ্কিনী।"

এমনিতর সূক্ষ্ম ভাব ও কবির রসদৃষ্টির গভীরতায় পদটি যেমন প্রাঞ্জল তেমনি মর্মস্পর্শী।

ভাষার সাবলীল গতি ও ভাবের গভীরতায় প্রত্যেকটি গান সার্থক সৃষ্টি হয়ে উঠেছে। একই মানুষের রচনায় এমন বিভিন্ন ভাবধারার সুষ্ঠু প্রকাশ খুব অল্পই দেখতে পাওয়া যায়। শক্তি সংস্কৃতি ও বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন একদিকে যেমন তাঁর জ্ঞানের পরিধিকে বিশাল ও মনকে সম্পূর্ণ ভারতীয় করে তুলেছিল তেমনি আবার ইংরাজী শিক্ষার মধ্যে নিয়ে পাশ্চাত্য সংস্কৃতিকেও তিনি আয়ত্ব করে নিতে পেরেছিলেন আপন চেষ্টায়।

নানা শাস্ত্রে গভীর জ্ঞান, অপূর্ব কবি প্রতিভা ও ভাষার ওপর দখল থাকায় কবি এমন বিভিন্ন ভাবধারা সমন্বিত নানারূপ গান ও কবিতা রচনায় সাফল্য লাভ করেছেন।

১৯৬৩ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর মাত্র ৪০ বছর বয়সে কবির লোকান্তর হয়। বর্তমান রসিক পাঠক সমাজে রামচন্দ্রের কবি প্রতিষ্ঠার অজ্ঞাত থাকলেও যাঁরা তাঁর কবিত্ব শক্তির পরিচয় পেয়েছিলেন তাঁরা আজও তাঁকে ভুলতে পারেন নি। তিনি আজও তাঁদের মনে বেঁচে আছেন তাঁর সেই উদার কবিপ্রাণ নিয়ে।

মূল লেখিকা—ডাফনে ডু মুরিয়ার
অনুবাদ—আভা পাকড়াশী

বহ্নি ও পতঙ্গ

প্রথম স্তবক

হোটেলের বারান্দায় তার নিজস্ব স্যুইট-এ ইজিচেয়ারে গা ঢেলে শুয়ে রয়েছে মারকুইস। গায়ে শুধু তার একটা হাল্কা সিল্কের চাদর জড়ান। চুলগুলো সে সবে ক্লিপ আটকে সেট করেছে। সেই সেট করা চুল বাঁচাতে মাথা ঘিরে রিবন বেঁধেছে। সেই রিবনের রংএ চোখের রংএর ছোঁয়া। হাতের কাছে ঐ ইজিচেয়ারের পাশে ছোট একটা টিপয়, তাতে তিনটে তিন রংএর নেল পালিশ রাখা রয়েছে। নিজের তিন আঙুলে তিনটে রং লাগিয়ে এখন সে চোখের সামনে হাতটা তুলে ধরে ভাবছে কোনটিকে সে বেছে নেবে। নাঃ এই বুড়ো আঙুলের রংটা যেন বড্ড লাল তার এই সাদা দুধের মত নিষ্কলঙ্ক হাতে যেন রক্তের ছিটে লেগেছে। তর্জ্জনীর এই ফিকে গাঢ় গোলাপিও ভাল না। যেন তার মেজাজের সঙ্গে এর মৌতাত জমছে না। এই রং-টি মানায় বিরাট রংদার পার্টিতে। দূর থেকে বেশ করুণ বেহালার সুর ভেসে আসবে আর সে যখন অমনি রংএর বলনাচের গাউনটি পরে মুক্তোর গয়নায় রাণীর মত সেজে অলিচ পাখীর পালকের তৈরী পাখাটি নেড়ে মৃদুমন্দ বাতাস খাবে। তখন নিমন্ত্রিত অতিথিদের চোখ ঠিকরে যাবে এই গাঢ় গোলাপীর আভায়।

কিন্তু মধ্যমার এই নীলাভ অপরাজিতার রং। বেশ মিষ্টি রংটি। যেন লাজুক কুঁড়িটি ফুল হয়ে ফুটতে তার এখনো অনেক দেরী। সবে প্রভাত সূর্যের আলো পড়ে লালচে আভা ছড়াচ্ছে কিন্তু গায়ে লেগে আছে রাতের

কুয়াশার স্পর্শ। যেন শিশির সিক্ত আলোর আভাস! নীচের লনের দিকে চেয়ে দেখল, লনের ধারে ফোটা ঐ পিওনি ফুলগুলো ব্রীড়াবনত ভঙ্গীতে ঘাসের দিকে মাথা ঝুকিয়ে রয়েছে। সূর্যের তাপ থেকে বাঁচবার জন্য পাপড়িগুলি ঘুরে রেখেছে ঐ তো ঐ ফুলের রং। এটিই ভাল—এই সিদ্ধান্ত নিয়ে এবার সে স্পিরিটে তুলো ভিজিয়ে অন্য আঙ্গুলের রং তুলতে লাগল। তারপর সুদক্ষ শিল্পীর মত ব্রাসের কয়েকটি পোঁচ দিয়ে সমস্ত নখগুলিতে সেই পিওনি ফুল ফুটিয়ে তুলল। এইটুকুতেই সে পরিশ্রান্ত হয়ে আবার সেই চেয়ারে ডুবে গেল। পায়ের পাতার দিকে চেয়ে ভাবতে লাগল এই জলপাই রং দিয়ে সে এখুনি পায়ের নখও রাঙাবে। তাড়াতাড়ি কিসের! এখনো প্রচুর সময় রয়েছে, দীর্ঘছন্দ গ্রীষ্মের দিন! এখনো সন্ধ্যে হতে অনেক দেরী। সমস্ত শরীরটা আরামে ঢেলে দিয়ে গদি আঁটা ইজিচেয়ারের নরম কোলের মধ্যে ডুবে যায় সে, ভাবে একটু বিশ্রাম করে নিই তো আগে। সন্ন্যাসিনীর আশীর্বাদের ভঙ্গিতে হাত দুটো নেড়ে নেড়ে সে নখের রং শুকোতে লাগল।

চোখ দুটো বন্ধ করে সেই রৌদ্রভরা দিনের নিঃসঙ্গ নিরুদ্বেগ আশ্লেষটুকু পান করতে লাগল সে। নিচের বারান্দায় যেন কে চেয়ার টানল—ডাইনিং রুম থেকে বয় যেন কাকে কি নির্দেশ দিল। লনের ওপরে ডোরা কাটা ঐ বড় বড় ছাতার তলায় বাবুর্চিরা টুং টাং শব্দে ছোট ছোট টেবিল সাজাচ্ছে—কোথায় যেন কে শব্দ করে খাটে বসল ছোট বাচ্ছাদের খিল খিল হাসির শব্দ তার দুটিও হয়ত ঐ সঙ্গে আছে কিন্তু এ সবই যেন দূরাগত কোন জীবনের স্পন্দন, স্বপ্নের ঘোরে তাকে শুধু ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে আর নিরন্তর কানে বাজছে অশান্ত সমুদ্রের সেই ক্লান্তিবিহীন ঢেউ-এর উচ্ছ্বাস। তপ্ত বালু বেলাকে স্নিগ্ধ করবার সেই অক্লান্ত প্রয়াস। আর সেই ব্যর্থতার দীর্ঘশ্বাস যেন দীর্ঘরেখা টেনে চলেছে তার অন্তরে।

নীচের টেরেসে কে যেন কফির অর্ডার দিল। কার সিগারেটের গন্ধ যেন ওপরে ভেসে আসছে। চেয়ারের দুপাশে ওর হাত দুটি আলগোছে, ঝুলছে যেন বৃন্তহীন দুটি পদ্মডাঁটা—কবির ভাষায় হয়ত একেই বলে মৃণালভুজ। তার মগ্ন চৈতন্যের অন্তরালে অনুভব হচ্ছে যেন এই সীমাহীন বিশ্রামে কত প্রশান্তি! এমনি করে যদি সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পড়ে থাকে তাতেই বা কি আসে যায়! ওঃ ছুটি, ছুটি, কি তৃপ্তি! কিন্তু কই। এতে তার অন্তর সাড়া দিচ্ছে কই! সেই নিঃসঙ্গতার বাঘটা যে তার মনের আড়ালে ওত পেতে বসে থেকে একাকীত্বের গুরুত্বটাকে প্রতিটি আঁচড়ে অনুভব করাচ্ছে, এর হাত থেকে তার

নিষ্কৃতি কই। এই স্বাধীনতার আনন্দ সে তেমনি করে উপভোগ করতে পারছে কই।

কোথা থেকে একটা ভোমরা ছুটে এসে ভোঁ ভোঁ শব্দে সেই নেল পালিশের বোতলগুলো ঘিরে চক্কর দিতে লাগল। সেই শব্দে চোখ মেলে তাকাল মারকুইস আবার পরক্ষণেই ভোমরাটা উড়ে গিয়ে নীচের লনের ধারে একটা ফোটা ফুলের ভেতর ঢুকে গেল। সেখানে একটি ছোট্ট ছেলে তার শব্দে আকৃষ্ট হয়ে নিশ্চিন্তে মধু আহরণে তাকে বাধা দেওয়ায় আবার সে ওপরে ছুটে এলো। এবারে ওর তন্দ্রা ছুটে গেল—হাত বাড়িয়ে এডোয়ার্ড ওর স্বামীর চিঠিটা মাটি থেকে কুড়িয়ে নিল।

সোনা আমার,—

আমি সত্যি বলছি, এত কাজে জড়িয়ে পড়েছি না, যে কিছুতেই সময় করে তোমাকে আর বাচ্ছাদের আনতে যেতে পারছি না। তুমি তো জান আমার এই ব্যবসাতে সাহায্য করবার মত একটি নির্ভরযোগ্য লোক নেই আমার। যেটি নিজে না দেখব সেটি হবে না। তাই বলছি তুমি এই কটা দিনে শরীরটা সারিয়ে নাও, সমুদ্রের হাওয়া তোমার স্বাস্থ্যের পক্ষেই ভাল, সমুদ্রে স্নান কর, সাঁতার কাট, বেড়াও, ঘুমোও, এই করতেই মাসটা শেষ হয়ে আসবে, আর মাসের শেষেই দেখবে আমি ঠিক পৌছে গিয়েছি। হ্যাঁ, মাকে একদিন দেখতে গিয়েছিলাম মেভিলিনও ভাল আছে···। চিঠিখানা আবার বারান্দার মেঝেয় উড়ে গিয়ে পড়ল—মারকুইস-এর সেই নিখুঁত সুন্দর ঠোঁটের এক কোণে একটি বেদনা বিধুর হাসি। কাজ, কাজ আর কাজ, জমিদারী, ফার্ম, জঙ্গলে কাঠ চেরাই থেকে নিয়ে ব্যবসা সবই তাকে দেখতে হবে সব কিছুর জন্যই তার সময় হয় শুধু স্ত্রীর প্রয়োজনে তার এতটুকু সময় নেই। এই তো তার স্বামী। হুঁ অথচ বাইরে থেকে দেখতে গেলে লোকে ভাবে সে যেন পরীর রাজ্যের রাণী! অমন রূপবান বিত্তবান স্বামী। প্যারিসের মত জায়গায় বিরাট প্যালেস—বিরাট জমিদারী, চাকর দারোয়ান হামেসা আসতে যেতে সেলাম জানায়। কেমন সুন্দর গালভরা নাম মাদাম-লা-মারকুইস। ফুটফুটে দুটি মেয়ে—শরীর ভরা স্বাস্থ্য। আর কি চাই। খেটে খাওয়া এক ডাক্তারের মেয়ে, যার মা চির রুগ্ন, তার আবার আর কি চাওয়ার থাকতে পারে। মঁসিয়ে-লে-মারকুইস এলেন আর তাকে বিয়ে করে ফেললেন, না হলে বাবার অ্যাসিসট্যান্ট সেই কম বয়েসী ডাক্তারটির সঙ্গে হয়ত তার শেষ পর্যন্ত বিয়ে হত। কিন্তু এই বিয়ে দেখে তো আত্মীয় স্বজনরা ধন্য ধন্য করে বলেছিল আহা যেন

রাজযোটক। কিন্তু বিয়ের পরের সেই চমক আর রইল কোথায় দিনগুলো সুতোর গাঁথা সমান মাপের পুঁথির মালার মত একঘেয়ে হয়ে উঠল। চল্লিশোত্তীর্ণ মঁসিঃয়-লে-মারকুইস জীবনে প্রতিষ্ঠিত কিন্তু তাঁর প্রাসাদ সাজাতে একটি সুন্দরী স্ত্রীর দরকার ছিল, সেই প্রয়োজন যথাযথ ভাবেই মিটিয়েছে মারকুইস। তাদের দুটি মেয়েও হয়েছে। মোটামুটি একরকম সুখী বইকি তারা। আরাম চেয়ার থেকে উঠে ঘরে এসে ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে চুলের ক্লিপগুলো খুলতে লাগল সে। এইটুকু পরিশ্রমেই ঘেমে উঠেছে। চাদরটা খুলে ফেলে একেবারে নগ্ন হয়ে বসল এবার। অথচ লিয়নস্-এর কথা মনে করলে দিনের পর দিনের সেই মধুর স্মৃতিতে আজও আকুল হয়ে ওঠে ও। সেই তার বন্ধুরা। বিয়ের আগের কথাগুলো মনে পড়ে যায় ওর। সেই রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাবার সময় কেউ তাদের দিকে তাকালে সকলের মিলিত চাপা হাসি, সেই চুপি চুপি চিঠি পড়া। শোবার ঘরে বসে ফিস ফাস লুকানো কথা! নিষিদ্ধ আলোচনা ছাড়াও কি সুন্দর একটা অন্তরঙ্গতার উত্তাপ ছিল তাদের বন্ধুত্বে। কারণে অকারণে কি উজ্জ্বল হাসিই না হাসত তারা। কিন্তু এখন তার একটিও তেমন বিশ্বাসযোগ্য বন্ধু নেই যার কাছে সে তার প্রাণের মনের কথা বা ব্যথা বেদনা উজাড় করে দিয়ে একটু হাল্কা হতে পারে। কিম্বা ইচ্ছে মত কারো কাছে হাসতে বা কাঁদতে পারে।

মাদাম-লা-মারকুইস হবার পর থেকেই তার সহজ হাসি শুকিয়ে গেছে। ওজন করে কথা, দেঁতো হাসি আর মাত্রা রেখে চলা হল এদের পারিবারিক ঐতিহ্য। এদের সকলেই জীবনে প্রতিষ্ঠিত। এডোয়ার্ডের, মা, বোন, ভাই, ভগ্নিপতি সবাই ঐ একই রকম আভিজাত্যের ছাঁচে ঢালা। এমন কি শীতের মরশুমেও প্যারিসে একটি নতুন মুখ দেখবার উপায় নেই। যদি থাকে তাতেই বা কি! সে এত বড় বংশের বৌ, সুতরাং সে কি করে হাল্কা কথা বলবে বা প্রাণ খুলে হাসবে। শুধু তার একমাত্র আনন্দ ছিল যখন এডোয়ার্ড তার বিজ্‌নেস পার্টনারদের পার্টি দিত তখন। তারা তার রাণীর মত অপরূপ রূপের প্রশংসা করত। তার হাতে চুমো দিয়ে সেই সৌন্দর্যকে সংবর্ধনা জানাত তারা।

এদিকে পুরোদমে পার্টি চলত আর সে হয়ত ওর রূপমুগ্ধ কোন একজনকে নিজের অনুসঙ্গী ভেবে নিয়ে তার সঙ্গে একটা সময় ঠিক করে নিত। ট্যাক্সিতেও চড়ে বসত ঠিক সেই সময় ভয়ে হয়ত বুকটা তার দুড় দুড় করত, তবু একটা

অচেনা বাড়ীর সিঁড়ি দিয়ে উঠে কাঁপা কাঁপা হাতে বেলটা চেপে ধরত। বন্ধ দরজাটা নিঃশব্দে খুলে যেতে আর সে বেপথুমতী অভিসারিকার মত সেই অজানা ঘরের আকর্ষণে আপনাকে সমর্পণ করত। ওঃ কি রোমাঞ্চ! কিন্তু ওসব কিছুই ঘটত না শেষ পর্যন্ত। পার্টি শেষে অভিবাদন জানিয়ে বাইরের লোকেরা সব বেরিয়েই চলে যেত! অন্তরে আর কেউ সাড়া জাগাত না, বরং মনে হত না লোকটার দাঁতগুলো তো সব বাঁধান। হোক বাঁধান তবু তার মাদকতা ভরা এই মুগ্ধ দৃষ্টি। সে যে বার বার ফিরে ফিরে তাকে দেখছিল আর সে যে ঐ দৃষ্টির কাঙাল।

এবার সে তার চিন্তার থলির মুখ বন্ধ করে একদিকের চুলটা বেশী করে কাঁপিয়ে তুলল আর তার নখের রংএর সঙ্গে মেলান সোনালী পাড় দেওয়া একটি রিবন বাঁধল মাথায়। ততক্ষণে চুলে একটা নতুন ধরণ আলতে পেড়েছে সে, এবার সাদা সিল্কের ফ্রকটা গলিয়ে নিতে সিফন স্কার্টটা যেমন তেমন করে কাঁধে ফেলে ঐ ডোরাকাটা ছাতার তলায় গিয়ে লাঞ্চ খেতে বসবে। মেয়েদেরও নিয়ে যাবে। আশ পাশের সবাই ওর দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকাবে ও ইচ্ছে করে একটু নীচু হয়ে হয়ত মেয়ের চুলটা একটু ঠিক করে দেখব পুরুষদের তখন কোনখানে আটকে যাবে সে জানে আর মেয়েরা ভাববে, আহা কি স্নেহময়ী জননী।

মাতৃত্বেই তো নারীর রূপের বিকাশ।

কিন্তু তখন! আয়নার সামনে রয়েছে একটি নগ্ন নারীদেহ আর নিরুৎসাহ মুখ। এত ঐশ্বর্য তার দেহে। অথচ অন্যান্য মেয়েদের কত প্রেমিক থাকে। কত কেলেঙ্কারীর কথা কানাকানি হতে সে শুনেছে। সেবারের সেই বিরাট পার্টির দিন এডোয়ার্ড বসেছিল টেবিলের ওমাথায় তার মধ্যেই একটি মহিলা ইঙ্গিতে ভঙ্গিতে কি যেন বললেন অন্যেরা কেউ ভুরু নাচাল কেউ মুখ কুঁচকোল, কিন্তু সবাই বেশ উপচিয়ে উঠল। তবে উটকো বড় লোকদের ব্যাপার নয়, তাদের মত আভিজাত্যপূর্ণ ঘরেও তো এমন কত ঘটনা ঘটে।

সেই যে একটা টিপার্টিতে একটি মহিলা বললেন আমায় ভাই তাড়াতাড়ি ছেড়ে দাও আর এক জায়গায় যেতে হবে। কে জানে কোথায় গেলেন তিনি হয়ত মিনিট কুড়ির মধ্যেই জামাকাপড় ফেলে দিয়ে কারুর বুকের ভেতর আশ্রয় নিয়েছিলেন, তারপর…।

এমন কি যে এলিস তার আইবুড়ো বেলায় বন্ধু, মাত্র ছ'বছর হয়েছে তার

বিয়ে হয়েছে তারও কিনা একটি মনের মানুষ আছে। সে আবার কখনো তার নাম ধরে লেখে না—লেখে "মন আমি।" হপ্তায় বার দুয়েক তার সঙ্গে দেখাও করে। সে ভদ্রলোকের একটি মোটর আছে তাতে চড়ে দুজনে হাওয়া হয়ে যায়। এমন কি কড়া শীত পড়লেও তাদের সোমবার আর বৃহস্পতিবার ফসকায় না। বারে বারে তাকে এলিস লেখে—ক'জন তার প্রেমিক আছে? কিভাবে তাদের সঙ্গ সে উপভোগ করে? সে সব জানতে চায়। বলে এইটুকু একটা ছোট্ট ব্যাপার শুনে নিশ্চয়ই তুমি হাসছ তুমি আমায় প্যারিসের কথা লেখ, সেখানে তুমি কি করছ, কেমন সব পার্টিতে যাচ্ছ সব লিখবে আমায়। কিন্তু কি লিখবে সে তাকে! তাই ঐ একঘেঁয়ে পার্টির পর পার্টি আর গাড়ীতে করে চুল সেট করতে গিয়ে যেটুকু প্যারিস দেখে সে সেই সব বাদ দিয়ে নতুন তৈরী ফ্রকটার বর্ণনা দিয়ে দু'একটা চুটকি হাসির কথা বলে চিঠি শেষ করে দেয়।

হোটেলের জমাদার বোধহয় ঘর ঝাঁট দিতে এসে তাকে এমনি অবস্থায় দেখে বেরিয়ে গেল। শুধু তার ঝাঁটার ডগাটুকু দেখতে পেয়েছে ও। লোকটা তো জানে সে বাইরে যায় নি। এই তো একটু আগেই সে বারান্দায় ইজিচেয়ারে শুয়েছিল। তবে কেমন করে তাকিয়ে ছিল লোকটা। বোধহয় তাকে দেখে ভাবল, আহা এমন সুন্দর একটি মেয়ে কিন্তু কি নিঃসঙ্গ।

ওঃ কি সাংঘাতিক গরম। সমুদ্রের ধারেও এক ফোঁটা হাওয়া নেই। গলা থেকে বুক অবধি ঘামের ধারা গড়িয়ে চলেছে।

এবার সেই সাদা ফ্রকটা টেনে নিয়ে তাড়াতাড়ি পরে নিয়ে স্কার্টটা আলগোছে গায় জড়িয়ে বারন্দায় বেরিয়ে এসে নীচের দিকে ঝুঁকল। চোখে কালো চশমা কিন্তু সারা গায়ে তার রোদের আভা, যেন সদ্য ফোটা একটি সূর্যমুখী। মেটালের রেলিংটায় ছ্যাকা লাগছে হাতে তবু সে নীচের দিকে চেয়ে রয়েছে—একটি পুরুষের পুরুষ কণ্ঠস্বরের সঙ্গে একটি মহিলার সুরেলা হাসি খেলে গেল। আবার সেই সিগারেটের গন্ধ ভেসে আসছে। গেলাসের টুংটাং শব্দ শোনা যাচ্ছে। একটা অ্যালসেসিয়ান কুকুর গরমে ধুঁকছে, জিভ দিয়ে ওর ঘাম পড়ছে, একটা ঠাণ্ডা কোণ খুঁজছে ও। বালির উপর দিয়ে কটি পুরুষ মূর্তি দৌড়ে আসছে—খালি গায় রোদ পড়ে যেন মনে হচ্ছে ব্রোঞ্জের মূর্তি। নিশ্চয়ই ড্রাই মার্টিনীর টানে আসছে হোটেলে—এর মানেই অ্যামেরিকান। ঝপাঝপ তোয়ালেগুলো চেয়ারের ওপর ছুঁড়ে ফেলল অ্যালসেসিয়ানটাকে শিষ দিয়ে ডাকল, কি স্ফূর্তিবাজ মানুষগুলো। কেমন

বেপরোয়া ছেলেমেয়ে মিশিয়ে বেশ বড় করে দল বেঁধে ঘুরে বেড়ায়, যখন যা ইচ্ছে হচ্ছে তাই করছে। যেখানে ইচ্ছে বেড়াতে যাচ্ছে, কোন আব্রু নেই, বাঁধন নেই, এদের দেখে দেখে ওর মনে কেমন যেন একটা ঈর্ষার কাঁটা বেঁধে। কিন্তু এদের এই মুক্ত বিহঙ্গের মত জীবনে রোমাঞ্চের সুযোগ কোথায়। আধ ভেজান কপাটের আড়ালে দাঁড়িয়ে কোন উৎকন্ঠিত বিরহিনী এদের জন্য প্রতীক্ষা করে না।

রেলিংএর ধারে রাখা টব থেকে একটা ফুটন্ত গোলাপ ছিঁড়ে নিয়ে ঠিক বুকের নীচে ফ্রকের ভিগলার শেষ প্রান্তে আটকাতে আটকাতে মারকুইস ভাবে ভালবাসা একটা অন্য জিনিষ। অন্তরের গভীরে থাকবে তার অনুভূতি অনুভবের প্রচ্ছন্নতায় থাকবে তার আকুলতা আর শুধু দুটি অব্যক্ত মনের মৌনতার গভীরে হবে ভাবের নিবিড় আদান প্রদান। সেখানে থাকবে না কোন কথার চাতুরি বা ভাবের বহিঃপ্রকাশ কিম্বা উজ্জল হাসি। গোপন মিলনের মাধুর্যটুকুই হল আসল। সেই যে উত্তেজনা ভয়, উৎকণ্ঠা চুরি করে একটুখানি পাওয়া সেই তো অনেক, তারপর ধীরে ধীরে সেই ভালবাসার কুঁড়ি পাপড়ি ফেলবে, চতুর্দিকে তার সুবাস ছড়াবে তখন ভয় ভেঙ্গে গিয়ে আসবে বিশ্বাস। সত্যিকারের বন্ধুর সঙ্গে কোন দেনাপাওনার হিসেব থাকে না। দেহের কামনা মেটানই তো একটা বড় কথা নয়, সে তো যে কোন রবাহুত লোকও মুহূর্তের ঐ আনন্দটুকু দিতে পারে। কিন্তু অন্তরের অন্তরালে ঐ আলো! ভালো না বাসলে ঐ প্রেমের প্রদীপ জ্বলে না। সমুদ্র স্নান শেষ করে একে একে সবাই এসে হোটেলে ভীড় করছে। গাড়ীর পর গাড়ী আসছে এরা শুধুই লাঞ্চ খেতে আসছে। সকালের সেই ঝিমিয়ে পড়া হোটেল যেন আবার জেগে উঠেছে। বেয়ারাদের যাতায়াত, বাসনের কাঁটা চামচের সঙ্গে প্লেটের আত্মীয়তার ধাতব শব্দ—মৃদু-গুঞ্জন সিগারেটের ঘন ধোঁয়া কোথাও তিনজন কোথাও ছয়জনে মিলে টেবিল ফিরে বসে নানা রকম সুখাদ্য খাচ্ছে। বেশীর ভাগ মানুষগুলিরই মুখ চেনা। পারিপার্শ্বিক এখন এমনই সরগরম যে সমুদ্রের ঢেউএর শব্দও আর ভাল শোনা যাচ্ছে না। হয়ত এখন জোয়ার শেষে সমুদ্রে ভাটার টান ধরেছে হবে।

ঐ যে ডোরাকাটা সানস্যুট পরে তার ইংরেজ গভর্নেসের সঙ্গে স্নান শেষ করে মেয়েরা ফিরছে। এলোমেলো সোনালী চুলে সোনালী রোদ পড়েছে। বারান্দায় তাকে দেখে—মেয়েরা মা মণি! মা মণি করে হাত নেড়ে চেঁচিয়ে উঠল। সেও হাত নাড়ল। ওদের দৃষ্টি অনুসরণ করে এবার অনেকেই

ওপর দিকে চাইছে। নিজে দেখছে আবার সঙ্গের বন্ধু বা বান্ধবীকে ইসারায় দেখিয়ে দিচ্ছে। ওদের প্রশংসা ভরা দৃষ্টি দেখেই ওরা কি বলাবলি করছে তা মারকুইস বুঝতে পারছে নিশ্চয়ই বলছে কি সুন্দর দেবশিশুর মত মেয়ে দুটি! আর দেখ দেখ ভদ্রমহিলাকে কি অপূর্ব দেখতে। মাদাম-লা-মারকুইস হবার পর থেকে দিনের পর দিন ধরে এমনি প্রশংসা আর স্তুতি সে শুনে আসছে। এতে সে সাময়িক একটু আনন্দ পায় মাত্র, কিন্তু এর কোন স্থায়িত্ব নেই। সাঁতার কাটতে, লক্ষ খেলতে, টেনিস খেলতে গিয়ে প্রতিদিনই তো এসব সে শোনে। কিন্তু ঐ অবধিই কি সুন্দর। কত আভিজাত্য পূর্ণ। এমনি সব বিশেষণে ভূষিত করে তারা দূরেই থেকে যায়, আর শেষ পর্যন্ত সে যে একা, কে সেই একা। বাচ্চা দুটি আর মিস ক্লেকে নিয়েই তার দিন কাটে।

মামণি। আমি বালুর চড়ায় একটা তারা মাছ দেখেছি, যখন আমরা বাড়ী ফিরে যাব আমি ওটাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব।

—ছোটটি অমনি মাথা ঝেঁকে বলে ওঠে, মোটেই না আমি আগে দেখেছি ওটা আমার। বড় বোনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সে। দুজনে ছুটোছুটি লেগে যায়। মারকুইস বলে আঃ তোমরা দেখছি আমার মাথাটা এবার ধরিয়ে ছাড়বে।

মিসেস ক্লে ওদের দুজনকে ছাড়াতে ছাড়াতে উদ্বিগ্ন ভাবে জিজ্ঞেস করে মাদাম কি ক্লান্ত। তা যা গরম পড়েছে এতে সকলেরই ক্লান্ত লাগে। দুপুরের খাওয়ার পর অমনি একটু বিশ্রাম নিলে আপনার ভাল লাগবে। অবশ্য দুপুরটা সকলের বিশ্রাম করা ভাল। এই বলে নিজের বিশ্রামের ব্যবস্থাটাও পাকা করে নিল।

উঃ বিশ্রাম! বিশ্রাম আর বিশ্রাম! বিয়ে হয়ে পর্যন্ত সে শুধু দুটি কথা শুনছে ওঃ কি শীত পড়েছে কোথাও বেরিও না, আর নয়ত বড্ড গরম এখন কোথাও যেও না। তার প্যারিসের বাড়ীতেও দুপুর দুটো বাজল কি জানলা শার্সি সব বন্ধ হল—বিছানা পাতা হল—যে যার শুয়ে পড়ল। তার ননদ—তার শাশুড়ী সকলের ঠিক এক অভ্যেস। তারা তাকেও অমনি মোমের পুতুল করে তুলেছে। তার স্বামী থেকে আরম্ভ করে গভর্নেস পর্যন্ত সবাই বলে বিশ্রাম কর। তার সারা জীবনটাই তো একটা মস্ত বড় বিশ্রামের দিন। কারুর জন্য তার কিছু করবার নেই, ভাবনার নেই চিন্তা করবার নেই, আছে শুধু অখণ্ড অবসর সুতরাং বিশ্রাম কর। সহজে তার

গলার সেই মোলায়েম স্বর নষ্ট হয় না, কিন্তু আজ তার স্বভাব বিরুদ্ধ উঁচু গলায় সে বলে উঠল—না। আমি মোটেও ক্লান্ত নই। আমি লাঞ্চের পর আজ শহরে বেড়াতে যাব।

মিস ক্লের চোখ দুটো বিস্ময়ে বড়ো হয়ে উঠেছে, ওরকম অস্বাভাবিক গলার স্বরে বাচ্চা দুটো আপনিই চুপ হয়ে যায়। তবুও মিস ক্লে আমতা আমতা করে বলে কিন্তু মাদাম এই দুপুর রোদে একা একা কি করবেন আপনি শহরে গিয়ে অর্ধেকের বেশী দোকান তো বেলা একটা থেকে তিনটে অবধি বন্ধ থাকে। বিকেলে চলুন বাচ্চারাও আপনার সঙ্গে যাবে, আমিও আমার ইস্ত্রি করার কাজটুকু সেরে নিয়ে আপনার সঙ্গে থাকব। কোন উত্তর দেয় না মারকুইস।

ছোট মেয়ে সিলেষ্টি কত আস্তে খায়। মারকুইস তাড়াতাড়ি নিজের খাওয়া সেরে নিল। হোটেল আবার প্রায় ফাঁকা হয়ে এসেছে। ও খেয়ে উঠে তাড়াতাড়ি ওপরে চলে এসে নিজের ঘরে ঢুকে পাউডারের পাফটা আর একবার মুখে বুলিয়ে নিল, একটু লিপষ্টিক দিল ঠোঁটে, সেণ্টের শিশিতে আঙুলটা একটু ছুঁইয়ে নিয়ে একটা ফিল্মের রোল ব্যাগে ভরল। আরও কিছু টুকিটাকি প্রয়োজনীয় জিনিষ ব্যাগে ভরে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। পাশের ঘরে মিস ক্লে তখন জানালা বন্ধ করে বাচ্চাদের ঘুম পাড়াবার জোগাড় করছে। ও পা টিপে টিপে নিঃশব্দে ওদের ঘরটা পেরিয়ে নীচে নেমে এসে একেবারে সেই ধুলোওড়া রাস্তায় নেমে পড়ল।

কিন্তু একটুখানি হাঁটতে না হাঁটতেই তার সমস্ত উৎসাহ নিভে গেল। প্রচণ্ড রোদের তাপে তার মাথায় চাঁদি ফাটছে, খোলা চটির মধ্যে দিয়ে রোদ ঢুকে তার পা পুড়িয়ে দিচ্ছে। আর সমস্ত রাস্তাঘাট জনহীন, সমুদ্রের ধারটা ধু-ধু করছে। শুধু শুকনো বালিগুলো উড়ে এসে ছুঁচের মত গায়ে বিঁধছে। ইস্ কি বোকা সে। সবাই সারা সকাল ধরে যখন এই সব জায়গাগুলো সর গরম করে রেখেছিল। সে তখন ঐ বারান্দায় একা একা ইজিচেয়ারে পড়ে ছিল, আবার এখন যখন সে পথে নেমে এলো ঠিক তখনই সবাই পথ ছেড়ে ঘরে আশ্রয় নিয়েছে। মিস ক্লের মত ঘর অন্ধকার করে বাচ্চাদের নিয়ে শুয়েছে। একমাত্র সেই ঘরের আরাম ছেড়ে উদ্দেশ্যহীন ভাবে একা একা এই রোদের তাপ মাথায় করে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। রেঁস্তোরাগুলোও ফাঁকা সিঁড়ির ধাপের নীচে একটা বাদামী রং-এর কুকুর হাঁপাচ্ছে তবু তো বেশ ছায়া আছে ওখানটায়। একটা মাছি ওকে বিরক্ত করছে। সব জায়গায় এই

মাছির ভনভনানি ডিসপেনসারির কাঁচের জানলার বাইরে থেকে ওষুধ ভরা নানা আকারের জারগুলোর মধ্যে কি আছে তা দেখেই বা ওদের কি হয়, আর মাংসর দোকানের সেই রক্তের ছিটে লাগা জারের বাইরে বসে ভনভন করেই ওরা কি পায়। কার ঘরে যেন রেডিও বন্ধ হল, হয়ত বা ঘুমের ব্যাঘাত হচ্ছিল। কাদের বাড়ীতে যেন কলের জল পড়ে যাচ্ছে, আঃ সে যদি ঐ জলের স্পর্শ একটু পেতো। উঃ কোথাও যদি একটু ছায়া থাকে, পোষ্ট-অফিসটাই বা কোথায় গেল। ষ্ট্যাম্প কেনবার অছিলাতেও তো একটু ছায়ায় দাঁড়াতে পারত। এবার সে বুঝতে পারে তার সারা গা বেয়ে পা বেয়ে ঘামের ধারা গড়িয়ে চলেছে। এইটুকু হেঁটেই ক্লান্তিতে তার পা ভেঙ্গে আসছে। আর যেন সে দাঁড়াতে পারছে না, দুটো বাড়ীর মাঝখানে একটা সরু গলি রয়েছে তার মধ্যে ঢুকে পড়ে একটা জানলার নীচে স্যাঁত সেঁতে দেয়ালে হাত রেখে সে হাঁপাতে লাগল। আঃ দেয়ালটা কি সুন্দর ঠাণ্ডা। হয়ত একটু শব্দ হয়ে থাকবে না হলে তার মাথার ওপরকার জানলাটা খুলে গেল যেন। একটা মুখ জানলা দিয়ে বেরিয়ে এসে তাকে দেখছে, চোর ভেবেছে হয়ত, কিন্তু কি সুন্দর মুখখানা, যেন শিল্পীতে ফুটে তুলেছে। নাকটা একটু ছোট কিন্তু গভীর নীল চোখ দুটো! একেই বোধহয় মৃগনয়ন বলে।

সে কিছু বলবার আগেই সেই মুখটিতে যেন একটা বিস্ময়ের চিহ্ন ফুটে উঠল। সঙ্গে সঙ্গেই তার নাম উচ্চারণ করল। বলল মাদাম-লা-মারকুইস। এ কি! ও তাকে চেনে নাকি। পরক্ষণেই কোথায় যেন একটা দরজা খুলে গেল, তারপর সে দেখল একটা ছোট্ট অন্ধকুপ ঘরের দরজার ধারে একটা চেয়ারে বসে রয়েছে সে। মারকুইস বলল, ওঃ কি রোদ। আমি যেন অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছিলাম, লোকটি তাড়াতাড়ি করে একটা মাটির গেলাস ভরে তাকে জল দিল। ওর চোখের ঐ নীরব ভাষা যেন ওর কথার মধ্যে দিয়ে ব্যক্ত হচ্ছে। কেমন সুন্দর সম্ভ্রমপূর্ণ ভরাট কণ্ঠস্বর.। সে তাকে ধন্যবাদ দিতে গিয়ে দেখল, ও তাকে দেখছে। কত যেন কৃতার্থ হয়েছে তাই তেমনি নম্রভাবেই বলল, না না এ আর এমন কি, আপনাকে আরও কোন সাহায্য করতে পারি কিনা তাই বলুন। সেই মাটির গেলাসে চুমুক দিতে দিতে মারকুইস বলল হ্যাঁ একটা ফিল্ম রোল আছে ডেভেলাপ করে দিতে হবে। এবার জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা আগে বল, তুমি আমায় চিনলে কি করে। লোকটি কিন্তু সমানে তার দিকে তাকাচ্ছে, তার বড় বড় চোখের দৃষ্টি বার বার ঘুরে ঘুরে ওর বুকের মাঝখানে আটকান গোলাপটার ওপর পড়ছে।

ফ্রকটা ঘামে ভিজে বডিজটা প্রকট করে তুলেছে—জীবনে এই প্রথম ওর একটা সলজ্জ বিব্রত ভাব-এর অনুভব হল যেন। কাঁধের ওপরে আলগোছে ফেলা সেই সিফন স্কার্ফ´টা ধীরে টেনে এনে পীনোন্নত বুক দুটো ঢাকা দিল মারকুইস। তখনো ও কথা বলে চলেছে, বলল এই তো তিন দিন আগেই আপনি আমার দোকানে ফিল্ম কিনতে এসেছিলেন।

সেদিন আপনার সঙ্গে আপনার মেয়েরা ছিল। এবার মনে পড়ে যায় মারকুইস-এর—হ্যাঁ, হ্যাঁ বড় বড় করে "কোডাক" লেখা আছে দেখে সে একটা দোকানের কাউণ্টারে ঢুকেছিল বটে কিন্তু ওদিক থেকে যে মহিলাটি তাকে ফিল্ম দিল তার সেই খুঁড়িয়ে হাঁটার ধরণ দেখে পাছে বাচ্চারা হেসে ফেলে এই ভয়ে সে কোনরকমে ফিল্মটা নিয়েই সরে পড়েছিল। তার নিজেরই হাসি পাচ্ছিল। ও বলছে সে নাকি তার বোন। সেই কেনা বেচা করে—ও কাউণ্টারে যায় না, ও শুধু ছবি তোলে। ভেতর ও তাকে দেখেছিল আর তাকে সেই প্রথমবার দোকানে দেখেই ও লজ্জায় ওর মুখটা লাল হয়ে ওঠে—কথাটা শেষ করতে পারে না। মারকুইসই ফিরে প্রশ্ন করে—প্রথমবার দোকানে দেখেই কি? ও লজ্জায় মুখটা তখনো ঘুরিয়ে রেখেছে। কিন্তু ওর প্রশ্নের উত্তরে এবার যে ওর দিকে ফিরে তাকাল আর তার সেই গভীর একাগ্র দৃষ্টি দেখে কেমন যেন একটা অজানা অস্বস্তিতে মারকুইসের বুকের ভেতরটা শিউরে উঠল। সে ওকথা চাপা দিয়ে তাড়াতাড়ি বলল, আরে আমি তো একেবারে সাধারণ—চেনো না তো আমায়। বাকি জলটুকু খেয়ে গেলাসটা ফিরিয়ে দিতে দিতে ভাবল—ছিঃ এই একটা চোরকুঠরির মত অন্ধকার ঘরে বসে একটা বাজে লোকের ব্যাজস্তুতি সে বরদাস্ত করছে কি করে। পরক্ষণেই ভাবে কিন্তু ও যা বলছে তা অন্তর থেকেই বলছে ওখানে কোন ভাণ বা ভণিতা নেই। এই তো এখনো সে তার মুখের ওপর থেকে যেন চোখ সরাতে পারছে না। এবার জোর করে সে তার চোখে চোখ ফেলে জিজ্ঞেস করল তুমি আমার ছবি তুলে দেবে?

সেও দ্বিরুক্তি না করে বলল—হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই, আপনি যে রাস্তা দিয়ে এসেছেন ওই রাস্তা দিয়ে ঘুরে বড় রাস্তায় যান আমি আপনার জন্য দোকানটি খুলছি।

মারকুইসের দৃষ্টি এবার ওর চোখ ছাড়িয়ে শরীরে নামল। সার্ট বা কোট নেই, কাঁধ কাটা গেঞ্জিটার দুধারে পেশীপুষ্ট দুটো রোমশ হাত, ভরাট গলা, সুশ্রী সুডৌল মুখ, মাথাভরা কোঁকড়া চুল। সে বলল আমি তোমাকে

এই ফিল্ম রোলটা এখানেই দিয়ে দিই না কেন। উত্তরে ও বলল, না—তা হয় না যে। এবার মারকুইস গলি পেরিয়ে ঘুরে গিয়ে বড় রাস্তায় উঠল—তেতে ওঠা ফুটপাতে দাঁড়িয়ে দরজা খোলার শব্দ শুনল। ও ঘরটা যেন ভেপসে রয়েছে—কাউন্টারের ওদিকে তাকিয়ে দেখল এর মধ্যেই ফোটো-গ্রাফার গায় একটা নীল সার্ট আর সস্তার কোট চড়িয়ে নিয়েছে। কাউন্টারের ওদিকে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে। একেবারে সাধারণ একটি দোকানদার ছাড়া এই মুহূর্তে লোকটিকে আর এখন কিছুই ভাবা যাচ্ছে না। কিন্তু ওর ঐ ভাবে ভরা চাউনি! সস্তা নীল সার্ট আর ঐ দোকানদারের কোট-এর কথা মুহূর্তের মধ্যে ভুলে গেল মারকুইস! জিজ্ঞেস করল—ছবিগুলো কখন পাব?

ও বলল—কালই পেয়ে যাবেন।

এবার মারকুইস বলল—তুমি যখন ফোটোগ্রাফার তখন আমার হোটেলে এসে আমার আর বাচ্চাদের ছবি তুলে দাও না কেন!

ও প্রশ্ন করল—আমি আপনার ওখানে যাই তা কি আপনি চান!

—নিশ্চয়ই!

ও নিচু হয়ে রোলটি বাঁধবার জন্য একটা সুতো খুঁজছে কিন্তু মারকুইস স্পষ্ট দেখল যে উত্তেজনায় ওর হাত কাঁপছে। ওকে কোনরকম ধন্যবাদ না জানিয়েই পরের দিন সকাল এগারটায় তার হোটেলে ওকে আসতে বলে সেই জলন্ত রাস্তায় নেমে পড়ল মারকুইস। যেতে যেতে তার মনে হল পেছন থেকে ও তাকে দেখছে। সেও তাকাল, দেখল সে এর মধ্যেই সার্ট আর কোট খুলে ফেলেছে, সেই কাঁধ কাটা গেঞ্জি গায়ে দোকানের জানলা দিয়ে ঝুঁকে পড়ে দেখছে ওকে। লোকটিরও যে ডান পা-টি খোঁড়া, একটা উঁচু বুট পরে সেটি যে ঢাকবার চেষ্টা করেছে এইসব দেখেছে মারকুইস কিন্তু ওর বোনকে দেখে যে রকম হাসি পেয়েছিল ওকে দেখে সে রকম কোন কিছুই মনে হোল না। বরং ঐ উঁচু জুতোটা যেন ওকে একটা আলাদা বৈশিষ্ট্য দিয়েছে এ কথাই মনে হল ওর।

পরের দিন বেলা এগারটার সময় হোটেলের ইনফরমার ফোন করে খবর পাঠাল যে ফোটোগ্রাফার মসিঁয়ে পল আপনার জন্য এখানে অপেক্ষা করছেন। ওপর থেকে খবর গেল যে মসিঁয়ে পল যদি ওপরে মাদাম মারকুইস-এর অ্যাপার্টমেন্ট-এ আসেন তাহলে ভাল হয়। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মারকুইস বাইরের দরজায় একটু দ্বিধাপূর্ণ মৃদু করাঘাত শুনতে পেল। ও

আসুন! বলতেই দরজাটা খুলে গেল আর পল দেখল, দুহাতে দুটি মেয়েকে ধরে যেন একটা স্থির চিত্রের মত দাঁড়িয়ে রয়েছেন মাদাম লা মারকুইস। শুধু ক্যামেরায় সেটি তুলে নেবার অপেক্ষা। আজ মারকুইস-এর চুলের আর পোষাকেরও পরিবর্তন হয়েছে। কালকের মত রিবন বাঁধা কিশোরীর কারুকার্য নয়, আজকে চুল মাঝখান দিয়ে ভাগ হয়ে কানের ওপর দিয়ে পেছনে গিয়ে গোছা ধরেছে। মাথার দুপাশে দুটি সোনার ক্লিপ আটকান। পলও দরজার ফ্রেমের ভেতর দাঁড়ান যেন একটি নিশ্চল ছবি হয়ে গেছে চোখের পলক অবধি পড়ছে না তার। মেয়ে দুটি অধৈর্য হয়ে উঠছে বার বার ওর ঐ উঁচু বুটের দিকে তাকাচ্ছে, কিন্তু কিছু বলছে না, ওদের মা আগেই বারণ করে রেখেছে। এবার নীরবতা ভেঙ্গে মারকুইস বলল—এরাই আমার মেয়ে, এবার তুমি বল কোনখানে কিভাবে দাঁড়ালে ছবিটা আসবে!

যেমন দাঁড়িয়ে আছেন থাকুন না, এই রকমই একটা না হয় তুলে নিই। এই তো বেশ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে রয়েছেন। বাচ্চারা সাধারণতঃ যেভাবে অতিথিদের অভিবাদন করে থাকে তার কিছুই করল না তাদের মা বলে দিয়েছে ওসবের দরকার নেই ওতো দোকানদার। একটা ছোট্ট ছবির দোকানের মালিক মাত্র।

এখন পলের জড়তা কেটে গেছে। এবার সে তার অভ্যস্ত কাজে হাত লাগাল—কিন্তু ঐ হাত দুটিতে শুধুই তো দোকানদারী নেই! ও যেন কোন একটি সুন্দর শিল্পকর্ম করছে। মারকুইস দেখছে ভেলভেট ঢাকা ক্যামেরার ভেতর ও যখন ঢুকে গেল তখন হাত ছেড়ে তার দৃষ্টি ওর পায়ে নামল—না! কই তেমন বিশ্রীভাবে খোঁড়াচ্ছে না! শুধু পা-টা একটু টেনে টেনে হাঁটছে। এই গরমে ঐ ভারী চামড়ার উঁচু বুটটা বোধহয় প্রতি পদক্ষেপে ওকে যন্ত্রণা দিচ্ছে, কেমন যেন একটা কোমল অনুভূতি হয় ওর।

—হয়েছে বেশ সুন্দর ছবি এসেছে।

পল এই কথা বলতেই তাড়াতাড়ি চোখ সরিয়ে নিল সে। ওর সেই গভীর চাউনি আর ভরাট কণ্ঠস্বর আবার তার ভেতরে একটা আলোড়ন জাগিয়ে তুলল। কাল দুপুরে ওর দোকানে থাকতেও ঠিক এমনি হয়েছিল তার।

পল বলল—আর একটা ছবি নিচ্ছি কিন্তু। আবার হাসি হাসি মুখ করল মারকুইস মনে মনে ভাবল নিশ্চয়ই ঐ পর্দার ভেতর থেকে পল তাকে

নিবিষ্ট হয়ে দেখতে চায়। বাচ্চারা থাকায় হয়ত সোজাসুজি তাকাতে লজ্জা পাচ্ছে, তাই ঐ আড়ালের সৃষ্টি।

প্রায় আধঘণ্টা ধরে নানান ভঙ্গিমায় ছবি তোলা হল। বাচ্চারা শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে উঠল। মারকুইস বলল—বড় গরম, আজ এই পর্যন্ত থাক, এদের ছেড়ে দিই। বাচ্চারা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। তারা ছুটতে ছুটতে নিজের ঘরে চলে গেল। টবের থেকে একটা গোলাপ তুলে গালে মুখে বুলোতে বুলোতে মারকুইস বলল অদ্ভুত! শিশুদের কি বিচিত্র স্বভাব দেখেছ! এইমাত্র যেটার জন্য তাদের ভীষণ আকুতি কিছুক্ষণ পরেই সেটাতেই তারা বিরক্ত হয়ে ওঠে। তখন তাদের আবার নতুন কিছু উত্তেজনার খোরাক চাই। কিন্তু মসিঁয়ে পল আপনার কিন্তু খুব ধৈর্য আছে। আবার সে তার ঠোঁটের ওপর গোলাপটা ছোঁয়াল।

পল তার সেই গম্ভীর গলায় বিনয়ের সঙ্গে বলল—যদি আপনি কিছু মনে না করেন তো আমার একটা আর্জি আছে! বেশ একটা মিষ্টি ছন্দে ফুলটা বারান্দা দিয়ে নীচের লনে ছুঁড়ে ফেলে দিতে দিতে মারকুইস বলল কি।

আপনি যদি ক্লান্ত না মনে করেন তাহলে বাচ্চাদের বাদ দিয়ে শুধু আপনার একার একটি ছবি আমি তুলতে চাই।

আরে তাতে কি হয়েছে! আমার কোনো আপত্তি নেই। ঝুপ করে সেই আরাম চেয়ারে ছড়িয়ে বসে সে মাথার তলায় একটা হাত রেখে বলল—কি! এমনি করে শুয়ে থাকলে হবে।

ওর চোখ দুটোতে যেন খুসী উপচে পড়ছে, বলল—হবে, তবে ঠিক ওভাবে নয়—আমি একটু ঠিক করে দেব! এবার সে এগিয়ে খুব ধীরে আলগোছে তার হাতটি ধরে একটু ওপরে করে দিয়ে বলল মুখটা একটু এপাশে ফেরান না; হল না! এবার ও নিজেই তার চিবুকটা ধরে মুখটা ঠিক করে দিতে লাগল—সময় লাগছে সময় কাটছে—ওর বুড়ো আঙুল তার গলার ওপর দিয়ে খুব মৃদু স্পর্শ দিয়ে সরে গেল। যেন পোষা পাখির নরম ডানায় হাত বুলোচ্ছে। মারকুইস চোখ বন্ধ করে এই স্পর্শটুকু অনুভব করছিল। বাচ্চারা ছুটে বেরিয়ে বারান্দার ওধারে গিয়ে খেলতে বসল। ওদের কথা নিয়ে দুজনে একটু হাসল—যেন দুজনেই তারা ওদের অভিভাবক। বেশ একটা নৈকট্যের অনুভূতি হল যেন দুজনের। তারপর শুধু একটা নয় একটার পর একটা ছবি তুলছে পল আর যেভাবে চাইছে মারকুইস সেভাবে বসছে না—ও তাকে ঠিকমত বসাতে গিয়ে তার হাত, পা, মুখ কপালে হাত

রাখছে; কিন্তু চোখে চোখ মেলাচ্ছে না—তবে ওর স্পর্শ কিন্তু আর সেই সম্ভ্রমপূর্ণ মৃদু পরশ নয়। বেশ সাহসের সঙ্গেই ভাল করে শক্ত করে হাত ধরছে; পিঠে হাত দিচ্ছে। কিন্তু এই যে কাঁপছে নিজের সঙ্গে একটা দ্বন্দ্ব চলেছে ওর, এতে মারকুইস একটা নতুন স্বাদের আনন্দ পাচ্ছে। ওর ঐ ব্রীড়ামাখান মুখ, কুণ্ঠিত দৃষ্টি, আর বলিষ্ঠ স্পর্শ একটা অদ্ভুত মাদকতার স্বাদ দিচ্ছে তাকে।

এখন ও পা মুড়ে হাঁটু গেড়ে বসে তার পায়ের কাছে ফ্রকটা ঠিক করে দিচ্ছে। মুখটা ঘামে ভিজে সাদা হয়ে গেছে ওর। এবার সে বলল তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছ আজ আর থাক।

—আমার চেয়ে আপনিই তো বেশী ক্লান্ত হয়েছেন।

নাঃ মোটেই ক্লান্ত হয়নি মারকুইস। ও চলে যেতেই সে সমুদ্রে স্নান করতে চলল। যেন একটা নতুন শক্তির উৎস খুলে গেছে তার মধ্যে। যেতে যেতে সে পূর্বাপর সব ঘটনাগুলো ভেবে চলেছে। একটু আগের পলের সেই অপলক চোখের গভীর দৃষ্টি বার বার ছায়া ফেলছে তার মনে। গম্ভীর গলার সেই ভরাট স্বর এখনো কানে বাজছে—ও বলছে না না মারকুইস, এইরকম নয় এমনি করে বসুন। আর সেই স্পর্শ তার শরীরের শিরায় শিরায় যেন কিসের শিরশিরানী······শুধু কথার পিঠে কথার জাল বুনতে সে বলছিল, আমায় ছবি তোলা শিখিয়ে দিবে। আমি কিন্তু ছবির কিছু জানি না। উত্তরে ও বলল—আরে আমিও তো জানতাম না, সমানে ছবি তুলে যান, হাত আপনিই সেট হয়ে যাবে। আমি এখনো তাই করি। রোজ দুপুরে ঐ যে দূরে পাহাড় দেখছেন ওর ঐ চূড়োটার পেছনে গিয়ে বসে থাকি আর ইচ্ছে মতন ছবি তুলি। প্রকৃতির ছবি তোলার মধ্যেই আমি প্রকৃত আনন্দ পাই সেই তুলনায় কিন্তু কোন ব্যক্তি বিশেষের ছবি তোলায় অতটা আনন্দ পাই না, তবে ব্যতিক্রমও ঘটে বৈকি, যেমন আজ! এবার ও তার দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল কি গভীর অতলস্পর্শ সেই দৃষ্টি! তারপর দুজনেই চুপ করে কাছাকাছি দাঁড়িয়েছিল কিছুক্ষণ। কি অদ্ভুত বাঙ্ময় নিঃশব্দতা। মিস ক্লের উপস্থিতিতে তার ঘোর কাটল, সে ডিনারের জন্য ডাকতে এসেছে। ওকি এর মধ্যে নীচে সব টেবিল ভরে উঠেছে। বেয়ারাদের বাসনপত্র নাড়াচাড়ার অত টুংটাং শব্দ বা নীচে অত লোকের উপস্থিতি এসব কিছুই এতক্ষণ তার চোখে পড়েনি। ইস্ এতখানি বেলা হয়ে গেছে। একেবারে শুকনো গলায় ভদ্রভাবে সে পল-কে বিদায় দিল। ঐ রোদেভরা লন পেরিয়ে সে পা টেনে

টেনে চলে গেল। যাবার সময় বলল, সেদিন আপনি আমাকে হঠাৎ বাড়ীতে পেয়ে গিয়েছিলেন, ডার্করুমে কয়েকটা ছবি আমি ভেঙে লপ করছিলাম তাই, না হলে রোজ দুপুরেই আমি বেরিয়ে যাই। নিষ্প্রাণ গলায় মারকুইস বলল, ঠিক আছে আমি অন্য সময়তেই ছবিগুলো নিয়ে আসার ব্যবস্থা করব। আপনি তৈরী করে রাখবেন। ও ঠিক আছে, তাই করব, এই বলে আজ্ঞাধীন কর্মচারির মত নিয়ে সেই রোদ মাথায় করে চলে গেল।

মিস ক্লে বলল, লোকটি ছবি বোধহয় ভালই তোলে তাই নয়। মারকুইস ছবিগুলো দেখে নিশ্চয়ই খুসীই হবেন। মাথায় সোনার ক্লিপ আর হাতের আংটি খুলতে খুলতে সে অন্যমনস্কভাবে বলল হুঁ। আজ সে কোন গয়না না পরেই একেবারে সাধারণ পোষাকে ডিনার খেতে চলল, তার মনে হলো অলঙ্কারগুলো বাহুল্য, তার এই অপ্রতুল সৌন্দর্যের সহায়তার জন্য কোনরকম অলঙ্কারের প্রয়োজন নেই। সে আজ স্বয়ং-সম্পূর্ণ।

প্রায় তিনটে সম্পূর্ণ দিনরাত কেটে গেল। প্রথম দিন মারকুইস সকালে সাঁতার কাটল দুপুরে টেনিস খেলা দেখল। দ্বিতীয় দিন মিস ক্লেকে ছুটি দিল শহর দেখবার জন্য নিজে বাচ্চাদের সামলানো তিন দিনের দিন পল-এর এখানে মিস ক্লেকে ছবিগুলো আনবার জন্য পাঠাল। সে তো ছবির খামটা নিয়ে এসে মারকুইস এর হাতে দিতে দিতে প্রশংসায় একেবারে পঞ্চমুখ! বলল, আপনি নিজে একবার দেখুন মাদাম! ঐ রকম ছোট দোকানের একটা সাধারণ ফটোগ্রাফার যা ছবি তুলেছে আমার তো মনে হয় না প্যারিসের কোন প্রথম শ্রেণীর দোকানদারও এমনটি পারবে। মারকুইসও সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ আজ পর্যন্ত সে নিজের এত ভাল প্রতিকৃতি কখন দেখেনি। ছবির মারকুইস যেন তার চেয়ে সুন্দরী সে বুঝতে পারল যে এই ছবিগুলির পেছনে একজনের কতখানি পরিশ্রম আর প্রাণ ঢালা যত্ন রয়েছে তাই জন্য হাই চাপতে চাপতে মিস ক্লেকে একবার জিজ্ঞেস করল—আর কি বলল মঁসিয়ে পল? উত্তরে মিস ক্লে বলল বাচ্চাদের কাছে আপনার কথা জিজ্ঞেস করছিল আপনি কেমন আছেন কি করছেন এইসব। ওদের সঙ্গে খুব ভাব করে নিয়েছে—ওরা বলল আপনি খুব সাঁতার কাটছেন। মনে হল যেন আপনি নিজেই ছবিগুলি আনতে যাবেন এটাও আশা করেছিল।

মারকুইস উত্তরটা ঘুরিয়ে দিল—বলল, বাবাঃ যে গরম! তাছাড়া শহরে যা ধুলো!

পরের দিন দুপুরবেলা ডিনারের পর বাচ্চাদের নিয়ে মিস ক্লে তার ঘরে বিশ্রাম করছে—হোটেল প্রায় ফাঁকা। মারকুইস তখন নিজের ঘরে পোষাক পরছে। বেশ পাতলা নরম একটি হাতকাটা ফ্রক পরে মাথায় হ্যাট চাপিয়ে কাঁধে নিজের ক্যামেরাটি ঝুলিয়ে ধীরে ধীরে হোটেলের লন পেরিয়ে সেই সীসে গলা রোদ ঝরা উত্তপ্ত পথে নেমে এলো। তবে শহরের দিকে নয় আজ পা বাড়াল পাহাড়ের দিকে। তবে রোদের তাত তার ওপর পায়ের নীচে গরম বালি কিন্তু আজ যেন এসবে তার কোন ভ্রূক্ষেপ নেই, বেশ ধীর ছন্দে সে আস্তে আস্তে ওপরে উঠছে—বালির চড়া শেষ হয়ে এবার ঘাস দেখা দিয়েছে। নরম গালিচের মত সেই ঘাস মাড়িয়ে মাড়িয়ে সে অনেকটা ওপরে উঠে এলো। হোটেলের সাদা বাড়ীটা সমুদ্রের ধারের স্নানঘরগুলো যেন মনে হচ্ছে শিশুদের তৈরী ইটের খেলাঘর। তার লীলায়িত ছন্দে হাঁটার তালে তালে কোমরের নীচের পৃথুল পিছনটি দুলে দুলে উঠছে। হঠাৎ যেন একটা আলোর রশ্মি তার মুখের ওপর দিয়ে ঘুরে গেল। চমকে উঠে পেছনে তাকাল সে। তারপর চলতে চলতে নিজের ক্যামেরায় গোটা দুয়েক ছবিও তুলল সে। আবার ক্লিক করে একটা শব্দ হতেই দেখল পেছনে পল দাঁড়িয়ে! মারকুইস হেসে বলল—আরে! তুমি যে! দেখ তোমার কথা মত আমিও ছবি তোলা প্র্যাকটিস করতে এলাম। তা তুমি কি এখানেই আসো রোজ! তারপর বলল, কই আমায় একটু ছবি তোলা শিখিয়ে দাও তো! ওর খুব কাছে এসে দাঁড়িয়েছে পল—সেই বিশ্রী নীল সার্ট আর কোট নয়, এখন ওর পায়ে চকচকে বুট—গায়ে গ্রে রং-এর বেশ ভাল একটি গেঞ্জি আর প্যান্ট। মাথা ভরা কালো চুল যেন ওর মোমের মত নিটোল মুখটা ঘিরে একটা ফ্রেমের সৃষ্টি করেছে। আর চোখ! কি ভাবে যে ওর দিকে চেয়ে রয়েছে! বিস্ময়, আনন্দ, শ্রদ্ধার এমন মিশ্রিত দৃষ্টির প্রকাশ আগে কখন দেখেনি মারকুইস—ওর হাতে হাত রেখে ক্যামেরাটি ঠিক করে ধরিয়ে দিল পল—ওর হাত কাঁপছে, বুক কাঁপছে—সেই কম্পন স্পষ্ট অনুভব করছে, মারকুইস আর সেই স্পন্দনে সেও স্পন্দিত হচ্ছে, এ এক অদ্ভুত রোমাঞ্চ। কিন্তু এই অনুভূতি যে ওর কাছে লুকোতে চায়—তাই বলল,—তোমার নিজের ক্যামেরা আনোনি!

—হ্যাঁ এনেছি বইকি! এই পাথরটার পেছনে একেবারে সমুদ্রের ধার ঘেঁসে খানিকটা সমতল জায়গায় আছে। কোনোদিক থেকে সেখানটা দেখা যায় না। ঐ আলো-ছায়া ঘেরা পাহাড়তলিতে এই বসন্তকালে প্রচুর

রং বেরংএর পাখী আসে—ওখানে বসে আমি তা ছবি তুলি—ওখানেই আমার কোট আর ক্যামেরা রয়েছে!

—কই দেখি!

মারকুইসকে পথ দেখিয়ে উপরে চলল পল।—দু'তিন ধাপ উঁচুতে উঠতেই সুন্দর একটি পাহাড়ের খাঁজে চলে এলো সে। কি সুন্দর ছায়া ঘেরা ঠাণ্ডা জায়গাটি আর পাহাড়ের একেবারে নীচে গভীর অতলে রয়েছে সমুদ্র—তার ঢেউএর গম্ভীর গর্জন ভেসে আসছে ওপরে। একটি ব্রাউন রংএর কোট, তার পাশে রয়েছে ক্যামেরা—বাঃ কি সুন্দর জায়গাটি—ছেলে-মানুষের মত উজ্জ্বল হয়ে উঠল মারকুইস যেন একটি কিশোরী মেয়ে পিকনিকে এসেছে। একটি বই রয়েছে কোটের পাশে!

—বলল—তুমি বুঝি বই পড়তে খুব ভালবাস মসিয়ে পল!

—হ্যাঁ তা পড়ি!

বইটি হাতে নিয়ে মারকুইস হাসি চাপল এই ধরণের সব ডিটেকটিভ বই বহুকাল আগে স্কুল-ব্যাগের মধ্যে লুকিয়ে উপরে অদল বদল করে পড়ত তারা।

কেমন, গল্পটা কেমন!

পল যে একাগ্র দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে রয়েছে তা ওর দিকে না তাকিয়েও বুঝতে পারছে মারকুইস। সে একটু হেলে বসে একটা লম্বা ঘাস দাঁত দিয়ে কাটছে।

—আবার জিজ্ঞেস করল—গল্পটা কেমন?

সেই গম্ভীর ভরাট গলায় পল বলল—ভারী মিষ্টি!

কথা বাড়াতে গিয়ে মারকুইস ছবির কথা তুলল—বলল চমৎকার হয়েছে ছবিগুলি। তারপর আবার প্রত্যেকটি ছবির কথা তার খুঁটিনাটি, আলাদা করে বলল। একটু পরে তার খেয়াল হল যে সে একাই কথা বলছে আর অন্য জন তার কথা শুনছে না। তাকে কথা বলতে হয়েছে।

এবার অতি বিনীতভাবে পল বলল—আমার একটা অনুরোধ রাখবেন!

—তেমনি এলিয়ে বসে অন্যমনস্কভাবেই জিজ্ঞেস করল কি অনুরোধ!

—ঠিক যেমন আছেন এমনিভাবে বসে থাকুন এই পাহাড়টাকে ব্যাক-গ্রাউণ্ড করে আপনার গোটাকতক ছবি তুলব—রাজী!

কি যেন একটা প্রত্যাশায় বুকের ভেতরটা কাঁপছিল মারকুইসএর পরিবর্তে এই প্রস্তাবে আবার সে হাসি চাপল। ভাবল মানুষটা কি ছেলেমানুষ!

একটু তাচ্ছিল্যের ভাবে বলল—যত ইচ্ছে ছবি তোলো তুমি কিন্তু আমার ভীষণ ঘুম পাচ্ছে।

—বেশ তো আমার কোটটাকে বালিশ করে শুয়ে পড়ুন। দাঁড়ান আমি ঠিক করে দিচ্ছি বলে, নিজেই কোটটি সুন্দর করে ভাঁজ করে তার মাথার কাছে রাখল। আর দ্বিরুক্তি না করে আড় হয়ে শুয়ে পড়ল মারকুইস। আর ও ছবি তুলতে লাগল। তাকে সরাচ্ছে না নড়াচ্ছে না, নিজেই এদিক ওদিক ডাইনে বাঁয়ে সামনে পাশে সবদিকে ঘুরে ঘুরে ছবি তুলছে। কখন হুমড়ি খেয়ে গুঁড়ি মেরে বসছে, কখনো একেবারে তার গা ঘেঁসে বসছে। আর মারকুইস ঘুম-ঘুম চোখে হাই তুলতে তুলতে ওকে দেখছে। দেখল পল ওর একটা পায়ের ওপর ভর দিয়েই তার পাশে বসে এমন নিবিষ্ট মনে ক্যামেরা নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। ছবি তোলার সময়েতেও ঐ একটা পা তাকে কষ্ট দিয়েছে। রোজ সকালে ঐ বুটটা পালিশ করবার সময় নিশ্চয়ই ওর মনে কষ্ট হয়! তাছাড়া সারাদিন ত' ভারি বুটটা টেনে বেড়ানোর দরুণ পায়ে বোধহয় আর কিছু থাকে না। নিশ্চয়ই খুব ব্যথা হয়। তার মনটা পলএর জন্য সমবেদনায় ভরে উঠল। স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাতে গিয়ে দেখল সমস্ত চোখ ভরে ওর দিকে চেয়ে রয়েছে। যেন ও তার দৃষ্টিপ্রদীপ দিয়ে আরতি করছে তাকে। কিন্তু এই অলস মধ্যাহ্নে ওর সান্নিধ্যে তার মন ছাপিয়ে শরীরে যে সাড়া উঠছে, সে শুধু কামনার আগুন, অনঙ্গের রঙ্গ, অন্য কিছু নয়। জোর করে সে অন্যদিকে দৃষ্টি ফেরাল, দেখল, একটা সোনালী রং-এর প্রজাপতি উড়ে বেড়াচ্ছে। এবার সেটা এসে ওর হাতের ওপর বসল। পলও এখন ক্লান্ত হয়ে তার পাশে আড হয়ে বসেছে। আর ওর সেই স্থির গভীর দৃষ্টি নিবিড়ভাবে লেহন করছে তাকে। মারকুইসএর মনে হচ্ছে, এই যৌন অনুভূতির নিবিড় রোমাঞ্চকর মুহূর্তটি তার সামান্য চাঞ্চল্যের প্রকাশেই যেন নিঃশেষ হয়ে যাবে। একটু অমনোযোগী হলেই এই মাদকতার রেশটুকু যেন মিলিয়ে যাবে! তাই সে অনড় হয়ে শুয়ে রয়েছে। কিন্তু তার সমস্ত শরীর যেন একটা উদগ্র কামনায় উদ্বেল হয়ে উঠছে, এবার প্রজাপতিটা তার হাত ছেড়ে উড়ে গেল—এখন তাকে অন্যদিকে তাকাতেই হবে। এতক্ষণ যা সে এড়িয়ে যাচ্ছিল শেষ পর্যন্ত পলএর সেই অতলস্পর্শী মদির দৃষ্টি-চুম্বকের আকর্ষণে এবার সে সম্মোহিতের মত ওর চোখে চোখ মিলিয়ে চেয়ে রইল। দুই দৃষ্টির মিলনে একি নিঃশব্দ রতি সম্ভোগ! অত্যুগ্র কামনার উষ্ণতায় উন্মুখ হয়ে

পিপাসিত অধরটি ওর দিকে তুলে ধরে এবার সে বলল আমাকে তুমি চুমু খাও পল! এসো! আবেগে চোখ বুঁজল সে।

কিন্তু কোন কামনা কলুষ আলিঙ্গনের নিবিড় নিষ্পেষণের বেদনা সে অনুভব করল না—পল যেন তেমনি স্থির অনড় হয়ে বসে শুধু দৃষ্টি দিয়েই তাকে সম্ভোগ করছে কিম্বা যেন সেই প্রজাপতিটিই আবার ফিরে এসে তার মসৃণ পাখার অতপ্ত পরশমণি ওর ফুলের পাপড়ির মত অধরে একবার আলগোছে একটু বুলিয়ে দিয়ে গেল। অতি সন্তর্পণে তাকে ছেড়ে যখন সরে গেল তখনো কোন রকম উচ্ছ্বাস প্রকাশ করল না ও। যেন কিছুই ঘটেনি, যদি মারকুইস লজ্জা পায়। যদি তার মনে আত্মশ্লাঘা জাগে। ঐটুকু বেদনাও ও তাকে দিতে চায় না যেন। তাই তাকে অমনি অম্লান অনাঘ্রাতই রেখে দিল, কামনার প্রকাশে তাকে কলুষিত করল না।

চোখের ওপর হাত চাপা দিয়ে শুয়ে আছে মারকুইস। নিজের কথার প্রতিধ্বনিতে নিজে সে কম বিস্মিত হয়নি। তবে লজ্জিতও হল না, কেননা লজ্জা পাবার কোন অবকাশও তাকে দিল না তাই সে এবার শুয়ে শুয়ে ফিরে যাবার কথা ভাবতে লাগল। বেশ কায়দা করে সকলের চোখ এড়িয়ে আবার সে তার হোটেলের সেই নিরাপদ আশ্রয়ে কি করে তাড়াতাড়ি ফিরে যাবে এটাই এখন তার চিন্তার বিষয়বস্তু। খানিকটা তো বালির ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সেই সময় যদি হোটেলের কেউ তার কাছে এগিয়ে আসে! সে তখন বিশেষ কোন কথাই বলবে না, আপন মনে হেঁটে চলে যাবে। এবার সে উঠে বসল কাপড়-চোপড় ঠিক করে নিয়ে পাউডারের ডিবেটা বার করে বিনা আয়নায় আন্দাজেই পাফটা একবার মুখে বুলিয়ে নিল। একটু লিপষ্টিকও ছুঁয়ালো ঠোঁটে। বেরিয়ে এসে দেখল রোদের তাত আর নেই। বরং বেশ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বাতাস বইছে।

হাঁটতে হাঁটতে ভাবছে দিনগুলো যদি এমনি পরিষ্কার থাকে তবে সে রোজ দুপুরে এখানে আসবে। এমনি কড়া রদ্দুর থাক ক্ষতি নেই, বৃষ্টি না হলেই হল! বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে তাহলে কি করে আসবে, হোটেলের বারান্দায় তেমনি করে একা বসে বসে একঘেয়ে বৃষ্টি পড়া দেখতে দেখতে ঘণ্টা পল গুণবে? না তবু সে আসবে! বৃষ্টি বাড়লে বরং এদিকে এই পাহাড়ের ওপরে আর কেউ ঘেসবে না! না সে রোজ আসবে। লাঞ্চের পর মিস ক্লে বাচ্চাদের নিয়ে তার ঘরে ঢুকলেই সে চলে আসবে। তারা যদি দুজনে আলাদা আসে আবার আলাদাই ফিরে যায় কে আর তাহলে তাদের ধরতে পারবে।

আর্নেস্ট হেমিংওয়ে
অনুবাদ— মলয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

একটি প্রশ্নোত্তরমালা

বাইরে তুষারপাতের ফলে বরফ জমে জমে উঁচু হয়ে জানালা প্রমাণ হবার যো হয়েছে। কুটিরটির দেয়াল পাইনগাছের কাঠ দিয়ে তৈরি—তার ওপর ঝোলান একটা মানচিত্র। বাইরে সূর্য দিগন্ত থেকে বেশ ওপরে : তুষারস্তূপের ওপর দিয়ে তার কিরণ ছুটে এসে জানালা গলে ঘরে ঢুকে লুটিয়ে পড়েছে ম্যাপটার গায়ে। কুটিরের যেদিকটা খোলা, সেদিকটায় একটা পরিখা— রৌদ্রস্নাত দিনগুলিতে কুটিরের বাইরের দিকের দেয়ালে সূর্যতাপ প্রতিফলিত হওয়ার ফলে বরফ গলে গিয়ে পরিখাটি বেশি করে চওড়া হয়ে পড়ে। সময়টা মার্চ মাসের শেষাশেষি। দেয়ালের গা ঘেঁষে যে টেবিলটা, তার পাশে বসেছিলেন মেজর সাহেব। তাঁর অধীনস্থ অফিসারটি বসেছিল অন্য একটা টেবিলের সামনে।

মেজর সাহেবের অক্ষিগোলকদ্বয়ের চারপাশের জায়গা জুড়ে দুটো গোল গোল শাদাটে দাগ। তুষার নিবারক চশমা পরে থাকার দরুণ এই অংশ দুটি রৌদ্র আর বরফের হাত থেকে মুক্ত ; মুখের বাকি অংশটা রোদে-পোড়া। টেবিলে বসে কাজ করার ফাঁকে ফাঁকে তিনি তেলের একটা পাত্রে বাঁ হাতের আঙুলগুলি ডুবিয়ে অল্প করে তেল মাখিয়ে নিচ্ছিলেন, এবং সেই তেল নিজের মুখে আস্তে আস্তে ডলে ডলে দিচ্ছিলেন। হাতের কাজ শেষ করে তেলের বাটিটি তুলে নিয়ে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। অধীনস্থ অফিসারটিকে বললেন, "আমি একটু ঘুমোতে যাচ্ছি, বুঝলে? বাকি কাজগুলো তুমি শেষ করে ফেলো।" তারপর তিনি ওপাশের ছোট কামরাটায়—যেটায় তিনি ঘুমোন— ঢুকে গেলেন।

"যে আজ্ঞে, সিনর ম্যাগিয়োরে" অফিসার উত্তর দিলে। চেয়ারের পিঠে নিজের পিঠ এলিয়ে দিয়ে সে আয়েস করে একটা হাই তুলল। তারপর কোটের পকেট থেকে একটা সস্তা সংস্করণের বই বের করে খুলল। তারপর বইটাকে টেবিলে রেখে পাইপ ধরাল। পাইপ টানতে টানতে বই পড়ার চেষ্টা করলে খানিক। শেষে বইটা মুড়ে ফেলে ফের পকেটেই পুরে ফেললে। বহু কাজ বাকি পড়ে রয়েছে, সেগুলো সেরে না ফেলা ইস্তক মৌজ করে পড়ায় মন দেওয়া অসম্ভব।

ইতিমধ্যে বিকেলের অস্তগামী সূর্য ওদিককার পাহাড়টার আড়ালে লুকিয়ে পড়ল। সেই সঙ্গে ঘরের আলোকোদ্ভাসিত দেয়ালটাও নিষ্প্রভ হয়ে গেল।

একটি বাচ্চা সৈনিক ঘরে ঢুকে জলন্ত চুল্লীতে ঢেলে দিলে কতকগুলো ডালপালা। অফিসারটি তাকে বললে, "আরে আস্তে হে, পিনিন। মেজর সাহেব ঘুমোচ্ছেন, অত শব্দ—শাব্দি কোরো না।"

পিনিন ছোকরাটি মেজরের আর্দালীর কাজ করে। চুল্লীতে কাঠের টুকরোগুলি বেশ ভাল করে সাজিয়ে দিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে সে বেরিয়ে গেল। অফিসারটি আবার তার কাগজপত্র নিয়ে পড়ল।

ও-ঘর থেকে মেজর ডাক দিলেন, "টোনানি!"

"আজ্ঞে, সিনর ম্যাগিয়োরে?" অফিসারের সাড়া গেল এদিক থেকে।

"পিনিনকে একবার পাঠিয়ে দাও তো!"

টোনানি চেঁচিয়ে ডাকলে, "পিনিন!" পিনিন আসার পর সে তাকে বললে, "মেজরসাহেব ডাকছেন তোমায়।"

পিনিন মেজরের কামরার দরজায় টোকা দিয়ে ডাকলে, "সিনর ম্যাগিয়োরে আমায় ডেকেছেন?"

"হ্যাঁ, ভেতরে এস। এসে দরজাটা বন্ধ করে দাও।" মেজর নির্দেশ দিলেন।

কামরার মধ্যে বাঙ্কের ওপর শুয়েছিলেন মেজর। পিনিন পাশে এসে দাঁড়াল। রুক্স্যাকটার টুকরো-টাকরা বাজে কাপড়-টাপড় পুরে বালিশ বানিয়ে তারই ওপর মাথা রেখে বিশ্রাম করছিলেন মেজর। হাত দু'খানা কম্বলের ওপর। পিনিনের দিকে তিনি চোখ ফেরালেন। তারপর প্রশ্ন করলেন, "তোমার বয়স হল কত যেন—উনিশ না?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"আচ্ছা, তুমি কোনদিন কারো ভালবাসায় পড়েছ?"

"আজ্ঞে—মানে—আপনি কী বলতে চাইছেন, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।"

"বলছি কী—কাউকে, অর্থাৎ কোন মেয়েকে, কি কোনদিন ভালবেসেছ?"

"আজ্ঞে সিনর, অনেক মেয়ের সঙ্গেই আমার মেলামেশা হয়েছে।"

"আরে না হে, সেকথা বলছি না। বলি, কোন মেয়ের প্রেমে-ট্রেমে পড়েছ, কোনদিন?"

"ও—হ্যাঁ—তা—হ্যাঁ—পড়ে—ছিলাম।"

"সেই প্রেম বজায় আছে এখনও, না ঘুচে গেছে?" মেজর জিজ্ঞাসু হলেন, "তাকে তো চিঠিপত্র লিখতে দেখি না? তোমার সব চিঠিই তো আমি পড়ি।"

পিনিন বললে, "ভাল—তাকে এখনও সমানই—বাসি, তবে চিঠি লিখি না।"

"এখনও সমান ভালবাস—ঠিক জান?"

"হ্যাঁ, ঠিক জানি।"

কণ্ঠস্বর একই পর্দায় রেখে মেজর ডাকলেন, "টোনানি, তুমি কি আমার গলা শুনতে পাচ্ছ?"

ও-ঘর থেকে কোন উত্তর এল না। মেজরের গলা ও-ঘর অবধি যাচ্ছে না, বোঝা গেল। মেজর বললেন, "না, আমাদের কথাবার্তা ও শুনতে পাচ্ছে না। —তাহলে, তুমি জোর দিয়েই বলতে পার যে, তুমি একটি মেয়েকে ভালবাস?"

"হ্যাঁ, সিনর ম্যাগিয়োরে, পারি।"

তার দিকে একটি দ্রুত কটাক্ষক্ষেপ করে মেজর বললেন, "আর তুমি যে খারাপ নও, তাও কি জোরের সঙ্গে বলতে পার?"

পিনিন জবাব দিলে, "খারাপ বলতে আপনি কী বোঝাচ্ছেন, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।"

"ম্—না, ঠিক আছে।" মেজর বললেন, "তোমার বুঝেও কাজ নেই।" পিনিনের দৃষ্টি তখন মেঝের দিকে। ম্যাগিয়োরে তার রোদে—পোড়া মুখের দিকে, তার চেহারার দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। পর্যবেক্ষণ করলেন তার সারা অবয়ব। তারপর গম্ভীর মুখেই বললেন, "তুমি কি সত্যি সত্যিই চাও না—?" থামলেন।

পিনিন মেঝের দিকে তাকিয়ে।

মেজর আবার মুখ খুললেন, "মানে, তোমার প্রবল বাসনা কি সত্যি সত্যিই এই নয় যে—?" পিনিন লহমার জন্যে মুখ তুলেই আবার তাকাল মাটির দিকে। তাকিয়ে রইল সেই দিকেই।

মেজর ম্যাগিয়োরে বিছানা থেকে গাত্রোত্থাপন করেছিলেন কিছুটা। ধীরে ধীরে ফের মাথা এলিয়ে দিলেন রুকস্যাকের তৈরি মাথার বালিশটার ওপর। হাসি ফুটে উঠল তাঁর মুখে। মস্ত একটা স্বস্তিবোধ করলেন তিনি। সৈনিকের জীবন বড় বেয়াড়া ধরনের—অনেক কিছু খারাপ, বদ্খত, অনেক কিছু এদিক-ওদিক ব্যাপার ঘটে সেখানে।

"তুমি খুব ভাল ছেলে, পিনিন," ম্যাগিয়োরে বললেন, "তুমি ছেলেটা সত্যিই খুব ভাল। কিন্তু একটা কথা বলি শোন। তোমার বয়সে যেমন থাকা উচিত ঠিক তেমনিভাবেই থেকো। বড়দের কাজকর্ম বা প্রথা কিছু অনুসরণ বা অনুকরণ করতে যেও না যেন—বুঝলে?" একটু থেমে তিনি বললেন, "আর হ্যাঁ, দেখ, একটু সাবধানে থাকবে, যাতে করে কেউ তোমায় কোন সময়ে বেকায়দায় ফেলতে না পারে।"

পিনিন তেমনি নিশ্চলভাবেই দাঁড়িয়ে রইল।

"ভয় নেই তোমার, কোন ভয় নেই," বললেন মেজর, "আমি তোমার গায়ে হাতও দেব না।" হাত দু'খানাকে কম্বলের ওপর আড়াআড়িভাবে রেখে বললেন, "যে প্লেটুনে তুমি আগে ছিলে সেখানে তুমি ফের ফিরে যেতে পার ইচ্ছা করলে। তবে আমি বলি কি, অনুচর হিসেবে আমার কাছেই তুমি থেকে যাও। এখানে তোমার প্রাণের আশঙ্কা অপেক্ষাকৃত কম হবে।"

"আপনার এখন কোন কিছুর দরকার আছে কি, সিনর?"

মেজর ম্যাগিয়োরে জবাব দিলেন, "না। তুমি যা করেছিলে কর গে যাও। যাবার সময় দরজাটা খোলা রেখে যেও।"

পিনিন কামরার বাইরে চলে গেল। দরজা রইল খোলা। সে টোনানির পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাবার সময় টোনানি মুখ তুলে তাকাল। পিনিনের মুখ চোখ ঘাড় হাত ঈষৎ রাঙা হয়ে উঠেছে। প্রথমবার যখন সে ঘরে ঢুকেছিল তখনকার তুলনায় তার এখনকার চলনভঙ্গী কেমন যেন অন্যরকম—বিস্রস্ত, অস্থিরগোছের। টোনানি তার দিকে চেয়ে নিজের মনেই হাসল। পিনিন বাইরে থেকে আরো কতকগুলি কাঠ নিয়ে এসে চুল্লীতে গুঁজে দিলে। তার পায়ের শব্দ মেজর ম্যাগিয়োরে ওঘর থেকে শুনতে পেলেন।

নিজের মনেই তিনি ভাবলেন, "ছেলেটা আমার কাছে যা বললে তা কি সত্যি না ধাপ্পা—কে জানে?"

সমস্ত বেদনাগুলো ক্রমশঃ মুখর হচ্ছে আর্তনাদ তুলে
এতক্ষণ পরে পরে গাড়ি এলে
চড়বো কি করে !
চোখের রোশনাই ছুঁড়ে
আমাকে শাসাচ্ছে কিংবা অনুরাগ এঁকে দিচ্ছে
অন্ধকারে চোখ রেখে কাঁপছে শুধু ছায়া
আত্মহত্যা-গুপ্তহত্যা আরো কত ভ্রূণ হত্যা
হয়ে গেছে গা-ঢেকেই ছায়ার আড়ালে
ধুকে ধুকে কলজেটা আমাদের জ্বলছে এখন ।

অন্ধকারে স্মিতকণ্ঠে কে যেন আমায় কাল বলেছিলো
প্রেম দেবে সন্ধ্যার এ্যাসপ্লানেডে
অথচ সেখানে কোনো প্রেম কিংবা ভালোবাসা কেউ নেই
ছায়ারা কেবল শুধু দ্রুত পায়ে পথ হাঁটছে কানাগলি দিয়ে
ভালোবাসা তা হ'লে কী তোমারো অসুখ করেছে !

অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়ে
স্নায়ুকে আমরা আর বেদনা দেবো না,
বেদনারা উচ্চকিত হচ্ছে, কথা বলছে আর্তনাদ তুলে
ছায়ারাও কেন জানি অন্ধকারে ছোটাচ্ছে ভীষণ,
সমস্ত বেদনাগুলো ক্রমশঃ মুখর হচ্ছে আর্তনাদ তুলে
এতক্ষণ পরে পরে গাড়ি এলে
চড়বো কি করে !

প্রবন্ধ

পবিত্র পাল

সাম্প্রতিকতার বিরুদ্ধে

'সাম্প্রতিকতা' আমাদের ঘাড় মটকে চলেছে। এই কথার অর্থ এই নয় যে, এই লেখক কাল ব্যতিক্রমের কবলিত হয়েছে কিম্বা হতে চাচ্ছে। কথাটা হল, সাম্প্রতিককালে বিশ্বের যাবতীয় ঘটনাবলী এমন প্রবল স্রোতে এবং বিপুল গতিতে ধাবমান যে এর তাৎক্ষণিক ধাক্কার চোটে আমাদের চেতনা লোপ পেয়ে যায়, বুদ্ধির প্রাসাদ ভেঙে পড়ে এবং সম্মুখ দৃষ্টি পলকমাত্রেই সঙ্কুচিত হয়ে আসে। ফলে একালে বসে ভিন্ন কালের কথা ভাবা অত্যন্ত দুরূহ এবং অলীক কল্পনার ব্যাপার। তাৎক্ষণিক ধাক্কাগুলি সামলাতে সামলাতেই আমাদের চলতে হচ্ছে। এই তাৎক্ষণিক মুহূর্তের যেন অবসান নেই। এই তাৎক্ষণিকবাদের কবলিত সময় অর্থে এখানে 'সাম্প্রতিকতা' বোঝানো হয়েছে। এখানে জোরের সঙ্গেই বলতে চাচ্ছি যে, আমরা সাম্প্রতিকতার চার দেয়ালের সীমা ছাড়িয়ে নিজেদের দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে পারছি নে। সাম্প্রতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে সম্যক সচেতন থাকাটা অতি আবশ্যিক গুণ, কিন্তু সাম্প্রতিক ঘটনাবলী দ্বারা আক্রান্ত হয়ে তার বশ থাকাটা কোন গুণ অবশ্যই নয়।

তেমনি গুণ নয় 'কালব্যতিক্রম-ও'। 'সাম্প্রতিকতা'য় দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হলে-ও এ সময়ে যে কালব্যতিক্রমের চর্চা হচ্ছে না এমন নয়। কেউ কেউ বলেন, এই সাম্প্রতিকতার কঠোর কারাগারে বদ্ধ হয়ে আমাদের নাভিশ্বাস ওঠার উপক্রম হচ্ছে। অতএব, এর জন্য উদার আলোক এবং মুক্তবায়ুর সান্নিধ্যে স্নিগ্ধ এবং আরাম বোধ করার জন্য আমরা অতীতের মধুর রূপকথার মত স্মৃতিগুলিকে জড়িয়ে ধরতে চাচ্ছি। অর্থাৎ একালে বসে ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রতি অন্ধ পিপাসা বাড়িয়ে তোলার প্রয়াসই তার

অন্যতম জলন্ত দৃষ্টান্ত। এসব উপন্যাসের ঐতিহাসিক ভিত্তি থাকলে-ও ইতিহাসাশ্রিত নয় এদের গোটা অবয়ব। বিন্দুর মত উপাদানের ওপর ভিত্তি তুলে সিন্ধুর স্বাদ জাগানোর জন্য দিগ্বিদিকহীন রসাল কল্পনার তাগিদে যথেচ্ছভাবে পাহাড় নদীর মত খরস্রোতা করা হয়। কালব্যতিক্রমের চর্চার একটা নমুনা হিসেবে বাংলাদেশের ঐতিহাসিক উপন্যাসের দৃষ্টান্ত এখানে সহজবোধ্য হবে বলে উল্লেখ করলাম। শুধু যে লেখকই 'কালব্যতিক্রম-এর দৃষ্টান্ত, তা নয়। বিপুল সংখ্যক পাঠক-ও ভিন্নকালের কথা শুনবার জন্যই এসব উপন্যাস পড়ে থাকেন বা থাকছেন। এই কালব্যতিক্রম-এর প্রতি অনর্থক এবং অন্ধ ঝোঁক বর্তমানের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার সামিল, বর্তমানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সতর্কতার অভাবই ঘোষণা প্রকাশ করছে।

'সাম্প্রতিকতা' নামক দুরারোগ্য ব্যাধিটির লক্ষণ কি কি?

আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে শীতলযুদ্ধের ক্রমপ্রসারমান এলাকা, অর্থনৈতিক বিপর্যয়, নৈতিক শক্তিগুলির হ্রাস, প্রবল এবং অন্ধ জাত্যাভিমানের পুনরুজ্জীবন, জঙ্গীবাদের প্রতি আত্যন্তিক প্রশ্রয়-প্রবল ঝোঁক, ধনতন্ত্রবাদের সরাসরি সাম্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই-এ অনিচ্ছা এবং নানা কূটনৈতিক ও অর্থের ব্যাপক লোভ ছড়ানো পথে ষড়যন্ত্র ইত্যাদি ইত্যাদি সব 'সাম্প্রতিকতা'-র লক্ষণ। এসব লক্ষণযুক্ত ব্যাধিতে মানবসমাজ আক্রান্ত হওয়াতে অমানবোচিত গুণসমূহের দলবদ্ধভাবে আত্মপ্রকাশ এবং মানবোচিত গুণসমূহের ওপর আক্রমণ করে তাদের নিহত করার প্রবণতা সাম্প্রতিকতার লক্ষণ।

দৈনন্দিন জীবনে আমরা যেসব ইন্‌ষ্টিটিউশনের সান্নিধ্যে এসে থাকি যেমন পরিবার, অফিস, পত্র-পত্রিকা, বন্ধু বান্ধব পরিজন প্রভৃতি, এইসব ইন্‌ষ্টিটিউশনের যে কোন একটিকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে কোথাও তেমন কিছু চোখে পড়ে না যাতে আমাদের চোখের দৃষ্টি উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর, আমাদের মনের দরজা জানালা খুলে গিয়ে অনুপ্রবিষ্ট আলো হাওয়ার স্পর্শে ক্রমশ দরাজ, মুক্ত, উদার পরিবেশে তার প্রতিষ্ঠা ঘটে, যুক্তিশীল পথে প্রবল হৃদয়াবেগ সংযত হয়ে চলতে পারে।

পরিচ্ছন্ন, মার্জিত বুদ্ধির ছলাকলা চাতুর্যের বক্রপথে এমনভাবে বিচরণ করছে যে, তাদের বুদ্ধির অস্তিত্বের সমূল অবসান ঘটে এমন আকাঙ্ক্ষার তরঙ্গ আমাদের মনকে যন্ত্রণা দেয়।

সংক্ষেপে সাম্প্রতিকতার যেসব লক্ষণগুলি বলা হল, সেগুলি সম্পর্কে

যথোচিত সচেতন থেকে পরিশীলিত যুক্তির ধারে তাদের বিশুদ্ধিকরণ ঘটালে ত আর সাম্প্রতিকতার বিরুদ্ধে কোনরূপ ধ্বনি উঠতে পারে না। তবে? সাম্প্রতিকতার বিরুদ্ধে এ আলোচনার উদ্ভব হয়েছে এ কারণে যে, সাম্প্রতিকতার লক্ষণগুলি দ্বারা আমরা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছি কিন্তু সে লক্ষণগুলিকে আমরা বশে এনে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছিনে।

তাতে ক্ষতিটা হয়, নিজেদের পরবশ্যতায় নীত হতে হয় এবং তার ফলে প্রগতির পথ আমাদের চোখের মনের সামনে থেকে অনেকখানি দূরে সরে যায়। সর্বোপরি নিজেদের ওপর বিশ্বাসের অভাব ঘটে। জাতিগতভাবে আত্মবিশ্বাসেরও সমাধি ঘটে। বিশেষ করে এই সাম্প্রতিকতা যখন কোন উজ্জ্বলতা, কোন ফূর্তির নয়, অত্যন্ত অন্ধকারজনক, অত্যন্ত নৈরাশ্যেপীড়িত এ সাম্প্রতিকতা।

এর ফলে আমরা এমন সব মূল্যবোধের দাসত্ব গ্রহণ করে চলেছি, যাতে আমাদের দুর্বল, আত্মবিশ্বাসবর্জ্জিত অস্তিত্ব ভবিষ্যত মানুষের কথা সুন্দরতর আগামী দিনগুলির স্বপ্ন দেখতে ভুলে গেছি।

একটি উদাহরণের সাহায্যে বক্তব্যটি বিশদ করা যাক।

'জাত্যাভিমান' সাম্প্রতিকতার একটি বড় লক্ষণ। সম্ভবতঃ বর্তমান বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের যুগে জাত্যাভিমান চরম উগ্রতার পোষাক পরেছে। সাম্যবাদী শিবিরে সোবিয়েতের সঙ্গে চীনের বিরোধের মূলে রয়েছে জাত্যাভিমান। বিসমার্ক জার্মান জাতিকে সেদিন উন্নত করার নামে জাত্যাভিমানের চর্চা করেছিলেন, তার বিষ বটিকা জার্মান জাতিকে সেবন করতে হয়েছিল বিশ শতকে হিটলারের আমলে। সাম্প্রতিকতার এমন চাপ পড়েছে আমাদের মননে এবং বুদ্ধিতে যে, আমরা সম্ভবত ইতিহাস পাঠ বর্জন করেছি। শুধু সাম্যবাদী শিবিরেই নয় এক প্রতিবেশী রাষ্ট্র অপর প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে কোন মুক্তবুদ্ধি নিয়ে আলোচনায় বসতে পারছে না, সেটাও এই জাত্যাভিমানের জন্য। মুক্তবুদ্ধির আলোতে কোন বিষয় আলোচনা করলে কোন সমাধান আয়ত্ত করা সম্ভব নয়, এমন মন্তব্য অধুনা অবৈজ্ঞানিক মনের পরিচায়ক। 'জাত্যাভিমান' প্রসূত ঈর্ষা, হিংসা সারা পিতৃভূমিকে যখন আচ্ছন্ন করে ফেলে তখন আমরা ভুলে যাই সারা পৃথিবীব্যাপী মুক্তবুদ্ধি এবং শুভ বুদ্ধির দিকে অগ্রচারণের অনুশীলন হচ্ছে। ভুলে যাওয়ার ফলে আমরা অগ্রচারণের ফলে পশ্চাৎমুখীনতাকে প্রশ্রয় দিই ত বটেই উপরন্তু তাকে আশ্রয় করে চলতে চাই। বৃহত্তর মানব সমাজের উন্নতি, কল্যাণ না

ঘটলে যে শুধু পিতৃভূমিকে আঁকড়ে ধরেও বিপদ মুক্তির কোন সম্ভাবনা নেই। এখন বহির্বিশ্বে যা ঘটে তার প্রচণ্ড প্রভাব আমাদের ওপর পড়ে, পিতৃভূমির অভ্যন্তরেও তার জের চলতে থাকে। এই সহজ বোধটা আমরা হারিয়ে ফেলেছি, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন খাড়া করতে গেলে কোন রকমভাবে সাম্প্রদায়িকতাকে আমাদের মনের মধ্যে ঘাঁটি গেড়ে বসতে দিলে চলবে না।

এই 'জাত্যাভিমান' কিম্বা সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে যে শিক্ষা বহু শতকের অভিজ্ঞতার আলোতে আয়ত্ত হয়েছে এবং তার প্রচার ঘটেছে—সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর চাপে পড়ে সে সব শিক্ষা আমরা ভুলতে চলেছি। সেই সঙ্কীর্ণ অন্ধকারার দিনগুলি যেন আবার সন্ত্রাস সৃষ্টি করার জন্য বর্তমান শতকে ফিরে আসছে।

তাহলে মুক্তির উপায়? এত বড় প্রশ্নের রায় দেবার জন্য এই আলোচনার উদ্ভব হয়নি। সাম্প্রতিকতার সমস্যাটাকে ধরবার জন্য এই আলোচনার সৃষ্টি। তবে একটা কথা পরিষ্কার করা দরকার, কালব্যতিক্রম কিংবা সঙ্কীর্ণ অর্থের সাম্প্রতিকতা দুটোই বর্জন যেখানে এই আলোচনায় করা হয়েছে সেখানে প্রশ্ন উঠবে সব যুগেই এই দুই সমস্যা ছিল না কি? নিশ্চয়ই ছিল, যে যুগে ঐতিহাসিক কাহিনীর মধ্যে পরম প্রীতি খোঁজবার কোন প্রবণতা ছিল না, তখনও পুরাণের আশ্রয় লোকে নিয়েছে। এ সঙ্গে এটা বলা দরকার, কাল-ব্যতিক্রমের মধ্যে মগ্ন হওয়াটাই দুর্বল সমাজের এক ধরনের আত্যন্তিক সাম্প্রতিকতা দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার ফল। যদি এই দুটো সমস্যা থেকেই থাকে, মানুষ বিজ্ঞান কিম্বা বহু শতকের জ্ঞানানুশীলনের ফলে আজ অনেকখানি পরিশীলিত হতে সক্ষম হয়েছে কী করে তা সম্ভব হল? সম্ভব হয়েছে একেক-কালে কয়েকজন যুগপ্রবর্তক ব্যক্তিত্বের অধিকারী মনীষীর আবির্ভাবের ফলে। কালে তাঁরা ভবিষ্যৎ মানব সমাজের চিত্র সুস্পষ্টভাবে এঁকে নিতে সক্ষম ছিলেন এবং সেভাবে বর্তমানকে চালনা করাও একটা শিক্ষার অনুশীলন করেছিলেন। চিরাচরিত গণ্ডীকে অতিক্রম করার এবং বহুকালের গেঁথে-বসা সংস্কারের প্রাচীর ভেঙ্গে ফেলার দুঃসাহস তাঁরা দর্শাতে পেরেছিলেন।

একালে সেসব মনীষী কই? ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনতা ঘিরে বস্তাপচা কতকগুলি কথা দিয়ে একেকজন অধিপতি রাজত্ব করে চলেছেন। গোঁড়ামি, সঙ্কীর্ণতা তাঁদের চরিত্রের ভূষণ। অর্থাৎ এই অধিপতিরা নিজেদের স্বার্থের জন্য

প্রগতিশীলতার নাম করে প্রতিক্রিয়াশীলতার কক্ষে আশ্রয় নিয়ে থাকেন। কোন প্রগতিবাদী দল যদি সাম্প্রদায়িক শক্তির সঙ্গে হাত মেলায়—সেটা যে প্রগতিবিরোধী কার্য-কলাপের নামান্তর এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। বিশাল জনসমষ্টিকে আলোকিত করছে অর্থনৈতিক সংগ্রামের পথে, কিন্তু সেই সঙ্গে আত্মিক মুক্তিটাও প্রয়োজন একথা কে বলেন। মুক্তবুদ্ধির উদয় হলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের শত্রুদের চিনতে অসুবিধে হয় না। কিন্তু কতকগুলি শ্লোগান দিয়ে কিম্বা কতকগুলি উর্বর মস্তিষ্কের অঙ্গুলি সন্ধানেই যদি জনতাকে শত্রু চেনাবার চেষ্টা হয়—তবে সেটি কোন প্রগতিশীল চিন্তার বিকাশ জানতে ইচ্ছে হয়। একদিকে যখন জঙ্গীবাদী সাম্রাজ্যবাদ বিশ্বের মানবতার অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে প্রতিনিয়ত অপমান করে চলেছে, অন্যদিকে প্রলিতারিয় সাংস্কৃতিক বিপ্লবের নামে উগ্রতার উৎসমুখ উন্মুক্ত হয়েছে।

এইসব শক্তির স্বপক্ষে বেশ কিছু লোক জড় হয়েছে যাদের বিগ্রহ আরাধনার প্রতি প্রবল আসক্তি রয়েছে। এক বিগ্রহ যদি হয় কুবেরের, অন্য বিগ্রহ নিশ্চয়ই উগ্র জঙ্গীবাদীর। বিগ্রহকে মুক্তবুদ্ধি সর্বদাই বর্জন করে।

এইসব অসুস্থ শক্তিগুলি দিনে দিনে মাথা চাড়া দিয়ে চলেছে এবং এর বিরুদ্ধে সমসাময়িককালের পৃথিবী দলবাজী নীতিই গ্রহণ করেছে।

এই লেখকের বক্তব্য সাম্প্রতিকতার প্রচণ্ড চাপে বিশ্ব আজ দূরদৃষ্টি হারিয়েছে; বিশ্ব থেকে মুক্তবুদ্ধি বিদায় নিয়েছে; বিশ্ব নিস্পৃহ চিন্তুতার চর্চা করতে ভুলে গিয়েছে। সাম্প্রতিকতাকে বিশ্ব নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারছে না —যদিও রাষ্ট্রসংঘ বলে বিশ্বমানব সংঘের অস্তিত্ব আছে এবং তার অধীনে গবেষণা এবং সার্বিক নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা পরিচালনার জন্য বহু রকম উপসংস্থা আছে। সেদিন বিশ্বে সাম্প্রতিকতাকে বশ করার জন্য দূরদৃষ্টিসম্পন্ন একদল দুঃসাহসী উদার ব্যক্তির জন্ম হবে যারা সাম্প্রতিকতাকে নিজেদের বশে রেখে মননকে সেভাবে পরিশীলিত করতে সক্ষম হবেন—সেদিন মানব সমাজের সর্ব অবয়ব ঘিরে উজ্জ্বলতা, প্রসন্নতা, নিরাপত্তার অস্তিত্বে নিশ্চিন্ততার আলো বিচ্ছুরিত হবে।

ইতিমধ্যে আমাদের মধ্যে সাম্প্রতিকতাকে উত্তীর্ণ হওয়ার অনুশীলন করলে কেমন হয়? অনুশীলনটা নিশ্চয়ই কোন স্পর্ধাগঠিত বাক্যের নির্দেশ করে না।

দেওয়ালী

এলিয়র ফার্জন

বাতিওলা তুমি রাস্তার আলো জ্বালো
পথচারী কত জমেছে পথের পরে ;
সরণী তমসালীন,
দৃষ্টি জ্যোতিহীন
চরণ স্খলন রেখো না ওদের তরে।
পরিখার খাদে হয়ত পড়বে ভুলে
ধুলো কাদা থেকে কেই বা আনবে তুলে ?
তার চেয়ে তুমি রাস্তার আলো জ্বালো
দেখছ না নেমে এসেছে রাতের কালো ?

ঠাকুমা, এবার পিদিম জ্বালিয়ে দাও
ঢুলু ঢুলু চোখ কচিরা এবার শোবে।
পিদিম যদি না জ্বলে
গুঁতো খাবে দলে দলে
খুঁজে পাবে নাক বালিশ বিছানা তবে।
সিঁড়ির ওপর হয়ত পড়বে ঢুলে
না হয় মেজেতে গড়াবে মনের ভুলে.
তার চেয়ে তুমি পিদিম জ্বালিয়ে দাও,
নিশি সমুদ্রে দিন যে হোল উধাও।

দেবদূত তুমি তারার দীপালি জ্বালো
পরীরা এবার এদিকে ওদিকে যাবে।
আকাশে অন্ধকার
থাকলে কি করে তার
পথে বিপথের সঠিক হদিস পাবে ?
দেখো চাঁদে গিয়ে মাথা ঠুকবেই ঠিক
ভুলে এলোমেলো ঘুরবে দিগ্বিদিক
মাঝ পথে যদি হোঁচট না খায়—ভালো
তার চেয়ে তুমি তারার দীপালি জ্বালো ॥

অনুবাদক—মনীশ ঘটক

ইষ্টার দিন

বার্টলেট ব্রেখট

ইষ্টারের ভোরে এই দ্বীপের উপর
হয়ে গেল অকস্মাৎ তুষারের ঝড়—
মুকুলিত ঝোপ-ঝাড়ে তুষারের ফুল।
আমার কনিষ্ঠ ছেলে দেখায় আঙুল।—
আখরোট গাছটির দিকে।

কবিতা লেখায় ছেদ পড়ে অকারণ—
যাদের বিরুদ্ধে আমি ধরেছি কলম
যারা যুদ্ধবাজ, যারা আজ
ধ্বংস করে এই মহাদেশ, এই দ্বীপটাকে
দেশবাসী, পরিবার এবং আমাকে।

আমরা নিঃশব্দে শুধু শীতে কাঁপা গাছটির গায়ে
কেবল একটি থলে দিলাম জড়ায়ে॥

অনুবাদ—দ্বিজেশ দাস

পরিচিত স্বপ্ন

পল ভেরলেন

আশ্চর্য উজ্জ্বল স্বপ্নে অজ্ঞাত নারীর অভ্যুদয়
দেখি আমি, সে বর্ণিনী প্রিয়া, আর আমি প্রিয় তার;
দেহমনে পূর্বরূপা সে আর হবে না, কিন্তু নয়
অন্তরূপা; ভালোবাসে আমাকে সে, খুঁজে ছাখে রহস্ত আত্মার।

সে মর্মবেদিনী নারী; সমুজ্জ্বল আমার হৃদয়
তারই অনুচিন্তনেই!—যা দৃশ্যত একান্ত সরল
তা শুধু তাকেই ভেবে; আর যে আর্দ্রতা সমুচ্চয়
আমার ললাটে, মুছে দিতে পারে তারই অশ্রুজল।

সুন্দরী, রেশমী চুল, মলিনা, তামাটে কিংবা লাল
চুল তার? কী যে নাম? কী মধুর প্রতিধ্বনিময়,
প্রেমিক প্রেমিকাদের দিন যেন চলে ধীর লয়ে।

দৃষ্টি তার, পাষাণের প্রতিমার চোখে রেখাজাল;
স্বর তার, শান্তি আর দুঃখে যেন হয়েছে সংশ্রয়;
উচ্চারণ তার, মৃত প্রিয়দের স্মৃতি আনে বয়ে।

অনুবাদ—গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়

সেই ডুবে যাওয়া মেয়েটি

বারটল্ট ব্রেখ্ট

নিরুপমা ভেসে গেল ডুবে গেল জলের গভীরে
স্বর্গের বহুরূপী, আশ্চর্য সুন্দর হেসে বাধ্য হয়ে যেন
খোশামোদে জ্বলে গেল শবের শরীরে।

বুনো লতা, ঠাণ্ডা মাছ আদরে জড়ায়ে ধরে—
ভারী হল মোমের শরীর।—
সে ঘুমও সুখের নয়,
ভাসে দেহ ফুলের পরীর।

সন্ধ্যার আকাশ যেন ধোঁয়া ধোঁয়া কালো কালো হল।
জ্বলায়ে দিয়াছে রাত তারাদের মনোহারী আলো।

কিন্তু কচি কলাপাতা ভোরে—
আবার হাল্‌কা আকাশ
আবার রূপালী সকাল
আর সোনালী বিকাল,
ভরে' ওঠে তারই আদরে।

তারপর—
যখন পাণ্ডুর দেহ পচে গেল, গ'লে গেল,
ঈশ্বরও ধীরে ধীরে ভুলে গেল তাকে।
মুছে গেল মুখ, পরে হাত দু'টি,
অবশেষে বর্ণালী চুলটি।

তারপর নদীর অতলে
পচা-গলা মাংসের আড়ালে
নিরুপমা ডুবে গেল।
জলের গভীরে মেশে স্বপ্নের ফুলটি ॥

মূল জার্মান থেকে অনুবাদ—জীবন বন্দ্যোপাধ্যায়

আগন্তুক

কমলা দাস

পথিক, তোমায় দেখেছি অনেকবার
দেখেছি শহরে পথ দিয়ে হেঁটে যেতে,
দু' চোখে দেখেছি হতাশার ঘনছায়া।
কোন তরুণীর চোখে চোখে চাওনিক ;
উদাস দৃষ্টি ; নির্দয় আকাশেতে
কুয়াশার ম্লান ধূসরতা, দুই হাত
মুষ্টিবদ্ধ, হেঁটে গেলে নির্জন
পথ দিয়ে একা—অচেনা আগন্তুক।

দেখেছি তোমায় রেস্টুরেণ্টে ; খুসী—
ঝলকায় যেথা অভ্যাগতের মুখে।
থামের পেছনে একা শুধু ছিলে তুমি।
ম্লান মুখে গ্লাস তুলেছ মদ্যে ভরা,
ক্লান্ত বাঁ হাতে আঁকড়িয়ে ধরেছিলে
সামনের ছোট টেবিলের কোণটাকে।

দেখেছি তোমাকে পার্কের উদ্যানে
দেখেছি নদীর কিনারায় হেঁটে যেতে।
শান্ত ও নত দু'চোখের চাউনিতে
কি ছিল, ভুলিনি ; সেই বিষণ্ণ হাসি
মৃদু নিঃশ্বাসে বলা ছোট ছোট কথা
ভুলিনি ; আজও অচেনা আগন্তুক।

অনুবাদ—**সন্তোষকুমার অধিকারী**

কমলা দাস (মাধবী কুট্টি) কেরালার মহিলা কবি বালামণি নায়ারের কন্যা। ইংরাজী ভাষায় লিখিত কবিতায় সম্প্রতি খ্যাতিলাভ করেছেন।

শেষ পাতা

হরমোহন পরমানন্দকে বলল, কেমন চলছে ভাই ?

—বিশেষ সুবিধের নয়। মাঝে মাঝে এমন ঝামেলা আসে যার ফলে লাভের গুড় পিঁপড়ের খায়।

—তাহলে যাতে না খায় তার ব্যবস্থা কর।

—তাই ত এলাম তোমার কাছে।

—আমি আর কি করতে পারি। নিজেই জড়িয়ে আছি একটা নূতন প্ল্যান নিয়ে…

—কেন, তোমারও কারবার মন্দা নাকি ?

—আরে ভাই বল কেন, চাল আর পাচ্ছি কোথায়, শুধু কায়দা-কানুন একটু জানা আছে তাতেই যা বেঁচে আছি, নইলে—

এমন সময় ধীরেশবাবুকে দেখে হরমোহন বলল, আসুন, আসুন। আপনি না হলে আমাদের আর গতি নেই। অকূলের কূল—

—না, না, কি বলছেন,—আমি অতি সামান্য প্রাণী।

—মিথ্যে কিন্তু বলিনি। একেবারে নির্জলা খাঁটি উক্তি।

—কেন ডেকে পাঠিয়েছেন বলুন তো ? সেই অবধি ভাবছি।

—গরীবের সেই কথাটা স্যার মনে আছে ত ?

—কেন আর লজ্জা দিচ্ছেন। ও কথা কি ভোলবার হরমোহনবাবু। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, ও সব ঠিক হয়ে যাবে।

—আর একটা ছোট্ট অনুরোধ আছে স্যার অবশ্য আমার নিজের জন্য নয়, আমার এই বন্ধুটির জন্যে। ওর একটু ঝামেলা হয়েছে।

—বলুন, আমার দ্বারা যদি কিছু—।

—বল না হে পরমানন্দ, তোমার সেই ব্যাপারটা কি ?

—তুমিই বল, তুমি বরং ভালো পারবে।

—এতে লজ্জার কিছু নেই, স্যার আমাদের নিজেদের লোক। আচ্ছা যখন বলছ তখন কথাটা বলেই ফেলি—মানে, ও একটু আধটু ঘি-এর কারবার করে; কিন্তু মাঝে মাঝে তাতে নানান্ ঝামেলা আসে, তাই…

—এতে আর লজ্জার কি আছে পরমানন্দবাবু, আপনারা থাকলেই আমরা আছি।

পরমানন্দ হাত কচলাতে কচলাতে বলল, দয়া করে যদি…

—দয়ার কিছু নেই, আপনি দেবেন আমি নেব, আমি দেব আপনি নেবেন, একেবারে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান—আর এটাই বা বুঝছেন না কেন, আমরা ত সবাই এক জাতি, এক প্রাণ…

ঠিক এই সময় অনেক দূরে কোনো প্যাণ্ডেলের কর্কশ মাইক আকাশ ফাটিয়ে চীৎকার করে উঠল—"বল বল বল সবে, শত বীণা বেণু রবে…"

ছেলেগুলোর কিছু কাণ্ডজ্ঞান আছে তাহলে!

পাত্র মহাশয়

পুজোয় চাই
নতুন জুতো
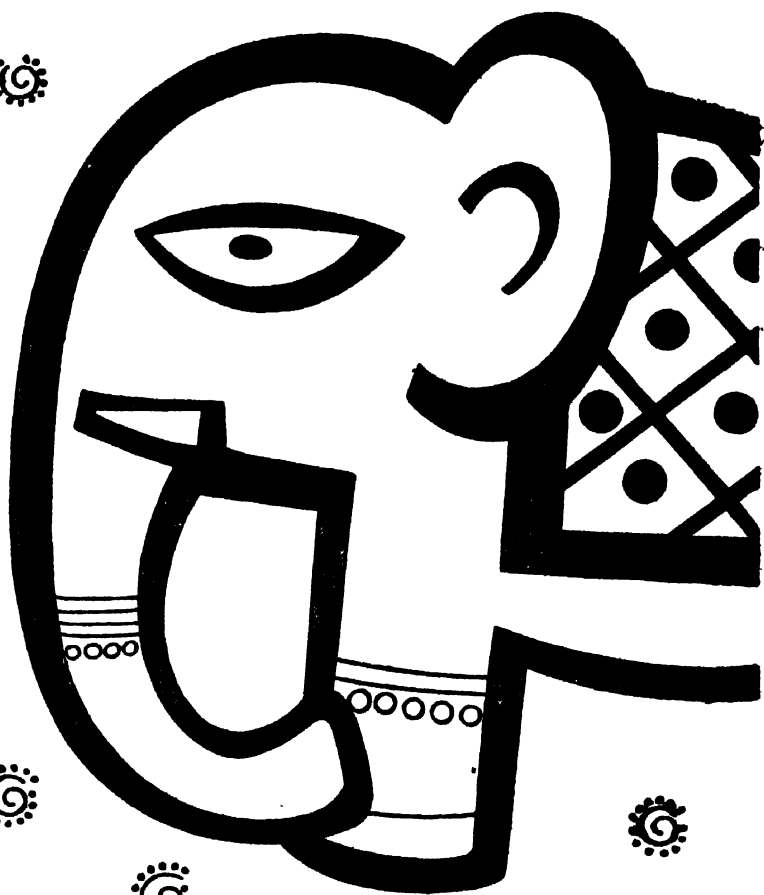
ভোর

ডক্টর লোকনাথ ভট্টাচার্য ॥ ৬'০০ ॥

বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস

॥ আনকোরা নতুন নতুন বই—সন্ত বেরিয়েছে ॥

লিপিকা ॥ ৫'৫০ ॥
॥ নীহাররঞ্জন গুপ্ত ॥

ব্যাটে বলে ক্রিকেট
অজয় বসু ॥ ৪'৫০ ॥

রঙিন নিমেষ
শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ৪'৫০ ॥

বিশেষ দ্রষ্টব্য
নীললোহিত ॥ ৪'৫০ ॥

চাঁদের ওপিঠ
মনোজ বসু ॥ ৪'৫০ ॥

কৃষ্ণচূড়া
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ॥ ৬'৫০ ॥

জর্জ বার্নাড শ ॥ ১০'০০ ॥ (২য় সংস্করণ)
ভবানী মুখোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স (প্রাঃ) লিমিটেড : গ্রন্থ-প্রকাশ
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট। কলিকাতা-১২

সাংস্কৃতিকী
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
বিবিধ বিষয়ের মূল্যবান আলোচনা
৫'৫০

অস্কার ওয়াইল্ড
ভবানী মুখোপাধ্যায়
এই বৈচিত্র্যময় জীবনী উপন্যাসের চেয়েও মনোরম। ৫'০০

সুতানুটি সমাচার
বিনয় ঘোষ
বাংলার গোড়াপত্তন কালের পারিবারিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের অনবদ্য আলেখ্য। ১২'০০

আধুনিক কবিতার ইতিহাস
আলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ও দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত
বাংলা কবিতায় আধুনিকতার সূচনা ও বিবর্তনের বৃত্তান্ত। ৭'৫০

বিদ্রোহী ডিরোজিও
বিনয় ঘোষ
ডিরোজিওর এই অনবদ্য জীবনচরিত সার্থক উপন্যাসের মতোই চিত্তাকর্ষক।
৫'০০

নাম ভূমিকায়
শ্রীপান্থ
বিস্ময়কর মানুষেরই বিচিত্র কাহিনী। একালের দুনিয়ার এক নিখুঁত দর্পণ।
১৫'০০

বাক্ সাহিত্য ॥ ৩৩, কলেজ রো। কলিকাতা-৯

বিশ্ব-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গল্প

ভবানী মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

মূল্য—প্রতি খণ্ড পাঁচ টাকা মাত্র

এই গ্রন্থ সম্পর্কে সাপ্তাহিক বসুমতীর দীর্ঘ সমালোচনার অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করা হল :

"বাংলা মৌলিক সাহিত্যে শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায় একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছেন। অনুবাদ-সাহিত্যেও তাঁর দক্ষতা অসামান্যই শুধু নয়, সেখানেও তাঁর মৌলিকতার ভুরি ভুরি নিদর্শন মেলে। বিশেষতঃ গল্প নির্ধারণে, মূল চরিত্রাঙ্কনে ও বাংলা বাগধারার সূক্ষ্ম ব্যবহারে তিনি এক অনন্যশক্তির পরিচয় দিয়ে থাকেন। উপর্যুক্ত গল্প সংকলনটি আরো অনেক কিছু নতুনত্বের দাবি করতে পারে। যেমন : (১) ছ'টি দেশের গল্প (ফ্রান্স, রাশিয়া, ইতালী, ইংলণ্ড, আমেরিকা, জার্মানী) সংকলনটিতে স্থান পেয়েছে। (২) প্রতিটি গল্প বিশেষ নৈপুণ্যে সংগৃহীত—যদ্বারা প্রমাণিত হয় যে, অনুবাদক অনুসন্ধানী মন, রসোপলব্ধি ও বহুপঠন সৌভাগ্যেই এইসব অতুলনীয় গল্প পাঠকদের উপহার দিতে পেরেছেন। (৩) গল্পগুলির আন্তর্জাতিক আবেদন অবিস্মরণীয়। (৪) ছ'টি দেশের সমাজ ও রাষ্ট্র আজ যে ভাবে গড়ে উঠেছে তাদের প্রাক্-স্বাক্ষররূপে এই সব গল্প তাদের রচয়িতাদের সমগ্র দেশ, সমাজ, মানুষ ও বিশ্ব-জগৎ সম্পর্কে চিন্তানুভূতির কথা আজ নতুন করে ভাবতে শেখায়।

বিশ্ব-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গল্পের এই প্রথম খণ্ডটি আর এক কারণে অভিনন্দিত হবে। একবারে হালের বাংলা সাহিত্যে গল্পের দৈন্য যেন মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে, সেই অবস্থায় বিশ্ব-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গল্পগুলি আমাদের অভিনব রসের আস্বাদ দেবে এবং তরুণ লেখকদের অনুপ্রাণিত করতে বিশেষভাবে সাহায্য করবে।......"—সাপ্তাহিক বসুমতী—২রা অগ্রহায়ণ, ১৩৭২

এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স্ প্রাঃইভেট লিঃ

১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট : কলিকাতা-১২

Kantharol

বৈতানিক

সম্পাদক

ভবানী মুখোপাধ্যায়

এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

সূচীপত্র

বাঁকুড়া জেলা গেজেটিয়ার

সম্পাদনা : শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

"বাঁকুড়া জেলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসুগণের যাবতীয় জ্ঞাতব্য তথ্য এই গ্রন্থে পরিবেশিত হয়েছে। তথ্যগুলি প্রামাণিক ও ইদানীন্তন। বহু মানচিত্র, রেখাচিত্র ও পরিসংখ্যান গ্রন্থটির মূল্য অনেকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে।"

—ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার

"এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট তথ্যাবলী প্রত্যাশিতভাবেই অধুনাতন এবং ইতিহাস, জাতিতত্ত্ব, ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি, লোকচর্যা, শিক্ষা, অর্থনীতিক ইত্যাদি কয়েকটি বিষয়ে সম্পাদক সময়োচিত পর্যালোচনা করবার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন।"

—ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

"হাণ্টারের সময় থেকে গেজেটিয়ার রচনার যে প্রগতিশীল ঐতিহ্যের সৃষ্টি হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বর্তমান গ্রন্থটিতে সেই ধারা প্রশংসনীয়ভাবেই অব্যাহত রয়েছে।"

—অধ্যাপক শ্রীনির্মলকুমার বসু

মূল্য : প্রতি কপি ২৫ টাকা

পুস্তক বিক্রেতাদের শতকরা ১৫ টাকা কমিশন

॥ প্রাপ্তিস্থান ॥

পশ্চিমবঙ্গ সরকারী মুদ্রণ
৩৮, গোপালনগর রোড
কলিকাতা-২৭

পাবলিকেশন সেল্‌স্ ডিপো
নিউ সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিংস্
১, কিরণশঙ্কর রায় রোড, কলি-১

প. ব. (তথ্য ও জনসংযোগ) বি ১৩২২—৬৯

বৈতানিক

বৈশাখ—১৩৭৬

হয়তো

হয়তো আকাঙ্ক্ষা ছিল
ডুব দিয়ে জলের হৃদয়ে
কোমল লিপ্ততা তার
গম্ভীর গাহনে নিয়ে ওঠা
পবিত্র নির্মল উজ্জীবিত !

সব আলিঙ্গন এক
নদীর, নারীর।
একই বুঝি এ সত্তার গহন যাচনা-
অভেদ আশ্লেষে
নিঃসর্তে নিজেকে ঢেলে,
চেতনায় তবু ধরে রাখা,
স্বতন্ত্রের শশঙ্ক শিহর।

দগ্ধ দেহ মগ্ন হবে,
কোথা সেই লুপ্তি স্বচ্ছতোয়া ?
স্বৈরিণী সমুদ্র নয়,
—আমাদের দম্ভে যার দ্বন্দ্বের আহ্বান—
সুশীতল স্নিগ্ধ গাঢ় জল
তবু খরস্রোতা
নিরাময় অবগাহনের
খোঁজা কি বৃথাই ?

আমাদের শশব্যস্ত সাবধানী লোভে
সব নদী চাটুশুল্কা দাসী হয়ে গেল।
সব তট নিরাপদ বাঁধানো বিলাস ?

প্রেমেন্দ্র মিত্র

গান্ধীবাদ বা দ্বান্দ্বিক আদর্শবাদ

অন্নদা শংকর রায়

গান্ধীবাদ যাকে বলা হয় তার প্রকৃত নাম দ্বান্দ্বিক আদর্শবাদ। যেমন মার্কস্‌বাদ হচ্ছে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ। এই দুই মতবাদের মধ্যে একটি জায়গায় মিল আছে। সেটি হ'ল এদের বিশেষণ পদ। উভয়েই দ্বান্দ্বিক।

হাঁ, উভয়েই দ্বান্দ্বিক। কিন্তু দ্বন্দ্বের পদ্ধতি এক নয়। দ্বান্দ্বিক আদর্শবাদ অসত্যকে পরিহার করে, হিংসাকে প্রশ্রয় দেয় না। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ প্রয়োজন হলে হিংসারও আশ্রয় নেয়, অসত্যের সুযোগ নেয়। তবে তেমন কোনো প্রয়োজন না হলে নেয় না। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ যে মনে প্রাণে অসত্যচারী বা হাড়ে হাড়ে হিংসাপরায়ণ এ ধারণা ভুল। তারও প্রস্থাপনা মানবিকবাদের উপরে। তারও অন্বিষ্ট মানবহিত। অধিকাংশ মানুষকে শোষণের হাত থেকে উদ্ধার করে এমন এক সমাজের পরিকল্পনা যাতে সকলেরই প্রতি ন্যায়, ভাষান্তরে সোশ্যাল জাস্‌টিস।

দ্বান্দ্বিক আদর্শবাদও মানবিকবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। পরকাল বা পরলোক নিয়ে এর তেমন কোনো মাথাব্যথা নেই, কে কোন্ দেবতাকে হবি দিয়ে তুষ্ট করে তা নিয়ে এর কিছু আসে যায় না। একজন গান্ধীবাদী আস্তিক না হয়ে নাস্তিকও হতে পারেন, অজ্ঞেয়বাদীও হতে পারেন। মহাত্মার শিষ্যদের মধ্যে আস্তিক নাস্তিক অজ্ঞেয়বাদী সবরকম লোক ছিলেন। কিন্তু সকলেই তাঁরা মানবিকবাদী। তাহলে দেখা যাচ্ছে দ্বান্দ্বিক আদর্শবাদ ও দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের মধ্যে আর এক জায়গায় মিল। উভয়েরই প্রস্থাপনা মানবিকবাদের উপরে। ইতিহাসের আধুনিক যুগটাই মানবিকবাদী দর্শন বিজ্ঞান রীতিনীতি অর্থনীতি সমাজনীতির যুগ। গান্ধীজী এর বাইরে ছিলেন না। তবে প্রাচীন যুগের সঙ্গেও তাঁর নাড়ীর যোগ ছিল। সেখান থেকেও তিনি বল সংগ্রহ করতেন। সেখানে তিনি এমন কিছু পেয়েছিলেন যা শুধু প্রাচীন নয়, যা সনাতন, নিত্য নূতন। তা বলে তিনি কারো চেয়ে কম আধুনিক বা কম মানবিকবাদী ছিলেন না। তাঁর চিন্তাধারাও ছিল বৈজ্ঞানিক। কথায় কথায় পদে পদে পরীক্ষা করাই ছিল তাঁর পদ্ধতি। তার সঙ্গে বিরোধ ছিল না অহিংসার। বিরোধ ছিল না সত্যের। বরঞ্চ সেই ছিল সত্যের পরীক্ষা।

দ্বান্দ্বিক আদর্শবাদও অধিকাংশ মানুষকে মুক্তি দিয়ে সব মানুষের মঙ্গল বিধান করতে চায় ও সেইজন্যে বার বার দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হয়। দ্বন্দ্বে ভীত অথবা শ্রান্ত যারা হয় তারা দ্বান্দ্বিক আদর্শবাদী নয়। গান্ধীবাদী নয়। হতে পারে গান্ধীমার্কা।

আত্মিক আদর্শবাদের সঙ্গে অহিংস পদ্ধতি যোগ দিলে তার নাম হয় সত্যাগ্রহ। সত্যাগ্রহ একজন ব্যক্তিরও হতে পারে। লক্ষ লক্ষ ব্যক্তিরও হতে পারে। সংখ্যার চেয়ে সত্যের দাম বেশী। ব্যক্তিসত্যাগ্রহও তার সত্যের জোরে জয়ী হতে পারে। প্রতিপক্ষের চিত্তপরিবর্তন ঘটাতে পারে। সমাজের বা রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন করতে পারে। তবে বিপ্লব যদি লক্ষ্য হয় সংখ্যার মূল্য অপরিসীম।

কোটি কোটি মানুষের জনতা দ্বন্দ্বে নামতে পারে, কিন্তু তার কাছে আদর্শবাদ আশা করা যায় না। অহিংসা আশা করাও উচ্চাশা। গণসত্যাগ্রহ কথাটা শুনতে যেমন জাঁকালো আসলে তেমনি ফাঁকা। জনতাকে জাগিয়ে তুললে জনতা আদর্শের বা সত্যের অনুরোধ শোনে না, হিংসার আকর্ষণে ভুলে যায়। তখন সত্যাগ্রহ হয় হত্যাগ্রহ।

তাহলে কি সংঘবদ্ধ সত্যাগ্রহের আহ্বান ভুল? না, তেমন কোনো কথা নেই। সত্যাগ্রহে সকলের অধিকার আছে। কেবল দু'চারজন উত্তম সাধকের নয়। নূতন কোনো অধিকারীভেদ প্রবর্তন করা গান্ধীজীর উদ্দেশ্য ছিল না। যেখানে সকলেই সমান অধিকারী সেখানে সবাইকেই ডাক দিতে হয়। মানুষের শুভবুদ্ধির উপর ভরসা রাখতে হয়।

সত্যাগ্রহের যে ইতিহাস আমরা পড়েছি তার দক্ষিণ আফ্রিকার অংশটিতে সমষ্টির যোগদান মোটের উপর সুশৃঙ্খল ও সংযত। কারণ সংখ্যা আয়ত্তের বাইরে চলে যায়নি। গান্ধীজী ও তাঁর সহকর্মীরা তাঁদের নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখেছেন। কয়েক হাজার না হয়ে কয়েক লাখ হলে কি হত তা বলা যায় না। হয়ত হিংসা এসে পড়ত।

যাদের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ তাদের সংখ্যা বেশী, যাদের দ্বারা সত্যাগ্রহ তাদের সংখ্যা কম। দক্ষিণ আফ্রিকায় তাই জনতাকে সামলানো শক্ত হয়নি। এদেশে শাসকদের সংখ্যা কম, শাসিতদের সংখ্যা বেশী। একবার ভয় ভেঙে গেলে হিংসার প্ররোচনা দুর্বার। জনতাকে অহিংস রাখা যাঁদের কাজ তাঁরা হয়ত লাখে একজন। দক্ষিণ আফ্রিকায় ছিলেন হাজারে একজন। ভারতের মাটিতে গণসত্যাগ্রহ রোপণ করতে সেইজন্যে এত বেগ পেতে হয়েছে।

এখনো জোর করে বলা চলে না যে গণসত্যাগ্রহের চারা ভারতের মাটিতে দৃঢ়ভাবে শিকড় গেড়েছে। গান্ধীজীর মতো তেমন নেতাও কি আছেন যিনি মালীর মতো প্রতিদিন লক্ষ্য রেখেছেন ও চর্যা করছেন? জনগণের মন পাবার জন্যে হিংসা যেমন সক্রিয় অহিংসা কি তেমনি সক্রিয়? তাই যদি হত তবে যত্র তত্র যখন তখন জনতা উচ্ছৃঙ্খল হত না, পুলিশ ডাকতে হত না, পুলিশে না কুলোলে মিলিটারি। মহাজীবন

সংগ্রামী আধুনিক

ভবানী মুখোপাধ্যায়

নতুন কোনও মানুষ চোখে পড়লেই যাঁরা রাজনীতি করে থাকেন সেইসব 'পাব্লিক ম্যান'দের প্রথমতম মানসিক প্রতিক্রিয়া বড়ই চমকপ্রদ। যে মতবাদের কেন্দ্রবিন্দুতে তিনি অধিষ্ঠিত, এবং যে বিষয়ে তাঁর নিজস্ব জ্ঞান তেমন সুস্পষ্ট নয়, তারই দক্ষিণে বা বামে নতুন মানুষটিকে তিনি ঠেলে দিতে চেষ্টা করেন, সেইভাবেই চিহ্নিত করেন। কবি বা কলাবিদদের সেই বালাই নেই, তাঁদের ভোট-ভিক্ষা করে ঘুরতে হয় না, যে-ব্যক্তি তাঁর সঙ্গে নেই সে যে তাঁর বিরোধী হবে সাধারণতঃ এমন কোনো আশংকাও নেই। কিন্তু 'পাব্লিক ম্যানে'র চোখে যেমন প্রতিটি নতুন মানুষ হয় ডাইনে নয় বামে, সমালোচক ও কবি স্টীফেন স্পেণ্ডারের বিচারে প্রতিটি লেখকই হয় 'আধুনিক' নয় 'সমকালীন' এই লেবেলে চিহ্নিত। অন্ততঃ তাঁর গ্রন্থ "The Struggle of the Modern"-এর এই হল প্রতিপাদ্য তার সকল যুক্তির এই হল অস্থি ও মজ্জা।

যাঁরা আধুনিক (বা স্পেণ্ডারের ভাষায় Recognisers) তাঁরা ভাবেন আমাদের কাল অতীত থেকে একেবারে মুক্ত, বিচ্যুত, যার ফলে শুধুমাত্র এক নতুন ধরণের সাহিত্যই এই যুগকে প্রভাবিত করতে পারে। যারা 'কনটেমপরারী' বা 'নন-রেকগনাইসার্স' তাঁরা কিন্তু তা মনে করেন না এবং আধুনিকত্বকে ততটা নতুন ভাবতে পারেন না। যাঁরা আধুনিক বা মডার্ন তাঁরা বিজ্ঞান বা প্রগতিমূলক মূল্যবোধকে আমল দেন না, কিন্তু যাঁরা সমকালীন তাঁরা তা গ্রহণ করেন। বার্নাড শ' বা এইচ জি ওয়েলসের মত যাঁরা 'কনটেমপরারী' তাঁদের ক্ষেত্রে ভলটেয়রীয় 'উত্তমপুরুষ' ঘটনার ভিত্তিতে কাজ করেন আর র‍্যাবো, জয়েস, এলিঅট প্রভৃতি যাঁরা 'মডার্নস' তাঁরা ঘটনার ভিত্তিতে চালিত হয়ে কাজ করেন। যাঁরা 'মডার্ন' তাঁরা আধুনিক জীবনকে সামগ্রিক দৃষ্টিতে বিচার করে তাতে সামগ্রিকভাবেই বাতিল করতে চান। যাঁরা 'কনটেমপরারী' তাঁরা দেখেন আংশিক দৃষ্টিতে এবং সেই কারণেই—

"They are partisans in the sense of seeing and supporting partial attitudes".

এই যুক্তি কিন্তু আগাগোড়াই শিথিল। যে সামগ্রিকতার স্বপ্ন শ্রীযুক্ত স্টীফেন স্পেণ্ডারের দৃষ্টিতে আধুনিকতার শ্রেষ্ঠতম মার্কা হিসাবে মনে হয়েছে

আসলে আধুনিক জগতের সঙ্গে তার সংযোগ অতি অল্প, বিশেষতঃ যে যুগ এবং কালের মানুষ সর্বদাই নতুন নতুন ঘটনা-প্রবাহের চাপে সশঙ্কিত। তথাকথিত আধুনিককে যা উৎপীড়িত করছে তা আধুনিক জীবন নয়, তা হল বাস্তব জীবন। যাঁরা নায়ক তারা বিবমিষায় ভারাক্রান্ত পৃথিবীর পরিবর্তন ঘটেছে বলে নয়, তাঁদের যন্ত্রণার কারণ পৃথিবীর নিবিড়ঘন রূপ, এবং কোনো কিছুর দ্বারাই তার অর্থভেদ সম্ভব নয়। কামুর যাঁরা নায়ক তাঁরা হতাশায় জর্জরিত, অতীত এবং বর্তমানের ব্যবধানের জন্য নয়। তাঁদের যন্ত্রণার কারণ প্রকৃত কোনো ব্যবধান হওয়া সম্ভব নয়, সবকিছুই 'এবসার্ড' হয়ে গেছে যা চিরদিনই হয়ে আসছে। একটা নতুন জগৎ, যার সঙ্গে অতীতের একফোঁটা মিল নেই সেই জগতে জন্ম নিয়েছে বলে ফ্রানৎস কাফ্কার হিরোবিরোধীরা যে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে তা নয়, তাদের বিভ্রান্তির কারণ জীবনের জটিল রহস্যজাল, যা ভেদ করা তাদের সাধ্যাতীত।

মানুষ নিঃসঙ্গ অভিযাত্রী। মানুষ নির্বাসিতের মত নিরালা। মানুষ সহিষ্ণু। মানুষ তার নিজের কাছেই এক অচেনা ব্যক্তিত্ব। মানুষ বন্ধ্যা-শ্রমের চরমদণ্ডে দণ্ডিত। মানুষ প্রেমবিরহিত। মানুষকে কেউ বোঝে না। এইসব বাক্-প্রতিমা মানুষের মতই প্রাচীন। বিজ্ঞানের যুগে তাদের করণীয় কিছু নেই, তারা বেকার। তারা মানুষের মনের অবস্থা নিয়েই ব্যস্ত। প্রুফ্রক বিজ্ঞানের দ্বারা বিরক্ত নয়, বিরক্ত সে নিজের ওপর। তার এই আত্ম-করুণা প্রায় আত্ম-হননের মত। আমার মনে হয় মহাত্মা কবীর এলিঅটের উত্তরকালের কবিতার মর্ম উপলব্ধি করতেন এবং এলিঅটি ভঙ্গীতে জীবনের ফলশ্রুতি যে শুধু জন্ম-প্রজনন ও মৃত্যুর অলাতচক্র তা স্বীকার করতেন। মহাত্মা কবীরও এই ধরণেরই একটা উক্তি করেছিলেন। এমন কি সেক্সপীয়রও আধুনিকদের মধ্যে হতাশা ও বিভ্রান্তির একটা নতুন সুরের সন্ধান পেতেন। কারণ আলবেয়র কামু নয় উইলিয়াম সেক্সপীয়রই বলেছিলেন—

"Life is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing".

এই কথাগুলি শ্রীযুক্ত স্টীফেন স্পেণ্ডারের মনে পড়লে অতীত ও বর্তমানের মধ্যে এমন একটি তীক্ষ্ণ রেখা তিনি নাও টানতে পারতেন, বা যা তাঁর মতে সামগ্রিক মনন বা একপেশে মনোভঙ্গী।

আসল সীমারেখা হল আশা ও নিরাশার মাঝখানে। তবে, মাঝে মাঝে লেখক হতাশার ব্যূহ-ভেদ করে বেরিয়ে আসেন হয় এলিঅটের মত ধর্মীয়

বিশ্বাসে নয় শাস্ত্রের মত সামাজিক কর্মকাণ্ডে। এইসব ক্ষেত্রে সীমারেখা টানতে হয় দুই জাতের বিশ্বাসে—একটি হল অন্তর্নিহিত পরিবর্তন যা মানুষকে ত্রাণ করতে পারে, আর অপরটি হল সামাজিক পরিবর্তন যা আবার একটা মানুষকে গড়তে পারে।

শ্রীযুক্ত স্পেণ্ডার যে আঙ্গিকের কথা উল্লেখ করেছেন সেই 'experience of modern life' সম্পর্কে কোনো কিছু বলা অবান্তর এবং অবাস্তব। জেমস জয়েসের "টোট্যাল অবজেকটিভিটি" বিষয়ে যা তিনি বলতে চান আসলে তা "টোট্যাল সাবজেকটিভিটি"। ব্লুম একটি দিনে মানুষ সারাজীবন ধরে যা করে উঠতে পারে তা হয়ত করেছে। কিন্তু এই দিনটি ত ব্লুমের নিজস্ব। আচার্য বিনোবা ভাবের জীবনের একটি দিন আবার সম্পূর্ণ বিভিন্নতর হবে। এই সামগ্রিক অবকেজটিভিট সম্পর্কে কিছু বলা প্রকৃতপক্ষে অনাধুনিক কারণ, আধুনিকদের প্রকৃত অভিযোগ হল এই যে কোনো মানুষই 'অবজেকটিভ' হতে পারে না, কেউ তার নিজের দেহ-কারার বন্দীদশা থেকে মুক্তি পেতে পারে না, নিজের দেহের খোলসটা জামার মত খুলে ফেলে ঝাঁপ দিয়ে বাইরে চলে আসতে পারে না।

এই দৃষ্টিভঙ্গী অবশ্য এক চরম অবস্থা, অপরের সঙ্গে কোনো সংযোগ না রাখা, কিংবা অভিজ্ঞতা বিনিময় না করার অর্থ সকল প্রকার রচনাকে বন্ধ্যা বলে অভিহিত করা। স্যামুয়েল বেকেটের মত মানুষ অবশ্য বলবেন যে এত-দ্বারা মানুষ যা কিছু করে থাকে তাতে তার অকিঞ্চিৎকরত্ব প্রমাণিত হয়। কিছুই বলার নেই জেনেও তাঁর পক্ষে চুপচাপ থাকা কঠিন। কিন্তু এই এইজাতীয় সর্বগ্রাসী হতাশায় শ্রীযুক্ত স্পেণ্ডারের প্রয়োজন নেই। আধুনিকদের সম্পর্কে এত আগ্রহান্বিত হওয়া সত্বেও যে সামগ্রিক স্বপ্নের বশে মানুষের দুর্দশারও শেষ দেখা যায় সেদিকে তাঁর লক্ষ্য নেই। যা মানুষকে কিছু স্বস্তি দিতে পারে, তা তার জ্বালা বৃদ্ধি করে, তাই তার পক্ষে আঁস্তাকুড়ে চুপচাপ বসে অপেক্ষা করা কিংবা অস্ট্রীচের মত বালুকাস্তূপে দেহ ডুবিয়ে রাখা ছাড়া আর উপায় কি!

শ্রীযুক্ত স্পেণ্ডার হতাশায় ভেঙে পড়ার মানুষ নন, যারা নতুনতম নন্দন-তাত্ত্বিক স্বপ্নে বিশ্বাসী তিনি সান্ত্বনার জন্য তাদের দিকে তাকান। 'কনটেম-পররীজ'দের প্রতি করুণাবশতঃ তিনি শেষ পর্যন্ত স্বীকার করেন পৃথিবীর জড়জীবনের প্রয়োজন বিজ্ঞান মেটাতে পারে। কিন্তু তাদের দল ত্যাগ করে তিনি যে জায়গাটায় আধুনিকদের সঙ্গে ভিড়ে পড়ছেন সেখানে তিনি আঙুল দেখাচ্ছেন—

"To the great spiritual danger of judging individual lives as units in the progressive society, that is, as social units which ought to be statically happier and to live statistically better lives because statistncally they are better fed."

স্পেণ্ডার তাই চীৎকার করে বলছেন—মিছিমিছি এলিঅটকে দোষ দাও কেন? সে ত' আর বুভুক্ষুর মুখের রুটি কেড়ে নেয়নি। তিনি শুধু সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন—"to the spiritual crisis which results from beneficial materialism."

এই আধ্যাত্মিক সংকট সম্পর্কে যুক্তি প্রদর্শন করতে গিয়েই, কল্যাণমূলক জড়বাদ বলে বোঝাতে গিয়ে শ্রীযুক্ত স্পেণ্ডারের চিন্তাজাল ছিন্ন হয়ে পড়েছে। তিনি বলতে চান যে—

"The real benefits accomplished by the welfare state have produced an unprecedented spiritual malaise."

ধরুন তীব্র দাঁতের যন্ত্রণা একজন মহানুভব ব্যক্তিকে যে বস্তিতে তিনি বাস করেন সেই বস্তিবাসীদের দুর্দশার কথা ভুলিয়ে দিতে পারে। কিন্তু দাঁতের ব্যথা সেরে যাওয়ার পর একথা বলা কি ঠিক হবে যে দাতব্য দন্তচিকিৎসাই তাকে দারিদ্র্য সম্পর্কে অধিকতর সচেতন করে তুলেছে? কল্যাণধর্মীয় আবর্ত সৃষ্টি করেনি, সেই অবস্থা বরাবরই ছিল। শুধু যা ছিল ভিতরে কল্যাণরাষ্ট্র তাকে চোখের উপরে নিয়ে এসেছে। কল্যাণরাষ্ট্রের পর নয়, আগেই এলিঅট লিখেছিলেন—"we are the hollow ones!" তবে খুব কমসংখ্যক মানুষই আগে একথা জানত, পরে অনেকেই জেনেছে।

সবচেয়ে মজা এই যে শ্রীযুক্ত স্পেণ্ডারও স্বয়ং তেমন বিশ্বাস করেন না যে 'আর্ট' সর্বদা অবজেকটিভ সত্যই বলে থাকে, তাই এক জায়গায় বলছেন—

"Art expresses the truth that despite all our systems of knowledge and analysis to grasp, to get the feeling of our world! We are driven to ourselves, our own feelings".

আমাদের অনুভূতি, নিজস্ব অনুভূতি। আমরা সকলেই জানি অখণ্ড আশা বা সামগ্রিক নিরাশার যমতুল নয়। আমরা তাই ঘরেরও নয়, পরেরও আমাদের স্থান সেই মাঝখানে, আশা ও নিরাশার মাঝের দেশ।

হরপ্রসাদ মিত্র

সাহিত্যতত্ত্ব
ও
রবীন্দ্রনাথের কৈশোর-চিন্তা

(পূর্বানুস্মৃতি)

রবীন্দ্রনাথের আদিপর্বের সেই বিশেষ রচনাটির একযোগে শ্রোতা এবং সমালোচক দুইই ছিলেন শ্রুতকীর্তি নবগোপাল মিত্র। বালক রবীন্দ্রনাথ তাঁর সে রচনায় ভ্রমর বোঝাতে 'দ্বিরেফ' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। নবগোপাল তাতে আপত্তি করেন। নবগোপালের সেই মৃদু আপত্তিতেই স্পর্শকাতর লেখকের মন ক্ষুব্ধ হয়। এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের নিজের উক্তিই তুলে দেওয়া যাক্—

> নবগোপালবাবু একটু হাসিয়া বলিলেন, 'বেশ হইয়াছে, কিন্তু ওই 'দ্বিরেফ' শব্দটার মানে কী?'
>
> 'দ্বিরেফ' এবং 'ভ্রমর' দুটোই তিন অক্ষরের কথা। ভ্রমর শব্দটা ব্যবহার করিলে ছন্দের কোনো অনিষ্ট হইত না। এই দুরূহ কথাটা কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলাম মনে নাই। সমস্ত কবিতাটির মধ্যে ওই শব্দটার উপরেই আমার আশাভরসা সবচেয়ে বেশি ছিল। দফ্‌তরখানার আমলামহলে নিশ্চয়ই এই কথাটাতে বিশেষ ফল

পাইয়াছিলাম। কিন্তু নবগোপালবাবুকে ইহাতেও লেশমাত্র দুর্বল করিতে পারিল না। এমন কি, তিনি হাসিয়া উঠিলেন। আমার দৃঢ়বিশ্বাস হইল, নবগোপালবাবু সমঝদার লোক নহেন।'

কবি-জীবনের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের সৃষ্টি এবং সমালোচনা, উভয় বিভাগেই তাঁর অনুভূতি, আলাপ-আলোচনা ইত্যাদি চলতে থাকে। স্বর্ণকুমারী দেবীর সম্পাদিত 'ভারতী' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের কৈশোর ও নবযৌবনকালের সাহিত্যচিন্তাপ্রধান অনেকগুলি লেখা ছাপা হয়। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর প্রথম প্রবন্ধ পুস্তক 'বিবিধ প্রসঙ্গ' প্রকাশিত হয় (ভাদ্র, ১৮০৫ শক)। মাত্র একটি ছাড়া ('সমাপন') এই 'বিবিধ প্রসঙ্গের' সব লেখাগুলিই প্রথম আত্মপ্রকাশ করে ১২৮৮-৮৯ সালের 'ভারতী' পত্রিকায়। এইখানিই রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-প্রাসঙ্গিক প্রথম বই। এর পরে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে (১৫ই এপ্রিল) বেরোয় সাহিত্যচিন্তা-সম্পর্কিত দ্বিতীয় বই 'আলোচনা'। তৃতীয় বই 'সমালোচনা' প্রকাশিত হয় ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে (১২৯৪ বঙ্গাব্দ)। এই সাহিত্য-প্রাসঙ্গিক বা সাহিত্যতত্ত্ব সম্পর্কিত গ্রন্থপর্যায়ের মধ্যেই চতুর্থ যে বইখানির উল্লেখ প্রাসঙ্গিক, সেই 'পঞ্চভূত' প্রকাশিত হয় ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের (১৩০৪ বঙ্গাব্দ) মে মাসে। 'পঞ্চভূতের' কয়েকটি প্রবন্ধের সঙ্গে সাহিত্য-সম্পর্কিত আরো কয়েকটি প্রবন্ধ অন্যান্য রচনার সঙ্গে যুক্ত হয়ে ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে (বৈশাখ, ১৩১৪) বেরোয় 'বিচিত্র প্রবন্ধ'। এটিকেই এ পর্যায়ের পঞ্চম বই বলতে হয়। সেই বছরেই তাঁর সাহিত্য-আলোচনা সম্পর্কিত ষষ্ঠ গ্রন্থ 'প্রাচীন সাহিত্য' (১৩ জুলাই, ১৩০৭) প্রকাশিত হয়। সপ্তম, অষ্টম ও নবম গ্রন্থ—যথাক্রমে 'লোক-সাহিত্য' (২৬, জুলাই), 'আধুনিক সাহিত্য' (১০, অক্টোবর), এবং 'সাহিত্য' (১১, অক্টোবর) প্রকাশিত হয় সেই ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দেই। দশম ও একাদশ গ্রন্থ—যথাক্রমে 'হাস্যকৌতুক' (১০, ডিসেম্বর) এবং 'ব্যঙ্গকৌতুক' (২৮, ডিসেম্বর) সেই ১৯০৭-এরই ফসল। এগুলি সবই প্রবন্ধ নয়,—'হাস্য-কৌতুক' কতকগুলি কৌতুক-নাটিকার সংগ্রহ,—'ব্যঙ্গকৌতুক' প্রবন্ধ এবং নাট্যরচনা উভয় শ্রেণীরই সমাবেশ-চিহ্নিত।

প্রকাশিত বইগুলির কথা ধ'রলে বলতে হয়, ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দটি তাঁর রচনা-ধারার এক স্মরণীয় বছর। সেই ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দেই সাহিত্যের বিভিন্নতা ও সাহিত্যতত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর অনেকগুলি রচনা প্রথম গ্রন্থভুক্ত হয়। এইসব বই পৃথক পৃথক বটে, কিন্তু এগুলির রচনাকাল একই পর্বে বিস্তৃত—মোটামুটি

১২৮৮-৮৯ থেকে ১৩১৪-১৫ বঙ্গাব্দের মধ্যে। অর্থাৎ এই প্রায় পঁচিশ বছরের মধ্যেই সাধারণভাবে সাহিত্যের স্বরূপ বিচার এবং বিশেষভাবে শ্রেণীনির্ণয়,—পৃথক পৃথক লেখকের প্রসঙ্গ,—বিশেষ বিশেষ রচনার পর্যালোচনা,—কোনো কোনো সাহিত্যরূপের বিশ্লেষণ ইত্যাদি ব্যাপারে তাঁর মনোনিবেশ লক্ষ্য করা যায়।

আবার একই কালে বাংলা ভাষার বিভিন্ন প্রসঙ্গ, যেমন—বাংলা উচ্চারণ-বিধি, বাংলার ধ্বন্যাত্মক শব্দ, শব্দদ্বৈত, বীম্‌সের বাংলা ব্যাকরণ সম্পর্কিত আলোচনা ইত্যাদিও তাঁর কতকগুলি রচনার বিষয় হয়েছে। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে (২, ফেব্রুয়ারী) প্রকাশিত 'শব্দতত্ত্ব' বইখানিতে এ লেখাগুলি প্রকাশিত হয়। তাঁর 'ছিন্নপত্র' প্রকাশিত হয় ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে (২৮, জুলাই)। প্রধানতঃ শ্রীশচন্দ্র মজুমদার ও ইন্দিরাদেবীকে লেখা এই চিঠিগুলির রচনাকালও কিন্তু ঐ পঁচিশ বছরের মধ্যেই অবস্থিত। 'ছিন্নপত্রের' এই প্রথম সংস্করণের প্রথম পত্রের তারিখ ৩০শে অক্টোবর ১৮৮৫,—শেষ পত্রের ১৬ ডিসেম্বর ১৮৯৫। এই চিঠিগুলিরও স্থলে স্থলে সাহিত্য-প্রসঙ্গ দেখা দিয়েছে। অতএব সাহিত্যতত্ত্ব বা সাহিত্যের স্বরূপ সম্বন্ধে তাঁর চিন্তার ক্রমগতি অনুধাবনের কাজে এইসব পত্রও উল্লেখযোগ্য উপাদান। তেমনি তাঁর এই পর্বের আরো অনেক ঘটনা,—যেমন, কয়েকটি গ্রন্থনাম,—কোনো কোনো কবিতা, জীবনের কয়েকটি ঘটনাও।

এই প্রসঙ্গটি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা দরকার। সাহিত্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের নানা অভিজ্ঞতার ইঙ্গিত আছে এইসব ঘটনায়, গ্রন্থনামে, কবিতায়,—প্রাসঙ্গিক নানা গদ্যে ও নাট্যরচনায়। কাব্যের শ্রেণীবৈচিত্র্য অনুসারে বিভিন্ন রূপাদর্শ সম্বন্ধে এই সময়েই তাঁর মনে পুঙ্খানুপুঙ্খ চিন্তা চলেছে। মনের সব ভাবসূত্র, সব যুক্তি-তর্ক গুছিয়ে প্রবন্ধ রচনার উদ্যম ঘটেনি সর্বক্ষেত্রে, কিন্তু চিন্তার স্রোতের চিহ্ন থেকে গেছে কোনো কোনো ঘটনায়। এইসব ঘটনাও তুচ্ছ নয়। পূর্বগামী কোনো কোনো আলোচক বিভিন্ন সময়ে সে-সবের অল্পাধিক ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন। কোথাও বা পরিণতিমুখী কিশোর কবি-মানসের উপমার দক্ষতা বা বিশিষ্টতা দেখা গেছে। কোথাও আবার সাহিত্যের প্রেরণা বা আদর্শ সম্বন্ধে তিনি বিশেষ বিশেষ অনুভূতির সম্মুখীন হয়েছেন। সৃষ্টির কাজ এবং সমালোচনার কাজ পাশাপাশি একই স্রোতের ঢেউয়ের মতন বিদ্যমান। যেমন তাঁর প্রথম নাটক 'রুদ্রচণ্ডের' (১৮৮১) দ্বিতীয় দৃশ্যে কালভৈরবের ভক্ত রুদ্রচণ্ড যখন অমিয়াকে চাঁদ কবির সঙ্গে

'কবিতা-আলাপ' করতে নিষেধ করেছেন এবং অমিয়া সে নির্দেশ পালনে অসমর্থ জেনে যখন বলেন—

মাতৃস্তন্য কেন তোর হয় নাই বিষ।
অথবা ভূমিষ্ঠ শয্যা চিতাশয্যা তোর।

তখন অমিয়া বলেন—

তাই যদি হত পিতা, বড় ভাল হত ?
কে জানে মনের মধ্যে কি হয়েছে মোর,
বরষার মেঘ যদি হইতাম আমি
বর্ষিয়া সহস্রধারে অশ্রুজলরাশি
বজ্রনাদে করিতাম আকুল বিলাপ !

বর্ষার মেঘ হয়ে সহস্রধারায় অশ্রুবর্ষণ করা এবং দিগ্‌দিগন্ত কম্পিত করে বজ্রনাদে বিলাপ প্রকাশের অভিপ্রায়ে যে, অতিশয়োক্তি ব্যক্ত হয়েছে তাতে বাংলা কবিতার ধারায় নতুন মনের বিশিষ্ট প্রকাশ-সামর্থ্যেরই পরিণতি অনুভব করা যায়। আবার 'কবি-কাহিনীর' বালক কবির কল্পনাশক্তি সম্বন্ধে কাব্যের প্রথম সর্গেই এই পরিচয় পাওয়া যায় যে, উষাকালে বায়ু যখন আপন 'বসন্ত-গান' গেয়ে উঠতো,—

তখনি বালক কবি ছুটিত প্রান্তরে,
দেখিত ধান্যের শিষ দুলিছে পবনে।
দেখিত একাকী বসি গাছের তলায়
স্বর্ণময় জলদের সোপানে সোপানে
উঠেছেন উষাদেবী হাসিয়া হাসিয়া।

আকাশে মেঘের স্তরে স্তরে প্রভাতের সূর্যরশ্মির বিচ্ছুরণ-জনিত স্বর্ণবর্ণ সোপানমালার দৃশ্যের ধারণা এবং একটির পরে একটি সেই সোপানাবলী অতিক্রম করে স্বয়ং উষাদেবী উঠে আসছেন—এই চলচ্চিত্র সম্ভব করে তোলা বিশেষ সৃষ্টিক্ষমতার উদাহরণ। উপমা, রূপক, সমাসোক্তি, অতিশয়োক্তির ক্ষেত্রে,—অর্থাৎ সাধারণভাবে অনুভূতির অলঙ্করণে সেই আমলের রবীন্দ্রনাথের এই দক্ষতার লক্ষণগুলি যেমন ধীরে ধীরে প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি বিশেষ বিশেষ কাব্যরূপের আদর্শ সম্বন্ধেও তখন তাঁর চিন্তা চলছিল; তাঁর নিজের কাব্য, কবিতা, নাটক বা নাট্যধর্মাবলম্বী সে-আমলের প্রায় সব রচনাগুলিতেই এই ব্যাপারের উদাহরণ ছড়িয়ে আছে—যেমন, 'কবি-কাহিনী' (৫ নভেম্বর, ১৮৭৮) তাঁর নিজের বিচারেই 'কাব্য'; 'বন-ফুল' (৯ মার্চ, ১৮৮০)

'কাব্যোপনাস'; 'বাল্মিকী প্রতিভা' (মার্চ, ১৮৮০); 'গীতিনাট্য' এবং 'ভগ্নহৃদয়' (২৩ জুন, ১৮৮১): 'গীতি-কাব্য', 'কাব্য', 'কাব্যোপন্যাস', 'গীতি-নাট্য', 'গীতিকাব্য' ইত্যাদি শ্রেণীবিভাগের বিধিবৈচিত্র্য সম্বন্ধে তিনি যে নিজের মনে মনে পর্যালোচনায় নিযুক্ত ছিলেন, সে চিন্তা অনিবার্য। 'ভগ্নহৃদয়' (১৮৮১) যে একখানি 'গীতিকাব্য' বইখানির নাম-পৃষ্ঠাতেই শিরোনামের নিচে বন্ধনী-চিহ্নে সে তত্ত্ব জানানো হয়েছিল। সেই সঙ্গে ছোটো একটি ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লেখেন—

> 'এই কাব্যটিকে কেহ যেন নাটক মনে না করেন। নাটক ফুলের গাছ। তাহাতে ফুল ফুটে বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে মূল, কাণ্ড, শাখা, পত্র, এমন কি কাঁটাটি পর্যন্ত থাকা চাই। বর্তমান কাব্যটি ফুলের মালা, ইহাতে কেবল ফুলগুলি মাত্র সংগ্রহ করা হইয়াছে। বলা-বাহুল্য, যে, দৃষ্টান্তস্বরূপেই ফুলের উল্লেখ করা হইল।'

আদিপর্বের তিনখানি কবিতার বইয়ের নামকরণেই 'সংগীত' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। যথাক্রমে এগুলি হলো 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' (৫ জুলাই, ১৮৮২), 'প্রভাতসঙ্গীত' (এপ্রিল, ১৮৮৩) এবং 'শৈশব সঙ্গীত' (২৯ মে, ১৮৮৪)। এই গ্রন্থনামের পরিকল্পনায় 'সঙ্গীত' অংশের কোনো বিশেষ বাচকতা তাঁর অভিপ্রেত ছিল কিনা, সে বিষয়ে স্বভাবতঃই কৌতূহল জাগে। রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার লিখেছেন—

> 'সঙ্গীত' অর্থে সাধারণত গানই বুঝায়; কিন্তু আলোচ্য কাব্যগুলির মধ্যে কণ্ঠগেয় গীত নাই। অথচ তাহাদিগকে সঙ্গীত বলা হইয়াছে। ইংরেজিতে যাহাকে লিরিক (Lyric) বলে তাহার অনুবাদ করা হয় গীতিকাব্য; লিরিক শব্দটির মূল হইতেছে গ্রীক; Lyre বা এক শ্রেণীর বীণাযন্ত্র সাহায্যে গ্রীকরা সুর করিয়া ছন্দোময় পদ আবৃত্তি করিত বলিয়া ক্রমে অন্তর্বিষয়ী কবিতামাত্রকে লিরিক নামে অভিহিত করা হয়, সেইজন্যই বোধহয় রবীন্দ্রনাথ লিরিকের অনুবাদ 'সঙ্গীত' দিয়া করিলেন।'[৭]

পূর্বোক্ত তিনখানি গ্রন্থের প্রকাশকাল ১৮৮২-৮৪। 'ভগ্নহৃদয়' এই বইগুলির পূর্ববর্তী, এবং সে বইখানিকে রবীন্দ্রনাথ নিজেই সেকালে 'গীতিকাব্য' বলে চিহ্নিত করে গেছেন। অতএব 'লিরিকের' বঙ্গানুবাদে প্রচলিত

৭। রবীন্দ্রজীবনী, প্রথম খণ্ড। বৈশাখ, ১৩৫৩। পৃষ্ঠা ১৩২ দ্রষ্টব্য।

'গীতিকাব্য' শব্দটিতে তাঁর সকল প্রয়োজনের নিবৃত্তি যে ঘটেনি, প্রভাত-কুমারের এ অনুমান ভিত্তিহীন নয়। 'কাব্য'-ই হোক, 'কাব্যোপন্যাস'-ই হোক—রবীন্দ্রনাথের সে আমলের রচনায়—প্রভাতকুমার যাকে বলেছেন 'কণ্ঠগেয় গীত', সে-উপাদান বারবার দেখা দিয়েছে। 'বনফুল'-এর তৃতীয় সর্গের সেই দীর্ঘ কণ্ঠগেয় গানটিই এর অন্যতম উদাহরণ।

নীরদের গান এটি—

'মোহিনী কল্পনে! আবার আবার—
মোহিনী বীণাটি বাজাও না লো!
স্বর্গ হতে আনি অমৃতের ধার
হৃদয়ে, শ্রবণে, জীবনে ঢালো।

মুদ্রিত মোট ১২৪ ছত্রের এই অংশটুকু 'কণ্ঠগেয়' হবে বলেই গ্রন্থের পাত্র-পাত্রীর অভিপ্রায় সুস্পষ্ট। এই গানটির অব্যবহিত পূর্বাংশে দেখা যায় নীরজা আর কমলা একটি গাছের অন্তরালে দাঁড়িয়েছে নীরদের গান শোনবার জন্যে, আর এই দীর্ঘ সঙ্গীতাংশের পরে—

কহিল কমলা, 'শুনেছিস ভাই
বিষাদে দুখে যে ফাটিছে প্রাণ
কিসের লাগিয়া মরমে মরিয়া
করিছে অমন খেদের গান:

লিরিকের বঙ্গানুবাদ সম্বন্ধে অথবা নিজের প্রকাশকলা সম্বন্ধে তাঁর মনে তখন এইরকম তর্কবিতর্ক, পথ-সন্ধান, আদর্শ-জিজ্ঞাসা ইত্যাদি চলছিল বটে, তবে সাহিত্যের স্বরূপ-সন্ধানে সেই পর্বের রবীন্দ্রনাথের এসব চিন্তা স্পষ্টোচ্চারিত নয়। স্পষ্ট কেবল এই মাত্র, যে, প্রাণ-সমুদ্রের বিপুলতাবোধ তখন এই কিশোর কবিমনে যোগ্য শিল্প-বাহনের চাহিদা জানিয়েছে। 'ভগ্নহৃদয়'-এর গানগুলি স্মরণীয়—এবং এই সূত্রেই ঐ কাব্যের প্রথম সর্গের এই কাব্যাংশটুকু উল্লেখযোগ্য—

প্রাণের সমুদ্র এক আছে যেন এ দেহ মাঝারে,
মহা উচ্ছ্বাসের সিন্ধু রুদ্ধ এই ক্ষুদ্র কারাগারে
মনের এ রুদ্ধস্রোত দেহখানা করি বিদারিত
সমস্ত জগৎ যেন চাহে সখি করিতে প্লাবিত।
অনন্ত আকাশ যদি হত এ মনের ক্রীড়াস্থল
অগণ্য তারকারাশি হত তার খেলনা কেবল,

চৌদিকে দিগন্ত আসি রুধিত না অনন্ত আকাশ
প্রকৃতি জননী নিজে পড়াত কালের ইতিহাস……

এ কিন্তু কবিমনের আনন্দ-সংবাদ নয়। অনেকেই রবীন্দ্রনাথের কৈশোরক পর্বের বেদনা-ভাবের প্রাধান্য লক্ষ্য করেছেন। এও সেই বেদনা। এর সঙ্গে 'বিবিধ প্রসঙ্গের' 'আত্ম-সংসর্গ' (প্রথম ১২৮৮ সালের ফাল্গুনের 'ভারতী'তে প্রকাশিত) নিবন্ধটি মিলিয়ে দেখলেই এ-বেদনার স্বরূপ স্পষ্ট হবে। তাতে তিনি লেখেন—

> 'আমাদের অন্তর ও বাহির, আমাদের মন ও জগৎ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পদার্থ হইলেও জগতের উপর আমাদের মনের সুখ এতটা নির্ভর করে যে, জগৎ বেঁকিয়া দাঁড়াইলেই আমাদের মন কাঁদিয়া উঠে। সে নিজের কাছে কোন মতেই থাকিতে চায় না। সে একটি অভাব মাত্র। সে এই বিশাল জগৎসংসারের মহা-ক্ষেত্রে প্রতি শব্দ, প্রতি দৃশ্য, প্রতি গন্ধ, প্রতি স্বাদকে শিকার করিয়া বেড়াইতেছে, যতক্ষণ পর্যন্ত শিকার করে ততক্ষণ থাকে ভাল, অবশেষে যখন রিক্তহস্তে শ্রান্ত দেহে গৃহে ফিরিয়া আসে তখনি তাহার দুঃখ।'

এই দুঃখই 'ভগ্নহৃদয়'-পর্বের রবীন্দ্রনাথের দুঃখবোধ। তখন এই বেদনাই তাঁর নানা রচনায় সুদীর্ঘ একটি মাত্র বিলাপগীতি হিসেবে অনুভব করা চলে। আত্ম-সংসর্গ বড়োই দুঃখময়, তাই—'জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া আকুল পাগলপারা'—'প্রভাত সংগীত'-এর 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের' এই ছত্রের সাহায্যে তাঁর মনের তদানীন্তন গতিপ্রকৃতি অনুভব করে দেখা কষ্টকল্পনা নয়। তখন মানবচিত্তের ক্ষুধাসর্বস্বতাই অতি প্রকট—

> 'আমাদের মন গোটাকতক ক্ষুধার সমষ্টি মাত্র। জ্ঞানের ক্ষুধা, আসঙ্গের ক্ষুধা, সৌন্দর্যের ক্ষুধা। আমাদের দিকে অনন্ত জ্ঞানের পিপাসা, আর জগতের দিকে অনন্ত-রহস্য। আমরা প্রাণের সহচর চাই, কিন্তু 'লাখে না মিলল এক'। আমরা সৌন্দর্য উপভোগ করিতে চাই, অথচ সৌন্দর্যকে দুই হাতে স্পর্শ করিলেই সে মলিন হইয়া যায়।'………

সাহিত্য-সমালোচনার ক্ষেত্রে তাঁর কৈশোরক প্রয়াসের বোধহয় সর্বাধিক স্মরণীয় ঘটনা হোলো তাঁর মেঘনাদবধ কাব্যের আলোচনাটি। তিনি যে খুবই অল্প বয়সে মেঘনাদবধ কাব্য পড়েছিলেন, সে-কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।

১২৮৪ সালের শ্রাবণ মাসে 'ভারতী' মাসিক পত্রিকা প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। সেই প্রথম সংখ্যাতেই মেঘনাদবধকাব্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের প্রসিদ্ধ রূঢ় সমালোচনা ছাপা হয়। প্রবন্ধটি প্রণিধানযোগ্য। অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে লিখেছেন—

> 'কিশোর লেখক মেঘনাদবধকাব্যের উপর তাঁহার পরিণত বিচার-বুদ্ধির দ্বারা অস্বীকৃত, ঝাঁঝালো যৌবনসুলভ দুঃসাহসে স্ফীত অভিমত প্রকাশ করেন। বর্তমান কালে আমরা এই অভিমতের মধ্যে মূলতত্ত্বের যথেষ্ট যাথার্থ্য আবিষ্কার করিয়া বিস্মিত হই। তরুণ লেখকের ত্রুটি তাঁহার মতের ভ্রান্তিতে নয়, তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্ত প্রয়োগের হঠকারিতায়। মহাকাব্যের দোষগুলি তিনি ঠিকই ধরিয়াছিলেন, মধুসূদন সেই দোষের যথার্থ দৃষ্টান্ত আছে কিনা এই বিষয়েই তাঁহার বিচার-বিভ্রান্তি ঘটিয়াছিল। ভাবিতে আশ্চর্য লাগে যে এই সদ্যোউদ্গতশৃঙ্গ মৃগশিশু অরণ্যের সর্বাপেক্ষা মজবুত বৃক্ষকাণ্ডের উপরেই তাহার অচিরলব্ধ অস্ত্রের ধার পরীক্ষা করিয়াছে। এই বালখিল্য-সমালোচকের আর যাহারই অভাব থাকুক, নিজ মতবাদে দৃঢ় প্রত্যয়ের অভাব নাই।'[৮]

'ভারতী'র প্রথম সংখ্যার এই প্রবন্ধের পরে মহাকাব্য সম্বন্ধে তাঁর চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায় আরো কয়েকটি রচনায়। পাঁচ বছর পরে, ১২৮৯ সালের ভাদ্র সংখ্যায় 'মেঘনাদবধ কাব্য' নামে তাঁর দ্বিতীয় প্রবন্ধ বেরোয়। তাঁর একবছর আগে ১২৮৮ সালের শ্রাবণ সংখ্যায় 'কাব্যের অবস্থা পরিবর্তন' নামে আর একটি প্রবন্ধে তিনি মহাকাব্য প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন। তাতে য়ুরোপে প্রাচীন মহাকাব্যের যে যুগান্ত ঘটে গেছে এবং আধুনিক কালে যে সে-দেশে 'কবিতার রাজ্য অত্যন্ত বিস্তৃত হইয়া উঠিয়াছে,—বৃহত্তম অনুভাব হইতে অতি সূক্ষ্মতম অনুভাব, জটিলতম অনুভাব হইতে অতি বিশদতম অনুভাব সকল কবিতার মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে'—এই উপলব্ধি তিনি প্রকাশ করেন।[৯] মধুসূদনের কোনো উল্লেখও তাতে নেই।

সেই ১২৮৮ সালের আশ্বিন সংখ্যার 'ভারতী'তে 'ডি প্রোফণ্ডিস' আলোচনাটি পাওয়া যায়। এটিকে কোনো শিল্পবিধি অনুসারেই 'মহাকাব্য'

৮। 'রবীন্দ্র সৃষ্টি-সমীক্ষা' (১৩৭২), প্রথম পর্ব, পৃষ্ঠা ২২২ দ্রষ্টব্য।
৯। রবীন্দ্র-রচনাবলী (অচলিত, ২য় খণ্ড,) পৃষ্ঠা ১০৫-১১০ দ্রষ্টব্য।

বলা চলে না। রবীন্দ্রনাথও তা বলেন নি। টেনিসন তাঁর সন্তানের জন্মদিন উপলক্ষে এটি রচনা করেন—এতে একদিকে নিজের সন্তানের প্রতি পিতার অপত্যস্নেহ, অন্যদিকে অসীম বিশ্বসত্যেরই প্রতিভূ এক মানবসত্তার প্রতি বন্দনাই ব্যক্ত হয়। কিশোর রবীন্দ্রনাথের 'নিজ মতবাদে' দৃঢ় প্রত্যয় সম্বন্ধে শ্রীকুমারবাবু যা উল্লেখ করেছেন, 'টেনিসনের এই কবিতার ভাবমহিমার স্বীকৃতিতে তাঁর সেই দৃঢ় প্রত্যয়েরই নজীর পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়, বাংলায় সাহিত্য-সমালোচনার একটি বিশেষ আদর্শের প্রতি তাঁর বিশেষ রুচিরও পরিচয় এই লেখাটিতে বিদ্যমান। এখানে সেই রুচির প্রসঙ্গই উপস্থাপিত হওয়া দরকার।

ইংলণ্ডে 'পঞ্চ' পত্রিকায় টেনিসনের এই কবিতাটি বিদ্রূপের বিষয় হয়েছিল। সে-কথা স্মরণ করে রবীন্দ্রনাথ লেখেন—

> 'টেনিসনের De Profundis কবিতাটি যে সমাদৃত হয় নাই, তাহার একটা কারণ, বিষয়টি অত্যন্ত গভীর, গুরুতর। আর একটা কারণ, ইহাতে এমন কতকগুলি ভাব আছে, যাহা সাধারণতঃ ইংরাজেরা বুঝিতে পারেন না, আমরাই সে সকল ভাব যথার্থ বুঝিবার উপযুক্ত। ইংরাজীবাগীশ শিক্ষিত বাঙ্গালীদের অনেকে ইংরাজী কাব্য শিল্পীভাবে সমালোচনা করিতে ভয় পান। তাঁহারা বলেন, যদি ইংরাজ সমালোচকদের উক্তির সহিত দৈবাৎ অমিল হইয়া যায়।'

নিজের প্রত্যয়ে প্রতিষ্ঠিত সেই আদিপর্বের রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই মন্তব্যের পরে লেখেন—

> 'না হয়, তাহা হইল। ইংরাজ সমালোচকের কথা ইংরাজী হিসাবে যেরূপ সত্য, আমাদের দেশীয় সমালোচকের কথা আমাদের দেশী হিসাবে তেমনি সত্য। উভয়েই বিভিন্ন অথচ উভয়েই সত্য হইতে পারে।'

সাহিত্যের বিষয়, প্রেরণা, আদর্শ এবং রূপ-রীতির বিচিত্রতা ইত্যাদি বিষয়েও যেমন, সমালোচনার আদর্শগত বিভিন্নতা সম্বন্ধেও তেমনি তিনি এই সব রচনায় তাঁর মতামত জানিয়ে গেছেন। 'রস' কথাটিরও উল্লেখ পাওয়া যায় একাধিক ক্ষেত্রে,—যেমন 'ছিন্নপত্রের' কথা স্মরণীয়। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের কয়েকটি ক্ষুদ্রায়তন বিচ্ছিন্ন গদ্য-রচনায় রসবোধ সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য দেখা যায়। ১লা অক্টোবর তিনি লেখেন—

'রস যে বোঝে না তাকে বোঝানো যায় না, কারণ, রসবোধ ইন্দ্রিয়বোধের মতো প্রত্যক্ষবোধ। এমন কি ভালোমন্দ বিচারের সময় রসজ্ঞ ব্যক্তিদের মধ্যেই মতভেদ হয়। এইজন্যে সমালোচনার কাজটাকে ঝক্‌মারি মনে হয় এবং রচনার কাজটাও প্রায় তথৈবচ।'

সাধারণ লোকের পক্ষে যা সম্ভব নয়, যথার্থ 'সমঝদারের' পক্ষে তা সম্ভব,—এই কথাটিও তিনি এই রচনাতেই উল্লেখ করেন—

'সমঝদার লোকের লক্ষণ এই যে, তার বোধশক্তি যেমন সূক্ষ্ম সমবেদনাশক্তি তেমনি ব্যাপক, এবং সাহিত্য অভিজ্ঞতাও খুব বিস্তৃত।'[১০]

ঠাকুরবাড়ির এই সাহিত্যিক আবহাওয়া,—এবং বিশেষভাবে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রভাব তাঁর সাহিত্যচিন্তায় যে নানাভাবে রশ্মি বিকিরণ করেছে, তাতে সন্দেহ নেই। ইতিমধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রিয়নাথ সেন, লোকেন পালিত, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রভৃতি সাহিত্যভাবুক মনীষীদের সংস্পর্শ ঘটে তাঁর জীবনে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যেই প্রথমে 'রুদ্রচণ্ড' (১৮৮১) ও পরে 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' উৎসর্গ করা হয়। 'ভারতী'তে এই পত্রগুলির কয়েকটি মাত্র প্রকাশিত হয়। য়ুরোপের সমাজ ও দৃশ্যক্ষেত্রের বিবরণ,—যাত্রার নানা কথা ইত্যাদি এই পত্রগুলিতে বিদ্যমান, কিন্তু সেসব প্রসঙ্গ এ আলোচনায় অত্যাবশ্যক উপকরণ নয়। বিশেষভাবে সাহিত্যের প্রকাশতত্ত্ব সম্পর্কে কয়েকটি দিক এতে যা যা পাওয়া যায়, সেইগুলির উল্লেখ করা যেতে পারে।

'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্রে'র দ্বিতীয় পত্রে, ইংলণ্ডে তাঁর প্রথম পরিচিতদের কথাসূত্রে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সাধারণ ইংরেজ স্ত্রী-পুরুষের অজ্ঞতার বিবরণ আছে। সেই সূত্রেই সেখানকার লোকধারণা অনুসারে যাঁরা সুশিক্ষিত বলে বিবেচিত হতেন, তাঁরাও যে তাঁদের নিজেদের কবি শেলির 'চেঞ্চি' বা 'এপিপ্‌সাইকিডিয়ন' পড়েননি, সে-কথার উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু ইংরেজ-সমাজের নানা রুচি এবং ইঙ্গবঙ্গ সমাজের কুরুচির প্রসঙ্গ বর্তমান আলোচনায় অবান্তর। বরং পঞ্চম পত্রের শেষ দিকে, নিজের দেশের কোনো মান্য বন্ধুর

১০। রবীন্দ্র-রচনাবলী (জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ), ১১শ খণ্ড, 'ছিন্নপত্রাবলী' পৃষ্ঠা ২৪৪-৪৫ দ্রষ্টব্য।

কাছ থেকে তিনি সংস্কৃত শিখরিণী ছন্দে যে বাংলা কবিতাটি উপহার প্রাপ্তির কথা লিখেছেন, সেটিই বেশি প্রাসঙ্গিক।[১১] কারণ সেই খবরটিতে সংস্কৃত ছন্দে আমাদের প্রচলিত বাংলা শব্দের সমুচিত অধিষ্ঠান যে অসম্ভব নয়, সেই নবযুবক রবীন্দ্রনাথের এতৎসম্পর্কিত ধারণার একটি নজীর পাওয়া যায়। আবার ষষ্ঠ পত্রে ব্রাইটনের, তথা ইংলণ্ডের ঘর-বাড়িরগুলির পরিষ্কার চেহারা দেখে তিনি লেখেন—'শিল্পজ্ঞান সৌন্দর্যজ্ঞান থেকে এখানকার লোকদের পরিষ্কার ভাবের জন্ম, আমাদের পরিষ্কার ভাব বলে যেন একটা স্বতন্ত্র মনোবৃত্তি আছে।[১২] [ক্রমশঃ]

১১। বিলাতে পালাতে ছট্‌ফট্‌ করে নব্যগৌড়ে
অরণ্যে যে জন্যে গৃহগ বিহগ প্রাণ দৌড়ে।
স্বদেশে কাঁদে সে, গুরুজনবশে কিছু হয় না—
বিনা হ্যাট্‌টা কোট্‌টা ধুতি-পিরহনে মান রয় না।...ইত্যাদি

এই কবিতা উল্লেখ করে তিনি লেখেন—'এ কবিতাটি যদি সংস্কৃত ছন্দে না পড়তে পারো, তাহলে এর মস্তক ভক্ষণ করা হবে।' 'রবীন্দ্ররচনাবলী' [জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ] পৃষ্ঠা ২৭৪ দ্রষ্টব্য।

১২। ঐ, পৃষ্ঠা ২৭৫ দ্রষ্টব্য।

একদা এক

বিদ্যুৎলাঙ্গুল করি ঘন তর্জন
বজ্রদিগ্ধ মেঘ করে বারি বর্জন,—
  সেইমতো বেদনায় অস্থির শার্দূল
  অস্থি-বিদ্ধ গলে করে ঘোর গর্জন।

—রবীন্দ্রনাথ

---

* "একদা এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল" এই বাক্যটি খবরের বেশী আর কিছুই দেয় না। কিন্তু শুধু রিপোর্ট না দিয়ে ব্যাপারটাকে যদি রূপ দিতে হয় তাহলে ভাষাকে নাবিয়ে দেখাতে হবে—রবীন্দ্রনাথ ॥ ছন্দ ॥

সমীর রক্ষিত

তারাচাঁদের স্বপ্ন ও স্বপ্নের তারাচাঁদ

তারাচাঁদ হাপুস নয়নে কাঁদছেন—চোখের জলে তার তাঁর দরাজ বুকে ঢল। প্যাঁচকাটা ট্যাপের জল পড়ছে তো পড়ছেই। কিন্তু এত জলেও তাঁর বুকের আগুন নেভে কই? কলজেটা মোচড় খায়; বাইরের কাকচিলের রা নেই ঘরে টিকটিকিটি পর্যন্ত নীরব, কেবল নিজের চাপা কান্নার ফোসফাস আওয়াজে তপ্ত হাওয়া অন্ধকার ঘরে চামচিকের মত ছটফট করছে। আর ঘুমে অসাড় সুধাময়ীর নাসানিঃসৃত ঘর্ঘর শব্দ তাঁর পোড়া বুকে থাব্ড়া মারছে। রাগে দুঃখে তারাচাঁদ তার দিকে অন্ধকারেই অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন, এতেও শব্দের ইতর বিশেষ না হওয়ায় খুন্ন তারাচাঁদের কান্নার বেগ বেড়ে গেল। তাঁর এই দুঃসময়ে তাঁরই স্ত্রী (বিবাহিতা) জলে ডোবা মেয়ের মত নির্বিকার। অথচ এই ৬৫ বছরের বার্ধক্যে তার সঙ্গ কাশী বৃন্দাবনের মত তীর্থ হতে পারত, তার একটি সান্ত্বনার কথা তাঁর পোড়াকপালে জলপটির কাজ করতে পারত অথচ সেই সুধাময়ীও—রাগে তারাচাঁদের বুকে আগুন হু হু করে উঠল। আগুন আগুন আর আগুন। মাথার ভিতরে, মনের

ভিতরে, ঘরের ভিতরে কপাটে জানালায়, ফ্রিজে সোফায়, কার্পেটে সিঁড়িতে গাড়ীতে বাড়ীতে সর্বত্র আগুন—মায় তাঁর এ্যালসেসিয়ান কুকুরের গায়ে। তারাচাঁদের চমক লাগে একি স্বপ্ন না মায়া—এত আগুন—একি দৃষ্টিভ্রম না মতিভ্রম। স্বপ্ন কী এত স্পষ্ট হয়? হয়তো হয় না—কিম্বা হয়ও। এত আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলে সবই স্পষ্ট হতে পারে—সবই সত্য হতে পারে। আর এইমাত্র তারাচাঁদ যা প্রত্যক্ষ করলেন তা যদি সত্য হয় (হায় প্রভু!) তাহলে—ডুকরে কেঁদে উঠলেন তারাচাঁদ। তিনি স্পষ্ট দেখলেন রাত্রির অন্ধকারে ছায়ার মত কিছু লোক তাঁর বাড়ী ঘিরে ফেলেছে। এইসব লোকদের তিনি চেনেন কিম্বা চিনতেন, যাদের চেনেন তার মধ্যে আছে তাঁর কারখানার যণ্ডামার্কা বেয়াড়া মজুরটা, যাকে দলবাজি করার জন্য কিছুদিন আগে ছাঁটাই করেছিলেন। তারপর থেকে তার খোঁজ ছিল না, দিন দশেক আগে একগাল দাঁড়ি গোফ নিয়ে তাঁর ওপর ঝাপিয়ে পড়েছিল, তারপর নাকি ইঁদুর মারা চটপটি খাইয়ে হতভাগা বৌ মেয়েকে মেরেছে; নিজে এখন দিব্যি হাওড়া ব্রিজে উঠে হাওয়া খায়, পেপারে ছবি উঠেছিল। আর যাদের চিনতেন তারাচাঁদ তার মধ্যে আছে পদ্মবাড়ীউলি যার বস্তীতে তিনি ভাড়া থাকতেন এবং যে বস্তীটা বর্তমানে নিজের করে নিয়েছেন। আর আছে ঢাকেশ্বরী, অকালের সময় যাকে চাল দিয়েছিলেন, আর তার বদলে তার গায়ে গতরের সব নিয়েছিলেন। এরা সকলে এবং এদের মত আরো অনেকে অন্ধকারে তাঁর বাড়ী ঘিরে ফেলেছে এবং অন্ধকারে ফুঁ দিচ্ছে। ফুঁ দিতে দিতে একসময় তারাচাঁদ চমকে দেখলেন, তারা তাঁর বাড়ীতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। চোখের পলকে সে আগুন বাড়ীর ভিৎ থেকে ক্যাঙারুর মত লাফিয়ে লাফিয়ে চারতলা বাড়ীর ছাত অবধি উঠে গেল। বাড়ীটা, গ্যারেজে দুটো গাড়ী, ফ্রিজ, সোফা, খাট কার্পেট, রোল্ড গোল্ড ফিনিস ফুলসাইজের গণেশ মূর্ত্তি সব জ্বালাতে জ্বালাতে সে আগুন এখন ছাতে ডিগবাজি খেয়ে আকাশে ফুঁসছে। আর সঙ্গে সঙ্গে বস্তীর সমস্ত লোক, পাড়া বেপাড়ার ডাণ্ডাবাজ মতলববাজের ফেরববাজের দল এসে জুটেছে আর ফ্যা ফ্যা করে হাসছে। সবাই যেন মজা লুটছে। ব্রহ্মতালু ইস্তক জ্বলে যায় তারাচাঁদের, গায়ে আগুন ধরিয়ে দেয়; তারাচাঁদের চারতলা বাড়ী, দুটো গাড়ী, সিঁড়ি কার্পেট, ফ্রিজ সোফা, রোল্ড গোল্ড ফিনিস ফুলসাইজ গণেশের মূর্ত্তি মায় তার এ্যালসেশিয়ান কুকুরটার গায়ে আগুন। একি স্বপ্ন না মায়া? এত আগুন, একি দৃষ্টিভ্রম না মতিভ্রম।

চোখের জলে তাঁর দরাজ বুকে ঢল। স্বপ্ন হওয়া বিচিত্র কী। সারাজীবন স্বপ্ন দেখে এসেছেন তারাচাঁদ আর তা সত্যও করেছেন। স্বপ্ন দেখার বাতিক তাঁর অনেককালের, সেই যখন পদ্মবাড়ীউলির বস্তিতে ছয় বাই চার স্যাত-স্যাতে মেঝের ঘরের ভাড়াটে। ৫ ফুট উঁচু টালির চাল, দাঁড়ালে মাথা ঠেকে। ব্রিজমোহন দুলিচাঁদের ওয়ার্কস সরকার তারাচাঁদ তখন, দুলিচাঁদজী ক্লাশ ওয়ান কনট্রাকটর। কুলিখেদানো কাজ তারাচাঁদের, ঘাটে মাঠে রোদে জলে; কখনো শুকনো কিম্বা ভেজা দুটি চারটি রুটি খেয়ে দিন যায়। রাত্রে ডেরায় ফেরেন, ঘরে বাতি জ্বলে না বস্তির সকলে বলত—'অন্ধারবাবু,' মনে মনে হাসতেন তারাচাঁদ আর অন্ধকারে স্যাঁতস্যাতে ঘরের বাঁশের মাচায় শুয়ে ভাঙা টালির ফাঁক দিয়ে আসমানের তারা চাঁদ দেখতেন, স্বপ্ন দেখতেন তাঁর ঘরে রোশনাই জ্বলছে, দুলিচাঁদজীর বাড়ীর মত তার ঘরে ইলেক্‌টিরিকের বাতি জ্বলছে। চোখে ধন্দ লাগে কী চকচকে মেঝে, দর্পণের মত শরীরের ছায়া পড়ে, হাঁটতে মায়া লাগে পাছে নোংরা লাগে; দুলিচাঁদজী বলতেন, 'বেটা স্বপ্‌না চাহিয়ে জিন্দিগীমে—খোয়াব নেহি, স্বপ্‌না, সমঝে'—

সেই থেকে স্বপ্ন দেখেছেন তারাচাঁদ আর তা সফলও করেছেন, তার বাড়ী তার গাড়ী, ফ্রিজ সোফা, এ্যায়ারকুলার মায় এ্যালসেশিয়ান কুকুর সব হয়েছে। এখন তাঁর জীবনী নিতে কাগজ থেকে লোক আসে, ছবি নেয়, বাণী চায়। তাঁদের প্রশ্নের উত্তরে গোঁফের নীচে আদ ইঞ্চি হেসে বলেন, 'তপস্যা চাই বুঝেছ, জীবনে বড় হতে গেলে স্বপ্ন দেখা চাই।' ইংরেজিতে প্রশ্ন হলে পি, এ ছেলেটি বেশ চটপটে, সাহেবের মত করে বলে দেয়—'ড্রিম্‌ ড্রিম্‌', ফ্লাশ বাল্বের চমকাআলোর চাবুক; চোখ পিট পিট করে তাঁর, যেন ভেতরেরও সব কিছু শুদ্ধ ছবি তুলে নেয়—বিরক্ত হন তারাচাঁদ বুক শুকায়, গোঁফ কাঁপে—'সব জানতে চেওনা, তবে স্বপ্নই হচ্ছে আমার বীজমন্ত্র।' আসলে স্বপ্নই জীবন আবার জীবনটাই স্বপ্ন। স্বপ্ন দেখা তাঁর গুরুর আদেশ আর সেই স্বপ্নকে সত্যিকরা। ইদানীং তাই ফাঁপরে পড়েন তারাচাঁদ দুচোখে গাড়ী বাড়ী যা দেখেন সবই স্বপ্ন বলে মনে হয় কখনো, তাই আবার সত্যিও বটে। কোনটা স্বপ্ন কোনটা সত্য গুলিয়ে যায় ইদানীং এ বড় বিচিত্র লীলা প্রভু। এই স্বপ্নের খপ্পরে পড়ে নাকের জলে চোখের জলে একাকার।

কিন্তু এত জলেও কী আগুন নেভে! আগুন তাঁর দরজায় জানলায়, সিঁড়িতে রেলিংএ, ফ্রিজে খাটে, সোফায় কার্পেটে, মায় তার এ্যালসেশিয়ান কুকুরের গায়ে। এত আগুন একি স্বপ্ন না মায়া, এত আগুন একি দৃষ্টিভ্রম

না মতিভ্রম। সুধাময়ীর নাসাগর্জনে কী ক্রন্দনের শব্দ, সব পুড়ে ছাই হবার বেদনায় হাহাকার, নাকি স্বপ্নে তার সশব্দ প্রেমলীলা। সব কেমন গুলিয়ে যায়—

যতদুর মনে পড়ে রোজকার মতই রাত দশটা নাগাদ তারাচাঁদ শোবার ঘরে আসেন। অবশ্য অন্যদিনের তুলনায় তাঁর চটির ফট্ ফট্ শব্দটা আজ চ্যাটাং চ্যাটাং করছিল। নিশ্বাসে গরম হাওয়া ছুটছিল, চোখের তারা চোখের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিল এবং গোঁফ জোড়া চমকে চমকে উঠছিল. কারণ একটু আগেই ফোন পেয়েছেন তাঁর ফ্রি ইণ্ডিয়া কেমিক্যালস-এর মজুরেরা তার ম্যানেজারকে ঘেরাও করেছে এবং পুলিশ আসছে না। দিল্লীতে ট্রাংকল করবার জন্য রিসিভার তুলে ছেড়ে দিয়েছেন, পি, এ ছোকরা আসেনি—আবার ইংরেজির ধকল। ব্যাটা ছোট লোক মজুরগুলোকে লাই দিলেই ঘাড়ে ওঠে—হাত শক্ত হয়ে যায় দাঁত কিরমির করে উঠতেই দুপাটি দাঁত মুখের ভিতরে নড়ে যায়—তৎক্ষণাৎ দুপাটি দাঁত খুলে বুড়ো চাকর গিরিধারীকে দিয়ে দেন রূপের বাটিতে ভিজিয়ে রাখতে তারপর দেয়ালের গর্তে বসানো রোল্ডগোল্ড ফিনিস্ ফুলসাইজ গণেশকে প্রণাম করেন এবং তাঁর পিঠে আদর করে একটু হাত বুলিয়ে দেন (ব্যাপারটা খুবই গোপনীয় কারণ ঠিক পিঠের ওখানেই ছোট্ট একটি জানলা আছে—খাপে খাপে লাগানো বাইরে থেকে বোঝাই যাবে না, অথচ চাবি ঘোরালেই খুলে আসবে, খুললে দেখা যাবে তার ভেতরে—যাক্ সে কথা)। তারপর বার্মা টিকের খাটের ডানলোপিলোর পুরু গদীতে শরীর টান করে দেন। গিরিধারী তাঁর পায়ের নীচে তাকিয়া ঠেস দিয়ে পায়ের তলায় সুড়সুড়ি দিলে তবে তাঁর চোখ বুজে আসে। যেদিন সুড়সুড়িতেও ঘুম আসে না সেদিন কখনো বিদেশী মতে একটু আধটু কারণ পান করেন ফ্রিজ থেকে, কিম্বা ভারতীয় মতে আফিম সেবন করেন। কোন কোনদিন, বিশেষ করে কোন উত্তেজনা থাকলে, ইঙ্গিতে তারাচাঁদ ব্রহ্মতালু দেখিয়ে দেন গিরিধারীকে এবং গিরিধারী দ্রুত তার কেশহীন তেলতেলে টাকে দশ আঙ্গুলে বিছের মত বিলি কেটে দেয়। তখনই তাঁর চোখের পাতা বুঁজে আসছিল কিন্তু সিঁড়িতে সুধাময়ীর পায়ের থপ থপ আওয়াজ ক্রমাগত এগুতে থাকায় বিরক্তিতে গাটা রি রি করে ওঠে। ভাবতে অবাক লাগে ওই মেদ চর্বির বস্তা তাঁকে গছানো হয়েছিল অথচ একটি কানা, আধলাও ফালতু জোটেনি কারণ তখনও তারাচাঁদ পদ্মবাড়ীউলির বস্তিতে। তাই সুধাময়ীর ও চিরকালের আব্দার এসবই নাকি তারই ভাগ্যে।

সুধাময়ী শেষবার গলাখাঁকরী দিয়ে মশারীর ভিতরে ঢুকতেই—গাটা ঘিন ঘিন করে উঠল এবং সঙ্গে সঙ্গে পার্কস্ট্রীটের মেয়ে লিজার বব ছাঁট চুল, কাজলটানা চোখ, টান টান কাঁচুলি আর কাচের মত ফ্রক পরা শরীরটা মনে পড়তেই ঘুমের ঘোরেও মনটা খুশীতে ডগমগ করে উঠল। পাঁচমিশালী রঙিন পানীয়ের পাত্রটা তাঁর ঠোঁটের সামনে ধরে লিজা যখন খুব মিষ্টি করে কাছে এসে বলে, 'ডার্লিং ইউ আর ইয়াং'—'ডারলিং' !—তখন মনে হয় অপ্সরী টপ্সরী কল্পনামাত্র। আসলে এই লিজাই উর্বশী আর স্বর্গটা তারাচাঁদের নিজের হাতে তৈরী। নীলরঙের মিটমিটে আলোয় ঘুমেবোজা চোখের পাতা টান করে সিলিং-এ তাকান—চার দেয়ালে, দরজায় জানলায়, বুকটা গর্বে ফুলে ওঠে: নিজেকে হতে দেখেননি তারাচাঁদ কাজেই বুকের পাঁজর কী রকম করে হয় জানেন না, কিন্তু এই দেয়াল সিলিং ডিস্‌টেম্পার, মশারী-অ্যায়ার-কুলার-ফ্রিজ সব তাঁর নিজে হাতে তৈরী তাঁর বুকের একেকটা পাঁজর; কোথাও এতটুকু দাগ লাগলে তাঁর চামড়া জ্বলে যায়, কোথাও এতটুকু চটে গেলে তাঁর বুক চিনচিন করে। মাঝে মাঝে বিনা কারণে সিঁড়ি বেয়ে নীচের তলা থেকে ছাতে উঠে যান, বড় করে শ্বাস টানেন। দেয়ালে টিকটিকি দেখলে তাড়া করেন, ল্যাজ খসিয়ে দেন, মেঝেয় পড়ে সেটা ছটফট করলে তবে শান্তি।

নীলরঙের ডিমলাইটে তাঁর চোখ বুজে আসে: সবই তোমার লীলা প্রভু! গুরুদেব ভুলিচাঁদজীর মুখটা ভেসে আসে: তাঁর কণ্ঠস্বর গম্ভীর, মধুর—'সপ্‌না চাহিয়ে, সম্‌ঝে।' স্বপ্ন দেখেছেন তারাচাঁদ। আর গুরু দিয়েছেন বীজমন্ত্র, বলো—'চিচিং ফাঁক' অমনি রাস্তা অন্ধকার, দুশমন ভি হ্যায় আগে পিছে, হোসিয়ার, মগর সব দরওজা মিলা, খিড়কি দরজা, বলো: 'চিচিং ফাঁক'—অমনি দরজা খুলে যাবে, অন্দরে সোনা দানা টাকার বাণ্ডিল বস্তাবস্তা কালা ধলা, 'যো খুশ্‌ লে যাও, মগর ইয়াদ রাখনা মন্তর বেফাঁস বেচাল হলেই খেল খতম—জান বরবাদ।' এই করে ভুলিচাঁদ টাকার পাহাড় করেছিল। তখন সবে ইংরেজদের সঙ্গে জাপানীদের লড়াই শুরু হয়েছে, গোরা পল্টনে কলকাতা—কেন সারা দেশটাই কিলবিল। রাতে ব্ল্যাকআউট, যখন তখন সাইরেন, বিমানের শব্দ, বোমার আওয়াজ, কামানের গর্জন, ফায়ার ব্রিগেড। চারদিকে হৈ হৈ করে রাস্তাঘাট, এ্যারোড্রম হচ্ছে। বাতাসে টাকার নোট ছড়াচ্ছে ইংরেজ, ভুলিচাঁদজীর মুখে—'চিচিং ফাঁক'। রাস্তাঘাট, বাড়ীঘর তৈরীর কণ্ট্রাক্ট তার, লাখে লাখে টাকা, লোহা লক্কড়ের ব্ল্যাক। তারাচাঁদকে বললেন গুরু, 'বেটা,

দরওয়াজা মিলা?' না, সাদা চোখ তখন তাঁর, চোখ থাকতেও অন্ধ হাত থাকতেও ঠুঁটো, কই দরজা কোথায়? গুরু বল্লেন 'দরওয়াজা হ্যায় নেহি! বক্রী লাও'—'বক্রী'?' হ্যাঁ সেই বক্রী দিয়ে সুরু তারাচাঁদের—গোরা-পল্টনের জন্য রামছাগল সাপ্লাই দিয়ে সুরু—আর সেই যে সুরু হল—সেই যে চোখ খুলে গেল তারপর জীবনে কত দরজা পেয়েছিল, কত অন্ধকার অলি-গলি, অমনি খিড়কি দোরের সামনে হাঁক পেড়েছিল, 'চিচিং ফাঁক।' বক্রী থেকে চাল—বস্তায় বস্তায় গুদাম ভর্তি করা চাল—সারা কলকাতায় এ যেন 'ফ্যান দে ফ্যান দে' রব উঠেছে—গাঁ উজাড় করে বকরীর পালের মত লোক আসছে কলকাতায়, এসে চিৎপটাং হয়ে পড়ে মরছে সব রাস্তায় ফুটপাতে নর্দমায়, কুকুরে কাক চিল শকুনে ছিঁড়ে খাচ্ছে। তারাচাঁদের তখন দুচোখে স্বপ্ন, রক্তে নেশা: 'চিচিং ফাঁক'। দুলিচাঁদ বৃদ্ধ বয়সে বল্লেন, 'সাবাস বেটা, তুম গুরুকো ভি মার দিয়া—যা বেটা'—তাঁর কাঁধ ঝাঁকিয়ে দিলেন গুরু।

যুদ্ধ থেমে গেল ততদিনে তাঁর বাড়ী সুরু হয়ে গেছে একটা গাড়ী আর রোল্ড্‌গোল্ড ফিনিস ফুলসাইজ গণেশের ঢাউস মূর্তি তাই পেট ভর্তি (যাক সে কথা)। আর পদ্ম বাড়াউলি পেটের দায়ে বস্তী বাঁধা দিয়ে টাকা নিয়েছিল, সে বস্তী হজম হয়ে গেছে। সে বস্তির উঁচু ধারটায় চারতলা বাড়ী উঠছে, বাড়ীতে আর সব ভাড়াটের সঙ্গে পদ্মও ছিল কিছুদিন। তারপর ভাড়া বাকী পড়তে পুলিশ দিয়ে উচ্ছেদ করে দিয়েছিলেন। শেষ নিশ্বাস ফেলবার সময় নাকি তার দুচোখে আগুন লেগেছিল—কে যেন তাঁকে খবরটা দিয়েছিল কিন্তু তখন তারাচাঁদ স্বাধীন দেশের মুরুব্বি, পাড়ার কাউন্সিলার, এ্যাসেম্বিলির মেম্বার, পাঁচটা চালকল তাঁর, দুটো গাড়ী, ফ্রি ইণ্ডিয়া কেমি-ক্যাল্‌সের ম্যানাজিং ডাইরেক্টর আরো-কত কিছুর সভাপতি, পৃষ্ঠপোষক ইত্যাদি ইত্যাদি। খবর কাগজে তাঁর ছবি ছাপে, জীবনী লেখে, বাণী নিতে আসে। হাফ ইঞ্চি ঝুল গোঁফের নীচে হেসে তিনি বলেন, 'তপস্যা চাই, বুঝেছ, স্বপ্ন দেখা চাই জীবনে।' আচমকা ফ্লাশ বাল্বের চমকা আলো, যেন অন্ধকার ভেতরের ও ছবি তুলে নেয়। চোখ পিট পিট করে, বিরক্ত হন তারাচাঁদ, মাথায় তাঁর আগুন ধরে যায়। ওরা বিগলিত হয়ে হাসে, আসলে যেন খোঁচা-মারে, সব ব্যাটার চোখগুলো কীরকম ট্যারা। কারো ভালো দেখতে পারে না এরা। ওদের হাসির ভঙ্গির সঙ্গে [ব্যাটা-বৌয়ের হাসির ভীষণ মিল] কিম্বা ভীষণ মিল ওই ত্যাঁদোড় মজুরগুলোর। লাই দিলে ঘাড়ে ওঠ, সর্বাঙ্গ জ্বলে যায়, তারাচাঁদের মাথার ভিতরে বুকের ভিতরে রক্তের ভিতরে আগুন

দপ দপ করে। সব জ্বলছে তাঁর চোখের সামনে। ঘরের ভিতরে কপাট জানালায় ফ্রিজে সোফায়, কার্পেট সিঁড়িতে গাড়ীতে বাড়ীতে—মায় তাঁর এ্যালসেশিয়ান কুকুরের ল্যাজে, এত আগুন একি স্বপ্ন না মায়া? ঐত আগুন একি মতিভ্রম না দৃষ্টিভ্রম? তাঁর বুকের পাঁজরের স্বর্গ পুড়ে ছাই হয়ে গেল, হাউ হাউ করে কাঁদল তারাচাঁদ। চোখের জলে তাঁর দরাজ বুকে ঢল।

এই আগুনের ভয়ে পালিয়ে এসে ভুল করেছিল, বরং ঐ আগুনেই আত্মাহুতি দেয়া উচিত ছিল তাঁর, আর তাহলে এই ছোট লোকগুলোর খপ্পরেও পড়তে হত না। লোকগুলো তাঁকে ঘিরে হাহা করে হাসছে, যেন নেত্য করছে। পাড়া বেপাড়ার যত গুণ্ডা মতলববাজ ষণ্ডা ফেরেববাজ সব এসে হাজির, যেন মেলা মচ্ছব। সবার মধ্যে ঢাকেশ্বরীর উড়ন্ত চুল, স্ফীত নাসা, টগবগে গতর, প্রথমদিন চোখ দিয়ে তার জল গড়িয়ে ছিল, শেষের দিন অভিশাপ দিয়েছিল পুড়ে মরবি—'গতর খাঁকী', পদ্মবাড়ীউলি আর ষণ্ডামার্কা মজুরটাও রয়েছে, আরো কাতারে কাতারে লোক তাঁকে দেখে হাসছে। সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে তাঁর মুক্তকচ্ছ অবস্থা। প্রথমে খাট থেকে নামতে গিয়ে পড়ে যান, সুধাময়ী তাঁকে টপকাতে গিয়ে টাল খেয়ে চেঁচিয়ে ওঠে 'বাবাগো রক্ষা করো—কে বাবা বলে তাকেই দুহাতে জড়িয়ে ধরে নেমে আসেন তাঁরাচাঁদ। 'আমার ভাগ্যেই সব হয়েছিল' সুধাময়ীর তখনও আব্দার। 'আ মর পোড়া কপালি!'—তারাচাঁদের হা হুতাসে সকলে হেসে ওঠে। কোথায় আগুন নেভাতে চেষ্টা করবে তার নাম নেই,—ছি ছি। তাঁর পিত্তি জ্বলে যায়। আগেকার দিন হলে মুনি ঋষিদের মত সকলকে ভস্ম করে দিতেন। এদিকে গলা কাঠ তেষ্টায়। আগুন থৈ থৈ, চারিদিকে হঠাৎ আগুন কাঁপিয়ে আগুনের হল্‌কা কাঁপিয়ে ঢং ঢং শব্দ। চারিদিকে চীৎকার 'ফায়ার ব্রিগেড—ফায়ার ব্রিগেড।' পাগলা মজুরটা একগাল দাঁড়ি গোফ নিয়ে মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসছিল আর সার্কাসের ক্লাউনের মত দুহাতে ভর দিয়ে পা ওপরে করে ডিগবাজি খেতে খেতে হাঁটছিল। হঠাৎ মজা করতে করতে এক ঘুষিতে কাঁচের খোলস ভেঙে চাবিকাঠি ঘুরিয়ে দিয়ে হা হা করে হাসলে। আর ঢং ঢং শব্দ, সাইরেন না বোমা বা কামান না, যুদ্ধ না, ফায়ার ব্রিগেড। ঢং ঢং ঢং দজ্জাল শব্দে যেন পৃথিবী কেঁপে ওঠে, কাতারে কাতারে লোক সরে দাঁড়ায় রাস্তা করে দেয়—'রাস্তা দে রাস্তা দে'—'ফ্যান্ দে ফ্যান্ দে' ঝলসানো আগুনে লোকগুলোর মুখ ভীষণ চেনাশোনা দেখা দেখা মনে মনে হয়। চারিদিকে কাচা মাংস পোড়ার গন্ধ, হাড় পোড়া রক্ত পোড়া গন্ধ। কালো ধোঁয়া

গদ গদ করে উঠছে। কুকুরের ডাক। লালটুপী খাকী পোষাক পায়ে গামবুট, ফায়ার ব্রিগেডের লোকগুলো ঝপঝপ নেমে পড়ে লাফিয়ে। লালগাড়ীতে বিরাট বিরাট মই—মুখ উঁচিয়ে আকাশের দিকে, ট্যাংকের ওপরে কামানের মত। আকাশে আগুন ডিগবাজি খায়। ধড়ে প্রাণ আসে 'জল কই জল -' 'জল চাই জল দাও—জল চাই জল দাও' লেলিহান আগুনের আঁচের হাল্কা বাতাসে লোফালুফি শব্দ। বুকের ভিতরে গণগনে আঁচ। জিভের ডগা থেকে আলজিভ, আলজিভ থেকে কলজের ভিতর অবধি কাট, জল দাও—জল চাই' মুহূর্তে সব জল নিঃশেষ। ফায়ার ব্রিগেড যা সঙ্গে এনেছিল সে জল ঢালল ওরা আশপাশের বাড়ী ভেজাবার জন্য। তাঁর বাড়ী যেমন তেমনি পুড়ছে। 'আরো জল চাই জল দাও'—অথচ যতদূর চোখ যায় দীঘি পুষ্করিণী, আলবিল, নদী নর্দমা কিছু নেই, লোকগুলোর হাসি দেখে পিত্তি জ্বলে যায়। সব ব্যাটার ভাড়া বাকী, মাসের শেষে হাড় হাভাতের দল এসে হাতে পায়ে ধরবে—'পেট চলে না বাবু—রাজা লোক আপনি, একবেলা খাই আরেক বেলা জোটে না, রাজা বটে আপনি'—'দূর হ' সব কটাকে উচ্ছেদ করে দিয়ে বকরীর মত ভাগিয়ে দিয়ে ঐ বস্তীতে যদি বড় দেখে একটা দীঘি কাটাতেন তবে আজ জলাভাবে এ অনাসৃষ্টি হয়। আর যদি তাতে মাছের চাষ করতেন—না হয় দুজন স্পেশালিষ্ট আনতেন জাপান থেকে, না হয় স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া থেকে—রুই কাতলা গলদা চিংড়ি ল্যাটা কলকাতায় কাড়াকাড়ি পড়ে যেত: 'চিচিং ফাঁক'—তাড়াতাড়া নোট, সোনাদানা, এ্যালসেশিয়ান কুকুর, লিভার উরু—'আমার গলার বিছে হার' কানের কাছে সুধাময়ীর তারস্বর। কোথায় পড়ল, কোথায় হারাল আগুনের ভয়ে পালাতে গিয়ে ভীড়ের মধ্যে। চঞ্চল হাত চালিয়ে দেন সুধাময়ীর গলায় বুকে, 'আমোলো যা রাত দুপুরে আদিখ্যেতা!' হাতের ওপর সুধাময়ীর ঝটকা খামচা যেন ইলেকট্রিকের শক লেগেছে। তারাচাঁদের বুকে অভিমানের ফেনা উছলে ওঠে, তাঁর এই বিপদের দিনে স্ত্রী পুত্র কেউ তাঁর নয়? কোথায় তাঁকে একটু সান্ত্বনা দেবে, একটু বুঝিয়ে সুঝিয়ে বশে আনবে, না ঘুমুচ্ছে আর তাকে খামচাচ্ছে রাতদুপুরে—'কা তব কান্তা'—ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন তারাচাঁদ—বুকের ভিতরে হৃৎপিণ্ড হাপরের মত হাসফাস করছে—চোখের জল তার দরাজ বুকে ঢল।

কাঁদতে কাঁদতে—কাঁদতে কাঁদতে বুকটা ফুলে ফেঁপে ঢোল হয়ে আবার আস্তে আস্তে যখন চুপসে যেতে লাগল, সারা শরীরের স্নায়ু ক্লান্ত অসাড়

হয়ে সব চিন্তা যখন আস্তে আস্তে তলিয়ে যেতে লাগল, সেই সময় তলিয়ে যেতে যেতে তলিয়ে যেতে যেতে তারাচাঁদের হঠাৎ হুঁস হল তবে তো সুধাময়ী তাঁর পাশেই শুয়ে আছে (এবং থামচাচ্ছেও), চোখের সামনে নীল আভা, সুধাময়ী সত্যি কী তাঁকে থামচাচ্ছে? নাকি দুঃখে শোকে অধীর উত্তেজিত, সব হারানোর শোকে প্রায় মূর্চ্ছিত! নাকি রাগে অভিমানে সব জ্বলে যাবার পরে ছাইয়ের গাদার ওপরে শুয়ে? অনেকদূর থেকে ঘর্ঘর্ শব্দ আসছে যেন এবড়ো খেবড়ো রাস্তার ওপরে জমাদারদের ময়লা ফেলার লোহার গাড়ীর চাকার শব্দ। হাজার হাজার গাড়ীর লক্ষ লক্ষ চাকার শব্দ। সব ছাই ভস্ম জঞ্জাল বুঝি ঝেটিয়ে সাফ করা হচ্ছে। তাঁদেরও তুলে নিয়ে যাবে হয়তো, ছাই গাদার ওপর থেকে সুধাময়ীকে, তাঁকে। একটা কিছু বিহিত করা দরকার। তাঁর শরীর কী তাঁর বুকের পাঁজরের ছাই গাদার ওপরে? আস্তে করে নীচের দিকে চাপ দিলেন তারাচাঁদ, পরখ করে দেখলেন কোথায় তিনি, লিজার তুলতুলে শরীরের মত নরম ডান্‌লোপিলের বিছানায় নাকি ছাইগাদায়। সমস্ত শরীর তলিয়ে যাচ্ছে, ডুবে যাচ্ছে। ছাই কি খুব নরম হয়?—খুব তুলতুলে? চামড়া পুড়লে মাংস পুড়লে হাড় পুড়লে পাঁজর পুড়লে রক্ত পুড়লে কি খুব নরম হয়, ছাই হয়? ভয়ে ভয়ে পাশ ফিরলেন তারাচাঁদ; পলকে উড়তে পলকে উল্টে পড়তে গিয়ে বোধহয় মশারীতে আটকে গেল শরীরটা; তবে কী মশারীটা পোড়েনি—নাকি পুড়ে গিয়ে হ্যাজাকের ম্যান্টেলের মত হয়ে আছে! একটু জারিজুরি করতেই পড়ে গেলেন তারচাঁদ—কোথায় এলেন! চারিদিকে অন্ধকার, ঠাণ্ডা, ভয়ানক কঠিন—স্বর্গ মর্ত না পাতালে? ভয়ে ভয়ে সর্বাঙ্গ ছড়িয়ে দিলেন, সাষ্টাঙ্গে প্রণামের ভঙ্গিতে, শরীরের প্রতিটি রোমকূপ খাড়া করে তুললেন, প্রতিটি রোম বেয়ে রক্তে ছড়িয়ে গেল ভীষণ শীতল শিরশিরে একটা স্রোত; কী কঠিন, কী শীতল—এই কি তার ইটালিয়ান মোজেক—যার ওপর দাঁড়ালে শরীরের ছায়া পড়ে? চলতে অসাবধান হলে যাতে পা হড়কে যায় - যার স্পর্শ মধু-র মত মধুর। যে মোজেক তিনি নিজে দাঁড়িয়ে—তদারকী করে ফিনিস করেছেন, যা করতে গিয়ে তাঁর ফুলসাইজ গণেশের চাউস ভুড়ি অনেকটা ফোঁপরা হয়ে গেছে। বুকে হাঁটলেন তারাচাঁদ—ঠাণ্ডা স্যাতস্যাতে; আগুনের নাম গন্ধ নেই তাঁর চোখের জলে, ফায়ার ব্রিগেডের জলে সব ঠাণ্ডা—ছাই পাশ গলে গিয়ে কাদা ছাইয়ের স্তূপ; মৃদু নীল আলো—সব অস্পষ্ট, কাক চিলের রা নেই, টিকটিকিটি পর্যন্ত নীরব, শুধু দূর থেকে ঘর ঘর

শব্দ ভেসে আসছে। যেন হাজার হাজার ময়লা ফেলার ধাঙরদের লোহার গাড়ীর লোহার চাকার শব্দ এবড়ো খেবড়ো রাস্তার ওপরে। যেন সব জঞ্জাল ছাই পাশ ঝেটিয়ে সাফ করা হচ্ছে আর গাড়ীতে করে সব ফেলে দেওয়া হচ্ছে। গুণ্ডা ষণ্ডা ফেরেববাজের দল লক্ষ লক্ষ হাতে ময়লা বোঝাই গাড়ী ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে—ছাই পাশ জঞ্জাল ঝেটিয়ে সাফ করছে—তার গায়ে হঠাৎ ওই শীতল দুটো হাত এসে পড়ল, ছাই গাদার ওপর থেকে তাঁকেও টুক করে তুলে নিয়ে রাবিশের মধ্যে ফেলে দেবে। চমকে চীৎকার করে উঠলেন তারাচাঁদ—

প্রথমে বিশ্বাস করতে পারলেন না, নীল আলোয় সুধাময়ী অস্থিরভাবে তাঁর বুকে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে, কিগো তোমাকে কী বোবায় ধরেছে নাকি। মেঝেয় পড়ে অমন গো গো করছ কেন?' অনেকক্ষণ তারাচাঁদ কোন কথা বলতে পারলেন না, একী স্বপ্ন না মায়া? একি মতিভ্রম না দৃষ্টিভ্রম। তাঁর দুচোখে দরদর ধারা, সুধাময়ী যেন দারুণ অপরিচিত, ফ্যালফ্যাল করে তার দিকে তাকিয়ে থাকেন; 'কিগো তুমি কথা বলছ না কেন, তুমি কী -' সুধাময়ীর কান্নায় যেন সম্বিৎ-পান তারাচাঁদ, আস্তে করে বলেন "সুধা সুধা, তোমার ভগ্যেই সব'। ঘুমে ঢুলু ঢুলু চোখে মুখটি হেসে সুধাময়ী বলেন, ওসব কথা দখল ডাক্তার পাকড়াসীকে ফোন করব?' তারাচাঁদের ধাৎ করে নিশ্বাস পড়ে, 'ডাক্তার? না ডাক্তার থাক, ভোর হল। 'বোধহয় এবার' সুধাময়ীর হাত ধরে উঠে দাঁড়িয়ে কাপড় ঠিক করলেন তারাচাঁদ, সুধাময়ী আবার গিয়ে বিছানায় টলে পড়ল এবং অনতিবিলম্বেই তার নাসিকার ঘর ঘর সুরু হল।

তারাচাঁদ চোখ মুছলেন, কোমর টান করলেন, সিলিং দেয়াল, মোজেক ডিসটেম্পার, রোল্ডগোল্ড ফিনিস ফুলসাইজ গণেশ দেখলেন; তারপর ভক্তিভরে গড় করে, গণেশের পিঠে হাত বুলিয়ে দিলেন।· এ্যালসেসিয়ানটা ঘেউ ঘেউ করছে। বাইরে এলেন। দ্রুত পায়ে ছাতে উঠে এলেন—তারাচাঁদ। ভোর হব হব, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাওয়া, চারিদিকে কুয়াশা, পুবের দিকে শুধু লালচে হয়ে উঠেছে। বস্তিটা কুয়াশার মধ্যে আবছা আবছা চুপিচুপি বস্তির চারিদিকটা ভাল করে লক্ষ্য করলেন। গুণ্ডা ফোরেবাজ, ষণ্ডা মতলববাজ কে কোথায় ওৎপেতে আছে। নাঃ কেউ কোথাও নেই, তাঁর চারতলা বাড়ী, দুটো গাড়ী মায় এ্যালসেসিয়ান কুকুর, তাঁর বুকের পাঁজর সবই ঠিক আছে। খুব জোরে শ্বাস টানতে গিয়ে মাঝপথে হঠাৎ চমকে উঠলেন তারাচাঁদ। পরাণ

দাসের বৌটা আর্তস্বরে চেঁচিয়ে উঠল। পরাণ দাস তাঁরই ব্রি-ইণ্ডিয়া কেমি-ক্যালসের মজুর, ভোর বেলায় ডিউটি; কিন্তু ছাঁটাই হয়ে গেছে। বৌ সেটা জানত না। কমলি তাকে সাতসকালে ডেকে দিয়েছে—রোজকার মত ওগো উঠবে না কারখানার সময় হয়ে গেল যে'—

'মাগী ছেনালি হচ্ছে?' বলেই ঘুমের ঘোরে তার তলপেটে ঝাঁকার লাথি কষিয়েছে পরাণ; কমলি ছিল দশমাসের গর্ভবতী; ঢাউস্ পেট। লাথির চোটে রক্তারক্তি কাণ্ড; রক্তের ঢল বস্তিতে। কমলির আর্তনাদের সঙ্গে সঙ্গে এ্যালসেশিয়ানটার চীৎকার। আর সেই মুহূর্তে সমস্ত পুব আকাশ লালে লাল করে সূর্য উঠল। সূর্যের সেই দুরন্ত আলো দুহাতে কুয়াসা সরিয়ে কমলির গর্ভের রক্ত স্রোতে ঝাপিয়ে পড়ে, তারপর থকথকে রক্ত থেকে উঠে ডিগবাজি খেতে খেতে লক্‌লক্ করে সারা আকাশে ছড়িয়ে যায়। তারাচাঁদ অবাক হয়ে দেখলেন সব, তারপর হঠাৎ একটা আতংকে দুহাতে চোখ বন্ধ করে দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে নীচের দিকে ছুটলেন।

আ খে রী

বুঝ সময়ের বইছে হাওয়া; গোলাম সময় যাচ্ছে ছুটে,
সাবালকির করছে দাবী সব দুনিয়া দাঁড়িয়ে উঠে।
মুরুব্বিদের করছে তলব, চাইছে হিসাব, চাইছে চাবি
মানুষ বলেই সকল মানুষ ইজ্জতেরি করছে দাবী।
তাবৎ জীবে শিব যে আছেন রুদ্র তিনি অবজ্ঞাতে,
নিখিল লয়ে রণ্ নারায়ণ পুণ্য পাঞ্চজন্য হাতে।

*

পাওনা দেনা ঠিক দিয়ে নে—দিল গোলামির নিকেশ করে।
মানুষ আবার মানুষ হবে বিশ্বে বিশ্বনাথের বরে।
রুজু দিয়ে পাতায় পাতায় জমা খরচ তৈরী রাখো—
জাব্দা জুজুর ভয় কোরোনা, ঠিক দিয়ে ঠিক তৈরী থাকো:
নতুন খাতার বেদাগ খাতায় স্বস্তিকে কে সিঁদুর দেবে—
তৈরী থাকো—অরুণ উষার-নতুন জীবন আসবে নেমে।

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

দেবপ্রসাদ সিংহ

ধূর্জটিপ্রসাদ ও আধুনিক বাংলা-সাহিত্য

ধূর্জটিপ্রসাদের লেখা গল্প 'রিয়ালিষ্ট' পড়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "তোমার লেখনীর প্রতি আমার একমাত্র অভিযোগ এই যে, দিনের শেষে সন্ধ্যাবেলায় যারা আরামে অনায়াসে গল্প পড়তে চায় তাদের প্রতি ওর কোনো মমতা নেই।" বস্তুতঃ, ধূর্জটিপ্রসাদের সব লেখার সম্বন্ধেই একথা খাটে, কম বা বেশী। আমার মনে হয় ঠিক এই কারণেই তাঁর জনপ্রিয়তা যতটা প্রকট হওয়া উচিত ছিল ততটা হয়নি। এটা আমাদের দুর্ভাগ্য। তাঁর বিশ্লেষণী অন্তর্দৃষ্টি দ্বন্দ্বময় ব্যক্তিমানসের মহান অসংগতি বাংলা সাহিত্যে একেবারে নূতন। তাঁর আগে ও পরে অনেকে লিখেছেন। কিন্তু তিনি বাংলা সাহিত্যে যে ধারা ও শৈলীর প্রবর্তন করলেন তা তাঁর ত্রয়ী "অন্তঃশীলা" "আবর্ত"ও "মোহানা"য় বিধৃত হয়ে আছে। "অন্তঃশীলা"য় খগেন, রমলা সাবিত্রীর যে চরিত্র অঙ্কিত হয়েছে তা শ্লাঘার বস্তু। তিনটিই ভিন্ন চরিত্র—এদের সম্বন্ধে বিপরীত মনোভাব দেখে লেখকের প্রতি রাগ না হয়ে ভালোই লাগে। লেখকও তাই চেয়েছেন।

একথা অনেকাংশে সত্য যে বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস নেই। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস 'গোরা' আজো একমাত্র। আছে গল্প এবং অনেকগুলিই খুব ভালো

ভালো গল্প। 'পথের পাঁচালী' জমেছিল। কিন্তু "অপরাজিত" কিঞ্চিৎ কাঁচা। আমাদের উপন্যাস সত্যিই অবিচিত্র, শ্বাস নেই। কেন এমনটা হল? আমার মনে হয় বাংলা ভাষায় এখনও পর্যন্ত দৃঢ় ভাবে যুক্তিতর্ক চুলচেরা বিচার চালাবার মত জোর আসেনি। আরও আসেনি আমাদের মধ্যে নূতন মহাদেশ খুঁজবার আত্যন্তিক তাগিদ যা উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর য়ুরোপীয় সাহিত্যিক শিল্পীদের পাগল করেছে, ব্যতিব্যস্ত করেছে। ছুটে ছুটে বেরিয়েছেন তাঁরা এখান থেকে ওখানে, কোথায় নয়, কেবলই নতুনের সন্ধানে। তাই জন্মও নিয়েছে হাজারো রকমের মতবাদ। নিত্য নূতন সংশয়বাদী সেখানে দৃপ্ত সৃষ্টিকর্মের মধ্যে দিয়ে উৎরে যাচ্ছে। এর কারণও আছে, সেখানে বয়ে গেছে তিন তিনটে বিপ্লব—সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক। তারও পরে এসেছে রুশ বিপ্লব ও যুদ্ধোত্তর কালের নানানতর ভাবনা ও তার প্রতিক্রিয়া। এই হিসেবে দেখতে গেলে আমাদের উপন্যাসগুলো প্রায়শঃই অ-বিচিত্র ও শ্বাসহীন। এবং এ ধরণের বিচার আমাদের করতেই হবে। কেন না, ভারতবর্ষটা পৃথিবী ছাড়া নয়।

ধূর্জটিপ্রসাদ এই চেতনায় কাজ করেছিলেন। উনিশ শ কুড়ি বাইশ সালে তিনি প্রুস্ত পড়া শেষ করেছিলেন। তিরিশ সাল নাগাদ তাঁর ছোট গল্পের বই 'রিয়ালিষ্ট' বেরোল। হেনরি জেমস, ভার্জিনিয়া উলফও তাঁর মনে ছায়া ফেলেছিল। কিন্তু ছায়া মাত্র, প্রভাব নয়। তিনি লিখতে সুরু করলেন। কিন্তু এসব লেখা ছিল অন্য ধরণের, অন্য রকমের। তিনি তাঁর নিজের লেখা সম্বন্ধে এক জায়গায় বলেছেন……"বাস্তবিক পক্ষে কখনই আমার কোনো রচনার পিছনে লোকে যাকে প্রেরণা বলে তা ছিল বলে মনে পড়ে না। সবই প্রায় খোঁচা খেয়ে লেখা। হয় বুদ্ধিগত, কারুর সঙ্গে মতের মিল হয়নি, না হয় ব্যক্তিগত, কেউ আঘাত করেছেন। সেই জন্য আমার রচনার ধর্ম পাল্টা জবাবের, ডায়লগের। নিজের থিসিস নেই। সব ক্ষেত্রে মতও হয়তো নেই। তবে মন আছে এবং সে-মন বিচারে সদাই তৎপর। ব্যস্, ঐ টুকু, তার বেশিও নয়, আশা করি, কমও নয়।"

তাঁর সঙ্গে আলাপ করার সময় লক্ষ্য করেছি তাঁর মন কত সূক্ষ্ম দ্রুত এবং ক্ষুরধার। এ রকম হৃদয় বুদ্ধি সঞ্জাত সচেতন মন এদেশে প্রায় দুর্লভ বললেই চলে। অনেকটা যেন বার্নার্ড শ'য়ের মত—শানিয়েই আছেন। কেটে দিলেই হল। বেশীর ভাগ লোকেরই হয়ত এটা ভালো লাগে না। অন্ততঃ স্বদেশীয়দের কাছে। ধূর্জটিপ্রসাদেরও অবস্থা খানিকটা সেই রকমের।

বাংলাদেশের বাইরে তাঁর অনেকটা সময় কেটেছিল। অনেক কিছু তাঁকে লিখতে হত ইংরেজীতে। বাংলা থেকে নিজেকে ক্রমে গুটিয়ে নিলেন। এ সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, "......আমি "রিয়ালিষ্ট" বলে একটা ছোট গল্পের বই বার করি। রবীন্দ্রনাথ সে সম্বন্ধে একটা বড় প্রবন্ধ লেখেন। সেটা কেউ পড়ে না। কেন? এর কারণ কি বুঝি না। একটা কারণ যে আমি লেখা নিয়ে পড়ে থাকিনি। লিখেছি, আর ফেলে দিয়েছি। প্রথম অধ্যাপক, পরে সাহিত্যিক। দেখি কি হয় আবার!"

তাঁর সম্বন্ধে বাংলাদেশের পাঠক সাধারণের কেন এই উদাসীনতা? আমার মনে হয় এজন্যে দায়ী তাঁর রচনার ভঙ্গী, মেজাজ আর মুখোশ। কবি ইয়েটস্ সম্বন্ধে বলা হয়েছে: "Yeats has obviously, a tremendous range of gait." ধূর্জটিপ্রসাদ সম্বন্ধেও একথা বিশেষ ভাবে প্রযোজ্য। তাঁর মননশীলতা সামাজিক সচেতনতা সূক্ষ্মতা তাঁর প্রত্যেকটি রচনায় ছড়িয়ে আছে। এ কথার প্রমাণ মিলবে তাঁর "বক্তব্য," "আমরা ও তাঁহারা"য়। প্রবন্ধগুলো গুরুগম্ভীর নিশ্চয়ই। কিন্তু প্রত্যেকটি প্রবন্ধ স্বকীয়তায় উজ্জ্বল ও ধারালো। আবার 'মনে এলো'তে ধরা দিয়েছেন নিজেকে অন্যভাবে। 'একলা খাবার টেবিলের ধারে বসে নিজের সঙ্গে যা কথোপকথন করেছি এ খানিকটা তাই।' অথচ, 'মনে এলো'তে যে পর্যায়ের সাহিত্য সৃষ্টি হয়ে উঠেছে তা আশ্চর্য রকমের সুন্দর। সহিতত্ব সম্পাদন করছি যদি সাহিত্যের মুখ্য কর্ম হয় তবে "মনে এলো"তে লেখক ও পাঠক মুখোমুখি বসে বয়স্কের মত আলোচনা করছে। কে লেখক আর কে পাঠক ভুলেই যেতে হয় পরে। ওটাই তাঁর ত্রুটি। আবার ওটাই তাঁর গুণ। পাঠককে তিনি এক মুহূর্তের জন্যেও নাবালক ভাবেন না। পাঠককে সাবালকের ভূমিকায় দাঁড় করিয়ে রেখে তিনি বলে যান।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন "......সাহিত্য সাবালকের সাহিত্যই হোক, কাঁটায় ভয় করব না যদি তাতে পুরো মাছটাকেই পাওয়া যায়।" ধূর্জটিপ্রসাদের লেখা কাঁটাসুদ্ধ মাছ। নিজে হাতে যত্ন করে কাঁটা বেছে নিতে পারলে পুরো মাছটা খাওয়ার আনন্দ পাওয়া যায়, এবং সেজন্য বৈদ্যুতিক আলোরও বিশেষ প্রয়োজন হতে পারে। মিটামিটে প্রদীপের আলোয় চলবে না। ধূর্জটিপ্রসাদের সাহিত্য নতুন যুগ বহন করে এনেছে। এনে দিয়েছে মহাজীবন পিপাসার একটা আকাঙ্ক্ষা, একটা অনন্যসাধারণ প্রেরণা।

অজিত মুখোপাধ্যায়

নাট্যকার সিনজ্

"And that inquiring man John Synge comes next
That dying chose the living world for text,
And never could have rested in his tomb
But, that, long-travelling, he had come
Towards nightfall upon certain set apart
In a most desolate stony place.
Towards nightfall upon a race
Passionate and simple as his heart."

—W. B. YEATS

১৯০৯ সালের মার্চ মাস। সময় সকাল। প্রাতরাশে বসেছেন আইরিশ কবি য়েটস্ আর তাঁর বোন লোলি। লোলি রাত্রে স্বপ্ন দেখেছেন—ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ উত্তাল তরঙ্গসঙ্কুল সমুদ্রের বুকের ওপরে ছোট্ট একখানা জাহাজ তীরের দিকে এগিয়ে আসার চেষ্টা করছে আর ঝড় ক্রুদ্ধ আক্রোশে বার বার তাকে সমুদ্রের বুকে ঠেলে দিচ্ছে। হঠাৎ অভাবনীয় কাণ্ড ঘটে গেল। লোলি দেখতে পেলেন যেন কোনো যাদুমন্ত্রবলে জাহাজখানি সমুদ্রের বুক থেকে সূর্যালোকিত তীরে এসে পৌঁছেচে।

* আইরিশ নাট্যকার জন সিঙ্গ এদেশে সিনজ নামেই তাঁর প্রসিদ্ধি। তাই সিঙ্গের পরিবর্তে 'সিনজ' উচ্চারণটি ব্যবহার করা হয়েছে—লেখক ॥

স্বপ্ন শুধু স্বপ্নই। কিন্তু লোলি তাঁর স্বপ্নে দেখা জাহাজের তীরে পৌঁছানোর বৃত্তান্ত জন মিলিংটন সিনজে্‌র আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে যাওয়ার ইঙ্গিত হিসেবেই ভাই য়েটসকে বলেছিলেন। লোলির স্বপ্ন অবশ্য বাস্তবে রূপান্তরিত হয় নি। সিনজ্‌ তার আগেই ২৪শে মার্চ সকাল সাড়ে পাঁচটায় এলপিস হাঁসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

আয়ারল্যাণ্ডের বিগত দিনের পল্লীগাথা, রূপকথা এবং সংস্কৃতি পুনরুজ্জীবিত করা ও সাহিত্যে সেই ভাবধারাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে যে জাতীয় আন্দোলন সুরু হল তার নেতৃত্বে এলেন য়েটস্‌, জর্জ মুর এবং আরও অনেকে। অন্যদিকে উইলি এবং ফ্রাঙ্ক ফে আয়ারল্যাণ্ডের জাতীয় নাট্যশালার গোড়া পত্তন করলেন। ফে ভ্রাতৃদ্বয় বিশ্বাস করতেন যে জাতীয় থিয়েটার গঠন করতে গেলে তা আয়ার-ল্যাণ্ডের কবি, সাহিত্যিক, নাট্যকার, অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের দিয়েই করতে হবে। ইতোমধ্যে তাঁরা হাইডের 'গেল' ভাষায় লেখা নাটকের অভিনয়ের মাধ্যমে তাঁদের দলকে শিক্ষিত করে তুলেছিলেন। তাঁদের তখন একমাত্র প্রয়োজন ছিল আয়ারল্যাণ্ডের জাতীয় জীবন নিয়ে লেখা নাটকের। জর্জ রাসেল এবং য়েটসের লেখা নাটক দিয়েই অ্যাবে থিয়েটার কোম্পানীর পত্তন হল। সিনজ্‌ শুধুমাত্র এই আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন না—জাতীয় জীবনভিত্তিক নাটক রচয়িতাদের মধ্যে তিনিই ছিলেন সর্বপ্রধান।

১৮৭১ সালের ১৬ই এপ্রিল বর্তমানে ডাবলিন শহরের শহরতলী অঞ্চলে নিউটন ভিলায় সিনজে্‌র জন্ম হয়। নিজের বাল্যকাল সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে তিনি তাঁর ডায়েরীতে লিখেছেন যে তাঁর মা পাঠপর ফলে যে অশেষ নরক যন্ত্রণার কথা বলতেন তা তাঁর মনে এমনভাবে গেঁথে যায় যে কুসংস্কার মতে প্রথাগুলোও এর থেকে বেশী ক্ষতি করতে পারত না। আবার নিজে ক্রমাগত অসুখে ভুগতেন বলেই মনে মনে ভাবতেন যদি অসুস্থ পিতামাতার সন্তান জন্মসূত্রে অসুস্থ হয় তবে তিনি কখনও বিয়ে করবেন না। সিনজে্‌র এই রুগ্নতা, ভাবালুতা এবং স্নায়বিক দৌর্বল্য তাঁকে নিঃসন্দেহে এমন এক কল্পলোকে পৌঁছে দিত যেখানে তিনি আয়ারল্যাণ্ডের অতীত দিনগুলির মধ্যে ফিরে যেতেন। বাল্যসঙ্গিনী ফ্লোরেন্স রসকে নিয়ে পোষা খরগোস, পায়রা, গিনিপিগ, ক্যানারী পাখী ও কুকুরের তত্ত্বাবধান করা আর বর্ষামুখর দিনগুলিতে কপিবুকে ঐ গৃহপালিত জীবগুলির ছবি আঁকার ফাঁকে তাঁর কল্পনার যে প্রথম কুঁড়ির উদ্গম হয় পরবর্তীকালে আরাম দ্বীপপুঞ্জের সম্পূর্ণ

নতুন ও অপরিচিত পরিবেশে তার পূর্ণ বিকাশ হয়। রুক্ষ, কঠোর এবং সভ্য জগতের সঙ্গে প্রায় সম্পর্ক বর্জিত এই দ্বীপপুঞ্জ ও সেখানকার অধিবাসীদের জীবনযাত্রা, সামাজিক আচার-ব্যবহার, ধর্মীয় বিশ্বাস এবং সংস্কার নিয়ে লেখা তাঁর 'দি আরান আইল্যাণ্ডস' এ তিনি সেখানে যা দেখেছেন তার বিন্দুমাত্র পরিবর্তন না করে বর্ণনা করেছেন। গেল জাতি এবং ভাষার শেষতম সাক্ষী ঐ দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীদের যে বর্ণনা সিনজ্ করেছেন তার ঐতিহাসিক এবং সাহিত্যিক মূল্য নিঃসন্দেহে তর্কাতীত। তাঁর চরিত্রের এই সুকুমার দিকটিই আবার দুঃস্থ জনগণের প্রতি সমবেদনায় বারবার কেঁদে উঠত। ১৮৮৫ সালে যখন তাঁর ভাই এডওয়ার্ড সিনজ্ ক্যাভাস, মেও এবং উইক্লোতে প্রজাদের উচ্ছেদ করছিলেন সিনজ্ তার প্রতিবাদ করেন। তাঁর 'দি ইমারজেন্সি ম্যান' কবিতা (১৯০৫) এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ১৮৯২ সালে ১৫ই ডিসেম্বর তিনি ডিগ্রী পরীক্ষায় পাশ করেন। ট্রিনিটি কলেজে পড়ার সময় থেকেই সঙ্গীতের প্রতি তাঁর অনুরাগ জন্মায়। কলেজ জীবন শেষ করার পর তিনি বেশ কিছুদিন সঙ্গীতের চর্চা করেন। হয়ত জীবিকার অবলম্বন হিসেবে তিনি সঙ্গীতকেই পেশা হিসেবে গ্রহণ করতেন কিন্তু ঐ সময়ের একটি ঘটনায় তাঁর জীবনের গতি অন্য খাতে মোড় নিয়ে ছিল।

১৮৯৩ সালে সিনজ্ তাঁর দূর সম্পর্কের বোন, পেশাদার পিয়ানো বাদিকা মেরী সিনজে্র পরামর্শে সঙ্গীতে উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্যে জার্মানী যাওয়া স্থির করলেন। মেরী এপ্রিলের শেষাশেষি লণ্ডন অভিমুখে যাত্রা করলে সিনজ্ লণ্ডনে তাঁর সঙ্গে জুলাই-এ মিলিত হবেন এবং সেখান থেকে দুজনে কবলেনজের কাছে রাইন নদীর দ্বীপ ওবেরওয়েরথের পথে যাত্রা করবেন এই স্থির হল।

বাল্যসঙ্গিনী ফ্লোরেন্স রস ছাড়াও উইকলো কাউন্টির কাছাকাছি গ্রে ষ্টোনে গ্রীষ্মের ছুটির অবকাশে সমবয়সী চেরী ম্যাথেসনের সঙ্গে সিনজে্র পরিচয় হয়। পরবর্তীকালে ম্যাথেসন পরিবার সিনজ্ পরিবারের প্রতিবেশী হলে সিনজ্ ও চেরীর প্রেম হয়। চেরীর বাবা ছিলেন ধর্মের দিক থেকে অত্যন্ত গোঁড়া, আর সিনজে্র প্রকৃতি ছিল তার বিপরীত। ফলে চেরী শেষ পর্যন্ত তাঁকে বিয়ে করতে অস্বীকার করেন। সিনজ্ প্রথম থেকেই ব্যর্থতা আঁচ করতে পারলেও অনেক দেরীতে তা মেনে নেন। যাই হোক, মা, ভাই, বোন, ঘরবাড়ী, পরিচিত পরিবেশ সব ছেড়ে সিনজ্ ২৯শে জুলাই ওবেরওয়েরথে পৌছলেন। মেরীর সহায়তায় তিনি রাইন নদী তীরে ভন আইবানদের

বোর্ডিং হাউসে থাকা সাব্যস্ত করলেন। সঙ্গীতচর্চার ফাঁকে ফাঁকে মনে পড়ে ফেলে আসা দিনগুলির কথা, মায়ের কথা, চেরীর কথা। কথায় কথায় আইকন পরিবারের কনিষ্ঠা কন্যা ভ্যালেস্কাকে তাঁর ব্যর্থ প্রেমের কথা সিনজ্ বলেন। ১৮৯৪ সালের ২২শে জানুয়ারী সিনজ্ ওবেরওয়েরথ থেকে উরজবার্গে চলে আসেন। সঙ্গীতচর্চা ছাড়াও ঐ সময়ে তিনি কবিতা রচনা আরম্ভ করেন এবং একটি নাটকের খসড়াও করেন।

সঙ্গীতের পরিবর্তে সাহিত্যকে অবলম্বন করার সিদ্ধান্তের কোনো নজীর তাঁর ডায়েরী বা চিঠিতে না পাওয়া গেলেও উরজবার্গে থাকাকালীন তিনি নিজেকে সাহিত্যের পথে তৈরী করছিলেন। তাঁর লেখা থেকে এই কথাই প্রতীত হয় যে তাঁর দৃঢ় ধারণা হয়েছিল যে তিনি কোনদিনও দর্শকদের সামনে বাদক হিসেবে সাফল্য লাভ করতে পারবেন না। আবার সঙ্গীত রচনার ক্ষেত্রেও তাঁর প্রতিভা সীমাবদ্ধ। প্রায় তিরিশ বছর পরে লেখা চেরীর (তখন তিনি মিসেস চেরী হরটন) স্মৃতিকথায় জানা যায় যে সিনজ্ নাকি তাঁকে বলেছিলেন যে তিনি সঙ্গীতকেই পেশা হিসেবে নিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর ডাবলিনের শিক্ষক তাঁকে বলেছিলেন যে যথেষ্ট মানসিক দৃঢ়তা না থাকার ফলে তিনি কোনোদিনই সাফল্যলাভ করতে পারবেন না। যাই হোক ১৮৯৪ সালে গ্রীষ্মের শেষে তিনি সঙ্গীতচর্চা ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন। ঐ বছরই অক্টোবর মাসে সরবনে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদেশী ভাষা শিখবার জন্যে প্যারিসের পথে রওনা হলেন। সঙ্গীত ছাড়লেও কিন্তু সিনজ্ চেরীর আশা ত্যাগ করতে পারলেন না। সরবোনেতে শিক্ষা শেষ করে তিনি দেশে ফিরলেন এবং কন্টিনেণ্টে যাওয়া স্থির করে ইতালীয় ভাষা শিখতে সুরু করলেন। ইতালী যাওয়ার আগে সিনজ্ আর একবার চেরীর মন জয়ের ব্যর্থ চেষ্টা করেন। ১৮৯৬ সালে ৩রা ফেব্রুয়ারী তিনি ইতালীর পথে প্যারিস থেকে যাত্রা করেন। ঐ বছরই জুন মাসে ফ্লোরেন্স থেকে ফিরে আসার পথে প্যারিসে থাকাকালীন চেরীর কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠান। চেরী উত্তরে কি লিখেছিলেন জানা যায় না তবে সিনজ্ তাঁর ডায়েরীতে লিখেছিলেন— প্রত্যাখ্যান। বার বার চেরীকে জয় করার ব্যর্থ চেষ্টার পর সিনজ্ ১৮৯৬ সালের অক্টোবর মাসে প্যারিসে চলে আসেন। মেসফিল্ড লিখেছেন— মেয়েদের সঙ্গে কথাবার্তায় সিনজ্ হাল্কা ও আনন্দময় পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারতেন। নারী চিত্তজয়ের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তিনি কেন যে চেরীর ভালবাসা পেলেন না, ভাবতেও আশ্চর্য হতে হয়।

প্যারিসে থাকাকালীন সিনজের সঙ্গে য়েটস্ এবং আইরিশ লীগের নেত্রী মিস মদগনের পরিচয় হয়। তিনি আইরিশ লীগের সদস্যও হন কিন্তু কিছুকাল পরেই ঐ পদ ত্যাগ করেন। অন্যদিকে সাহিত্যক্ষেত্রে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার অদম্য অধ্যবসায় সুরু করেছেন তিনি। কিন্তু সবই ব্যর্থ হল। পাঁচ বছর ধরে ক্রমাগত চেষ্টা করেও কলেজ ম্যাগাজিনে একটিমাত্র কবিতা ছাড়া অন্য কোথাও তাঁর লেখার একটি লাইনও ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হল না। য়েটস্ বলেছিলেন আরান দ্বীপপুঞ্জে আইরিশ ভাষাভাষী চাষীদের মধ্যে গিয়ে বাস করতে। সিনজের কবিতার মধ্যে তিনি কোনো প্রতিশ্রুতির ছাপ দেখতে পান নি। তিনি ভেবেছিলেন যদি আরান দ্বীপপুঞ্জে সিনজ্ লেখার উপাদান হয়ত খুঁজে পাবেন না। য়েটস্ নিজে এর আগে তাঁর 'দি স্পেকলড্ বার্ড' উপন্যাসের জন্যে আরান দ্বীপপুঞ্জে গিয়েছিলেন। জন ও'লিয়েরিকে লেখা এক চিঠিতে তিনি এই দ্বীপপুঞ্জকে আয়ারল্যাণ্ডের পরীর রাজ্য বলে অভিহিত করেছেন।

শুধু য়েটসের পরামর্শই নয়—যে জীবনদেবতা তাঁর মাত্র আটত্রিশ বছরের জীবনকে অশান্ত এক ঝড়ের তাড়নায় আয়ারল্যাণ্ড থেকে জার্মান, প্যারিস এবং রোম, আবার সেখান থেকে প্যারিসের পথে পথে বোহেমিয়ান করে তুলেছিলেন সেই জীবন দেবতাই তাঁকে আবার আরান দ্বীপপুঞ্জে নিয়ে এলেন। জমিদার নন্দন সিনজকে তাই বংশানুক্রমিক ধন অন্বেষণ ও প্রজাপীড়নের পথ থেকে সরে এসে আরান দ্বীপপুঞ্জের জেলের কুটিরে বাস করতে দেখা যায়।

প্যাট ডাইরেনের কাছে শোনা বহু গল্পের উল্লেখ তিনি তাঁর 'দি আরাম আইল্যাণ্ডস'-এ করেছেন। তাঁর কাছেই শোনা গল্পের ওপর ভিত্তি করে সিনজের প্রথম নাটক 'ইন দি শ্যাডো অফ দি গ্লেন' (১৯০৫)। নাটকের বিষয়বস্তু হল একটি লোক মরার ভান করে পড়ে থেকে দেখতে চাইছে তার স্ত্রী তার মৃত্যুর পর তার স্মৃতির প্রতি বিশ্বস্ত থাকবে কি না। 'দি ইউনাইটেড আইরিশম্যান' এর সম্পাদক আর্থার গ্রিফিথ অবশ্য সিনজ্ রোমান লেখক পেট্রোনিয়াসের গল্প আয়ারল্যাণ্ডের চাষীদের ঘাড়ে চাপাচ্ছেন বলে তীব্র আক্রমণ করেন। কিন্তু এই নাটকের বিষয়বস্তু পশ্চিম ইউরোপের বিখ্যাত লোকগাথাগুলির অন্যতম যা সিনজ্ প্যাট ডাইরেনের মুখেই শুনেছিলেন। প্যাট ডাইরেনের কাছে শোনা আর একটি গল্পের নায়িকা এক বিশ্বস্তা স্ত্রী। এই গল্পে দুটি বিষয় একই সঙ্গে গাঁথা আছে। একটি 'মার্চেণ্ট অফ ভেনিস' খ্যাত। নির্দিষ্ট সময়ে ঋণশোধ না করতে পারলে বুকের মাংস কেটে দেওয়ার

চুক্তি আর একটি লোককাহিনী কৃষক গ্রিসেলডার গল্প—সেখানে এক প্রতি প্রাণা স্ত্রীর কঠোর পরীক্ষার কথা বলা হয়। সিনজ্ এই গল্প অবলম্বনে একটি নাটকের চিত্রনাট্য রচনা করেছিলেন।

তাঁর দ্বিতীয় নাটক 'রাইডারস টু দি সী' (১৯০৫)। এইটিই তাঁর প্রথম বিয়োগান্তক নাটক। ডোনেগালের উপকূলে একটি মৃতদেহ ভেসে ওঠায় তার কিছু পোষাক ইনিশমানে আনা হয়। পোষাকগুলো ঐ গ্রামের যে অধিবাসীটি নিখোঁজ হয়েছে তার না দক্ষিণ দ্বীপের আর কারও তা নিয়ে গ্রামবাসীরা তিন দিন ধরে তর্ক বিতর্ক করে। সিনজ ম্যাকডনো কুটিরে ইনিশমানের মৃত লোকটির মায়ের বিলাপ শোনেন। একই সঙ্গে লক্ষ্য করেন যে অত্যন্ত নিকট আত্মীয় ছাড়া দ্বীপের অধিবাসীদের কাছে কারও মৃত্যু সামান্য ঘটনা ছাড়া কিছুই নয়। বাবা আর তার দুই বড় ছেলে অথবা পরিবারের কর্মক্ষম সমস্ত পুরুষ মানুষের এই জাতীয় দুর্ঘটনায় মৃত্যু এ দ্বীপের অধিবাসীদের কাছে অতি পরিচিত ঘটনা। এই ঘটনা থেকে 'রাইডারস টু দি সী'র জন্ম। কিন্তু কেবল মাত্র এই ঘটনাই সিনজকে ঐ নাটক লেখায় উদ্বুদ্ধ করেছিল এ ধারণা করা ভুল। ঐ সময়ে তিনি কীটিংসের 'হিস্ট্রি অফ আয়ারল্যাণ্ড' পড়ছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীর সেই আধা-ইতিহাস আধা রূপকথার পাতা থেকে সিনজ্ তাঁর নাটকের বিষয় খুঁজে পান।

আরান দ্বীপপুঞ্জে যে জীবনকে সিনজ্ প্রত্যক্ষ করেছিলেন সে জীবন আয়ারল্যাণ্ডের প্রকৃতির বুক থেকে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া জীবনের ক্ষীণতম স্পন্দন। সভ্যতার আলোকবর্জিত, আদিম প্রবৃত্তির তাড়নায় তাড়িত মানুষের সঙ্গে সমুদ্রের প্রতিনিয়ত যে সংগ্রাম তার ভেতরেই সিনজ্ মানুষের জীবনে প্রকৃতির অস্তিত্বের মৌলিক প্রয়োজন সম্ভবতঃ সর্বপ্রথম অনুভব করেন। যে প্রকৃতিকে তিনি দেখেছিলেন সে প্রকৃতি কখনো বা দুর্বার সংহার মূর্তি ধারণ করে মানুষের সব চেষ্টাকে ধূলিসাৎ করে দিতে বদ্ধপরিকর, আবার কখনো বিগলিত করুণার মূর্তপ্রতীক হয়ে জীবপালিনীরূপে দণ্ডায়মান। ওয়ার্ডস-ওয়ার্থের ক্ষেত্রে যেমন তেমনি করেই সিনজের সংবেদনশীল মনে প্রকৃতি সাড়া জাগাত। কিন্তু ওয়ার্ডওয়ার্থের মত কোনো দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তিনি প্রকৃতিকে দেখেন নি। তিনি আদিমরূপের মধ্যেই প্রকৃতিকে দেখেছেন।

দিগন্তবিস্তৃত সদাগর্জমান অতলান্তিক মহাসমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গমালা, বাতাসের সাঁই সাঁই ডাক, কখনো বা সে বাতাস আবার নীল আকাশের তলায় ঘুমিয়ে পড়া ফুলের মত শান্ত, আর ইতস্ততঃ অযত্নবর্ধিত গুল্মরাজি—এই

পরিবেশে দাঁড়িয়ে আছে আরান দ্বীপপুঞ্জের তিনটি দ্বীপ—ইনিসমোর, ইনিশমান ও ইনিশিয়ার। গ্রীষ্মের উজ্জ্বল দিনগুলিতে এই দ্বীপপুঞ্জ সূর্য কিরণে জ্বলজ্বল করে কিন্তু শীতের কুয়াসা যখন সমস্ত দ্বীপকে মুড়ে ফেলে তখন যেন মনে হয় মধ্যযুগীয় আইরিশ রূপকথায় বর্ণিত সমুদ্রের তলা থেকে উঠে আসা কোনো প্রেতাত্মা। মাটির চিহ্ন নেই কোথাও। চুনাপাথরে ভর্তি, রুক্ষ, অনুর্বর আরান দ্বীপপুঞ্জের তিনটি দ্বীপই পূর্বদিকের সমুদ্রের কোল থেকে উঠে ক্রমশঃ উন্নীত হতে হতে পশ্চিমের খাড়া পাহাড়ে এসে শেষ হয়েছে। সামান্য চাষবাস ও মাছ ধরাই একমাত্র জীবিকা। দ্বীপবাসীরা এবং তাদের জীবন-যাত্রা সিনজ্‌কে গভীরভাবে অভিভূত করে। চুনা-পাথরের ধূসর পটভূমিকায় ঘরে বোনা লাল ফ্ল্যানেলের স্কার্ট আর শাল গায়ে মেয়েদের বিবর্ণ চেহারা, আর ঘুঘুর গলার রংয়ের সোয়েটার গায়ে, ঘরে তৈরী পাজামা, ফতুয়া আর গরুর চামড়ার 'পামপুটি' জুতো পায়ে পুরুষের দল, পশ্চিম আয়ারল্যাণ্ডের ঐতিহ্যবাহী কাঠের তক্তা আর আলকাতরা মাখানো ক্যানভাসের তৈরী 'কুররাগ' (ডোঙ্গা), সমুদ্রের শ্যাওলা পুড়িয়ে খাড় তৈরী, মৃতের জন্যে বৃদ্ধারমণীদের একযোগে বিলাপ—এক কথায় আরান দ্বীপবাসীদের জীবনের প্রতিটি খুঁটিনাটির মধ্যেই সিনজ্‌ এক সত্যের আবিষ্কার করেন। একই সঙ্গে কৃষক আর জেলেদের ভাষা তিনি তাঁর লেখার মধ্যে ব্যবহার করেন। পরবর্তীকালে ঐ ভাষাই তিনি অভূতপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে তাঁর নাটকে ব্যবহার করেছিলেন।

সিনজের কাছে মেয়েরাই ছিল সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক। তাঁর ডায়েরী, নোটবুক মেয়েদের দৈহিক সৌন্দর্য, কমনীয় গতি ছন্দ ও রং বেরংয়ের পোষাকের কথায় ভরা। মেয়েদের সৌন্দর্যের কথা বলতে গিয়ে সিনজ্‌ একটি অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন। একদিন একটি মেয়ের বৃত্তাকারে সুন্দর মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকানোর ফলে মেয়েটি যখন বাদামী শালের ঘোমটার ফাঁকে তাঁর দিকে তাকায় অস্বস্তিতে সিনজ্‌ দৃষ্টি নীচু করেন। তিনি লিখেছেন যে সারাদিন পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন আর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে ফিরেছে সেই মুখ মনের পটে মুদ্রিত হয়ে। সে মুখে কুমারী মেরীর মুখের প্রতিভাস আবার উচ্ছল আনন্দের আবেগে সে মুখ উল্লসিত। সে মুখে র‍্যাফেলের শেষ জীবনের শিল্পের নিদর্শন। সিনজ্‌ এই মুখের তুলনা আর কোথাও পান নি।

ইনিসমোরে দু-সপ্তাহ থাকার পর তিনি ইনিশমানে আসেন। ঐ সময়ে প্রথম 'কুররাগে' চড়েন। 'কুররাগে' চড়ার সে এক অভূতপূর্ব আনন্দ। ইনিশমানে ম্যাকডনো কুটিরে থাকাকালীন বুড়ো প্যাট ডাইরেনের কাছে

সিনজ্ পুরান দিনের রূপকথা শুনতেন। ইনিশিয়ারেও জন জয়েস গল্প, ও রূপকথা বলতেন। এঁরা দুজনেই ছিলেন প্রাচীন কবি বংশ-সম্ভূত। তাঁরা গল্প বলার ধারাটিকে দক্ষতার সঙ্গে গল্প পরিবেশন করে অব্যাহত রেখেছিলেন। সিনজ্ বলেছেন যে এইসব গল্পগাথাই সমস্ত কথাশিল্পের উৎস। লিখিত সাহিত্য কথিত সাহিত্যের কাছে কতখানি ঋণী হতে পারে তা নিয়ে তিনি অনেক চিন্তাও করেছিলেন। এক প্রবন্ধে তিনি বলেছেন যে প্রত্যেক কবিতারই দ্বৈত সত্তা আছে—কবির কণ্ঠে আর পাঠকের কণ্ঠে। আধুনিক কবিতায় তিনি প্রাণশক্তির অভাব লক্ষ্য করে বলেছিলেন—এই কবিতায় কবির কণ্ঠস্বর না থাকায় এবং পাঠকের সামনে মুদ্রিত অক্ষর ছাড়া আর কিছু না থাকায়—এই কবিতা, পিষ্ট, গন্ধবিহীন, বিবর্ণ, আকারবিহীন ফুলের মত। কিন্তু যেখানে মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলন নেই—যেমন পশ্চিম আয়ারল্যাণ্ড কথকতার মাধ্যমে কবির কণ্ঠ প্রতিধ্বনিত হয়। প্যাট ডাইরেন আর জয়েসের গল্প বলার মধ্যে সিনজ্ এই জিনিষ খুঁজে পান। গেল ভাষা না বুঝলেও ঐ ভাষায় গাথা শুনতে শুনতে তাঁর চোখে জল এসে যেত।

'ইন দি স্যাডো অফ্ দি গ্লেন' এর অভিনয়ে আয়ারল্যাণ্ডে যে ঝড়ের সৃষ্টি হয়েছিল 'রাইডারস টু দি সী'র অভিনয় তা কিছুটা প্রশমিত করতে পারলেও সিনজ্‌কে এই নাটক দুটি প্রকাশের জন্যে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে হয়েছিল।

সিনজের তৃতীয় নাটক 'দি ওয়েল অব দি সেণ্টস' (১৯০৫)। এই নাটকের সমালোচনায় জর্জ মুর বলেছেন যে সংলাপ শুনলে মনে হয় গান শুনছি। তিনি আরও বলেছেন যে সিনজ্ 'বারবারাশ ইডিয়ম' এর মধ্যে এক মহান সাহিত্যের আবিষ্কার করেছেন। তবুও নাটকটি কোনো দিন জনপ্রিয়তা অর্জন করেনি।

পরবর্তী নাটক 'দি টিংকারস ওয়েডিং' (১৯০৮)। কয়েক বছর আগে উইকলোর একটি প্রকৃত ঘটনার ওপর ভিত্তি করে লেখা। কিন্তু নাটকটির অভিনয়ে যাজক সম্প্রদায় বিক্ষুব্ধ হবেন এই ভেবে অ্যাবে থিয়েটার কোম্পানী নাটকটি তখনকার মত মঞ্চস্থ করা স্থগিত রাখলেন।

'দি প্লে বয় অফ দি ওয়েষ্টারন ওয়ারল্ড' (১৯০৭) মিলনান্তক। মেওয়ের একটি প্রকৃত ঘটনা নিয়ে লেখা, সিনজ্ প্রথমবার আরান দ্বীপপুঞ্জে গিয়ে শোনেন যে কননে-মারায় একটি লোক হঠাৎ উত্তেজনার বশে কোদালের আঘাতে বাবাকে খুন করে ইনিশমানে পালিয়ে আসে এবং ঐ দ্বীপের

অধিবাসীদের দয়ার ওপর নিজেকে সঁপে দেয়। নাটকে বর্নিত জায়গাটির অধিবাসীরা চোরা কারবার করে। লোকটির আসার ফলে তারা সচকিত হয়ে ওঠে। লোকটি ফেরারী আসামী এবং যাতে সে আমেরিকা পালিয়ে যেতে পারে তাই দ্বীপবাসীদের কাছে আবেদন জানিয়েছে। কিন্তু তার ধারণা দ্বীপের অধিবাসীরা এত ধার্মিক যে শেষ পর্যন্ত তাকে ধরিয়ে দেবে। নাটকের শেষ দিকে লোকটির বাবা জীবিত অবস্থায় ফিরে এলে নাটকটি মিলনান্তক হয়।

সিনজ্ এই নাটকে আইরিশ পল্লীজীবনে যে ঐতিহ্যবাহী একটি ভাবধারাকে লক্ষ্য করেছিলেন তাই ব্যক্ত করতে চেয়েছেন। তিনি ডায়েরীতে লিখেছেন যে পশ্চিমের সমস্ত অধিবাসীদের মধ্যে দোষীকে আইনের হাত থেকে বাঁচানোর এক প্রবৃত্তি পরিলক্ষিত হয়। এর সঙ্গে ইংরেজের ন্যায়-বিচার ও শাসনের প্রতি ঘৃণা কাজ করলেও সিনজে্র মনে হয়েছিল কোনো এক আদিম মনোভাবই এর পেছনে কাজ করছে। এরা মনে করে মানুষ প্রবৃত্তির দ্বারা চালিত না হলে কখনও অন্যায় কাজ করতে পারে না। এবং সেই দুষ্ট প্রবৃত্তি সক্ষম সমুদ্রের ঝড়ের মতই সব অঘটনের জন্য দায়ী, তখন কেউ যদি তার বাবাকে খুন করে দুঃখে ভেঙ্গে পড়ে তবে তাকে আইনের হাতে তুলে দেওয়ার কোনো কারণই থাকতে পারে না।

এই নাটকটির অভিনয়ে কিন্তু দর্শকবৃন্দ বিশৃঙ্খলায় ভেঙ্গে পড়ে। সিনজ্কে 'ঈভিল জিনিয়স' আর য়েটস্‌কে তাঁর 'যোগ্য সহকারী' আখ্যা দেওয়া হয়। বিশৃঙ্খলা এত চরমে ওঠে যে থিয়েটার কোম্পানীকে পুলিশ ডাকতে হয়েছিল। য়েটস্ নাটকটি আলোচনার জন্যে বিতর্কসভা পর্যন্ত বসিয়েছিলেন এবং নিজে তাতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। জনসাধারণ এবং সংবাদপত্রগুলি বিরুদ্ধতা করলেও গুণগ্রাহীও অনেক ছিলেন। জর্জ মুর নাটকটির খুব প্রশংসা করে সিনজ্কে চিঠি দেন। মেসফিল্ড দর্শকদের নির্বুদ্ধিতার নিন্দা করেন। বন্ধু ম্যাককেনাও নাটকটির প্রশংসা করে সিনজ্কে উৎসাহিত করেন। শেষ পর্যন্ত য়েটসে্র উৎসাহে নাটকটির লণ্ডন অভিনয়ের পর থেকে সিনজে্র খ্যাতির পালা এবার সুরু হয়। তাঁর শেষ নাটক 'ডিইরডার অফ দি সরোজ' (১৯১০)।

১৯০৬ সাল। সিনজ এখন মোটামুটি ভাবে প্রতিষ্ঠিত। ইউরোপীয় রঙ্গমঞ্চে তাঁর দুটি নাটকের সাফল্যময় অভিনয় চলছে। ডাবলিনের ম্যনসেল এণ্ড কোম্পানীর সঙ্গে তাঁর 'দি আরান আইল্যাণ্ডস' প্রকাশের ব্যবস্থাও

হয়ে গিয়েছে। এছাড়া এক আমেরিকান আর একজন ইংরেজ প্রকাশকও পাণ্ডু-লিপি চেয়েছেন। সর্বোপরি তিনি এখন অ্যাবে থিয়েটারের অন্যতম পরিচালক।

অ্যাবে থিয়েটার কোম্পানীর ভাড়া করা অভিনেত্রী মলি অলগুডের সঙ্গে সিনজের প্রেম য়েটস্ এবং লেডি গ্রেগরীকে হতবুদ্ধি করে দেয়। সাহিত্যে তাঁর প্রতিষ্ঠা এবং অ্যাবে থিয়েটারের পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য হওয়া ছাড়াও সিনজের বংশগত আভিজাত্য এই প্রেমের পথে অন্তরায় ছিল। ধর্মের প্রতি গোঁড়া মনোভাব না থাকা আর রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করা তাঁর মা মেনে নিয়েছিলেন—তাই বলে রোমান ক্যাথলিক এক মেয়েকে সিনজ ভালবাসলেন, —তাও আবার সেই মেয়ে এককালে যে ডিপার্টমেণ্টাল স্টোরে সেলস গার্লের কাজ করত এবং বর্তমানে ভাড়া করা অভিনেত্রী—এ কখনও হতে পারে না। তবু তিনি মলিকে ভালবেসেছিলেন এবং মলিও তাঁকে ভালবেসে-ছিলেন। মলির সঙ্গে প্রেমের পথে সিনজের ব্যক্তিগত দুঃখই ছিল সবচেয়ে বড় বাধা, তাছাড়া তিনি যে মলির চেয়ে বয়সে অনেক বড় (সিনজের বয়স তখন পঁয়ত্রিশ আর মলির একুশেরও নীচে)। সিনজ তাঁর শেষ নাটকটিতে বৃদ্ধের বাগদত্তা যে তরুণীর আর এক যুবকের সঙ্গে প্রেমের কথা বলেছেন তা তাঁর নিজস্ব অনুভূতির তীব্রতা থেকে লেখা। যে বিষাদের সুর নাটকটির সর্বত্র ছড়িয়ে আছে তা যত না তার আসন্ন মৃত্যুর চিন্তাপ্রসূত তার চেয়েও বেশী মলির সঙ্গে তাঁর বিয়ে না হওয়ার পূর্বাভাষের।

আগামী দিনের রঙীন কল্পনায় বিভোর সিনজ প্রনয়িনী মলিকে নিয়ে ব্রে'তে বেড়াতে যান। পাহাড়ের মাথায় নিরালা কোনো লতাকুঞ্জের ছায়ায় দুজনে পাশাপাশি শুয়ে থাকেন আর তাকিয়ে থাকেন—নীল আকাশের বুকে। কখনও বা দৃষ্টি শস্যসবুজ প্রান্তরের ওপর দিয়ে দিগন্তে উধাও নীলাম্বুরাশিকে অনুসরণ করে। মলি ঘাসের বুক থেকে ছিঁড়ে নেওয়া 'ফ্রন' (এর আমেরিকান ব্লু বেরীর মত এক ধরণের ফল) গুচ্ছ থেকে নিজে দু' একটি খান আর গুঁজে দেন সিনজের ঠোঁটের ফাঁকে।

তবু এ প্রেমের কথা জানলে মা কি করবে ভেবে সিনজ আকুল হন। দুঃখকে বুকে পুষে রেখে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়ান আর মলিকে অজস্র চিঠি লেখেন। মাঝে মাঝে অসমাপ্ত নাটকের পাণ্ডুলিপি নিয়ে কঠোর পরিশ্রম করেন। শেষ পর্যন্ত মাকে চিঠি লিখে সব জানান। ছেলেকে কোনো মতেই ফেরান যাবে না দেখে শেষ পর্যন্ত মা মত দিয়েছিলেন। তাঁর বেচারা জনি যদি সুখী হয়। কিন্তু ভাগ্য বাদ সাধল।

১৯০৮ সালের ৩০শে এপ্রিল। সিনজ এলপিস হাসপাতালে ভর্তি হলেন। ৪ঠা মে তাঁর দেহে অস্ত্রোপচার হল। এই সময় তিনি মলিকে এক চিঠিতে লেখেন "……যদি কাল আমার ভালমন্দ কিছু একটা হয়ে যায় তাই তোমাকে বিদায় জানাচ্ছি।……" য়েটস্‌কে কাছে কিছু পাণ্ডুলিপি পাঠিয়ে দেবার জন্যে আর একটি চিঠিও লেখেন। তিনি কি বুঝতে পেরেছিলেন তিনি আর বাঁচবেন না। দু'দিন পরে মিসেস সিনজকে জানান হয় যে তাঁর ছেলের অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক। অ্যাবে থিয়েটারেও খবরটি ছড়িয়ে পড়ে। অপারেশন করেও নাকি টিউমারের বিনাশ করা সম্ভব হয় নি। সিনজের কাছে অবশ্য সব গোপন রাখা হয়েছিল। সে যাত্রা কিন্তু তিনি বেঁচে গেলেন আর ৬ই জুলাই হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন।

বাড়ীতে অসুস্থ মা, তার ওপরে মলি অভিনয়ের জন্যে ব্যস্ত থাকায় ইচ্ছানুযায়ী আসতে পারেন না। সিনজ এই নিঃসঙ্গতা সহ্য করতে না পারায় হঠাৎ জার্মান যাওয়া স্থির করলেন। জার্মানীতে থাকাকালীন তিনি মায়ের মৃত্যু সংবাদ পান। ৭ই নভেম্বর তিনি ডাবলিনে ফিরে আসেন। মায়ের সঙ্গে মতের পার্থক্য হওয়ার এবং তাঁর লেখক জীবন মাকে যে দুঃখ দিয়েছিল সিনজ সেই কথাই ভাবেন। কিন্তু তিনি শেষ পর্যন্ত ত ভাল ছেলে হতেই চেয়েছিলেন!

শরীর আবার ভেঙ্গে পড়ায় ২রা ফেব্রুয়ারী (১৯০৯) সিমজ শেষ বারের মত এলপিস হাসপাতালে ভর্তি হলেন। ১৪ই ফেব্রুয়ারী মলিকে অভিনয়ের জন্যে ম্যানচেষ্টার যেতে হয়। ২২শে তিনি যখন ফিরে এলেন তখন সিনজের শেষ মুহূর্তটি অতি কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। ২৫শে য়েটস্‌ তাঁর সঙ্গে শেষ বারের মত দেখা করেন। ঐ সময়ই সিনজের ভাই রবার্ট সামান্য অস্ত্রোপচারের জন্যে ১৫ই মার্চ এলপিস হাসপাতালে ভর্তি হন। ২১শে মার্চ তিনি সিনজের সঙ্গে দেখা করেন এবং ডায়েরীতে লেখেন যে জনের (সিমজের) অবস্থা খারাপ। মলি পাগলের মত রোম্যান কাথলিক পাদরীদের কাছে গিয়ে সিনজের আরোগ্য কামনায় উপাসনার কথা বলেন। কিন্তু প্রোটেষ্ট্যান্ট সিনজের জন্যে এই ব্যবস্থা করতে তাঁরা রাজী হন না। ২৩শে মার্চ ভাগনে এডওয়ার্ড ষ্টিসেম তাঁকে দেখতে আসেন। সিনজের অনুরোধে ভাই রবার্ট এক বোতল শ্যাম্পেন কিনে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। শ্যাম্পেন পান করতে করতে সিনজ এডওয়ার্ডকে জিজ্ঞাসা করেন যে সে এর মধ্যেই ব্ল্যাকবার্ডের গান শুনেছে কিনা?……এডওয়ার্ড বুঝতেও পারেন নি যে তাঁদের এই সাক্ষাৎকারই শেষ

সাক্ষাৎকার। ২৪শে মার্চ টেলিগ্রাম করে ষ্টিফেনদের জানিয়ে দেওয়া হয় যে সব শেষ হয়ে গেছে।

সিনজ একবার তাঁর নোটবুকে লিখেছিলেন সে প্রতিভাই সব নয় যদি সেই প্রতিভা সমসাময়িক যুগ এবং জীবনকে সম্যক উপলব্ধি করতে না পারে। তার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিয়ে না চলতে পারে। আয়ারল্যাণ্ডের ইতিহাসের এমন এক যুগসন্ধিক্ষণে তাঁর আবির্ভাব যখন মাঝারি ধরনের লেখকেরাও জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজেদের ক্ষমতার তুলনায় উন্নত সাহিত্য রচনা করেছিলেন। কিন্তু যে-জাতীয়তাবাদের আহ্বানে সারা আয়ারল্যাণ্ড জ্বলে উঠেছিল সিনজ তাতে প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ করলেন না। সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে দিয়েই দেশের সেবা করতে চাইলেন। তাঁর সম্বন্ধে য়েটস্ বলেছেন "I am certain that my friend's noble art is the Victory of a man who in proverty and sickness created from the delight of expression." সমসাময়িক যে কোনো সাহিত্যিকের রচনার চেয়ে তাঁর রচনায় হারিয়ে যাওয়া "গেল" জাতির অতীত ঐতিহ্যের সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন—যা আইরিশ রেনেসাঁর লক্ষ্যই ছিল—অনেক বেশী পরিমানে পরিদৃষ্ট হয়।

বাংলার নাট্যশালা ॥

বাংলার নাট্যশালা এখনও সর্বাঙ্গীন উন্নতিলাভ করেনি। জগতের শ্রেষ্ঠ জাতিদের নাট্যশালার সঙ্গে হয়ত আমাদের রঙ্গমঞ্চ এখনও অনেক বিষয়ে তুলনীয় নয়। কিন্তু জাতির পরিচয় তার রঙ্গমঞ্চে, সুতরাং জগতে বড় জাতি বলে পরিচিত হতে হলে উন্নত নাট্যশালার প্রয়োজন। নাট্যশালাকে উন্নত করতে হলে সর্বাগ্রে মনের ভিতর থেকে নাট্যশালা সম্বন্ধে যে অনুদার ভাব আছে তাকে দূর করা দরকার। নাট্যশালা জাতীয় সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। এই নাট্যমঞ্চে এসে সকল কলা মিলিত হয়। নৃত্যগীত, অভিনয়, সাহিত্য, ইতিহাস, নাট্যে সকলেরই বিকাশ। সর্বজাতির শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকেরা নাট্যকার। সাহিত্যের মুকুটমনি নাট্য। অভিনয় ব্যতিরেকে নাট্য সম্পূর্ণ হয় না। অতএব নাট্যশালার উৎকর্ষ আমাদের জাতীয় প্রয়োজন।

—শিশিরকুমার ভাদুড়ী

বিদেশী নাটিকা

মূল রচনা—জন্ গল্‌স্‌ওয়ার্দি
অনুবাদ— বিজন ঘোষ

পরাজয়

সময় : প্রথম মহাযুদ্ধকালীন একটি সন্ধ্যা ॥

[গ্যাসের মৃদু আলোয় আলোকিত একটি নির্জন কক্ষ, এই কক্ষের দেওয়ালগুলি এবং আসবাবপত্র থেকে সবুজ রঙের আভাষ পাওয়া যাচ্ছে। কক্ষটির বাঁদিকে অগ্নিকুণ্ড, টেবিলের ওপর একটি পাত্রে ছোট একটি ফার্ণ গাছের চারা—সবুজ এবং সতেজ। ডানদিকে একটি দরজা। সেই দরজা দিয়ে একটি মেয়ে ও সামরিক খাঁকী উর্দি পরা একজন অল্পবয়স্ক অফিসারের প্রবেশ। মেয়েটির পরিধানে কালো রঙের পোষাক, মাথায় টুপি মুখে অবগুণ্ঠন এবং হাতে হলুদরঙের দাগ-ধরা দস্তানা। অফিসারটি বেশ লম্বা গড়নের—তার মুখখানি বেশ সরল কিন্তু তেজোব্যঞ্জক। তার নীল চোখদুটিতে সদয়, উৎসুক দৃষ্টি। অফিসারটি সামান্য খঞ্জ।

মেয়েটি ঘরের গ্যাসের আলোটা জোর করতে গিয়ে কি ভেবে জানালার পর্দাটা সরিয়ে দিয়ে জানালাটা খুলে দিল। খোলা জানালা দিয়ে কামরার মধ্যে ঢুকে পড়ল উজ্জ্বল চাঁদের আলো। বাইরে অদূরে ছোট পার্কের গাছগুলি দেখা যাচ্ছে। মেয়েটি কিছুক্ষণ বাইরে তাকিয়ে রইল। পরে হঠাৎ একটা কাঁপুনি অনুভব ক'রে কামরার ভিতরের দিকে চ'লে এল।]

অফিসার—কী হয়েছে তোমার, বলতো। যখন তোমার সঙ্গে পথে আলাপ হল তখন তুমি কেঁদেছিলে—না ?

মেয়েটি—(একটু সামলিয়ে নিয়ে)—ও কিছু না। আজকের সন্ধ্যেটা বেশ চমৎকার লাগছে তাই……।

অফিসার—(মেয়েটির দিকে চেয়ে)-মন-মরা হ'য়ে থেকো না—একটু প্রফুল্ল হও।

মেয়েটি—(টুপি ও অবগুণ্ঠন খোলে ; তার হলদে রঙের কোঁকড়া চুল নজরে পড়ে)—প্রফুল্ল হবো! তোমাকে তো আর আমার মতো একলা-একলা দিন কাটাতে হয় না।

অফিসার—(খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে জানালার কাছে যায়—তার মুখে দেখা দেয় সন্দেহের রেখা)—আচ্ছা, তুমি এ-পথে এলে কী ক'রে ? এ-ধরণের জীবন কি হতাশাময় নয় ?

মেয়েটি—ঠিক বলেছ।……তুমি আহত হয়েছ, না ?

অফিসার—হাসপাতালে থেকে আজই ছাড়া পেয়েছি।

মেয়েটি—জঘন্য এই যুদ্ধ! যা কিছু দুঃখ-কষ্ট, সবই যুদ্ধের জন্যে। কবে এই যুদ্ধ শেষ হবে, বলতে পার ?

অফিসার—(জানালায় ঠেস দিয়ে মেয়িটির দিকে একমনে তাকিয়ে)—তোমরা কী জাত ?

মেয়েটি—(ক্ষিপ্রদৃষ্টিতে তাকিয়ে)—রাশিয়ান।

অফিসার—সত্যিই ? কোন রাশিয়ান মেয়ের সঙ্গে আমার এর আগে আলাপ হয়নি। (মেয়েটি আবার তার দিকে ক্ষিপ্রদৃষ্টিতে তাকায়)—আচ্ছা, যতটা শোনা যায়, তোমাদের অবস্থা কি সত্যিই ততটা খারাপ ?

মেয়েটি—(ছেলেটির হাতের মধ্যে নিজের হাত গলিয়ে দেয়)—না, যখন তোমার মতো কোন সুন্দর পুরুষ আমার কাছে থাকে তখন ততটা খারাপ মনে হয় না। এর আগে অবিশ্যি আমার সে-সৌভাগ্য হয়নি। (মেয়েটি মৃদু হাসে)—আমায় বিমর্ষ দেখে তুমি থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলে পথে ; অন্যেরা আমায় হাসিখুসি দেখে পথ চলার মাঝে থেমে যায়, আমার সঙ্গ নেয়। পুরুষদের আমার মোটেই ভাল লাগে না। আর, ভাল লাগে না জানি বলেই……

অফিসার—তুমি কি পুরুষকে দেখেছ তার শ্রেষ্ঠরূপে ? তাদের দেখতে হয় যখন তারা যুদ্ধক্ষেত্রে পরিখার মধ্যে থাকে। তখন তারা অদ্ভুত—

অফিসার, সৈনিক, প্রত্যেকে। ওরকম হাসিমুখে একটানা স্বার্থত্যাগের উদাহরণ অন্য কোথাও বড় একটা দেখা যায় না। এসব সত্যিই আমার খুবই আশ্চর্য লাগে।

মেয়েটি—(ছেলেটির ওপর দৃষ্টি রেখে)—আশা করি তুমিই তাদের শেষ দৃষ্টান্ত হবে না।···আমার কী মনে হচ্ছে জান? মনে হচ্ছে, তুমি নিজেকে দিয়ে অন্য সকলের বিচার করছ।

অফিসার—মোটেই না। তুমিই ভুল করছো। আমি শপথ ক'রে বলতে পারি, শত্রুপক্ষকে আক্রমণ করতে গিয়ে আমি যখন আহত হলাম তখন আমার রেজিমেণ্টের প্রত্যেকেই বীরের মতো সেই আক্রমণ অংশগ্রহণ করেছিল। নিজেদের ভাল মন্দ চিন্তা না ক'রে তারা যেভাবে শত্রুপক্ষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল······ভাবলেও শিউরে উঠি।

মেয়েটি—(সন্দিগ্ধভাবে)—এ কথাটা বোধহয় শত্রুপক্ষের বেলাতেও খাটে, নয় কি?

অফিসার—নিশ্চয়ই···আমি নিজে তা জানি।

মেয়েটি—তুমি দেখছি তেমন নীচ নও। নীচমনা লোকদের আমি খুব ঘৃণা করি।

অফিসার—তারা হয়ত নীচমনা নয়। আসলে তারা সমস্ত ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারে না।

মেয়েটি—আহা! তুমি এখনও দেখছি শিশুই রয়ে গেছ। (ছেলেটি এ-ধরণের উক্তি পছন্দ করে না ও ভ্রূকুটি করে—তা দেখে মেয়েটি ভয় পেয়েছে বলে মনে হয়)

মেয়েটি—(সানুনয়ে)—এইজন্যেই তো তোমাকে আমার ভাল লাগছে। একজন ভাল লোকের সঙ্গে পরিচিত হওয়া সৌভাগ্যের কথা।

অফিসার—(হঠাৎ) আচ্ছা একা থাকার কথা বলছিলে! কেন, তোমার কি কোন রুশ বন্ধু নেই?

মেয়েটি—(অসহায়ভাবে)—রুশ? কই না তো। কী বড় এই সহর।··· যখন আমাদের দেখা হল তখন তুমি কনসার্ট থেকে ফিরছিলে?

অফিসার—হ্যাঁ।

মেয়েটি—গান বাজনা আমিও খুব ভালবাসি।

অফিসার—আমার ধারণা, গানবাজনা তোমাদের দেশের সকলেই ভালবাসে।

মেয়েটি—হাতে পয়সা থাকলে আমিও কনসার্ট শুনতে যাই।

অফিসার—তার মানে? তোমার আর্থিক অবস্থা কি মোটেই ভাল নয়?

মেয়েটি—বর্তমানে আমি মাত্র এক শিলিং-এর মালিক। (মেয়েটি করুণভাবে হেসে ওঠে। ছেলেটি বিপর্যস্তভাবে জানালায় গিয়ে বসে ও মেয়েটির দিকে ঝুঁকে পড়ে)

অফিসার—তোমার নাম কি?

মেয়েটি—মে…নিজেকে আমি ঐ নামেই ডাকি।……তোমার নাম জিগ্যেস ক'রে কোন লাভ নেই নিশ্চয়।

অফিসার—(হেসে)—তুমি আমায় বিশ্বাস করো না—না?

মেয়েটি—বিশ্বাস না-করার কারণও আছে—তাই না?

অফিসার—হ্যাঁ। আমার মনে হয় তোমার ধারণা আমরা সবাই পশুর সমান।

মেয়েটি—(জানালার কাছে রাখা চেয়ারে বসে—খোলা জানালা দিয়ে চাঁদের আলো তার পাউডার-মাখা একটি গালের ওপর পড়ে)—কি জান! সব সময়েই ভয়ে ভয়ে থাকার যথেষ্ট কারণ আমার আছে। মনের দিক থেকে এউ মুহূর্তে নিজেকে দুর্বল মনে হচ্ছে—কাউকেই বিশ্বাস করতে মন চাইছে না……এই যুদ্ধে তোমারা বোধহয় অনেক জার্মান মেরে ফেলেছ?

অফিসার—হাতাহাতি যুদ্ধ না হলে সেটা ঠিক জানা যায় না। আমার অদৃষ্টে সে-সৌভাগ্য এখনও হয়নি।

মেয়েটি—কিছু জার্মান মারতে পারলে তুমি খুব খুশি হবে নিশ্চয়ই।

অফিসার—খুসি হব? বোধহয় না। পরস্পরকে মেরে ফেলে আমরা খুশি হই না—অন্ততঃ আমাদের মধ্যে বেশীর ভাগ সৈনিকরা শুধু নিজেদের কর্তব্য ক'রে যাই—ব্যস।

মেয়েটি—উঃ, কী ভয়ানক। আমার ভায়েরা কেউই বোধহয় আর বেঁচে নেই।

অফিসার—কেন, তুমি কি তাদের খবরাখবর পাওনা?

মেয়েটি—খবর? কই না তো। আমার দেশের কারুরই কোন খবর পাই না।…আমার নিজের দেশ বলতে হয়তো আজ কিছুই নেই; যা ছিল তা লোপ পেয়েছে।…বাবা, মা, ভাইরা, বোনেরা—সকলে।…বোধহয় আর কোনদিনই তাদের সঙ্গে দেখা হবে না।…

এই যুদ্ধই সকলের হৃদয় ভেঙে চুরমার ক'রে দিচ্ছে। (মেয়েটি ভিতরে-ভিতরে ওঠে)· ·তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে কী ভাবছিলাম, জান? ভাবছিলাম আমার জন্মস্থানের কথা, চাঁদের আলোয় সেখানে নদীটা কী সুন্দর দেখাতো। সে-দৃশ্য আবার দেখতে পেলে কি খুসিই না হব।···আচ্ছা, বিদেশে বাস ক'রে কোনদিন কি তুমি দেশে নিজের ঘরে ফিরে যাওয়ার জন্যে কাতর হওনি?

অফিসার—হয়েছি, যখন যুদ্ধক্ষেত্রে আমাদের পরিখার মধ্যে থাকতে হত। অত লোকের মধ্যে কিন্তু সে-ভাব প্রকাশ করতে লজ্জা করত।

মেয়েটি—ঠিকই তো। সেখানে তোমরা পরস্পরের সঙ্গী ছিল। এখানে আমি একলা থাকি—সবাই আমায় ঘেন্না করে, পারলে ধ'রে জেলে আটকে রাখতে পারে। এই তো আমার অবস্থা, বুঝেছ? (তোর বুক ফুলে ওঠে)

অফিসার—(মেয়েটির হাঁটুর ওপর হাত রাখে)·······আমি সত্যিই খুব দুঃখিত।

মেয়েটি—(চাপা গলায়)—তুমিই আমায় সর্বপ্রথম করুণা দেখালে। তোমার কাছে আমি সত্যি কথা বলব। আমি রুশ নই···আমি জার্মান মেয়ে।

অফিসার—(তীক্ষ্ণদৃষ্টি হেনে)—তাতে হয়েছে কি, লক্ষ্মীটি? আমরা তো মেয়েদের সঙ্গে লড়াই করছি না।

মেয়েটি—(বাঁকা চোখে চেয়ে)—অরেকজন পুরুষও ঠিক ঐ কথা আমায় বলেছিল। কিন্তু সে তখন নিজের স্ফূর্তির কথাই ভেবেছিল।···· তুমি কিন্তু ভারি চমৎকার মানুষ। তোমার সঙ্গে আলাপ হওয়াতে সত্যিই খুসি হয়েছি আমি। মানুষের ভাল দিকটাই তুমি দেখ—তাই না? জগতে এইটাই সব চেয়ে বড়ো গুণ কারণ আজকালকার মানুষের মধ্যে ভালোর ভাগটা খুবই কম দেখা যায়।

অফিসার—(হেসে)—তুমি দেখছি ভয়ঙ্কর রকম একটা ক্ষুদে সিনিক্।

মেয়েটি—সিনিক্! সিনিক না হলে কতদিন বাঁচতে পারব, বলতে পার? হয়তো আসছে কালই ডুবে মরতে হবে।······জগতে হয়তো কিছু ভাল লোক আছে কিন্তু আমি তো তাদের চিনি না।

অফিসার—আমি কিন্তু অনেককে চিনি।

মেয়েটি—(ছেলেটির দিকে ঝুঁকে)—আচ্ছা, সুবোধ বালক, শোন। তুমি কি কোনদিন দুঃখকষ্টে পড়েছ ?

অফিসার—না, তেমন কোন দুঃখকষ্টে পড়িনি।

মেয়েটি—তোমার মতো সুন্দর চেহারার লোকের কষ্টে পড়ার কথা নয়। আচ্ছা ধরো, আগে যেমন ভাল মেয়ে ছিলাম, এখনও আমি তেমনি আছি। আমাকে তোমার মা-বোনদের কাছে নিয়ে গিয়ে তাদের তুমি বললে—"এ একটা ছোট্ট জার্মান মেয়ে—বেকার, হাতে পয়সা-কড়ি নেই, কোন বন্ধু-বান্ধবও নেই"। তারা বলবে—"আহা, কি দুঃখের কথা—একটা জার্মান মেয়ে!" ব্যস, ঐ পর্যন্তই। তারপর আমার কথা তারা একেবারে ভুলে যাবে। (ছেলেটি নির্বাক হয়ে মেয়েটির দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে)।··· বুঝলে ?

অফিসার—(অস্পষ্টভাবে) ভিন্নপ্রকৃতির লোকও যে নেই, তা তো নয়।

মেয়েটি—না। হাজার হলেও তারা কখনও কোন জার্মানকে স্থান দেবে না। ···তাছাড়া, আমিও নতুন করে ভাল হতে চাই না—আমি প্রবঞ্চক নই। মন্দ পথে চলা আমার সয়ে গেছে।···তুমি আমায় একটা চুমু দেবে না, লক্ষ্মীটি ?

অফিসার—না—তুমি যদি কিছু মনে না করো তাহলে না-ই বা দিলাম। (মেয়েটি তার দিকে উৎসুকভাবে একদৃষ্টে তাকায়)···ওটা নির্বুদ্ধিতার কাজ।···আমি ঠিক বুঝতে পারছি না···কিন্তু দেখ, যুদ্ধক্ষেত্রে, হাসপাতালে জীবনটা অন্যরকম···সেখানে নীচতার স্থান নেই।

মেয়েটি—তুমি ঠাট্টা করছো!····তুমি আমাদের খুব ঘৃণা করো, না ?

অফিসার—ঘৃণা—ঠিক জানি না।

মেয়েটি—আমি ইংরেজদেরও ঘৃণা করি না—তাদের অবজ্ঞার চোখে দেখি। আমার দেশের লোকদেরও আমি অবজ্ঞা করি বেশী করে, কারণ তারাই এই যুদ্ধ বাধিয়েছিল। আমি জানি সে-কথা····সবাইকে আমি ঘৃণা করি। কেন তারা জগৎটাকে টেনে এনেছে এমন এক শোচনীয় অবস্থায়—কেন তারা আমাদের জীবনকে হত্যা করছে··· বিনা কারণে। জগৎটাকে তারা এমন খারাপভাবে গড়ে তুলেছে

যেখানে পরস্পর পরস্পরকে ঘৃণা করে, সবাই সব জিনিসের মধ্যে মন্দটাই খুঁজে বার করে।…আমি জানি তারা আমাকেও খারাপ করেছে। আমার বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছি…আর, বিশ্বাস করার মতো আছেই বা কী? ঈশ্বর আছেন কি? মনে করলে হাসি পায় যে আমিই একদিন ছোট-ছোট ইংরেজ ছেলেমেয়েদের প্রার্থনা শেখাতাম—তাদের পড়ে শোনাতাম যীশুখ্রীষ্ট ও তাঁর প্রেমের বাণী। তখন আমি ওসব বিশ্বাস করতাম…এখন আর করি না। একমাত্র মূর্খ বা মিথ্যাবাদী লোকেরাই ও-সবে বিশ্বাস করতে পারে।…ইচ্ছে হয় হাসপাতালে কাজ নিই—তোমার মতো অসহায় লোকদের সেবা করি। কিন্তু কাজের লোক হলেও ওরা আমায় নেবে না কারণ আমি জার্মান। সব দেশেই ঐ একই ব্যাপার—ফ্রান্সে, রুশিয়াতে। তুমি কি মনে কর ভবিষ্যতে ঈশ্বর, খ্রীষ্ট, প্রেম, এ-সবের ওপর আমি আমার বিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে পারব—না, না—কখনই না। আমরা আর মানুষ নেই, পশুতে নেমে গেছি। …ভাবছো, আমার জীবনটা নষ্ট হয়ে গেছে বলেই আমি এসব কথা বলছি। না, মোটেই তা নয়। আমার জীবনে কোন বড়ো রকমের বিপর্যয় এখনও আসেনি। যারা আমার কাছে আসে তারা হয়তো তোমার মতো ভাল লোক নয়—নিজেদের স্বভাব মতোই তারা আমার সঙ্গে আচরণ করে। কিন্তু তারা আমাকে বেঁচে থাকতে সাহায্য করে—সেটাই বা কী কম?…কারা আমাদের পশুতে পরিণত করেছে, জান? যারা নিজেদেরকে খুব ভাল ও বড়ো লোক মনে করে, যারা কথার দ্বারা হিংসার বিষ ছড়িয়ে যুদ্ধ বাধিয়ে দেয়, যাতে তোমার মতো ছেলেরা—আমরা সবাই—প্রাণ হারাই আর আমাদের মধ্যে যারা গরীব তারা আটকা পড়ে কয়েদখানায়; তারা আর সেই সব ভয়ঙ্কর লোকেরা যারা কাগজে এসব খবর ছাপিয়ে এই বিষ ছড়ায় আরও ব্যাপক-ভাবে। এ-ধরনের লোক সব দেশেই আছে—আমার দেশেও যে নেই তা আমি বলতে পারি না। (ছেলেটি উঠে দাঁড়ায়—নিজেকে তার নিঃস্ব মনে হয়। মেয়েটি তার দিকে চেয়ে থাকে)…আমার কথায় বিরক্ত হয়ো না, লক্ষীটি। কথা বলার লোক পাই না আমি। তোমার যদি ভাল না লাগে তো আমি চুপ করে থাকছি।

অফিসার—বলে যাও, শেষ করে ফেলো। তোমার কথাগুলো যে আমি বিশ্বাস করব এরকম কোন প্রতিশ্রুতি তো দিইনি, আর সত্যিই তোমার সব কথা আমি বিশ্বাস করি না। (মেয়েটি উঠে দেওয়ালে ঠেস্‌ দিয়ে দাঁড়ায়—তার কালো পোষাক ও ফ্যাকাশে মুখের ওপর চাঁদের আলো পড়ে বাঁকাভাবে। এবার সে খুব ধীরে ধীরে কথা বলে)।

মেয়েটি—আচ্ছা, এই যে পৃথিবী, যেখানে অসংখ্য লোকেরা নির্যাতিত হচ্ছে বিনা দোষে, বিনা কারণে—একে তোমরা সুন্দর বল, না? তোমরা বল—যুদ্ধক্ষেত্রে তোমরা সকলে কমরেড, সেখানে স্বার্থপরতার স্থান নেই।…নিজের সম্বন্ধে আমার খুব উঁচু ধারণা নেই। থাকলেই বা কী হতো, এখন আমি নষ্ট হয়ে গেছি। আমি ভাবি আমার দেশের লোকদের কথা—কী নিদারুণ দুঃখ-কষ্টের মধ্যে দিয়ে তারা জীবনযাপন করছে। শুধু তাই নয়—আমি ভাবি সে-দেশের ও এ-দেশের দুঃখী দারিদ্রদের কথা, যারা এই যুদ্ধে হারাচ্ছে তাদের প্রিয়জনদের।…আর ভাবি হতভাগ্য যুদ্ধবন্দীদের কথা।…এদের কথা ভাববার অধিকার কি আমার থাকতে পারে না? যদি থাকে, তাহলে কেমন করেই বা বিশ্বাস করি যে এই পৃথিবী খুব মনোরম স্থান? (ছেলেটি নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে মেয়েটির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে)…আমাদের জীবন ক্ষণস্থায়ী…স্বল্পকালের মধ্যেই এর সমাপ্তি ঘটে। আমার মনে হয় এদিক দিয়ে আমরা খুব ভাগ্যবান।

অফিসার—জীবনের সমাপ্তি ঘটলেই তার শেষ হয় না—তারপরেও, তার ওপরও অনেক কিছু থেকে যায়।

মেয়েটি—(ধীরে)—ওঃ, তোমার বুঝি ধারণা যে তোমরা যুদ্ধ করো ভবিষ্যতের জন্যে—নিজেকে উৎসর্গ করো, নিজেদের জীবন বিসর্জন দাও একটা সুন্দরতর পৃথিবী সৃষ্টি করার জন্যে, তাই না?

অফিসার—যুদ্ধে জয়ী না হওয়া পর্যন্ত আমরা লড়াই করে যাব, আমরা এই কথাই জানি।

মেয়েটি—জয়ী না হওয়া পর্যন্ত! আমার দেশের লোকরাও ঠিক ঐ কথাই ভাবে। সবাই ভাবে তারা জয়ী হলেই পৃথিবীটা আরো সুন্দর ও সুখের স্থান হবে। কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই জান যে সেটা সম্ভব নয়,

আসলে অবস্থাটা আরো খারাপ হয়ে দাঁড়াবে। (ছেলেটি ফিরে দাঁড়ায় ও তার টুপিটি তুলে নেয়। মেয়েটি বলে চলে)···কারা জিতলো, কারা হারলো, তাতে আমার কিছু যায়-আসে না। আমার দেশ যদি হারে তাতেও আমার দুঃখ নেই। সব পশু, সবাইকে আমি ঘৃণা করি।···যেও না লক্ষ্মীটি, এবার আমি চুপ করছি। (ছেলেটি তার জামার পকেট থেকে কয়েকখানা নোট বার করে টেবিলের ওপর রাখে—পরে মেয়েটির দিকে এগিয়ে যায়)

অফিসার—বিদায়—শুভরাত্রি।

মেয়েটি—(সখেদে)—সত্যিই তুমি চলে যাচ্ছ! আমাকে তোমার ভাল লাগছে না?

অফিসার—ভাল লাগবে না কেন? লাগছে বৈকি।

মেয়েটি—আমি জার্মান বলে, নিশ্চয়ই।

অফিসার—না।

মেয়েটি—তবে তুমি আর কিছুক্ষণ থাকছ না কেন?

অফিসার—তাহলে সত্যিকথা শুনবে? থাকছি না কারণ তুমি আমায় বিভ্রান্ত, বিপর্যস্ত করে তুলেছ।

মেয়েটি—আমায় একটা চুমুও দেবে না? (ছেলেটি নিচু হয়ে মেয়েটির কপালে ঠোঁট রাখে। ঠোঁট সরালে মেয়েটি তার মাথা পিছনে সরিয়ে তার মুখ ছেলেটির মুখের ওপর চেপে ধরে তাকে জড়িয়ে ধরে)

অফিসার—(তৎক্ষণাৎ বসে পড়ে)····না··দিও না। নিজেকে আমি পশু ভাবতে চাই না।

মেয়েটি—(হেসে) তুমি বেশ মজার লোক কিন্তু; বড়ো ভাল তুমি। আমার সঙ্গে একটু গল্প করো না—আমার সঙ্গে কেউ বড় একটা কথা বলে না।···বলো না, তুমি অনেক জার্মান যুদ্ধবন্দী দেখেছ?

অফিসার—(দীর্ঘশ্বাস ফেলে)···হ্যাঁ, অনেক দেখেছি।

মেয়েটি—রাইন নদীর দিকের কাউকে দেখেছ?

অফিসার—বোধহয় দেখেছি।

মেয়েটি—তাদের কি খুব বিমর্ষ দেখেছিলে?

অফিসার—কেউ কেউ বিমর্ষ ছিল; আবার কেউ কেউ ধরা পড়ে খুসিই হয়েছিল।

মেয়েটি—তুমি কি কখনও রাইন নদী দেখেছ? আজকের রাতে তাকে কী চমৎকারই না দেখাবে। এখানের চাঁদের আলো থাকবে সেখানেও —রুশিয়াতে, ফ্রান্সে, সর্বত্রই। এখানকার গাছপালা আজ যেমন সুন্দর দেখাচ্ছে সেখানেও তেমনই—এখানের মতো সেখানেও তরুতলে তরুণ-তরুণীরা মিলিত হয়ে পরস্পরকে ভালবাসা জানাবে। ...উঃ, কী জঘন্য এই যুদ্ধ—না? যেন বেঁচে থাকাটা আদৌ সুখের নয়।

অফিসার—মৃত্যুর মুখোমুখি না দাঁড়ালে জানা যায় না বেঁচে থাকাটা কত সুখের। দুঃখের বিষয় যে ততদিন আমরা বাঁচি না। অনেকে যখন এইভাবে চিন্তা করে ও পরস্পরের জন্যে জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিতে প্রস্তুত থাকে তখন এদের জীবনের মূল্য বাকী সমস্ত লোকের জীবনের সমান হয়ে দাঁড়ায়। (মেয়েটির সামনে এরকম ভাব-বিলাসিতায় লজ্জাবোধ করে ছেলেটি থেমে যায়)

মেয়েটি—তুমি কেমন করে আহত হয়েছিলে, বলো না লক্ষীটি।

অফিসার—ফাঁকা মাঠের মধ্যে শত্রুপক্ষকে আক্রমণ করতে গিয়ে। একসঙ্গে চারটে বুলেট লেগেছিল।

মেয়েটি—আক্রমণ করার হুকুম পেয়ে খুব ভয় পেয়েছিলে, না? (ছেলেটি হেসে মাথা নাড়ায়)

অফিসার—সেদিন খুব চমৎকার লেগেছিল। জান, সেদিন সকালে আমরা প্রাণভরে হেসেছিলাম...যদিও অল্প সময়ের মধ্যেই আমি আহত হয়ে পড়ি।

মেয়েটি—(স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে)...তুমি হেসেছিলে?

অফিসার—নিশ্চয়ই। পরদিন জ্ঞান হলে প্রথমেই কি দেখেছিলাম, জান? দেখেছিলাম আমার বৃদ্ধ কর্ণেল আমায় লেবুর রস খাওয়াচ্ছেন। আমার কর্ণেলকে যদি তুমি জানতে তাহলে তোমার হারানো বিশ্বাস কিছুটা ফিরে আসতো। একথা মনে রেখ যে এই যুদ্ধের বীভৎসতার পিছনে মনে রাখবার মতো অনেক কিছু আছে। মানুষ মরে একবারই, আর সে মৃত্যু যদি তার দেশের জন্যে হয় তাহলে সেটা খুবই সুখের বিষয়—নয় কি? (চাঁদের আলোতে মেয়েটির মুখের ভাব বদলে যায়—মনে হয় সে যেন অন্য জগতে চলে গেছে)

মেয়েটি—না—না—আমি কিছুতে বিশ্বাস করি না—এমনকি নিজের দেশকেও বিশ্বাস করি না। আমার হৃদয় মরে গেছে।

অফিসার—তোমার সেরকম মনে হতে পারে; কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই জান যে সেটা সত্যি নয়…নইলে আমার সঙ্গে যখন দেখা হয় তখন তুমি কাঁদছিলে কেন?

মেয়েটি—আর তা যদি সত্যি না হয় তাহলে ভাবতে পার কেমন করে আমি আজও বেঁচে আছি। প্রতিদিন সন্ধ্যায় পথে পথে ঘুরি, অচেনা লোকদের চেনার ভাণ করি, শুনি না কারও মুখ থেকে একটা সান্ত্বনার কথা; নিজে প্রাণ খুলে কথা বলতে ভয় পাই, পাছে জার্মান বলে ধরা পাড়।….ভাবছি, মদ খাওয়া ধরবো…বাস্তব মেনে চলি বলে সব জিনিস আমি স্পষ্টভাবে দেখতে পাই। আজ রাতে হয়তো একটু উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়েছি।…চাঁদটা কি দুষ্টু, না?…এই মুহূর্তে আমি কিন্তু শুধু নিজের জন্যেই বেঁচে আছি—অন্য কারো বা কিছুর জন্যেই আমি ভাবি না।

অফিসার—তা সত্ত্বেও তো একটু আগেই তুমি নিজের দেশের লোকদের জন্যে সহানুভূতি প্রকাশ করছিলে—ভাবছিলে যুদ্ধবন্দীদের দুঃখ-দুর্দশার কথা—

মেয়েটি—তাই তো; কারণ তারা সকলেই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, দুঃখভোগ করছে আমারই মতো নিজের প্রতিও আমার করুণা হয়। তোমার ইংরেজ মেয়েদের চেয়ে আমি একটু আলাদা ধরনের। আমি যা করি তা দেখেশুনেই করি। আমার নৈতিক পতন হলেও আমার মনটাকে আমি তো আর আস্তাকুঁড়ে ফেলে দিইনি।

অফিসার—যা বুঝছি, হৃদয়টাকেও ফেলতে পারনি।

মেয়েটি—লক্ষ্মী সোনা, তুমি ভয়ানক একগুঁয়ে। কিন্তু প্রেম সম্বন্ধে তোমরা যেসব বড় বড় কথা বল, সেগুলো সবই ভুয়ো। আমরা শুধু নিজেদেরই ভালবাসি। (মেয়েটির স্বরে গভীর তিক্ততার আভাষ পাওয়া যায়। ছেলেটির মনে হয় যেন তার শ্বাসরোধ হয়ে আসছে —সে উঠে জানালার কাছে দাঁড়ায়। দূর থেকে একজন খবরের কাগজ বিক্রেতার চিৎকার অস্পষ্টভাবে শোনা যায়। মেয়েটি তার হাতের আঙুলগুলি ছেলেটির আঙুলের মধ্যে চালিয়ে দিয়ে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। ছেলেটি একদৃষ্টে চেয়ে থাকে মেয়েটির

মুখের দিকে। ঘষা-মাজা সত্ত্বেও মেয়েটির মুখে ফুটে ওঠে একটা অসাধারণ, ভয়াবহ অথচ মর্মস্পর্শী সৌন্দর্য।)

অফিসার—না, আমরা শুধু নিজেদেরই ভালবাসি না—আমাদের ভালবাসার পরিধি আরো ব্যাপক। আমি ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারছি না কিন্তু বৃহত্তর, মহত্তর কিছু আছে—যেমন দয়া, মায়া···

থবরের কাগজওয়ালাদের চিৎকার ক্রমশঃ বেড়ে চলে। চিৎকারে তাদের বক্তব্য স্পষ্টভাবে বোঝা যায় না। ছেলেটি খবর শোনার জন্যে ব্যস্ত হয়। মেয়েটি সজোরে ছেলেটির হাত চেপে ধরে, সেও খবর শুনতে চায়। কাগজের হকারদের চিৎকার আরো কাছে এসে পড়ে এবং ক্রমশঃ কর্কশ ও তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। মনে হয় বাইরে চাঁদের আলোতে বহুলোক চলাফেরা করছে। দূর থেকে ভেসে আসছে একটা বিকট উল্লাসধ্বনি···"বিরাট জয়—ইংরেজদের বিরাট জয়—জার্মানদের ভীষণ পরাজয়—হাজার হাজার লোক বন্দী—ভীষণ পরাজয়।" উল্লসিত জনতা এগিয়ে চলে। ছেলেটির মন ভরে ওঠে আনন্দে—সে ঝুঁকে পড়ে টুপি নাড়িয়ে পাগলের মতো নিজের আনন্দ প্রকাশ করতে থাকে। রাত্রিটা হঠাৎ যেন চঞ্চল হয়ে কেঁপে কেঁপে ওঠে। ছেলেটি ছুটে রাস্তায় যেতে গিয়ে কিসে যেন বাধা পেয়ে ফিরে আসে। মেয়েটি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁপায়—তার হাত মুষ্টিবদ্ধ, মুখ বিবর্ণ। কিছু একটা করা উচিত এই ভেবে ছেলেটি নিচু হয়ে মেয়েটির হাতে চুমু খেতে যায়। মেয়েটি হাত সরিয়ে নেয় ও ছেলেটির দেওয়া নোটগুলি গুছিয়ে নিয়ে তার দিকে তুলে ধরে)

মেয়েটি—নিয়ে যাও—আমি চাই না তোমাদের ইংরেজ সরকারের টাকা—নিয়ে যাও। (মেয়েটি হঠাৎ নোটগুলি ছিঁড়তে সুরু করে ও ছেঁড়া টুকরোগুলি মেঝেময় ছড়াতে থাকে। তারপর ঘুরে ছেলেটির দিকে পিছন ফিরে দাঁড়ায়। ছেলেটি দেখতে পায় মেয়েটি টেবিলে ঠেস্ দিয়ে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে···অন্ধকার ঘরের মধ্যে যেন একটা কালো মূর্তি, যার প্রতিটি রেখা চাঁদের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। এক মিনিটকাল এইভাবে থাকার পর ছেলেটি দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায়। ছেলেটি চলে যাবার পরেও মেয়েটি সেইখানেই দাঁড়িয়ে থাকে—তার চিবুক বুকের ওপর নেমে

এসে পড়েছে…কানে আসছে রাস্তায় ছুটোছুটির শব্দ ও উল্লসিত চিৎকার…"ভীষণ পরাজয়"। মেয়েটি ছেঁড়া নোটের টুকরোগুলির মধ্যে এসে দাঁড়ায়…তাকায় বাইরের চাঁদের আলোর দিকে। এই অভিশপ্ত কামরাটিও বাইরে অনতিদূরের পার্কটি ছাড়িয়ে তার দৃষ্টি চলে যায় দূরে—বহুদূরে। তার দৃষ্টিতে ভেসে আসে জার্মান দেশে একটা ফলের বাগান। সে নিজে যেন একটা ছোট্ট মেয়ে…সেই বাগানে আপেল তুলছে…তার পাশে রয়েছে একটা বড় জার্মান কুকুর। এইরকম অসংখ্য ছোট ছোট ছবি, যা ভেসে ওঠে কোনও নিমজ্জমান লোকের চোখের সামনে। মেঝের ওপর বসে পড়ে মেয়েটি নোংরা কার্পেটে তার কপাল ঠেকায়, নিজের সর্বাঙ্গ চেপে ধরে। যন্ত্রচালিতের মতো ধুলোমাখা নোটের টুকরোগুলিকে জড়ো করে নাড়াচাড়া করে—তার গাল বেয়ে ঝরে পড়ে দরদর অশ্রুধারা)

মেয়েটি—পরাজয়—হায় পিতৃভূমি—পরাজিত তুমি—এক শিলিং…।

(তারপর চাঁদের আলোতে হঠাৎ সে উঠে বসে—তার সমস্ত শক্তি দিয়ে গাইতে সুরু করে জার্মান জাতীয় সঙ্গীত—"DIE WACHT AM RHEIN"। বাইরে রাস্তায় জনতা গেয়ে যায়—"RULE BRITANNIA")

—যবনিকা—

মহা গোধূলী ॥

কোথায় চার্টার প্যাক্ট কমিশন ম্লান ক্ষয় হয়;
কেন হিংসা ঈর্ষা গ্লানি ক্লান্তি ভয় রক্ত কলরব;
বুদ্ধের মৃত্যুর পরে যেই তন্বী ভিক্ষুনীকে এই প্রশ্ন আমার হৃদয়
ক'রে চুপ হয়েছিল—আজও সময়ের কাছে তেমনি নীরব।

—জীবনানন্দ দাশ

বারবারা বীডলার

আমার বারবছরের ছোট্ট বোনকে

মূল রচনা—হুয় কাণ (ভিয়েৎনাম)

অনুবাদ : বিজন ঘোষ

[Barbara Beidler—বারবারা বীড্লার। মার্কিন মুলুকের ছোট একটি মেয়ে। কতই বা বয়স হবে তার? বছর বারোর বেশী নয়। "Venture" নামে এক আমেরিকান পত্রিকা একদিন প্রকাশ ক'রে বসল বারবারা-র লেখা একটি কবিতা। কী ছিল সেই কবিতায়? আগুন ছিল তাতে। হ্যাঁ, সত্যিই আগুন। উত্তর ভিয়েৎনামে হাইফঙ-এর কাছে একটি গ্রামে আমেরিকানরা নাপাম বোমা ফেলায় যে-আগুন জ্বলে উঠেছিল, সেই আগুন। তারই বর্ণনা ছিল বারো বছরের সেই ছোট্ট মেয়েটির লেখা কবিতায়। আমেরিকার প্রতিরক্ষা দপ্তর সেই কবিতাটি সম্পর্কে মন্তব্য করল—"অস্বস্তিকর"। কিন্তু বারবারা-কে সাবাস জানালেন Huy Can—ভিয়েৎনামের প্রখ্যাত কবি এবং "ডেমোক্রাটিক রিপাবলিক অব ভিয়েৎনাম"-এর উপমন্ত্রী, তিনি নিজে একটি কবিতা লিখে সেটি উৎসর্গ করলেন বারবারা-কে। ভিয়েৎনামী কবির সেই কবিতাটির স্বচ্ছন্দ অনুবাদ নিচে দেওয়া হল।......অনুবাদক]

সাগর পারের ছোট্ট মেয়ে বারবারা!
গায়ের রঙ তোমার ভিন্ন হলেও
হাইফঙের কাছে
ভয়ার্ত শিশুদের সেই চিৎকার
তুমি স্পষ্ট শুনেছ—
যে শিশুগুলি আমেরিকান বোমার আগুনে
পুড়ে মরেছে,
যাদের আগুন-ধরা কাপড়ের টুকরোগুলো
আকাশে বাতাসে উড়েছে।

বয়স তোমার মাত্র বারো, কিন্তু
প্রতিটি বোমাবর্ষণে ক্ষুব্ধ মানুষের
বিবেকের বাণীকেই তুমি
রূপ দিয়েছ।

আ মে রি কা, আ মে রি কা,
সোনালী আগুনে ঝলসে পুড়ে-মরা
হাজার হাজার শিশুর করুণ চিৎকার
তুমি কি শুনতে পাও ?
নাপামের সোনালী আগুন,
ডলারের সোনালী আগুন,
আমেরিকার প্রতিটি অঙ্গে ছড়িয়ে প'ড়ে
তার রক্ত আর আত্মাকে কলুষিত করেছে—
ঠিক যেমন দূষিত ক্যানসার আর
গ্যানগ্রীনের পুঁয শরীরটাকে
বিষাক্ত ক'রে তোলে।

আ মে রি কা, আ মে রি কা,
তুমি কি বুঝতে পারছ—
তোমাদের বোমাগুলি,
তোমারই অস্থি-মজ্জা আর
সেই সঙ্গে বিবেককেও পুড়িয়ে ছাই ক'রে দিচ্ছে।

ছোট্ট বোন বারবারা !
তোমার কবিতায় যে-আগুন জ্বলেছে,
ভূত-প্রেতদের ঝলসে দিচ্ছে,
তারা ভয় পেয়ে হতবুদ্ধি হয়েছে।
তোমার কবিতার ওপরে তারা
নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে···
কিন্তু ছোট্ট ছেলে মেয়েদের বুকেও
যে-সত্যের আগুন।
জ্বলে উঠেছে,
তার ওপরে কোন বিধি-নিষেধ তারা
জারি করতে পারবে কি ?

ক্ষুদ্র শহর

মূল লেখক—রবার্ট হোরান্ (১৯২৮—)

অনুবাদ : গোপাল ভৌমিক

জলন্ত নিদ্রা থেকে উঠে
মাকড়সাটি গড়িয়ে আসে
জানালার ফ্রেমে ;
শুয়ে থাকার লাল গুহা থেকে বেরিয়ে
এসে আশ্রয় নেয় বাঁকানো কাঁচে।
স্ফীতকায় নায়ক, প্রেমিকের মাংসাশী
ভঙ্গুর মই নামিয়ে একটা
গ্রন্থি বন্ধন করে
এবং মসৃণ লাবণ্যে নেমে আসে
তার অবতরণ-ক্ষেত্রে।
মধ্যাহ্নে এই কোণাটা হয়ে
দাঁড়ায় যেন গুলিবিদ্ধ শহর
এবং ক্লান্ত স্থপতি ঘুমায়
বিবর্ণ চাকার মধ্যে,
নির্দয়ভাবে অপেক্ষা করে
সোনালী আগন্তুক কিংবা
তাম্রাভ বন্দীর ;
তার আকাশচারী শত্রুরা
জানালা বেয়ে তীরবেগে
এসে পড়ে ফাঁদে।
সুতার তৈরী পথ কেঁপে ওঠে
ঘোষণা করে সুড়ঙ্গপথে
বিস্মিত দেবদূতের আগমন,

মাকড়সা তার তন্তুজ স্বর্গ থেকে
নাচতে নাচতে নামে
পতঙ্গের আস্বাদ গ্রহণ করতে।
ছোটখাট যুদ্ধ বাধে,
কেঁপে ওঠে বন্দীশালা।
গোলাকার মাকড়সা
উচু হয়ে বসে বিচারকের মত,
টাকটা ঝলমল করে ওঠে।
শিকারটা পায়ে ঝোলে আর মাকড়সা
অদৃশ্য পথে ঘুরে কবর বানায়।
সন্ধ্যার দিকে জাল ভরে
ওঠে দৈত্যদানায়,
মৌমাছি ও বোলতার সমুজ্জল স্তূপ,
শ্বাসরুদ্ধ, আত্ম সমর্পিত।
সুতায় ঝুলে থাকে ব্রোঞ্জের কঙ্কালগুলি
এবং একটি দুর্বল পাখা তুলে ওঠে।
মধ্যযুগের শহর তারার রাজ্যে প্রলম্বিত।
জাল বেয়ে নেমে আসে মাকড়সা
আর শহরটি তার স্পর্শে
বিস্তারিত হয়ে ওঠে।
রাত্রিতে পতঙ্গগুলির মুখ
এবং দোদুল্যমান মাকড়সাটিকে
আমরা আর দেখতে পাই না।

আত্মহনন

মূল লেখক—টমাস হুড

অনুবাদঃ মনোমোহন ঘোষ (চিত্রগুপ্ত)

ভাগ্যহীনা আরেকজন এই !
জীবন-রণে ক্লান্ত,
করেছে তা-ই করতে যা নেই !
—আপন জীবনান্ত !
এখন বিচার শিকেয় থুয়ে
(ওকে) যত্নে তুলে আন্ ত !
হাত দুখানি দয়ায় ধুয়ে
মেজাজ রেখে শান্ত ।
উথ্ লে-পড়া রূপের রাশি
কোমল কচি অঙ্গে
বিধির এদান সর্বনাশী
বিসর্জিল গঙ্গে !
কে জানে কোন্ মর্মজালার
জীবন হোল সাঙ্গ
হায়, রূপসী তন্বীবালার
পেলব কোমলাঙ্গ !
হয়নি শিথিল ঢেউ-দোলনে
বসন, বাঁধা যত্নে !
দরদ দেখাস্ উত্তোলনে
এমন নারী-রত্নে ।
ঘৃণাতে নয়, স্নেহেই তুলিস্ ;
দেখিস্ ক্ষমার চক্ষে ,
নিন্দা-কঠোর বচন ভুলিস্,
দরদ রাখিস্ বক্ষে ।

হয়ত জীবন ছিল ম্লানই
তাই যদিরে, থাকনা !
উড়ে গেল সেসব গ্লানি
মেলিয়ে মরণ-পাখ্ না !
ধৌত-গ্লানি নারীদেহের
পবিত্রতার মর্ম
বুঝে, পালন করিস্ স্নেহের,—
মানবতার—ধর্ম ।
কাজ কী গভীর বিশ্লেষণে
কোন্ সে দারুণ দুঃখ—
তুল্‌লো ক'রে (কী ক্লেশ মনে)
আত্মঘাতন মুখ্য ?
কেমন ক'রে সব-খোওয়ানোর
সুগভীর নৈরাশ্য—
করলো সারা প্রাণ-নেওয়া ওর,
থাক্‌না সে সব ভাষ্য !
মরণ-বঁধু হরণ ক'রে
রিক্তপ্রাণের লজ্জা
করলো বধূ-বরণ ওরে
পরিয়ে শবের সজ্জা ।
মুছিয়ে দে ওর সিক্তমুখের
তিক্ত অধর-প্রান্ত
আজ্ কে যে ওর রিক্ত দুখের
রাত্রি অতিক্রান্ত !

ঘর কোথা ওর ? ও কোন্ জাতি ?
বাপ-মা, ভ্রাতা-ভগ্নী,
সপ্তপদীর জীবন-সাথী
সাক্ষী-করা অগ্নি—
ছিল কিংবা ছিল না তার ?
—এ সব প্রশ্ন তুচ্ছ !
সাজিয়ে দে ওর রুক্ষ মাথার
এলো চুলের গুচ্ছ।
তেল-চিরুণী-ফিতে-কাঁটায়
হয়নি কেশের চর্চা
ভাবতে ওরে বুক যে টাটায় !
(বুঝি) যোটেনি তার খরচা !
তলিয়ে গেল এই ধরণীর
দুঃখেরই আবর্তে !
কেউ ছিল না হেম-বরণীর
বেদনা-ভার হরতে ?
মস্ত শহর-ভরা লোকের
উচ্ছ্বসিত স্ফূর্তি !
তারি মধ্যে তীব্র শোকের
পাষাণ প্রতিমূর্তি—
তরুণী এই দুর্ভাগিনীর !
—জীবন-ভয়ে ত্রস্তা
ভাগ্য-দেবী-কাল-নাগিনীর
মৃত্যুশাপগ্রস্তা !
নদীর বুকে আলোর কাঁপন
দেখ্‌লো পাষাণ-চক্ষে ;
রাত্রি-যাপন-শয্যা আপন
মিল্‌লো নদীর বক্ষে !
শীতের হাওয়ায় জাড়-কাঁটাতে
কাঁপলো দেহ ; প্রাণত
কাঁপলো নকো ? বুক-পাটাতে
শঙ্কা অতিক্রান্ত
একরোখা এক ঝোঁকে পাথর !
সুকঠিন সিদ্ধান্ত !—
করতে হবেই জ্বালায় কাতর
জীবনধারণান্ত !

যেই নিমেষে সুপ্তিমগন
শহরবাসী সর্বে—*
ঝাঁপিয়ে পড়ার এলো লগন
হিমেল নদীগর্ভে !
এই ধরণীর নিষ্ঠুরতায়
দৃষ্টি যে ওর ক্রুদ্ধ
মুদিয়ে দিয়ে আঁখির পাতায়
কর রে অবরুদ্ধ !
শিথিল দেহ এখনো ওর
হয়নি তেমন শক্ত
ঘুমের যেন কাটেনি ঘোর
(যেন) স্বপ্ন অভিব্যক্ত !
মরার আগে পরাণে ওর
ঝড় গেছে দুর্দান্ত
কেটে জীবন-বন্ধন-ডোর
এখন পরম শান্ত !
হাত দুটি ওর যুক্ত কোরে
বক্ষে করিস্ ন্যস্ত
মৃতদেহের যত্ন—ওরে !—
সান্ত্বনা সেও মস্ত !
বঞ্চিত-সুখ হতাশ মেয়ে
জীবন-রসে লুব্ধ
দেখলোনা কেউ ওমুখ চেয়ে
তাই হোল বিক্ষুব্ধ !
ক্ষোভে ক্ষিপ্ত চোখে বাঁচার
দেখলো নাকো পন্থা ;
আশ্বাসহীন, মত্ত, নাচার
(হোল) আপন জীবনহন্তা !
যাহোক আজ ওর গেছেই চুকে
সকল ভালোমন্দ !
ঝেড়ে ফ্যাল্ ওর যাবার মুখে
সকল দ্বিধাদ্বন্দ্ব।
মন করুণায় কোরে নরম
ক্ষমিস্ পথভ্রান্তে
আজ সঁপে দিস্ ওকে পরম-
পিতার পদপ্রান্তে ॥

---

* The Bridge of Sighs-এর স্বচ্ছন্দ অনুবাদ।—অনুবাদক

হে আমার প্রেম

মূল লেখক—পল এলুয়ার

অনুবাদ : জীবন বন্দ্যোপাধ্যায়

আমার কামনা
তোমারই মধুর সৃষ্টি,
তারাই আমার
তৃষ্ণার মন-প্রতিমা।
তোমার বানীর
সুদূর আকাশ-দৃষ্টি
তারার মতই
জ্বেলেছে ঠোঁটের বৃষ্টি,
তোমার আদর
রেখেছে রাত্রি নীলা।
আমায় ঘিরে
তোমার বাহুর লীলা,
বিজয়-প্রতীক
অগ্নি শিখার মত।
(তবু) আমার কথা
জানাই পৃথিবীকে
চিরকালের
গোপন কথা যত।
(আর) যখন তুমি এখানে নেই
তখন স্বপ্ন দেখি
মগন যেন গহণ ঘুমে—
তোমায় দেখি একি!
আমি তার স্বপ্ন নিয়ে আছি।
স্বপ্নে ডুবে আছি!

ঘৃণা

মূল লেখক—জেম্‌স্ স্টিফেন্‌স্

অনুবাদ : ডঃ উজ্জ্বলকুমার মজুমদার

আমার পুরোনো শত্রুর সঙ্গে আজ দেখা।
ওকে দেখেই কেমন যেন হোলো আমার!
ঠোঁট কুঁচকে
চোখ কুঁচকে
তাকালাম ওর দিকে।
তারপর
মুখ ফিরিয়ে নিতেই
আমায় বললে :
একদিন যখন সমস্ত হিংসার
বাণ মারা শেষ হবে,
সমস্ত ক্রোধের জ্বালা জুড়োবে,
সেদিন কি আমরা
পরস্পর ঘৃণার কারণ
জানতে চাইব না?

হয়তো মনে হবে,
কেন যে ঘৃণা করি তা বুঝি না।

এই বলে আমার দিকে তাকালে সে।
ভাবলে—
হয়তো কিছু বলবো।
কিন্তু আমি পালিয়ে গেলাম।
ভেবে দেখলাম,
কাছে থাকলে হয়তো ওকে চুমু খেতাম
যে-কোনো মেয়ের মতো করেই।

নির্মলেন্দু গৌতম

পৃথিবীর পুরাতন গল্প

নিখিলেশবাবু ঠিক দেড়টার সময় প্রায় ছুটতে ছুটতে এসে দেখলেন, সেই নির্জন ছায়ার মধ্যে কয়েকটা শালিক উড়ে বেড়াচ্ছে।

নিখিলেশবাবু সেই ছায়ার মধ্যে এসে দাঁড়ালেন। শালিকগুলো উড়ে গেলো। সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে ঘড়ি দেখলেন নিখিলেশবাবু। সুধাময় ঠিক দুটোর সময় আসবে বলেছে। এখন ঠিক দেড়টা বাজে। সুধাময় বলেছে দুটোর মধ্যে আসবেই।

নিখিলেশবাবু সেই ছায়ার তলায় বেশ খানিকটা সময় দাঁড়ালেন। সুধাময় এখুনি এসে পড়তে পারে, মনে মনে ভাবলেন সে কথা। যে কোনো শব্দকেই তিনি সুধাময়ের গাড়ির শব্দ ভেবে ক্রমশঃ হতাশ হয়ে গেলেন। নিখিলেশবাবুর মনে হচ্ছে সুধাময় যখন বলেছে তখন ঠিক ঠিকই আসবে।

আজকে বেশ গরম পড়েছে। রৌদ্রের রঙ এখন খাঁটি রূপোর মতো। ছায়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে নিখিলেশবাবু তাপটুকু উপলব্ধি করতে পারছেন না। সেজন্যেই ছায়াটাকে খুব নিবিড় মনে হলো নিখিলেশবাবুর। ছুটতে ছুটতে এসেছিলেন বলে বেশ গরম লাগছিলো। এখন, ছায়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে তার আরাম লাগছে।

নিখিলেশবাবু গতকাল যেচে কিছু বলেননি সুধাময়কে। সুধাময় নিজেই নিখিলেশবাবু যাবে শুনে বলেছিলো, 'আমার গাড়ি যাচ্ছে, আপনি আমার গাড়িতেই যেতে পারেন।'

নিখিলেশবাবু বলেছিলেন, 'তুমিও যাবে নাকি?'

সুধাময় বলেছিলো, 'আমাকে যেতেই হবে। কাজটা আমি না গেলে হবার নয়।'

'তাহলে ভালোই হয়। বেশ গল্প করতে করতে যাওয়া যাবে।' নিখিলেশবাবু বলেছিলেন।

তারপর নিখিলেশবাবু কোন জায়গায় অপেক্ষা করবেন সে কথা বলে দিয়েছে সুধাময়। ক'টার মধ্যে সুধাময় আসবে তাও বলে দিয়েছে।

কথাগুলো ভেবে নিখিলেশবাবু ফের ঘড়ি দেখলেন। আড়াইটা বেজে গেছে। আর অপেক্ষা করা যায় না। নিখিলেশবাবুকে যেতেই হবে।

খানিকটা চঞ্চল হয়ে উঠলেন নিখিলেশবাবু। একটা রিক্সার জন্য মিনিট পাঁচেক সময় দাঁড়িয়ে হন্ হন্ করে রৌদ্রের মধ্যে হাঁটতে সুরু করলেন।

সুধাময় তাহলে সত্যি সত্যি এলো না। নিশ্চয়ই খুব ঠেকে গেছে কোথাও। একটা ফোন করলে হতো। বাসষ্ট্যাণ্ডে গিয়ে ওখান থেকে সুবিধে পেলে সুধাময়কে একটা ফোন করবেন নিখিলেশবাবু। রৌদ্রের ভেতর দিয়ে দ্রুত হাঁটতে হাঁটতে নিখিলেশবাবু ভাবলেন।

হাঁটতে হাঁটতেই শেষ পর্যন্ত বাস ষ্ট্যাণ্ডে পৌঁছুলেন নিখিলেশবাবু। বাস আর ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে নেই। কাজেই ট্যাক্সিতে যেতে হবে। উপায় কি তাছাড়া! অবশ্য ট্যাক্সিও যে সঙ্গে সঙ্গে ছাড়বে এমন নয়। ছ' জন যাত্রী জুটিয়ে তবেই ছাড়বে। তবু খানিকটা আগে যাওয়া যাবে ট্যাক্সিতে।

ফোন করবার কথাটা মনে হলো নিখিলেশবাবুর। ফোনটা তুলে তিনি সুধাময়কে পেতে চেষ্টা করলেন। প্রথমবার এনগেজড ছিলো। দ্বিতীয়বার যে ফোন ধরলো সে সুধাময়ের সঠিক কোনো খবর দিতে পারলো না। ফোন ছেড়ে দিয়ে নিখিলেশবাবু চলে এলেন ট্যাক্সি ষ্ট্যাণ্ডে। ফিরে এসে সুধাময়কে খবর দিতে হবে।

একটা ট্যাক্সি ছিলো ষ্ট্যাণ্ডে। যাত্রী নেই। নিখিলেশবাবুই প্রথম যাত্রী হবেন। ট্যাক্সিঅলা দাঁড়িয়েছিলো। নিখিলেশবাবু শুধালেন, 'ট্যাক্সি যাবে তো?'

'যাবে। ছ'জন হলেই ষ্টার্ট করবো।' কথাটা বলেই ট্যাক্সিঅলা ফের গাড়ির গায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ালো।

জীর্ণ ট্যাক্সিটার দরজার হাতল ঘুরিয়ে পেছনের সীটের এককোনায় গভীর আলস্যে বসলেন নিখিলেশবাবু। ট্যাক্সিটা একটা বড়ো বাড়ির ছায়ায় বলে ভেতরে একটা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব। সাদাটে এবং কিছুটা ঘসা কাঁচ দরজায় এবং পেছনে মাথার কাছে। সেজন্যে ভেতরে আলোর ঔজ্জ্বল্যও নেই। নিঃশব্দে একদিকের কাঁচ নামানো জানালার মধ্য দিয়ে বাইরের দিকে তাকালেন নিখিলেশবাবু। আরো পাঁচজন যাত্রীর জন্য তাকে আরো অনেকটা সময় হয়তো এমনি বসেই থাকতে হবে।

বাইরে রূপালী আলো গাছে পাতায় পথে খেলে বেড়াচ্ছে। চারিদিক ভর দুপুরবেলায় খানিকটা ঝিমিয়ে পড়েছে যেন। পথের দু'পাশের ছোটো ছোটো দোকানগুলো নির্জন এবং বিষণ্ণ। পথটাও নির্জন হয়ে আছে। খানিকটা বিশ্রাম হচ্ছে এই কথা মনে করে নিখিলেশবাবু ক্লান্ত হলেন না।

ট্যাক্সিঅলা একটা সিগারেট ধরিয়েছে। তাকে খানিকটা ব্যস্ত মনে হচ্ছে। অন্ততঃ একজন যাত্রী যে তার ট্যাক্সির মধ্যে আর পাঁচজনের জন্য অপেক্ষা করছে, সেকথা সম্ভবতঃ অনুভব করতে পারছে সে। সেজন্যে সে খানিকটা ব্যস্ত।

সুধাময় সময়মতো এলে এতোক্ষণে তিরিশ মাইল রাস্তা প্রায় পেরিয়ে যেতেন নিখিলেশবাবু। ফোন করেও সুধাময়ের সঠিক খবর পেলেন না তিনি। অথচ আশ্চর্য সুধাময়ের যে করেই হোক নিখিলেশবাবুকে একটা খবর দেয়া উচিত ছিলো। নিখিলেশবাবুর মনে হলো, সুধাময়ের ভরসায় থাকাই তার অন্যায় হয়েছিলো। বাসেই যেতে পারতেন তিনি। আর বাসে গেলে এতোক্ষণে পৌঁছেও যেতেন।

'এই যে এদিকে আসুন!' বলতে বলতে ট্যাক্সিঅলা সিগারেটটা হাতে নিয়ে হঠাৎ দ্রুত এগিয়ে গেলো। নিখিলেশবাবু তেমনি নির্জনভাবে পেছনের সীটের কোণার দিকে বসেই রইলেন। উৎসাহ প্রকাশ করে উঠে দেখলেন না একবারও। এই ট্যাক্সির জন্য হয়তো আরেকজন যাত্রী। ছ'জন হতে বেশ খানিকটা সময় লাগবে।

সামনের কাঁচের মধ্য দিয়ে লম্বা রাস্তাটা দেখা যাচ্ছে। দুটো সাইকেল রিক্সা আসছে। সম্ভবতঃ একটি স্কুল পালানো ছেলে রাস্তার ধার ঘেসে দ্রুত পায়ে ফিরছে। বেশ মজা লাগলো নিখিলেশবাবুর।

হঠাৎ নিখিলেশবাবু দেখলেন ট্যাক্সিঅলা সামনের দরজা খুলে দু'জনকে বসিয়ে দিলো সামনের সীটে। যারা বসলো, তাদের দুটি প্রজাপতির মতো

লঘু আর স্বচ্ছন্দ মনে হলো নিখিলেশবাবুর। তারা হঠাৎ যেন অনুকূল হাওয়ায় এখানে ভেসে চলে এসেছে। তারা কেবল পরস্পরকে অনুভব করছে। একটা চাপা উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ছে তারা। নিখিলেশবাবু যে পেছনে বসে আছেন দু'জনে কিন্তু তা দেখলো না। অথবা নিখিলেশবাবুর মনে হলো, এখন তাঁরা অনুভবের পৃথিবীটাকে ছাড়া আর কিছুই দেখতে চায় না।

নিখিলেশবাবু ট্যাক্সির ভেতরে ঠিক তেমনিভাবে বসেই সেই লঘু প্রজাপতি দুটোকে দেখতে থাকলেন। শুধু বাইরে একপলক তাকিয়ে দেখলেন ট্যাক্সিঅলা ফের তেমনিভাবে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে। আরো তিনজন যাত্রী চাই।

দু'জন খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে বসেছে।

মেয়েটি একসময় মৃদু গলায় বললো, 'এই ভালো হলো কিন্তু।'

নিখিলেশবাবু বুঝতে পারলেন, মেয়েটির নির্জনতা ভালো লাগছে।

ছেলেটি বললো, 'বাসের ভীড় আমারও ভালো লাগে না। বিশেষ করে তুমি সঙ্গে থাকলে।'

শেষের কথাটা বলে ছেলেটি হাসলো। নিখিলেশবাবু ছেলেটির মুখ পাশ থেকে দেখতে পাচ্ছিলেন। মেয়েটির মুখ দেখতে পাচ্ছিলেন না। কিন্তু তার কাঁধের ওপর গড়িয়ে নামা ঢিলে খোপাটির আন্দোলন দেখেই তাকে বুঝতে পারছিলেন।

'আজকে রোদ্দুরটা খুব তেতে উঠেছে।' মেয়েটি বললো।

'কিন্তু এই ট্যাক্সির মধ্যে আমার খুব আরাম লাগছে। রিক্সায় আসবার সময় যেমন গরম লাগছিলো বাব্বা!' ছেলেটি মেয়েটির দিকে তাকিয়েই আছে।

মেয়েটি হঠাৎ মাথা নামিয়ে বললো, 'মা বলছিলেন তোমাকে যেন আরো দুটো দিন থাকবার জন্য রাজী করাই। বিয়ের পর এই প্রথম এলে তো!'

নিখিলেশবাবুর মনে হলো ছেলেটি মেয়েটির হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিলো। তারপর খানিকটা হাল্কা গলায় বললো, 'ছেলেদের আপিস আর স্ত্রী এ দুটো একসঙ্গে ম্যানেজ করে চলতে হয় যে। থাকবার ইচ্ছে হচ্ছিলো আমারও। এমন খাতির যত্ন রাজা বাদশার ও ঈর্ষার বিষয়।'

মেয়েটি মুখ তুলে লঘুস্বরে হাসলো। বললো, 'তোমার মুখে স্ত্রী কথাটা শুনলে আমার অদ্ভুত লাগে।'

ছেলেটিও হেসে উঠলো এবার।

নিখিলেশবাবুর অদ্ভুত একটা অনুভূতির মধ্যে ডুবে যেতে থাকলেন এবার। নিজের শারীরিক অস্তিত্বটুকুকে যেন হঠাৎ ভুলে গেলেন তিনি। ট্যাক্সির এই শীতলতার মধ্যে, নরম আলোর মধ্যে নিজেকে তার অশরীরি একটা কিছু মনে হলো।

ওদের দু'জনকে আরো লঘু, আরো স্বচ্ছন্দ মনে হচ্ছে নিখিলেশবাবুর।

মেয়েটি ডানহাত দিয়ে খোঁপাটা একবার দেখে নিয়ে বললো, 'সুমিত্রা আমায় কি বলেছে জানো?'

ছেলেটি বললো, 'কি করে জানবো?'

'বলেছে, তোর স্বামীকে দেখলে আমার হিংসে হয়। তখন স্বামী শব্দটা এতো ভারী ভারী আর হাসির মনে হচ্ছিলো যে হেসেই ফেলেছিলাম আমি। বলেছি স্বামী টামী নয়, বল রঞ্জনকে দেখে আমার হিংসে হচ্ছে!'

রঞ্জন এবার হেসে ফেললো, বললো, 'স্বামী বললে নিশ্চয়ই তোমার জবরদস্ত একটা লোক বলে মনে হয় শীলা। স্ত্রী বললে ও আমার কিন্তু তোমার মতো ছোটোখাটো এবং কলেজে পড়া কোনো মেয়েকে মনে হয় না। বেশ লাল টকটকে চওড়া পাড়ওয়ালা সাদা শাড়ি পরা, আধুলীর মতো বিরাট একটা সিঁদুরের ফোঁটা কপাল জুড়ে আঁকা—'

শীলা খিল্ খিল্ করে হেসে উঠলো। রঞ্জন আর বাকীটা বলতে পারলো না।

হাসি থামতেই রঞ্জন বললো, 'সুমিত্রার কথা কি বলছিলে! ও তোমায় হিংসে করে আমার জন্যে! বেশ মজা তো!'

'সুমিত্রার বোধহয় শিগ্‌গীরই বিয়ে।'

'তুমি বিয়েতে আসবার কথা দিয়ে গেছো নাকি?'

'না দিয়ে যেতে পারি! কিন্তু আগেই বলে রাখি, তোমায় তখন আমায় পৌঁছে দিয়ে যেতে হবে।' শীলা রঞ্জনের মুখের দিকে তাকালো।

রঞ্জন হাসছে। রঞ্জনকে খুব সমৃদ্ধ মনে হচ্ছে এখন। একজন রাজার চাইতেও রঞ্জন অনেক বেশী সমৃদ্ধ। নিখিলেশবাবু নির্ণিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন রঞ্জনের দিকে।

শীলা ফের তার খোঁপাটা দেখে বললো, 'কিছু বললে না যে!'

'কী আর বলবো আমি! তুমি তো আগেই বলে রাখলে যে পৌঁছে দিতে হবে তোমায়।' হাসতে হাসতেই রঞ্জন বললো।

ট্যাক্সিঅলা শেষ হয়ে যাওয়া সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দ্রুত চলে গেলো। নিখিলেশবাবু একটু সময়ের জন্য চোখ ফিরিয়ে দেখলেন। রাস্তাটা ফের নির্জন দেখাচ্ছে। একটা রিক্সা কেবল উধাও হয়ে যাচ্ছে রাস্তা সোজা।

শীলা ডান হাতখানা বাড়িয়ে ষ্টীয়ারিং হুইলটা ধরলো। ফর্সা এবং সুডৌল হাতে একরাশ অলঙ্কার। ব্লাউজের হাতাটা কনুই পর্যন্ত দীর্ঘ। লাল টকটকে ব্লাউজটাতে শীলাকে আরো বেশী ভালো লাগছে। রঞ্জনের দিকে মন রেখেই ষ্টীয়ারিংটাকে আস্তে আস্তে নাড়াতে থাকলো শীলা। শীলাকে খুব ছোটো আর নিষ্পাপ মনে হচ্ছে নিখিলেশবাবুর।

রঞ্জন পকেট থেকে দামী একটা সিগারেটের প্যাকেট বের করে একটা সিগারেট ধরালো। জানালা দিয়ে ধুঁয়োটা বাইরে ছুঁড়ে দিয়ে বললো, 'অনেকক্ষণ সিগারেট খাইনি।'

'তোমার সিগারেটের গন্ধটুকু খুব ভালো লাগে আমার।' শীলা বললো।

রঞ্জন হেসে বললো, 'ছেলেবেলায় এই গন্ধের লোভেই সিগারেট খাওয়া ধরেছিলাম।'

শীলা সামান্য শব্দ করে হাসলো। তারপর বললো, 'তাই বলে মনে করো না আমিও সিগারেট খাওয়া অভ্যেস করবো।'

রঞ্জন বললো, 'অভ্যেস করলেই বা! দু'জন একসঙ্গে বসে টেনে টেনে প্যাকেট ফুরিয়ে ফেলবো।'

লঘুস্বরে ফের হেসে উঠলো দু'জনে।

নিখিলেশবাবু সিগারেটের গন্ধ পাচ্ছেন। ট্যাক্সির ভেতরটাই গন্ধে ভরে উঠেছে। খুব ভালো লাগছে নিখিলেশবাবুর। রঞ্জনকে অসম্ভব সৌখীন আর সুখী মনে হচ্ছে এখন।

হাসি থামিয়ে সামনের কাঁচের দিকে মুখ ফিরিয়ে রঞ্জন সিগারেট টানছে। শীলাও সেদিকে তাকিয়েছিলো। হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে বললো, 'পৌছুতে কতক্ষণ লাগবে আমাদের?'

'ঠিক একঘণ্টা!'

'মাত্র!' কেমন বিষণ্ণ গলায় বললো শীলা।

'একঘণ্টা তোমার কাছে 'মাত্র' হলো?' রঞ্জন খানিকটা চমকে উঠলো যেন।

'একটা জীবনও আমার কাছে 'মাত্র' মনে হচ্ছে এখন। ট্যাক্সিটা যদি অনন্তকাল চলতো তাহলে সুখ পেতাম!' ফের বললো শীলা।

রঞ্জন অবাক হয়ে তাকালো শীলার দিকে। বেদনার্ত গলায় রঞ্জন যেন এবার স্বগতোক্তি করলো, 'আমারও তাই মনে হচ্ছে শীলা।'

শীলা রঞ্জনের কথা শুনে হাসছে, নিখিলেশবাবুর মনে হলো।

নিখিলেশবাবুর মনে হলো শীলার কথার মধ্যে কোথায় যেন একটা সত্যি আছে। শীলা আর রঞ্জনের জন্য একটা জীবন যেন অত্যন্ত ছোটো। এই ট্যাক্সির মতো একঘণ্টা ছুটে জীবনটা হঠাৎ ফুরিয়ে যাবে। নিখিলেশবাবুর বুকের মধ্যে ব্যথা জমে উঠলো। শীলার বুকের মধ্যেও নিশ্চয়ই ঠিক এইরকম ব্যথা জমেছে।

রঞ্জন আর শীলা ঘনিষ্ঠ হয়ে বসেছে আরো অনেকখানি। রঞ্জনের আঙুলের ফাঁকে সিগারেট পুড়ছে। শীলার হাতখানা স্থির হয়ে আছে ষ্টীয়ারিং-এর ওপর। লালপাথরের একটা আংটি দীপ্ত হয়ে আছে অনামিকায়।

ট্যাক্সিঅলা আরো যাত্রী আনতে গেছে। সম্ভবতঃ এখুনি ফিরবে।

নিখিলেশবাবু এবার সামনের সীটে রঞ্জন আর শীলাকে নয় নিখিলেশ আর আরতিকে দেখলেন। ক্রমে সেখানে পৃথিবীর সমস্ত দম্পতিকে দেখলেন। যাদের প্রত্যেকের কাছে একটা জীবনও ছোটো ছিলো, অথচ তারা সবাই জানতো মাত্র একঘণ্টা ট্যাক্সি চলবে। তারপরই নেমে পড়তে হবে ট্যাক্সি থেকে।

নিখিলেশবাবুর মনে হলো, সুধাময় তার জন্যে ঠিকই সেই গাছের তলায় গাড়ি নিয়ে এসেছিলো কিন্তু নিখিলেশবাবু দেখতে পাননি। কে যেন তাকে ভুলিয়ে পুরোনো ট্যাক্সির মধ্যে এনে বসিয়ে দিয়েছে রঞ্জন আর শীলার গল্প শোনবার জন্য।

নিখিলেশবাবু দারুণ বিস্ময়ে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলেন সেই মুহূর্তে!

লিপিকা

আকাশের নীল
বনের শ্যামলো চায়।
মাঝখানে তার
হাওয়া করে হায় হায়॥

—রবীন্দ্রনাথ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

নাটকীয়

[পাত্র-পাত্রী—রেবা দেবী (মা), প্রণববাবু (বাবা), সবিতা (ছোট মেয়ে), থানার ও, সি, কবিতা (বড় মেয়ে) ও রামেশ্বর মিশ্র (জামাতা)]

স্থান—কলিকাতা ॥ কাল—বর্তমানকাল

প্রথম দৃশ্য

[ভাড়াটে বাড়ির এক ফালি বারান্দায় সকলে দাঁড়িয়ে]

রেবাদেবী—(অসহায় ভঙ্গীতে) তুমি তাহলে পুলিশে খবর দাও।

প্রণববাবু—(সচকিত হয়ে) পুলিশ! চুরি নয়, ডাকাতি নয়, হামলা নয়, জিন্দাবাদ নয়—পুলিশ! পুলিশে খবর দিলেই বা কী হবে? হয়তো বলবে ইনস্ট্রাকসন নেই। রাজ্যজোড়া এত অশান্তির মধ্যে এ কোথাকার এক পারিবারিক অশান্তি। বলতেও কেমন যেন একটা হীনবল শোনায়—

রেবাদেবী—কিন্তু একটু কিছু ত করা দরকার!

প্রণববাবু—তাহলে যাই, বরং একটা ডাইরি করে আসি!

(প্রণববাবু জামা পরতে ঘরের ভেতর গেলেন,) ছোট মেয়ে সবিতা এতক্ষণে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে মন্তব্য করে ওঠে—]

সবিতা—এর কোনো মানে হয় না।

রেবাদেবী—(রাগে জলে ওঠে)—তুই চুপ কর, কথা বলিসনে। কলেজ থেকে নাম কাটিয়ে এনে বাড়িতে বন্ধ করে রাখব। যদি কখনো বেরোস আমিও যাব তোর সঙ্গে সঙ্গে। কোথায় যাস, কার সঙ্গে আড্ডা দিস, সব জেনে নেব। সব ভণ্ডুল করে দেব।

(ডান হাতের তর্জনীটা উদ্দণ্ড প্রহারের মত খাড়া করে রাখেন।)

সবিতা—(ম্লান গলায়) এ তোমাদের নিতান্ত অযৌক্তিক কথা। উচ্চ শিক্ষা দেবে, স্বাধীনতা দেবে, শুধু শিক্ষিত বিবেক অনুসারে আচরণ করতে দেবে না। এর কোনো মানে হয় ?

প্রণবাবু (ঘর থেকে বেরোতে বেরোতে) উচ্চ শিক্ষা ! স্বাধীনতা ! এ সমস্ত পাগলের বুলি। সেই পাগলই যদি হবি তবে শিক্ষিত হয়ে লাভ কী। স্বাধীনতারও বা কী মূল্য ?

(বল্‌তে বল্‌তেই বেরিয়ে গেলেন প্রণববাবু)

দ্বিতীয় দৃশ্য

[থানার ও,সি,র ঘর। অতিশয় নোঙরা ফাইলপত্র বোঝাই একটি পার্টিসন করা কামরা—ও,সি, আপন মনে সিগারেট টানছেন]

(প্রণববাবুর প্রবেশ, পাগলের মত চেহারা)

প্রণববাবু—আমার বড় মেয়ে কবিতাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

ও, সি—(লঘুভাবে) আজকাল কোথাও কবিতাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না—না সাহিত্যে, না জীবনে। (তারপর প্রণববাবু মুখের অবস্থা দেখে একটু গম্ভীর হয়ে)—কবে থেকে পাওয়া যাচ্ছে না ?

প্রণববাবু (ক্লান্ত চাউনি মেলে)—কাল সন্ধেবেলা থেকে। কাল সন্ধে গেল, সমস্ত রাত চলে গেল, এখন দুপুর প্রায় বারোটা, তার এখনো দেখা নেই।

ও সি—কবিতার বয়স কত ?

প্রণববাবু—তেইশ-চব্বিশ।

ও, সি—বিয়ে হয়েছে ?

প্রণববাবু—বিয়ে হলেও তার স্বামী আসতো। কবিতা কুমারী।

ও, সি—তাহলে নাকে তেল দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোন গে যান। কিছুই করবার নেই।

প্রণববাবু (আরো কুঁকড়ে গিয়ে)—কিছুই করবার নেই কেন ?

ও, সি—এডাল্ট মেয়ে, নিশ্চয় স্বেচ্ছায় কারু সঙ্গে ভেগেছে! (তারপর চরম নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে)—কিছুই করবার নেই।

প্রণবাবু—(চোখে জল) আমার মেয়ে ও রকম নয়। আমার মেয়ে গঙ্গাজলের মত পবিত্র।

ও, সি, (সহাস্যে)—সব বাপই তাই মনে করে। কিন্তু গঙ্গাজলে কত রাঘব বোয়াল থেকে কুচো চিংড়ি আনাগোনা করছে তার খবর রাখে না।

প্রণববাবু (হতাশ গলায়) অন্য কোনো রকম অনুমান করা যায় না?

ও, সি (উৎসুক কণ্ঠে)—তেমন কিছু অনুমান থাকে ত' বলুন।

প্রণববাবু—যদি বাড়ি ফেরার সময় রাস্তায় কোনো দুর্ঘটনা হয়?

ও, সি—গাড়ি চাপা বলতে চান?

প্রণববাবু—সে সম্ভাবনাও ত বাদ দেওয়া যায় না!

ও, সি (নিষ্ঠুর গলায়) তাহলে, হাসপাতালে বা মর্গে খোঁজ করুন।

প্রণবাবু—ধরুন, রাস্তা থেকে কোনো গুণ্ডারদল ওকে জোর করে ধরে ট্যাকসিতে তুলে নিয়ে পালালো—

ও, সি—এই ক ল কা তা য়?

প্রণববাবু—কেন এরকম ঘটনা দেখেন নি?

ও, সি—ঢের ঢের দেখেছি। কিন্তু কবিতার ওসব কিছুই হয়নি। সে স্রেফ ভেগেছে।

প্রণববাবু (ভাঙা গলায়)—বলেন কি, সে একা-একা কোথায় যাবে?

ও, সি—ভালো জ্বালা। একা যাবে কেন মশাই, সঙ্গে তার লাভার আছে। সেই হাত ধরে নিয়ে গেছে। গান শোনেন নি—হাত ধরে তুমি নিয়ে চলো সখা—

প্রণববাবু—কিন্তু বাড়িতে না বলে কোনোদিন ও কোথাও যায়নি। কেমন শান্ত বাধ্য শক্ত মেয়ে। বাপ-মায়ের কষ্ট বোঝে! আপনি যা বল্‌ছেন তা ঠিক নয়, ও কেন অমন কাজ করতে যাবে?

ও, সি—হয়ত ছেলেটা অবাঞ্ছিত কিংবা তারও চেয়ে খারাপ। হয়তো অপদার্থ। তাই অগোচরে পালিয়েছে।

প্রণববাবু—উঃ বল্‌বেন না, বল্‌বেন না, সহ্য করতে পারব না—

(এতক্ষণে একটা খালি চেয়ারে বসে পড়লেন)

ও, সি, (আলোচনা শেষ করার বাসনায় ডাইরিটা টানলেন)—বলুন। আপনার নালিশটা রেকর্ড করে নিই।

প্রণববাবু—নাম, কবিতা ভট্টাচার্য। এম-এ পাশ। গত মঙ্গলবার সেই যে বাড়ি থেকে বেরিয়ে ছিল আর ফেরেনি। সন্দেহ হচ্ছে যে গুণ্ডারা ধরে নিয়ে গেছে।

ও, সি (হেসে উঠলেন)—কে-কাকে ধরেছে বলা কঠিন!

তৃতীয় দৃশ্য

[তিনদিন পরের কথা—প্রণববাবু বসে আছেন—চায়ের একটি পেয়ালা হাতে আছে, পোষাক দেখে অনুমান হয় অফিস থেকে এই মাত্র ফিরেছেন। রেবাদেবী তোলা উনুনে পাখার হাওয়া করে আঁচ তুলছেন। সবিতা বাংলা খবরের কাগজের ছায়াছবির পাতায় মন দিয়ে কি সব দেখছে]

প্রণববাবু—কেন ও এমন কাজ করল। কেন আমাকে জানিয়ে শুনিয়ে সব দিক ব্যবস্থা করে গেল না! কেন সব সম্পর্ক ছিন্ন করে চলে গেল? আমি কি একটা সুরাহা করতে পারতাম না! জানো, গায়ের রক্ত জল করে ওকে উচ্চ শিক্ষা দিয়েছি, ওর বিয়ের জন্য তিল-তিল করে টাকা জমিয়েছি। সংসারের শত দুর্দিনেও সে টাকায় হাত দিইনি। জানো, এর ভেতর নিশ্চয়ই নিবিড় কোনো ষড়যন্ত্র আছে। ওকে নিশ্চয়ই কেউ প্রতারিত করেছে, প্রথমে ছলনা পরে বলপ্রয়োগ। ফিরে আসতে চাইলেও ও ফিরে আসতে পারছে না। ওকে আটকে রেখেছে।

রেবাদেবী—(গর্জন করে ওঠেন) আটকেছে না ছাই।

প্রণববাবু—বাবা মাকে ছেড়ে ও একটি দিনও বাইরে থাকেনি। সামান্য একটু বাইরে বেরুতে হলে 'বাবা যাই' 'মা যাই' বলে জানিয়ে গেছে।

রেবাদেবী—(মুখ ঝামটা দিয়ে বলেন)—চুপ করো, এমন যে অকৃতজ্ঞ তার জন্যে শোক করাও পাপ। জানো, এদিকে পাড়ায় গুজব ছড়াচ্ছে ও নাকি মোড়ের পানওলাটার সঙ্গে ভেগেছে।

প্রণববাবু—আমিও শুনেছি কেউ কেউ বলছে ঐ চোঙা প্যাণ্ট পরা ছেলেটা। যে সর্বজনীন পুজোর চাঁদা তোলার হেড, তার সঙ্গেই সটকেছে—

সবিতা—(খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলে মৃদুগলায় বলে)—আমি যখন কলেজ যাচ্ছিলাম তখন আমাকে চায়ের দোকানের বেঞ্চ থেকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলছিল যে কবিতা এক মাড়োয়ারীকে বিয়ে করেছে, এবার এনতার ঘি দুধ খাবে আর মোটা হবে।

(কথার স্রোতে বাধা পড়ল, একজন থানার লোক ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়ালেন)

থানার লোক—আমি থানা থেকে আসছি। আপনার মেয়েকে বার করা গেছে কিন্তু ধরা গেল না।

প্রণববাবু—(চেঁচিয়ে ওঠেন) তার মানে ? ধরা গেলনা মানে ?

থানার লোক—মানে ত' খুব সোজা। আপনার মেয়ে বৈধভাবে বিবাহে বদ্ধ হয়েছে। আপনার মেয়ে যখন সাবালিকা তখন এ বিয়েতে কোনো অপরাধ নেই। যেখানে অপরাধ নেই সেখানে আমাদের কাজ শেষ।

প্রণববাবু—(উন্মাদের মাথার চুল মুঠিতে আঁকড়ে ধরেন)—আমার মেয়ে বিয়ে করেছে ! আমি জানতে পারলাম না, আর আমার মেয়ে বিয়ে করল ?

সবিতা—(আবহাওয়া তরল করে বলে ওঠে)—দিদি ত' সেই কথাই লিখে রেখে গেছে। আমি ত প্রথম থেকেই বলছি দিদির কথা ঠিক, দিদি কখনো মিথ্যে লিখবে না।

থানার লোক (হাত বাড়াল)—লিখে রেখে গেছে ? কই দেখি ?

(সবিতা একটি একসারসাইজ বুকের খোলা পৃষ্ঠা থানার লোককে দেখায়) এই আমার দিদির হাতের লেখা।

থানার লোক—(সজোরে পড়লেন)—'মা, আমি বিয়ে করতে চললাম, আমার জন্য চিন্তা কোরোনা। আমাকে খুঁজতে যেওনা। আমাদের আশীর্বাদ কোরো। যথা সময়ে দেখা দেব। (একটু হেসে)—

—যা সবই ত' নিজের হাতে লিখেই জানিয়ে গেছে। তবে, মিছি মিছি থানায় নালিশ করতে গিয়েছিলেন কেন ?"

সবিতা (খুশী হয়ে বলে)—দেখুন না, আমি যত বলি ও চিঠি খাঁটি চিঠি ওঁরা বিশ্বাস করতেই চান না ! দিদি খেলো কথা বলার লোকই নয়। ওঁদের মনে ধারণা যে, এই চিঠি ধোঁকাবাজি, আসলে দিদিকে গুণ্ডারা ধরে নিয়ে গেছে।

থানার লোক—আপনাদের ঐ রকম সব আলটু-ফালটু মনে হয় বলেই ত' আমাদের এনতার কাজ বাড়ে। আগে জানলে এত সব ঝুট-ঝামেলায় পড়তে হত না।

রেবাদেবী (আর্তনাদ করে উঠলেন)—তুই থাম। তুই যখন যাবি তখন তুইতো একটা চিরকুটও লিখে রেখে যাবি না।

সবিতা—(বেশ সাহস ভরে)—না, মোটেই নয়, আমি দিদির মত অত

সংক্ষেপে সারবো না, আমি গোটা খাতা ভরে সমস্ত নাম ধাম বংশ পরিচয়, গুণাবলী, সমস্ত কীর্তিকাহিনী সবিস্তারে লিখে যাব।

রেবাদেবী—তুই থাম, বড় ফাজিল হয়েছিস।

সবিতা—না, বল্‌ছি সবই যদি আগে ভাগে জানিয়ে রাখি তাহলে আর পালাবার কি দরকার!

প্রণববাবু—ওর কথা নিয়ে কে মাথা ঘামাচ্ছে, দাঁড়াও আগে কবিতার কথাটি জানি, (থানার লোকটিকে উদ্দেশ্য করে) বিয়ে করেছে বুঝ্‌লেন কী করে?

থানার লোক—ম্যারেজ রেজিষ্ট্রারের খাতা থেকে।

প্রণববাবু—কী সর্বনাশ! কাকে বিয়ে করেছে?

থানার লোক—কে এক রামেশ্বর মিশ্রকে!

প্রণববাবু—রামেশ্বর মিশ্র? সে কে? কোন্ প্রদেশের লোক? (যেন মূর্ছিত হয়ে পড়বেন এমন ভাব)

রেবাদেবী—সে কি বাঙালী?

থানার লোক—আমরা আর পার্স্যু করিনি—যেখানে অপরাধ নেই, সেখানে অনুসন্ধানও নেই।

প্রণববাবু—আচ্ছা রামেশ্বরের ঠিকানাটি কি?

থানার লোক—জানি না, ওর ঠিকানায় আমরা ইনটারেষ্টেড নই।

প্রণববাবু—ম্যারেজ রেজিষ্ট্রারের অফিসটা কোথায়?

থানার লোক—আপনি খুঁজে নেবেন। (থানার লোক চলে যেতে যেতে বিরক্তি ভরে)—যেখানে কেস নেই সেখানে মিছিমিছি হায়রানি। আগুন নেই তবু শুধু শুধু ফায়ার ব্রিগেডকে ডাকা। (থানার লোকের প্রস্থান)

(প্রণববাবু সার্টটা গায়ে গলাতে গলাতে চটিটা খুঁজছেন)

রেবাদেবী—কোথায় যাচ্ছ, অমন পাগলের মত।

প্রণববাবু—যাই একবার থানা হয়ে ম্যারেজ রেজিষ্ট্রারের অফিসে। এই রামেশ্বর মিশ্রটা কে, কোথায় থাকে, কী করে, পারিতো সব জেনে আসি।

রেবাদেবী—(কঠোর গলায়) না তুমি যেতে পারবে না। তুমি বোসো চুপ করে। যে মেয়ে বাপের মুখ কালো করে দিয়ে চলে যেতে পারে তার সঙ্গে আবার সম্পর্ক কিসের?

প্রণববাবু—মানে, এই রামেশ্বরটা কে একবার জানা দরকার।

রেবাদেবী—রামেশ্বর মিশ্র আবার কে হবে? কোনো রাঁধুনে বামুন

হয়তো, নয়তো কাপড়ের দোকানদার, নয়তো কোনো ট্যাক্সি-ড্রাইভার, তার খোঁজে আমাদের দরকার নেই। তুমি বোসো চুপ করে।

(রেবাদেবী স্বামীকে জোর করে বসিয়ে দিয়ে দরজায় ছিটকিনি এঁটে দিলেন)

সবিতা—(আত্মগতভাবে) মিশ্র! মিশ্র মানে বামুন। দিদি ত' খুব চালাক। ব্রাহ্মণ দেখে বেছেচে।

প্রণবাবু—(হতাশ গলায়)—কিন্তু রামেশ্বর! রাঁধুনী বামুন নাকি?

সবিতা—রামেশ্বর ত' ভালো নাম বাবা। মহাদেবের নাম। মহাদেবের আর যা সব নাম আছে—ভোলানাথ, পশুপতি, দিগম্বর, ষণ্ডেশ্বর,—তার চেয়ে ভালো। অনেক ভালো।

প্রণববাবু—কিন্তু আমি ভাবছি কোন্ প্রদেশের? বিহার, ইউ পি, না উড়িষ্যা?

সবিতা—পাঞ্জাব-সিন্ধু-গুজরাট-মারাঠা—যে কোনো প্রদেশেরই হোক ভারতবর্ষের। আমার ত' মনে হয় ভিন্ন প্রদেশের সঙ্গে বিয়ে হলে প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতা দূর হতে পারে।

প্রণববাবু—প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতা দূর হবে? জাতীয় সংহতি?

সবিতা—বাবা, তুমি তো এককালে এসব উদার মত পোষণ করতে। আজ হঠাৎ কেন মুষড়ে পড়ছ?

প্রণববাবু—নিশ্চয়ই করতাম! এখনো করি। আমার ত দুঃখ সে জন্যে নয়, আমার দুঃখ ও আমাকে জানিয়ে গেল না কেন? আমার জীবনে প্রথম উৎসব। ইংরাজীতে এম, এ পাশ মেয়ের বিয়ে, এ আমার কত দিনের স্বপ্ন রে—তার বিয়ে আমার জীবনের সর্বোত্তম উৎসব। আমি নিজে হাতে করে তার মনোনীত বরের হাতে, এই রামেশ্বর মিশ্রের হাতেই সমর্পণ করে দিতাম।

রেবাদেবী—খুব আদিখ্যেতা হয়েছে এখন হাত-মুখ ধুয়ে নাও, একটু কিছু মুখে দাও!

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান : প্রণববাবুর বাড়ির বারান্দা।

[বিবাহের পর দু মাস কাটতে যায়, মার কাছে কবিতা চিঠি লিখেছে। সবাই একমনে শুনছে, সবিতা পোষ্টকার্ডের চিঠিটা পড়ছে—]

সবিতা—দিদির চিঠি, দিদির চিঠি, মাকে লিখেছে—

রেবাদেবী (কাপড়ে হলুদ ছোপানো হাত পুঁছতে পুঁছতে)—পড় দেখি, আমার আবার চশমাটা নেই।

সবিতা—চিঠি পড়েছে মা, আমরা কলকাতা যাচ্ছি। তোমার জামাইকে অফিসের কাজে যেতে হচ্ছে বলে আমরা হোটেলে উঠতে বাধ্য হচ্ছি। গিয়েই তোমাদের প্রণাম করব। আশাকরি তুমি ও বাবা ভালো আছ—সবিও নিশ্চয়ই ফূর্তিতে আছে—ইতি

প্রণববাবু (চিঠিটা নাড়া চাড়া করে) বম্বে থেকে লিখেছে। জামাই অফিসের কাজে কলকাতা আসছে। হোটেলে উঠছে।

রেবাদেবী—প্রণাম করতে আসবে ভাবছে। ঝাঁটা মারো অমন প্রণামের মাথায়—

প্রণববাবু—না না, রাগের কথা নয়, হোটেলে উঠে আমাদের এইখানে কখন আসবার স্থবিধে হবে কে জানে। যাবে ষ্টেশনে ?

রেবাদেবী—তোমার বলতে লজ্জা করল না ? হোটেলে উঠবে, নিজের বাপের বাড়িতে নয়, আর তাকে তুমি আগ বাড়িয়ে রিসিভ করতে যাবে ?

সবিতা—কিন্তু তোমার এই তিন কামরার ফ্লাটে উঠলে ওদের থাকতে দেবে কোথায় ? তিনটের মধ্যে একটা ত' আবার জিনিষপত্রে ঠাসা ! ওরা ঠিকই করেছে হোটেলে উঠছে। আমাদের অস্থবিধে হবে বলেই এই ব্যবস্থা।

রেবাদেবী—(নতুন একটা বিষয় পেয়ে উন্মুখর)—কোন ধাপ-ধাড়া গোবিন্দপুরে কবে ক' কাঠা জমি কিনেছ শুনেছি, কিন্তু আজ পর্যন্ত একটা মাথা গোঁজবার মত আস্তানা হলনা। মেয়ের বিয়ে দিতে ত' খুব সখ, কিন্তু মেয়ে-জামাই বাড়িতে এলে একরাত থাকতে দেবার মত ব্যবস্থা নেই।

[প্রণববাবু কি একটা জবাব দিতে যাচ্ছিলেন বাধা পড়ল, মা মা মা বলতে বলতে কবিতা সিঁড়ি দিয়ে ছুটতে ছুটতে এসে একেবারে রেবাদেবীর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল, আর প্রণববাবু একদৃষ্টিতে পিছনে দাঁড়ান রামেশ্বরকে দেখতে থাকেন, দিব্যি নম্র ভঙ্গিতে সে প্রণববাবুকে প্রণাম করে, এদিকে মা আর মেয়ে দুজনের চোখে আনন্দাশ্রু, রামেশ্বর কে বসতে বলে প্রণববাবু নানা রকম জেরা করছেন—

প্রণববাবু—আচ্ছা বাবা, তোমাদের এই মিশ্র উপাধিটা কত দিনের ?

রামেশ্বর—ঠিক জানিনা, আমাদের আদি পুরুষ এসেছিলেন যুক্তপ্রদেশ থেকে বাংলায়। সেই থেকে আমাদের দেশ মুর্শিদাবাদ—

প্রণববাবু—তোমাদের অফিসটা কিসের? কোয়ার্টার দিয়েছে? গাড়ি-টাড়ি?

রামেশ্বর—কর্মাসিয়াল ফার্ম। একজিকিউটিভ্ বাংলো একটা পেয়েছি, গাড়ি, এখন অফিসের গাড়িই চড়ি, নিজের গাড়ির জন্ম নাম রেজেষ্ট্রি করিয়েছি, পেতে দেরী হবে।

রেবাদেবী—(হুংকার দিলেন) ওরা ট্রেনে ক' দিন কাটিয়ে এল আর তুমি আজে বাজে কি সব বকাচ্ছো—

রামেশ্বর—না-না, আমরা ট্রেনে আসিনি, প্লেনে এসেছি।

সবিতা (দিদিকে জড়িয়ে ধরে)—দিদি, তুই কি ভীষণ চালাক! সব দিক মিলিয়ে বুদ্ধি খাটিয়ে প্রেমে পড়েছিস। বাহাদুর মেয়ে তুই। পানের থেকে এতটুকু চুন খসতে দিসনি।

রেবাদেবী—আমাকে কেন তুই একটু জানতে দিলিনা?

প্রণববাবু—কেন এমন করে পালিয়ে গেলি?

কবিতা (মুখটা তুলে)—তোমাদের কুড়ি হাজার টাকা বাঁচিয়ে দিতে। সেই টাকায় এবার বাড়িটা করে ফেল।

প্রণববাবু—বাঁচিয়ে দিতে। আমাদের বাঁচিয়ে দিতে।

কবিতা—হাঁ, বাবা, না জানিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলাম বলেই তোমার সমস্ত টাকাটা নিটুট থেকে গেল। জানাতে গেলে একেবারে নাজেহাল হয়ে যেতে। তোমার টাকার কত দরকার, রিটায়ার করার ত বেশি আর দেরী নেই। রেজেষ্ট্রি বিয়ে কত সস্তায় হয়ে গেল। কত লেগেছিল জানো?

রামেশ্বর (হেসে বলে ওঠে)—মাত্র সাড়ে বারো টাকা।

কবিতা—বলো ঠিক করিনি।

প্রণববাবু (বিগলিত হয়ে) মা তোর এত বুদ্ধি, এত বিবেচনা।

সবিতা—দিদি তুই কি ঘুঘু। মাঝখান থেকে তুই জামাইবাবুকে ঠকালি।

রামেশ্বর—না না, আমার কিছু দরকার নেই, আমার ঢের জামা-কাপড় আছে, ফার্ণিচার ত' শাস্তি।

কবিতা—(সবিতার গালটিপে) সব পোড়ারমুখি তোর জন্যে।

সবিতা—বারে, আমার আবার কি হবে এসব!

কবিতা—তুই তো আর নিজে জোগাতে পারবিনা, তোকে দাঁড়িয়ে পরীক্ষা দিতে হবে। তাই পরীক্ষকদের ঘুষ দেবার জন্ম বাবার হাতে টাকার

দরকার। শুধু তোর জন্যই রেখে গেলাম। (মার দিকে ফিরে)—মা, একদিন ভালো করে রান্না করে আমাদের দুজনকে খাওয়াও, না।

প্রণববাবু—নিশ্চয়ই। শুধু দুজন কেন পাঁচজনকে ডাকব, সবাই এসে দেখে যাক ছেলে কেমন রূপবান, কবিতার আমার কেমন বরেণ্য বর।

রামেশ্বর—আমরা এখন যাই, পরশু আবার আসব বিকেলের দিকে, সেদিন খাওয়া যাবে।

শেষ দৃশ্য

[প্রণববাবু প্যাণ্ডেল খটিয়েছেন, খাওয়া দাওয়ার বিরাট আয়োজন, আত্মীয়-স্বজনকে বলেছেন। শেষ পর্যন্ত জামাই-মেয়ে কিন্তু এলোনা। হোটেল থেকে হতাশ হয়ে ফিরে এলেন। রেবাদেবী, সবিতা এবং আরো অনেকে তাঁকে ঘিরে ধরেছে—প্রণববাবু অতিকষ্টে বললেন]

প্রণববাবু—ওরা নেই, হোটেল ছেড়ে আবার চলে গেছে।

রেবাদেবী—কোথায় গেল ?

প্রণববাবু—কোনও ঠিকানা নেই, ওরা আবার পালিয়েছে—

[সমবেত কণ্ঠে প্রতিধ্বনি—আবার পালিয়েছে—আবার পালালো]

॥ য ব নি কা ॥

॥ অঙ্কাঙ্ক নাটক ॥

দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

আগুনের ফুলকি

প্রথম অঙ্ক : প্রথম দৃশ্য

[মঙ্গলকোটের দুর্দান্ত প্রতাপশালী জমিদার বিশ্বম্ভরনারায়ণ রায়ের বাড়ীর বৈঠকখানা। প্রশস্ত ঘর, পূর্বপুরুষের ঐশ্বর্য এবং বিলাসিতার চিহ্নস্বরূপ গোটাকতক কাঁচের ঝাড় কড়িকাঠ থেকে ঝুলছে এবং জায়গায় জায়গায় বালিখসা দেওয়ালে প্রায় অর্ধনগ্ন খানকয়েক বিদেশী ছবি টাঙানো। প্রবেশদ্বারের ওপরেই সম্রাট পঞ্চম জর্জ ও সাম্রাজ্ঞীর সম্মিলিত ছবি। ঘরের একপাশে একটা টেবিল ও খানতিনেক চেয়ার, অপরপাশে একটি ইজিচেয়ার। শীতের গোধুলি। বিশ্বম্ভরনারায়ণের পুত্র অদ্বৈতনারায়ণ উত্তেজিতভাবে ঘরময় পায়চারী করছেন।

অদ্বৈত—[পাইপ থেকে খানিকটা ধোঁয়া ছেড়ে] তুমি কাল রামাদীন্‌কে মেরে হরকালি মুখুজ্যের বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিছলে?

বিজয়—আজ্ঞে না। রামাদীন্ মুখুজ্যে মশায়ের বাড়ীর মেয়েদের অপমান করছিল, আমি বারণ করেছিলাম মাত্র।

অদ্বৈত—[গম্ভীরভাবে] হুঁ। সেবারেও তুমি নিত্যানন্দ গোমস্তাকে অপমান করেছিলে। তুমি কি আমার সঙ্গে একটা শত্রুতা বাধাতে চাও?

বিজয়—এসব কি বলছেন! আপনারা বড়লোক—গ্রামের জমিদার—

দেশের মাথা, আপনার সঙ্গে শত্রুতা করবো আমি! আমি একজন নগণ্য মানুষ, আমার অত শক্তি কোথায়?

অদ্বৈত—তবে বারবার তুমি আমার পথে এসে দাঁড়াও কেন?

বিজয়—আপনার চলার পথে তো আমি বাধা দিইনি।

অদ্বৈত—তুমি যে পথ ধরে চলছো সে পথে চলা মানেই আমার চলার পথে বাধা সৃষ্টি করা।

বিজয়—নিজের ইচ্ছামত চলবার অধিকারও কি আমার নেই?

অদ্বৈত—[চেয়ারে বসে] শোনো বিজয়—। তুমি বুদ্ধিমান, লেখাপড়া শিখেছ। কেন এইভাবে নিজের ভবিষ্যতটা নষ্ট করছো? কতকগুলো চাষাভুষো, হাড়ি-ডোম নিয়ে দিবারাত্র মেতে রয়েছ। ছোটলোকগুলোর জন্যে আমার সঙ্গে শত্রুতা করছো; এতে তোমার কি লাভ?

বিজয়—দেখুন, ছোটলোকই বলুন আর চাষাভুষোই বলুন, রক্তের সম্বন্ধটা যে অনেক চেষ্টাতেও ভুলতে পারি না।

অদ্বৈত—দেখ, ওসব কথায় চিঁড়ে ভেজে না। শূন্যগর্ভ কলসী বাজে বটে কোন কাজে লাগে না। আগে নিজের ভিতটা শক্ত করে নাও তবে তো অপরের ভিত গড়তে পারবে। বেশ তো, আমি তোমাকে ইউনিয়ন বোর্ডের, ব্যাঙ্কের মেম্বার করে দিচ্ছি—এ সবের ভেতর দিয়ে গ্রামের উন্নতির চেষ্টা কর।

বিজয়—[অল্প হেসে] তা কি করে হয়? এ যে শ্রেণীগত পার্থক্য। ওদের সঙ্গে আমি বেশ স্বচ্ছন্দে চলতে পারি, আপনাদের ভেতর আমি বড্ড বেমানান হব।

অদ্বৈত—[অত্যন্ত গম্ভীরভাবে] তুমি তা হলে আমার বিরুদ্ধাচারণ করতেই বদ্ধপরিকর। শেষ পর্যন্ত পেরে উঠবে?

বিজয়—[হেসে] বাড়ীতে ডেকে এনে ভয় দেখাচ্ছেন? আমি কারো বিরুদ্ধে কোন কাজ করিনি। আমি শুধু আমার নিজের কাজ করছি।

অদ্বৈত—[গম্ভীরভাবে] থাক্, আর কথার দরকার নেই। তোমাকে এ গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে হবে—কালই।

বিজয়—তা কি করে হয়? আমি আমার পৈত্রিক ভিটে ছেড়ে কোথায় যাব? এটা আপনার অন্যায় জিদ্।

অদ্বৈত—ওসব কোন কথা শুনতে চাই না—তোমাকে যেতেই হবে।

বিজয়—সে আমি পারি না।

অদ্বৈত—পার না—!

বিজয়—না—।

অদ্বৈত—[সগর্জনে] তোমাকে যেতে হবে—

বিজয়—[দৃঢ়ভাবে]—না।

[চেয়ার থেকে উঠে অদ্বৈত প্রথমে চীৎকার করে ডাকল "রামধারী"। পরে দেওয়ালে টাঙানো একটা চাবুক নিয়ে উন্মাদের মত বিজয়ের ওপর চালাতে লাগল। ঠিক সেই মুহূর্তে বৃদ্ধ বিশ্বম্ভর নারায়ণের প্রবেশ। দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ বার্ধক্যে কিঞ্চিত নত। শুভ্র দাড়ি-গোঁফ-চুলের মাঝে কুটিল চোখ দুটো জ্বল্ জ্বল্ করছে।]

বিশ্বম্ভর—[সগর্জনে] অদ্বৈত—। বাড়ীতে ডেকে এনে তুমি এভাবে লোকজনকে অপমান কর। [পিতার গর্জন শুনে অদ্বৈত চাবুক ফেলে একপাশে সরে গেল] ছিঃ ছিঃ, তোমার লজ্জা পাওয়া উচিত। ওর বাবা আমার বন্ধু ছিলেন, তারও একটা মর্যাদা তুমি রাখলে না। [বিজয়ের হাত দুটো ধরে] তুমি কিছু মনে করো না বাবা, ওর ব্যবহারে আমি লজ্জায় মরে যাচ্ছি। স্টুপিড জানে না যে কার গায়ে হাত দিচ্ছে—। [অদ্বৈতের প্রতি] ছিঃ ছিঃ, তুমি হলে দেশের জমিদার, তোমার আচারে ব্যবহারে যথেষ্ট সংযমের প্রয়োজন। [পরে উচ্চকণ্ঠে ডাক দিলেন—"বাসনা, বাসনা"। ভেতর থেকে উত্তর এল "যাই দাদু"। সঙ্গে সঙ্গে ষোল সতের বছরের একটি সুশ্রী মেয়ের প্রবেশ। সাজ পোশাক জমিদারের বাড়ীর উপযোগী] তোমার বিজয়কাকার জন্যে চা-জলখাবার নিয়ে এস।

বিজয়—[বিশ্বম্ভরের কথায় বাধা দিয়ে] না, না, তার দরকার হবে না। যে খাওয়া এইমাত্র খেয়েছি আগে সেটাই হজম করি। আমি তা হলে যেতে পারি ?

বিশ্বম্ভর—দাঁড়াও। [উচ্চকণ্ঠের ডাক] বংশী। [বংশীর প্রবেশ] এই বাবুকে গাড়ী করে বাড়ীতে পৌছে দিয়ে এস।

বিজয়—না—না, কি যে বলেন ! এইটুকু তো যাব তার আবার গাড়ী। হেঁটেই আমি যেতে পারবো। গায়েই আঘাত লেগেছে পা দুটো ঠিকই আছে। আচ্ছা নমস্কার—। [বিজয়ের প্রস্থান]

বাসনা—ও কে দাদু ?

বিশ্বম্ভর—ও ?' ও হচ্ছে দুঃস্বপ্ন, শান্তির মাঝে উপদ্রব, আচ্ছা তুমি এখন ভেতরে যাও তো দিদি। [বাসনার প্রস্থান] মূর্খ—। এরকম করলেই দেখছি তুমি জমিদারী চালিয়েছ—!

অদ্বৈত—আপনি জানেন না বাবা ওদের স্পর্ধা। একেবারে মাথায় চড়ে বসতে চায়।

বিশ্বম্ভর—চুপ কর। আমায় কি তোমার কাছ থেকে শিক্ষা করতে হবে? ভুলে যেও না অদ্বৈত, এই জমিদারী তোমার আগে আমি বহুদিন চালিয়েছি। তখন চাবুকেই কাজ হত। আজ আর সেদিন নেই—, মারলে বুঝতে পারে। যুগের হাওয়ার সঙ্গে পা ফেলে চলতে হবে, নইলে পতন অনিবার্য।

অদ্বৈত—কিন্তু তাহলে উপায় কি?

বিশ্বম্ভর—[মুচকে হেসে] উপায়—, উপায় আছে বৈকি। যেমন রোগ তার তেমনি ওষুধ, নইলে কাজ করবে না। চেষ্টা কর বিজয়কে দলে টানতে কারণ ওই দলের পাণ্ডা। যদি না পার ওদের দলের ভেতর ভাঙন ধরিয়ে দাও।

অদ্বৈত—সে কি করে সম্ভব হবে?

বিশ্বম্ভর—[হেসে] হবে—হবে, সব সম্ভব হবে। রূপোর চাঁদি দু'হাতে ছড়িয়ে দাও, দেখবে সকলেই ছুটে চলেছে কুড়োতে—কেউই আর কেন্দ্রীভূত নেই। ও বড় মজার ওষুধ—সর্বরোগের ধন্বন্তরি; তবে প্রয়োগটা একটু বুঝেসুঝে করতে হয়। আর সর্বশেষ ওষুধ হচ্ছে··· ···বাসনার সঙ্গে বিজয়ের······হাঃ—হাঃ—হাঃ, অবাক হয়ো না, জমিদারী রাখতে গেলে অনেক কিছু করতে হয়।

[বাসনার দ্রুত প্রবেশ]

বাসনা—দাদু, আজ তুমি আমার গান শুনতে যাবে না? [কণ্ঠে আবদারের সুর]

বিশ্বম্ভর—যাবো বৈকি দিদি, নিশ্চয়ই যাব। তোমার বাবাকে সমর-বিজয় অধ্যায়টা বুঝিয়ে দিচ্ছিলাম কি না, তাই যেতে পারি নি।

বাসনা—[আবদারের সুরে] ও সব ছাই ভস্ম এখন থাক,—তুমি চল।

বিশ্বম্ভর—চল দিদি, চল।

[বিশ্বম্ভর ও বাসনার প্রস্থান। খানিক পরে সদর দরজা দিয়ে কুটিলাকৃতি বিপিনচন্দ্রের প্রবেশ।]

অদ্বৈত—কি খবর বিপিন?

বিপিন—[শ্রদ্ধাভরে অদ্বৈতের পদধূলি গ্রহণ করে] খবরটা শুনে চলে আসচি।

অদ্বৈত—তুমি একটি অপদার্থ।

বিপিন—[আমতা আমতা করে] তা যা বলেছেন, কিন্তু আমি কি করলাম ছোট বাবু?

অদ্বৈত—কতদিন থেকে তোমাকে বলচি যে বিজয় আর সমরকে এখান থেকে সরিয়ে ফেলতে হ'বে,—তা তুমি কিছুতেই পারলে না।

বিপিন—আজ্ঞে আমি চেষ্টার তো কসুর করচি না।

অদ্বৈত—ছাই করচো। ওসব কোন কথা শুনতে চাই না। যেমন করে পার তোমাকে করতেই হবে।

বিপিন—আজ্ঞে কাজটা একটু কঠিন কিনা তাই পেরে উঠচি না। [অল্প মুচকে হেসে] অন্য কোন কাজ হলে আমি এতদিনে কোনকালে করে ফেলতাম। বিজয় তবু ঠাণ্ডা মেজাজের লোক, কিছু বলতে গেলে শুধু ঠাট্টা করে। আর সমর, ওরে বাপরে বাপ, একেবারে জলন্ত আগুন; যেন ভস্ম করে দেবে, এমনি ব্যাপার।

অদ্বৈত—কতটাকা হলে তুমি পার? কোন সঙ্কোচ কোরো না, যা লাগবে দেবো।

বিপিন—আজ্ঞে, পৃথিবী টাকার বশ বটে, বিজয়কে হয়তো চেষ্টা করলে পারা যেতেও পারে। কিন্তু সমর, ওকে কিছুতেই পারা যাবে না। ও হচ্ছে পৃথিবীর বাইরের জীব—টাকাকড়ি গ্রাহ্যই করে না। ওর ভারটা আপনি অন্য কাউকে দিন।

অদ্বৈত—[গম্ভীরভাবে] হুঁ। বাবা কি বলছিলেন জান—? ও নাকি কেউটে বিশেষ।

বিপিন—আজ্ঞে উনি বিজ্ঞ লোক ঠিকই বলেছেন। তার ওপরে যদি কিছু থাকে তো ও তাই। ওকে দেখলে আমি আর সে পথ দিয়ে চলি না। কি জানি, ঘুসিটুসি বুঝি বা একটা মেরে দেয়—যা চোয়াড়।

অদ্বৈত—[গম্ভীরভাবে] আচ্ছা, এখন যেতে পার। আমি ভেবে দেখি।

বিপিন—আজ্ঞে তাই দেখুন, যদি কিছু পথটথ খুঁজে বার করতে পারেন।

[বিপিন হেঁট হয়ে অদ্বৈতকে প্রণাম করে চলে যেতে যেতে আবার ফিরে দাঁড়ালো]

অদ্বৈত—কি দাঁড়ালে কেন? কিছু বলবার আছে?

বিপিন—[আমতা আমতা করে] আজ্ঞে আর একটা কথা ছিল বলবার।

অদ্বৈত—কি কথা?

বিপিন—আজ্ঞে সেই—সেই……।

অদ্বৈত—কথাটা খুলে বল, সেই সেই করলে কি করে বুঝবো।

[বিপিন অদ্বৈতের কানের কাছে মুখ নিয়ে চুপি চুপি কি বোললো]

[উচ্চহাস্যে] ও—হো—হো, রাজী আছে ?

বিপিন—আজ্ঞে হ্যাঁ, রাজী আছে।

অদ্বৈত—বেশ, বেশ। এই নাও তোমার খরচ। [টাকা প্রদান] হ্যাঁ ভাল কথা, মৃণ্ময়ী কি বলে ?

বিপিন—ওরে বাবা, ওকি মেয়েমানুষ! যেন বাঘিনী, এগোয় কার ক্ষমতা। একদিন সবেমাত্র সুর ভাঁজতেই, সে মারে আর কি। বলে সমরকে বলে দোবো। পালিয়ে প্রাণ বাঁচাই। [খানিক চুপ করে] তা তাকে কি এখানেই নিয়ে আসবো ?

অদ্বৈত—[সরোষে] তুমি একটি আস্ত গাধা। দেখচ না বাবা রয়েচেন, ওদিকে বাসনা রয়েচে—এখানে নিয়ে আসবে! পাগল নাকি! রঞ্জনদিঘীর বাগান বাড়ীতে—বুঝলে ?

বিপিন—আজ্ঞে সেই ভালো। কাকপক্ষীতে জানতে পারবে না।

[বিপিনের প্রস্থানোদ্যোগ]

অদ্বৈত—বুঝলে বিপিন ওটা কিন্তু আমার চাই-ই [হেসে]

[বিপিন ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে ধীরে ধীরে প্রস্থান করলো।]

(ক্রমশঃ)
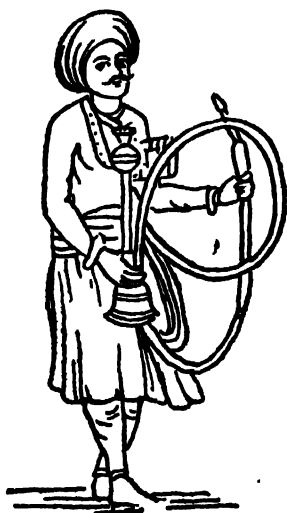
তৃপ্তি বসু

প্রজাপতির নানারঙ

—আচ্ছা, এই প্রেমটা একটু কস্টলি হয়ে গেল না?

—তা গেল—সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করল মিনতি;

—কিন্তু আজকের দিনে কস্ট না দিয়ে, কষ্ট না করে কোন্ কেষ্টটাই বা মেলে বল?

—তা মেলে না—এবার আমিও স্বীকার করলাম; কিন্তু....কস্টটা ত আপেক্ষিক হতে পারত বিয়েটা যখন প্রেমজ।

—হয়ত পারত। তবু আমার বেলায় যে তা হোল না সেইটিই সত্য। নইলে শুনেছিস কখনো যে চার চারটে বছর ধরে প্রেম করা বিয়েতে ড্রইং, ডাইনিং আর বেড্রুম সেট এবং সেই সঙ্গে প্রতিটি রুমের আরও নানা সেটিং এর চাহিদা? ঘড়ি, বোতাম, গয়নাগাঁটির আনুষঙ্গিক ত আছেই এ ছাড়াও নগদ আটটি হাজারের কারেন্সি নোট!......তবু নাকি আইন করে যৌতুক নেওয়া বন্ধ হয়ে গেছে! এক এক সময় ইচ্ছে করে দিই ভেঙে এ বিয়ে কিন্তু...।

—বসন্ত আপত্তি করে নি?

—পাগল! আপত্তি করলে নাকি সম্মতিই দিত না বাড়ী থেকে! সব-সব বাজে—সব ছল বুঝলি? আসলে ওর নিজেরও ভেতরে ভেতরে আছে

প্রচণ্ড লোভ। অথচ তথাকথিত ভদ্র, সভ্য, শিক্ষিত হয়ে স্ব নামে সে লোলুপতা প্রকাশ করতে পারে না তাই বে-নামে, বাড়ীর নামেই…।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম—

—এতই যদি বুঝিস নাই বা করতিস এখানে বিয়ে।

—না করে নিস্তার আছে? সুদীর্ঘ চার বছর ধরে আমার দেহ মনের ওপর দিয়ে যে ক্ষতি হয়ে গেছে বিয়ে না করলে, বিশেষ করে এখানে না করলে, তার ক্ষতিপুরণ হয় কি করে? তাই আগ্রহ না থাকলেও উপায় নেই। এক অন্ধকার থেকে পা ফেলে আমায় এগিয়ে চলতেই হবে আর এক অন্ধকারে। এ তবু কিছুটা চেনা অন্ধকার।

এক এক সময় মিনতিকে আমার ভয়নক ভাল লাগত। বিশেষ করে সেই সব সময় যখন মনের ওপর থেকে ধার করা মুখোশ একটানে ছুঁড়ে ফেলে অত্যন্ত সহজভাবে ও কাছে এসে দাঁড়াত। কৃত্রিমতা নেই, উন্নাসিকতা নেই, বেশে বাসেও নেই অশালীন প্রখর্যের সঙ্গে রঙের উচ্চরোল। শুধু শ্যাম্পু করা চুলের অবিন্যস্ত কবরীতে, ডান ভ্রুর ওপর নেমে আসা শাসন না মানা একগুচ্ছ অবাধ্য কেশে, চওড়া পাড় হাল্কা শাড়ী ও সাদা ব্লাউজে মোম-নরম স্নিগ্ধ একটি মেয়ে।

ভাল লাগত সুধাকান্তর। ভারী একটা সাদামাটা মিষ্টি রূপ আছে মেয়েটার। চড়া প্রসাধনের অন্তরাল থেকেও সেই রূপ মাঝে মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে বসে। ক্বচিৎ মুহূর্তে এমনও মনে হোত সুধাকান্তর যে এ মেয়ে যদি ঘরণী হয়ে কাছে আসে তাহলে মন্দ হয় না। কিন্তু সে ওই ক্বচিৎ মুহূর্তেই। আসলে সুধাকান্ত ঠিকই আছে। সুধাকান্ত চেনে এ মেয়েকে। তাই মুগ্ধ হবার মুহূর্তেই নিজেকে টেনে তোলে। ছিন্ন করে মোহবন্ধন। মিনতিকে প্রথম ওর ভাল লেগেছিল অন্যকারণে। ভাল লেগেছিল বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্যে। 'অদ্ভুত ইনটেলিজেণ্ট মেয়েটি—' এই হোল মিনতি সম্বন্ধে সুধাকান্তর ফার্স্ট ইম্প্রেশন। ক্রমশঃ আরও পরিচয় পেয়েছিল।

বান্ধবীকে পত্র দিয়েছিল মিনতি—

"বুঝলি ভাই জীবনে আর স্বাদ নেই। ভাবছি যে দু'চারটে শখ, সাধ আজও আছে তাড়াতাড়ি মিটিয়ে নিয়ে শেষ স্বাদের আস্বাদ নিলে কেমন হয়? শুধু আজ নয়। কিছুদিন থেকেই এই ভাবনায় ভোর হয়ে আছি। বিশ্বাস কর আমার মত ধৈর্যহীন এক মেয়ের পক্ষে পৃথিবীর অনেক কিছু সম্বন্ধে আজ এই ধরনের চিন্তা করাটা বোধহয় অযৌক্তিক নয়। সংসারে আরও অনেক

কঠিন, অনেক বাস্তব দুঃখ-দ্বন্দ্ব আছে জানি। কিন্তু আমাদের মত মেয়েদের যাদের ইচ্ছা বা অভিলাষ শুধু প্রকাশের অপেক্ষা, শাড়ী, গাড়ী আহার, বিহার সবেতেই যারা বাধা-বন্ধহীন, তাদের অলস মন আর প্রচুর অবকাশের জীবনে আমার মত প্রেমের সমস্যাই একমাত্র মৌল সমস্যা—যার সমাধান আমার জানা নেই। তবু, এইটুকুই জেনেছি যে শত আকুলতা সত্বেও জীবনের সেই শেষ স্বাদ নিতে যদি প্রকৃতই পিছিয়ে আসি তাহলে ওই সমস্যাকে সাথী করেই চলতে হবে আমায় চিরদিন—।"

মিনতি মৈত্রের সমস্যাটা অদ্ভুত। বসন্ত কাঞ্জিলালের সঙ্গে প্রেম হয়েছে, প্রণয় হয়েছে, পরিণয়েরও বিলম্ব নেই। অথচ আজকাল মাঝে মধ্যেই তার ওপর কেমন যেন ক্ষেপে উঠছে মিনতি। বসন্তর নাম শোনা মাত্রই মেজাজ চড়ছে। তার সঙ্গে এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট করে হয়ত ঠিক সেই সময়ই হাতের কাছে পাওয়া কোনও অযোগ্য ভক্তকে পাশে নিয়ে বসে আছে সিনেমা হলের আলো-আঁধারে। সেখানেও শান্তি নেই। 'আসছি' বলে ইন্‌টারভ্যালে উঠে পড়ে ট্যাক্সি নিয়ে—পৌঁছে যাবে সোজা বান্ধবীর বাড়ী। বসন্তর সঙ্গে বিয়ের কথা পাকাপাকি হয়ে যাবার পর থেকেই যেন এ ছটফটানি বেড়েছে ওর। কি যেন চাইছে, কি যেন খুঁজছে, কি যেন পাচ্ছে না।

এক সন্ধ্যায় আমার কাছে এল মিনতি। অজন্তা স্টাইলের খোঁপায় গোঁজা গোলাপ কুঁড়িটি থেকে শুরু করে স্লিপারের স্ট্র্যাপটি পর্যন্ত চড়া লালের সুষ্ঠু সামঞ্জস্য। হেসে বললাম—

—অনেক মনই ত মাতিয়েছিস, অনেক প্রাণই রাঙিয়েছিস, আজ আবার কোন্ নির্বোধ পতঙ্গকে পোড়াবার জন্যে এ বহ্নি-বিন্যাস? পুরুষ যে আজ পাগল হয়ে যাবে তোকে দেখে।

কই আর হেল—! কেমন এক বিষণ্ণ স্বরে জবাব দিল মিনতি।

—হোল না? বলিস কি? বসন্ত কি এ ড্রেস দেখে নি তোর?

—বসন্ত? তার কথা ওঠে কেন?

—তাহলে কার কথা উঠবে? এমন করেই ভোলালি যে বসন্ত চিরদিনের মত দাসখৎ লিখে দিল তোকে; দিয়ে দিল ব্ল্যাঙ্ক চেক্। সারাজীবনের মত শুধু ওই একটি মাত্র ঋতুই সাথী হোল তোর।

—তোর লোভ থাকে সে চেক্ তুইই নিয়ে নিগে যা—অবগাহণ করগে যা বসন্ত ঋতুতে।

—মানে?

—মানে মনটাকে কিছুতেই ঠিকমত বুঝতে—চায় না। খালি জোর, খালি জবরদস্তি। আর—আর—ভারী বিশ্রী। যখন তখন যা তা বলে বসে। যেন এখনি আমি ওর বিয়ে করা বৌ হয়ে গেছি আর কি! ছ্যাবলা কোথাকার! কেমন এক বিদ্বেষ ও বিতৃষ্ণার নিবিড় কুঞ্চন জেগে উঠল মিনতি মৈত্রের ওষ্ঠ আর নাসিকার ভাঁজে। চমকে উঠলাম। চিন্তিত হলাম। আর তাই গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করলাম—

—তোর সঙ্গে বসন্তর বিয়ের দিন ঠিক হয়ে গেছে না?

—হ্যাঁ, সামনের মাসেই।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে আবার আস্তে করে জানতে চাইলাম—

—তোর কি ওকে ঠিক পছন্দ নয়?

—পছন্দ নয়? হা-হা-হা-হা—ভীষণ পছন্দ, ভয়নক পছন্দ, খুব খুব বেশী রকম পছন্দ। আমি স্ত্রী প্রজাপতি, ও পুরুষ ভ্রমর। পছন্দ না হয়ে উপায় আছে? জীবনে মিল, ছন্দে মিল, গতিতে মিল, রীতিতে মিল—মিলতেই যে হবে আমাদের নইলে……হা—হা—হা—

কথা শেষ করার আগেই আবার অস্বাভাবিক উচ্ছ্বাসে হাসিতে ফেটে পড়ল মিনতি। মেয়েটাকে ভালবাসি। তাই সমস্ত হাসি উচ্ছ্বাসের অন্তরালে ধরাছোঁয়ার অতীত একটা সূক্ষ্ম বিষন্নতার আভাস পেয়ে আমিও বিষন্ন হয়ে উঠলাম। এরি আগে কথাপ্রসঙ্গে একদিন বলেছিল—

—তুই বলিস যে আমাকে দেখলেই পুরুষ মাত্রাই ঘায়েল হয়। সব বাজে কথা তোর, সব মিছে কথা।

—মিছে কথা? মানে সুশ্রী সৌন্দর্য আর ছলা-কলাসমৃদ্ধ এমন একটি ওয়েল্ ড্রেস্ড্ মহিলাকে দেখে কোনও পুরুষই ভিরমী খায় না বলতে চাস?

—যারা খাবার তারাই খায়—খাবার জন্যে তৈরীই থাকে তারা। কিন্তু যারা না খাবার—ড্রেস্ড্, আন্‌ড্রেস্ড্ কোনও অবস্থাতেই তারা খায় না বুঝলি?

—সে—কি—রে—কপট বিস্ময়ে চোখ বড় বড় করে আমি বলি—ওই শেষ কথাটা যা বললি অমন অবস্থাতেও কখনো কাউকে ভিরমী খাওয়াবার চেষ্টা করেছিস নাকি?

—বাঁদরী কোথাকার! হেসে ফেলল মিনতি। তোর সঙ্গে কথা বলাই দায়। ওটা ত কথার পিঠে এসে যাওয়া কথা—।

—তাই বল্ বাপু, যা ভয় পাইয়ে দিয়েছিলি! সেইদিনই চলে যাবার সময় মুখ ফিরিয়ে হঠাৎ আবার বলেছিল—

—বিশ্বাস কর, যা বলেছি তা একবর্ণও ভুল নয়। যে পুরুষ ভিরমী না খাবার তাকে তুই কিছুতেই খাওয়াতে পারবি না—শত চেষ্টাতেও না।

কি জবাব দেব ভেবে না পেয়ে আলগোছে উত্তর দিলাম—

—তা হতেও পারে; এক একটা পুরুষ থাকেই অমন বেয়াড়া।

—বেয়াড়া?······তাই বোধহয় থামল মিনতি। একটু থেমে আবার বলল—

—বুঝলি খবর পেয়েছি সে আগেই বুকড্ হয়ে আছে। একটি বান্ধবী আছে তার কিন্তু...ভয়ানক দেখতে ইচ্ছে করে সেই বান্ধবীটিকে। কতবড় রূপসী সে, কি তার আকর্ষণ যে অলক্ষ্যে, অগোচরে থেকেও আমার এত কৌশল, এত চেষ্টা সমস্ত ব্যর্থ করে দিল।

মিনতি চলে যাবার বহুক্ষণ পরে খেয়াল হোল মস্ত একটা ভুল হয়ে গেছে। ওকে জিজ্ঞাসা করা হোল না যে ওর সেই না পাওয়ার মানুষ, সেই আরাধনার ধনটি কে?

মিনতির জন্যে মনটা খারাপই ছিল। তাই সুধাকান্তকে বললাম সে কথা। শুনেই চটে উঠল—

—মিনতির কথা রাখ। ও একটা—ও একটা—আসলে বুদ্ধি থাকলে কি হবে মেয়েটা ভয়নক হ্যাংলা। একেবারে ডেপ্‌থ্ নেই।

ব্যাপার মন্দ নয়। মিনতি বসন্তকে বলে 'ছ্যাব্‌লা' আর সুধাকান্ত মিনতিকে বলে 'অগভীর'। হেসে জানতে চাইলাম—

—মিনতিকে এতকাল ত তুমি ভালই বলতে তাহলে আজ হঠাৎ চটলে কেন?

—ভাল ত আজও বলি। ভাল বলি ওকে বুদ্ধির দিক দিয়ে, ঔজ্জ্বল্যের দিক দিয়ে। একটা কথা জেনে রেখ রূপ আর অর্থের সঙ্গে বুদ্ধির কম্‌বিনেশন বড় একটা পাওয়া যায় না—বিশেষ করে মেয়েদের মধ্যে। মিনতিতে সেই রেয়ার কোয়ালিটি দেখেই খুশী হয়েছিলাম। কিন্তু ওর অন্য আরও একটা রূপ আছে। ধর···বসন্তর সঙ্গে ওর প্রেমের বিয়ে, দিনক্ষণও ঠিক হয়ে গেছে অথচ তুমি বলছ কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্ত। আসলে ও একটি প্রজাপতি মন। এক জায়গায় আটকে থাকতে পারে না। যেখানে যা পায়, যতটুকু পায়, লুটেপুটে নেবার চেষ্টায় থাকে। নইলে আমাকেও—।

—তো মা কে ও!

—হ্যাঁ, অফিস থেকে ফিরছিলাম। বৃষ্টিটা একটু কমে এলেও ট্রামে বাসে জায়গা পাবার আশা দুরাশা। তাই কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে ট্যাক্সি ধরেছিলাম। হঠাৎ দেখি ফরেন্ ল্যাঙ্গুয়েজ শেখার একটা স্কুলের সামনে মাথায় কাপড় তুলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজছে মিনতি। শাড়ীটা অর্ধেকেরও বেশী ভেজা, জামাটাও তথৈবচ। গাড়ী দাঁড় করিয়ে তুলে নিলাম। স্কুলের ছুটী হয়ে গেছে অথচ সময়মত বাড়ীর গাড়ী এসে পৌঁছয় নি। তাই কোনও একটা ট্যাক্সির অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিল।

যাইহোক, দরজাটা খুলে ধরতেই একেবারে ধপ্ করে এসে বসে পড়ল গায়ের ওপর। ভাবলাম জলে ভেজা শরীর নিয়ে উঠতে গিয়ে হয়ত ব্যালান্স রাখতে পারে নি ঠিকমত। কিন্তু একটু অপেক্ষা করে দেখলাম সরে যে বসতে হবে বা সরে যে বসা উচিত সে খেয়ালই যেন নেই ওর। শেষে আর চুপ করে থাকতে না পেরে বিদ্রূপভরে বললাম—"তোমার শাড়ী ব্লাউজের অভাব নেই জানি। আমাকে কিন্তু আগামী কালও এই একই পোশাকে অফিস করতে হবে। প্যান্টে জলে ভেজা দাগ নিয়ে কি···"

"সরি" বলে সেই যে ওদিকে সরে বসে বাইরের দিকে মুখ ঘোরাল সহজে আর ফিরল না। সুর কেটে গেলেও দু'জন চেনা মানুষের একেবারে চুপচাপ পাশাপাশি বসে থাকা যেন কেমন অস্বস্তিকর। তাছাড়া নিজের আচরণে লজ্জাও পাচ্ছিলাম মনে মনে। কথাটা অন্যভাবেও বলা চলত। তাই চেষ্টা করে ভেবেচিন্তে এদিক ওদিক যে দু'চারটে বাক্যবয়নের প্রয়াস পাচ্ছিলাম তার সব জবাবই দিচ্ছিল ওদিকে ফিরে। শেষে আমিও হাল ছেড়ে আমার দিকের রাস্তা দেখতে শুরু করলাম। ইতিমধ্যে আবার বৃষ্টি নেমেছে জোরে। বাড়ীর মোড়ে টার্ণ নেবার আগেই হঠাৎ একেবারে হুমড়ি খেয়ে আবার গা ঘেঁসে এল মিনতি। গোপন কথা বলার মত প্রায় ফিস্‌ফিসিয়ে উঠল—

—শুনছেন?

—বল।

—গাড়ীটা একেবারে বাড়ীর সামনে না দাঁড় করিয়ে একটু তফাতে থামালে হয় না?

—কেন? বিস্মিত সুরে প্রশ্ন করলাম।

—এই বৃষ্টি···জামাকাপড়ের এই অবস্থা···তার ওপর আপনার সঙ্গে একলা এক ট্যাক্সিতে এসেছি দেখলে বাড়ীতে যদি···

মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম ক্ষণকাল। তারপর কঠিন সুরে জবাব দিলাম—

—প্রজাপতিবৃত্তি ত অনেক হল, আর কেন?

চুপ করে শুনছিলাম। কথা শেষ করে সুধাকান্তও অন্যমনস্ক হয়ে তাকিয়ে রইল। একসময় স্তব্ধতা ভেঙে বললাম—

—ঘটনাটা জানতাম না। তা শেষ পর্যন্ত কোথায় নামালে ওকে? মোড়ের মাথায়?

—মাথা খারাপ! চুরি করছি না অন্যায় করছি যে লুকিয়ে করব?

আবার কিছুক্ষণ পরে মৃদু হেসে প্রশ্ন করলাম—

—প্রকৃতির বুকে বৃষ্টির রিমঝিম; কাঁচতোলা ট্যাক্সির অভ্যন্তর, আলো-আলো, ছায়া-ছায়া আর অল্প ব্যবধানে বসে থাকা সিক্তবসনা সুন্দরী—এতটুকুও চাঞ্চল্য জাগেনি বলতে চাও?

—জাগে নি, তোমায় কে বললে? সেত সেই প্রথমেই ভেজা জামাকাপড়ে দাঁড়িয়ে থাকা ঘোমটা তোলা মুখখানা দেখেই জেগেছিল। আমি পুরুষ, হাতে তালি বাজিয়ে উৎসব আসনে নেচে বেড়ান আমার পেশা নয়, সৃষ্টিই আমার ধর্ম। কাজেই চাঞ্চল্য ত জাগবেই।...সব নষ্ট করল মিনতি নিজেই। ওর ইনিসিয়েটিভ্ নেওয়া দেখেই আমার মেজাজ চড়ল, নইলে···বাকিটা তোমার ভালই বুঝলে—আমার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে কথা শেষ করল সুধাকান্ত।

মিনতি মৈত্র একদিন মহাসমারোহে মিনতি কাঞ্জিলাল হয়ে গেল। বসন্ত কাঞ্জিলালের সঙ্গে বিয়ে হল ওর। বিয়ের কিছুদিন পরে এক নির্জন মধ্যাহ্নে দেখা করতে গেলাম ওর সঙ্গে। এদিক ওদিক্ দু'চারটে কথাবার্তার পর জানতে চাইলাম কেমন লাগছে এ জীবন। এক গাল হেসে সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল—

—খুব, খুব ভাল বুঝলি, ভীষণ ভাল—বলতে বলতেই হঠাৎ কেমন গম্ভীর অন্যমনস্ক হয়ে গেল। আমার দিক থেকে সম্পূর্ণ মুখ ফিরিয়ে জানলা দিয়ে তাকিয়ে রইল বাইরের দিকে। কি যেন ভাবল মনে মনে। তারপর সেইভাবে থেকেই এক সময়ে যেন আত্মগত ভাবে ধীরে ধীরে বলতে থাকল—

—সংসার জীবনের সিং দরজার চাবি কবে যেন একদিন খুঁজে পেয়েছিলাম

কোন অতল জলে লুকিয়ে রাখা পদ্মের মধ্যে—বিয়ের মধ্যে। দুরু দুরু বুকে অল্পে অল্পে এগিয়ে চলেছি। মাঝে মাঝে থমকে গিয়ে দাঁড়িয়েও পড়ছি বার বার। কোথাও ভয়ঙ্কর প্রহরী খড়্গ উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আমার একটিমাত্র বে-হিসেবী পদক্ষেপের প্রতীক্ষায়। কোথাও বা রূপে, বর্ণে অনবদ্য কুসুমের সৌরভ। আবার তারই পাশে গুপ্ত রয়েছে কাঁটার গুল্ম। ভুল করে, অসাবধানে, এক একসময় যখন পা দিয়ে ফেলছি সেই কাঁটায়, অঝোরধারে রক্ত ঝরছে এক দেবদূত এসে আদরে, যত্নে নিরাময় করে তুলছে আমাকে। কখনো বা আবার সেই দেবদূতবেশী দানবই সম্পূর্ণরূপে নিংড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে।…অকস্মাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে চোখে চোখে চেয়ে তীব্রস্বরে প্রশ্ন করল—

—হ্যাঁরে, এরই নাম কি সংসার? তাই যদি হয়, পরোয়া নেই। চ্যালেঞ্জ আমি গ্রহণ করলাম। দেখি শেষ পর্যন্ত অদৃষ্ট আমায় কোথায় নিয়ে যায়। পঙ্ককুণ্ডেই ডুবে যাই অথবা পঙ্কজ হয়ে ফুটে উঠি।

বসন্ত আর মিনতি হনিমুনে চলে গেছে। ইতিমধ্যে একদিন বিয়ে হয়ে গেছে সুধাকান্তরও। তারপরও অনেকগুলো দিন কেটে গেল। নির্জন অবকাশে মাঝে মাঝে মিনতির কথা মনে পড়ে। কবে ফিরবে মেয়েটা কে জানে! কতদিন যেন দেখিনি ওকে। পঙ্কজ হয়ে ফুটে ওঠবার সাধনায় হয়ত বিস্মৃত হয়েছে সমস্ত অতীত অথবা পঙ্ককুণ্ডেই ডুবে যাচ্ছে—কে দেবে সে খবর?

খবর দিল মিনতিই। সুদীর্ঘ এক পত্র দিয়ে জানাল—

ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি। ভুবনেশ্বরে, কোণারকে, পুরীতে—ঘুরে বেড়াচ্ছি সমুদ্রতীরে। যে যুগে আমরা নিঃশ্বাস নিয়ে চলেছি এই যুগ জলবার যুগ, অঙ্গারের যুগ, জ্বলে জ্বলে নিঃশেষ হওয়ার কাল। তাই সমুদ্র গভীরতা কোথায় পাব বল, শুধু তার শূন্যতা আর হাহাকার, আর অশ্রান্ত কান্নাকেই তুলে নিয়েছি বুকে করে।

ভাবছিস কান্না কেন? কান্নাই যে সত্য, কান্নাই শাশ্বত। সৃষ্টির কান্না থেকেই জীবনের উদ্ভব। মাটির কান্নাতেই ঝরে আকাশের অনুগ্রহ, অঙ্কুরের উদ্গমন। বেদনার কান্নাতেই প্রাণের প্রথম আলোক বরণ। শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান সবকিছুর জন্ম তো সেই কান্না থেকেই। জানার কান্না, বোঝার কান্না, প্রকাশের কান্না। তাই আমিও যে কাঁদব এ আর বেশী কি?

একটা কথা তোকে জানাবার জন্যেই আজ আমার এ পত্রের অবতারণা। খবর পেলাম আমার মতই আমার সেই না পাবার মানুষটিও আর একক নেই। সেই বান্ধবীটিকেই বরণ করে নিয়েছে। নিজেকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করে

দেখেছি যে আমার মধ্যে আছে দু'দু'টো বিভিন্ন সত্তা। একটা চায় ছোট সুখ, ছোট আনন্দ। পুরুষের সঙ্গে একটু আধটু ঘনিষ্ঠতা, অল্প-স্বল্প স্পর্শের প্রশ্রয় আর মাঝে মাঝে তাদের বুকে আগুন ধরিয়ে নিরাপদ দূরত্বে সরে এসে সেই দাহ-যন্ত্রণা উপভোগের কৌতুকলীলা। অন্যটা একেবারেই আলাদা। তার চাওয়ায় বিচার আছে, বুদ্ধি আছে, আছে জীবনকে জানার উন্মুখ আগ্রহ। আমার সেই সত্তাই কাঁদতে জানে, ভাবতে জানে আর সেই দ্বিতীয় সত্তাই চেয়েছে সুধাকান্তকে আপন করে, নিবিড় করে পেতে, বসন্তর সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছে আমার একমন, অপর মন চিরদিনই কেঁদে ফিরেছে সুধাকান্তকে কেন্দ্র করে। তাই যতই এগিয়ে এসেছে যে কোনও একজনকে বেছে নেবার চূড়ান্ত সময় ততই অধীর হয়েছি, অস্থির হয়েছি, উন্মাদের মত ফিরেছি ঘুরে ঘুরে। অথচ আমার তূণে যত বাণ ছিল অনেক ভেবেচিন্তে সুকৌশলে সমস্ত উজাড় করেও পারিনি সুধাকান্তকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করতে। এইখানেই আমার সবচেয়ে বড় লজ্জা—সবচেয়ে বড় পরাজয়।

কৌতূহল ছিল কে সেই সুন্দরী যার অলক্ষ্য প্রভাব এমন কঠিন বর্মের মত সুরক্ষিত করে রেখেছে সুধাকান্তকে? এতদিনে সে সুন্দরীর সন্ধান পেলাম। তোকে ক্র্যাঙ্কলি বলছি রুচির প্রশংসা করতে পারলাম না সুধাকান্তর। অন্ততঃ রূপ আর অর্থ দুদিক দিয়েই আমার কাছেই বেশী লাভবান হোত সে। কিন্তু অদ্ভুত হলেও আরও একটা সত্যি কথা শোন, নিজেকে ভাল করে চিনেছি, জেনেছি বলেই এমন নিঃসংশয়ে বলতে পারছি যে আমার শত আকুলতা সত্ত্বেও, সুধাকান্তকে পেলেও, হয়ত আমি পূর্ণরূপে তৃপ্ত হতাম না। তখন আবার এমনি হাহাকারই জাগত আমার বসন্তকে ঘিরে। অথচ বসন্ত বা সুধাকান্ত কারুর পক্ষেই সম্ভব হোত না এককভাবে একই সঙ্গে দুটো সম্পূর্ণ পৃথক সত্তার সঙ্গে কম্প্রোমাইজ করা। শেষপর্যন্ত আজকের মতই একটা মনকে আমার মর্যাদা দিতেই হোত আর একটাকে রাখতে হোত বুভুক্ষু।

কিন্তু সব কথার শেষ কথা, কি জানিস? সেই সুন্দরীর সন্ধান পাবার পর থেকে নিরন্তর এই একটি কথাই ভেবে চলেছি মনে মনে—

মুখপুড়ি, শেষ পর্যন্ত তোর কাছেই হার হল আমার! "বর্মরূপে তুই-ই এতদিন আড়াল করে রেখেছিলি আমার আকাঙ্খার মানুষটিকে!"

আর অন্ধকারে অন্ধের মত হাতড়ে ফিরেছি আমি!

কস্তুরী সেনগুপ্ত

কফি হাউস

বেদান্ত ও ন্যায়ের ধ্বজাধারীগণ ও কান্ট হেগেল প্রমুখ পৃথিবীর তাবৎ দার্শনিককুল আত্মদর্শন বা জীবনদর্শনের জন্য 'ক্ষুরস্যধারা' যে পথেরই নির্দ্দেশ দিননা কেন, আমরা Confirmed Gossiperরা, কিন্তু দু' বছর ধরে আমাদের 'কফি হাউস'কেই জীবনের পরম শ্রেয় বলে জেনে এসেছি। পিউ-রিটানগণ! আপনাদের পিউরিটানিজমের দিব্যি, এখনই সবেগে শ্রেয় ও প্রেয়ের তর্ক তুলতে বসবেন না যেন। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভাল এর পরেই এখানে যে রসের অবতারনা করা হ'বে তা অনেকের কাছেই স্বরভি চন্দনের সুগন্ধ ব'য়ে আনবেনা। অতএব, হে শ্রদ্ধেয় পিউরিটানগণ! এটুকু প'ড়েই আপনারা আপনাদের কুঞ্চিত নাসিকাকে কুঞ্চিততর ক'রে স্বচ্ছন্দে পাতা উল্‌টে প্রসঙ্গান্তরে চলে যেতে পারেন।

'কফি-হাউস'—পাঁচ অক্ষরের ঐ বীজমন্ত্রখানি মাঘের শীতেও রসিকচিত্তে যে কোন্ বসন্ত সমীরণের দোলা লাগিয়ে যায়, 'হৃদয় নন্দন বন' যে কোকিলের পঞ্চমতানে কেমন মাতাল হ'য়ে ওঠে সে বার্তা অরসিকের কাছে নিবেদন না করাই ভাল। আর যতই গলাবাজি করিনা কেন, আমাদের চেয়েও অনেক গুণে জাঁহাবাজ এমন সব জব্বর কফি হাউস রসিক রয়েছেন যাঁদের উপস্থিতিতে এ ব্যাপারে বেশী কিছু বলা মানেই অব্যাপারেষু ব্যাপারম্-এর ভয়ঙ্কর দায়ে ধরা পড়া।

তবে আমরা, কফি হাউসানুরাগীরা বিনা দ্বিধায় জোর সাহসে যে কথাটা কবি ফিরদৌসির ঢঙে বলতে পারি তা হ'চ্ছে এই যে জীবনকে যদি কোথাও দেখা যায় তবে তা এইখনেই, এইখানেই, এইখানে। অর্থাৎ যদি কোন জীবন প্রেমিকের এক লহমায় জীবন দর্শনের সাধ জেগে থাকে তবে কফি হাউস, হ্যাঁ, কফি হাউস ছাড়া তাঁর গত্যান্তর নেই—সেই যাকে ব'লে 'নান্যঃপন্থা বিদ্যতেঽয়নায়'। অতএব, হে জীবনদর্শনাভিলাষী পথিক প্রবর! এতদিনে একবারও যদি কফি হাউসে পায়ের ধুলো না দিয়ে থাকেন তবে সত্বর আসুন আর এসেই একটা অদখলীকৃত টেবিল দখল করে বসে পড়ুন—বিলম্বে হস্তান্তরের সম্ভাবনা। কারণ Rights of Admission Reserved-জাতীয় বিজ্ঞপ্তি দেবার মত প্রগতি এখন এখানে আসেনি।

এবার একবার চারিদিকের জনসমুদ্র বা শিরঃ সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে দেখুন। কি দেখছেন? দেখবেন 'কফি হাউস' রঙ্গমঞ্চে নিত্য নব জীবন নাট্যের অভিনয়, দেখবেন টেবিল থেকে টেবিলান্তরে জীবনের বিচিত্র লীলা আর ধূমায়িত কফির কাপে টাইফুন বা কাল বৈশাখী তুলবার প্রচেষ্টা।

এ দিকে ডানদিকের ব্যালকনি হয়ত যখন সাঁত্রে আঁদ্রে ব্রেতো ও ভ্যান্ গগকে নিয়ে ব্যস্ত, আর বাঁদিকের ব্যালকণি ultimate reality-র তথ্য উদ্‌ঘাটনে উদ্‌গ্রীব নিচের টেবিলগুলোয় তখন 'আমার নাম, তোমার নাম, ভিয়েৎনামের' প্রচণ্ড ধ্বনিতে সোচচার। অন্য কোনখানে হয়ত তখন পাশের টেবিলের অধিকারিণীদের সঙ্গে আলাপ করবার অক্লান্ত প্রয়াস চলছে—আর বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবার দায়িত্বটা কে নেবে তারই জন্য মুহুর্মুহু অবলীলা-ক্রমে দশ পনের টাকার বাজী ধরা হচ্ছে।

অন্যদিকে তাকিয়ে দেখুন, হয়ত দেখবেন কোনও উঠ্‌তি আধুনিক হাংরী কবিকে বা বীট্ জেনারেশনের নব্যতম প্রবক্তাকে যাকে দেখলেই আপনার মনে হবে জীবনদর্শন পথে এ বুঝি বা কোন উদ্‌ভ্রান্ত পথিক।

আপনি যদি অন্যতর রসের সন্ধানী হন তবে দেওয়ালের দিকের Cosy Corner গুলোর দিকেও পলকপাত করতে ভুলবেন না যেন। ওদিকে দৃষ্টিপাত করলে আপনার চোখ সহসা বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে আসবে। এই বিপুল কোলাহল সমুদ্র উপেক্ষা করে করে জোড়ায় জোড়ায় যে সব কপোত কপোতীর ঐ Cosy Corner-গুলোর অধীশ্বর হয়ে বসে আছেন তাঁদের একাগ্রতার তুলনা একমাত্র ভারতীয় যোগদর্শনের পাতা উল্টোলেই পাওয়া যেতে পারে বলে আমার বিশ্বাস।

এসব দেখে আমি জোর গলায় বলতে পারি, আপনার নিশ্চয় এতক্ষণ সেই লাইনটি গেয়ে উঠতে ইচ্ছে জাগছে "আমারে তুমি যে অশেষ করেছ এমনই লীলা তব।"

সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা—এই ত্রিকালে বঙ্কিমচন্দ্রের মাতৃমূর্তির মতই কফি হাউসও রূপ ত্রয়ে প্রকাশিত হন। আপনি যদি যদি তারকা বিলাসী হন তবে গ্ল্যামারবিহীন বিখ্যাত চলচ্চিত্র নায়ককে দেখতে আপনাকে অবশ্যই আসতে হবে সকালের দিকে।

আর দুপুরের কফি হাউসটা একান্ত ভাবেই 'ভর্সিটি আর কলেজগুলোর কাছে বাঁধা। অবশ্য এরই মধ্যে চকিতে এক আধ্‌বারের জন্যও যে স্কুলে পড়া কচি কচি ভীরু দু একখানি মুখ দেখতে পাওয়া যায়না এমন নয়। তবে তারা সংখ্যায় নিতান্তই নগণ্য।

আর সন্ধ্যার কফি হাউস? সে এক একেবারে পাল্‌টে যাওয়া রূপ। দুপুরের সেই অন্ধকার কোনগুলো এতক্ষণে নিওনের চড়া আলোয় ঝল্‌মল্‌ করছে, চাকরীর ইনক্রিমেন্ট, ইনকামট্যাক্সের আলোচনায় আবহাওয়াটাও বেশ ভারী থম্‌থমে—তার কারণ কফি হাউসে এখন প্রধানতঃ অফিস ফেরতা জীবনযুদ্ধে ক্লান্ত মানুষদের ভিড়।

পিউরিটান্‌রা যাই বলুননা কেন, আমি বেশ নিশ্চয় করে বলতে পারি আমাদের মতই 'কফি হাউস' কিছু দিনের মধ্যেই আপনার ধাতে সয়ে যাবে, তখন আর চার্‌মিনারের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন ঐ হলখানি আপনার বিবমিষার কারণ হবেনা, টেবিলে টেবিলে হরেকরকমের ফরমাস্‌ আর টিপস্‌ নিতে ব্যস্ত বেয়ারাদের হংসশুভ্র পাগড়িগুলিকে আপনার মুগ্ধদৃষ্টিতে অনুপম বলে মনে হবে।

চিকেন্‌ ওমলেটের গন্ধে আমোদিত ঐ বিখ্যাত buzzing sound এর মধ্যে আপনি বেশ স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করবেন, ভুলেও মনে হবেনা মাত্র কয়েকদিন আগেই এখানে এলে মনে হত যে আপনি বুঝি বা ডাঙ্গায় তোলা একটী নিরীহ জলের মাছ, আর, আর ঐ সদা ব্যস্ত প্রাণোচ্ছল হলঘরটির দিকে তাকিয়ে হঠাৎ হয়তো অনুভব করবেন যে কোন্‌ এক অজ্ঞাত মুহূর্তে আপনি এই কফি হাউসকে ভালবেসে ফেলেছেন ঠিক যেমন ভালবেসে ফেলেছি আমরা।

বিজনকুমার সেনগুপ্ত

পাত্র-পাত্রী সংবাদ

সকালে চায়ের সঙ্গে একখানা খবরের কাগজ না হলে আমাদের অনেকেরই চলে না—কারো কারো একখানার বেশী হলেই ভালো হয়। সব পাঠক-পাঠিকাই যে কাগজের সবকিছুতে সমান উৎসাহী তা নয়। কেউ কেউ বড়ো বড়ো শিরোনামাগুলোর ওপর চোখ বুলিয়েই তাড়াতাড়ি স্নানের ঘরে ঢুকে পড়েন, সময়মত আফিসে হাজিরা দেবার জন্য। কারো কারো বা খেলাধূলা সিনেমা-থিয়েটারের উপরই ঝোক বেশী। আবার কেউ দেখা যায়—বিশেষ করে পাঠিকাদের মধ্যে যাঁরা আইন-আদালতের স্তম্ভটা খুঁটিয়ে পড়েন আর নারী-নির্যাতন-সংক্রান্ত মামলার বিবরণ থাকলে একেবারে তন্ময় হয়ে যান। তাঁদেরই মধ্যে কিছু আবার জন্ম-মৃত্যু-বিবাহের খবরে বিশেষ উৎসাহ বোধ করেন।

সরলভাবে বলতে কী, আমি কিন্তু কাগজে অন্যান্য আকর্ষণীয় বিষয়ের মতো বিয়ের বিজ্ঞাপনের স্তম্ভগুলিও বেশ মনোযোগের সঙ্গেই নিয়মিত পড়ে থাকি। আমার এই লেখার পাঠক-পাঠিকাদের মুখের চেহারাটা আমার পক্ষে দেখা সম্ভব নয়, যদি হতো, তবে দেখা যেত তাঁদের অনেকের আননই বিরাগে কুঞ্চিত বা আমোদে ঢল ঢল হয়ে উঠেছে। আমি কিন্তু সেজন্য সঙ্কোচ বা লজ্জাবোধ করি না। সত্যি করে বলতে কী, শুধু একটা প্রচ্ছন্ন কৌতুকবোধের জন্যই

আমি ধৈর্য ধরে বেশ খানিকটা সময় নষ্ট করে বিয়ের বিজ্ঞাপনের ক্রমশঃ বিস্তারমান স্তম্ভগুলি পড়ি না, আসলে, এর মধ্যে আমি বর্তমান সমাজ-জীবনের প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই। তাই আমি এগুলি বেশ নিবিষ্ট ভাবেই পড়ি এবং এ নিয়ে বেশ খানিকটা ভাবি—

এ বিষয়ে একটা জিনিস আমার কাছে যেন খানিকটা 'প্যারাডক্সের' মতই মনে হয় তরুণ-তরুণীর অবাধ মেলা-মেশার ফলে স্বেচ্ছায় বিবাহ এখন কিছুটা চালু হয়েছে, তা সত্ত্বেও দেখা যায় বিয়ের বিজ্ঞাপনের স্তম্ভগুলি যেন দিন দিনই দৈর্ঘ্য-প্রস্থে বেড়েই চলেছে। কারণ যে ঠিক কী, বুঝে উঠতে পারি না।

এ প্রসঙ্গে খেয়াল রাখা প্রয়োজন এই বিজ্ঞাপনগুলি গ্রামের মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে—উচ্চ এবং নিম্ন উভয়াংশেরই—কারণ একেবারে উঁচু শ্রেণীর মধ্যে নারী-পুরুষের মেলা-মেসা এত বেশী যে, সেখানে অভিভাবকের মধ্যস্থতায় বিয়ের দরকারই হয় না; আর একেবারে নীচুস্তরে হয়ত ঘটক-ঘটকী এখনও কিছুটা কাজে লাগে কিন্তু বিজ্ঞাপন দিয়ে বিয়ের কথা তারা ভাবতেও পারে না।

পূর্বেই বলেছি, বিয়ের বিজ্ঞাপনকে আমি বর্তমান সামাজিক-অর্থনৈতিক জীবনের দর্পণ মনে করি তাই এতো উৎসাহ বোধ করি। তা ছাড়া, এও মনে রাখা দরকার যে, খবরের কাগজ মারফত বিয়ে ব্যবস্থা করা শুধু আমাদের মত অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর দেশেই আর আজকাল সীমাবদ্ধ নয়, এমন কি, সমৃদ্ধ ও উন্নত পাশ্চাত্য দেশে যে তা চোখে পড়ে না, তা নয়। এর কারণ বোঝাও শক্ত নয়। জীবন ক্ষণস্থায়ী এবং আধুনিক যুগ বিশেষ করে সংগ্রাম-মুখর এ অবস্থায় বিবাহেচ্ছু ছেলে-মেয়েদের (আর শুধু ছেলে-মেয়েই বা বলি কেন, কাগজে ত প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায় এমনকি আশী বছরের বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা পর্যন্ত—তাঁরাও কী নিজেদের সম্বন্ধে তাই মনে করেন। বেশ ঘটা করেই বিয়ে করে যাচ্ছেন।) যাহোক্, বিজ্ঞাপনের কৃপায় কাজটা তাঁদের পক্ষে বেশ কিছুটা সহজ হয়ে যায়, বিজ্ঞাপনে রূপ-গুণ ও আনুষঙ্গিক গুণাবলীর বিবরণ পড়ে তারা অল্প কয়জনের পিছু-ধাওয়া করতে পারে। এভাবে বেশ কিছু প্রণয়-পাগল ট্রয়েলাস্ সমধর্মী ক্রেসিডার সন্ধান পায়। অনেক ক্ষেত্রেই আশা করি বৈবাহিক মিলনে তাদের সন্ধানের মধু-সমাপ্তি ঘটে।

হালে কাগজে এও দেখতে পাই, আমেরিকা, ফ্রান্স, বৃটেন প্রভৃতি দেশে এই প্রাথমিক বাছাই কাজের জন্য 'অটোমেশনের' সাহায্য নেওয়া হচ্ছে—সে যন্ত্রের মারফত দেখান হয়, কোন ছেলের সঙ্গে কোন্ মেয়ের বিবাহ

হওয়া সম্ভব, এ পদ্ধতি এখনও বেশী করে চালু না হবার দরুণ এর সাফল্য সম্বন্ধেও এখনও কোন স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাচ্ছে না।

সে যা হোক, বেশ কিছুকাল বিজ্ঞাপনগুলি আমি মনোযোগের সঙ্গে বিশ্লেষণ করে এই স্থির সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছি, মেয়ে ও ছেলের পক্ষে যথাক্রমে এমন জিনিস (গুরুত্বানুসারে সাজান হল) বিপরীতপক্ষীয়দের কাছে আকর্ষণীয়। মেয়েদের বেলায়—(১) সৌন্দর্য (২) শিক্ষা (গ্রাজুয়েট হওয়াই সাধারণভাবে বাঞ্ছনীয়) (৩) গান, বাজনা, নাচ (৪) বংশ-পরিচয়, বিশেষ করে, বাবার চাকুরী (৫। ছবি-আঁকা, সেলাই-ফোঁড়াই ইত্যাদি (আশ্চর্য, রান্নাটা সাধারণ-ভাবে লিষ্ট থেকে উহ্য থেকে যায় যদিও একে খুব উঁচু স্থান দেওয়া দরকার।) ছেলেদের পক্ষে—(১) কী কাজ করে আর বিশেষ করে বেতন কত (২) বাবার চাকুরী (৩) বাড়ী-গাড়ি (অন্ততঃ প্রথমটা) আছে কিনা (৭) চেহারা (৫) স্বাস্থ্য। এবার বিবাহেচ্ছু ছেলেমেয়েরা ভেবে দেখতে পারেন, কার চান্স কত খানি এবং কত শীঘ্র আছে। মেয়েদের একটা কথা মনে রাখা দরকার—তাঁদের প্রথম-দফা গুণ, সৌন্দর্য্য, কিন্তু এখন প্রায়শঃ গায়ের রঙেই পর্য্যবসিত হচ্ছে অবশ্য, তাঁরা যে আর এটা জানেন না, সেরকম মনে করার কোন কারণ নেই।

দু'একটা বিজ্ঞাপন আবার কৌতুকপ্রদ বলে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিছুদিন আগে একটা বিজ্ঞাপন দেখেছিলাম—ছেলের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে—যেখানে পাত্রের গুণাবলী দিতে গিয়ে বলা হয়েছে যে সে নামজাদা ঘরের ছেলে, কলকাতায় খান কয়েক বাড়ীর সে মালিক, বয়স তিরিশের কম, এক ঝুড়ি বিলেতী ডিগ্রি আছে, কার্তিকোপম চেহারা। ভাবী বধূর গুণাবলীর বর্ণনা করে শেষ পর্য্যন্ত তার চেহারার প্রতি অংশের মাপ-জোক পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে—দৈর্ঘ, বুকের, হাতের ও পায়ের মাপ, রঙ শুধু ফর্সা হলেই চলবে না—কী ধরণের ফর্সা হবে তা পর্য্যন্ত বলে দেওয়া হয়েছে। পড়ে তখন মনে হয়েছিল, বুঝি বা হেডী লামার বা জোয়ান ক্রফোর্ড পর্য্যন্ত প্রতিযোগী হলে সরাসরি উৎরে যাবে কিনা সন্দেহ। একমাত্র কোন স্বর্গীয় ডায়না (সেই যাকে বলে ডানা-কাটা পরী) অথবা নিদেন পক্ষে, আটালাণ্টাই এই প্রতিযোগিতায় যেন খানিকটা আশা নিয়ে এগিয়ে আসতে পারত।

অনেকদিন পর্য্যন্ত, এই ভাবে বিজ্ঞাপিত একাধারে লক্ষী-সরস্বতীর বরপুত্রটির কোথায়, কী রকম বিয়ে হলো, তা নিয়ে মনে কৌতুহল ছিল।

ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য

রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর'

অনেকে রবীন্দ্রনাথের সংকেতিক নাটকগুলির সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য সংকেতিক নাটকগুলির তুলনা করিয়া থাকেন। কিন্তু এই সম্পর্কে একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সংকেতের সহায়তায় ভাব-প্রকাশ করিবার পদ্ধতি ভারতীয় চিন্তার রাজ্যে সম্পূর্ণ অভিনব নহে, বরং ভারতীয় জীবন-সাধনায় তাহা যত সহজ, জড়বাদী পাশ্চাত্ত্য জীবনাচরণে তাহা তত সহজ নহে। প্রত্যক্ষ জীবনের প্রতি বিশ্বাস যখনই শিথিল হইয়াছে, তখনই পাশ্চাত্য সাহিত্যে সঙ্কেতধর্মী নাটকের জন্ম হইয়াছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে যুগে তাঁহার সঙ্কেত-ধর্মী নাটকগুলি রচনা করেন, সেই যুগে বাঙ্গালীর জীবন-চেতনায় কোন শৈথিল্য দেখা দিয়াছিল তাহা বলিতে পারা যায় না, তবে একথা সত্য রবীন্দ্রনাথের মনে এক আধ্যাত্মিকভাবের বিকাশ হইতেছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'মানসী', 'সোনারতরী', 'চিত্রা' রচনার যুগে যে জীবনদৃষ্টির অধিকারী ছিলেন, 'খেয়া' উত্তীর্ণ হইয়া যাইবার পর তিনি 'ক্রমেই সেই প্রত্যক্ষ মানব-জীবনের সম্পর্ক হইতে দূরবর্তী হইয়া পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তথাপি রবীন্দ্র কবিমানসে প্রত্যক্ষ মানবজীবন সম্পর্কিত সংস্কার এত প্রবল ছিল যে, তিনি তাঁহার সঙ্কেতধর্মী নাটক রচনাতেও তাহার প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে পারেন নাই। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য সঙ্কেতধর্মী নাটক সম্পর্কে একথা বলিতে পারা যাইবে না। পাশ্চাত্ত্য সঙ্কেতধর্মী নাটকের কাহিনীতে প্রবেশ করিলে এ কথা বুঝিতে পারা যায় যে, এক স্বতন্ত্র রাজ্যের মধ্যে আসিয়া

পাঠক প্রবেশ করিয়াছে তাহার পরিচিত সংসারের সঙ্গে ইহার কোন যোগ নাই, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সাঙ্কেতিক নাটক পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায়, আমরা পরিচিত পৃথিবীর উপর দিয়েই যেন হাঁটিয়া চলিয়াছি। তাহার ফলে রবীন্দ্রনাথের এই শ্রেণীর নাটকগুলি অধিকতর বাস্তব গুণসম্পন্ন হইয়া থাকে। ইহার উল্লেখযোগ্য নিদর্শন রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর।'

'ডাকঘর' নাটক সংকেত ধর্মী হওয়া সত্ত্বেও ইহার এই প্রধান নাট্যগুণ এই যে পার্থিব জীবনের পরিবেশের মধ্যেই ইহার সঙ্কেত ব্যক্ত করা হইয়াছে, 'রাজা' নাটকের মতো ইহাতে অপ্রত্যক্ষ রোমান্টিক জগতের আশ্রয় লইতে হয় নাই। রবীন্দ্রনাথের কবিধর্মের বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি জাগতিক জীবনের প্রাত্যহিক ও তুচ্ছ উপকরণের মধ্য হইতেও সুগভীর জীবনসত্যের সন্ধান পাইয়াছেন, কোন বস্তুকেই পার্থিব বলিয়া যেমন তিনি তুচ্ছ করেন নাই, তেমনই ক্ষুদ্র বলিয়াও উপেক্ষা করেন নাই। 'রাজা' নাটকের চরিত্রগুলির যে অভিজাত পরিচয় ছিল, তাহা 'ডাকঘর' নাটকের চরিত্রগুলির নাই। তাহারা প্রত্যেকেই আমাদের পরিচিত জগতের স্ত্রীপুরুষ। এমন কি, ইহাদের পরিচয়ও গৌরবোজ্জল নহে। ইহারা আমাদের পরিচিত দইওয়ালা, নাগরা পায়ে বিদেশী কর্মসন্ধানী পথিক, লাল পেড়ে শাড়ী পরা গয়লাদের মেয়ে এবং মালীদের এতটুকুন ছোট্ট মেয়ে সুধা। সে ছোট পা দুইটি দিয়া মল ঝম্ ঝম্ করিয়া গাঁয়ের পথে হাঁটে, ছোট সাজিটিতে ফুল ভরিয়া আনে। ইহাকে আমার পরিচিত বলিয়া চিনিয়া লইতে কিছুমাত্র ভুল হয় না। এই প্রকার প্রাত্যহিক জীবনের উপকরণ দিয়া যে অলোকপন্থী সাংকেতিক নাটক রচিত হইতে পারে, তাহা পৃথিবীর সাহিত্যে আর কেহ দেখাইতে পারেন নাই। ইউরোপীয় সাহিত্যের বিভিন্ন লেখক যখন সাংকেতিক নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তখনই তাহারা প্রাত্যহিক জীবনের কোলাহল হইতে দূরে সরিয়া গিয়া কল্প-লোকে অবতরণ করিয়াছিল, যে জগৎ তাহারা রচনা করিয়াছিল, তাহা কখনও আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাপনের ধূলিমলিন জগৎ বলিয়া মনে হইতে পারে না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ প্রাত্যহিক জীবন যাপনে আমাদের পরিচিত জগতের সঙ্গে অপার্থিব কোন জগতের কোন পার্থক্য স্বীকার করেন নাই। সাধারণের মধ্যেই তিনি অসাধারণকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, রূপের মধ্য হইতেই তিনি অরূপের সন্ধান পাইয়াছেন। ভারতীয় দার্শনিক যখন জীবন এবং জগতের কথা চিন্তা করেন, তখন চক্ষু মুদিয়া ধ্যান দৃষ্টিতে জীবন এবং জগতের সত্য সম্পর্কে সন্ধান করেন। তুচ্ছতার কোলাহল হইতে তাঁহার চিত্ত দূরে

সরিয়া যায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ প্রাত্যহিক জীবনের তুচ্ছ কোলাহলের মধ্য হইতেই জীবনের চরম দার্শনিক সত্যের সন্ধান পাইয়াছেন। 'ডাকঘর' নাটকটি তাহার একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হইয়া আছে।

অথচ ইহাও অত্যন্ত বিস্ময়ের বিষয় এই যে রবীন্দ্রনাথ যখন 'ডাকঘর' নাটক রচনা করেন, তখন তিনি ধ্যান লোকেই বিচরণ করিয়াছেন বলিয়া সকলেরই বিশ্বাস। অন্ততঃ তাঁহার সেই যুগের রচনা পড়িলে এই কথাই মনে হয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পক্ষে কোনদিনই ভূমা সত্য ছিল না, বরং ভূমিই যে সত্য ছিল, 'ডাকঘর' নাটকটি তাহাই প্রকাশ করিয়াছে। অধ্যাত্মলোকে বিচরণ করিবার যুগেও রবীন্দ্রনাথ যে তাঁহার মর্ত্যাভিমুখী দৃষ্টি পরিত্যাগ করেন নাই, তাহার ভিতর দিয়েই রবীন্দ্র সাধনার মধ্যে দর্শনের চাইতে কবিত্বই যে বড় ছিল তাহাই বুঝিতে পারা যায় এবং তাহা যে কত শক্তিশালী ছিল, তাহা 'ডাকঘর' নাটকে যত সহজে প্রমাণিত হয়, তাহা তাঁহার আর কোন নাটকের মধ্যে তত প্রমাণ হয় না। সেইজন্য তাঁহার 'ডাকঘর' কেবলমাত্র তাঁহার শ্রেষ্ঠ নাটক নহে, তাঁহার শ্রেষ্ঠ রচনা। 'ডাকঘর' রচনার যুগে রবীন্দ্রনাথ নাট্যরচনায় অতিভাষণের দোষ হইতে মুক্তি পাইয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের নাটকগুলির একটি প্রধান ত্রুটি এই যে ইহাদের মধ্যে নাট্যকার প্রয়োজনাতিরিক্ত দীর্ঘ সংলাপ ব্যবহার করিয়াছেন। ভাষা কেবলমাত্র পল্লবায়িত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার ফলে অনেক ক্ষেত্রেই ইহা উত্তম কাব্য হইয়া উঠিলেও তাহা উচ্চাঙ্গের নাট্যগুণান্বিত হইতে পারে নাই। কারণ ঘটনা এবং সংলাপে সংযম প্রকাশ করা নাটকের একটি প্রধান গুণ। নাট্য-কাব্য রচনার যুগ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এই গুণটি বিকাশ লাভ করিতে পারে নাই। তারপর 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটক হইতে যদিও সেই গুণের কিছু কিছু বিকাশ দেখা দিল, তথাপি তখন তাঁহার নাটকগুলি সঙ্গীতে ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। সঙ্গীতও নাট্যকাহিনীর যে ভারস্বরূপ, তাহার স্বচ্ছন্দ গতির সহায়ক নহে, তাহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। 'প্রায়শ্চিত্ত' এবং 'রাজা' নাটকে মিতভাষণ লক্ষ্য করা গেলেও সঙ্গীতের ভার হইতে ইহারা মুক্ত হইতে পারে নাই। কিন্তু 'ডাকঘর' নাটকে একটিও সঙ্গীত নাই। 'রাজা' নাটকের অব্যবহিত পরবর্তীকালে রচিত হওয়া সত্বেও 'রাজা'র সঙ্গীতের কোন প্রভাব যে ইহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই, তাহাও ইহার সম্পর্কে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার যোগ্য। সঙ্গীত নাট্য কাহিনীর নিরবচ্ছিন্নতা বিনষ্ট করে, ইহার গতিকে শিথিল করিয়া দেয়। যদিও একান্ত ভাব বা আইডিয়ামূলক নাটকে

কাহিনী দৃঢ় সংবদ্ধতা লাভ করিতে পারে না, তথাপি যতটুকুও পারে, সঙ্গীতের ব্যবহার দ্বারা তাহাও শিথিল হইয়া যায়। এই বিষয়ে 'ডাকঘর' নাটক একটি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম। এমন কি, 'ডাকঘরে'র পরবর্তীকালেও রবীন্দ্রনাথ যে সকল রূপক এবং সঙ্কেতধর্মী নাটক রচনা করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যেও ব্যাপকভাবে সঙ্গীত ব্যবহার করিয়াছেন। এই বিষয়ে 'মুক্তধারা' এবং 'রক্ত-করবী'র নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহাদের মধ্যে ব্যাপকভাবে সঙ্গীতের ব্যবহার হইয়াছে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহাদের পূর্ববর্তী রচনা 'ডাকঘরেই' ইহার ব্যতিক্রম দেখা দিয়াছে।

'ডাকঘর' প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত একটি সুগভীর বেদনার সুরে গাঁথা। ইহার বেদনার সুরের মধ্যে কোথাও ছেদ পড়ে নাই, কোথাও বিরাম কিংবা যতি-চিহ্ন পর্যন্ত নাই। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত জীবনের ব্যথা বেদনার সুর ইহার সঙ্গে জড়িত হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়া ইহার বেদনা-করুণ সুরটি এত মধুর বলিয়া বোধ হয়। জীবনের স্পর্শ না থাকিলে ইহার সৃষ্টি এত আন্তরিক হইতে পারিত না। গীতিকবি রবীন্দ্রনাথের গভীরতম জীবনানুভূতি ইহার ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু তাহা গীতিকবিতার নৈর্ব্যক্তিকভাবের পরিবর্তে কতকগুলি বাস্তব চরিত্র আশ্রয় করিয়াছে বলিয়াই তাহার দ্বারা নাট্যগুণ বিকাশ লাভ করিবার পক্ষে সহায়ক হইয়াছে।

জীবনের রস উপলব্ধি করিবার ভারতবাসীর একটি নিজস্ব পদ্ধতি আছে। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের সঙ্গে এইখানেই তাহার পার্থক্য। সেক্সপীয়রের নাটকে যে কর্মকোলাহলময় জীবন-রূপের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা ভারতীয় জীবন-সাধনার অভ্রান্ত লক্ষ্য নহে, মানুষের কর্মের মধ্য দিয়া সেক্সপীয়র তাহার জীবন সত্যকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, সেইজন্য তাহার নাটকে কর্মের সমারোহ দেখা যায়। কিন্তু ভারতীয় ঐতিহ্যে ধ্যান-দৃষ্টির একটি বিশেষ স্থান স্বীকৃত হয়। ধ্যানের ভিতর দিয়া ইহাতে জীবনের সত্য উপলব্ধি হয়। কর্ম ব্যতিরেকেও মানুষকে চিনিয়া লইবার আরও বিভিন্ন যে ক্ষেত্র আছে, তাহার স্বীকার করা হয়। 'ডাকঘরের' মধ্যে মানব-জীবনের একটি ধ্যান-দৃষ্টি দিয়া প্রত্যক্ষ করা হইয়াছে, কর্ম-কোলাহলের মধ্য দিয়া নহে। সেইজন্য প্রচলিত ইংরেজি নাটকের অনুসরণে ইহার চরিত্রগুলি চিত্রিত হইতে পারে নাই। ভারতীয়েরা প্রতীকের উপাসক, ইঙ্গিতের মধ্য দিয়া মহান্ সত্যকে উপলব্ধি করিতে তাহারা অভ্যস্ত। পরিপূর্ণ জীবনের পরিবর্তে জীবনের কেবলমাত্র যদি একটি খণ্ডাংশ তাহা দেখিতে পায় তাহা হইলেও তাহা হইতেই পরিপূর্ণ জীবনের স্বাদ লাভ

করা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব হয় না। সুতরাং সাংকেতিক নাটক ওই দেশের জলবায়ুতে যত সহজে বোধগম্য হয় অন্য কোন বিষয় তত নহে। সুতরাং 'ডাকঘর' নাটকের আঙ্গিককে ভারতীয় ঐতিহ্যের বিরোধী রচনা বলিয়া কখনও মনে করা যায় না। বরং তাহার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াই ইহার পরিকল্পনা এবং রূপায়ণ সার্থক হইয়াছে। রবীন্দ্র-সাধনার আধ্যাত্মিকতার পরিপূর্ণ উন্মেষের যুগে 'ডাকঘর' রচিত হওয়া সত্ত্বেও ইহার মধ্যে অপার্থিব কোন অধ্যাত্মিক অনুভূতি প্রাধান্য লাভ করিতে পারে নাই। ইহার ভিতর দিয়া রবীন্দ্র-প্রতিভার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা এই যে রবীন্দ্র-সাধনায় আধ্যাত্মিকতা নিতান্ত গৌণস্থান অধিকার করিয়া আছে, বরং তাহার পরিবর্তে তাঁহার মানব ও মর্তমুখীনতা সর্বদাই মুখ্যস্থান অধিকার করিয়াছে। 'ডাকঘর' নাটকের প্রধানগুণ ইহাই। ইহার মধ্যে পিসেমহাশয়, পিসিমার স্নেহ যত সত্য, সেই তুলনায় অমলের কোন অতীন্দ্রিয় অনুভূতি তত সত্য নহে। ইহার চিত্রগুলি যত বাস্তবধর্মী, তত অলৌকিক পথের নির্দেশক নহে। রবীন্দ্রনাথের রূপক এবং সাঙ্কেতিক নাটক রচনার ক্ষেত্রে ইহা একটি ব্যতিক্রম এবং ব্যতিক্রম বলিয়াই ইহার রচনায় এই চরম সিদ্ধি দেখা দিয়াছে।

একমাত্র 'ডাকঘর' ব্যতীত রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য রূপক এবং সাংকেতিক নাটকের জীবন এবং জগৎ সম্পূর্ণ রোমান্টিক, তাহাদের ভিতর দিয়া মনুষ্য জীবন সম্পর্কে যে শাশ্বত চিন্তার বিকাশ হোক না কেন, প্রত্যক্ষ জীবন বিশেষ কোন যোগ রক্ষা করিতে পারে নাই। কিন্তু 'ডাকঘরে'র মধ্যে প্রত্যক্ষ জীবনের মমতা অতীন্দ্রিয় অনুভূতির বহু উর্ধ্বে উঠিয়া গিয়াছে, সেইজন্য ইহা যে আবেদন সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা এই শ্রেণীর আর কোন নাটক করিতে পারে নাই।

'ডাকঘরে'র পরবর্তী রচনা 'মুক্তধারা' এবং 'রক্তকরবী'। ইহাদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ 'ডাকঘরে'র মত কোন চিরন্তন জীবনের রূপ কিংবা অনুভূতি প্রকাশ করিতে পারেন নাই, বরং তাহাদের পরিবর্তে তিনি দুইটি সমসাময়িক ব্যবহারিক জীবনের সমস্যা লইয়া আলোচনা করিয়া তাহাদের বিষয়ে তাঁহার নিজস্ব মতবাদ প্রচার করিয়া গিয়াছেন। একটির মধ্যে যন্ত্রশিল্পের বিরুদ্ধে তাঁহার প্রতিবাদ ঘোষিত হইয়াছে, অপরটির মধ্যে ধনতন্ত্রের সঙ্গে সহজ মানবিকতার সংঘষের শোচনীয় পরিনতির বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে। বিশেষতঃ 'মুক্তধারা' নাটকের কাহিনী এবং চিত্রপট চরিত্র-পরিকল্পনার মধ্যেও রবীন্দ্রনাথের কোন মৌলিক প্রতিভার বিকাশ দেখা যায় না। কারণ, পূর্বরচিত একটি নাটকের কাহিনীকেই তিনি ইহার মধ্যে গ্রহণ করিয়াছেন। 'রক্ত

করবী'র কাহিনীর মধ্যে একজন বিশিষ্ট সমালোচক নাটকের ত নহেই, এমন কি কাব্যেরও কোন উপাদানের সন্ধান পান নাই, বরং তাঁহার মতে ইহা প্রবন্ধের বিষয় বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। ধনতন্ত্রের ভালমন্দ লইয়া বিচার রূপক এবং সংকেতধর্মী নাটকের উপজীব্য হওয়া কতদূর সম্ভব তাহা প্রকৃতই বিচারসাপেক্ষ। কারণ, ইহা জীবনে শাশ্বত কোন সমস্যা নহে, ইহা সাময়িক কিংবা বহির্মুখী ও অর্থনৈতিক সমস্যামূলক। চিরন্তন সাহিত্যিক আবেদন ইহার ভিতর দিয়া সার্থক হইতে পারে না।

সুতরাং দেখা যায়, কতকগুলি বিশেষ গুণের জন্য রবীন্দ্রনাথের রূপক এবং সাংকেতিক নাটকগুলির মধ্যেও 'ডাকঘর' এক স্বতন্ত্র রচনা। তবে ইহার মূলভাব রবীন্দ্রসাধনায় অভিনব নহে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ছোটগল্প 'গল্পগুচ্ছ' রচনার যুগে একটি গল্পের ভিতর দিয়া ইহার মূল ভাবটির প্রথম সন্ধান পাইয়াছিলেন। গল্পটির নাম অতিথি। ইহার তারাপদর চরিত্রের সঙ্গে অমলের চরিত্রের ঐক্য আছে। তবে অমলের জীবনের মধ্যে কবির নিজ বাল্যজীবনের বন্ধন-দশার করুণ স্মৃতিও বিজড়িত ছিল বলিয়া ইহা এতখানি জীবন্ত এবং সরস হইতে পারিয়াছে। কাহিনীটির পরিকল্পনায় অবশ্য পাশ্চাত্তা সাহিত্যের ক্ষীনতম সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। ওয়ার্ড্‌সাথের ODE TO IMMORTALITY কবিতার শিশুর সঙ্গে ডাকঘরের 'অমলে'র কিছু মিল আছে। তারপর ইহাতে যাহাকে EARTH বলা হইয়াছে, তাহার সঙ্গে মাধবদত্তের চরিত্রেরও একটু যোগ আছে। ওয়ার্ড্‌সার্থের কবিতায় আছে—

> Doth all he can
> To make life foster child, his inmate, man,
> Forget the glories he hath known,
> And that imperial palace whence he came.

মাধবদত্তের আবরণে তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে।

এ'কথা স্মরণ রাখিতে হইবে রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর' পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি সভ্য জাতির সাহিত্যে অনূদিত হইয়া অভিনীত হইয়াছে। ইহাও বিশেষ তাৎপর্যমূলক। যদি একটি বিশ্বজনীন আবেদন ইহার ভিতর দিয়া প্রকাশ না পাইত, তবে ইহা কখনও এত ব্যাপক সমাদর লাভ করিতে পারিত না। কোন সাময়িক কিংবা সাম্প্রদায়িক সমস্যামূলক বিষয় সর্বজনীন আবেদন সৃষ্টি করিতে পারে না। 'ডাকঘর' ইহাদের সকলের উর্ধ্বে উঠিয়া গিয়াছিল বলিয়াই ইহার এই আবেদন সম্ভব হইয়াছিল। তাঁহার আর কোন রচনারই সেই শক্তি ছিল না।

নির্মলেন্দু রায়চৌধুরী

ইসকাইলাস

(৫২৫—৪৫৬ খ্রীঃ পূঃ)

কালগত হয়েও নাট্যজগতে সে নামটি চিরভাস্বর তিনি ইসকাইলাস। প্রাচীন যুগের নাট্যকারগণের মধ্যমণি। শুধু ট্র্যাজিক-নাটকের জনক-ই নন, গ্রীক নাটক সৃষ্টির গৌরবও তাঁর। সেই সঙ্গে 'ট্রিয়োলজি' বা ত্রয়ী-নাটকের অভিনব অবদানও এঁর। নাটকে ঘটনার প্রবক্তাও ইসকাইলাস। আবার তা সার্থক রূপায়ণে উপযোগী চলন ও বাচনভঙ্গী, নৃত্য, পোষাক, মুখোস, দৃশ্যপট এবং সচল মঞ্চের প্রবর্তনের কৃতিত্বও ইস্কাইলাসের। সেদিক থেকে বিচার করলে এই প্রাচীন নাট্যকারকে আধুনিক নাট্যরূপের পথিকৃৎ বললেও অত্যুক্তি হবে না। বলাবাহুল্য, বিশ্বসাহিত্যের দরবারে নাট্যকার ইসকাইলাসের নামটি চিরদিন অম্লান থেকে সর্বকালের এবং সর্বদেশের নাট্যকারগণের প্রেরণার উৎস হবে।

কিন্তু তাঁর কাব্যপ্রতিভাও কম ছিল না। অবশ্য কবি ইসকাইলাসের পরিচিতি আমাদের কাছে কিছুটা অস্পষ্ট। হয়তো বা নাটকের প্রতি ইসকাইলাসের গভীর প্রবণতাই তাঁর কাব্যপ্রতিভা পূর্ণ বিকাশের বা প্রসারের ছিল।—যেটুকু বিকশিত হয়েছিল তাতেই উত্তরকালে তিনি কবি-খ্যাতিও কম অর্জন করেন নি।

কোন কোন সমালোচকের মতে,—ইসকাইলাস ছিলেন গ্রীসের শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজিক-কবি। Macaulay-এর ভাষায়,—Aeschylus was a great lyric poet rather than a great dramatist...considered as plays his works are above all praise....But if we forget the

characters and think only of the poetry, we shall admit that it has never been surpassed in energy and magnificence.

আরও একজন বিদগ্ধ সমালোচকের উক্তি এই সূত্রে প্রণিধানযোগ্য : If ever there was a poet filled with a deep sense of the sacred nature of his calling as the Teacher of religion, and of all virtue as therewith connected,.Aeschylus was he.

তবুও ইসকাইলাস আমাদের কাছে মূলতঃ বিশ্বের অবিসম্বাদিত শ্রেষ্ঠ নাট্যকার রূপেই চিরদিন গভীর শ্রদ্ধা অর্জন করবেন। তাঁর রচিত প্রায় সত্তরখানা (কারুর মতে—৮০টি) নাটকের মধ্যে মাত্র সাতটির সন্ধান পাওয়া যায়। যথা,—Prometheus Bound, The Seven against Thebes (467 B. C), The Persae (472 B. C), The Female Suppliants, Oresteia (458 B. C): The Agamemnon—The Choephori/ Libation Bearers—The Eumenides, a triology.

Oresteia অথবা The House of Atyens নাট্যকারের শ্রেষ্ঠ অবদান বলে চিহ্নিত। খ্রীঃ পূঃ ৪৮৮-তে এ নাটকটি মঞ্চস্থ হতে ইসকাইলাস পুরস্কৃত হয়েছিলেন। প্রসঙ্গতঃ, Persae-ই একমাত্র নাটক যাতে গ্রীসদেশের সমকালীন সমাজ-চিত্রটি বিধৃত হয়েছে। নাটকটি এটনা নগর উদ্বোধনের দিন প্রথম রূপায়িত হয়েছিল বলে জানা যায়।

ইসকাইলাসের নাট্যচৈতন্যের প্রসাদগুণটি ছিল—গ্রীকসাহিত্যের প্রচলিত 'নেমেসিস্'বাদের সংস্কার। এবং এই নিয়তিবাদকে নাট্যসাহিত্যে নতুন অর্থে, নতুন আত্মায় তথা প্রতিজ্ঞায় চিহ্নিত করা। তাঁর চরিত্র এই নিয়তিবাদের কবলে পড়ে তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কখনোই বিসর্জন দিতেন না।—সমাজ মানস এবং সামগ্রিক মানসিকতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তারা ঘটনার সঙ্গে দৃঢ়ভাবে মোকাবিলা করতো। এইখানেই বোধকরি ইসকাইলাস নব্যযুগের পরীক্ষা-প্রবণ প্রতিভার প্রথম মনীষী।

দুঃখের বিষয় ইসকাইলাসের ব্যক্তিজীবনের তথ্যের সন্ধান বিশেষ পাওয়া যায় না। ইলিয়ুসিস নগরে এক সম্ভ্রান্ত জমিদার পরিবারে তাঁর জন্ম। কেউ বা মনে করেন, তাঁর পিতা ইউমেনরিয়ন সম্ভবতঃ এথেন্সের শেষ রাজা কডরাসের বংশধর ছিলেন।

তবে একথা নিঃসন্দেহে জানা যায়—পারস্যের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা-সংগ্রামে ইসকাইলাস সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। ম্যারাথন এবং সালামিসের যুদ্ধে অমিত বিক্রমে যুদ্ধ করে তিনি বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন। ম্যারাথন

যুদ্ধের বিজয় (৪৯০ খ্রীঃ পূঃ) বীর সৈনিক ইসকাইলাসের জীবনে এক গৌরবময় অধ্যায়।

তা যাই হোক। আসলে তিনি ছিলেন একজন জাতশিল্পী। তাই যুদ্ধেরবিজয়-গৌরব তাঁকে উচ্ছ্বসিত করে নি। যুদ্ধের রূঢ় বাস্তব—দুঃখ, দুর্দশা বা বীভৎসতা তাঁর কবি-চেতনাকে গভীর পীড়া দিয়েছিল। সেই বেদনাই তাঁর কাব্য এবং নাটকে মূর্ত হয়ে উঠেছে। তাই তাঁর রচনায় ম্যারাথনের বিজয়-গৌরব অস্ফুট। সালামিস যুদ্ধের অভিজ্ঞতার আভাস অবশ্য পাওয়া যায় তাঁর Persae নাটকে।

ঠিক কবে তাঁর ভেতর সাহিত্যের বীজ উপ্ত হয়েছিল বা কি করে তিনি প্রথম লিখতে শুরু করেন, বলা শক্ত। সম্ভবতঃ গ্রীসের পুরাণ এবং উপকথাই ইসকাইলাসকে সে প্রেরণা দিয়েছিল।

সে সময় গ্রীস দেশে নাটক রচনার প্রতিযোগিতা প্রচলিত ছিল। খ্রীঃ পূঃ ৪৯৯-তে ইসকাইলাস প্রথম সে প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন ; ৪৮৫ খ্রীস্ট পূর্বাব্দে তিনি প্রথম স্থান অধিকার করে পুরস্কৃত হন। ক্রমে তিনি উক্ত তেরটি পুরস্কারের গৌরব অর্জন করেন। একবার তাঁর উত্তরসূরী সোফোক্লেসের কাছে পরাজিত হয়ে মনের দুঃখে ইস্কাইলাস স্বদেশ ত্যাগ করেন। তিনি স্বদেশে আর কোনদিন ফেরেন নি।

দেশত্যাগী ইসকাইলাস সিরাকুজ (সিসিলি) রাজ হীরোর সাদর অভ্যর্থনা সানন্দে গ্রহণ করেন। শেষ জীবন তিনি সিরাকুজে কাটান। এর আগেও অবশ্য একসময় (৪৭২-৪৬৮ খ্রীঃ পূঃ) কিছুদিনের জন্য তিনি সিরাকুজ রাজার আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন।

গেলা অঞ্চলে মহান ইসকাইলাস শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুটা যেমনি অস্বাভাবিক তেমনি মর্মান্তিক। একদিন এই মনীষী আপনমনে প্রায়-জনহীন প্রান্তরে একাকী বেড়াচ্ছিলেন। এমন সময় একটি প্রকাণ্ড ঈগল পাখী তাঁর মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যায়। যেতে যেতে ঈগলটি ইসকাইলাসের কেশ-বিরল মস্তকের ওপর তার কবলিত একটি বড় কচ্ছপ ফেলে যায়। নিয়তির কি নিষ্ঠুর পরিহাস! সঙ্গে সঙ্গে রক্তাপ্লুত মস্তকে ইস্কাইলাস মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। তিনি আর ওঠেন না। এমনিভাবে তাঁর অমূল্য জীবন-দীপটি নিভে যায়।

নাটক এবং কাব্য মিলিয়ে তিনি লিখেছিলেন বিস্তর, সন্দেহ নেই। অনেকের মতে, তাঁর সমাধিস্তম্ভে যে স্মারকলিপিটি উৎকীর্ণ আছে—সেটিও ইসকাইলাসের স্বরচিত। বিচিত্র নয়।